শ্রীহিমাংশু ভূষণ সরকার

★

দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য

এই গ্রন্থে দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য-সৃষ্টির ইতিহাস, ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার, পুরাণ, দর্শন, নীতি, স্মৃতিশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ভেষজশাস্ত্র, রামায়ণ-মহাভারত ও তদাশ্রয়ী কিম্বদন্তী কাহিনী, ছায়ানাটক, পশুপক্ষীর গল্প এবং ঐতিহাসিক সাহিত্য প্রভৃতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মূল ভাষায় রচিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এইরূপ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ কোন ইউরোপীয় ভাষাতেও প্রকাশিত হয় নাই।

ফার্মা কে. এল্. মুখোপাধ্যায়
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
৬/১এ, ধীরেন ধর সরণী, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ ১৯৬০

প্রকাশক : ফার্মা কে. এল্. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ১২
মুদ্রাকর : শ্রীগোপাল কুণ্ডু, জার্নাল প্রেস, ৫১/১০ রানী হর্ষমুখী রোড, কলিকাতা-২

ভূমিকা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণপূর্ব এসিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই স্থলে তিনি প্রাচীন যুগের স্বাক্ষর দেখিয়াছেন সাহিত্যে, আর্টে, স্থানীয় লোকের জীবনাচরণে, রীতিতে-নীতিতে। এ যেন ছিল তাঁর এক তীর্থযাত্রা! তাঁর মর্মবাণী তাই ভাষায় রূপ নিল ; ছন্দে সেই বাণী শুনিলাম :

"তোমায় আমায় মিল হয়েছে কোন যুগে এইখানে
ভাষায় ভাষায় গাঁঠ পড়েছে, প্রাণের সঙ্গে প্রাণে!"

বস্তুতঃ একদিন মহাদেশের মত এই সুবিশাল জায়গা ব্যাপিয়া গণমানসে ও কর্মে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভিষেক হইয়াছিল। এই সভ্যতার জারক-রসে অষ্ট্রোনেশিয়ান সংস্কৃতি যেন এক নূতন রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছিল ; তাহারই অপূর্ব ছটায় একদিন চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেদেশের নগরে-নগরে, বন্দর-অঞ্চলে, ক্রেতন বা রাজধানী-অঞ্চলে, মন্দিরে ও বিহারে আরম্ভ হইল এই সভ্যতার বিজয়যাত্রা। এই মিশ্র-সভ্যতা বর্মা, মালয় উপদ্বীপ, শ্যামদেশ (থাইল্যাণ্ড), ইন্দোচীন ও দ্বীপময় ভারতে বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে ; বস্তুতঃ এই সুবিশাল অঞ্চলে এমন কোন বিশিষ্ট স্থল নাই যেখানে ভারতীয় সভ্যতার চিহ্ন সম্পূর্ণ-রূপে অবলুপ্ত। যখন এই সভ্যতা নগর হইতে গ্রামাঞ্চলে অনুপ্রবেশ করিতে লাগিল তখন স্বভাবতঃই ইহার প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইতে লাগিল। সেখানে স্বদেশী রীতিনীতি ও সংস্কৃতির প্রবল প্রতাপে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া রহিল, কিন্তু ইহার বাহিরে এবং জীবনের উচ্চস্তরে এই সভ্যতার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িতে লাগিল। ভারতীয় সভ্যতা তাই তথাকার নাগর-সভ্যতার নাগপাশে প্রধানতঃ জড়াইয়া পড়িল। ইহারই রূপায়ন হইয়াছে আর্টে, সাহিত্যে, জীবনাচরণে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টিতে যে-সত্য ধরা পড়িয়াছিল, তাহারই আংশিক পরিচয় বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সাহিত্য ব্যতীত জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারতীয় সভ্যতা যে রূপ, রস ও গন্ধ বিকীরণ করিয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি অন্যত্র পরিবেশন করিয়াছি।

মহাদেশের মত বিশাল এই অঞ্চল একদা ভারতীয় অভিযাত্রিগণের চরণধ্বনিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল ; তাহাদের পদার্পণেই যেন এখানকার ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা খুলিয়া গেল ; সে কাহিনী খৃষ্টাব্দের প্রথম পর্ব হইতেই। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে ইহা বিপুল গতিবেগ

সঞ্চয় করিল ; ইন্দোচীনে ইহার প্রাণচাঞ্চল্য চতুর্থ-পঞ্চম খৃষ্টাব্দ হইতেই অনুভব করি। দ্বীপময় ভারতে ইহার প্রভাব পরিব্যাপ্ত হইয়াছে অন্ততঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ঘটিল ইসলামের আবির্ভাব, কিন্তু তথাপি সেই প্রাচীন হিন্দু যুগের স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে ওয়েয়াঙ্-নাট্যে, আর্টে, লোক-সাহিত্যে এবং সামাজিক উৎসবে ; তবে ইসলামের আবির্ভাবে হিন্দু-ভারতের সঙ্গে দ্বীপময় ভারতের যোগসূত্র ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিল। রবীন্দ্রনাথ ইহার কথা জাভা যাত্রীর পত্রে (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৬৩০-১) সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন :

"মূলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, ভারতবর্ষ চলে গেল দূরে—হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা হল নিষিদ্ধ, হিন্দু আপন গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে কষে বাঁধলে, ঘরের বাইরে তার যে এক প্রশস্ত আঙিনা ছিল এ কথা সে ভুললে। কিন্তু সমুদ্র-পারের আত্মীয় বাড়ীতে তার অনেক বাণী, অনেক মূর্তি, অনেক চিহ্ন, অনেক উপকরণ পড়ে আছে বলে সেই আত্মীয় তাকে সম্পূর্ণ ভুলতে পারলে না। পথে-ঘাটে পদে পদে মিলনের নানা অভিজ্ঞান চোখে পড়ে। কিন্তু সেগুলির সংস্কার হতে পায়নি বলে কালের হাতে সেই-সব অভিজ্ঞান কিছু গেছে ক্ষয়ে, কিছু গেছে চুরে, কিছু গেছে লুপ্ত হয়ে।"

রবীন্দ্রনাথ কবির অন্তর্দৃষ্টি দিয়া যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। সেই যুগে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার ভ্রমণ-সঙ্গী ভাষাচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা আমার মনের গহনে গভীর আলোড়ন তুলিয়াছিল, কিন্তু তখনো ইংরেজী ভাষায় এই বিষয়ে গভীর অনুশীলন হয় নাই। সুতরাং আমার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্নেহে ও তত্ত্বাবধানে আমার বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে পঠন-পাঠনে দীক্ষা হইল। ডঃ মজুমদার স্বয়ং এই বিষয়ে গভীর গবেষণা করিয়াছেন এবং বিশ্বের পণ্ডিত সমাজ তাঁহার অভিমত শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করিয়া থাকেন। তিনি চম্পা এবং সুবর্ণ দ্বীপের অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দর কাহিনীকে ইতিহাসের নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া ভারত ইতিহাসের এক নূতন দিগন্ত খুলিয়া দিয়াছেন।

বৃহত্তর ভারতের মধ্যমণি হইল দ্বীপময় ভারত, কিন্তু এই অঞ্চল সংক্রান্ত সমস্ত গবেষণা-মূলক রচনা ডচ ভাষায় লিখিত ; মূল গ্রন্থাদি ও অনুশাসনলিপি প্রাচীন যবদ্বীপীয় বা প্রাচীন মালয় ভাষায় লেখা। ভাষার বাধা অতিক্রম করিলে সহসা যেন আমার পূর্ব দিগন্তে অনেকগুলি বাতায়ন উন্মুক্ত হইয়া গেল। সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের পরপারে ও ক্রোড়ে লালিত, লবঙ্গলতার সুগন্ধি বিজড়িত, কবি কালিদাস বন্দিত দ্বীপান্তরের মর্মরধ্বনি ও হাতছানি যেন বারংবার আমন্ত্রণ জানাইল। ইহারই প্রথম পরিচয় হইল আমার লেখা Indian Influences on the Literature of Java and Bali। গ্রন্থখানি বৃহত্তর ভারত পরিষদ (Greater India Society) কর্তৃক ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই বিষয়ে গভীরতর মৌলিক গবেষণার পথ যেন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতেছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কয়টি দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা

স্বাধীনোত্তর যুগে নির্মমভাবে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে, অথচ একদিন এই অঞ্চলের সঙ্গেই না আমাদের প্রাণের নিবিড়তম রাখিবন্ধন হইয়াছিল।

যাহাই হউক, দক্ষিণ-পুর্ব এসিয়ার প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাহিনী আমাদের দেশের শিক্ষা জগতের নেপথ্যে পড়িয়া গেলেও, ইউরোপ-আমেরিকা-অষ্ট্রেলিয়া এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সম্বন্ধে গভীরতর চর্চার সূত্রপাত করিয়াছে। আমার গ্রন্থখানিও এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হইয়া থাকে। প্রায় পাঁচ বৎসর পুর্বে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন যবদ্বীপীয় ও মালয় ভাষার অধ্যাপক ডঃ হুইকাশ আমাকে উপরোক্ত ইংরেজী গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই অনুরোধের পটভূমিকায় এবং আঞ্চলিক ভাষাসমূহের প্রতি গভর্ণমেণ্টের সাম্প্রতিক উৎসাহের কথা স্মরণ করিয়া এই গ্রন্থখানি বাঙলা ভাষায় লিখিয়াছিলাম ; আশা ছিল শীঘ্রই ইংরেজী গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণটির রচনায়ও হাত দিতে পারিব, কিন্তু অন্য বিষয়ে পুস্তক রচনায় ব্যাপৃত থাকায় এই গ্রন্থ রচনায় এখনো হাত দিতে পারি নাই। তবে এই প্রসঙ্গে ইহার স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বর্তমান গ্রন্থটি উপরোক্ত ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ নহে ; ইহা শুধু আকারেই বৃহত্তর নহে, তথ্যাদিতেও সমৃদ্ধতর। এই গ্রন্থে আমার প্রায় ৩৫ বৎসরের গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দ্বীপময় ভারতের সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সুদীর্ঘকালে যে গবেষণা বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় হইয়াছে তাহার আধুনিকতম পরিচয় এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে ; সুতরাং এক হিসাবে ইহা নূতন গ্রন্থ। কোন ইউরোপীয় ভাষায় দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে এইরূপ সুবৃহৎ গ্রন্থ বিদ্যমান না থাকায় আশা করি ইহা বাঙালী পাঠক সমাজে অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক করিবে।

বর্তমান গ্রন্থখানি প্রায় চারি বৎসর পুর্বে রচিত হইয়াছিল। নাটক-উপন্যাস-নোট বই প্লাবিত বাঙলা দেশে কোন প্রকাশক এইরূপ গবেষণামুলক সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিবার হটকারিতা প্রদর্শন করেন নাই। এই স্তিমিত উৎসাহে শঙ্কিত হইয়া এই গ্রন্থখানির প্রথম পরিচ্ছেদটি কক্ষচ্যুত করিয়া "হিন্দু যুগে দ্বীপময় ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা" নামে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়াছি ; উদ্দেশ্য হইল বর্তমান গ্রন্থের পরিসর হ্রাস করা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাহিত্য সৃষ্টি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে : উহার জন্য চাই অনুকুল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ। সুতরাং যাঁহারা বর্তমান গ্রন্থ পাঠ করিবেন তাঁহারা পুর্বে উপরোক্ত পুস্তক হইতে সেই পরিবেশের কাহিনীটি পাঠ করিয়া লইলে অধিকতর লাভবান হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

এই গ্রন্থের মধ্যে মূল যবদ্বীপীয় পুঁথির বানান যথাসম্ভব রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি ; সুতরাং সংস্কৃত শব্দের বিকৃত বানান চোখে পড়িলে উহা যবদ্বীপীয় তক্‌মা-পড়া মনে করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণ উহাকে ঔদার্যের সঙ্গেই গ্রহণ করিবেন আশা করি। এইবার ধন্যবাদ দিবার পালা। আমার মূল পাণ্ডুলিপির অনুলেখনে অনেকেই বিভিন্ন সময়ে অংশগ্রহণ করিয়া আমার অন্যান্য গ্রন্থ রচনা অব্যাহত রাখার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে আছেন আমার

ভাগিনেয়ী শ্রীমতী অঞ্জলি নন্দী এম-এ, আমার প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান সহকর্মী অধ্যাপক সমীরেশ দাশগুপ্ত, কল্যাণীয়া শ্রীমতী অপর্ণা চক্রবর্তী এম-এ, শ্রীমতী মীরা সাহা বি-এ, ভাগিনেয়ী শ্রীমতী হাসি গুহ বি-এ এবং শ্রীমতী প্রকৃতি ভট্টাচার্য এম-এ। ইহাদিগকে জানাই অকৃপণ আশীর্বাদ। বাড়ীতে যাঁহারা অনুলেখনে অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আছেন আমার গৃহিণী শ্রীমতী কমলরাণী, কন্যা রেবা ও পুত্র সবিতাংশু এবং অরুণাংশু। বন্ধুবর শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনায় ও অঙ্গসজ্জায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহের নিকট আমি অনেকখানি ঋণী। জার্নাল প্রেসের সত্ত্বাধিকারী ও কর্মিবৃন্দও অল্প সময়ের মধ্যে যত্নসহকারে এই গ্রন্থ মুদ্রন করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে কুণ্ঠাহীন ধন্যবাদ জানাই।

যাঁহারা আমার বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে পড়াশুনায় ও গবেষণায় প্রেরণা জোগাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আছেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি আমাকে তাঁহার সান্নিধ্যের গৌরব এবং স্নেহ ও বৈদগ্ধ্যের পরিমণ্ডলে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং বিশ্বজনীন মন সম্বন্ধে প্রশস্তি গাহিয়াছেন এবং তাঁহাকে উপাধি দিয়াছেন : লিপি-বাচস্পতি কিংবা লিপি সার্বভৌম বা লিপি চক্রবর্তী। এই অসামান্য পণ্ডিতবরের নামের সঙ্গে এই সামান্য গ্রন্থখানি সংযুক্ত করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। তাঁহাকে আমার প্রণাম জানাই।

হিমাংশু ভূষণ সরকার

লিপিবাচস্পতি

জাতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলেষু

সূচীপত্র

গ্রন্থ-নামের সংক্ষিপ্তায়ন

Ann. Rep.—Annual Report.

B. C. A. I—Bulletin de la Commission Archeologique de l'Indo-Chine.

BEFEO—Bulletin de l'École francaise d'Extrême-Orient.

BKI—Bijdragen tot de Taal-Land en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie.

Cat. van de Jav. Mad. Hss.—Vreede, Catalogus van de Javaansche en Madoereesche Handschriften der Leidsche Universiteits Bibliotheek, 1892.

Ep. Ind.—Epigraphia Indica.

Geschiedenis—Krom, Hindoe-Javaansche Geschiedenis, 1931.

IHQ—Indian Historical Quarterly, Calcutta.

Ind. Ant.—Indian Antiquary.

Inleiding—Krom, Inleiding tot de Hindoe-Javaansche Kunst, 2nd edition, vols. I-III, 1923.

I. S. C. C.—Bargaigne, Inscriptions Sanscrites de Campā et du Cambodge, published as 'Notices et extraits des Manuscrits de la Bibliothéque Nationale, etc. Tome vingt-septieme (lre partie), 1st and 2nd fascicule.

J. A. Journal Asiatique.

J. A. O. S.—Journal of the American Oriental Society.

JASB—Journal of the Asiatic Society of Bengal.

JBBRAS—Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.

JMBRAS—Journal of the Malay Branch of the Royal Asiatic Society.

J. P. T. S—Journal of the Pali Text Society.

KBNWdb—Van der Tuuk, Kawi-Balineesch-Nederlandsch Woordenboek, vols. I-IV.

NBG—Notulen van de algemeene en bestuursvergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

N. S.—New Series.

OJO—Oudjavaansche Oorkonden. Nagelaten transcripties van wijlen Dr. J. L. A. Brandes, Ed. N. J. Krom.

O. L. Z.—Orientalistische Literaturzeitung.

Supplement—Juynboll, Supplement op den Catalogus van de Javaansche en Madoereesche Handschriften der Leidsche Universiteits Bibliotheek, vols. I-II (1907 and 1911).

Suppl. Cat. Sund. Bal. Sas. Hss.—Juynboll, Supplement op den Catalogus van de Sundaneesche Handschriften en Catalogus van de Balineesche en Sasaksche Handschriften der Leidsche Universiteits Bibliotheek, 1912.

TBG—Tijdschrift voor Indische Taal, Land en Volkendunde.

VBG—Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

প্রথম অধ্যায়

দ্বীপময় ভারতের ভাষা

ভাষাতাত্ত্বিক অর্থে দ্বীপময় ভারত বা ইন্দোনেশিয়ার বিস্তৃতি বিশাল: পশ্চিমে মাদাগাস্কার হইতে হাল্‌মাহারা এবং উত্তরে ফরমোজা হইতে দক্ষিণে ফ্লোরিস-সুম্ব দ্বীপপুঞ্জ এই দ্বীপময় ভারতের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। দ্বীপময় ভারতের উপরোক্ত সংজ্ঞার কোন রাজনৈতিক অস্তিত্ব নাই, কিন্তু ইহার ভাষাতাত্ত্বিক অস্তিত্ব আছে। যে ইন্দোনেশীয় ভাষাগোষ্ঠি এই অঞ্চলকে একদা প্রেমের নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে, রাজনীতির কূট নাগপাশ তাহাকে কোন যুগেই একত্র সুসংবদ্ধ করিতে পারে নাই। এই বিস্তৃত অঞ্চল একদা ভারতীয় অভিযাত্রীগণের চরণ-ধ্বনিতে মুখর হইয়াছিল। তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর এই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া রহিয়া গিয়াছে। কোথাও এই স্বাক্ষর সুস্পষ্ট, কোথাও বা ইহার চিহ্ন ক্ষীণ, কিন্তু দ্বীপময় ভারতের এমন কোন বিশিষ্ট অঞ্চল নাই যেখানে প্রাচীন ভারতীয় প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার ইতিহাসে এই দ্বীপময় ভারতের মধ্যমণি হইল জাভা-বলি-সুমাত্রা। জাভা এবং বলিদ্বীপে সুন্দর প্রাচীন সাহিত্য বিদ্যমান। সুমাত্রার নিজস্ব উল্লেখ-যোগ্য প্রাচীন সাহিত্য বিদ্যমান নাই, কিন্তু একদা যে ছিল তাহার স্বাক্ষর রহিয়াছে বিদেশী পর্যটকগণের ভ্রমণ কাহিনীতে তাম্রশাসন-শিলালেখে। শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের অংশীদার হিসাবে পূর্ব-দক্ষিণ সুমাত্রা বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চার অন্যতম পীঠস্থান ছিল ; ১০১৭ খৃষ্টাব্দে এই স্থল হইতে বহু সংস্কৃত পুস্তক চীনদেশে প্রেরিত হইয়াছিল এবং চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত সুমাত্রার রাজদরবারে সংস্কৃত ভাষার অতুলনীয় সমাদর ছিল। এই সংস্কৃত ভাষার প্রবল প্রভাবের জারকরসে জাভা-বলি ও সুমাত্রার ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ লাভ ঘটিয়াছিল।

দ্বীপময় ভারতের ভাষাগুলি অষ্ট্রিক বা অষ্ট্রোনেশীয় ভাষাগোষ্ঠীর একটি শাখামাত্র। অষ্ট্রোনেশীয় ভাষাগোষ্ঠী ভারতীয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রায় সর্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলস্থ মাদাগাস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া চিলির পশ্চিম-দিকস্থ ইস্টার দ্বীপ পর্য্যন্ত প্রসারিত ; উত্তরে ইহা ফরমোজা হইতে আরম্ভ করিয়া নিউজিল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার মধ্যে মালাক্কা উপদ্বীপের কিয়দংশ এবং সম্ভবতঃ এশিয়ার আরো কোন কোন অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এই বিরাট ভৌগোলিক পটভূমিকা হইতে বাদ পড়িবে

অষ্ট্রেলিয়া, তাসমানিয়া, নিউ গিনি (তীরভাগ ব্যতীত), প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং দ্বীপময় ভারতের পুর্বাঞ্চল যেখানে পাপুয়ান ভাষা প্রচলিত[১]।

এই অষ্ট্রোনেশীয় ভাষাগোষ্ঠীকে পলিনেশীয়, মাইক্রোনেশীয়, মেলানেশীয় এবং ইন্দোনেশীয় শাখায় বিভক্ত করা হইয়াছে। এই বিভাগ ভৌগলিক দিক হইতে সুবিধাজনক হইলেও ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া ততটা গ্রহণীয় নহে, কারণ কোন কোন অঞ্চলে অষ্ট্রোনেশীয় ভাষার সহিত অনষ্ট্রোনেশীয় ভাষার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই সতর্কবাণী স্মরণে রাখিয়া আমরা অষ্ট্রো-নেশীয় ভাষাগোষ্ঠীর উপরোক্ত বিভাগ গ্রহণ করিতে পারি। আলোচ্য গ্রন্থে আমরা পলিনেশীয়, মাইক্রোনেশীয় এবং মেলানেশীয় শাখার ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিব না। আমাদের দৃষ্টি প্রধানতঃ ইন্দোনেশীয় ভাষা এবং উহার সংশ্লিষ্ট উপভাষাগুলির দিকে নিবদ্ধ থাকিবে।

ইন্দোনেশীয় ভাষার ভৌগলিক বিস্তারও প্রায় মহাদেশের মতই বিশাল। ইহার ভাষা-সংখ্যাও প্রায় ২৫০। ডঃ গণ্ডা দ্বীপময় ভারতের এই ভাষাগুলিকে ১৬টি শ্রেণীতে বিন্যাস করিয়াছেন, যথা—(১) ফিলিপাইন ভাষাগোষ্ঠী, (২) সুমাত্রা ভাষাগোষ্ঠী, (৩) জাভা ভাষাগোষ্ঠী, (৪) বোর্ণিও ভাষাগোষ্ঠী, (৫) বলিদ্বীপীয় এবং সংশ্লিষ্ট ভাষাগোষ্ঠী, (৬) গেরোন্তলো ভাষাগোষ্ঠী, (৭) তোমিনি ভাষাগোষ্ঠী, (৮) তোরজ ভাষাগোষ্ঠী, (৯) লয়নাঙ্গ ভাষাগোষ্ঠী এবং বঙ্গাই ভাষারীতি, (১০) বুঙ্গুলকি ভাষাগোষ্ঠী, (১১) দক্ষিণ সিলিবিসের ভাষাগোষ্ঠী, (১২) মুন-বুতন (বুতুঙ্গ) ভাষাগোষ্ঠী, (১৩) বিম-সুম্ব ভাষাগোষ্ঠী, (১৪) অম্বোন-টিমোর ভাষাগোষ্ঠী, (১৫) সুল ভাষাগোষ্ঠী, (১৬) দক্ষিণ হালমাহারা ভাষারীতি এবং সংশ্লিষ্ট ভাষাসমূহ[২]।

দ্বীপময় ভারতের ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনার পথে প্রতিবন্ধক আছে। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শত শত ভাষা প্রচলিত আছে ; কিন্তু এই বিষয়ে পথিকৃৎ সংখ্যা একান্তই সীমাবদ্ধ। শুধু তাহাই নহে ; এই অঞ্চলের ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে গবেষণা এবং যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মূল্যও সর্বক্ষেত্রে একপ্রকার নহে। কোন কোন ভাষা সম্বন্ধে উন্নত পর্যায়ে গবেষণা হইয়াছে ; কোন কোন ভাষার আবার লিখিত পুস্তকই নাই ; কোথাও আবার এক একটি ভাষা অবলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। অষ্ট্রোনেশীয় ভাষাতত্ত্বের মুখবন্ধে আমাদিগকে এই কথা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। এই অঞ্চলের ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহারা আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অনেক খৃষ্টান মিশনারী ছিলেন বা আছেন ; অন্যান্য পণ্ডিতও এই বিষয়ে তাহাদের প্রতিভা নিয়োজিত করিয়াছেন। খৃষ্টান ধর্মের প্রচার এবং পাশ্চাত্য শাসকবর্গের প্রশাসনিক সুবিধার জন্যই মুখ্যতঃ এই সমস্ত ইন্দোনেশীয় ভাষার দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার ফলে দ্বীপময় ভারতের ভাষাতত্ত্ব এবং সাহিত্য আলোচনার একটি বৈজ্ঞানিক ভূমিকা রচিত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্বের এই সমস্ত দিকপালগণের মধ্যে কার্ন, ভান দের তুক, স্নুক হুরগ্রোঞ্জ, আড্রিয়ানি, ফেরাণ্ড, রঙ্কেল, গণ্ডা প্রভৃতির নাম আমরা চিরকাল শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিব। দুঃখের বিষয় ইহাদের গবেষণার লব্ধফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডচ্, জার্মান, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষায় লিপিবদ্ধ হওয়ায় ইহাদের রচনা বিশেষজ্ঞ-মহল ব্যতীত অন্যত্র বিশেষ পরিচিত নহে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে দ্বীপময় ভারতে প্রায় ২৫০ ভাষা এবং উপভাষা প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে কোন কোনটির সাহিত্যসম্পদও নিতান্ত নগণ্য নহে। এই বিপুলায়তন ভাষাগোষ্ঠীর সামগ্রিক বিবরণ দেওয়া বর্তমান গ্রন্থে সম্ভবপর নহে এবং প্রাসঙ্গিকও নহে ; সুতরাং আমরা আলোচ্য অধ্যায়ে সুমাত্রা-জাভা-বলিদ্বীপের দিকে মুখ্যতঃ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব।

সুমাত্রায় ১৪।১৫টি বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে, ইহার মধ্যে আচেনীজ ভাষা প্রধান[৩]। এই ভাষা সম্বন্ধে স্নুক হুরগোঞ্জ, জয়দিনিঙ্গরাৎ প্রমুখ পণ্ডিতগণ গভীর গবেষণা করিয়াছেন। জয়দিনিঙ্গরাতের অভিধান[৪] এবং হুরগোঞ্জের ব্যাকরণ সংক্রান্ত রচনা[৫] এই ভাষার মূল্যবান ভূমিকা রচনা করিয়াছে। আচেনীজ ভাষার একটি বিশেষত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ভাষার ধাতুরূপ আছে, কিন্তু ইহা সংশ্লিষ্ট অপরাপর ভাষায় নাই। নীম্যান সাহেব একদা আচেনীজ এবং চাম ভাষার সম্বন্ধ-বিচার করিয়াছিলেন[৬] ; শ্রীযুক্ত কৌয়ান আবার আচেনীজ এবং চাম-ছন্দের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছিলেন[৭]। হুরগ্রোঞ্জ আচেনীজ সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাঁহার আচেনীজ ভাষা সংক্রান্ত বিখ্যাত পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন[৮]। ইহাতে গদ্যে রচিত কাহিনীর আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে 'হব' এবং ছন্দে বিরচিত রচনার নাম দেওয়া হইয়াছে 'হিকায়ৎ'।

স্নুক হুরগ্রোঞ্জ এবং পণ্ডিতবর হাজোর কৃতিত্বের জন্য সুমাত্রার আর একটি ভাষার বৈজ্ঞানিক আলোচনার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। এই ভাষার নাম গয়ো[৯]। দুঃখের বিষয় গয়ো ভাষার কোন সাহিত্য নাই। সুমাত্রার আর একটি প্রধান ভাষার নাম বটক, কিন্তু ইহার বিভিন্ন উপভাষার মধ্যে পার্থক্য এত বেশী যে কোন কোন উপভাষাকে কার্যতঃ স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা দিতে হয়। এই সমস্ত উপভাষার মধ্যে তোব-বটক এবং করো-বটক উপভাষাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য[১০]। ডঃ ভান দের তুক বটকভাষার ব্যাকরণ এবং অভিধান প্রকাশ করিয়া এই ভাষা সম্বন্ধে গবেষণার পথ প্রশস্ত করিয়াছেন[১১]। ইদানীং জুষ্ট্রো এবং নিউম্যান নূতন করো-বটক অভিধান প্রকাশ করিয়া এই ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পথ আরো সুগম করিয়া দিয়াছেন[১২]। নিউম্যানের করো বটক ব্যাকরণটিও মূল্যবান গ্রন্থ হিসাবে পরিগৃহীত হইয়াছে[১৩]। তোব-বটক সম্বন্ধে ভার্নেক রচিত অভিধানটি এখন দুর্লভ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই ভাষা সম্বন্ধে ভান দের তুক বিগত শতাব্দীতে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়াছিলেন এখনো তাহার যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে[১৪]। সাধারণভাবে আমরা বলিতে পারি যে ভান দের তুকের তোব-ব্যাকরণই ইন্দোনেশীয় ভাষার প্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। ইহাতে ভাষার বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াই ব্যাকরণসূত্র প্রণীত হইয়াছে এবং ইহাতে যথাসম্ভব আধুনিক ব্যাকরণের সংজ্ঞাগুলি রক্ষা করা হইয়াছে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে গয়ো ভাষার কোন সাহিত্য বিদ্যমান নাই, কিন্তু বটক-ভাষা এদিক দিয়া অপেক্ষাকৃত সম্পদশালিনী। তবে এই সাহিত্য মুখ্যতঃ উপকথামূলক এবং যাদুমন্ত্র-সাহিত্য[১৫]। ইদানীং সমস্ত বটক উপভাষাগুলিকে একই সাহিত্যিক চন্দ্রাতপতলে আনিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু এই চেষ্টা আজিও সার্থক হয় নাই।

আমরা সুমাত্রার দক্ষিণাঞ্চলে অপর এক ভাষাগোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাইতেছি; ইহাকে আমরা স্বচ্ছন্দে বৃহত্তর মালয় ভাষার পরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি। মিনঙ্কবাউয়ের ভাষার সহিত এই মালয় ভাষার কিঞ্চিৎ যোগাযোগ আছে মনে হয়, কিন্তু এই উভয় ভাষার সীমারেখা কোথায় তাহা আজিও পরিস্কাররূপে নির্ধারিত হয় নাই। মিনঙ্কবাউ ভাষারও কতকগুলি উপভাষা আছে, কিন্তু ইদানীং বানান-সংস্কার হওয়ার জন্য উহাদের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান ছিল তাহা ক্রমশঃ অবলুপ্ত হইতেছে। দুঃখের বিষয় কোন গ্রন্থে মিনঙ্কবাউ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয় নাই। এই সাহিত্যে গদ্য এবং পদ্য উভয়বিধ রচনাই আছে। পদ্য-রচনার নাম 'কব'; সম্ভবতঃ ইহা সংস্কৃত কাব্য-শব্দের বিকৃতি। মিনঙ্কবাউ কাব্যের মধ্যে 'কব চিন্দু মতো' সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এই কাব্য-গ্রন্থখানির আংশিক ডচ্-অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে[১৬]।

সুমাত্রার বেঙ্কুলেন এবং পালেম্বঙ্গ মালভূমি অঞ্চলের যে-ভাষাকে ব্র্যাণ্ডেস মধ্য-মালয় বলিয়াছেন তাহার দুইটি উপভাষা সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত গভীরতর আলোচনা হইয়াছে। এই দুইটি উপভাষার নাম বেসেম এবং সেরবৈ। পালেম্বাঙ্গের রাজদরবারে পূর্বে যবদ্বীপীয় ভাষার আধিপত্য ছিল; এখানকার সুলতানদের ফর্মান পূর্বে এই ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হইত। বস্তুতঃ দক্ষিণ সুমাত্রার প্রায় সর্বত্রই এই তথাকথিত মধ্য-মালয়ের আধিপত্য[১৭]। পালেম্বাঙ্গের নিকট বঙ্ক-দ্বীপে এবং মেরঙ্গিন নদীর উজানে সপ্তম শতাব্দীর শেষপাদে রচিত কতকগুলি অনুশাসনলিপি আবিস্কৃত হইয়াছে। ইহার ভাষা প্রাচীন মালয় ভাষার সমগোত্রীয়, কিন্তু ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য-গুলি মালয়ভাষার সহিত সর্বদা সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। ইহা সম্ভবতঃ মালয় ভাষার আদিমরূপ এবং আমরা ইহাকে প্রাচীন মালয় নামে অভিহিত করিতে পারি। কার্ন, ব্র্যাগডেন, ক্রোম, ভান রন্কেল, কোয়েদেস্, ফেরাণ্ড, আইসেলে, ডি. ক্যাসপ্যারিস প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ এই অনুশাসনলিপি-গুলির ভাষা বিভিন্নসময়ে আলোচনা করিয়াছেন।

পূর্বোল্লিখিত মালয়-মিনঙ্কবাউ ভাষা-অঞ্চল ছাড়িয়া আমরা অতঃপর রেজঙ্গ এবং লাম্পুঙ্গ ভাষা-অঞ্চলে উপনীত হই। এই ভাষাগুলি বিশেষ উন্নত নহে। হেলফ্রিখ এবং ভান অপহুইসেন লাম্পুঙ্গ-ভাষার রূপকথা-সাহিত্য আংশিকভাবে প্রকাশ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

সুমাত্রার পূর্বদিকে যে কয়েকটি দ্বীপ আছে তাহার মধ্যে বঙ্ক এবং বেলিতুঙ্গ (বিল্লিতন) দ্বীপ প্রধান। এই দ্বীপগুলিতে যে-ভাষা প্রচলিত তাহাতে সাধারণভাবে আমরা মালয় বলিতে পারি। এই মালয়কে ভাষাতত্ত্ববিদগণ রিয়াউ-মালয়ের সমগোত্রীয় মনে করিয়া থাকেন[১৮]। সুমাত্রার দক্ষিণের বেলাভূমি হইতে কিছু দূরে সমুদ্র ক্রোড়ে লালিত কয়েকটি দ্বীপ আছে; ইহাদের নাম যথাক্রমে সিমলুর, নিয়াস, বটু এবং মেণ্টবাই দ্বীপপুঞ্জ। সিমলুরে দুইটি ভাষা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু ইহার বিশেষ কোন সাহিত্য নাই। তবে ইহার কিছু রূপকথা, কিছু স্থানীয় কিম্বদন্তী এবং সঙ্গীত-সাহিত্য প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে একটি ডচ্-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল[১৯]। নিয়াস-দ্বীপের উত্তর এবং দক্ষিণাংশে দুইটি ভাষা বিদ্যমান। উত্তর-নিয়াসের

ভাষাতে কিছু কিছু গ্রন্থ, এমন কি একটি মহাকাব্য পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে[২০]। দক্ষিণ-নিয়াসের ভাষাতেও কিছু কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে[২১]। সুন্দেরমান নিয়াসভাষার অভিধান এবং ব্যাকরণ রচনা করিয়া এই ভাষার আলোচনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। এই ভাষাতে কিছু কিছু সংস্কৃত শব্দও আছে।

নিয়াসের পূর্বদিকে মেণ্টবাই দ্বীপপুঞ্জ। অষ্ট্রোনেশীয় ভাষাতত্ত্বের দিকপাল আড্রিয়ানি এই দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত ভাষার একটি ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে এই ভাষার সহিত দক্ষিণ নিয়াসের ভাষার কিছুটা সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু এঙ্গানো ভাষার সহিত ইহার কোন সহধর্মিতা নাই। মেণ্টবাই দ্বীপপুঞ্জের পূর্বদিকে এঙ্গানো-দ্বীপ অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কাহ্‌লের এঙ্গানো-সাহিত্যের কিছু নিদর্শন ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় জনবিরল এই দ্বীপের সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্রুত লোপ পাইতে চলিয়াছে[২২]।

সুমাত্রা পরিত্যাগ করিয়া আমরা এইবার যবদ্বীপে উপনীত হই। যবদ্বীপের ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে আছে সুন্দনীজ, যবদ্বীপীয় ভাষা এবং মাদুরীয় ভাষা। সুন্দনীজ ভাষা যবদ্বীপের পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত আছে। পূর্ণবর্মনের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত পশ্চিম যবদ্বীপের সাহিত্যের কোন পরিচয় পাই না। সম্ভবতঃ কদিরি-সিঙ্গসারি যুগে এই সাহিত্যের প্রথম কাকলীধ্বনি উচ্চারিত হইয়াছিল। এই সাহিত্যের পন্টুন-কাহিনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে[২৩], কিন্তু ইহার অন্যান্য শাখা সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণার অবকাশ রহিয়াছে।

পূর্বোল্লিখিত শত শত ভাষা এবং উপভাষার মধ্যে একমাত্র যবদ্বীপীয় ভাষারই একটি প্রাচীন সাহিত্য আছে। এই ভাষার নিদর্শন আমরা নবম শতাব্দী হইতেই পাইতেছি। প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষা ব্যতীত প্রাচীন মালয় এবং প্রাচীন বলিদ্বীপীয় ভাষার নিদর্শন আজও আমরা পড়িতে পাইতেছি। প্রাচীন মালয় অনুশাসনলিপিগুলির তারিখ ৭ম শতাব্দীর শেষে হইলেও, ইহার সাহিত্যের নিদর্শন মিলিতেছে যোড়শ শতাব্দীতে। বিখ্যাত মালয় "ঐতিহাসিক" গ্রন্থ সেজর মেলয়ু সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই রচিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আচেনীজ, বটক, মিনঙ্কবাউ প্রভৃতি ভাষারও সাহিত্য আছে, কিন্তু এই সাহিত্য আধুনিক কালের। সুতরাং এই সাহিত্য বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নহে।

ইন্দোনেশীয় ভাষার বিভিন্ন শাখায় যাহারা কথাবার্তা বলিয়া থাকেন তাহাদের সংখ্যা কয়েক কোটি হইতে কয়েক শত পর্যন্ত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এক একটি ভাষা অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে অথবা হওয়ার মুখে। এই সমস্ত ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে যবদ্বীপীয় ভাষায় কথা বলে প্রায় তিন কোটি লোক, সুন্দনীজ ভাষায় কথা বলে প্রায় এক কোটি লোক এবং মাদুরীজ ভাষায় কথা বলে প্রায় ৫০ লক্ষ। মালয় ভাষা দ্বীপময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে; ইহা আবার কোন কোন উপভাষার জননীও। তবুও এই ভাষায় যাহারা কথাবার্তা বলিয়া থাকেন তাহাদের সংখ্যা জাভানীজ ভাষাভাষীর সংখ্যা অপেক্ষা কম[২৪]। ডঃ পিগো বলিয়াছেন যে বর্তমান যবদ্বীপীয় ভাষা সম্ভবতঃ কদিড়ি-পজঙ্গ-মতরাম কথাশৈলী ইহাতে উদ্ভূত হইয়াছে[২৫]।

আধুনিক যবদ্বীপীয় ভাষার কয়েকটি সুনির্ধারিত শ্রেণীবিন্যাস আছে। যথা :—ক্রম, মধ্য, ঙ্গোকো, ক্রম ইঙ্গিল এবং বস কেড়তন।

ক্রম ভাষাটি ভদ্রতার ভাষা। অভিজাতগণ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলিবার সময় এই ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং উচ্চবংশীয় লোকেরা নিম্নস্তরের অথবা সমপর্যায়ের লোকদের সহিত আলাপ করিবার জন্য অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা ঙ্গোকো-ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাই সাধারণ লোকের ভাষা। সাধারণ লোকেও অভিজাতগণের সহিত আলাপ করিবার সময় সৌজন্যমূলক অভিজাত ক্রম-ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং উচ্চশ্রেণীর লোক এবং জনসাধারণকে বাধ্য হইয়াই ঙ্গোকো এবং ক্রম-ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। ঙ্গোকো এবং ক্রমভাষার অন্তবর্তীস্তরের একটি ভাষা আছে; উহার নাম মধ্য (=মধ্য)। অভিজাতগণ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলিবার সময় কোন কোন সময় পূর্ববর্ণিত ক্রম ভাষা, কোন কোন সময়ে ঐ মধ্য-ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। এহ মধ্য ভাষাটি ঙ্গোকো এবং ক্রম শব্দের সংমিশ্রণে গঠিত। যবদ্বীপের একজন সাধারণ অধিবাসীকে বাধ্য হইয়াই ঙ্গোকো, ক্রম এবং মধ্যভাষায় কথাবার্তা বলিতে না শিখিলে চলে না। ক্রম ইঙ্গিল ভাষায় প্রায় তিনশত শব্দ আছে এবং এই ভাষা দেবতা এবং অভিজাতগণকে সম্বোধন করিতে ব্যবহৃত হইত। বস কড়তন দরবারী ভাষা। যাহারা রাজদরবারে বাস করেন তাহারাই এই ভাষায় কথাবার্তা বলিয়া থাকেন। রাজবংশীয় লোকেরা দেশের এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি; সুতরাং তাহারা অন্য লোককে ঙ্গোকো-ভাষায় সম্বোধন করিয়া থাকেন। দরবারের মহিলারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলিতে ক্রম বা মধ্যভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন; তাঁহাদের যদি পুরুষদিগের সহিত কথাবার্তা বলিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তাঁহারা বস কেড়তন বা দরবারী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ক্রম এবং ঙ্গোকো ভাষার মধ্যে অনেক সংস্কৃত শব্দ রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই শব্দগুলি বেমালুম স্বদেশী হইয়া গিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে যবদ্বীপীয় ভাষায় রূপান্তরিত হইবার সময় হয়তো ইহাদের আদিম সংস্কৃত অর্থটি রক্ষিত হইয়াছে, কোথাও হয়তো ইহাদের অর্থের কিঞ্চিৎ বিকৃতি সাধিত হইয়াছে। এই শব্দগুলি কেনই বা রহিয়া গেল, কিরূপেই বা ইহারা প্রতিদ্বন্দ্বী স্বদেশী শব্দকে একেবারে বিতাড়িত বা কোণঠাসা করিল তাহা বৈজ্ঞানিক কৌতুহলের বিষয়। ডঃ গণ্ডা এইদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত পরিবেশন করিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত এখানে পরিবেশন করা হইল। প্রাচীন ইন্দোনেশীয় ভাষাগুলিতে অগ্নি বুঝাইবার জন্য 'অপুয়' শব্দটির ব্যবহার ছিল; বর্তমানে ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে 'অগ্নি' শব্দের বিকৃত রূপ 'গেনি'। এইরূপে 'সেগর' শব্দটি সংস্কৃত সাগর শব্দ হইতে মহা আড়ম্বরে ইন্দোনেশীয় ভাষায় অনুপ্রবেশ করিয়া স্বদেশী আউদ বা লোদ শব্দকে প্রায় বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে। এইরূপ আরো শব্দ আছে[২৬]। দরবারী ভাষা ও ক্রম ইঙ্গিলেও এইরূপ অনেক সংস্কৃত শব্দ অনুপ্রবেশ করিয়াছে। ক্রম-ইঙ্গিল ভাষায় মস্তক, গ্রিব, অস্ত, রেম, সলির, স্বর্গ, তুক প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত মস্তক, গ্রীব, হস্ত, রোম, শরীর,

স্বর্গ, দুঃখ ইত্যাদির ক্রম-ইঙ্গিল রূপায়ণ। এইরূপ সংস্কৃত শব্দ ক্রম ভাষাতেও পরিগৃহীত হইয়াছে, যেমন গ্রিয়, দশ, তোয়, পেকৃসি, বন, নম, মনঃ, বেস্মি (অগ্নিপ্রদান করা) প্রভৃতি। এই সমস্ত শব্দ সংস্কৃত গৃহ, দশ, তোয়, পক্ষী, বন, নাম, মনঃ, ভস্মী (যেমন ভস্মীভূত) হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। ঙ্গোকো ভাষাতেও সংস্কৃত শব্দ বিকৃতরূপে বিদ্যমান আছে, যেমন দিন, বর্ত, বর্ণ, সসি, গেনি। এই শব্দগুলি দিন, বার্তা, বর্ণ, শশী, অগ্নি প্রভৃতি শব্দের যবদ্বীপীয় বেশ। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে সংস্কৃত শব্দের অন্তে 'ই'কার যোগ করিয়া ক্রম-শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে ; উহা আবার অকারান্ত হইলেই ঙ্গোকো-শব্দে রূপায়িত হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সংস্কৃত 'বর্ণ' শব্দ হইতে সঞ্জাত 'মর্ণি' শব্দ হইল ক্রম এবং 'মর্ণ' হইল ঙ্গোকো[২৭]। এইরূপ আরো দৃষ্টান্ত আছে।

আজকাল অনেক লোক দ্বীপময় ভারতের প্রায় সর্বত্র সরকারী কাজকর্মে, স্কুলে, সাহিত্য রচনায় বেহস ইন্দোনেশিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন ; ইহার রূপ ও প্রকৃতি আধুনিক মালয়। শ্রীবিজয়, শৈলেন্দ্র ও মজপহিত সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির জন্য এবং পরবর্তী যুগের আন্তর্জাতিক ইসলামের প্রাধান্যের ফলে মালয়ভাষা ইন্দোনেশিয়ায় সর্বত্র বিশেষভাবে প্রসারলাভ করিয়াছিল। আন্তঃরাষ্ট্রভাষা হিসাবে তাই বেহস ইন্দোনেশিয়া সর্বত্র উচ্চ সমাদর লাভ করিয়াছে।

পা দ টী কা

১. Gonda ; *Sanskrit in Indonesia*, pp., 8-9.

২. দ্বীপময় ভারতের ভাষা-মানচিত্রের জন্য দ্রষ্টব্য : (ক) Esser, *Atlas Van Tropisch Nederland*, Batavia, 1938. (খ) Ensink in Winkler-Prins, *Algemeene Encyclopaedie*, Amsterdam, S. V. Indonesische talen. (গ) Gonda, *Sanskrit in Indonesia*, 1952 (ঘ) Voorhoeve, *Languages of Sumatra*, 1955. (ঙ) Loeb, *Sumatra*, p. 352.

৩. সুমাত্রার সম্বন্ধে যে-সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তক বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য : E. M. Loeb, *Sumatra*, Vienna, 1935, Bibliography, pp. 335-342.

৪. H. Djajadiningrat, *Atjehsch-Nederlandsch woordenb ek met Neder-Atjehsch Register by* G. W. J. Drewes, vols. I & II, 1934, Batavia , see also Kreemer, *Atjehsch-Handwoordenboek*, Leiden 1931.

৫. C. S. Hurgronje, *Atjehsch taalstudien* in *TBG* 42 (1900) pp. 144-262 (*VG* V pp. 285-372).

৬. *BKI* 40 (1891) pp. 27-44.

৭. Ibid 90 (1933) pp. 149-55.

৮. Hurgronje, *The Achenese*, translated by O' Sullivan, vols,, I & II, Leiden, 1906. দ্রষ্টব্য Voorhoeve, *Languages of Snmatra*, pp. 7-8.

৯, Hurgronje, *VG* V pp. 373-83 ; G. A. J. Hazeu, *Gajosch-Neder. Woordenboek* etc., Batavia, 1907.

১০. অন্যান্য উপভাষার মধ্যে অলস, ডৈরিবটক, কেলসন, সিমসিম, পেগগন, কাতা বোয়াঙ্গ, তোজ, অঙ্কোল, মন্দৈলিঙ্গ, সিমলুঙ্গন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১১. *Tobasche Spraak Kunst pts* I & II, Amsterdam, 1864 and 1867 ; *Bataksch-Neder. Woordenboek*, 1861.

১২. M. Joustra, *Karo-Bataksch Woordenboek*, Leiden, 1907 , J. H Neumann, *Karo-Bataks-Nederlandsch Woordenboek*, Djakarta, 1951.

১৩. Schets der Karo-Bataksche Spraakkunst in *VBG* 63.4 (1922).

১৪. *Tobasche Spraakkunst*, pt. I (1864), pt. II (1867), Amsterdam.

১৫ এই সাহিত্য সম্বন্ধে যে-সমস্ত গ্রন্থ প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য : Voorhoeve, *Languages of Sumatra*, p p. 59-73 , Gonda, *Lettekunde van de Indische Archipel*, Amsterdam-Brussels, 1947, pp. 45 ff.

১৬. *VBG* 45.2 (1886) pp. 204 ff.

১৭. এই সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য · Voorhoeve, *Languages of Sumatra*, pp. 18-20 and Literature cited therein.

১৮. এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : Voorhoeve, op. cit, p 23 , *TBG* 31 (1891) pp. 373-400 , *Ibid* 73 (1933) pp. 328-50.

১৯. *BKI* 71 (1916) pp. 584 638

২০. *BKI* 58 (1905) pp. 1-72 , *TBG* 48 (1906) pp. 341-407

২১. *TBG* 74 (1934) pp. 326-376, *Ibid* 84 (1950-1) pp. 33-100, Steinhart, *Niasse teksten, vertaald in van aanteekeningen voorzien*, 's-gravenhage, 1954.

২২. এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : Keuning, *Enggano de Geschiedenis van een Verdwenen cultuur*, Indonesie, 8 (1955) pp. 177-213.

২৩. Pleyte in *VBG*, 58 , *TBG*, 49, pp. 35-101, *Ibid* 57, p. 58 ff and 456 ff.

২৪. তুলনীয় Gonda, *Sanskrit in Indonesia*, p. 9.

২৫. Pigeaud, *Java in the fourteenth century*, vol. IV, p. 122.

২৬. Gonda, *op. cit*, p. 416.

২৭. Gonda, *op. cit*, p. 280.

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বীপময় ভারতের ভাষাতত্ত্ব এবং ইহাতে সংস্কৃতের স্থান

১

দ্বীপময় ভারতের ভাষাগোষ্ঠীকে ভারতবর্ষের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ সম্ভবতঃ শ্রদ্ধা এবং উদারতার সহিত পরিগ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই ভাষা তাহাদের কর্ণে যে সুধাবর্ষণও করে নাই সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কারণ ৭ম—৮ম শতাব্দীতে রচিত আযমঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামক গ্রন্থে আমরা পড়িতেছি:

"কর্ম্মরঙ্গাখ্যদ্বীপেষু নাড়িকের সমুদ্ভবে।
দ্বীপে বারুসকে চৈব নগ্ন বলি সমুদ্ভবে॥
যবদ্বীপ বা সত্ত্বেষু তদন্যদ্বীপ সমুদ্ভবা।
বাচা রকারবহুলাতু বাচা অস্ফুটাংগতা॥
অব্যক্তা নিষ্ঠুরা চৈব সক্রোধপ্রেতযোনীষু[১]।"

এই গ্রন্থের লেখকের মতে কর্মরঙ্গ দ্বীপ[২] (কামলঙ্কা=লঙ্ক-কিয়সু), নাড়িকের দ্বীপ (নারিকেল দ্বীপে), বারুসক দ্বীপ (বর্তমান ব্যারোস্), নগ্নদ্বীপ (নিকোবর), বলিদ্বীপ এবং যবদ্বীপের ভাষা রকালবহুল, অস্ফুট, অব্যক্ত এবং কর্কশ। বিংশ শতাব্দীতে আমাদের মধ্যে যাহারা অজ্ঞাত ব্যাকরণ, অসম্পূর্ণ অভিধান এবং অসম্পাদিত বহু গ্রন্থ লইয়া প্রাচীন দ্বীপময় ভারতের ভাষা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের লেখকের দুঃখে নিশ্চয়ই সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন, কারণ এই সমস্ত দ্বীপের প্রাচীন ভাষার রহস্য এখনো অনেকাংশে অনুদ্ঘাটিত রহিয়া গিয়াছে। এই ভাষার অস্পষ্টতা জনিত দোষ অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু ইহার মধ্যে কতটুকু আমাদের অজ্ঞতাজনিত এবং কতটুকু অস্ট্রোনেশীয় ভাষার রচনাশৈলীর জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে তাহা অনুসন্ধানযোগ্য। বর্তমানে যতটুকু বুঝিতে পারিতেছি তাহাতে এই দুইটি কারণই সমবেতভাবে এই দুর্বোধ্যতা সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী। তবে এই দুর্বোধ্যতার উপর অতিরিক্ত জোর দিবার প্রয়োজন নাই, কারণ যবদ্বীপের প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করিবার সময় কোথাও কোথাও দুর্বোধ্য অংশ সমুপস্থিত হইলেও ইহার সাধারণ ভাবার্থ বুঝিতে খুব কষ্ট হয় না।

পূর্বেই বলিয়াছি দ্বীপময় ভারতের আয়তন মহাদেশের মতই বিশাল। এই বিরাট অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে যে বিষয়টা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইল বিভিন্ন ভাষার মধ্যে বাক্যশৈলীর সামঞ্জস্য এবং পরস্পরের মধ্যে গভীর সহধর্মিতা। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন[৩] যে ফিলিপাইনের তাগালোক এবং সুমাত্রার গয়ো ভাষা, কিংবা সিলিবিসের বরীভাষা এবং প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও উহাদের ব্যাকরণ, ধ্বনিতত্ত্ব, morphology এবং বাক্যবিন্যাস পদ্ধতি প্রায় একই প্রকারের। এই সমস্ত লক্ষণই দ্বীপময় ভারতের বিভিন্ন ভাষাকে মূলতঃ একই রাখিবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে।

ইন্দোনেশীয় বিভিন্ন ভাষার মধ্যে স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃতে হ্রস্বস্বর এবং দীর্ঘস্বর আছে বটে, কিন্তু স্বরবর্ণগুলি আনুনাসিকস্বরে উচ্চারণ করিতে হইলে যে ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহা সংস্কৃতে বিদ্যমান নাই। ইন্দোনেশীয় ভাষায় স্বরবর্ণের সংখ্যা নিতান্তই সীমিত, কারণ ইহাতে দীর্ঘস্বরের বালাই নাই; তবে ইহা লক্ষ্যণীয় যে ইন্দোনেশীয় ভাষায় এমন একটি স্বরবর্ণ আছে যাহা সংস্কৃতে নাই। উহার উচ্চারণ অনেকটা 'অ্যা'-র মত। সংস্কৃতজ্ঞদের নিকট বাহ্যতঃ মনে হইবে যে ইন্দোনেশীয় ভাষাতে দীর্ঘস্বর না থাকার জন্য উক্ত ভাষায় বানানের রাজ্যে অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা হয় নাই। সংস্কৃতে অবশ্য দিন-দীন, সুত-সূত প্রভৃতি শব্দে হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর ভেদে অর্থের পার্থক্য সূচিত হয়, কিন্তু ইন্দোনেশীয় ভাষার দীর্ঘস্বর ব্যবহারে এইরূপ অর্থের কোন রূপান্তর হয় না। ডঃ গণ্ডা অবশ্য ইকু=উহা এবং ইকূ=লেজ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ শব্দের সংখ্যা দ্বীপময় ভারতে একান্তই বিরল বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন[৪]। যবদ্বীপীয় কাব্য-সাহিত্যে সংস্কৃত ছন্দের জন্যই হ্রস্বস্বর এবং দীর্ঘস্বরের পার্থক্য বজায় রাখিতে হইয়াছে। সে স্থলে প্রয়োজনবোধে হ্রস্বস্বরকে দীর্ঘস্বর বা দীর্ঘস্বরকে হ্রস্বস্বর হিসাবে উচ্চারণ করিলেই ছন্দের দাবী-দাওয়া মিটিয়াছে। কাব্যরচনায় এই অসুবিধাটুকু বিদ্যমান থাকিলেও গদ্য রচনাগুলিতে এই সম্বন্ধে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা রহিয়াছে। সংস্কৃত এবং অনেক ভারতীয় ভাষায় অন্যান্য স্বরবর্ণের মধ্যে 'ঐ' এবং 'ঔ' অক্ষরদ্বয় বিদ্যমান। ইন্দোনেশীয় ভাষাতে 'ঐ', 'ঔ' ব্যতীত 'উই' অক্ষরটিও পরিদৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থলে এই যুক্ত ধ্বনিকে (ও+ই) এক ধ্বনিতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে, অর্থাৎ ও+ই=এ। যবদ্বীপীয় বহু প্রাচীন অনুশাসনলিপিতে তাই আমরা পড়ি গবৈ=গবে, রকৈ=রকে ইত্যাদি।

ইন্দোনেশীয় ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহারও অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। ইহাতে খ, ছ প্রভৃতি মহাপ্রাণবর্ণ নাই, কিন্তু কোথাও কোথাও আবার মাদুরীজ ভাষার মত ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ প্রভৃতি মহাপ্রাণ বর্ণ আছে। মাদুরীজ ভাষায় আবার খ প্রভৃতির অনুরূপ বর্ণ নাই। ডঃ গণ্ডা ধ্বনির দিক দিয়া বিচার করিয়া যবদ্বীপের বর্ণমালাকে নিম্নলিখিত পরিকল্পনানুযায়ী সজ্জিত করিয়াছেন[৫]।

স্বরবর্ণ: অ, এ, ই, ও, উ, অ্যা

ব্যঞ্জনবর্ণ :	প	ব	ম		
	ত	দ	ন	ল	ব
	ট	ড়		স	হ
	চ	জ	ঞ	র	য
	ক	গ	ঙ		
	ক[৬]				

ডঃ গণ্ডা[৭] শব্দরূপের কথা আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে আদিম ইন্দোনেশীয় ভাষায় শতকরা ৯৬টি শব্দই ছিল দুই Syllable বিশিষ্ট। প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত অনুশাসনলিপি পাঠ করিলেও ডঃ গণ্ডার অভিমত সাধারণভাবে সমর্থিত হয়। আধুনিক যবদ্বীপীয় ভাষায়ও শতকরা প্রায় ৮৫টি শব্দই দুই syllable বিশিষ্ট। প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার শব্দগুলিতে স্বরের পর ব্যঞ্জন, ব্যঞ্জনের পর স্বরবর্ণ – এই রীতিই সাধারণতঃ অনুসৃত হইয়াছে। ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় সুলভ নহে। তারিখ সম্বলিত প্রাচীন যবদ্বীপীয় অনুশাসনলিপিগুলি পাঠ করিলে দেখা যাইবে এই বৈশিষ্ট্য অল্পসংখ্যক লিপিতেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে[৮]। তবে এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে যবদ্বীপীয় শব্দের যে স্থলে বর্ণের দ্বিত্ব-ভাব ঘটিয়াছে উহা সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী নহে। সংস্কৃত এবং সংস্কৃতজ ভাষায় শব্দের প্রারম্ভে আমরা অনেক সময় যুক্তাক্ষর দেখিতে পাই, যেমন, ক্ষ, ত্র, ধ্ব, স্ত্র, ইত্যাদি। যবদ্বীপীয় ভাষায় প্র, প্র, গ্র, ত্ল প্রভৃতি যুক্তাক্ষর কখনো কখনো প্রথমে দেখা গেলেও এই প্রকার যুক্তাক্ষর সাধারণতঃ শব্দের প্রথমে ব্যবহৃত হয় না; শব্দের মধ্যভাগে কয়েকটি জোড়া ব্যঞ্জনবর্ণ বা তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণ একত্র সন্নিবেশিত হওয়ার দৃষ্টান্তও একান্ত বিরল[৯]। তবে যবদ্বীপীয় ভাষার সহিত সংস্কৃতের আর একটি বিষয়ে সামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হয়, যেমন উভয় ভাষাতেই পর পর দুইটি বা তিনটি স্বরবর্ণ সংযোজনা করিয়া সাধারণতঃ কোন শব্দের সৃষ্টি হয় না। ইন্দোনেশীয় ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়াই সাধারণতঃ শব্দের আরম্ভ হয়। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে মালয় ভাষায় ইহার অনুপাত হইল ১০ : ১, সংস্কৃতে ৪·৫০ : ১[১০]। ইন্দোনেশীয় ভাষায় শব্দের অন্তিমে অনেক সময় ব্যঞ্জনবর্ণ দেখিতে পাওয়া গেলেও স্বরবর্ণের ব্যবহারও এই স্থলে নগণ্য নহে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে ইন্দোনেশীয় ভাষার শব্দাবলী সাধারণতঃ দুই syllable বিশিষ্ট, কিন্তু শব্দগুলিতে উপসর্গ (prefix), মাধ্যমিক উপসর্গ (infix) এবং প্রত্যয় (suffix) সংযোগের জন্য শব্দগুলি দীর্ঘতর হইয়া যায়; তখন উহার syllable সংখ্যা তিনটি বা চারটি অথবা উহা অপেক্ষাও অধিকতর হয়। শব্দের প্রারম্ভে ম, প, ক প্রভৃতি উপসর্গ দিয়া শব্দের মধ্যে ইন্, উম প্রভৃতি মাধ্যমিক উপসর্গের প্রয়োগ করিয়া এবং শব্দের অন্তিমে অন্, অকেন্ প্রভৃতি প্রত্যয় সংযোগ করিয়া এই প্রকার অতিকায় শব্দের সৃষ্টি হয়। যেমন—

(ক) উপসর্গ ও প্রত্যয় যোগে : ম + বিজিল + অকন্ = মমিজিলকন।

ইহাতে মূল ধাতু 'বিজিল'-এর সঙ্গে ম-উপসর্গ সংযুক্ত হইয়া মমিজিল হইয়াছে; অতঃপর

উহাতে অকন-প্রত্যয় যোগ করিয়া মমিজিলকন শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। বিজিল শব্দের অর্থ: পরিদৃশ্যমান হওয়া। 'ম' শব্দের পরবর্তী ধাতুর আদিতে 'ত' বা 'শ' থাকিলে উহা 'ন' তে রূপান্তরিত হয়, যেমন: ম+তবঙ্গ=মনবঙ্গ, ম+তঙ্গকের=মনঙ্কের, ম+শপথ=মনপথ প্রভৃতি।

(খ) মাধ্যমিক উপসর্গ:

(১) ৎ+উম্+ওন=তুমোন। এই স্থলে ৎ+ওন=তোন শব্দটি ধাতুরূপ; ইহার সঙ্গে মাধ্যমিক উপসর্গ উম যোগ হওয়ায় শব্দটি তুমোন-এ রূপান্তরিত হইয়াছে। 'তোন' শব্দের অর্থ 'দেখা'।

(২) ব+ইন্+এহ (বা ঐঃ)=বিনে: (বা বিনৈঃ)। এই স্থলে ধাতুরূপ বেহ্ (বা বৈঃ); ইহার সঙ্গে মাধ্যমিক উপসর্গ ইন্ সংযুক্ত হওয়ায় শব্দটি বিনেঃ-তে রূপান্তরিত হইয়াছে। 'ইন্'—মাধ্যমিক উপসর্গ যোগে ধাতুটি কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত হয়। এ স্থলে বিনে:—শব্দটির অর্থ: প্রদত্ত হইয়াছিল। যেমন 'সঙ্গ পাতুকন্ বিনৈঃ অর্ঘ লাবন বেড়িহন' অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় পাতুকনকে অর্ঘ্য এবং বস্ত্র প্রদত্ত হইয়াছিল।

যবদ্বীপীয় ভাষায় শব্দের প্রথমে 'প'-উপসর্গ এবং অন্তিমে 'অন্'-প্রত্যয় সংযোগ করিয়া অনেক সময় বিশেষ্য সৃষ্টি হইয়া থাকে, যেমন, পতপন্ (গ+সংস্কৃত-তপ+অন)=তপস্যা করিবার স্থান। এ স্থলে সংস্কৃত শব্দের সহিত ইন্দোনেশীয় উপসর্গ এবং প্রত্যয় সংযুক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দকে মূল করিয়া এই রূপে উহাকে দেশী শব্দের রূপায়ণে আমরা ইন্দোনেশীয় ভাষার প্রাণশক্তির পরিচয় পাইতেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে প-উপসর্গ যোগে একদিকে যেমন বিশেষ্য সৃষ্টি হইয়াছে তেমনি আবার আদেশবাঞ্জক ক্রিয়ারও সৃষ্টি হইয়াছে। ইন্দোনেশীয় ভাষায় কখনো কখনো যুগ্ম অক্ষরকে দ্বিত্ব করিয়া নূতন ধাতুরূপ তৈয়ার করা হইয়াছে, যেমন লকূলক্ = খোসা ছাড়ানো ইত্যাদি[১১]। কখনো কখনো আবার শব্দের অন্তে 'ই' যোগ করিয়া সকর্মক ক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে, যেমন মরঙ্গি=কিছুর উপর আলোক সম্পাত করা। তবে ইহা স্বীকার্য যে ইন্দোনেশীয় ক্রিয়ার পরিচয় এখনো এত অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে যে এখনো ইহাকে ব্যাকরণের নাগপাশে আবদ্ধ করিবার সময় হয় নাই। বিশেষণ সৃষ্টির ব্যাপারে অনেক সময় শব্দের পুর্বে 'ক' উপসর্গ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ইহার ব্যবহারে কোন বস্তুর বিশেষ অবস্থা প্রাপ্তি বুঝায়।

ইন্দোনেশীয় ভাষায় বিশেষ্যের লিঙ্গ নাই, বচন নাই, কারক নাই, বিভক্তি নাই: পরম ব্রহ্মের মত ইহার সনাতন রূপ। এই অসুবিধা কেবলমাত্র বিশেষ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। বস্তুতঃ যবদ্বীপীয় ভাষার কোন শব্দটি বিশেষ্য বা ক্রিয়া, কোনটি আবার বিশেষ্য বা বিশেষণ তাহা নির্দ্ধারণ করিবার সহজ উপায় নাই: শব্দের পর পর বিন্যাস অনুযায়ী এই সমস্ত শব্দের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে। বস্তুতঃ কোন শব্দই নিজস্ব সত্তায় ক্রিয়া বা বিশেষ্য নহে। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদিগকে অন্য শব্দের অবস্থান বা পারম্পর্য লক্ষ্য করিয়া শব্দের শ্রেণীবিন্যাস করিতে হইবে। পুর্বেই বলিয়াছি যে ইন্দোনেশীয় ভাষায় বিশেষ্যের লিঙ্গ, বচন বা বিভক্তি নাই। সুতরাং কখনো স্ত্রী পুরুষের প্রভেদ বুঝাইবার প্রয়োজন হইলে ইন্দোনেশীয় শব্দটির পুর্বে পুরুষ

বা স্ত্রীদ্যোতক শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। অবশ্য আধুনিক যুগের প্রভাবে পড়িয়া মালয়-ভাষা এবং বেহস ইন্দোনেশীয়াতে স্ত্রীলিঙ্গের সৃষ্টি হইতেছে। এই পরিবর্তন সাধিত হইতেছে সংস্কৃত শব্দান্তের 'আ' বা 'ঈ' পরিগ্রহণ করিয়া, যেমন মালয় পুতের (রাজকুমার, পুত্র) হইয়াছে পুতেরি (রাজকন্যা), কপুত্রিয়ন (মহিলাসমিতি), পেমুদ (যুবক) হইয়াছে পেমুদি (যুবতী) ইত্যাদি[১২]। লিঙ্গ সম্বন্ধে যে ব্যাকরণগত অসুবিধা বিদ্যমান, বচন সম্বন্ধেও তাহাই। যদি কখনো বহুবচন বুঝাইবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে শব্দের পূর্বে দুই, তিন বা বহু শব্দের প্রতি-শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে যবদ্বীপীয় ভাষায় কয়ু (= বৃক্ষ) শব্দ দ্বারা একটি গৃহ কিংবা বহু বৃক্ষ বুঝায় না, কারণ শব্দটী অপরিবর্তনীয়। এইরূপ ক্ষেত্রে বহু-বচন বুঝাইতে হইলে কোথাও কোথাও সংস্কৃত 'সকল' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া বহুবচনের কাজ নিষ্পন্ন করিয়াছে। এই শব্দটী মালয় ভাষায় সেগল এবং গয়ো ভাষায় সিগোলো হইয়া বহু-বচনের কাজ করিতেছে, যেমন সেগ্‌ল কয়ু = বৃক্ষগুলি।

সংস্কৃত ভাষায় শব্দের লিঙ্গ, বচন, বিভক্তি, কারক প্রভৃতি সবই আছে, কিন্তু ইন্দোনেশীয় ভাষায় ইহার সবগুলিরই অসদ্ভাব। সুতরাং লিঙ্গ-বচন-বিভক্তি-কারক বিরহিত সংস্কৃত শব্দ যখন দ্বীপময় ভারতের শব্দপুঞ্জে অনুপ্রবেশ করিল তখন উহা এমনভাবেই পরিগৃহীত হইল যাহাতে উহার স্বদেশীকরণের পক্ষে বাধার সৃষ্টি না হয়। সুতরাং ইহা আদৌ আশ্চর্যের বিষয় নহে যে দ্বীপময় ভারতের সংস্কৃত শব্দসম্ভার বিভক্তি এবং কারকের অঙ্গসজ্জা বর্জিত[১৩]। তবে সংস্কৃত উপসর্গ এবং সমাস দ্বীপময় ভারতের সাহিত্যে কিছু প্রভাবের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে সংস্কৃতে যেমন দীর্ঘ দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের সৃষ্টি হইতে পারে, মালয় বা যবদ্বীপীয় ভাষাতে সেরূপ সমাস সৃষ্টির অবকাশ নাই। ডঃ গণ্ডা এই আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কৃত দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ বা বহুব্রীহি সমাসকে হয়তো চেষ্টা করিলে ইন্দোনেশীয় ছাঁদে উহার বাক্যশৈলীর বন্ধনে আবদ্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে যে শব্দগুচ্ছের সৃষ্টি হইবে তাহা সমাস হইবে, না ইংরেজী phrase এর সমতুল্য কোন কিছু সৃষ্টি হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা দুঃসাধ্য। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে আমরা সংস্কৃত 'মাতাপিতরৌ'কে হয়তো মালয় ইবু-বপ দ্বারা অনুবাদ করিতে পারি, কিন্তু সংস্কৃত "পূর্বসম্রাজর্ষিতুল্যাকুলপ্রভাবকীর্তি"---জাতীয় সমাসকে যবদ্বীপীয় ভাষার সমাসবন্ধনে আবদ্ধ করা অসম্ভব[১৪]। কোথাও কোথাও আবার যবদ্বীপের সাহিত্যে তৎপুরুষ সমাসটি অভিনব রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে, যেমন 'ধর্মপুত্র' শব্দটি। ধর্মপুত্র = ধর্মের পুত্র, ইহা হইল ষষ্ঠী তৎপুরুষ। প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় ইহার রূপ হইয়াছে সানকধর্ম ; এস্থলে 'সানক'-শব্দের অর্থ হইল 'পুত্র'। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সংস্কৃত শব্দ দুইটি যবদ্বীপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিবার সময় স্থান পরিবর্তন করিয়াছে। ইহা হইতে সম্ভবতঃ আমরা এই অনুমান করিতে পারি যে দ্বীপময় ভারতের সাহিত্যে যখন এইরূপ সমাসবদ্ধ শব্দের আবির্ভাব ঘটিবে তখন উহার মূল খুঁজিতে হইবে সংস্কৃত-ভাষায়। এইরূপ শব্দগুচ্ছের আবির্ভাব আরো একটি সম্ভাবনার দিক্ নির্দেশ করে ; উহা যবদ্বীপীয় গ্রন্থকারের সংস্কৃত শব্দের মর্ম ও রস পরিগ্রহণ করিবার ক্ষমতার পরিচায়ক।

২

ডঃ গণ্ডা দ্বীপময় ভারতের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সংস্কৃতের অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে বহু পাণ্ডিত্য-পূর্ণ প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ রচনা করিয়া এই বিষয়ে আলোচনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে বহুদূরে সমুদ্রের পরপারে বস্তুতঃ, সংস্কৃত ভাষার দিগ্বিজয় এবং উহার সম্প্রসারনের কাহিনীর মধ্যে যে অবিশ্বাস্য রোমান্টিকতা আছে তাহা ডঃ গণ্ডার গ্রন্থাবলী অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে। সংস্কৃত ভাষার এই সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে মালাক্কাতে, সুমাত্রার পালেম্বাঙ্গ-জেলায় এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলে, জাভাবলিদ্বীপের সমুদ্রতটস্থ কয়েকটি প্রধান অঞ্চলে ও অন্যান্য জেলায়, বোর্নিওর অন্ততঃ একটি অংশে, সিলিবিসের একাধিক তীরাঞ্চলে এবং উহার সন্নিহিত জনপদে[১৫]। এই পরিধির মধ্যে আমরা আপাততঃ দাক্ষিণপূর্ব এসিয়ার বর্মা, থাইল্যাণ্ড, চম্পা, কম্বুজ প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্যগুলির কথা বিশেষভাবে টানিয়া আনিতে চাহি না। দ্বীপময় ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এসিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনের যুগে সংস্কৃত শব্দসম্ভার বণিক, ধর্মপ্রচারক ও পুরোহিতগণের মাধ্যমেই এই সমস্ত স্থলে প্রচলিত হইয়াছিল। স্বদেশী বণিকগণ আবার এই সমস্ত শব্দের মধ্যে যাহা নিত্য ব্যবহার্য অথবা যাহার সহিত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন পরিচয় ঘটিয়া থাকে তাহা দ্বীপে-দ্বীপান্তরে প্রচারিত করিয়াছিলেন। সুতরাং ভারতীয় ও অভারতীয় জনগণের একাংশের সহযোগিতায় সংস্কৃত শব্দরাশি দক্ষিণপূর্ব এসিয়া এবং দ্বীপময় ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত হইয়াছিল। আমরা আজ যখন সুদূর নিউ গিনির উত্তরাঞ্চলের পাপুয়ানগণের কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যেও রাজা, অর্ত (=অর্থ) প্রভৃতি শব্দের প্রচলন দেখি তখন আমাদের যেন বিস্ময় রাখিবাব আর জায়গা থাকে না[১৬]। সেই সঙ্গে আরো ভাবি যে-সমস্ত অজ্ঞাতকুলশীলব্যক্তি ভারতীয় সভ্যতার ভাণ্ডার উজার করিয়া দ্বীপময় ভারতের ঘাটে ঘাটে তরণী ভিড়াইয়াছিলেন এবং এইরূপ মণি-মুক্তা বিলাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাদের সেই অবদানের অধিকাংশই তো আজ অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেইগুলি আজ স্মৃতি ও দীর্ঘশ্বাস এবং অতীত সভ্যতার ধ্বংসস্তূপে সমাহিত। সামান্য কিছুই এখন অতীতের সাক্ষ্য হিসাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

যেটুকু সাক্ষ্য বিদ্যমান তাহার প্রাচুর্য আবার দেখা যাইবে মালয় এবং যবদ্বীপীয় ভাষাতে; ইহারা পরস্পরের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রাচীন যুগ হইতেই ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষ্যে মালয়-উপদ্বীপের অধিবাসীগণ জাভা-সুমাত্রার বন্দরে বন্দরে বাণিজ্য জাহাজ নোঙ্গর করিয়াছে; এই উপলক্ষ্যে তাহাদের ভাষা এবং রীতিনীতি দ্বীপময় ভারতের বহুস্থলে প্রচলিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীবিজয় ও শৈলেন্দ্র রাজগণের প্রাধান্য এবং মজপহিত সাম্রাজ্যের বিপুল বিস্তারের ফলে দ্বীপময় ভারতের বহুস্থল একই রাজছত্রতলে আনীত হইয়াছিল। তখন পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সাহচর্য এবং পরিচয়ের ফলে মালয় এবং যবদ্বীপীয় ভাষা ও সাহিত্য পরস্পরকে অনেকটা প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। পারস্পরিক এই প্রভাব কখনো সাহিত্যের পথে গতিবেগ সঞ্চয় করিয়াছে, কখনো বা করিয়াছে বাণিজ্যিক পথে। ভারতবর্ষের মহাকাব্য

গুলি, যবদ্বীপের ছায়ানাট্য বা ওয়েয়াঙ্, পঞ্জিসাহিত্যচক্র এবং যবদ্বীপীয় রাজনৈতিক কেন্দ্রগুলির উচ্চ সাংস্কৃতিক মান মালয়-এসিয়ার বিভিন্নস্থলকে বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ এই সমস্ত পথেই সংস্কৃত শব্দ, ভাব-সম্ভার এবং কাহিনী অনেক সময় যবদ্বীপ হইতে অন্যত্র প্রচলিত হইয়াছে[১৭]। মালাক্কা প্রণালীর উভয় পার্শ্বস্থ মালয় অঞ্চলের অধিবাসী-গণও দীর্ঘকাল হইতেই ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বোর্ণিও, সিলিবিস, মালাক্কার বিভিন্ন দ্বীপ এবং ইন্দোনেশীয়ার পূর্বাঞ্চলের দেশগুলিতে মালয় ভাষা প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই ভাষা অবশ্য একেবারে নির্ভেজাল মালয়-শব্দ সম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল না; ইহার মধ্যে সংস্কৃত শব্দের খাদ মিশ্রিত ছিল। ১৫২১ খৃষ্টাব্দে রচিত পিগাফেটার মালয়-অভিধানের কিঞ্চিদধিক ৪২৫টি শব্দের মধ্যে কিছু সংস্কৃত শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৪০৩-১৫১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একজন চীনদেশীয় গ্রন্থকার মালাক্কার ৪৮২টি মালয় শব্দের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন; ইহার মধ্যেও আমরা কিছু কিছু সংস্কৃত শব্দের সন্ধান পাইতেছি[১৮]। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে মালয়-ভাষার এই বিস্তৃতির ইতিহাসে কথ্য-মালয়, প্রাচীন যুগের লিখিত মালয়, বাটাভিয়া বা জাকার্তার কথ্য-মালয়, মালয়-চীনার পাঁচমিশেলী ভাষাশৈলী (idiom), মোলাক্কা ও মিনা-হাসার খৃষ্টানী মালয় যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সর্বভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্ট অভূতপূর্ব বাজারী মালয়ও এই কার্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

সিলিবিসের বুগিনীজগণ নৌবিদ্যা এবং উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহারা মালয় এবং তৎসহ কিছু কিছু সংস্কৃত শব্দ পরিগ্রহণ করিয়া উহা চতুষ্পার্শ্বস্থ দ্বীপ-দ্বীপান্তরে প্রচলিত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত শব্দগুলি তৈজসপত্র এবং ব্যবসায়ের জিনিস-পত্রের পরিচয়ব্যঞ্জক; সুতরাং এইগুলি উন্নততর সভ্যতার স্বাক্ষরবহ। ইহার দুই একটি দৃষ্টান্ত এখানে পরিবেশন করা যাইতেছে। সিলিবিস-দ্বীপের মাকাসার-ভাষার 'লব' শব্দটি সংস্কৃত 'লাভ' শব্দের বিকৃত রূপ। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত শৃঙ্খল শব্দটি মালয় এবং মাকাসার ভাষায় সঙ্কল-শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে; সংস্কৃত কংস শব্দটি মালয় ভাষায় হইয়াছে গঙ্গস, মাকাসার ভাষায় হইয়াছে গস্‌স। মাকাসার এবং মালয় ভাষায় মণি শব্দটিও সংস্কৃত 'মণি'-রই রূপান্তর। ইহা ব্যতীত ধর্ম, আগম, প্রশাসন এবং সামাজিক জীবনের পরিচায়ক অনেক সংস্কৃত শব্দ মালয় ভাষার মাধ্যমে বুগিনীজ-ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে, যেমন, গুরু, পুঙ্গব, পতিহ, পুবস, ভুত, বটর, মন্তরি (মেন্তেরি) প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত গুরু, পুঙ্গব, পতি, উপবাস, ভূত, ভটার, মন্ত্রী প্রভৃতি শব্দ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে[১৯]। আমরা উপরে যে-সমস্ত দৃষ্টান্ত পরিবেশন করিলাম তাহা দক্ষিণ-সিলিবিসের কথা; মধ্য-সিলিবিসের বরী-ভাষাতেও কিছু কিছু সংস্কৃত শব্দ বুগিনীজ ভাষার মাধ্যমে প্রবেশলাভ করিয়াছে।

যদি আমরা এইবার বলিদ্বীপের পূর্বদিকস্থ দ্বীপপুঞ্জের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে এই অঞ্চলের ভাষার মধ্যেও সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। মালয় ভাষাভাষীগণের মাধ্যমে বিম-সুম্ব ভাষাগুচ্ছের মধ্যে কিছু কিছু সংস্কৃত শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছে। বিমনীজ, রোটিনীজ, মঙ্গরই (ফ্লোরেস) এবং লম্বকদ্বীপের পূর্বদিকস্থ দেশগুলিতেও

এইরূপ সংস্কৃত শব্দ বিদ্যমান আছে, তবে কোথাও কোথাও ইহা একান্তই বিকৃতরূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে, যেমন সংস্কৃত 'রাক্ষস'-শব্দটি মালয় ভাষায় হইয়াছে রক্‌সস, বিমনীজ-ভাষায় হইয়াছে রঙ্গসস ; অনুরূপভাবে সংস্কৃত 'সাক্ষী'-শব্দটি মালয় ভাষাতে হইয়াছে 'সক্‌সি', বিমনীজেও সকসি-শব্দ[২০]। লম্বকের সসক ভাষাতেও মালয় এবং যবদ্বীপীয় ভাষার মাধ্যমে কিছু কিছু সংস্কৃতশব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। লম্বকের সসক-ভাষার অরিয়, বয়, বক্তি, বটর, বুত প্রভৃতি শব্দ আর্য, ভয়, ভক্তি, ভট্টার, ভূত প্রভৃতি সংস্কৃতশব্দসঞ্জাত। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার সংস্কৃত শব্দে স্বদেশী উপসর্গ এবং প্রত্যয় যোগ করিয়া নূতন নূতন ক্রিয়া এবং শব্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে, যেমন সংস্কৃত মাংস-শব্দ-সম্ভূত 'মেমংস' শব্দটি ; মেমংস শব্দটির অর্থ 'পশু শিকারে গমন করা'। মধ্য-বোর্ণিওর বুসঙ্গ ভাষাতেও সংস্কৃত শব্দের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আমরা যদি আরো উত্তরের দিকে অগ্রসর হই তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে ফিলিপাইন ভাষাপুঞ্জের তাগালোগ ভাষার মধ্যে প্রায় ২৫০টি সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে[২১]। তাগালোগ এবং বিষয় ভাষার সংস্কৃত শব্দগুলি মুখ্যতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পার্থিব সভ্যতার আনুসঙ্গিক শব্দ। তাগালোগ ভাষার কথ, লহু, লস, মুখ, মূল প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত কথা, রাহু, রস, মুখ, মূল প্রভৃতি শব্দ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে[২২]।

এসিয়ার মূল-ভূখণ্ডের মধ্যে চাম-ভাষার সহিত ইন্দোনেশীয় ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে চাম-ভাষার আইমোনিয়ার-ক্যাবাটন সম্পাদিত চাম-ফরাসী অভিধানের[২৩] ৯৩৫০টি শব্দের মধ্যে অন্ততঃ ৭০০টি শব্দই সংস্কৃতভাষা হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে[২৪]। যাহারা দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার বিশেষতঃ চম্পা-কম্বুজের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাহারা ভাষাতত্ত্বের মধ্যেও হিন্দু-গৌরবের পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইবেন।

যবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া এইবার যদি আমরা পশ্চিমদিকে অগ্রসর হই তাহা হইলে আমরা এই অঞ্চলে একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাইব। সুমাত্রার উত্তরাঞ্চলে মালয় ভাষার মাধ্যমে অনেক সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। সুমাত্রার গয়ো ভাষার অস্তন (প্রাসাদ), মালয় ইস্তন বা অস্তন সংস্কৃত আস্থান শব্দ হইতে উদ্ভূত। অনুরূপভাবে মালয় ও আচেনীজ ভাষার 'অতব' শব্দটি পরিগৃহীত হইয়াছে সংস্কৃত 'অথবা' শব্দটি হইতে। এতদ্ব্যতীত আচেনীজ-ভাষার বগিঅ, বিঅয়, বিসো প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ভাগ্য, ব্যয় এবং বিষেরই রূপান্তর মাত্র[২৫]। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে সুমাত্রার করো-বটক ভাষায় ১৫৫টি এবং তোব-বটক ভাষায় ১৭৫টি ভারতীয় শব্দ অনুপ্রবেশ করিয়াছে[২৬]। এই বটকগণ চতুষ্পার্শ্বস্থ মুসলিম প্রভাব প্রায় সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য দীর্ঘকাল পর্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। সম্ভবতঃ এই শব্দগুলি অংশতঃ শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে এবং অংশত ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে যবদ্বীপের রাজনৈতিক প্রাধান্যের যুগে করো-বটক এবং তোব-বটক ভাষায় অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। এই প্রভাবের অপর সাক্ষ্য রহিয়া গিয়াছে ইহাদের বর্ণমালায় এবং লিপিতে। এই প্রভাবের অর্থ ইহা নহে যে করো-বটক বা তোব-বটকগণ শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের এবং যবদ্বীপের রাজনৈতিক আশ্রয়তলে আনীত হইয়াছিল। যাহাই হউক বটকভাষার সস্তি, উঙ্গ, লউ, কুদাল, সপত

প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত শান্তি, ওম্, রাহু, কুদাল, শপথ প্রভৃতি হইতে পরিগৃহীত হইয়া ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয় ঘোষণা করিতেছে। কেবলমাত্র ইহাই নহে ; তোব এবং করো-বটক অধ্যুষিত অঞ্চলে ভারতীয় সপ্তাহের নামও পরিগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু ইহাদের অঙ্গে সুমাত্রীয় ছদ্মবেশ। স্বদেশী বেশে ইহাদের নাম হইয়াছে : সোম, অঙ্গর বা ঙ্গর, মুদ বা বুদহ, বোরস্পতি, চুকের বা সিঙ্গহোর প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত জ্যোতির্বিদ্যা এবং সময় পরিমাপক কিছু কিছু সংস্কৃত শব্দও ইহাদের ভাষাতে পরিগৃহীত হইয়াছে[২৭]।

সুমাত্রার দক্ষিণের নিয়াসদ্বীপের ভাষায় অন্ততঃ ৬০টি সংস্কৃত শব্দ অনুপ্রবেশ করিয়াছে। এই শব্দগুলি সম্ভবতঃ মালয়, মিনঙ্কবাউ অথবা বটক ভাষাভাষী লোকের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে নিয়াসদ্বীপে প্রবেশ লাভ করিয়াছে[২৮]। নিয়াস ভাষার আগম, রজো, গুরু, গজ, সিংঙ্গো, কত প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত আগম, রাজা, গুরু, গজ, সিংহ, কথা প্রভৃতি শব্দ হইতে আহরিত হইয়াছে। এই সমস্ত শব্দ দ্বীপময় ভারতের প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান ; সুতরাং কোন শব্দটি কোন পথে কোথায় প্রচলিত হইয়াছে তাহা সর্বদা সঠিক-ভাবে নির্দ্ধারণ করা সহজসাধ্য নহে। নিয়াসের সংস্কৃত শব্দাবলীর কিয়দংশ আবার নিকটবর্তী মেণ্টাওয়ে, সিমালুর প্রভৃতি দ্বীপে প্রসার লাভ করিয়াছে। সংস্কৃতভাষার দিগ্বিজয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সুদূর আফ্রিকার উপকূলস্থ মাদাগাস্কার-দ্বীপের ভাষা। ইহার মালাগাসি-ভাষায় সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ লইয়া পণ্ডিতমহলে তীব্র মতবিরোধ বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজা ফিন্ত্রালামা বলিয়াছেন যে মাদাগাস্কার দ্বীপের মালাগাসি-ভাষায় ৪৫০টি সংস্কৃত শব্দ অনুপ্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু গ্র্যাণ্ডিডিয়েয় মালাগাসি-ভাষায় সংস্কৃত শব্দের অস্তিত্ব একেবারেই অস্বীকার করিয়াছেন। এই দুইটি অভিমতই অগ্রাহ্য করিয়া ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ নিঃসন্দেহে মাদাগাস্কারে প্রচলিত হইয়াছিল[২৯]। এই স্থলে ইহার দুই চারিটি দৃষ্টান্ত পরিবেশন করা যাইতে পারে, যথা, অশর বা অসর, বত্রবত্র, শূত্রি বা অশুত্রি, হৎসিহ, শির বা সির, ফাব্‌স বা ফোস, মক, ৎসিহিঅ বা হিঅহিয়, ফিশক প্রভৃতি মাসের নাম সংস্কৃত আষাঢ়, ভাদ্রপদ, চৈত্র, কার্তিক, (মার্গ) শির, পৌষ, মাঘ, জ্যৈষ্ঠ, বৈশাখ শব্দের মালাগাসী রূপায়ণ বলিয়া মনে হয়। মাদাগাস্কারের সংস্কৃত শব্দ কাহার মাধ্যমে, কোনযুগে কিরূপে প্রবেশ লাভ করিল তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই, তবে মালাগাসি ভাষার সংস্কৃত শব্দের বিকৃত রূপ এবং সীমিত ঐশ্বর্য দেখিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে এই শব্দগুলি দ্বীপময় ভারতের সেই সমস্ত লোকেরা আমদানী করিয়াছিল যাহাদের সংস্কৃত শব্দের সহিত পরিচয় নিবিড় ছিল না। কিছু কিছু শব্দ অবশ্য অন্য সূত্রেও মাদাগাস্কারে প্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে[৩০]।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে সংস্কৃত শব্দমালা দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ায় এবং দ্বীপময় ভারতে বিপুলভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছে ; কোথাও ইহার প্রচলন বেশী, কোথাও বা ইহার প্রচলন কম[৩১]। ভাষাতত্ত্ববিদগণ এই সংস্কৃত শব্দাবলীর একটি বিশেষত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। তাহা হইল একই সংস্কৃত শব্দ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছে ; এমন কি, যে যবদ্বীপে একদা গভীরভাবে

সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা হইত সেখানেও অনেক সংস্কৃত শব্দ পৃথক অর্থবহ। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া আমরা এই আলোচনা হইতে বিরত হইলাম[৩২]।

দ্বীপময় ভারতের সংস্কৃত শব্দের ভাণ্ডারটি যেরূপ সমৃদ্ধ তাহা হইতে আমরা হয়তো অনুমান করিতে পারি যে ইহার প্রভাব জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে কমবেশী প্রসারিত হইয়াছিল। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন[৩৩] যে আজকাল যে-সমস্ত সংস্কৃত শব্দ সর্বাপেক্ষা বেশী লোক সর্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে তাহার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং এই শ্রেণীর শব্দের মধ্যে আছে মন্ত্রী, গুরু, গুণ, জাল, সাক্ষী, ভাণ্ড, রূপ প্রভৃতি শব্দ। প্রাচীনতর যুগে কেবলমাত্র সর্বদা ব্যবহার্য শব্দই যে সাহিত্যের আসরে পরিগৃহীত হইয়াছিল তাহা নহে, পরন্তু দুর্লভ পাণ্ডিত্যসূচক বহু শব্দ অবিকৃত কিংবা প্রায় বিশুদ্ধরূপে যবদ্বীপীয় ভাষায় পরিগৃহীত হইয়াছিল। তবে কথ্যভাষায় সংস্কৃত শব্দের যে নিদর্শন অদ্যাবধি রহিয়া গিয়াছে তাহাতে ধ্বনি এবং রূপগত বৈশাদৃশ্য বিলক্ষণ পরিদৃশ্যমান, যেমন সংস্কৃত অগ্নি শব্দ কথ্যভাষায় 'গেনি'-রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। সাহিত্যে এই সমস্ত সংস্কৃত শব্দের প্রথম আবির্ভাব, ব্যবহার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থ পরিবর্তনের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্য নিষ্ঠা-সহকারে পাঠ করা প্রয়োজন। বস্তুতঃ যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সুন্দ এবং মালয় উপদ্বীপে এইরূপ সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা নগণ্য নহে এবং এইরূপ প্রায় প্রত্যেকটি শব্দের পিছনেই যেন একটি করিয়া অলিখিত ইতিহাস রহিয়া গিয়াছে। জাভা এবং মালয় অঞ্চলে কিছু কিছু সংস্কৃত শব্দের স্বদেশী প্রতি শব্দ পাশাপাশি রহিয়া গিয়াছে, আবার কোথাও কোথাও হয়তো সংস্কৃত শব্দটি স্বদেশী শব্দটিকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া একক মহিমায় বিরাজমান রহিয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে আবার হয়তো নিজেও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। একদিন যখন যবদ্বীপীয় সাহিত্যের সমস্ত পুঁথি প্রকাশিত হইবে এবং অতীত ও আধুনিক যবদ্বীপীয় ভাষার পূর্ণাঙ্গ অভিধান রচিত হইবে তখন হয়তো যবদ্বীপীয় ভাষাতত্ত্বের এই রোমাঞ্চকর অধ্যায়টি লিখিবার উপযুক্ত সময় আসিবে[৩৪]।

পাদটীকা

১. Mañjuśrimūlakalpa, II, p. 332 (Ed. Ganapati Sastri, Trivandrum Sanskrit Series). এই গ্রন্থের অংশ বিশেষ ৭৪৬ এবং ৭৭১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অমোঘবজ্র কর্তৃক অনূদিত হইয়াছিল। সিলভাঁ লেভী অনুমান করেন যে মূল সংস্কৃত গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ ৭ম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। দ্রষ্টব্য S. Levi, Sanskrit Texts from Bali, p. X.

২. সিলভাঁ লেভী বলিয়াছেন যে সংস্কৃত কর্মরঙ্গ (বাংলা কামরাঙ্গা, ইউরোপীয় করমবোলা) ফলটি এই দেশসম্ভূত।

৩. Gonda, *op. cit.*, p. 1

৪. Gonda, *op. cit.*, p. 2.

৫. Gonda, Sanskrit in Indonesia, p. 2.

৬. This corresponds to : q (glottal stop).

৭. Gonda, *op. cit.*, p. 3.

৮. একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে, *OJO* XXXI (Minto-stone). এই শিলালিপিটিতে লিখিত শব্দগুলির ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বিত্ব হওয়ার পরিচয় পাইতেছি। যথা—ইনর্পন্নকন, হুমরেপ্পকন, অন্দেক্ষকন, দলম্মের প্রভৃতি।

৯. For these particulars see Gonda, *op. cit.*, p. 3.

১০. *Ibid.*

১১. Gonda, *op. cit.*, p. 4.

১২. Gonda, *op. cit.*, pp. 279-80.

১৩. এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও দুর্লভ নহে, যেমন প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণের ২১/৮৬ শ্লোকে আমরা পড়িতেছি : 'হাঃ প্রিয়ে জনকরাজপুত্রিকা'। এখানে 'প্রিয়ে' শব্দটি ৭মীর সম্বোধন কারক এবং উহা সংস্কৃতের নিয়মানুসারেই পরিগৃহীত হইয়াছে। এইরূপ দৃষ্টান্ত আরো আছে। দ্রষ্টব্য : Gonda, Sanskrit in Indonesia, pp. 276 ff.

১৪. Gonda, *Sanskrit in Indonesia*, pp. 300-1.

১৫. Gonda, *op. cit.*, p. 33.

১৬. Gonda, *op. cit.*, p. 38.

১৭. দ্রষ্টব্য Gonda, *op. cit.*, p. 33 ff.

১৮. এই তালিকা বা অভিধান দুইটি ইংরেজীতে সম্পাদিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য Gonda in *BKI*, XCVII, p. 101 ff. ; *Sanskrit in Indonesia* pp. 36-7.

১৯. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Gonda, Sanskrit in Indonesia, pp. 38-48.

২০. Gonda, *op. cit.*, p. 47.

২১. Gonda, *op. cit.*, p. 53.

২২. *Ibid* p. 56-57.

২৩. Published from Paris in 1906.

২৪. Gonda, *op. cit.*, p. 52.

২৫. Gonda, *op. cit.*, p. 58-9.

২৬. *Ibid*, p. 62.

২৭. দ্রষ্টব্য Gonda, *op. cit.*, pp. 62-63.

২৮. *Ibid*, p. 66-7.

২৯. Gonda, *op. cit.*, p. 68 and f.ns. 102 and 103 on p. 78.

৩০. তুলনীয় Gonda, *op. cit.*, 69.

৩১. কেবলমাত্র সংস্কৃত শব্দ নহে ; তামিল শব্দও দ্বীপময় ভারতে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। একমাত্র মালয় ভাষাতেই প্রায় ১০৫টি তামিল শব্দ বিদ্যমান আছে। তবে ইহা পরবর্তী যুগের কথা। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য Gonda, *op. cit*, p. 89 and literature cited therein.

৩২. অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই প্রসঙ্গে Gonda, *op. cit.*, pp. 80-88 পড়িবেন।

৩৩. *Op. cit.*, p. 405.

৩৪. Cf. Gonda, *op. cit.*, pp. 406-7.

১৪৯৩

তৃতীয় অধ্যায়

সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বাভাষ এবং সাহিত্যের শ্রেণী-বিন্যাস

প্রথম পর্ব

পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমরা বলিয়াছি যে দ্বীপময় ভারতে অন্ততঃ ২৫০টি ভাষা এবং উপভাষা বিদ্যমান আছে, কিন্তু এই সমস্ত ভাষার মধ্যে একমাত্র যবদ্বীপীয় বলিদ্বীপীয় ভাষারই একটি বিশিষ্ট প্রাচীন সাহিত্য বর্তমান আছে। পূর্বে এই ভাষাকে কবিভাষা বলা হইত কিন্তু অনেকে এই পরিচয় বা অভিজ্ঞানের পক্ষপাতী নহেন ; কারণ, ইহা দ্বারা আবহমানকাল প্রচলিত (traditional) এমন একটি সাহিত্যিক রীতিকে বুঝাইতেছে যাহা প্রাচীন এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক রচনার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং পণ্ডিতগণ জাভার সুপ্রাচীন ভাষার আখ্যা দিয়াছেন প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষা। তবে এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণীয় যে মজপহিত যুগে সম্ভবতঃ এই সংস্কৃত-বহুল প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার রচনাবলীকে কবি-ভাষা নামেই আখ্যাত করা হইত। কারণ নাগরকৃতাগমের ২৫ সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকে ডঙ্গ আচার্য উত্তর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তিনি ছিলেন 'বিদগ্ধেঙ্গ ক্রঃ কবি" অর্থাৎ তিনি ছিলেন আগমশাস্ত্রে বিদগ্ধ এবং তিনি কবি (ভাষা) জানিতেন। মধ্যযুগে এই ভাষা কবিভাষা অথবা অন্য যে-কোন নামেই পরিচিত হউক না কেন বর্তমান যুগের পণ্ডিতগণ প্রাক্-মুসলিম এই সাহিত্যকে প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষা নামে আখ্যাত করিয়াছেন এবং আমরাও ইহাকে এই নামেই অভিহিত করিব।

প্রাচীন যুগের এই যবদ্বীপীয় সাহিত্য গদ্য এবং পদ্য উভয় শৈলীতেই রচিত হইয়াছে। সংস্কৃত ছন্দোবদ্ধ কবিতা বা কাব্যগুলি কাকাবিন নামে বিখ্যাত। এই কাকাবিনগুলির স্বকীয় একটি বৈশিষ্ট্য আছে এবং ইহাদের প্রকৃতি ও পরিণাম একই প্রকারের। কাকাবিন-সাহিত্যের এই বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে এই শ্রেণীর সমস্ত গ্রন্থ পাঠ না করিলে মনের মধ্যে একটি বিকৃত বা অসম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হইবে ; কেবলমাত্র একটি কাকাবিন গ্রন্থ স্বতন্ত্রভাবে পাঠ করিলেও গ্রন্থগুলির তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে না। সুতরাং এই কাকাবিন সাহিত্যের বিশেষত্ব-গুলি অনুধাবন করিতে হইলে এই কাকাবিন সাহিত্যকে সম্পূর্ণরূপে পাঠ করিতে হইবে। এই কাকাবিনগুলির পরিণামও বিস্ময়কররূপে একই প্রকার। ইহাতে যে শতাধিক ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে আজ তাহার স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট আছে। কাকাবিন সাহিত্যের এই বিশেষত্বের দিকে পূর্ববর্তী কোন কোন লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন[১]।

যবদ্বীপের বহু উচ্চপদস্থ নরনারী এবং বিভিন্ন নরপতি প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব যবদ্বীপাধিপতি ধর্মবংশ, কামেশ্বর, জয়ভয়, হয়ম ভুরুক প্রভৃতি রাজগণ এই বিষয়ে বিপুল খ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। রাজান্তঃপুরের মহিলাগণও যে এই বিষয়ে জহুরী ছিলেন তাহার পরিচয় রহিয়া গিয়াছে নাগরক্লতাগমের ৯৫ সর্গে। কাহারো কাহারো আবার পুঁথিপত্রাদি সংগ্রহ করিবারও বাতিক ছিল। প্রপঞ্চ তাঁহার ঐতিহাসিক কাব্যে তাঁহার কবি-বন্ধুর দুর্লভ পুস্তক সংগ্রহ করার বাতিকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (২৯ সর্গ)।

কাকাবিন-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই শ্রেণীর আরো ২/১টি শাখা সাহিত্যের উল্লেখ করিব। নাগরক্লতাগম কাব্যে (৯৩/২) একপ্রকার বর্ণনামূলক কবিতার উল্লেখ করা হইয়াছে ; উহার নাম হইল ববচন। শব্দটি সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'বচ'-ধাতু হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। এইগুলি সাধারণতঃ স্বদেশী ছন্দে বিরচিত হইলেও ইহাতে সম্ভবতঃ সংস্কৃতছন্দ প্রয়োগ করিবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। এতদ্ব্যতীত আরো একপ্রকার ছন্দোবদ্ধ কাব্য বিদ্যমান ছিল ; উহার নাম ছিল লম্বঙ্গ। আমরা তন্তুলার বিরচিত সুতসোম নামক কাব্যের (চতুর্দ্দশ শতাব্দী) শেষের দিকের একটি চরণে পড়িতেছি : 'কবি গীত লম্বঙ্গ' অর্থাৎ গীত এবং লম্বঙ্গের কবি। ডঃ পিগো অনুমান করিয়াছেন যে এই লম্বঙ্গ শ্রেণীর কবিতা বা প্রশস্তি সম্ভবতঃ কাকাবিনের মতই সংস্কৃতছন্দে বিরচিত হইত। তিনি নাগরক্লতাগমের ৯৭ সর্গের দুইটি বিপরীত মাত্রার অর্দ্ধচরণকে ইহার দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন[২]। তবে ইহা স্বীকার্য যে এই সমস্ত ববচন এবং লম্বঙ্গ পর্যায়ের কবিতা বা প্রশস্তি বর্তমানে দুর্লভ। যে সমস্ত প্রাচীন যবদ্বীপীয় পুঁথি এখনো পঠিত কিংবা আলোচিত হয় নাই তাহার মধ্যে এই শ্রেণীর রচনা আছে কিনা তাহা অনুসন্ধান করা কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত কাকাবিনের সহিত ববচন এবং লম্বঙ্গের কি সম্বন্ধ ছিল বা আদৌ ছিল কিনা তাহা নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের বিষয়।

যবদ্বীপের বাহিরে মালয়-অঞ্চলে এবং বলিদ্বীপেও একটি সাহিত্যের জগৎ বিদ্যমান ছিল। ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে প্রাচীন মালয় এবং প্রাচীন বলিদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত অনুশাসন লিপিগুলিতে। কেবলমাত্র শিলালিপি বা তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ হইয়াছে অথবা ইহা অলঙ্কারবিহীন এই অপরাধে যদি আমরা ইহাদিগকে সাহিত্যিক পদমর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হই তাহা হইলে সম্ভবতঃ অন্যায় হইবে, কারণ যে উপকরনেই লিপিগুলি লিখিত হইয়া থাকুক না কেন উহা যে সেই যুগের রচনার নিদর্শন সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং রচনার উৎকর্ষ বা মূল্যায়ন দিয়া সাহিত্যিক প্রচেষ্টার এই প্রথম নিদর্শনকে স্বাগত জানানো অসঙ্গত হইবে না ; সাহিত্যের অপটু প্রথম প্রয়াস হিসাবেই ইহাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইতে হইবে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে আমাদিগকে প্রাচীনতম শিলালেখ তাম্রশাসনগুলির তারিখগুলি স্মরণে রাখিতে হইবে। সুমাত্রায় প্রাচীন-মালয় বা প্রাচীন মালয়ের মত ভাষায় রচিত সর্বপ্রাচীন লিপিটি (শিলালিপি) ৬০৫ শকাব্দে (৬৮৩ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহার আরম্ভে আমরা পড়িতেছি :

'স্বস্তি শ্রী-শকবর্ষাতীত ৬০৫ একাদশী শুক্লপক্ষ বুলন বৈশাখ ডপুন্ত হিয়ম্ নায়িক দি সাম্বৌ মঙ্গলপ্ সিদ্ধযাত্র দি সপ্তমী শুক্লপক্ষ বুলন জ্যেষ্ঠ ডপুন্ত হিয়ম্ মরল্পস্ দরি মিনাঙ্গ তাম্বন্ মমাব যম্ বল দুঅ—লক্ষ দঙ্গন্ কোদুঅরতুস চার দি সাম্বৌ ডঙ্গন্ জালন্ সরিবু ৎলুরাতুস্ সপুলু দুঅ বঙকেঙ দাতম্ দি মত জপ্ সুখচিত্ত দি পঞ্চমী শুক্লপক্ষ বুল (ন্)···লঘু মুদিত দাতম্ মরবুঅৎ বনুঅ···শ্রীবিজয় সিদ্ধযাত্র সুভিক্ষ···' ইত্যাদি

অনুরূপ ভাষায় রচিত আরো দুইটি অনুশাসনলিপি ৬০৬ এবং ৬০৮ শকাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল[৩]। ইহার প্রথমটি পাওয়া গিয়াছিল সুমাত্রার পালেম্বাঙ্গ অঞ্চলে, দ্বিতীয়টি বঙ্কদ্বীপের কোটা কাপুর নামক স্থলে। এই সমস্ত অনুশাসন লিপির সংস্কৃত শব্দগুলি সহজেই বোধগম্য, কিন্তু ইহার অপরাপর অংশের ভাষা পণ্ডিতগণের নিকট অনেকটা দুর্বোধ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। লিপিগুলিতে ব্যবহৃত এই ভাষার নাম প্রাচীন-মালয় কিংবা কিউয়েন-লুয়েন[৪] যাহাই দেওয়া হউক না কেন, এই ভাষা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনো একান্তই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। যদি আমরা ইহাকে প্রাচীন মালয়-ভাষার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করি তাহা হইলে আমরা বলিব যে প্রাচীন মালয়-সাহিত্যের আদি-পর্বের নমুনা ৬৮৩ খৃষ্টাব্দের উৎকীর্ণ শিলা-লিপিতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

বলিদ্বীপের তারিখ-সম্বলিত সর্ব-প্রাচীন অনুশাসনলিপিটি ৮৯৬ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। উহা বলিদ্বীপীয় ভাষাতেই রচিত হইয়াছে[৫]।

এই সমস্ত অনুশাসনলিপিকে আমরা প্রাচীন মালয় বা প্রাচীন বলিদ্বীপীয় সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করিলেও একথা স্বীকার্য যে এই ভাষাতে লিখিত প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন লোপ পাইয়াছে অথবা দীর্ঘকালের মধ্যে এই ভাষাতে পুঁথি-পুস্তক লিখিত হয় নাই। সুতরাং দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য বলিতে আমরা সাধারণতঃ প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি বুঝিয়া থাকি।

ট্যাঙ্গ-রাজবংশের ইতিবৃত্ত[৬] (৬১৮-৯০৬ খৃঃ অঃ) হইতে আমরা জানিতে পারি যে সমসাময়িক যবদ্বীপে লিখনবিদ্যা প্রচলিত ছিল এবং তাহারা জ্যোতির্বিদ্যাতেও কিছু কিছু দক্ষতা অর্জন করিয়াছিল। এই সাহিত্য আলোচনা করিবার পূর্বে আমরা যবদ্বীপীয় লিখনরীতি বা হস্তাক্ষর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। খুব প্রাচীন কালের হস্তলিখিত পুঁথি এখন আর বিদ্যমান নাই; সুতরাং যবদ্বীপের প্রাচীন অক্ষরগুলির নিদর্শন খুঁজিতে গেলে তাম্রপত্র এবং শিলালেখগুলির সাহায্যই লইতে হইবে। ৭৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যবদ্বীপের সর্বপ্রাচীন অনুশাসনলিপিগুলি পল্লব-গ্রন্থ হস্তাক্ষরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পূর্ণবর্মনের শিলালিপিগুলি, তুক মাসের শিলালিপি এবং সঞ্জয়ের চঙ্গল লিপিটি দক্ষিণ ভারতের পল্লব-গ্রন্থ হস্তাক্ষরেই স্বাক্ষর বহন করিতেছে। ৭৬০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ দিনজ-লিপিতে আমরা প্রাচীন যবদ্বীপীয় হস্তাক্ষরের সর্বপ্রথম নিদর্শন পাই; ইহা পল্লব-গ্রন্থ হস্তাক্ষরের বিবর্তিত রূপ এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এই লিপিকে অনেকে কবি-লিপি আখ্যা দিয়াছেন।

শুধু লিপি বা হস্তাক্ষরেই এই পরিবর্তন পর্যবসিত হয় নাই। ইহার কিছুকাল পর

হইতেই অনুশাসনলিপিতেও স্বদেশী ভাষা ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ভারতবর্ষে পর্যায়ক্রমে প্রাকৃত, প্রাকৃত-সংস্কৃতের মিশ্রণ এবং সর্বশেষ বিশুদ্ধ সংস্কৃত অনুশাসনলিপিগুলিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। পল্লব-শাসিত দক্ষিণ ভারতের অনুশাসনলিপিতেও এই পর্যায় প্রতিফলিত হইয়াছে, কিন্তু সপ্তম শতাব্দী হইতেই পল্লবগণের অনুশাসনলিপি রচনায় অনেক সময় তামিল ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা একান্ত আকস্মিক ব্যাপার নাও হইতে পারে যে প্রায় একই সময়ে সুমাত্রায় প্রাচীন-মালয়, কাম্বোডিয়াতে খ্মের, চম্পাতে চাম এবং যবদ্বীপে প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষা ব্যবহৃত হইতে লাগিল[৭]।

প্রাক-মুসলিম যুগের এই হস্তাক্ষরকে স্থানীয় লোকেরা 'অক্ষর-বুদ' বলিয়া থাকেন। ডঃ গণ্ডা ইহার অর্থ করিয়াছেন 'অক্ষর বুদ্ধ' বা বৌদ্ধ হস্তলিপি। এই হস্তাক্ষরকে 'বৌদ্ধ হস্তলিপি' কেন বলা হইবে তাহার কারণ বোঝা দুঃসাধ্য। প্রথমতঃ শৈলেন্দ্র রাজাদের আমল ছাড়া যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্মের প্রতাপ তান্ত্রিক শৈব ধর্মাপেক্ষা কখনো প্রবলতর ছিল না। দ্বিতীয়তঃ এই হস্তাক্ষর যদি শৈব দিনজ-অনুশাসন লিপির বিবর্তিত রূপ হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহাকে অক্ষর-শেব বলাই যুক্তিসঙ্গত ছিল। সুতরাং ইহাকে বৌদ্ধ হস্তলিপির সহিত সংযুক্ত করা অসঙ্গত।

প্রাচীন যবদ্বীপে পল্লবগ্রন্থ এবং কবি-হস্তাক্ষর ব্যতীত আরো একটি হস্তাক্ষর কিছু দিনের জন্য প্রচলিত হইয়াছিল। ডঃ বস্ ইহার নাম দিয়াছেন প্রাক্-নাগরী হস্তাক্ষর। এই হস্তাক্ষর দিনজ-অনুশাসনের প্রায় সমসাময়িক কলসন (৭৭৮ খৃঃ), কেলুরক (৭৮২ খৃঃ) প্রভৃতি লিপিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে, উত্তর ভারতে, নেপালেও এই হস্তলিপির পরিচয় পাওয়া যায়[৮]। যবদ্বীপে এই প্রাক-নাগরীর আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, ইহার বিলয়ও তেমনি আকস্মিক ; কারণ পরবর্তী যবদ্বীপীয় লিপিগুলি কবি-হস্তাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। এই কবি হস্তাক্ষর দিনজলিপির যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে আধুনিক যবদ্বীপীয় হস্তাক্ষরে পরিণত হইয়াছে[৯]। এই লিপি হইতেই আবার সুন্দনীজ, মাদুরীজ এবং বলিদ্বীপীয় হস্তাক্ষরের জন্ম হইয়াছে। মধ্যযুগের সুমাত্রার হস্তাক্ষরও কবি-লিপির বংশধর। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে মধ্যসুমাত্রার বটক হস্তাক্ষর ইন্দোনেশীয় পল্লবহস্তাক্ষরের প্রকার ভেদ মাত্র। এমন কি, দক্ষিণ-সুমাত্রার রেজঙ্গ এবং লম্পোঙ্গ হস্তলিপির সহিত এই কবি-লিপির যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইন্দোচীনের চম্পাদেশের চাম-হস্তাক্ষরও ভারতবর্ষ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। এই চাম ভাষার সহিত ইন্দোনেশীয় ভাষার নিকট সম্পর্ক ভাষাতত্ত্ববিদগণের নিকট অপরিজ্ঞাত নহে।

অধ্যাপক জুটমুল্ডার প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যের তথ্যাদি আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন[১০] যে যবদ্বীপীয় লেখকেরা লেখনী হিসাবে একপ্রকার তীক্ষ্ণ ফলাকা ব্যবহার করিত। তাঁহার এই মন্তব্য চৈনিক ইতিবৃত্ত হইতে সমর্থিত হইতেছে। মিঙ্গ-রাজবংশের ইতিবৃত্তে (১৩৬৮-১৫৪৩ খৃঃ অঃ) বলা হইয়াছে যে যবদ্বীপের লোকদের লিখিবার কাগজ বা পেন্সিল নাই ; তাহারা কজঙ্গ-পত্রের উপর অক্ষর খুদিয়া থাকে[১১]। ট্যাঙ্গরাজবংশের প্রাচীন ইতিহাসেও

(৬: ১০৬ খৃঃ অঃ) দ্ব-প-তন্ বা বলিদ্বীপের লেখা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ঐ স্থলের লোকেরা অক্ষরবিন্যাসে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে এবং উহারা পত্র নামক গাছের পাতায় (Lontarus domestica) অক্ষর লিখিয়া থাকে[১২]। এই অক্ষর খোদাই কাজ যে ছুরিকা দ্বারা নিষ্পন্ন হইত তাহাও চৈনিক ইতিবৃত্ত হইতেই সমর্থিত হয়[১৩]।

পূর্বেই বলিয়াছি যে যবদ্বীপের লিখিত ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হইল সংস্কৃত ভাষায় রচিত অনুশাসনলিপিগুলি। যবদ্বীপের প্রাচীন গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে উহাতে সংস্কৃত শ্লোক এবং শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে যবদ্বীপে সংস্কৃত ভাষার গভীর অনুশীলন হইত। পার্শ্বস্থ দ্বীপ সুমাত্রাতেও আমরা সংস্কৃতের প্রচলন দেখিতে পাই। সুমাত্রার পালেম্বাঙ্গ-অঞ্চলের কেদুকন বুকিতের যে-অনুশাসন লিপিটি আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি উহা পাঠ করিলে সুমাত্রার সভ্য মানুষের জীবনে সংস্কৃতের কি স্থান ছিল তাহা উপলব্ধি হইবে। এই অনুশাসনলিপিটির প্রারম্ভিক শব্দগুলি এবং 'বুলন' শব্দ ব্যতীত অন্যান্য সময়-পরিমাপক শব্দগুলি বিভক্তি বিহীন সংস্কৃতে বিরচিত। পরবর্তী তালাঙ্গ-তুবো অনুশাসন লিপিটিতেও অনেক সংস্কৃত শব্দ পরিবেশিত হইয়াছে। অনুশাসনলিপিগুলির কথা বাদ দিলেও যবদ্বীপ ও সুমাত্রায় যে গভীরভাবে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন হইত তাহার আরো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙ্গের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে।

ইৎসিঙ্গ শ্রীবিজয়ে (দক্ষিণপূর্ব সুমাত্রায়) দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি ৬৮৫ হইতে ৬৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চারি বৎসর ফো-চিতে (শ্রীবিজয়) অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি সংস্কৃত ভাষায় লেখা অনেক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্যান্টন হইতে কয়েকজন সহকর্মী সংগ্রহ করিয়া শ্রীবিজয়ে আসেন এবং সেখানে দুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। এই দুইখানি গ্রন্থই মুখ্যতঃ তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত[১৪]। অতঃপর ৬৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি পাণ্ডুলিপিগুলি চীনে প্রেরণ করিলেন এবং ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বয়ং সেখানে উপনীত হইলেন। ভারতবর্ষ এবং চীনের মধ্যে যাতায়াত করিবার সময় ইৎসিঙ্গ শ্রীবিজয়ে ছয় মাস কাল থাকিয়া শব্দবিদ্যা বা সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত য়ুন-কি, ত-ৎসিন, চেঙ্গকৌ, তও-হোঙ্গ, ফ-লঙ্গ প্রভৃতি চীনা পণ্ডিত শ্রীবিজয়ে দীর্ঘকাল থাকিয়া স্থানীয় ভাষা কৌএন-লুয়েন এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রধান কার্য ছিল বৌদ্ধ-গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া উহা অধ্যয়ন করা এবং অনুবাদ করা। ইৎসিঙ্গ বলিয়াছেন যে চীনা তীর্থযাত্রী হুইনিঙ্গ ভারতবর্ষে যাওয়ার পথে তিন বৎসরকাল হোলিঙ্গ (মধ্যজাভা) নামক স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় পণ্ডিত জ্ঞানভদ্রের সহযোগিতায় তিনি কয়েকখানি বৌদ্ধ ধর্মসংক্রান্ত পুস্তক অনুবাদ করিয়াছিলেন[১৫]। হুইনিঙ্গ এবং জ্ঞানভদ্রের এই সহযোগিতার ফলে বুদ্ধদেবের নির্বাণ-সংক্রান্ত আগমের অনুবাদ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য পালি-ধর্মশাস্ত্রে যাহা নিকায় নামে পরিচিত, সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্রে তাহাই আগম নামে সুপরিচিত। সুতরাং বুদ্ধদেবের নির্বাণ-সংক্রান্ত গ্রন্থের অনুবাদে গভীর সংস্কৃত জ্ঞান অপরিহার্য ছিল। ইৎসিঙ্গ আরো বলিয়াছেন যে এই দ্বীপাঞ্চলে অশ্বঘোষের

সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত বুদ্ধচরিত ভারতবর্ষের মতই জনপ্রিয় ছিল। দ্বীপময় ভারতের এই বৌদ্ধধর্ম মুখ্যতঃ ছিল হীনযানের মূলসর্বাস্তিবাদ শাখার। এই শাখার গ্রন্থাবলী প্রধানতঃ সংস্কৃতে রচিত হওয়ায় যবদ্বীপে এবং দ্বীপময় ভারতের অন্যত্র পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থাদি দুর্লভ। শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের কল্যাণে সুমাত্রায় সংস্কৃত-চর্চা যে গতিবেগ সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা দীর্ঘকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, কারণ আমরা সুঙ্গ-বংশের ইতিবৃত্তে পড়িতেছি যে ১০১৭ খৃষ্টাব্দে চীনা-দূতগণ এই স্থল হইতে অনেক সংস্কৃত পুঁথি স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। এই সময়ে সুমাত্রার যিনি নরপতি ছিলেন তাহাকে সুঙ্গ-ইতিবৃত্তে হিয়-চে সৌ-বৌ-চ-পৌ-মি অর্থাৎ হজি সমুদ্রভূমি (সুমাত্রার রাজা) অভিধানে ভূষিত করা হইয়াছে[১৬]। ক্রমে ভারতবর্ষে মুসলমান প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় এই সংস্কৃত চর্চায় ছেদ পড়িল। সেইজন্য সুমাত্রায় অবস্থিত অদ্বয়বর্মনের পুত্র 'কনকমেদিনীন্দ্র'[১৭] আদিত্যবর্মনের (১৩৪৩ খৃঃ) বটুবেরগুঙ্গ, অমোঘপাশ শিলালিপি প্রভৃতি 'উদ্ভট সংস্কৃতে' রচিত হইয়াছে[১৮]।

সুমাত্রার সংস্কৃতচর্চায় ক্রমশঃ ভাটা পড়িলেও মধ্যযবদ্বীপে ইহার স্রোত দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। এই স্থলের সর্বপ্রাচীন অনুশাসনলিপিগুলি যে কেবলমাত্র সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাই নহে, ঐ সংস্কৃত ভাষা শিখাইবার জন্য আবার অনুশীলনী পুস্তক, ব্যাকরণ, ছন্দশাস্ত্র, অভিধান প্রভৃতি গ্রন্থ প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় অথবা সংস্কৃত মিশ্র-যবদ্বীপীয় ভাষায় রচিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত রামায়ণ-মহাভারতের প্রাচীন যবদ্বীপীয় সংস্করণ, ঐ সমস্ত কাব্যাশ্রয়ী বিভিন্ন কাকাবিন গ্রন্থ, ধর্ম ও পুরাণ সাহিত্য, ওয়েয়াঙ্ ও রূপকথা এত অধিক সংখ্যায় রচিত হইয়াছিল যে যবদ্বীপে সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন শাখায় গভীর অনুশীলন ব্যতীত ইহা সম্ভবপর ছিল না। ইদানীং ইহা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ হইয়াছে যে কবি যোগীশ্বরের যবদ্বীপীয় রামায়ণ গ্রন্থখানি ভট্টিকাব্যের আংশিক অনুবাদ এবং আংশিক মূলানুসারী স্বকীয় সৃষ্টি। এই সমস্ত গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা যথাসময়ে করিব।

যবদ্বীপের আদিম ভাষা কিরূপ ছিল তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করিবার মত পর্যাপ্ত উপাদান বিদ্যমান নাই। তবে বিভিন্ন দ্বীপে প্রচলিত ইন্দোনেশীয় ভাষাগোষ্ঠীর বাক্যশৈলীর রূপ অনুধাবন করিলে ইহা মনে হইবে যে প্রাচীন যবদ্বীপীয় নর-নারী সহজ সরল ছোট ছোট বাক্য দ্বারা নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করিত। বস্তুতঃ কেবলমাত্র প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার নহে, প্রাচীন মালয় ভাষারও আদিম রূপ এইরূপ সহজ, নিরাভরণ এবং জটিলতাবর্জিত ছিল। ইহাতে লিঙ্গ, বচন, বিভক্তি, ক্রিয়া ও অক্রিয়ার পার্থক্য বিদ্যমান ছিল না বলিলেই হয়; ইহার জটিল বাক্য সৃষ্টি করিবার সাধ্য একান্ত সীমিত ছিল। এই সীমিত-সাধ্য যবদ্বীপীয় ভাষার উপর সংস্কৃতের প্রখর সূর্যালোক আসিয়া নিপতিত হইল। ইহার ফল হইল অসাধারণ; কারণ এই সাংস্কৃতিক সংঘাত ও সহযোগিতার ফলে যে অমৃত উঠিয়াছিল তাহাই যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের সাহিত্যে শাশ্বত রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। দুঃখের বিষয় প্রথমযুগে সংস্কৃত এবং প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার মধ্যে যে সহযোগিতা বা সংঘাত ঘটিয়াছিল, তাহার স্বরূপ বুঝিবার কোন দিগ্‌দর্শন নাই। সুতরাং এই যুগের দুই ভাষার মধ্যে সহযোগিতা ও সংঘাতের ফলে যে

অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সম্বন্ধে আমরা কেবল অনুমান করিতে পারি, কিন্তু ইহার সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিবেশন করা সম্ভব নহে। পরোক্ষ প্রমাণ যাহা বিদ্যমান তাহার মধ্যে প্রধান হইল : ১. প্রাচীনতম শিলালেখ-তাম্রশাসনে ব্যবহৃত যবদ্বীপীয় ভাষা এবং উহাতে পরিবেশিত সংস্কৃত শব্দগুলির বানান, ২. মধ্য যবদ্বীপে রচিত গ্রন্থাবলী এবং উহার আলোচ্য বিষয়। প্রমাণের স্বরূপ দেখিয়া স্বভাবতই মনে হইবে যে এইরূপ শিথিল ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কোন অচল সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর নহে। এই কথা অতীব সত্য ; সুতরাং এই বিষয়ে এস্থলে যাহা বলা হইবে তাহাকে সুসঙ্গত অনুমানের বেশী মর্যাদা দেওয়া সম্ভবপর নহে।

আমরা একথা হয়তো সহজেই স্বীকার করিয়া লইতে পারি যে যবদ্বীপে যে-সমস্ত হিন্দু-বৌদ্ধ ঔপনিবেশিক, ব্যবসায়ী বা অভিযাত্রিক আগমন করিয়াছিলেন তাহারা নিশ্চয়ই সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা বলিতেন না। তাহাদের ভাষা ছিল প্রাদেশিক বা প্রাকৃত ভাষা অর্থাৎ তাহারা ভারতবর্ষের যে অঞ্চল হইতে গিয়াছিলেন সেই অঞ্চলের ভাষাতেই তাহারা নিজেদের মধ্যে যথাসম্ভব কথোপকথন বা ভাবের আদান প্রদান করিতেন। উত্তর ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষার জননী হইল সংস্কৃত ; সুতরাং এই সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার শব্দাবলী সংস্কৃত বহুল হওয়ার জন্যে সম্ভবতঃ ঔপনিবেশিকেরা নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানে বিশেষ কোন অসুবিধা বোধ করিতেন না, তবে দক্ষিণ ভারতীয়েরা যখন দ্বীপময় ভারতে পাড়ি জমাইলেন, তখন তাহাদের ভাষার সমস্যাটা অন্যরূপে দেখা দিল। দ্রাবিড়ি ভাষা উত্তর ভারতে বা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সুপরিচিত ছিল না। সুতরাং উত্তর ভারতীয় ঔপনিবেশিক এবং দ্বীপময় ভারতের অধিবাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে দ্রাবিড় ভাষা-ভাষীদের অসুবিধা হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিয়াছিলেন সহযাত্রী ব্রাহ্মণগণ। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ইতিহাসের প্রথম প্রভাতে যে সমস্ত শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং কোন কোনটিতে ব্রাহ্মণগণ স্বকীয় মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। সম্ভবতঃ এই ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণের মধ্য যোগ-সূত্র স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ইহারাই অগ্রণী হইয়া দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারে সাহায্য করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ এই ব্যাপারে অগ্রণী হওয়ার জন্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন সাহিত্যে পালি, প্রাকৃত বা দ্রাবিড়ি ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাই ঘটনাচক্রে পড়িয়া দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে সংস্কৃতের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছে। তবে এই সংস্কৃত শব্দগুলি সর্বদা বিশুদ্ধ আকারে পাওয়া যায় নাই। যবদ্বীপীয় ভাষায় লেখা প্রাচীনতম অনুশাসনলিপিগুলির সংস্কৃত বানান অনুধাবন করিলে মনে হইবে যে এই সংস্কৃত শব্দগুলি যেন প্রাদেশিক ভাষার কথ্য-সংস্কৃত শব্দ। এইপ্রকার সংস্কৃত শব্দসম্ভার দ্বীপময় ভারতের ভাষায় ও সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত যে-সমস্ত ভারতবাসী দ্বীপময় ভারতের নারীগণকে বিবাহ করিয়া ঐ অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসী হইয়া গিয়াছিলেন তাহারাও স্বদেশী ভাষায় আংশিক ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া ভারতবর্ষাগত অপরাপর ঔপনিবেশিক বা ব্যবসায়ীগণকে এই ভাষায় দীক্ষিত করিলেন। সম্ভবতঃ অতি প্রাচীন যুগে

এই ভাষার শব্দসংখ্যাও বিপুল ছিল না ; সুতরাং এই ভাষা শিক্ষা করিতে দীর্ঘকাল লাগিবার কথা নহে।

একথা আমরা সহজেই স্বীকার করিয়া লইতে পারি যে দ্বীপময় ভারতের অগণিত নরনারী স্বদেশী ভাষাতেই কথাবার্তা বলিতেন। সুতরাং বিদেশীলোকের পক্ষে নূতন দেশে আসিয়া তথাকার প্রচলিত ভাষার কোন মৌলিক পরিবর্তন করা অসম্ভব ছিল। এই পরিস্থিতিতে সংস্কৃত এবং দেশী ভাষার সহযোগিতায় ও সংঘাতে প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার অবলুপ্তি ঘটিল না, ঘটিল উৎকর্ষসাধন। ইহারই স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে উচ্চস্তরের ভাবের জগতে। সেখানে সংস্কৃতের সাহায্য অপরিহার্য ছিল এবং এই সাহায্য গ্রহণ করিয়াই যবদ্বীপীয় ভাষায় জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণীত হইল। আমাদের উপরোক্ত মন্তব্যগুলি যদি সত্য হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষা সংস্কৃত এবং যবদ্বীপীয় ভাষার মিশ্রণ নহে : ইহা হইল ইন্দোনেশীয় বাক্য এবং রচনাশৈলীর মধ্যে সংস্কৃতশব্দের অনুপ্রবেশ। এই অনুপ্রবেশ কোন কোন গ্রন্থে সীমিত ভাবে হইয়াছে, কোন কোন গ্রন্থে হইয়াছে বন্যা-প্রবাহের মত। বস্তুতঃ যবদ্বীপীয় গ্রন্থগুলিতে আমরা সংস্কৃতের যে দিগ্বিজয়ী রূপ দেখিতে পাই তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে ডঃ যুইনবল কর্তৃক সঙ্কলিত এক যবদ্বীপীয় ডচ্ ভাষার অভিধান হইতে। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে ঐ অভিধানে ৬৭৯০টি সংস্কৃত শব্দ আছে এবং যবদ্বীপীয় শব্দের সংখ্যা হইল ৬৯২৫। মালয় অভিধানগুলিতেও সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা ৭৫০টির কম হইবে না[১৯]। ডঃ গণ্ডা যবদ্বীপের ব্রহ্মাণ্ড পুরানের কথা আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে উহার কোন কোন পৃষ্ঠায় সংস্কৃত ও দেশী শব্দের আনুপাতিক সংখ্যা যথাক্রমে ৪ ও ৯। প্রাচীন যবদ্বীপীয় কাব্যগুলিতে এই অনুপাত ১ : ৪ বা ২:৭[২০]। মধ্যযুগের কিদুঙ্ সুন্দের রচনায় সংস্কৃত ও দেশী শব্দের হার যথাক্রমে ১ : ৪ হইবে[২১]।

বহুদিন পূর্বে ডঃ ব্র্যাণ্ডেস[২২] যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত প্রাচীনতম শিলালেখ-তাম্রপত্রে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের পর্যালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে উহাতে সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং উহার বানানও শুদ্ধ নহে। পরবর্তী যুগের অনুশাসনলিপিগুলিতে সংস্কৃত শব্দ সংখ্যার যেমন বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয় যেমনি উহার বানানও প্রায় নির্ভুল। ইহা হইতে এই অনুমান করাই স্বাভাবিক যে (ক) সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ প্রথম যুগ অপেক্ষা দ্বিতীয় যুগে ব্যাপকতর হইয়াছিল এবং (খ) দ্বিতীয়পর্বে সংস্কৃত ভাষার গভীরতর অনুশীলনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। দ্বিতীয় যুগের সংস্কৃত-শব্দ শ্রুতিলিখন পর্যায়ের নহে। (গ) তৃতীয় এবং শেষ পর্বে আমরা যবদ্বীপে এবং সুমাত্রায় সংস্কৃত রচনায় যে-নিদর্শন পাই তাহাতে ব্যাকরণ, বানান প্রভৃতি বিষয়ে অনেক ভুলভ্রান্তি পরিদৃষ্ট হয়। এই যুগে, বিশেষতঃ মজপহিত যুগে যে অজস্র সংস্কৃত শব্দ দৈনিক কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হইত তাহা সম্ভবতঃ যবদ্বীপীয় কথ্য-রীতির সহিত যথাসম্ভব সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়াই উচ্চারিত হইত[২৩]। অর্থাৎ এই যুগের সংস্কৃত শব্দ যবদ্বীপের স্থায়ী ভাষাসম্পদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং কথ্য ভাষার প্রভাবে এই যুগের সংস্কৃত শব্দের বহুল রূপান্তর ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয় পর্ব

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে হিন্দু আধিপত্যের যুগে যবদ্বীপের রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র প্রথমে পশ্চিম যবদ্বীপে ছিল। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিরচিত পূর্ণবর্মনের সংস্কৃত অনুশাসন-লিপি এই রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিচায়ক। তাঁহার রাজধানী ছিল তারুম নগরে। এই তারুম রাজ্যটি সম্ভবতঃ ৭ম শতাব্দীতেও বিদ্যমান ছিল, কারণ ত্যাঙ্গ-বংশের নূতন ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে যে তো-লো-মো বা তারুম হইতে ৬৬৬-৬৬৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনদেশে দূত প্রেরিত হইয়াছিল[২৪]। এই দুইশত বৎসর পশ্চিম যবদ্বীপের রাজদরবারে সংস্কৃত চর্চা আদৌ হইত না ইহা কল্পনা করা দুঃসাধ্য, কিন্তু ইহা প্রমাণ করাও আবার অসম্ভব।

পশ্চিম যবদ্বীপের রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র অবশেষে মধ্য যবদ্বীপে চলিয়া গেল ; ইহা সম্ভবতঃ সপ্তম শতাব্দীর ঘটনা। যে তারুম রাজ্যটিকে আমরা পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে একবার বিস্ময়চকিত নেত্রে দেখিয়াছিলাম তাহা সপ্তম শতাব্দীর ষষ্ঠদশকে একবার দেখা দিয়া কাল-সমুদ্রে বিলীন প্রায় হইয়া গেল। এই সময়েই ঘটিল হো-লিঙ্গ বা মধ্যজাভার অভ্যুত্থান। পশ্চিম যবদ্বীপের নেপথ্য গমন এবং মধ্যজাভার উত্থানের মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে কিনা এবং থাকিলে তাহার তাৎপর্য কি তাহা বর্তমানে আর আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা এস্থলে শুধু এইটুকু স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে তুকমাস শিলালিপির ব্রাহ্মণ্যধর্ম ডিয়েঙ্গ উপত্যকার স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য, হুইনিঙ্গ-জ্ঞানভদ্রের শাস্ত্রালোচনা যে সংস্কৃতির স্বাক্ষরবহ তাহাতে মনে হয় যে মধ্য যবদ্বীপে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশলাভ করিবার পরিবেশ যথেষ্ট অনুকূল ছিল। এই স্থলে ইন্দোনেশীয় এবং ভারতীয় সভ্যতার সংঘাতে একদিকে ভাষা ও সাহিত্য এবং অন্যদিকে শিল্পের সৃষ্টি হইল। সামাজিক জীবনেও সম্ভবতঃ এই সময়ে এক বিপুল আলোড়ন দেখা দিয়াছিল। এই আলোড়ন ছিল সুদূর প্রসারী এবং ইহা প্রায় তিন শতাব্দীকাল ব্যাপিয়া উচ্চতর সমাজ-জীবনে, চিন্তায় এবং আদর্শে বিপুল পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছিল। সম্ভবতঃ ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ব্যাকরণ-অভিধান রচনা, সংস্কৃত শিখিবার অনুশীলনী পুস্তক মধ্য-যবদ্বীপের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কালেই সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যুগে কোন্ কোন্ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে বলিবার উপায় নাই। মধ্যজাভার প্রাধান্যকাল যদি আমরা ৭০০-৯২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ করি তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে এই যুগে সম্ভবতঃ তিনখানি মাত্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই বিষয়েও অবশ্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে অমরমালা নামক কোষ গ্রন্থখানি অন্যতম এবং ইহা রাজা জিতেন্দ্রের নির্দেশানুযায়ী রচিত হইয়াছিল বলিয়া এই গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। এই সমস্ত গ্রন্থের আলোচনা আমরা পরে করিব। অন্য দুইখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে মতভেদ আরো তীব্রতর এবং ইহাদের কথা পরে আলোচনা করিব।

পূর্ব জাভার প্রাধান্য স্থাপিত হয় দশম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ হইতে, কিন্তু এই সময় হইতে রাজা ধর্মবংশের শাসনকালের পূর্ব পর্যন্ত (৯২৫-৯৯০ খৃষ্টাব্দ) আর কোন যবদ্বীপীয় গ্রন্থ

রচিত হইয়াছিল কিনা তাহা আজ বলিবার উপায় নাই। দশম শতাব্দীর শেষভাগে ধর্মবংশের রাজত্বকাল হইতে যবদ্বীপীয় সাহিত্যের উন্নতির যুগ আরম্ভ হইল। এই যুগ আনুমানিক ১০০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এই যুগে কদিড়ি, সিঙ্গসারি এবং মজপহিত রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করে। এই সাহিত্য সৃষ্টিতে পূর্ব-যবদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিভিন্ন স্তরের লোক সহযোগিতা করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ গ্রন্থই তারিখ বিহীন এবং ইহাদের রচনাস্থল কোথায় তাহাও নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। এই অনিশ্চয়তার জন্য এই সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতির ইতিহাস লেখা অত্যন্ত দুঃসাধ্য এবং ইহার সময়ও সম্ভবতঃ সমাগত হয় নাই। যাহাই হউক, মজপহিত যুগের পরেও এই ভাষায় আরো প্রায় দুইশত বৎসর কাল অর্থাৎ ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সাহিত্যের প্রাণ ছিল না। প্রাক্-মুসলিম যুগের এই সাহিত্যই প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্য নামে পরিচিত। দুঃখের বিষয় এই সাহিত্যে সমসাময়িক নরনারীর জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখের চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রাচীন যুগের শিলালেখ, তাম্রশাসন এবং সাহিত্যের মাধ্যমেই আমরা প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার পরিচয় লাভ করি। যদি আমরা দশম-একাদশ শতাব্দীর রচনার সহিত চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা তুলনা করি তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে যবদ্বীপীয় ভাষায় এই চারিশত বৎসরের মধ্যে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয় নাই। তবে কথ্য এবং দরবারী বা সাহিত্যিক ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান ছিল সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। মজপহিত যুগের দলিলগুলিতে যে-ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার সহিত যদি আমরা সমসাময়িক দরবারী বা সাহিত্যিক ভাষার তুলনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে শেষোক্ত ভাষায় প্রাচীনত্বের ছাপ রহিয়া গিয়াছে। এইদিক হইতে বিচার করিলে মনে হইবে যে দলিলগুলির মধ্যে প্রগতিশীলতার পরিচয় রহিয়াছে এবং ইহার মধ্যে আধুনিক যুগের স্বাক্ষর যেন অনেকটা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। ডঃ পিগো বলিয়াছেন যে চতুর্দশ শতাব্দীতেই মধ্য এবং পূর্ব যবদ্বীপের বাচনভঙ্গীতে পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছিল; তবে বর্তমানে উভয় অঞ্চলের বাচনভঙ্গীতে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহা মজপহিত যুগেও বিদ্যমান ছিল কিনা তাহা বলা দুঃসাধ্য। ইহা সম্ভব মনে হয় যে মজপহিত অঞ্চলে এবং ব্র্যান্টাস নদীর ভাটার অঞ্চলে যে বাচনভঙ্গী বিদ্যমান ছিল তাহার সহিত উক্ত নদীর মধ্য-অঞ্চলের কদিড়ি-বাচনভঙ্গীর পার্থক্য বিদ্যমান ছিল[২৫]।

মুসলমান আক্রমণের ফলে অবশেষে এই গৌরবময় সাহিত্যের উপর এক হিসাবে যবনিকাপাত হইল (১৬০০ খৃষ্টাব্দ)। মুসলমান আক্রমণের মুখে (১৫১৩-১৫২৮ খৃষ্টাব্দ) পর্যুদস্ত হইয়া মজপহিতের রাজা, রাজসভাসদগণ এবং অনেক হিন্দু বৌদ্ধ নরনারী বলিদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন[২৬]। তাহারা সঙ্গে লইয়া গেলেন তাহাদের লণ্টার-পুথিপত্র। দেশ-ত্যাগের এই হিড়িক সত্ত্বেও পশ্চাতে রহিয়া গেলেন পূর্ব যবদ্বীপের ব্রম-পর্বতের চতুষ্পার্শ্বস্থ তেঙ্গের-সম্প্রদায়। তাহারা মুসলমান গণ-সমুদ্রে আজিও প্রাচীনধর্ম আকড়াইয়া রহিয়াছেন[২৭]।

পূর্ব-যবদ্বীপের যে সমস্ত নরনারী বলিদ্বীপে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে বলিদ্বীপীয় অধিবাসীগণ ইতিপূর্বেই হিন্দুসভ্যতার আশীর্বাদ লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ জাভা এবং বলিদ্বীপের রাজপরিবারের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন (উদয়ন-মহেন্দ্রদত্তা : ৯৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে) এবং পরবর্তী যুগে বলিদ্বীপের উপর পূর্ব যবদ্বীপের আধিপত্য স্থাপনের জন্য এই দুই দ্বীপের মধ্যে পূর্ব হইতেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। সুতরাং উভয় দ্বীপই কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় সভ্যতা পরিগ্রহণ করায় যবদ্বীপের শরণার্থীদল বলিদ্বীপে আসিয়া একান্ত অসহায় বোধ করিলেন না। বলিদ্বীপাগত শরণার্থী সাহিত্যিকগণ কিন্তু তাহাদের সাহিত্য-চর্চা পরিত্যাগ করিলেন না। মধ্যযুগের ঐতিহাসিক সাহিত্য আলোচনা করিবার সময় আমরা এই বিষয়টি আরো বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিব। আপাততঃ এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই শরণার্থীদল এবং তাহাদের সহযোগী বন্ধুগণ বলিদ্বীপে যে সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন তাহাই মধ্যযুগীয় জাভানীজ সাহিত্য নামে পরিচিত হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যের পরিপূরক এবং সেই যুগের ঐতিহ্যের উত্তর-অববাহিকা। এই সমস্ত শরণার্থীর সঙ্গে যে-সমস্ত প্রাচীন যবদ্বীপীয় পুঁথিপত্রাদি আসিল তাহা আবার বলিদ্বীপে নকল করা হইতে লাগিল। সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলিদ্বীপে নকল করা এই সমস্ত গ্রন্থাদি অনেক সময় যবদ্বীপে প্রাপ্ত গ্রন্থাদি অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য। ইহার কারণ হইল যবদ্বীপীয় নকল নবীশগণ মুসলিম আধিপত্যের কালে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগবিদ্যা ভুলিয়া গেলেন; সুতরাং তাহারা অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতশব্দ পরিবর্তন করিয়া সেইস্থলে এমন শব্দ বিন্যাস করিলেন যাহাতে সংস্কৃতের ছন্দ-সুষমা নষ্ট হইয়া গেল। অনেক ক্ষেত্রে তাহারা প্রাচীন যবদ্বীপীয় ব্যাকরণকেও গ্রাহ্যের মধ্যে আনয়ন করেন নাই। অবশ্য বলিদ্বীপীয় নকল-নবীশগণ যে একেবারে ভুলত্রুটি করেন নাই তাহা নহে : কোন কোন সময় তাহাদের হস্তে সংস্কৃত শব্দ বিকৃত হইয়া যবদ্বীপীয় রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। এই বিকৃতরূপ বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয় সেই সমস্ত গ্রন্থে যেখানে যবদ্বীপী কিম্বদন্তীই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ঐ সমস্ত গ্রন্থে ভারতীয় ঐতিহ্য, ধর্ম এবং সাহিত্যের প্রভাব বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু বলিদ্বীপীয় নকলনবীশগণ ইহাকে কোথাও কোথাও বিকৃত রূপ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ আছে। ইহাও অসম্ভব নহে যে এই শ্রেণীর কোন কোন গ্রন্থ হিন্দু প্রভাব পরিমণ্ডলের অনেকটা বাহিরে রচিত হইয়াছিল[২৮]। যাহাই হউক, বলিদ্বীপাগত জাভানীজ শরণার্থীগণের প্রচেষ্টায় একদিকে যেমন প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্য সুরক্ষিত হইয়াছে, তেমনি আবার ইহারা এবং ইহাদের সহযোগী লেখকগণের সাহিত্য-সাধনায় বলিদ্বীপে এক নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাই মধ্যযুগের যবদ্বীপীয় সাহিত্য নামে পরিচিত। এই সাহিত্যের ধাত্রী হইল বলিদ্বীপ।

মধ্যযুগের এই সাহিত্যের মধ্যে স্বদেশী-ছন্দে বিরচিত কাব্যগুলি কিদুঙ্ নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইহাতে যে-সমস্ত বিষয়বস্তু আলোচিত হইয়াছে তাহা স্বদেশী। এই বিষয়বস্তুগুলি সাধারণতঃ ইতিহাস, কিম্বদন্তী এবং অনুরূপ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই

কাব্যগুলি সংস্কৃত ছন্দে বিরচিত কাকাবিনগুলির মত এতটা সু-অলঙ্কৃত নহে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার সহজ অনাড়ম্বর আকর্ষণ জনসাধারণকে যুগে যুগে মুগ্ধ করিয়াছে। বস্তুতঃ ইহার জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে আমরা বৃহস্পতিতত্ত্বে একস্থলে পড়িতেছি[২৯] :

'...তাহারা স্বামী বা স্ত্রী পরিগ্রহণ করিয়াই সুখী ; বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গত, কিদুঙ্ এবং গুপিত-গুপিতন কবিতাবলী শুনিয়া সুখী।' বলিদ্বীপে আজিও কাকাবিন এবং কিদুঙ্‌কে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ইতিহাসের মধ্যে আছে : (ক) পর্ব (খ) কাকাবিন (সংস্কৃত ছন্দ) (গ) কিদুঙ্ (স্বদেশী তেনগহণ ছন্দ) এবং (ঘ) গগুরিতন (স্বদেশী মচপৎ ছন্দ)[৩০]।

কিদুঙ্-সাহিত্যের সূচনা সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীতে। পররতন[৩১] নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে বুকির পোলমন (মৎস্য-সরোবর পর্বত) নামক একখানি কিদুঙ্-গ্রন্থের উল্লেখ আছে। উহার রচয়িতা ছিলেন হাজি জয় কৎবঙ্গ। তিনি ছিলেন কদিড়ির শেষ নরপতি এবং তিনি মঙ্গোল সম্রাট কুবলাই খান প্রেরিত চীনা সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া ১২৯৩ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হইয়াছিলেন। ডঃ পিগো[৩২] অনুমান করিয়াছেন যে জয়কৎবঙ্গ যখন জুঙ্গলুহ্ নামক স্থানে নির্বাসিতের জীবন যাপন করিতেছিলেন তখন তিনি হয়তো স্বদেশী ছন্দে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সংস্কৃত এবং স্বদেশী ছন্দের মধ্যবর্তী যে তেনগহণ ছন্দ বিদ্যমান তাহার উৎসস্থলই ছিল কদিড়ি। কদিড়ি নামক একটি স্বদেশী ছন্দও বিদ্যমান ; সম্ভবতঃ ইহাও কদিড়িতেই বিকাশলাভ করিয়াছিল। মধ্যযুগীয় যবদ্বীপের আর একটি চারণ-ছন্দের নাম হইল বুকির, উকির বা অদ্রি। বাহ্যতঃ মনে হয় যে রাজা জয়কৎবঙ্গ এবং কদিড়ির নামের সহিত প্রথমযুগের কিদুঙ্ সাহিত্য এত অচ্ছেদ্য-বন্ধনে আবদ্ধ যে ইহার সৃষ্টিতে উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। যদি এই সাহিত্যের সৃষ্টি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হইয়া থাকে তাহা হইলে আমরা বলিব যে চতুর্দশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে এই কিদুঙ্-রচনা এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে হয়ম ভুরুক (১৩৬৫ খৃঃ) পেনঙ্গুঙ্গ পর্বতের অপূর্ব সৌন্দর্য অবলোকন করিয়া স্বয়ং স্বদেশী ছন্দে কিদুঙ্‌কাব্য রচনা করিয়াছিলেন[৩৩]। তিনি একদা সমুদ্রের সৌন্দর্য বর্ণনা করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন[৩৪] ; উহা বিরচিত হইয়া থাকিলে সম্ভবতঃ উহা কিদুঙ্-কাব্যেই রূপায়িত হইয়াছিল। এই সমস্ত কিদুঙ্ কাব্য যাহারা গাহিতেন তাহাদিগকে প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যে বিদু-মঙ্কিদুঙ্গ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ নাগরকৃতাগমের বিভিন্ন স্থলেই গীত এবং কিদুঙ্ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই কিদুঙ্ কাব্যগুলি অনেক সময় সঙ্গীতরূপে পরিবেশিত হইত। এই প্রকার স্বদেশী ছন্দের আরো নিদর্শন পাই মালয় পন্তুন এবং যবদ্বীপীয় পরিকন শ্রেণীর রচনায়। এই শেষোক্ত শ্রেণীর রচনা যবদ্বীপের আন্তর্জাতিক বন্দর-অঞ্চলে বিকাশ লাভ করিয়াছিল বলিয়া পিগো মনে করেন[৩৫]।

যবদ্বীপের হিন্দু-বৌদ্ধ এবং সাহিত্যিক সমাজের অনেকেই বলিদ্বীপে চলিয়া আসিলেও যবদ্বীপের সাহিত্য অবলুপ্ত হইল না : উহা নূতনরূপ পরিগ্রহণ করিল। মধ্য যবদ্বীপের নূতন মুসলিম রাজ্য মতরামে নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। এই নূতন সাহিত্যের শব্দসম্ভার, বানান এবং রচনাশৈলী প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার সহিত সর্বদা সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে ; সুতরাং এই সাহিত্যকে

আমরা নিঃসন্দেহে নূতন যবদ্বীপীয় ভাষার মর্যাদা দিতে পারি। বলিদ্বীপে লালিত মধ্যযুগীয় সাহিত্য যেমন প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যেরই বিবর্তিত রূপ এবং উহার সহিত অচ্ছেদ্য-বন্ধনে আবদ্ধ, নূতন যবদ্বীপীয় সাহিত্যটি ঠিক তাহা নহে, ইহার সহিত প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যের বন্ধন যেন অনেকটা শ্লথ। নূতন যবদ্বীপীয় ভাষা এবং সাহিত্য মধ্য যবদ্বীপের মতরাম রাজ্য এবং উহার পার্শ্বস্থ অন্যান্য স্থলকে কেন্দ্র করিয়া বিকাশত হইয়াছে। যবদ্বীপে মুসলমান প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নূতন যবদ্বীপীয় সাহিত্যের স্বরূপ এবং প্রকৃতি অনেকটা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। পূর্বে যেস্থলে গ্রন্থের উপজীব্য বিষয় ছিল হিন্দু ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি, এখন সেস্থলে স্বাভাবিকভাবেই ঐশ্লামিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হইল। ঐশ্লামিক পরিমণ্ডল সর্বদা খাদবিহীন ছিল না: ইহার মধ্যে পঞ্জি, দমর-বুলন, ইসলাম ধর্মের নায়কগণ, হিন্দু দেবদেবীগণ একত্র মিলিত হইয়া যেন এক নূতন সাহিত্যের উদ্বোধন করিলেন। মজপহিতের পতনের পর হিন্দু সাহিত্য-সমাজ প্রধানতঃ বলিদ্বীপে চলিয়া যাওয়ায়, যবদ্বীপে যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহাকে অবলম্বন করিয়াই এবং কোথাও কোথাও ইহাতে নূতন উপাদান সংমিশ্রণ করিয়া এই নূতন সাহিত্য গঠনের কাজ চলিল। প্রশাসনিক ব্যাপারের জন্য প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরাচত কোন কোন গ্রন্থের নূতন যবদ্বীপীয় অনুবাদ প্রকাশিত হইল। রাজাদের বংশপঞ্জীতেও যথাসম্ভব কৌলিন্যের ছাপ লাগানো হইল। নবীন যুগের এই সাহিত্যের সৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশিত হইয়াছে। ডঃ হ্যাজো বলিয়াছেন[৩৬] যে এই সাহিত্য-রচনাতে প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যের অনুকরণ করিবার নিষ্ফল প্রয়াস অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র এবং ইহার বিকৃতির জন্য ঐশ্লামিক প্রভাবই দায়ী। ডঃ বের্গ[৩৭] কিন্তু এই অভিমত গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই। তিনি বালয়াছেন যে মতরামের নবীন রাজ্যে যে নূতন যবদ্বীপীয় সাহিত্য সৃষ্টি হইল তাহা আদৌ অভিনব নহে: ইহা মধ্যজাভার প্রাচীন সাহিত্যিক প্রচেষ্টার পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস ব্যতীত আর কিছুই নহে। মধ্য জাভাতে ৬/৭ শত বৎসর পূর্বে অমরমালা প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। নূতন সুলতানদের আমলে মধ্যজাভায় আবার নূতন করিয়া রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতির কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বহু শতাব্দীর পর আবার সেখানে নূতন করিয়া প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিল। সুতরাং নূতন যবদ্বীপীয় সাহিত্য মধ্য জাভার প্রাচীন সাহিত্যিক ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকারী। তবে প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্য এবং আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে যেটুকু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তাহা ঐতিহাসিক কারণেই ঘটিয়াছে। একথা অবশ্য ঠিক যে নবম দশম শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্য যবদ্বীপের সাহিত্য সাধনার ইতিহাস আমাদের নিকট অজ্ঞাত। এই সময়ের রাজনৈতিক কেন্দ্র পূর্ব যবদ্বীপে স্থিতিলাভ করায় মধ্যযবদ্বীপের সাংস্কৃতিক জীবনও অনেকটা পঙ্গু হইয়া গিয়াছিল। তথাপি ইহা কল্পনা করা দুঃসাধ্য যে রাজনৈতিক কেন্দ্র পূর্ব যবদ্বীপে চলিয়া যাওয়ার জন্য মধ্য যবদ্বীপের সমস্ত সংস্কৃতি এবং সাহিত্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। বরঞ্চ এইটুকু অনুমান করা চলে যে ৯০০-১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে-সাহিত্য রচিত হইয়াছিল তাহার মূল্য এরূপ ছিল না যে তাহা কালের কষ্টিপাথরে স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে। এই অভিমত যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহা হইলে আমরা ডঃ হ্যাজো এবং ডঃ

বের্গের অভিমত কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপে গ্রহণ করিতে পারি : অর্থাৎ নূতন যবদ্বীপীয় সাহিত্য প্রাচীন মধ্য-যবদ্বীপীয় সাহিত্যের উত্তরাধিকারী, কিন্তু সাহিত্য সাধনার এই নূতনযুগের লেখকগণ পূর্ব যবদ্বীপের সমৃদ্ধ সাহিত্যকে যথাসম্ভব অনুকরণ করিয়া, প্রয়োজনবোধে ইহাকে যুগোপযোগী করিয়া লইয়া ইহাকে কতকটা নূতনরূপে পরিবেশন করিয়াছেন। এই প্রয়াসের নিদর্শন স্বরূপ আমরা প্রণীতি রাজ কপকপের উল্লেখ করিতে পারি[৩৮]। নূতন যবদ্বীপীয় সাহিত্য এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নহে বলিয়া এই সম্বন্ধে আর বিস্তৃততর আলোচনা আবশ্যক নহে।

পাদটীকা

১. Teeuw, *Het Bhomakavya,* Groningen, 1946 p. 1 , C. Hooykaas, *VKI,* 16 (1955) pp. 6-7.

২. ছন্দ বিপুলাবক্ত্র :

⏑⏑–⏑⏑––⏑̄/⏑̄ ––⏑⏑ –⏑⏑

৩. এই সমস্ত অনুশাসনলিপি সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য : Coedes in BEFEO, XXX, pp. 29-80 , Ferrand in *J. As* 1932, pp. 271-326 ; Van Ronkel in *Acta Orientalia,* vol, II, p. 12 ; Krom in *TBG* 59, p. 426 ; Kern, *VG VII* p. 205. See also Coedes, *Les etats* etc. p. 142 ff.

৪. এই ভাষার আলোচনা সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য : Ferrand, Le K'ouen-louen cf. les anciennes navigations interoceaniques dans les mers du sud in *Journal Asiatique,* 1919, March-April, pp. 239-333 , May-June, pp. 431-492 ; July-Aug., pp. 5-68 , Sept-Oct., pp. 201-241 ; S. Levi, in *BKI,* 88 (1931) pp. 621-27 ; Krom, *Geschiedenis,* 2nd., ed., p. 110 , R. C. Majumdar, *Journ. Greater Ind. Soc.*, III, 1936, p. 86 ; Coedes, *Les etats* etc., pp. 26-27, 31. মধ্য এশিয়ার ভিক্ষু লি-যেন ৭ম-৮ম শতাব্দীতে সম্পাদিত একটি সংস্কৃত-চীনা কোষগ্রন্থে দ্বীপান্তর এবং কুন-লুন শব্দটিকে সমার্থবোধক হিসাবে পরিগ্রহণ করিয়াছেন। পাণিনীয় অভিজ্ঞান অনুযায়ী আমরা দুইদিকে জলবেষ্টিত স্থলকেও যদি দ্বীপ বলি তাহা হইলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এইরূপ অঞ্চল এবং সমুদ্রক্রোড়ে লালিত দ্বীপগুলিও কুন-লুন বা কুয়েন-লুয়েন আখ্যা পাইতে পারে। এই যুক্তি যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা হইলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যেখানে ২ অষ্ট্রোনেশীয় ভাষার বিভিন্ন শাখা বিদ্যমান ছিল সেই সমস্ত স্থান এই অভিজ্ঞান বা নামের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। এইরূপ অঞ্চলের ভাষা Proto-Old Malay ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

৫. তারিখ সম্বলিত অনুশাসনলিপিগুলির তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য : Van Stein Callenfels, *OV* 1924, pp. 28-35 ; Stutterheim, *Oudheden van Bali* I (1929) p. 190 ff.

৬. Vide Groeneveldt, *Notes on the Malay Archipelago and Malacca,* p. 12.

৭. Vide Chhabra in *JASBL* I (1935), p. 63.

৮. B. R. Chatterji, *Indian cultural influence in Cambodia,* p. 110.

৯. Kern, *VG* VII, p. 67 ff. ; Krom, *Geschiedenis,* p. 5 ; Gonda, *op. cit.*, p. 32.

১০. P, J. Zoetmulder, The Old-Javanese poet and his craft, read at XXVI International Congress of Orientalists, 1964, New Delhi.

১১. Groeneveldt, *Notes on the Malay Archipelago and Malacca*, p. 40. কজঙ্গ বিভিন্ন প্রকার ভূর্জ্জপত্রের সাধারণ নাম, লেখক নিশ্চয়ই যবদ্বীপের লণ্টার (lontar) পত্রের কথা স্মরণ করিয়া ইহা লিখিয়াছেন।

১২ *Ibid*, p. 58.

১৩. *Ibid*, p. 135.

১৪. (ক) *Mémoire composé a l'époque de la grande dynastie T'ang sur les Religieux Eminents qui allerent chercher la loi dans les pays d'occident* par I-tsing. Translated by E. Chavannes, Paris, 1894. (খ) *A Record of the Buddhist religion as practised in India and the Malay Archiplago* (671-695) by I-tsing. Translated by J. Takakusu (Oxford, 1896).

১৫. E. Chavannes, *op. cit*, p. 60.

১৬. Groeneveldt, *Notes*, p. 65, Ferrand, *J. As*, 1922, pp. 19-20; Krom, *Geschiedenis*, p. 249.

১৭. Kern, VG *VII* p. 219.

১৮. এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : Kern in *OV* 1912, pp. 51-2, *TBG* 1921, pp. 199-200.

১৯. দ্রষ্টব্য Gonda : *Sanskrit in Indonesia*, pp. 115-6.

২০. *Ibid* pp. 119, 120.

২১. *Ibid* p. 121.

২২. *TBG* XXXII (1889) p. 112 ff., 129 ff; Krom, *Geschiedenis*, p. 94.

২৩. Cf. Pigeaud in *Java in the Fourteenth Century*, vol. IV, p. 181.

২৪. Pelliot, *Deux itineraires*, *BEFEO* IV p. 284.

২৫. Pigeaud in *Java in the Fourteenth Century*, vol. IV p. 513.

২৬. কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার এই ব্যাপারের গুরুত্ব হ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু যাহারা মুসলমান আক্রমণের মুখে বিহারের বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলির নির্মম উৎসাদন ব্যাপার পাঠ করিয়াছেন তাহারা ইহাতে আশ্চর্য হইবেন না। আমরা চৈনিক ইতিবৃত্তে এই ঘটনার সুস্পষ্ট আভাষ পাই। *Tung Hsi Yang K'au* (1618 A. D.) নামক গ্রন্থের Book IV-এ লেখা আছে : "Modjopait (মজপহিত) has vanished also, having been destroyed in the wars which accompanied the introduction of the Islam" দ্রষ্টব্য Groeneveldt, *Notes on the Malay Archipelgo and Malacca*, (1876) p. 56.

২৭. ইহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : Bernet Kempers and Tjan Tjoe Siem in *TBG* 84 (1950).

২৮. Vide Gonda, *Sanskrit in Indonesia*, pp. 229-31.

২৯. Ed. Sudarshana Devi, *Bṛhaspati Tattwa*, p. 51.

৩০. C. Hooykaas in *VKI* dl. 16 (1955), p. 6 fn. 10.

৩১. Ed. Brandes-Krom, *VBG* 62 (1920), pp. 24-33.

৩২. Pigeaud, *Java in the Fourteenth Century*, vol. IV, pp. 44-45.

৩৩. নাগরকৃতাগম ৫৮ / ১.

৩৪. নাগরকৃতাগম ৩০ / ১.

৩৫. Pigeaud *op. cit.*, p. 501. ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন (*Sanskrit in Indonesia*, p. 109) যে পন্তুনগুলি গদ্যও নহে, পদ্যও নহে। ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা গদ্য এবং পদ্য রচনার পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল।

৩৬. Hazeu, *Oud en Nieuw uit de Javaansche Letterkunde* (1921), pp. 6-7.

৩৭. Berg—*Hoofdlijnen*, pp. 16-17.

৩৮. Vide Pigeaud, *Java in the Fourteenth Century*, II, pp. 128-29.

চতুর্থ অধ্যায়

বৈদিক সাহিত্য

যবদ্বীপ তথা বলিদ্বীপের ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনা করিতে গিয়া যে জিনিষটি প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইল ইহার বিস্ময়কর ব্যাপকতা। ভারতবর্ষ হইতে সহস্র সহস্র মাইল দূরে সংস্কৃত ভাষার চন্দ্রাতপতলে জাতীয় সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় এত গ্রন্থ প্রাচীনকালে রচিত হইয়াছিল যে ইহা ভাবিলে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কির্ত্যা লাইফ্রিক্ষ ভান দের তুক নামক প্রতিষ্ঠান হইতে বলিদ্বীপের সাহিত্য সম্বন্ধে একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল[১]। এই তালিকাতে বলিদ্বীপে প্রাপ্ত প্রাচীন সাহিত্যকে ছয়টি শাখাতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা (১) বেদ (ঐ নামে বলিদ্বীপে যাহা প্রচলিত), মন্ত্র, কল্পশাস্ত্র: ১৭৭টি পুঁথি (২) আগম বা ধর্মশাস্ত্র, শাসন এবং নীতিসাহিত্য: ৬৩টি পুঁথি (৩) বরিগ অর্থাৎ জ্যোতিষ, উপদেশ (তুতুর), সৃষ্টিতত্ত্ব, কাণ্ড বা ব্যাকরণ, ছন্দ, উপকথা, বৃত্তিমূলক (professional) সাহিত্য, উষদ: ৫৯২টি পুঁথি (৪) ইতিহাস; ইহার মধ্যে আছে গদ্যে রচিত পর্ব, কাকাবিন বা সংস্কৃত ছন্দে বিরচিত কাব্যগ্রন্থ; কিদুঙ্ বা স্বদেশীছন্দে রচিত স্বদেশী কাহিনী; গগুরিতন: পুঁথিসংখ্যা ১৫৯ (৫) বাবাদ বা ঐতিহাসিক গ্রন্থ; ইহার মধ্যে পমঞ্চঙ্গ বা বংশাবলী আছে: পুঁথি সংখ্যা ৩৫ (৬) তন্ত্রি বা গল্প-কাহিনী; ইহার উৎস সংস্কৃত ও স্বদেশী আখ্যায়িকা: পুঁথিসংখ্যা ৯। এতদ্ব্যতীত ডঃ পুর্বচরকপ্রমুখ পণ্ডিতগণের সম্পাদনায় ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ইন্দোনেশীয় পুঁথিগুলির আর একটি বিবরণও প্রকাশিত হইয়াছে[২]। আমরা উপরোল্লিখিত সাহিত্য-বিভাগকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় রচনা করিলাম।

প্রথমেই আমরা ধর্ম সংক্রান্ত পুঁথিগুলি আলোচনা করিব। ভারতীয় সাহিত্যের উষালগ্নে বেদগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; সুতরাং যবদ্বীপের প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিতে গিয়া আমরা প্রথমেই বেদ এবং বৈদিক সাহিত্যের অনুসন্ধান করিব। বহুদিন পূর্বে ডঃ ফ্রিড্‌রিখ দ্বীপময় ভারতে বেদের অনুসন্ধানকার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন[৩]। তিনি বলিয়াছেন যে বলিদ্বীপে চারিটি বেদ ছিল। উহার নাম হইল (১) ঋগ্বেদ, (২) যর্জুবেদ, (৩) লমবেদ এবং (৪) অর্তব বেদ[৪]। তিনি আরো বলিয়াছেন যে এই বেদগুলি ভগবান ব্যাস কর্তৃক রচিত এবং উহাতে গৃহপূজা

এবং বৃহৎ উৎসবের প্রার্থনার মন্ত্র বিদ্যমান ছিল। ফ্রিড্‌রিখের এই অভিমত সত্য নহে, কারণ তাঁহার সময় হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত গভীর অনুসন্ধান করিয়াও বেদাদি গ্রন্থ যবদ্বীপ-বলিদ্বীপে আবিষ্কৃত হয় নাই। বলিদ্বীপে যে চতুর্বেদ পাওয়া গিয়াছে তাহা বস্তুতঃ ভারতীয় চতুর্বেদ নহে।

বলিদ্বীপের পুরোহিত সম্প্রদায় অনেক সময় বেদ, চতুর্বেদ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই 'বেদ'-শব্দ দ্বারা হিন্দু-যবদ্বীপীয় যুগে সম্ভবতঃ তুকতাক্ জাতীয় মন্ত্রাদি বুঝিত। ডঃ গোরিস বলিয়াছেন[৫] যে বলিদ্বীপের লোকেরা বেদ-শব্দদ্বারা যে তুকতাক্-জাতীয় মন্ত্রাদি বুঝিত তাহার পরিচয় রহিয়াছে বিবাহ নামক কাব্যে ; কারণ উহাতে যে গূঢ়-মন্ত্র (তুকতাক্) শব্দটির ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার বলিদ্বীপীয় অনুবাদ করিবার সময় ঐ স্থলে 'বেদ'-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে ; বলিদ্বীপে যে সমস্ত গ্রন্থের নামের সঙ্গে বেদ-শব্দটি সংযুক্ত আছে তাহার প্রত্যেকটিই মন্ত্রের পুঁথি। গোরিসের মত আমার নিকট বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না, কারণ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত যবদ্বীপে বেদজ্ঞ পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং বলিতে হয় যবদ্বীপীয় বেদগ্রন্থগুলি ইহার পর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে অথবা বলিদ্বীপীয় বেদজ্ঞগণ উহা অসামান্য যত্ন সহকারে সংগোপনে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

বলিদ্বীপে যে 'বৈদিক'-গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে আচার্য সিলভাঁ লেভী তাহার অনেকগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ইহার মধ্য হইতে প্রথমেই আলোচনা করিব চতুর্বেদ-নামক পুঁথিখানি। চতুর্বেদ দ্বারা বলিদ্বীপীয় পুরোহিতগণ যাহা বুঝিয়া থাকেন তাহা হইল নারায়ণাথর্ব-শীর্ষোপনিষদের চারিটি শিরস্ ; উহা ঋক্ এবং অন্যান্য বেদের 'শির' হিসাবে পরিগণিত। পরবর্তীকালে এই উপনিষদটি আবার বেদ অপেক্ষা তান্ত্রিকবাদের সহিত ঘনিষ্টতররূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। লেভী মহোদয় বলিদ্বীপের এই চতুর্বেদ এবং ভারতীয় সংস্করণের মূল প্রকাশ করিয়া পাঠকগণের তুলনামূলক বিচার করিবার সুযোগ দান করিয়াছেন। নিম্নে এই পাঠ দুইটির একাংশ বিধৃত হইল :

বলিদ্বীপীয় চতুর্বেদ

অথ পুরুষো বৈ নরয়ণ কময়ত্তম্ প্রজ স্রিজয়তি প্রনো জয়তি মনস সর্বেন্দ্রিয়নি কময়্ জোঁতিরপ পৃথিবী বিশ্বস্ চ দরনি নরয়ন এত দ্বদসদিত্য রুদ্র বসব সর্বেন্দ্রিয়নি সিন্ধংসি সদেব স্বপত্যন্তি প্রলিয়ন্তি এত ঋগ্বেদসিরোদিতে।

নারায়ণ অথর্বশিরোপনিষদ

অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণো'রিংকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি। নারায়ণাৎ প্রাণো জায়তে মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বশ্চ ধারণী। নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে। নারায়ণাদ্রুদ্রো জায়তে। নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে। নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে। নারায়ণাদ্দাদশাদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সর্ব্বাণি ছন্দাংসি। নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে। নারায়ণাৎপ্রবর্ত্তন্তে। নারায়ণে প্রলীয়ন্তে। এতদৃগ্বেদশিরো'ধীতে।

উপরোক্ত অংশ দুইটির তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে বলিদ্বীপীয় সংস্করণটি সংক্ষিপ্ত এবং পেদণ্ডগণ ও নকলনবীশগণের সংস্কৃত জ্ঞানের অভাবের জন্য পরবর্তীযুগে উহা স্বভাবতঃই অনেকটা বিকৃতরূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। উপরোল্লিখিত চতুর্বেদের সহিত নারায়ণ অথর্ব-শিরোপনিষদের অনেক সামঞ্জস্য থাকিলেও চতুর্থ বেদ-শিরস্ অর্থাৎ বলিদ্বীপে যাহা অর্থবেদ-শিরস্ নামে পরিচিত তাহার সহিত উপনিষদীয় অথর্ববেদশিরসের কোন সামঞ্জস্য নাই[৭]। বলিদ্বীপে যাহা মোটামুটি সুরক্ষিত হইয়াছে তাহা হইল ঋক, যজুঃ এবং সামবেদশিরস্। লেভী মহোদয় বলিয়াছেন যে বেদশিরস্গুলি প্রত্যেক পক্ষের প্রথম চন্দ্রোদয়ে এবং পুর্ণিমাতে স্বর সহযোগে গীত হইয়া থাকে ; উহা কখনো আবৃত্তি করা হয় না[৮]।

এইবার আমরা বেদপরিক্রমসারসংহিতাকিরণ নামক মন্ত্র-পুঁথিটির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব[৯]। ইহার আরম্ভেই পড়িতেছি: অবিঘ্নমস্তু। নমঃ সিদ্ধম্। পূজা পরিক্রমঃ। প্রথমেই বস্ত্র পরিধান করিয়া বলা হইল: ওঁ তং মহাদেবায় নমঃ। ইহার পর মন্ত্রপাঠ করিয়া কোমর-বেষ্টনী, উর্ধাঙ্গের বস্ত্র এবং বক্ষবস্ত্র যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া পাদপ্রক্ষালন করিতে হইবে। অতঃপর মুখবিবর এবং হস্তপ্রক্ষালন করিয়া আসনে উপবেশন করিতে হইবে। প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার সঙ্গে অবশ্য আনুসঙ্গিক মন্ত্রপাঠ করিতে হইবে। ইহার পর শরীরমন্ত্র, কোষপত্রের আবরণ মুক্ত করার মন্ত্র, স্থিতি মন্ত্র, ধুনুচী মন্ত্র, অস্ত্রমন্ত্র, মুদ্রা অস্ত্রমন্ত্র এবং করশুদ্ধির বিভিন্ন মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। ইহার পরই অঞ্জলিকূটমন্ত্রে আমরা পড়িতেছি:

'ওঁ হ্রুং হ্রিং সঃ পরমশিবাদিত্যায় নমঃ।'

ইহার পর উত্তর এবং দক্ষিণপশ্চিমে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করিয়া অঙ্গুলী অমৃতমুদ্রায় সন্নিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উপরোক্ত কূটমন্ত্রটি আবার পাঠ করিতে হইবে। ইহার পর স্বরূপ-রগ এবং মন্ত্রসপ্রকার পাঠ করিয়া অর্ঘ্যদানীর উপর পদ্ম রাখিতে হইবে। ইহার পর ত্রিপদ তুলিয়া অঞ্জলিহস্তে পরমশিবাদিত্যকে নমস্কার করিয়া ত্রিপদ পুনরায় সংস্থাপিত করিতে হইবে। ইহার পর গন্ধাক্ষত, মুদ্রা, অর্ঘ্য, সংস্কার, প্রদীপ, ধুনুচীসহ বিভিন্ন মন্ত্রপাঠ করিয়া অতঃপর প্রাণায়াম মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে:

'ওঁ অং নমঃ কুম্ভক, ওঁ ওঁ নমঃ পূরক,
ওঁ মং নমঃ রেচক।'

ইহার পর মন্ত্রদ্বারা শ্রী আত্মাকে শিবদ্বারে আনিয়া দগ্ধীকরণ এবং কুণ্ডরহস্যমন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। তৎপর অমৃতকরণী মন্ত্রপাঠ করিয়া আবার পূর্বোল্লিখিত করশোধন এবং অঞ্জলি কূটমন্ত্র পাঠ করিয়া বিভিন্নপ্রকার ন্যাস করিতে হইবে। ইহার মধ্যে আছে শিবাঙ্গ, শ্রীচতুরৈশ্বর্য, স্বরব্যঞ্জন, শ্রীপিত্রাদি, শ্রীচতুঃসন্ধ্যা, শ্রীত্রিসময়, শ্রীকূটমন্ত্র প্রভৃতি ন্যাস। ইহার পর উদকাঞ্জলি, পাদার্ঘ্য, আচমনীয়, ধূপদীপগন্ধপুষ্প প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ করিয়া ত্রিকোণাকার কুশ-ঘাস দ্বারা জলের উপর লিখিতে হইবে। এই লিখনের নাম হইল: ওঙ্কারাক্ষররহস্য। ইহার পর কয়েকটি সংক্ষিপ্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া পুরোহিতকে তিনটি যুগ্মচরণে-রচিত গঙ্গাদেবী অমৃতমুদ্রাসাধনমন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। তৎপর ঘণ্টাস্তব, সহগন্ধ-অক্ষত অস্ত্রমন্ত্র পাঠ করিয়া ভগবানের নিকট ক্ষমার মন্ত্র পাঠ

করিতে হইবে। তারপর অপ্সুদেব, পঞ্চাক্ষর, দক্ষিণদিকে তিনবার পূতবারি সংরক্ষণ প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। ইহার পর আমরা পড়িতেছি সপ্ততীর্থ মন্ত্র। এই প্রসঙ্গে যে নদীগুলির নামোল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে আছে গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু, বিপাশা, কৌশিকী, যমুনা এবং সরয়ূ। ইহার পরে আমরা পড়িতেছি শ্রীসপ্তওঙ্কার-আত্মা নামক মন্ত্র। ইহার মধ্যে পরমশিবকে শূন্যাত্মন, সদাশিবকে নিষ্কলাত্মন, মহাদেবকে নিরাত্মন্ এবং ঈশ্বরকে পরমাত্মনরূপে আবাহন করা হইয়াছে। ইহার পর শ্রীসকলনিষ্কলশিবের স্তবপাঠ করিতে হইবে। ইহার পরই আছে গঙ্গাদ্বার স্তব ; উহাতে আমরা পড়িতেছি :

'ওঁ গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
সর্বঙ্গতা ভূর্লভতে ত্রিভিঃ স্থানৈর্বিশেষতাম্॥
পাপো'হম্ পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ॥
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সবাহ্যাভ্যন্তরাশুচিম্॥
অশুচির্বা শুচির্বা'পি সর্বকামগতো'পি বা।
চিন্তয়েদ্দেবমীশানং সবাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ॥'

ইহার পর ভট্টারক গঙ্গাসরস্বতী এবং গঙ্গাসিন্ধু স্তব সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। গঙ্গাসিন্ধু স্তবের মধ্যে উপরোল্লিখিত সপ্ততীর্থের সাতটি নদী ব্যতীত আরো কয়েকটি নদীর নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে ; উহার মধ্যে আছে : গোদাবরী, নর্মদা, কাবেরী, চর্মণ্বতী, বেণুকা, ভদ্রা, নেত্রবতী, মহাসুরনদী, গণ্ডকী। ইহার পর আমরা পড়িতেছি গঙ্গাদেবি মহাপুণ্য, ভগবদগঙ্গা, গঙ্গাসোম, জলসিদ্ধে, গঙ্গাগৌরী, পবিত্রবারিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান, দীর্ঘায়ুঃ প্রভৃতি স্তব ও মন্ত্র। ইহার পর পূজার অন্যান্য প্রক্রিয়া (যথা প্রাণায়াম, মুদ্রা ইত্যাদি) শেষ করিয়া মন্ত্রদ্বারা দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহার পর আরো কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্ত্রপাঠ করিয়া সর্বশেষে তর্পণতোয় মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। উহার মধ্যে আছে ভট্টারকসূর্যস্তব। ইহা দ্বারাই বেদ-পরিক্রমের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে বেদপরিক্রমসারসংহিতা-কিরণ পুঁথিটি একটি মন্ত্র-স্তবক। সিলভাঁ লেভী[১০] এবং গণ্ডা[১১] মনে করেন যে পরিক্রম শব্দ দ্বারা বলিদ্বীপের মধ্যপূজা বা দৈনিকপূজার কথাই বলা হইয়াছে। তাঁহাদের আরো বিশ্বাস যে 'পরিক্রম' শব্দটি সংস্কৃত পরিকর্মন শব্দের বিকৃতি এবং ইহা দ্বারা 'cult adoration' প্রভৃতি বোঝায়। ভাগবত-পুরাণেও শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দৈনিক পূজাটি একটি ক্ষুদ্র মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয় এবং পূজার সময় নানাবিধ মুদ্রায় অঙ্গুলী সঞ্চালিত হয়। এই মন্ত্রগুলি একই নামে বা অনুরূপ নামে সূর্যসেবন মন্ত্রের অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। লেভী মহোদয় বলিয়াছেন যে ইহার অনুরূপ মন্ত্র বা মন্ত্রাংশ ঈশানশিবগুরুদেবপদ্ধতি তত্ত্বসমুচ্চয়, মহানির্বাণতন্ত্র এবং পরশুরামকল্পে বিদ্যমান[১২]। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে চতুর্বেদের মত এই নামের সহিত গ্রন্থের বক্তব্য বিষয়ের কোন সঙ্গতি নাই।

এইবার আমরা 'বুদ্ধবেদ'-নামক পুঁথিটির আলোচনা করিব। ইহা বৌদ্ধ-পুরোহিত-

গণের সহিত দৈনিক আচরিত প্রার্থনামন্ত্রের সঙ্কলনমাত্র। সিলভাঁ লেভী বলিয়াছেন যে উহাকে ব্রাহ্মণ্যবেদের বৌদ্ধ প্রতিপক্ষ হিসাবে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে কতকগুলি স্তোত্র আছে যাহা বিভিন্ন স্তোত্র সঙ্কলনে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে ইহার মধ্যে অবলোকিতেশ্বরের স্তবটি অষ্টমহাভয়স্তবের অন্তর্ভুক্ত, পঞ্চবুদ্ধের স্তবটি পঞ্চবুদ্ধস্তব এবং নাগবায়ু সূত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই দুইটি স্তবই নেপালে সুপরিচিত[১৩]।

লেভী মহোদয় বলিয়াছেন যে সমগ্র বুদ্ধবেদই বিভিন্ন তান্ত্রিক মন্ত্রের সঙ্কলন। ইহার 'নমো-বুদ্ধায়। অং অঃ ওঁ অনন্তাসনায় নমঃ' এবং 'রত্নত্রয়ং মে শরণম্' হইতে 'উৎপাদয়ামি বরবোধি-চিত্তম্' অংশটি অদ্বয়-বজ্রসংগ্রহের কুদৃষ্টিসংগ্রহ অংশে উদ্ধৃত হইয়াছে। উদানবর্গ, পালি ধর্মপদ এবং সর্বাস্তিবাদী প্রাতিমোক্ষসূত্রের বিখ্যাত একটি শ্লোক সংক্ষিপ্ত হইয়া এখানে আবির্ভূত হইয়াছে।

'সর্বপাপস্যাকরণং এতদ্ বুদ্ধানুশাসনম্।' এই শ্লোকটি প্রাচীন ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সোয়াট অঞ্চলের পাহাড়ে উৎকীর্ণ দেখিয়াছি ; আবার ইহার সাক্ষাৎ মিলিল এক মহাদেশ পাড়ি দিয়া সহস্র সহস্র মাইল দূরবর্তী একটি দ্বীপের পুঁথিতে[১৪]। ইহা এক অভাবনীয় ব্যাপার এবং আবিষ্কার। কেবল ইহাই নহে ; ইহার আরো কোন কোন অংশ (ধারণী) হেবজ্রতন্ত্রের মন্ত্রপটলে, সাধনমালা প্রভৃতি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থটি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে ইহা শূন্যের প্রশস্তি গাহিয়া আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু একটু পরেই ইহাতে আমরা পড়িতেছি : ভট্টার বৈরোচন ভট্টার শিব। স্তব রচয়িতা বৈরোচনের সহিত ভট্টারক শিবের অভিন্নতা স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি আবার বলিতেছেন : 'সরস্বতী···নমস্তে ভগবন্নমে···গিরিপতি···শ্রীদেবী··· পরমশিব।' ইহার পর আমরা একটি শ্লোক পড়িতেছি যাহা একান্তভাবেই হিন্দুধর্মের অঙ্গ। শ্লোকটি এই :

'ওঁ আয়ুর্বৃদ্ধির্যশোবৃদ্ধির্বৃদ্ধি প্রজ্ঞাসুখশ্রিয়াম্।
ধর্ম্মসন্তানবৃদ্ধিশ্চ সন্তু তে সুখবৃদ্ধয়ে ॥'

যে বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র হইল কামনা-বাসনা প্রভৃতি জয় করিয়া নির্বাণলাভ করা সেই ধর্মের প্রার্থনামন্ত্রে ধর্মসন্তানবৃদ্ধি এবং অন্যান্য পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির কামনা করা মানসিক পরিচ্ছন্নতার পরিচালক নহে। এই মন্ত্রাংশটি হিন্দুদের মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের মধ্যেও বিদ্যমান আছে এবং ইহা পরে যথাস্থানে আলোচিত হইবে। বুদ্ধবেদের অন্যত্রও এই প্রকার ধর্মের সংমিশ্রন পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে একদিকে যেমন আমরা ভট্টারী গঙ্গা, গরুড়বাহন বিষ্ণু, পিশাচবাহন উমাপতি শিব, কলিদ্বাপরসম্ভূত আর্য ভীম, প্রজাপতি প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন দেখিতেছি তেমনি আবার পড়িতেছি বহুশ্লোকে নন্দিত অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি এবং বৈরোচনের স্তব। স্তবে বজ্রপর্যঙ্ক, বজ্ররাগ-বজ্রসাধু-বজ্ররাজ-বজ্রধরাদি-বোধিসত্ত্বপরিবার প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ পাইতেছি ; পাতায় পাতায় বজ্র শব্দ আকীর্ণ রহিয়াছে। স্তবের শেষের দিকে সকলের কল্যান কামনা করা হইয়াছে। সুতরাং এই বুদ্ধবেদ পাঠ করিলে মনে হইবে যে ইহার

সহিত বেদের সামান্যতম সম্বন্ধও বিদ্যমান নাই। ইহা বৌদ্ধ এবং শৈব তান্ত্রিক মতের সংমিশ্রণে সৃষ্ট অদ্ভুত একটি স্তব।

উপরে আমরা চতুর্বেদ, বেদপরিক্রমসার সংহিতাকিরণ এবং বুদ্ধবেদ আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে ইহাদের সহিত বেদের কোন সম্পর্ক বিদ্যমান নাই। এই কথা মে-বেদ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। বলিদ্বীপের পুরোহিতগণ মে-বেদ শব্দ-দ্বারা নির্দিষ্ট মন্ত্রপাঠ করা বুঝিয়া থাকেন। সুতরাং এই সমস্ত তথাকথিত বেদ বিভিন্নপ্রকারের ধর্মানুষ্ঠানের মন্ত্র বা মন্ত্রাদির প্রক্রিয়ার সঙ্কলনমাত্র। এই সঙ্কলনগুলির মূল পাঠ করিলেই ইহার স্বরূপ এবং প্রকৃতি উপলব্ধি হইবে। সুতরাং বেদ বা বৈদিকমন্ত্র বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা বলিদ্বীপে বিদ্যমান নাই। বৈদিক মন্ত্রের একমাত্র স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে গায়ত্রীমন্ত্রের একটি পদাংশে : 'ভর্গো দেবস্য ধীমহী'[১৫]। ডঃ গণ্ডা এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে গায়ত্রীমন্ত্র এবং উহার স্বতন্ত্রপাঠ বৈদিকোত্তর এবং মহাকাব্যোত্তর যুগে বারংবার উদ্ধৃত কিংবা উল্লিখিত হইয়াছে; ইহার দৃষ্টান্ত সৌরপুরাণ এবং কালিকাপুরাণেও মিলিবে[১৬]। উপরোক্ত গায়ত্রীমন্ত্রের খণ্ডিতাংশটি শিবসূত্র নামক মন্ত্রের অংশ যাহার প্রথমে আমরা পড়িতেছি : 'যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রম্।' এই মন্ত্রটি কাঠক আরণ্যক, বৌধায়ন, বৈখানস এবং পারস্কর গৃহ্যসূত্রেও বিধৃত হইয়াছে[১৭]।

সুতরাং যবদ্বীপ-বলিদ্বীপের এই তথাকথিত বৈদিক সাহিত্য পাঠ করিয়া দেখা যাইতেছে যে বেদ বলিতে আমরা যে ঋক, যজু, সাম ও অথর্ববেদের কথা বুঝিয়া থাকি সেই বেদাদি গ্রন্থ বর্তমানে জাভা এবং বলিদ্বীপে বিদ্যমান নাই। উহা কোথাও খুঁজিয়াও পাওয়া যায় নাই। এই কথা ক্রফুর্ড সাহেব বহুদিন পূর্বেই ঘোষণা করিয়াছিলেন। ক্রফুর্ড বলিয়াছেন[১৮] : 'আমি জাভা এবং বলিতে হিন্দুশাস্ত্র বা বেদের কোন কিছুই খুঁজিয়া পাই নাই। যদিও এই অনুসন্ধান কার্য যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল কিনা তৎসম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তবুও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রাচ্যের দ্বীপগুলিতে এই শাস্ত্রের কোন অস্তিত্ব নাই বা কোনদিন ছিল না। ইহা অতীব আশ্চর্য মনে হইবে যে হিন্দুদের মধ্যে শিবের উপাসকশ্রেণীর মত রক্ষণশীল সম্প্রদায় ধর্মগ্রন্থ ব্যতীত থাকিবে। হিন্দুদের মধ্যে নিম্নবর্ণের লোকেরা ধর্মের নিষেধের জন্যেই বেদ পড়িতে পারে না। যে ব্রাহ্মণেরা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহারা কি অপবিত্রতা বা অস্পৃশ্যতার জন্যই এই বাধানিষেধের গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলেন; অথবা তাঁহারা ছিলেন নিম্নবর্ণের লোক, যাহাদের বেদপাঠ ছিল আইন-বিগর্হিত ব্যাপার? সর্বশেষে এই সম্ভাবনাটুকুও অস্বীকার করা যায় না যে ব্রাহ্মণগণ আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়া সংস্কারবশে তাঁহাদের অপবিত্র সন্তানগণকে বেদপাঠ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।' এই সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন কিছু বলা আজ অসম্ভব, তবে বর্তমান অবস্থার পটভূমিকায় যেটুকু বলা সম্ভবপর তাহার অনেকটা যেন ক্রফুর্ড সাহেবের উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোনদিন মিলিবে কিনা সন্দেহ।

পা দ টী কা

১. *Mededeelingen van de kirtya Liefrinck van der Tuuk*, 1929, Singaradja—Solo pp. 20-40। পরবর্তী তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য: ঐ 3 (1931), 4 (1935), 5 (1937), 6 (1939), 11 (1940), 13 (1941).

২. Ed. Dr. R. ng. Poerbatjaraka, Dr. P. Voorhoeve and Dr. C. Hooykaas, Lembaga Kebudajan Indonesia, 1950.

৩. *VBG* XXII (1849) p. 10.

৪. সম = সাম এবং অর্তব = অর্থব = অথর্ব। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে অথর্ববেদ এবং অর্থবেদ উভয় শব্দই যবদ্বীপীয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে। Vide Gonda, *Sanskrit in Indonesia*, p. 126 fn. 66.

৫. Goris, *Theologie* p. 144.

৫. (ক) এই প্রশ্নটি আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : H. B. Sarkar in *JIH*, XLIV (1966) pp. 657 ff.

৬. *Sanskrit Texts from Bali* (Gaekwad Oriental Series, no. 67 Baroda), 1933.

৭. Levi, *op. cit.*, pp. 5-6.

৮. *Ibid* ; p. XVI.

৯. Text in *Ibid* pp. 7 ff.

১০. Levi, *op. cit.*, p. XVIII.

১১. Gonda, *Sanskrit in Indonesia*, p. 110.

১২. *Op. cit.* p. XIX.

১৩. *Ibid* p. XXX.

১৪. ইহার বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য *Ibid* p. XXX ff.

১৫. ঋগ্বেদ ৩।৬২।১০ এবং Goris, *Theologie* p. 144.

১৬. সৌরপুরাণ ১৮, ৩৪ ; ৪১, ৭৬ ; ৪২, ১৯ ; ৪৪, ৬০ ; কালিকাপুরাণ ৬৬, ২২ ইত্যাদি।

১৭. Goris, *Theologie* p. 45 ff. ; Levi, *op cit* p. XVI.

১৮. *Asiatic Researches*, vol. XIII, 18 : "On the existence of Hindu Religion in the island of Bali", p. 147.

পঞ্চম অধ্যায়

মন্ত্র-সাহিত্য

যেদিন দ্বীপময় ভারতে প্রথম ভারতীয় দেবদেবীর আবির্ভাব হইল সে দিনক্ষণের কেহ হিসাব রাখে নাই, কিন্তু সেইদিন হইতেই ভারতীয় মন্ত্রতন্ত্র এবং স্তবস্তুতি এই সমস্ত স্থলে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এই প্রকার মন্ত্রতন্ত্র একদা বিপুলসংখ্যায় বলিদ্বীপ-যবদ্বীপে প্রচলিত ছিল। আজিও বলিদ্বীপের পুরোহিতগণ প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে ঐ সমস্ত মন্ত্রতন্ত্র প্রায়শঃ অর্থ না বুঝিয়াও পাঠ বা আবৃত্তি করিয়া থাকেন এবং লিখিয়া থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা হয়তো জানেন ও না যে ঐ সমস্ত মন্ত্রতন্ত্রের আদি বাসভূমি ভারতবর্ষ এবং ঐ সমস্ত মন্ত্রতন্ত্রের প্রত্যেকটির অর্থ আছে। এই মন্ত্রতন্ত্র একদা যবদ্বীপেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু যবদ্বীপ ইসলামধর্ম গ্রহণ করায় হিন্দুবৌদ্ধধর্ম এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রতন্ত্র বলিদ্বীপেই আশ্রয়লাভ করিয়াছে। সুতরাং মন্ত্রতন্ত্র, স্তবস্তোত্র ইত্যাদির কথা ভাবিলে আমাদিগকে বলিদ্বীপের দিকেই দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। ভারতবর্ষের বাহিরে একমাত্র বলিদ্বীপেই হিন্দুধর্ম এখনো জীবন্ত এবং প্রাণময় ধর্ম।

বলিদ্বীপের মন্ত্রগুলি ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত অবিকৃত রূপে পাওয়া গিয়াছে। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে মন্ত্রগুলি সংস্কৃতে রচিত এবং বলিদ্বীপের পুরোহিতগণের সংস্কৃতজ্ঞান বিশেষ না থাকায় তাহারা এই সমস্ত মন্ত্র পূর্বপুরুষদিগের নিকট হইতে যে-ভাবে পাইয়াছেন সেই ভাবেই উহা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ মন্ত্রগুণ রক্ষা করিবার প্রয়োজনও ইহার পবিত্রতা রক্ষার অন্যতম কারণ। কালক্রমে ভারতবর্ষের সহিত যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় এবং সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞতার জন্য এই মন্ত্রগুলিতে কিছুকিছু বিকৃতি প্রবেশ করিতে লাগিল। এই বিকৃতিগুলি যে ভয়াবহরূপ পরিগ্রহণ করে নাই তাহা আমাদের সৌভাগ্য। যদি বলিদ্বীপের ব্রাহ্মণ বা পেদণ্ডগণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন না হইতেন তাহা হইলে তাহারা হয়তো সংস্কৃত মন্ত্রগুলিকে প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া উপাসনার কার্য নির্বাহ করিতেন; ইহা সংঘটিত হইলে আমরা হয়তো মূল সংস্কৃত মন্ত্রগুলি একেবারে হারাইয়া ফেলিতাম। এই প্রসঙ্গে আমরা ইংলণ্ডের কথা স্মরণ করিতে পারি। যখন লাটিন ভাষায় রচিত খৃষ্টীয় স্তোত্রগুলি ইংরেজীতে ভাষান্তরিত হইয়া ইংলণ্ডের গির্জ্জায় গির্জ্জায় পঠিত হইতে লাগিল তখন ইংরাজ নরনারীর মুখে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছিল। সুতরাং দ্বীপময় ভারতের

তৎকালীন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় এই সংস্কৃত মন্ত্রগুলিকে ভাষান্তরিত করিবার পক্ষে প্রবল বাধা বিদ্যমান ছিল।

বলিদ্বীপে যে সমস্ত স্তবস্তোত্র পাওয়া গিয়াছে তাহার উদ্দিষ্ট দেবতা হইলেন সূর্য, শ্রী, সরস্বতী, বায়ু, যম, বাসুকী, উমা, গঙ্গা, আকাশ, গণপতি, অগ্নি, ইন্দ্রানী, পিতৃগণ, রতি, বরুণ ইত্যাদি। এই সমস্ত দেবদেবীর পুজা করার অধিকার আছে একমাত্র ব্রাহ্মণগণের। এই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাহারা পেদণ্ড নামে খ্যাত তাহারাই সাধারণতঃ পুজার্চনা করিয়া থাকেন। পেদণ্ড হইতে হইলে লেখাপড়া শিখিয়া শাস্ত্রজ্ঞ হইতে হইবে এবং তাহারা পুজার বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবেন। পেদণ্ডগণ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা পেদণ্ড শিব এবং পেদণ্ড বুদ্ধ। সিলভাঁ লেভী ইহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন[১] যে ইহারা প্রভাতকালীন পূজান্তে পবিত্র 'তোয়' বা নির্মাল্যবারি বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকেন। এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিরোধ বিদ্যমান নাই; বস্তুতঃ স্থানীয় শৈব এবং বৌদ্ধ ধর্ম তন্ত্রেরই দুইটি শাখা মাত্র। বলিদ্বীপে বুদ্ধকে শিবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিসাবে গণ্য করা হয় এবং পদমর্যাদানুযায়ী বিষ্ণু এবং ব্রহ্মার স্থান শিবের নিম্নে। বস্তুতঃ মেরুনামধারী মন্দিরগুলির মধ্যে শিবের মন্দির একাদশতলবিশিষ্ট; ব্রহ্মা-বিষ্ণুর মন্দিরগুলি নবমতল বিশিষ্ট। এই সমস্ত দেবকুলের উপরে আছেন সঙ্গহ্যঙ্গ বিধি[২]।

বলিদ্বীপে মন্ত্রতন্ত্রের জগৎ বিশাল। ভারতবর্ষের মতই এই সমস্ত মন্ত্রতন্ত্রের আবার বিভিন্ন সঙ্কলনও প্রচলিত আছে। ইহার একটিতে কিরূপে মৃতদেহের সৎকার করিতে হইবে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় কি কি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে ইত্যাদির যথাযোগ্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মুক্তি এবং দেহশুদ্ধির মন্ত্র, স্বচন্দমরণ (স্বচ্ছন্দ বা স্বেচ্ছামরণ), বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদি সংক্রান্ত মন্ত্র প্রভৃতি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বলিদ্বীপের মন্ত্র-সাহিত্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে ইহাতে আরো আছে শরীর মন্ত্র, স্থিতিমন্ত্র, অস্ত্রমন্ত্র, করশুদ্ধি, চতুরঙ্গুল, প্রাণায়াম মন্ত্র, উদকাঞ্জলি, পাদ্যার্ঘ্য, আচমনীয় প্রভৃতি মন্ত্র। এই সমস্ত মন্ত্রও বেদ নামে পরিচিত, তবে পূর্বেই বলিয়াছি যে এই বেদের সহিত ভারতীয় চতুর্বেদের কোন সংযোগ নাই। ডঃ যুইনবল[৩] বলিয়াছেন যে একশ্রেণীর যাদুমন্ত্রও বলিদ্বীপে বেদ নামে পরিচিত। যাহাই হউক এই সমস্ত মন্ত্র-তন্ত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জটিল এবং ব্যাপক হইল বলিদ্বীপের মৃতের সৎকার সম্পর্কিত বিধিগুলি। ইহার মধ্যে হিন্দুধর্ম এবং রীতিনীতির প্রভাবও যেমন বিদ্যমান, তেমনি আবার রহিয়াছে পলিনেশীয় প্রেত-জগতের প্রভাব। বস্তুতঃ জন্মলগ্ন হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বলিদ্বীপীয় হিন্দুবৌদ্ধগণ এই প্রেতাত্মার শান্তিবিধানে ব্যাপৃত থাকেন[৪]।

সিলভাঁ লেভী বলিদ্বীপের হিন্দুধর্মের আর একটি বিশেষত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন; উহা হইল পীঠস্থানে বা বেদীর উপর দেবতার মূর্তির অনুপস্থিতি[৫]। সু-অলঙ্কৃত দেবমন্দিরে মূর্তিবিহীন দেবতার শাস্ত্রানুযায়ী পুজা হইতেছে ইহা ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণের চক্ষুতে এক অভাবনীয়রূপে পরিগণিত হইবে; কিন্তু বলিদ্বীপের দেবপুজায় ইহাই স্বাভাবিক বিধি। এই কথা প্রাচীন যবদ্বীপ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ প্রযোজ্য নহে, কারণ দিনজ-অনু-

শাসনলিপিতে[৬] স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে রাজা গজযান অগস্ত্যের 'সুরদারুময়ী' প্রতিমা স্থলে 'কৃষ্ণাদ্ভুতোপল'-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। কাষ্ঠমূর্তির স্থলে কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্মিত প্রতিমা নির্মান দ্বারা বাস্তবমূর্তি প্রতিষ্ঠার কথাই বুঝাইতেছে ইহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই।

সুখের বিষয় এই সমস্ত মন্ত্র, স্তব, স্তুতির মধ্যে কোন কোনটির উৎস ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু কোন কোনটির হয় নাই। ডঃ গণ্ডা মনে করেন যে শেষোক্তগুলির মধ্যে কোন কোনটি হয়তো ভারতবর্ষীয় মন্ত্রের যবদ্বীপীয় বা বলিদ্বীপীয় সংস্করণ; ইহাও অসম্ভব নহে যে কোন কোন স্তব হয়তো যবদ্বীপ বা বলিদ্বীপেই রচিত হইয়াছিল[৭]। তবে মন্ত্রবিষয়ে ভারতবর্ষে সূত্র-যুগ হইতে যে রক্ষণশীলতা অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে অখ্যাত দেবদেবীর মন্ত্র ছাড়া অন্য কোন মন্ত্র (যাদুমন্ত্র নহে) যে দ্বীপময় ভারতে রচিত হইয়াছে তাহা মনে হয় না[৭ক]।

বলিদ্বীপের মন্ত্রগুলির মধ্যে সূর্যসেবনের স্থান উচ্চে। সূর্যসেবনের অর্থ শিবকে সূর্যরূপে উপাসনা করা। প্রাচীন জগতের অনেক সুসভ্য জাতি যেমন, মিশরীয়, সুমেরীয় এবং ভারতীয়-গণ সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে স্তবস্তুতি করিয়াছেন এবং জগতের প্রাচীনতম লেখমালা, যেমন মৃতের পুস্তক, বেদ, আবেস্তা, পাপিরাই প্রভৃতিতে এই শ্রদ্ধার স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে। সূর্যদেব ক্রমে ক্রমে তাঁহার বৈদিকযুগের মহিমা হারাইলেন এবং তিনি শিবের সহিত অভিন্ন হইয়া গেলেন। অগ্নিপুরাণে আমরা পড়িতেছি 'হৃৎপদ্মে শিব-সূর্য ইতি'[৮]। এই প্রকার দৃষ্টান্ত সৌর এবং গরুড় পুরাণেও আছে। ডঃ গোরিস সূর্যসেবন মন্ত্রের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন; তিনি বলেন যে শিবাদিত্যের উপাসনা বলিদ্বীপের একটি বিশিষ্ট ধর্মোৎসব এবং ঐ সংক্রান্ত একটি কূটমন্ত্রে আমরা পড়ি: 'ওম্ হ্রাম হ্রিম্ সঃ পরমশিবাদিত্যায় নমঃ[৯]। ডঃ সুদর্শনা দেবী ইহার আরো কতকগুলি দৃষ্টান্ত পরিবেশন করিয়াছেন[১০]। তিনি বলিয়াছেন যে শিবের অষ্টমূর্তির বর্ণনায় শিব সূর্যরূপে কল্পিত হইয়াছেন: 'ওঁ ঈশানায় সূর্যমূর্তয়ে নমঃ।' এই মূর্তি কোথায় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে হিরণ্যকেশীয় ব্রহ্মকর্মসমুচ্চয় গ্রন্থের পার্থিব লিঙ্গপূজার ২৭ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে: 'ওঁ ঈশানায় সূর্যমূর্তয়ে নমঃ।' বৃহৎ স্তোত্ররত্নাকরের শিবসহস্রনামস্তোত্রে আমরা শিবের নামগুলির মধ্যে পাইতেছি: অর্যমা, সবিতা, রবি ইত্যাদি। এই গ্রন্থেরই ৪০ অধ্যায়ে পড়িতেছি: 'যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান যশ্চ সূর্যস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।' সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নহে, জাভা বলিদ্বীপেও কোন কোন দেবতা শিবের সহিত লীন বা অভিন্ন হইয়া যাইতেছেন। এই ঘটনায় আমাদের প্রাচীন মিশরের একটি অনুরূপ ঘটনার কথা মনে পড়িয়া যাইতেছে। সেখানে আমরা দেখিতে পাই যে সূর্যদেব বা ক্রমশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবগণের বিভূতি বা গুণাবলী নিঃশেষে পরিগ্রহণ করিয়া রাজা ইখ্‌নাটনের আমলে আটোনে পরিণত হইলেন। তবে জাভা এবং বলিদ্বীপের হিন্দুধর্ম কখনো একেশ্বরবাদে পরিণতিলাভ করে নাই। ইহা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে দ্বীপময় ভারতের শিব-বুদ্ধ, হরিহর প্রভৃতি দেবতার কল্পনা ধর্মের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা।

অদ্যাবধি বলিদ্বীপে শিবাদিত্যের পূজা নিত্যই প্রতিপালিত হইতেছে। পূজার সময় পুরোহিত বিশেষ বস্ত্র পরিধান করেন: মস্তকে থাকে শিরোবিষ্ট; এতদ্ব্যতীত দেহের অন্যান্য

অঙ্গে থাকে যজ্ঞোপবীত, গণিত্রি বা অক্ষমালা। অতঃপর তলবেদন এবং করশোধন অনুষ্ঠানের পর সূর্যসেবন বা শিবাদিত্যের পূজা আরম্ভ হইল। করশোধন অনুষ্ঠান দুই হাত দিয়াই করিতে হইবে : 'ওম্ শুদ্ধ মম্ স্বাহা' ; বাম হাত শুদ্ধ করিবার সময় বলিতে হইবে : 'ওম্ অতিশুদ্ধ মম্ স্বাহা।'

দুইটি হস্তই শুদ্ধ করার পর পুরোহিত অন্যান্য মন্ত্র পাঠ করেন এবং প্রাণায়াম করেন। প্রাণায়াম করিবার সময় পূরক, কুম্ভক বা রেচক-আসনে সমাসীন হইতে হয়। এই প্রাণায়াম শেষ হইলে উপাসক অস্ত্রমন্ত্র জপ করেন :

(ক) 'ওম্ অম্ হৃদয়ায় নমঃ

(খ) ওম্ অর্কায় শিরসে নমঃ

(গ) ওম্ ভুর্ভুবঃ স্বরে জ্বালিনি শিখায়ৈঃ নমঃ

(ঘ) ওম্ হ্রুম্ কবচায় নমঃ

(ঙ) ওম্ ভাম্ নেত্রায় নমঃ

(চ) ওম্ হূম্ রঃ ফট্ অস্ত্রায় নমঃ।'

ডঃ গোরিস্ বলিয়াছেন যে এই মন্ত্রটি গরুড় পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়[১১]। উভয় মন্ত্রের মধ্যে এইটুকু মাত্র পার্থক্য যে উপরোক্ত (গ) এবং (ঙ) স্থলে আমরা গরুড়পুরাণে পড়িতেছি : 'ওম্ অঃ ভুর্ভুবঃ স্বঃ জ্বালিনি শিখায়ৈ বষট্" এবং "ওম্ ভাম্ নেত্রাভ্যাম্ বৌষট্।" এতদ্ব্যতীত জাভা-বলির মন্ত্রশেষে যেখানে আমরা 'নমঃ' পাইতেছি সেস্থলে ভারতীয় মন্ত্রশেষে আছে : নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুম্, বৌষট্, ফট্ ইত্যাদি।

ইহার পর সূর্যসেবন পূজার পরবর্তী অধ্যায় আরম্ভ হইল। এই অংশের নাম ঙুরৎ ওঙ্কার। ইহা করিতে আচমন, ত্র্যক্ষর, ত্রিমণ্ডল, গঙ্গাদেবী, সপ্ততীর্থ প্রভৃতি মন্ত্রজপ করিতে হয়[১২]। অনুষ্ঠানটির আরম্ভ এইরূপ :

"ওম্ পরম-শিব-গঙ্গায় নমঃ

ওম্ হ্রাম্ হ্রীম্ বৌষট্ পরম-শিব-মৃতায়-নমঃ"

এই অনুষ্ঠানের পর জলের উপর ত্র্যক্ষর (অ+উ+ম) লিখিতে হয়। সপ্ততীর্থ মন্ত্রটি আমাদের নিকট কৌতূহলোদ্দীপক মনে হইবে, কারণ ইহাতে কতকগুলি নদীর নাম দেওয়া হইয়াছে যাহা জাভা ও বলিদ্বীপের লোকের নিকট পবিত্র বলিয়া গণ্য হইত। মন্ত্রটি এইরূপ[১৩]

ওম্ অম্ গঙ্গায়ৈঃ নমঃ

ওম্ অম্ সরস্বত্যৈঃ নমঃ

ওম্ অম্ সিন্ধবে নমঃ

ওম্ অম্ বিপাশায়ৈ নমঃ

ওম্ অম্ কৌশিক্যৈ নমঃ

ওম্ অম্ যমুনায়ৈ নমঃ

ওম্ অম্ সরযুয়ে নমঃ

এই তালিকাটি নিশ্চয়ই পরবর্তী বৈদিক যুগে সঙ্কলিত হইয়াছিল, কারণ ইহাতে ভারত-বর্ষের পবিত্র প্রাচীনতম নদীনামের সহিত অপেক্ষাকৃত আধুনিক নদীনামের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষের এই সাতটি নদীকে আবাহন করা হইয়াছে কমণ্ডলুর জলকে পবিত্র করিবার জন্য। এই ক্রিয়া শেষ হওয়ার পর উপাসক কয়েকটি মন্ত্রপাঠ করেন যাহা একান্তই পৌরাণিক সূর্যার্চনার সহিত সংশ্লিষ্ট। এই মন্ত্রগুলির নাম চতুরৈশ্চর্য, সপ্তস্বর ব্যঞ্জন, নবশক্তি, ত্রিতত্ত্ব, কূটমন্ত্র (ইহাতে শিব এবং সূর্যের মৌলিক একত্ব প্রকাশিত হইয়াছে), ব্রহ্মাঙ্গ বা শিবিকরণ, শিবাঙ্গ, গর্ভমন্ত্র, অষ্টগ্রহ, চতুরৃতর্পন ইত্যাদি। এই মন্ত্রগুলি পদ্মাসন বা অনন্তাসন করিয়া পড়িতে হয়। এই দীর্ঘ মন্ত্রগুলি পড়া শেষ হইলে উপাসক ঘণ্টামন্ত্র অর্থাৎ যে মন্ত্র সহকারে ঘণ্টাধ্বনি করা হয় তাহাই পাঠ করেন। এই মন্ত্রটি নিম্নে পরিবেশিত হইল :

"ওম্!
ওঙ্কার সদাশিবস্তম্ জগন্নাথহিতঙ্করঃ।
অভিবাদবদনীয়ম্, ঘণ্টাশব্দঃ প্রকাশ্যতে ॥
ঘণ্টাশব্দম্ মহাশ্রেষ্ঠম্, ওঙ্কারম্ পরিকীর্ত্তিতম্।
চন্দ্রনাদবিন্দুদন্তং স্ফুলিঙ্গ শিব ত্বং চ তৎ ॥
ওম্ ঘণ্টায়র্ পুজ্যতো দেবং অভবভবকর্মসু।
বরণ লব্ধসম্দেহং বরম্ সিদ্ধি নিঃসম্শয়ম্[১৪] ॥"

এই ঘণ্টামন্ত্র শেষ হইলে উপাসক একান্ত বিনীতভাবে একটি মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া ভগবানের নিকট কৃত অপরাধের জন্য মার্জনাভিক্ষা করেন। ভারতীয় মন্ত্রগুলির অন্তিমেও অনেক সময় এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই মন্ত্রটি সহজ, কিন্তু ইহা অপেক্ষাকৃত বিকৃত ভাষায় পরিবেশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আত্মনিবেদনের যে সুরটি ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা সহজেই সকলের হৃদয় স্পর্শ করিবে[১৫]।

"ওম্ ক্ষমস্ব মাম্ মহাদেব, সর্ব্বপ্রাণিহিতঙ্কর।
মাম্ মোচ সর্ব্বপাপেভ্যঃ পালয়স্ব সদাশিব ॥
পাপো'হম্ পাপকর্ম্মা'হম্ পাপাত্মা পাপসম্ভব।
ত্রাহি মাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ কেনচিৎ মম রক্ষতু ॥
ক্ষান্তব্যাঃ কায়িকা দোষাঃ ক্ষান্তব্যাঃ বাচিকা মম।
ক্ষান্তব্যাঃ মানসা দোষাঃ তৎপ্রসীদ[১৬] ক্ষমস্ব মাম্ ॥
হীনাক্ষরম্ হীনপাদম্ হীনমন্ত্রং তথৈব চ।
হীনভক্তিং হীনবুদ্ধিং সদাশিব নম'স্তুতে ॥
ওম্ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং মহেশ্বর।
যৎ পুজিতম্ ময়া দেব পরিপুর্ণং তদস্তু মে[১৭] ॥"

এই মন্ত্রের প্রতিটি শব্দে শিবের চরণে আত্মনিবেদনের ভাব সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সূর্য-অর্চনার মধ্যে শিবের এই আবির্ভাব নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক ; দ্বীপময় ভারতে

শিবার্চনা কতদূর প্রসার লাভ করিয়াছিল ইহা তাহার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করিতেছে। এই মন্ত্র শেষ হইলে অপর কয়েকটি স্তবস্তুতি করিতে হয়, যথা আপ্সুদেব, সপ্ত ওঙ্কর, স্তব ভটার, সপ্তগঙ্গা ইত্যাদি। ইহার পর ধূপ, দীপ, গন্ধপুষ্প এবং উদকাঞ্জলি ও পাদ্যার্ঘ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ক্রিয়া শেষ করিতে হয়। ইহার পর মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্র পাঠ করিতে হয়; ইহার আরম্ভে আমরা পড়িতেছি :

"ওম্ দীর্ঘায়ুর্বলবুদ্ধিশক্তিকারণ মৃত্যুঞ্জয়ঃ" এবং ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত বিখ্যাত চরণগুলি বিদ্যমান :

"ওম্ আয়ুর্বৃদ্ধির্যশোবৃদ্ধির্বৃদ্ধিঃ প্রজ্ঞাসুখশ্রিয়াম্।
ধর্মসন্তানবৃদ্ধিশ্চ সন্তু তে সপ্ত বৃদ্ধয়ঃ ॥
যাবন্মেরৌ স্থিতা দেবা যাবদ্গঙ্গা মহীতলে।
চন্দ্রার্কো গগনে যাবত্তাবত্তাবৎ (বি) জয়ী ভবেৎ[১৮] ॥

ভগবানের নিকট এই প্রকারের প্রার্থনা সর্বদেশে সর্বকালে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। আমাদের দেশেও বৈদিক স্তোত্রগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া অনার্য প্রার্থনা মন্ত্রেও এইপ্রকার প্রার্থনার সুর বিদ্যমান। উপরোক্ত প্রার্থনার ভাষা এবং ভাবনা নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে একদিকে যেমন মনুসংহিতার মত ধর্মসন্তানবৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে তেমনি আবার পৃথিবীতে উচ্চস্থান অধিকার করিবার অভিলাষও প্রকাশ করা হইয়াছে। এই মন্ত্রের ভাবনাগুলি পূর্ণ বা আংশিকভাবে ইন্দো-যবদ্বীপীয় সাহিত্যের বিভিন্নস্থলে প্রতিফলিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের অনেক মন্ত্রেরই অন্তিমভাগ এইরূপ, তাহা সংস্কৃত ভাষায়ই রচিত হউক অথবা প্রাদেশিক ভাষাতেই[১৯] রচিত হউক। বাংলাদেশের বিভিন্ন পূজাপার্বনের অন্তেও এই ধরণের প্রার্থনা আছে। অরণ্যষষ্ঠী, নাগপঞ্চমী, নাটাই ষষ্ঠী, সুবচনী, শীতলা, বুড়ো ঠাকরুন, ঘেণ্টু, কুলাই, মূলাই, প্রভৃতি পূজার অন্তিমভাগও সংস্কৃত মন্ত্রের আদর্শে রচিত হইয়াছে। এই পূজাগুলির অঙ্গে অনার্যের বেশ, কিন্তু ইহার প্রার্থনার সুরের মধ্যে ভাবনার যে অভিব্যক্তি দেখিতেছি তাহা বিশ্বজনীন দৃষ্টিতে দেখিলে বিশ্বজনীন, আবার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখিলে উহা একান্তভাবেই ভারতীয় বা বঙ্গজ। এইস্থলে একটি দৃষ্টান্ত পরিবেশন করিতেছি। বাংলাদেশের তোষলাব্রতের মধ্যে আমরা পড়িতেছি[২০] :

"কোদাল-কাটা ধন পাবো,
গোহাল-আলো গরু পাবো,
দরবার-আলো বেটা পাবো,
সেঁঝ-আলো ঝি পাবো,
আড়ি-মাপা সিঁদুর পাবো,
ঘর করবো নগরে
মরবো গিয়ে সাগরে,[২১]
জন্মাবো উত্তম কুলে,

তোমার কাছে মাগি এই বর,
স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর[২২]।

মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের শেষে ভস্মমন্ত্র পড়িতে হয়। ইহার পরই পাঠ করিতে হয় যজ্ঞোপবীত মন্ত্র; ইহার মধ্যেই বিখ্যাত গায়ত্রীমন্ত্রের একাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে :

(ক) ওঁ (শিবসূত্রম্) যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং
প্রজাপ আয়ুষ্যং বলমস্তু তেজঃ।

(খ) পরগুহ্যাত্মত্রিগণং ত্রিগণাত্মকম্
অগ্নিবেং ক্ষিতিস্সূর্যপ্রকাশং চন্দ্রকোটিহৃদয়ম্।

(গ) ইতি বেদমন্ত্র গায়ত্রী মাত্র মাত্র (?) ষড়ক্ষর।
সর্বদেব পিতা স্বয়ম্ভু।

(ঘ) ভর্গো দেবস্য ধীমহী…"

গায়ত্রী মন্ত্রের সম্পূর্ণ চরণ হইল :

"ওম্‌ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যম। ভর্গো
দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো ন প্রচোদয়াৎ॥"

পণ্ডিতপ্রবর সিলভাঁ লেভী[২৩] বলিয়াছেন যে পেদণ্ডগণ কোন দিন গায়ত্রীমন্ত্রের নামও শুনেন নাই, কিন্তু তাঁহারা দৈনিক মন্ত্রপাঠ করিবার সময় গায়ত্রীমন্ত্রের এই অংশটুকু আবৃত্তি করিয়া থাকেন। অধ্যাপক কালাণ্ড বলিয়াছেন যে যজ্ঞোপবীত মন্ত্রটি কাঠক আরণ্যক, বৌধায়ন, বৈখানস এবং পারস্কর গৃহ্যসূত্রে বিদ্যমান আছে এবং ইহা পরবর্তী বৈদিক যুগের রচনা। (ক)-চিহ্নিত যজ্ঞোপবীত মন্ত্রটির সম্পূর্ণ পাঠ নিম্নে পরিবেশিত হইল[২৪]

যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যৎ সহজং
পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং
বলমস্তু তেজঃ।

যাহাই হউক বলিদ্বীপের যজ্ঞোপবীতমন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্রের আংশিক আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্যধর্মের ইতিহাসে গায়ত্রী মন্ত্রের একটি বিশেষ স্থান আছে। এই মন্ত্র অব্রাহ্মণের নিকট পৌঁছা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। দ্বীপময় ভারতে এই মন্ত্রের আবির্ভাব হইতে আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি যে সেযুগের ব্রাহ্মণগণ হিন্দুশাস্ত্রের বিধান অনেকটা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। গায়ত্রী মন্ত্রে দ্বিজাতি ভিন্ন অন্য কাহারো অধিকার ছিল না। সুতরাং আমরা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারি যে ভারতবর্ষাগত ব্রাহ্মণগণই এই গায়ত্রীমন্ত্র জাভা-বলিদ্বীপে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহারা একদিন স্থানীয় ব্রাহ্মণগণকে এই গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন। যবদ্বীপে-বলিদ্বীপে অবশ্য চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এই চতুর্বর্ণের কথা সাহিত্যে এবং অনুশাসনলিপির বিভিন্ন স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বীপময় ভারতের এই স্বদেশী

ব্রাহ্মণগণকে যদি গায়ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রে দীক্ষিত করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের মাধ্যমেই বংশ-পরম্পরায় এই মন্ত্রগুলি আমাদের হাতে পৌঁছিয়াছে। সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনুরূপক্ষেত্রে মন্ত্রদানের এই ব্যবস্থা অনুমোদন করিতে পারিত কি না সন্দেহস্থল।

যজ্ঞোপবীত মন্ত্র শেষ হইলে আমরা পূজার অন্তিম পর্যায়ে আসিয়া উপনীত হই। এই পর্যায়ে ১০৮ বার জপের মালা ফিরাইতে হইবে এবং প্রার্থনা ও ধ্যান করিতে হইবে। পূজার সময় শিব উপাসকের দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, পুজান্তে তিনি উপাসকের উদরগহ্বরে প্রবেশ করিলেই পূজা সুসম্পন্ন হইল।

পুজার প্রক্রিয়া দেখিয়া লেভী মহোদয় সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে পুজার মধ্যে তান্ত্রিক প্রভাব বিদ্যমান[২৫]। এতদ্ব্যতীত এই সমস্ত মন্ত্র ভারতবর্ষ এবং দ্বীপময় ভারতে অত্যন্ত গোপনে সংরক্ষিত হইত। পুরোহিতগণের হস্তে এই মন্ত্রজগতের চাবিকাঠি ছিল এবং তাঁহারা ইহা দ্বারাই গণমানসে শ্রদ্ধা এবং ভীতির সৃষ্টি করিতেন। তান্ত্রিক গুরুগণ তাঁহাদের মন্ত্রাদি আরো কঠোরতার সহিত সংগোপন রাখিতে চেষ্টা করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে : "কেহ হয়তো তাহার ধন-ঐশ্বর্য, এমন কি তাহার স্ত্রী এবং জীবনকে পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু সে কখনো অপরকে তাহার গুহ্যমন্ত্র দান করিবে না[২৬]।" গারুড়েয় মন্ত্রেও অনুরূপভাবেই উক্ত হইয়াছে :

"ইতি সঙ্ হঙ্ গরুড়েয় সমাপ্তম্। 'রহস্য সির', কয় তেনাক্র দে সঙ্ সধক।" অর্থাৎ গরুড়েয়-মন্ত্র সমাপ্ত হইল ; সাধক ইহাকে 'রহস্য' হিসাবে সঙ্গোপনে রক্ষা করিবেন।

আমরা এইবার জাভা-বলিদ্বীপের অন্যান্য মন্ত্র এবং স্তবস্তুতির আলোচনা করিব ; ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি আবার গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত হইয়াছে। মন্ত্র ও স্তবগুলির মধ্যে কোন কোনটির ভাস্কর্য বা মূর্তিশিল্পের দিক হইতেও যথেষ্ট মূল্য আছে ; কারণ এই মন্ত্রগুলিতে আরাধ্য দেবতার অঙ্গাদির বর্ণনা আছে। আমরা এইবার একটি বিষ্ণুমন্ত্র আলোচনা করিব, এই মন্ত্রটির নাম নরসিংহধ্যান। এই মন্ত্রে নরসিংহ বা বিষ্ণুর দুইটি বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথমাংশে দেবতার ভয়াল মূর্তির বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহার নাম হইল 'তীক্ষ্মমন্ত্র'। মন্ত্রের শেষাংশে তাঁহার মাঙ্গল্যের কথা বিবৃত হইয়াছে ; সুতরাং সঙ্গতভাবেই ইহাকে 'সৌম্যমন্ত্র' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বিষ্ণুর বাহন ছিলেন গরুড়, কিন্তু যবদ্বীপীয় ভাস্কর্যে বিষ্ণু অপেক্ষা বিষ্ণুর বাহনই যেন অধিকতর সমাদর লাভ করিয়াছে[২৭]। গরুড়ের মুখের ভয়ঙ্কর ভাব বিষ্ণুমূর্তির শান্ত মহিমার ছটায় আরো যেন ভয়াল হইয়া উঠিয়াছে। মোজোকের্তোর যাদুঘরে এই দেবতার অনেক সুন্দর মূর্তি সংরক্ষিত আছে।

নরসিংহমন্ত্র সহজবোধ্য সংস্কৃতভাষায় রচিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার স্থলে স্থলে যবদ্বীপের অবোধ্য রহস্যময় শব্দ অনুপ্রবেশ করিয়াছে। এই মন্ত্রে আমরা পড়িতেছি :

"ওম্ নরসিংহায় সর্বশক্রবিনাশায় পৎ। নরসিংহধ্যান সহাস্ত্র নির। উম্, হ্রুম্ খড়্গোশ্বরায় সর্বশক্রবিনাশায় পৎ ; পুর্, ম, উম্, হ্রুম সংখপাঞ্চজন্যায় সর্বশক্রবিনাশায়, পৎ, গ্নেঙ্গ, মুক, ম, উম্, হ্রুম, চক্র সুদর্শনায় সর্বশক্রবিনাশায় পৎ দ মুক, ম উম্ হ্রুম গদায় সর্বশক্রবিনাশায় পৎ নেঙ্গ

মুক উম্ হ্রুম চাপায় সর্বশত্রুবিনাশায় পৎ, প, মুক, ম, উম্ হ্রুম শরায় সর্বশত্রুবিনাশায় পৎ, ব, মুক, ম, উম্ হ্রুম টন্‌কায় সর্বশত্রুবিনাশায় পৎ, উ মুক ম উম্ হ্রুম অর্দ্ধচন্দ্রায় সর্বশত্রুবিনাশায় পৎ উ, মুক, ম, স্ম, কতুড়ুহন ইর সঙ্গ্ হঙ্গ্ অস্ত্র ইকি।"

মন্ত্রের উপরোক্ত অংশ হইতে দেখা যাইবে যবদ্বীপের অধিবাসীগণ বিষ্ণুকে নরসিংহাবতারে কিরূপে ধ্যান এবং উপাসনা করিতেন। ইহার পর আবার মন্ত্রে পড়িতেছি :

"ওম্ নরসিংহায় নমঃ উগ্র বিষ্ণুমহাবীর্যম জলন্তম্ সর্বতোমুখম্। নৃসিংহাভীষণম্ মৃত্যুমৃত্যুন্ নমাম্যহম্। তীক্ষ্ণমন্ত্র ইতি।"

যবদ্বীপের এই নরসিংহমন্ত্রকে ভারতীয় নরসিংহমন্ত্রের সহিত তুলনা করা যায়। মন্ত্রের সাধারণ-বিশেষত্ব প্রায় একই প্রকার। ভারতীয় নরসিংহ মন্ত্রও দেহকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য। আমরা নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিতেছি :

"উগ্রম বীরম্ মহাবিষ্ণুম্ জলন্তম্ সর্বতোমুখম্। নৃসিংহম্ ভীষণম্ ভদ্রম্ মৃত্যুমৃত্যুম্ নমাম্যহম্। দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ। কণ্ঠম্ পাতু ধ্রুবম্ ক্ষ্রৌম্ হৃদ্ভগবতে চক্ষুষী মম। নরসিংহায় চ জ্বালামালিনে পাতু মস্তকম্। দীপ্তদংষ্ট্রায় চ তথাগ্নি নেত্রায় চ নাসিকাম্। সর্বরক্ষোঘ্নায় সর্বভূতবিনাশায় চ। সর্বজ্বরবিনাশায় দহদহ পচদ্‌ব্যম্। রক্ষ রক্ষ বর্ম চাস্ত্রম্ স্বাহা পাতু মুখম্ মম। ক্লীম্ পায়াৎ পার্শ্বযুগ্মঞ্চ তারম্ নমঃ পদম্ ততঃ।"

এই দুইটি মন্ত্রের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে মন্ত্র দুইটির প্রথমাংশের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান নাই। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে যবদ্বীপীয় নরসিংহধ্যানের তীক্ষ্ণমন্ত্রটি আকস্মিকভাবে শেষ হইয়াছে। ইহার পর আমরা সোম্যমন্ত্র পাঠ করি ; উহার অন্তিমে লেখা আছে : "ইতি বজ্র নরসিংহ কহিলঙ্গন্ ইঙ্গ শত্রু দোন্‌ইর মুয়াঙ্গ শরীর রক্ষক।" ইহার অর্থ হইল : "এই বজ্র (বা অস্ত্র) নরসিংহের ; তিনি শত্রুহন্তারক এবং দেহরক্ষক।" এই অংশটুকুর সহিত দুইটি শ্লোক সংযোজিত হইয়াছে এবং তাহার সহিত যবদ্বীপীয় ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। যবদ্বীপীয় ব্যাখ্যা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই মন্ত্র যুদ্ধের সময় ব্যবহার করিতে হইবে এবং যিনি ইহা ব্যবহার করিবেন তিনি অবশ্যই যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন। ভারতীয় নরসিংহমূর্তি-মন্ত্রের শেষাংশে আমরা পড়িতেছি :—

"ত্রৈলোক্যম্ ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।
ভূতপ্রেতাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষসা দানবাশ্চ যে।
তম্ দৃষ্ট্বা প্রপলায়ন্তে দেশাদ্দেশান্তরম্ ধ্রুবম"—ইত্যাদি।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে যবদ্বীপীয় মন্ত্রে ও ব্যাখ্যায় যে উদ্দেশ্যের কথা বলা হইয়াছে ভারতীয় মন্ত্রেও তাহা সমর্থিত হইতেছে।

লম্বক-সংগ্রহের ৫৩২৫ সংখ্যক পুঁথিও একটি বিষ্ণুমন্ত্র ; উহার নাম বিষ্ণুস্তব। এই পুঁথি এবং ৫৩৩৫ সংখ্যক পুঁথি ভারতীয় রীতিতে 'স্বাহা' শব্দ দ্বারা সমাপ্তিলাভ করিয়াছে। এই দুইটি পুঁথিই সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা এইবার লেভী মহোদয়[২৮] কর্তৃক বিধৃত একটি বিষ্ণুস্তবের অংশ বিশেষ এই স্থলে পরিবেশন করিতেছি। উহা ৫৩৩১ সংখ্যক পুঁথিতেও খণ্ডিত

এবং বিকৃতরূপে বিদ্যমান[২৯]। এই শ্লোকগুলির তুলনা ভারতীয় সাহিত্যে এবং মন্ত্রে অজস্র পরিমাণে পাওয়া যাইবে।

"পাদৌ রক্ষতু গোবিন্দো জঙ্ঘাভ্যাং চ ত্রিবিক্রমঃ।
ঊর্বস্তং কেশবো রক্ষেদ্রক্ষেদ্‌গুহ্যং তথা হরিঃ॥
উদরং পদ্মনাভশ্চ কটিং চৈব জনার্দনঃ।
নাভিকমচ্যুতো রক্ষেৎ পৃষ্ঠং রক্ষতু মাধবঃ॥
বামপার্শ্বে স্থিতো বিষ্ণুর্দক্ষিণে মধুসূদনঃ।
বাহ্বঙ্গৌ[৩০] বাসুদেবশ্চ নরসিংহো হৃদি স্থিতঃ॥
কণ্ঠং রক্ষতু বরাহঃ কৃষ্ণশ্চ মুখমণ্ডলম্‌।
মাধবঃ শ্রোত্রসংস্থিতো হৃষীকেশশ্চ নাসিকে॥
নেত্রে নারায়ণো রক্ষেল্ললাটং গরুড়ধ্বজঃ।
কপোলে বৈনতেয়শ্চ কেশবো শিরসিস্থিতঃ॥"

স্তবটি দীর্ঘ এবং ভারতীয় সংস্করণে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে বিষ্ণুপঞ্জর। এই নামটি যবদ্বীপীয় বিষ্ণুস্তবের প্রথম চরণেই রক্ষিত হইয়াছে। লেভী মহোদয় এই সুন্দর স্তবটি বৃহৎ স্তোত্ররত্নাকর (পৃঃ ৪৩) এবং অন্যত্র খুঁজিয়া পাইয়াছেন[৩১]। এই স্তবের শেষাংশ আমাদিগকে ভারতীয় পুজা-পার্বন বা ব্রতকথার স্বস্তি-বাচনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এখানে মন্ত্ররচয়িতা উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে যাহারা এই মন্ত্রপাঠ করিবে তাহারা বিষ্ণুলোকে যাইবে এবং "ডাকিনী ভূতপ্রেতেস্থ[৩২] ভয়ং নাস্তি কদাচন, অপুত্রো লভতে পুত্রং ; ধনহীনো ধনং লভেৎ, মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং সদাহশ্নুতে[৩৩]॥

বিষ্ণুস্তবের একটি গদ্যসংস্করণও বলিদ্বীপে প্রচলিত আছে ; উহা লেভী মহোদয়ের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় উহার ভারতীয় মূল এখনো আবিষ্কৃত হয় নাই[৩৪]। জাভা-বলিদ্বীপে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রকৃতি কিরূপ ছিল তাহা এই সকল মন্ত্র হইতে অনেকটা সুপরিস্ফুট হয়।

এইবার আমরা দুইটি শিবস্তবের উল্লেখ করিব। এই দুইটি স্তবও লেভী মহোদয়ের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে[৩৫]। ইহার মধ্যে প্রথমটি অবিমিশ্র স্তব, দ্বিতীয় স্তবটি শিবের প্রতি উদ্দিষ্ট রক্ষা—প্রার্থনার স্তব। প্রথমটির আরম্ভ এইরূপ :

"ওঁ নমঃ শিবায় শর্বায় দেবদেবায় বৈ নমঃ।
রুদ্রায় ভুবনেশায় শিবরূপায় বৈ নমঃ॥
ত্বং শিবস্ত্বং মহাদেব ঈশ্বরঃ পরমেশ্বরঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ পুরুষ প্রকৃতিস্তথা॥

নমস্তে দেবদেবেশ ঈশান বরদাচ্যুত
মম সিদ্ধং ভূয়শ্চ ত্বং সর্বকার্যেষু শঙ্কর

নমস্তে দেবদেবেশ ঈশান বরদাচ্যুত।
বাক্যে হীনেঽতিরিক্তে বা মাং ক্ষমস্ব সুরোত্তম ॥

অপর স্তবটির আরম্ভ হইল :

"ওঁ শিবঃ কর্তা শিবো ধাতা শিবো দত্তবরপ্রদঃ।
শিবো রক্ষতু মাং নিত্যং শিবায় চ নমোঽস্তু তে ॥
শিবো ভোক্তা শিবো ভোগ্যং দাসকং চ শিবাত্মকম্।
যজমানঃ শিবশ্চাপি মাং রক্ষতু নমোঽস্তু তে ॥

বিষস্থানাস্তু যে সর্বে সরীসৃপপিপীলিকাঃ।
সর্বঃ শিবগণশ্চৈব মাং রক্ষতু নমোঽস্তু তে ॥"

ভারতবর্ষের সাহিত্যে, মন্ত্র এবং স্তবে শ্রী দেবী লক্ষ্মীরূপে সমাদৃতা হইলেও শ্রী রূপে তিনি গণমানস জয় করিতে পারেন নাই। জাভা এবং বলিদ্বীপে তাহার স্থান ছিল অনন্য-সাধারণ ; তিনি সেস্থলে শ্রীতাণ্ডুলী বা ধান্যরাজ্ঞী রূপে পূজিতা হইয়াছেন। ভারতবর্ষেরও কোন কোন স্থলে লক্ষ্মীরূপে তাঁহার এই রূপটি দেখিতে পাইতেছি। বাঙ্‌লাদেশের লক্ষ্মীপুজায় ধান্যের ছড়া, অলংকরণে ধান্যের চিত্র, কদলীবৃক্ষের খোল দ্বারা রচিত ধান্যের বেড় জাভা এবং বলি-দ্বীপের শ্রীর রূপটির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বাংলাদেশ হইতে লক্ষ্মীর এই শ্রীরূপটি দ্বীপময় ভারতে গিয়া পৌঁছিয়াছে কিনা বলা শক্ত। যদি লক্ষ্মীর শ্রীতাণ্ডুলী বা ধান্যরাজ্ঞীরূপ বাঙ্‌লাদেশ হইতে গিয়াও থাকে তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ স্থলে শ্রীর সহিত ধান্যের সম্পর্ক নিবিড়তর হইয়াছে। বলিদ্বীপের একটি কিম্বদন্তীর কথা লেভী মহোদয় এই প্রসঙ্গে অবতারণা করিয়াছেন[৩৬]। এই কিম্বদন্তীটির বিভিন্ন সংস্করণ দ্বীপময় ভারতে প্রাচীন যুগে প্রচলিত ছিল এবং ইহা আমরা এই গ্রন্থের অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। লেভী মহোদয় বলিয়াছেন যে শ্রী যখন বিষ্ণুর উদ্যানে স্নান করিতেছিলেন তখন রূপমুগ্ধ জনৈক দৈত্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে বলপূর্বক পরিগ্রহণ করেন। শ্রী বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পন করেন, কিন্তু ইহার পর তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহাকে সমধিস্থ করা হয়। অতঃপর তাঁহার দেহ হইতে কয়েকটি লতাগুল্মের সৃষ্টি হইল। তাঁহার নাভি হইতে সৃষ্টি হইল সবহ্-ধান্য। সবহ্-ধান্য জলসিঞ্চিত ক্ষেত্রে জন্মিয়া থাকে। ধান মাড়াই করার পূর্বে কর্তিত ধান্যকেও শ্রীদেবী নামে আখ্যাত করা হয় এবং ধান্যবীজকে বলা হয় উমাদেবী। ধান্যচারার নাম হইল গিরিনাথ ; স্থানান্তরিত ধান্য-চারাকে বপন করিবার পর উহার নাম হয় গঙ্গাদেবী। লেভী মহোদয় বলিয়াছেন যে শ্রীদেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত পল্লীমন্দিরগুলি জলসিঞ্চিত ক্ষেত্রে কিংবা ঐ প্রকার ক্ষেত্রে যাইবার পথের পার্শ্বে নির্মিত হইয়া থাকে। শ্রীদেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই স্তবটি দ্বীপময় ভারতে রচিত হইয়া থাকিলে রচয়িতার প্রশংসা করিতে হইবে ; লেভী মহোদয়ও স্তবটির ভাষা এবং ছন্দের প্রশংসা করিয়াছেন। ইহার প্রথম চারিটি চরণের পর আমরা পড়িতেছি :

"শ্রীশালিকান্তরূপা ত্বং স্নিগ্ধগাত্রং চ তাণ্ডুলম্।
দদাসি মে সদা চিত্রং সৌভাগ্যং লোকপূজিতম্॥
শ্রীতাণ্ডুলী মহাদেবী শ্রীমল (ত্ ?) কমলশোভিতা।
দদাসি মে মহাভোগ্যং সর্বদ্রব্যহিতং ধনম্॥

শ্রীধান্যরাজ্ঞী ত্বং দেবী প্রাণস্তাণ্ডুলসংজ্ঞক।
মহী রত্নসভাস্থিতা সর্বরত্নগুণান্বিতা॥"

এই স্তবের শেষাংশে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং ঈশ্বরের আত্মা বা পরমাত্মাকে নমস্কার করিয়া বলা হইয়াছে :

"ওঁ শ্রীবুদ্ধাত্যাত্মনে নমঃ স্বাহা। ওঁ শ্রীধর্মানিষ্কলাত্মনে নমঃ স্বাহা। ওঁ শ্রীসঙ্ঘশূন্যাত্মনে নমঃ স্বাহা।" অর্থাৎ এই মন্ত্রের রচয়িতা একদিকে যেমন হিন্দু ত্রিমূর্তিকে প্রণাম জানাইতেছেন তেমনি আবার বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘকেও প্রণাম করিয়া উভয় ধর্মজগতের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অগ্নিস্তুতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লেভী বলিয়াছেন যে ইহার অংশবিশেষ বুদ্ধবেদের মধ্যেও সন্নিবেশিত হইয়াছে[৩৭]। আকাশস্তবটি পড়িতে গিয়া দেখিতেছি যে উহা বিভিন্ন স্তবকের সমষ্টি। ক্যাট অ্যাঞ্জেলিনো বলিয়াছেন[৩৮] যে বলিদ্বীপের শবদাহ করিবার সময় অথবা অন্য কোন সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠানাদির সময় আকাশস্তবটি শেষাংশে আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। হাল্কা কাষ্ঠ-নির্মিত বিরাট রথ নির্মান করিয়া উহা রঙীন কাগজে সুসজ্জিত করা হয়; রঙ-বেরঙের কাগজ নির্মিত অদ্ভুতদর্শন পশুমূর্তিও উহাতে সন্নিবেশিত থাকে। ইহার পর বহু পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে সমস্ত স্থল মুখর হইয়া উঠে এবং রথটিতে অগ্নিপ্রজ্জ্বালন করিয়া দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে আকাশস্তবটি পাঠ করা হয়। সিলভাঁ লেভী বলিয়াছেন যে এই স্তবটি বিনায়কস্তোত্রের মধ্যেও উদ্ধৃত হইয়াছে[৩৯]। তিনি আরো বলিয়াছেন যে মাদ্রাজের কানাড়া-হস্তাক্ষরে লিখিত ঐ পুঁথিটির অন্তিমে লেখা আছে :

"ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে স্কন্দ প্রোক্তং বিনায়কস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।" ইহা হইতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই আকাশস্তব বা বিনায়কস্তোত্রটি যবদ্বীপের ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের পুঁথিতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই চেষ্টা সার্থক হয় নাই। যাহাই হউক, এই আকাশ-বিনায়ক স্তবের ৩৮ চরণ হইতে (এক-দন্তং মহাকায়ং) হইতে ৫৩ চরণ (সর্বসিদ্ধি প্রদাতারং বন্দে'হম্ গণনায়কম্") পর্যন্ত অংশটি গণেশাষ্টক নামে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে[৪০]। এই স্তবটির আরম্ভ পড়িলেই মনে হইবে ইহার নাম আকাশ স্তব না হইয়া বিনায়ক স্তব হইলেই সুসঙ্গত হইত :

"দেবদেবসুতং দেবং জগদ্বিঘ্নবিনায়কম্।
হস্তিরূপং মহাকায়ং সূর্যকোটিসমপ্রভম্॥"

এই স্তবের শেষাংশ সামান্য পরিবর্তিতরূপে অন্যত্রও পাওয়া যায়। আলোচ্য স্তবটির শেষ দুই চরণে আমরা পড়িতেছি :

"সর্বমঙ্গলমঙ্গলে শিবে সর্বপ্রসাদকে।
ইত্যেবমাদি চরিতং সর্বব্যাধিহরং শুভম্॥"

দ্বাদশস্মর (স্মরস্তুতি) এবং ইন্দ্রানী স্তবটিতে কামদেব এবং ইন্দ্রানীর বিভিন্ন নামের সমাবেশ দেখিতেছি। ইহার লক্ষণীয় কোন বিশেষত্ব না থাকিলেও গদ্যে রচিত ঈশ্বর স্তবটি আশ্চর্য রূপে সুন্দর। দীর্ঘসমাস বদ্ধ বাক্যগুলি ভাবগম্ভীর এবং শ্রুতিমধুর। বলিদ্বীপে উমার প্রতি উদ্দিষ্ট একটি সংক্ষিপ্ত স্তবও আছে, কিন্তু গঙ্গাস্তবটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং ইহার অংশ বিশেষ বিভিন্ন মন্ত্রের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। ইহার "পাপী'হম্ পাপকর্মা'হম্ পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ" অংশটি পূর্বেই অন্যান্য মন্ত্রের মধ্যে পড়িয়াছি। লেভী মহোদয় বলিয়াছেন যে এই স্তবে বেদ-পরিক্রম হইতে দুইটি অংশ সংযুক্ত হইয়াছে[৪১]। বলিদ্বীপের আর একটি স্তবের নাম পিতৃস্তব। উহা পূর্ব-পুরুষের স্তব এবং ইহার শেষাংশে আমরা পড়িতেছি :

"সোমপাশং চ বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং চ বির্ভুজঃ।
বৈশ্যানাং মদ্যপানং চ শূদ্রাণাং তু সুখার্থিনাম্॥"

লেভী মহোদয় পূর্বেই বলিয়াছেন যে স্তবের এই অংশটি বুদ্ধবেদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। পৃথিবীস্তব নামক আর একটি স্তব বলিদ্বীপে বিদ্যমান। ইহার মধ্যে যবদ্বীপীয় স্পু, সঙ্গ প্রভৃতি শব্দ অনুপ্রবেশ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভৈরবস্তব নামক একটি তান্ত্রিক সাধনা এবং মহাদেব-স্তব, যমরাজস্তব, যমস্তব (ভূত-স্তব), রতিস্তব প্রভৃতি স্তবও বলিদ্বীপে বর্তমান আছে। এই-গুলির মধ্যে যমরাজস্তব এবং রতিস্তব অত্যন্ত বিকৃতরূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। যমস্তবের মধ্যে কয়েকটি চরণ বিদ্যমান যাহা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে ভারতবর্ষের অন্যান্য মন্ত্রের মধ্যেও বিদ্যমান।

"সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্য শিব সর্বপ্রসাদক।
শরণ্য এ্যম্বকদেব নারায়ণ নমোঽস্তু তে॥
শরণাগতানাং নাথ পরিত্রাণ পরায়ণ।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

ইহার প্রথম চরণটি আকাশস্তবেও বিদ্যমান।

এইবার আমরা বরুণস্তবটির আলোচনা করিব, কারণ বলিদ্বীপে বরুণদেবের একটি বিশেষ স্থান ছিল যাহা ভারতবর্ষে অনুপস্থিত। বরুণ বৈদিক যুগ হইতেই জলের দেবতা, কিন্তু বলিদ্বীপে মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সহিত সম্পর্ক গৌরবেই তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ধিত হইয়াছে। বলিদ্বীপে সমুদ্রসৈকতে বরুণদেবতার অনেক মন্দির আছে। মৃতদেহ সৎকার করা হইলে ভস্মাবশেষ বরুণদেবের মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়, সেখানে দেবতার পূজা শেষ হইলে ভস্ম নৌকায় লইয়া গিয়া গভীর সমুদ্রে বিসর্জন দেওয়া হয়। মৃতের সহিত সংযোগ এই স্তবটিতেও প্রতিফলিত হইয়াছে। মৃতভূমিশুদ্ধ, মৃতভূমিসমুদ্র, মৃতদেবং, মৃতভূমিমহাসিদ্ধম্, মৃতকমণ্ডলু-দিব্যং প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ এই পরিচয়ের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। বায়ুস্তবটি প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান প্রভৃতির প্রশস্তিতে রচিত হইয়াছে,[৪২] কিন্তু বিষয়বস্তুর মধ্যে তান্ত্রিক প্রভাবও বিদ্যমান রহিয়াছে। মন্ত্রটি গদ্যে রচিত এবং ইহার প্রথমেই আমরা পড়িতেছি : "ওঁ প্রাণো

বায়ুমূর্তিনাম মুখস্থানং প্রতিষ্ঠা সিদ্ধিযোগবন্তং বজ্রে সর্বমন্ত্রসিদ্ধৈ পূজা। অপানো বায়ুমূর্তিনাম্ পুরুষপ্রতিষ্ঠালিঙ্গং সর্বাভিচারমোক্ষণং বিঘ্নদোষবিনাশনং নমঃ স্বাহা।" পরবর্তী একটি ছত্রে পড়িতেছি : "কুর্মো বায়ুবীর্যনাম গুহ্যপ্রতিষ্ঠা লিঙ্গং" ইত্যাদি।

বাসুকি-স্তবটি বিশেষত্ব-বর্জিত গদ্যে রচিত একটি ক্ষুদ্র স্তব। স্তবটির মধ্যে বাসুকি শব্দের উল্লেখ নাই; এই দিক দিয়া স্তবটি অসামান্যতা অর্জন করিয়াছে। বলিদ্বীপে আমরা আরো একটি স্তব পাইতেছি, উহা হইল অনুষ্টুভ্‌ছন্দে রচিত ভট্টারীসরস্বতীস্তুতি। ভারতবর্ষে পৌরাণিক সরস্বতীমূর্তি সাধারণতঃ শ্বেতবসনা; বলিদ্বীপের এই স্তুতিতে তাঁহাকে বলা হইয়াছে পঞ্চবর্ণসমন্বিতা[৪৩]। যবদ্বীপের তান্ত্রিক শৈব সাহিত্যের কোন কোন স্থলে (যেমন ভুবনকোষ) দেবতার পঞ্চবর্ণের কথা বলা হইয়াছে, এস্থলে তাহারই প্রভাব প্রতিফলিত হওয়া অসম্ভব নহে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে এই স্তুতির একটি সংস্করণের শেষ দুইটি চরণ বিশেষ অর্থবহ বলিয়া মনে হয় :

"কাব্যং ব্যাকরণং তর্কং বেদশাস্ত্রপুরাণকম্।
কল্পসিদ্ধীণি তন্ত্রানি ত্বৎপ্রসাদাৎ করোক্ষভেৎ ॥

লেভী মহোদয় এই স্তুতিটির অংশবিশেষের ভারতীয় উৎসের সন্ধান পাইয়াছেন, কিন্তু সেই উৎসস্থল দক্ষিণভারত[৪৪]। স্তবে সরস্বতী-মূর্তির যে-রূপ মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহা বাঙ্‌লাদেশের দ্বিভুজা, শ্বেতবসনা সরস্বতী মূর্তির নহে, তান্ত্রিক সরস্বতীমূর্তির সহিতও ইহার সাদৃশ্য যৎসামান্য। সুতরাং আলোচ্যস্তবের সরস্বতী দক্ষিণ-ভারতের এবং ইহা আর একবার দক্ষিণভারতীয় প্রভাবের পরিচয় ঘোষণা করিল। বলিদ্বীপের অন্যান্য স্তবের মধ্যে একাধিক সূর্যস্তবের সাক্ষাৎ পাইতেছি। সিলভাঁ লেভী বলিয়াছেন যে উহার মধ্যে যেটি দ্বাদশাদিত্যের স্তব তাহা অংশতঃ ভবিষ্যোত্তর পুরাণের আদিত্যহৃদয় স্তোত্র হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। এই সূর্যস্তবগুলির মধ্যে সূর্যকে শিবের সহিত অভিন্ন প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়[৪৫]।

এইবার আমরা বৌদ্ধ স্তবস্তুতিগুলির আলোচনা করিব। ইহার মধ্যে পঞ্চদশরসস্তুতি (বা পঞ্চদশ বজ্রদেবতাস্তুতি) নিঃসন্দেহে বৌদ্ধ তান্ত্রিক স্তুতি; ইহা পঞ্চদশ বজ্রদেবতার উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট হইয়াছে। এই স্তুতিটিতে বিবৃত পঞ্চদশ দেবতার নাম ভারতবর্ষের বিভিন্ন বৌদ্ধ তান্ত্রিকগ্রন্থে বিদ্যমান, কিন্তু স্তুতিটির উৎসস্থল এখনো নির্ধারিত হয় নাই। বৌদ্ধগণের আর একটি স্তুতির নাম শ্রীযজুর্বেদ বুদ্ধস্তুতি। বলা বাহুল্য ইহার সহিত যজুর্বেদের কোন সম্বন্ধই বিদ্যমান নাই, কিন্তু নামের মধ্যে আমরা যেমন হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী লক্ষ্য করি, বিষয়বস্তুর মধ্যেও তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে। এই স্তুতির তৃতীয়-চতুর্থ চরণে পড়িতেছি হিন্দু ত্রিমূর্তির বন্দনা :

"পুরস্তাদীশ্বরঃ স্থাপ্যো ব্রহ্মা দেবশ্চ দক্ষিণে।
পশ্চিমে তু মহাদেবো বিষ্ণুরুত্তরখণ্ডকে ॥"

সমস্যা হইল আমরা যদি ব্রহ্মাকে দক্ষিণে, পশ্চিমে মহাদেবকে এবং বিষ্ণুকে উত্তরখণ্ডে স্থাপন করি তাহা হইলে সম্মুখে যাহাকে স্থাপনা করিব সেই ঈশ্বরটির স্বরূপ কি? যবদ্বীপে ঈশ্বর

বলিতে সাধারণতঃ শিবকে বুঝাইত; কিন্তু তিনি তো মহাদেবরূপে পূর্বেই পশ্চিমদেশে বিরাজমান রহিয়াছেন। ইনি কি তথাগত? ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ চরণে আবার পড়িতেছি ছন্দ, ধর্ম এবং সঙ্ঘের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন :

"সদা বুদ্ধিমিদং জ্ঞানং সদা ধর্মমিদং জ্ঞানম্।
সদা সঙ্ঘমিদং জ্ঞানং পরমশ্চ তথাগতঃ ॥"

বলিদ্বীপের আর একটি বৌদ্ধ স্তুতির নাম হইল বৌদ্ধমূলস্তুতি (বোধিমূলস্তুতি); ইহা শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে রচিত। এই স্তুতিটি বুদ্ধবেদের মধ্যেও বর্তমান আছে[৪৬]। বজ্রানলস্তুতিটি বৌদ্ধ তান্ত্রিকপর্যায়ের স্তুতি। লেভী মহোদয় স্তুতিটির মধ্যে বজ্রানল শব্দটি না পাইয়া বলিয়াছেন যে হয়তো কোন অজ্ঞাত কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কারণেই এই নামকরণ করা হইয়াছে। এই স্তুতিতে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের পঞ্চসহচর, যথা যমরাজ, ভবাভব, সিংহাভব, মন্থন এবং বৎসলকে প্রণতি জানানো হইয়াছে। লেভী-ধৃত পাঠে ইহাদের দুইজনের নাম হইয়া গিয়াছে ভাবাভাব এবং সিংহবাহ। অপর আর একটি বৌদ্ধ তান্ত্রিক স্তুতির নাম হইল সর্বসিদ্ধি স্তুতি। এই স্তুতিটির ভাষায় ইন্দোনেশীয় উপাধি এবং শব্দের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, ম্পু, সি, ইঙ্গ, সির প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার ইহার পরিচায়ক। এই স্তুতিটি পড়িয়া মনে হয় যে ইহা ইন্দোনেশীয় বৌদ্ধ তন্ত্রাচার্যগণের প্রতি উদ্দিষ্ট একটি প্রশস্তি; এই সমস্ত তন্ত্রাচার্যগণের নামের মধ্যে আছে ভদন্ত, সম্বুদ্ধ, বুদ্ধ, বজ্রপুর, হম্বস্ত, মহাযান, বজ্রপণ্ডি, সঙ্ঘার্যবজ্র, গগনবজ্র। লেভী অনুমান করিয়াছেন যে এই নামগুলি সম্ভবতঃ শিষ্যপরম্পরানুযায়ী বিধৃত হইয়াছে।

এইবার আমরা আর একটি স্তুতির আলোচনা করিব; ইহার নাম হইল সূর্যানন্দস্তুতি। স্তুতিটি হিন্দুবৌদ্ধ দেবতার সংমিশ্রণে এক অপূর্ব রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। স্তবটি গদ্যে রচিত। ইহার মধ্যে আমরা বিষ্ণু, কেশবমহর্ষি, পিঙ্গলমহর্ষি প্রভৃতির উল্লেখ পাইতেছি; অন্যদিকে আছেন অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমোঘসিদ্ধি এবং বৈরোচন। স্তুতিরচয়িতা এই সমস্ত বৌদ্ধদেব-গণের সহিত সূর্যদেবের অভিন্নতা কল্পনা করিয়া উভয়ের উদ্দেশ্যে "মহাগঙ্গায়ৈঃ নমঃ স্বাহা" বলিয়া প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন।

এইবার আমরা আর একটি স্তুতির আলোচনা করিয়াই বলিদ্বীপ তথা যবদ্বীপের মন্ত্র এবং স্তুতিপর্যায়ের আলোচনা পরিসমাপ্ত করিব। আলোচ্য স্তুতিটি আজিও ভারতবর্ষের রক্ষণশীল পরিবারের মহিলারা প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার পূর্বে আবৃত্তি করিয়া থাকেন :

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যম্ মহাপাতকনাশনম্ ॥
পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দনঃ ॥
প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যম্ দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্যোদয়ে যথা ॥"

এই শ্লোকগুলির প্রথমাংশের "ব্রহ্মামুরারীস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুশশী" ইত্যাদি (এ স্থলে উদ্ধৃত করা হয় নাই) এবং শেষাংশের "পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা" প্রভৃতি চরণ দ্বীপময় ভারতে প্রচলিত ছিল কিনা তাহা আমাদের অজ্ঞাত কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত দুইটি চরণ জাভা-বলিদ্বীপের মন্ত্র-সাহিত্যে আবিষ্কার একটি বিস্ময়কর ঘটনা। এই চরণ দুইটি যেরূপে যেখানে বিদ্যমান তাহা হইল :

"ওম্ অহল্যা দ্রোপদীসীতদর মন্দোদরী তত
পঞ্চকন্যা স্মরে নিত্যম্—"

উপরোক্ত শ্লোকটির মধ্যে কুন্তীদেবীর স্থলে সীতাদেবীর আবির্ভাব রামায়ণের অধিকতর জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য দেয়। উপরে আমরা যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার শেষে লেখা আছে : "ওম্ সর্বরোঘ বিঘ্ন শত্রু ব্যুঃ ফট্ নমঃ স্বাহা।"

দেবতার বা দেবতুল্য সাধুপুরুষের উদ্দেশ্যে রচিত এই শ্রেণীর মন্ত্র এবং স্তব ব্যতীত আর এক শ্রেণীর মন্ত্র আছে, যাহাকে বাংলাতে আমরা ঝাড়ফুক-তুক্‌তাক্ বলিয়া থাকি। ইংরাজীর charm বা যাদুমন্ত্র দ্বারা ইহার সবটা অর্থ সম্ভবতঃ প্রকাশিত হয় না। এই দুই শ্রেণীর মন্ত্রের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইল এই যে পূর্বালোচিত মন্ত্রগুলির পরিবেশ বিভিন্ন : উহাতে দেবতার আশির্বাদ যাজ্ঞা করা হইয়াছে অথবা ভগবানের নিকট রক্ষার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এইবার আমরা যে শ্রেণীর মন্ত্রাদির আলোচনা করিব তাহার পরিবেশও বিভিন্ন। উহা অনেক সময় আধিব্যাধি বা শারীরিক রোগ নিরাময়ের জন্য প্রয়োগ করা হইয়া থাকে ; কখনো বা ব্যর্থ প্রণয়ী প্রণয়িনীকে নিজের আয়ত্বাধীনে আনিবার জন্য ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহার প্রধান লক্ষণ হইল : মন্ত্রোচ্চারণকারীর প্রার্থনা যদি দেবগণ পূরণ না করেন তাহা হইলে তাহাদিগকে অভিসম্পাত বা শাস্তি দিবার ভয় প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। এই মন্ত্র যাহারা উচ্চারণ করিবেন তাঁহাদের ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত সম্প্রদায়ের লোক হইবার কোন প্রয়োজন নাই কিন্তু মন্ত্রগুলি সংগোপনে রক্ষা করিবার দায়িত্ব ইহাদের উপর ন্যস্ত আছে। গুরুর শিষ্য না হইলে আবার এই শ্রেণীর মন্ত্রলাভ করিবার উপায় নাই এবং শিখিয়া প্রকাশ করিলেও ইহা ফলপ্রদ হয় না বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এই শ্রেণীর মন্ত্র-সাহিত্যের সৃষ্টি এবং বিকাশে শৈব এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের অবদান নিতান্ত কম ছিল না এবং ইহারাই অংশতঃ অথর্ব বেদের ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক ছিলেন বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। বস্তুতঃ যাহারা মন্ত্রগুরুর গৌরব বা অভিমান লইয়া সমাজে আবির্ভূত হইয়াছিলেন অথচ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া চিরাচরিত প্রথায় মন্ত্রপাঠ করিবার অধিকারী ছিলেন না, তাহাদের কেহ কেহ যে এই জাতীয় মন্ত্রসাহিত্যের প্রবক্তা ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। মনে হয় এই শ্রেণীর মন্ত্রতন্ত্র তান্ত্রিক বিশ্বাস এবং প্রাচীন সংস্কারকে অবলম্বন করিয়াই ভারতবর্ষে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এই উৎস হইতেই ইহা দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ায় এবং দ্বীপময় ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল।

উপরোক্ত লক্ষণগুলির কথা স্মরণ রাখিয়া আমরা যদি গরুড়ের মন্ত্র বিচার করি তাহা হইলে মনে হইবে যে গরুড়ের মন্ত্র আদৌ মন্ত্র নহে ; উহা সর্পদংশন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য

একটি ঝাড়ফুক তুক্‌তাক্‌ মাত্র। এই মন্ত্রে বিষ্ণুর বাহন গরুড়কে সর্পবিষের দোষ নষ্ট করিবার জন্য আবাহন করা হইয়াছে। প্রায়শঃ আমরা বিষপহ, বিষহরি, বিষদহ প্রভৃতি শব্দের বা শব্দ-গুচ্ছের ব্যবহার দেখি। এইরূপ ধরণের তুক্‌তাক্‌ মন্ত্র সমগ্র ভারতবর্ষেই প্রচলিত ; বাঙ্‌লা-দেশেও এই সম্বন্ধে বিপুলায়তন অপ্রকাশিত মন্ত্রসাহিত্য বিদ্যমান।

অনেকদিন পুর্ব প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া মীর খোরাম আলি কতকগুলি বাঙ্‌লা ঝাড়ফুক তুক্‌তাক্‌ মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত তথাকথিত মন্ত্রের মধ্যে যে-সমস্ত দেবদেবীর আবাহন করা হইয়াছে তাহার মধ্যে আছেন মনসা, শিব, কালি, গরুড়, কৃষ্ণ প্রভৃতি। এই শ্রেণীর মন্ত্রের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাই 'মৃতবৎসা'-নামক মন্ত্রে। এই মন্ত্রের উদ্দেশ্য হইল স্ত্রীলোক মৃতবৎসা হইলে তাহার প্রতিবিধান করা। পুর্বে আমরা ঝাড়ফুক তুক্‌তাক্‌ মন্ত্রের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছি ইহাতে তাহার সমস্ত লক্ষণই বিদ্যমান। নিম্নে এই মন্ত্রটি পরিবেশন করা হইল :

"খোলা খোলা ওরে খোলা, তোরে দেখিবারে পাই,
হনুমানের কৃপায় তোরে সাপটিয়া পাই।
কেন তুমি করো মোরে ওরূপ ক্যাজাই॥
পশ্চাতে কালিকা মা, সম্মুখেতে শিব,
চতুর্দিকে রক্ষা করে হয়ে চতুর্দিক।
এ মন্ত্র যদি নড়ে, মহাদেবের জটা ছিঁড়ে
কালিকার পদে পড়ে।
কার আজ্ঞে ?
কামরূপ কামিখ্যা মায়ের আজ্ঞে।
শীঘ্রি লাগ্‌গে॥"

এই ধরণের অপ্রকাশিত বিপুলায়তন মন্ত্র সাহিত্য দক্ষিণপুর্ব এসিয়াতে বিদ্যমান। অথর্ব-বেদের যুগে আমরা এই শ্রেণীর মন্ত্রের যে শৈশবাবস্থা দেখিয়াছিলাম, কৌটিল্যের যুগে তাহার অনেকটা বিকাশলাভ ঘটিয়াছে। কৌটিল্য পশু বিহ্বল করিবার, রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিবার, আকৃতি পরিবর্তন করিবার ব্যাপারে এই শ্রেণীর মন্ত্র প্রয়োগের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই যুগ হইতে আজ পর্যন্ত এই শ্রেণীর মন্ত্রসাহিত্য নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া বর্তমান আকার পরিগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে আস্থাবান মানবমন ক্রিয়াশীল ছিল তাহা আধুনিক সভ্যতার চাপে আর কতদিন বিদ্যমান থাকিবে বলা শক্ত ; সুতরাং যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত এই শ্রেণীর মন্ত্রসাহিত্য অবলুপ্ত হইবার পুর্বেই যাহাতে অন্ততঃ সাহিত্য হিসাবে উহা সংরক্ষিত হয় তাহার জন্য অবহিত হওয়া প্রয়োজন। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ধ্যানধারণার এবং ভাবনার অভিব্যক্তি এই জাতীয় মন্ত্রসাহিত্যে বিদ্যমান ; সুতরাং এই বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে।

এই শ্রেণীর হিন্দু-মালয়-পলিনেশীয় মন্ত্র দক্ষিণপুর্ব এসিয়ার বিভিন্ন স্থলে বিদ্যমান। নিম্নে এই শ্রেণীর একটি মন্ত্র উদ্ধৃত হইল :

"হেই রাজা হনুমান,
অকু তহু কেন অসল-মু
ইবু-মু তুয়ন পুতেরি সিতি দেবী
বহ-মু রাজা সেরি রম
মু মেম্বব সিঙ্গো তরক সিয়হু কপদু দিরি অকু,
গিল সেবর মবোক্ বিঙ্গোঙ্গ,
বেঙ্গের-দেঙ্গের পেসনন অকু
জিকলন মু ত দেঙ্গের,
অকু সম্পু।"

এই মালয় মন্ত্রটির নিম্নে বাংলা অনুবাদ প্রদত্ত হইল :

"রাজা হনুমান
আমি তোমার জন্মের বৃত্তান্ত জানি।
তোমার মাতা ছিলেন সিতি দেবী (সীতা দেবী),
তোমার পিতা ছিলেন রাজা সেরি রম (শ্রীরাম),
শোন, তুমি আমার প্রিয়তমাকে আমার নিকট আন,
তাহাকে আমার জন্য উন্মাদিনী, ব্যাকুল কর।
আমার আদেশ শোন,
যদি তুমি না শোন
আমি তোমাকে অভিশাপ দিব।"

মন্ত্রের শেষাংশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কারণ এই অংশে হিন্দু-মালয়-পলিনেশীয় মন্ত্রের বিশেষত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই জাতীয় মন্ত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে বিদ্যমান, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই মালয়েসিয়ার বিভিন্ন স্থলে এই শ্রেণীর মন্ত্রে ইসলামের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। একটি প্রকাশিত মন্ত্রে[৪৭] আমরা পড়িতেছি : "বাপ মু নবি মহম্মদ" এবং ইহা বলা হইয়াছে রামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া। মালয় উপদ্বীপের অনেক মন্ত্র বা তুকতাকে রামচন্দ্র হইলেন হজরত মহম্মদের পুত্র। এইরূপে মন্ত্রসাহিত্যে দুইধর্মের সমন্বয়সাধন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। রোগ-ব্যাধি নিরাময় করিবার জন্য যে-সমস্ত ঝারফুক-তুকতাক মন্ত্রাদি দ্বীপময় ভারতে প্রচলিত আছে তাহা আমরা ঔষদ বা চিকিৎসাশাস্ত্র আলোচনা করিবার সময় পরিবেশন করিব।

উপরে আমরা জাভা এবং বলিদ্বীপের মন্ত্রসাহিত্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করিলাম তাহাতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে এই সাহিত্যের সৃষ্টি এবং বিকাশে সংস্কৃত সাহিত্যের দান অবিনশ্বর। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো হিন্দুদের সামাজিক এবং ধর্মীয় রূপ দ্বীপান্তরের নূতন পরিবেশে অনেকটা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, তবুও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে এই পরিবর্তিত রূপই দ্বীপময় ভারতে জীবন্ত সত্য হইয়া সেখানকার নরনারীর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত

করিয়াছে। সাহিত্যে এবং শিল্পে এই কথাই মুখর হইয়া উঠিয়াছে ; মন্ত্র, স্তব-স্তুতির সাহিত্যেও তাহার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

পা দ টী কা

১. *Sanskrit Texts from Bali*, p. XIII.

২. *Ibid* p. XIV.

৩. *Suppl.* II, p. 334, no. 4673.

৪. For detailed treatment of the subject vide K. C. Crucq, *Bijdrage tot de kennis van het Balisch Dooden ritueel*, Santpoort, 1928.

৫. Levi, *op. cit.*, p. XIV.

৬. Bosch in *TBG* 64 (1924) Verse 5. Latest edition by H. B. Sarkar in R. C. Majumdar felicitation volume.

৭. Gonda, *Sanskrit in Indonesia*, p. 109.

৭. (ক) দ্রষ্টব্য : H. B. Sarkar in JIH, XLIV (1966) p. 660.

৮. ১৩ অধ্যায়। দ্রষ্টব্য : Goris, *op. cit.*, p. 11.

৯. Goris, *op. cit.*

১০. Wrhaspatitattwa, *Notes*, p. 70 ff.

১১. Vide Goris, *op. cit.*, p. 13.

১২. ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মন্ত্র জপ করিতে হইলে উহা ৩, ৫, ৭, ৯ প্রভৃতি অ-যুগ্ম বার করিতে হইবে।

১৩. মন্ত্রটির জন্য দ্রষ্টব্য Goris, *op. cit.*, p. 20. এই তালিকাটি সপ্তগঙ্গামন্ত্রেও আছে :

"ওম গঙ্গা সিন্ধু সরস্বতি, সিন্ধু, বিপাশ, কৌশিকি,
নদী যমুনা মহাতিশ্রেষ্ঠা সরযুশ্চ মহানদী।"

ইহাতে বানান প্রভৃতি ভুল থাকিলেও নদীগুলিকে চিনিবার পক্ষে কোন অসুবিধা নাই।

১৪. এই মন্ত্রটির জন্য দ্রষ্টব্য : Levi, *op. cit.*, p. 20. গোরিসের পাঠটি অপেক্ষাকৃত অন্যরকম (vide Goris ; *op. cit.*, p. 27).

১৫. এই মন্ত্রের প্রথমাংশের সহিত তুলনীয় বেদপরিক্রমাসারসংহিতা-কিরণের একটি মন্ত্রাংশ। দ্রষ্টব্য : Levi, *op. cit.*, p. 23.

১৬. এইস্থলে গোরিস ধৃত পাঠে আছে : তৎপ্রমাদম্।

১৭. For text vide Levi, *op. cit.*, pp. 20-21 ; Goris, *op. cit.*, pp. 27-28. গোরিসের পুঁথির পাঠ অধিকতর বিকৃত।

১৮. Levi, *op. cit.*, p. 27 ; Goris, *op. cit.*, p. 37 ff. গোরিসের পাঠ অপেক্ষাকৃত অধিকতর বিকৃত।

১৯. দ্রষ্টব্য : শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাসী কর্তৃক সঙ্কলিত শীতলামঙ্গলমাহাত্ম্য, পৃঃ ৩ হইতে।

২০. অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, পৃঃ ২৩-২৪

২১. ইহাকে পূর্বে পুণ্যকর্ম বলিয়া মনে করা হইত।

২২. এই প্রকার অন্যান্য দৃষ্টান্তের জন্য দ্রষ্টব্য: শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাসী, মেয়েদের ব্রতকথা বা মাহাত্ম্য, পৃঃ ১৪, ৫৯ ; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, পৃঃ ৫ ; পুণ্যিপুকুর ব্রতও দ্রষ্টব্য।

২৩. Levi, *op. cit.*, p. XV.

২৪. Vide *Ibid* p. XVI.

২৫. Levi, *op. cit* , p. XIX.

২৬. দ্রষ্টব্য : কুলার্ণব তন্ত্র, কুলাচার পূজা।

২৭. বেলাহনের বিষ্ণুমূর্তি দ্রষ্টব্য। Krom, Inleiding, III, plate 47 ; Majumdar, *Suvarnadvipa*, II, plate XXXV. যবদ্বীপের অনুশাসনলিপিগুলির শেষাংশে অনেক সময় অনাগত নিয়ম লঙ্ঘনকারীগণের প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে যে-সমস্ত দেবদেবী বা অপদেবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে তাহার মধ্যে গরুড়ও আছে। দ্রষ্টব্য *OJO* No XXXI.

২৮. *Op. cit.*, pp. 56-7.

২৯. *BKI*, 1908, pp. 412 ff.

৩০. পাঠান্তর : বাহু দ্বৌ।

৩১. Vide *Descr. Cat. Skt Mss*, Madras, vol. XIV (1915) Nos. 7236-39.

৩২. পাঠান্তর : দাক্ষিণীভূতপেতেষ্। যবদ্বীপীয় লোকেরা মনে করিত যে যমরাজের বিকট দর্শন অনুচরগণ দক্ষিণাঞ্চলে বিচরণ করিত।

৩৩ এই মন্ত্রের অপরাংশের সহিত তুলনীয় :

"কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ,
জন্মবন্ধ্যা নষ্টপুত্রা বহুপুত্রবতী ভবেৎ।"

দ্রষ্টব্য Juynboll, *suppl.* dl. II, cod. 3935 (4).

৩৪ Levi, *op. cit.*, p. XXVIII and p. 58.

৩৫. *Ibid*, p. XXVIII and pp. 59-60.

৩৬. *Op. cit.*, p. XXVIII.

৩৭. Levi, *op. cit.*, p. 35 (ll. 10-12) & 83 (ll. 2-4).

৩৮. *Mudras auf Bali*, p. 53 quoted by Levi, *op. cit.*, p. XXI.

৩৯. *Descr. Cat. Madras*, vol. XII (1915) p. 6717, no. 9413, quoted by Levi, *op. cit.*, p. XXI.

৪০. *Descr. Cat.* XVIII, p. 6715, n. 9407 , Levi, *op. cit.* ; p. XXII.

৪১. দ্রষ্টব্য : Levi, *op. cit.*, p. 23 § 99 and p 25 § 105.

৪২. গোরিস ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাইয়াছেন বেদান্তসারে § ৯৫-১০৪ , অগ্নিপুরাণ অধ্যায় ২১৪ ; ৫-১৪ ; গরুড়পুরাণ, অধ্যায় ২৩। সিলভাঁ লেভী এই প্রসঙ্গে যোগ-উপনিষদের কয়েকটি কথা উল্লেখ করিয়াছেন ; দ্রষ্টব্য : ত্রিশিখিব্রাহ্মণ উপনিষদ ৭৭-৮৭ ; দর্শন উপনিষদ ২৩-৭৪ ; যোগচূড়ামণি উপনিষদ ২১-৩০ ; শাণ্ডিল্য উপনিষদ ১, ৪। তিনি আরো বলিয়াছেন যে ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য এবং পার্থক্য দুইই যথেষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

৪৩. শ্বেতবর্ণা, রক্তবর্ণা, পীতবর্ণা, কৃষ্ণবর্ণা, বিশ্ববর্ণা।

৪৪. Levi, *op cit.*, p. XXVIII.

৪৫ Cf. Levi, *op. cit.*, XXIX and pp. 65-67.

৪৬. দ্রষ্টব্য : Levi, *op. cit* , p. 79, l. 9.

৪৭. J. Mal-Br. R. A. S., IX, pt. 1, 1931. অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য Skeat, Malay Magic (1900) নামক গ্রন্থটি পাঠ করিতে পারেন। ইহার নূতন সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এবং অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী

ক. ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ

যবদ্বীপের একটি সমৃদ্ধ পৌরাণিক সাহিত্য আছে; এই পৌরাণিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অবদান হইল ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। ইহা অনেক সময় আশ্চর্য বলিয়া মনে হয় যে ভারতবর্ষে অষ্টাদশ পুরাণ[১] এবং বহু উপপুরাণ বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়কে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিলেও যবদ্বীপে এক-মাত্র ব্রহ্মাণ্ডপুরাণটিই কেন প্রচলিত হইল এবং মহাকালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া রহিল। যবদ্বীপে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মত আরো কোন পুরাণ গিয়াছিল কিনা এবং মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মুখে উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল কিনা এই প্রশ্নের আজ আর উত্তর দিবার উপায় নাই এবং ইহা লইয়া সম্ভবতঃ আলোচনা করারও এখন বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। সুতরাং আমরা এইবার যবদ্বীপীয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণটি লইয়াই আলোচনার সূত্রপাত করিব[২]।

যবদ্বীপীয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ। ইহা খুবই সম্ভবপর মনে হয় যে যবদ্বীপে সর্বপ্রথম ধর্ম এবং ধর্মাচরণের বিধি সংক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচলিত হইয়াছিল; ইহার আংশিক স্মারকচিহ্ন রহিয়া গিয়াছে সঙ্গ-হ্যঙ্গ কমহাযানিকন-নামক গ্রন্থে। ডঃ গণ্ডাও এই অভিমত পোষণ করেন। তিনি বলিয়াছেন যে পৃথিবীর ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট মহাভারতীয় পর্বগুলি যবদ্বীপে রচিত হইবার (আনুমানিক ১০০০ খৃষ্টাব্দ) পূর্বে অ-পার্থিব ধর্মসংক্রান্ত নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাও যবদ্বীপে বিদ্যমান ছিল। তিনি আরো বলিয়াছেন যে যবদ্বীপীয় পর্বগুলিতে যে পৌরাণিক-নৈতিক অংশগুলি বিদ্যমান আছে (যেমন জম্বুখণ্ডনির্মান ও ভীষ্মপর্বের ভগবদ্গীতা-অংশ) তাহাতে প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর রহিয়াছে, কিন্তু মহাকাব্যীয় অংশগুলি উহার তুলনায় অর্বাচীন। আলোচ্য ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে আবার আখ্যায়িকা-ভাগ (ইহা মুখ্যতঃ ধর্মতত্ত্ব ও নীতিমূলক নহে, যেমন দক্ষের কাহিনী, পৃথিবীর দুগ্ধ দোহনের কাহিনী, গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণ ইত্যাদি) অন্যান্য অংশ হইতে স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন বহন করিতেছে। উপরোক্ত আলোচনার পরি-প্রেক্ষিতে যবদ্বীপীয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের কোন অংশ প্রাচীন এবং কোন অংশ অর্বাচীন তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। সুতরাং ইহার রচনার তারিখ সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট অভিমত প্রকাশ করাও কঠিন। গ্রন্থে রচনার কালব্যঞ্জক কোন তারিখ সন্নিবেশিত হয় নাই। সুতরাং ইহা কোন যুগে রচিত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে হইলে ইহার রচনারীতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা

ব্যতীত আর কোন গত্যন্তর নাই। এই দিক দিয়া বিচার করিয়া অনেকে মনে করেন যে এই গ্রন্থ ৯৯৬ খৃষ্টাব্দে রচিত যবদ্বীপীয় আদিপর্ব অপেক্ষা প্রাচীনতর। একমাত্র রচনারীতির উপর নির্ভর করিয়া এই সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা কতকটা বিপজ্জনক, কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ও বর্তমানে বিদ্যমান নাই। কেহ কেহ মনে করেন যে যবদ্বীপীয় আদিপর্বের একটি অংশ এই বিষয়ে আলোকসম্পাত করিতে পারে; উহার একস্থলে আমরা পড়িতেছি: "(উগ্রশ্রব) অনক্ সঙ্গ রোমহর্ষণ সির সিদ্ধ বিনেহ্ মংগ্যা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মুয়ঙ্গ অষ্টাদশপর্ব[৩]। ইহা হইতে হয়তো মনে হইতে পারে যে যবদ্বীপে আদিপর্ব রচিত হইবার সময় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল না। ইহা দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের যবদ্বীপীয় সংস্করণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় ইহা হয়তো কেহ স্বীকার করিবেন না, তবুও এই সময়ে উক্ত গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল উহার সম্ভাব্যতার কথাও আমরা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না। এই সকল কথা স্মরণ করিলে এই গ্রন্থকে দশম শতাব্দীর রচনা মনে করা স্বাভাবিক, কিন্তু ইহা একাদশ শতাব্দীতে রচিত হইতে পারে এই সম্ভাবনার কথাও আমাদিগকে একেবারে ভুলিলে চলিবে না। এই গ্রন্থ দশম-একাদশ শতাব্দীতে যেরূপে বিদ্যমান ছিল ইহা প্রধানতঃ সেইরূপেই সম্ভবতঃ আমাদের হস্তে পৌঁছিয়াছে[৪]।

এই গ্রন্থে বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কোন কোন পৃষ্ঠায় সংস্কৃত ও দেশী শব্দের আনুপাতিক হার হইবে যথাক্রমে ৪[ক] : ৯। বস্তুতঃ যবদ্বীপীয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অলিতে-গলিতে, পাতায় পাতায় ভারতীয় নাম, সর্বত্র ভারতীয় ভাবের পরিমণ্ডল। ডঃ গণ্ডা এই গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ইহার অধিকাংশ আলোচ্য বিষয়ই সংস্কৃত সংস্করণ হইতে সাক্ষাৎভাবে পরিগৃহীত হইয়াছে এবং ইহার ভাষা, রচনারীতি প্রভৃতি যবদ্বীপের মহাভারতের পর্বগুলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ[৫]। তিনি আরো মনে করেন যে এই গ্রন্থটি আলোচ্য বিষয়ের দিক দিয়া বায়ুপুরাণের সংস্করণের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ, কিন্তু কোন কোন অংশের বর্ণনায় ইহা আবার মৎস্যপুরাণ, এমন কি বরাহপুরাণের সহিতও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ইহা স্বীকার্য যে ভারতীয় বায়ুপুরাণে শৈবমতের প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে, কিন্তু যবদ্বীপীয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ এই বিষয়ে নির্বিকার: ইহা শৈবও নহে, বৈষ্ণবও নহে; ইহা বরঞ্চ ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে নিবেদিত[৬]। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে যবদ্বীপীয় গ্রন্থকার যে-সংস্কৃত পুস্তকের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ রচনা করিয়াছিলেন তাহা প্রচলিত ভারতীয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের সহিত এক নহে, কারণ উভয় গ্রন্থের একই অংশে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দগুলি অনেকস্থলে বিভিন্ন। তবুও সাধারণভাবে বলা যায় যে যবদ্বীপীয় গ্রন্থকার কাহিনীবিন্যাসে মোটামুটি ভারতীয় গ্রন্থকেই অনুসরণ করিয়া তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন[৭]। তবে তিনি স্থলে স্থলে ঈষৎ নূতন পথে চলিয়াছেন, কারণ অপ্রাসঙ্গিক শ্লোক, পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি ব্যাপার তিনি যথাসম্ভব পরিহার করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। তবে ইহা লক্ষ্যণীয় বিষয় যে যবদ্বীপীয় সংস্করণে আমরা অনেক শ্লোক, অর্দ্ধশ্লোক, পাদ, এমন কি একটি মাত্র শব্দ পাই যাহার মোটামুটি সঠিক অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে[৮]।

পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব, ভূগোল, উপকথা প্রভৃতি যবদ্বীপীয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের প্রায় সর্বত্র জুড়িয়া রহিয়াছে। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে প্রায় ১৫০০টি ভারতীয় দেবতা, মুনিঋষি, পৌরাণিক

(mythological) রাজা, পাহাড় পর্বত, নদনদী প্রভৃতির নাম এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সমস্ত নামের কতকগুলি পরবর্তী সাহিত্য হইতে অবলুপ্ত হইয়াছে; কতকগুলি আবার স্বদেশী পোষাক পড়িয়া যবদ্বীপের প্রাচীন সাহিত্যে স্থায়ী আসন পরিগ্রহণ করিয়াছে[৯]।

যবদ্বীপীয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অষ্টাদশ সর্গে বিভক্ত একটি কাব্য সংস্করণও আছে: ইহার নাম হইল পৃথুবিজয় কাকাবিন বা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-কাকাবিন; পৃথুবিজয় কাকাবিনটি অষ্টগুণ বিরচিত। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে এই কাকাবিনটি সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল[১০]। এই গ্রন্থের কাহিনী পরে বর্ণনা করিব। ডঃ ফ্রিড্‌রিখ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলেন। ডঃ গণ্ডা এই গ্রন্থের নূতন সংস্করণ ডচ্‌ অনুবাদ সহ প্রকাশ করিয়া আমাদের আলোচনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন[১১]।

এইবার আমরা যবদ্বীপীয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি। গ্রন্থারম্ভে আমরা পড়িতেছি: 'অবিঘ্নং অস্তু' এবং তৎপরেই একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে। ইহার পর বলা হইয়াছে যে ভারতবর্ষে অধিসীমকৃষ্ণ[১২] নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন অতুলনীয় এবং তাঁহার রাজত্বকালে পীড়া ছিল না; চোর প্রভৃতির উৎপাতও ছিল না। দ্বীপান্তরের অসংখ্য রাজা এবং সামন্ত নরপতিগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন। সেই উপলক্ষ্যে আলোকসজ্জা হইত, মুখোস-ক্রীড়া প্রদর্শিত হইত, ওয়েয়াঙ্‌-নাট্য প্রদর্শিত হইত এবং পতাকা উড়িত। বস্তুতঃ এই সময় তাঁহার রাজপ্রাসাদ ইন্দ্রপুরীর শোভা ধারণ করিত। এই সমস্ত বন্দোবস্ত হইত শাস্ত্রানুযায়ী এবং এইস্থলে চারণ কবি, সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণজ্ঞগণ, পুতচরিত্র ঋষিগণ সমবেত হইতেন। পণ্ডিতগণ এবং যোগাচার্যগণও সম্রাটকে শ্রদ্ধা করিতেন। দিবারাত্র অধীনস্থ লোকগণ শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আসিতেন।

ইহার পর রোমহর্ষন নামের (রোম+হর্ষন) ব্যাখ্যা পরিবেশন করা হইয়াছে[১৩]। রোমহর্ষণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তিনি ছিলেন ব্যাসের শিষ্য, ইতিহাসপুরাণ এবং বেদজ্ঞ; শাস্ত্রজ্ঞ হিসাবে ত্রিভুবনে আর কেহ তাঁহার তুল্য ছিলেন না। সম্রাট তাহাকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। শুক্লপক্ষের তৃতীয় দিনে, ষষ্ঠাহের চতুর্থ দিনে, পঞ্চাহের প্রথম দিবসে, বৃহস্পতিবার, বুকু প্রঙ্গ বকতে, রোহিণী নক্ষত্রে, আয়ুষ্মান যোগে এক বিরাট ভোজপর্ব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাতে বহু মুনিঋষি সমবেত হইয়াছিলেন। সম্রাট সেই উপলক্ষ্যে মহামান্য রোমহর্ষণের নিকট মনুর বিবরণ, বংশ কথা, তীর্থাদির কাহিনী শ্রবণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

রোমহর্ষণ তখন অপ্রকাশ্য, আদিশূন্য, সৎ এবং অসৎ প্রধানের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে জগৎ একদা উহার মধ্যেই স্থিতিলাভ করিয়াছিল। মহাপ্রলয়ের সময়ে জগৎ ছিল মহা অন্ধকারে নিমগ্ন, ধর্ম ছিল অনুপস্থিত, আত্মা ছিল সময়ের মধ্যে বিলীন; তখন ধর্মও ছিল না, অধর্মও ছিল না। জগৎ যেন তখন নিদ্রামগ্ন ছিল, কারণ ইহা তখন প্রধানের মধ্যে বিলীন ছিল। বস্তুতঃ আদিতে ছিলেন পরম ব্রহ্ম। যখন মহান্ধকার বিদ্যমান ছিল তখন তমোগুণই ছিল প্রধান; সত্ত্ব এবং রজঃগুণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন পরম ব্রহ্ম ছিলেন অন্তক, কাল

ও রুদ্ররূপী। তিনিই আবার ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃষ্টি করিলেন। জগৎ হইল অণ্ডাকৃতি। তখন বিষ্ণুরূপে তিনি জগৎ রক্ষা করিতে ব্রতী হইলেন। অতঃপর ব্রহ্মা মহান্, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূত সৃষ্টি করিলেন। ইহার পর সৃষ্টি হইল ব্রহ্মাণ্ড। উহাতে রহিল সপ্ত পাতাল এবং সপ্ত ভুবন ; দেবগণও যথাস্থানে সংস্থাপিত হইলেন। এইরূপে দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, মনুষ্য, পশু দ্বারা সমস্ত স্থল পূর্ণ হইল। রোমহর্ষণ বলিলেন : 'অগ্রে সসর্জ ভগবান মানসান্ আত্মনঃ সমান্[১৪]।' অর্থাৎ ভগবান অগ্রে আত্ম-সম মানস-পুত্র সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর সৃষ্ট হইল চারিজন ঋষি ; যথা : সনন্দন, সনক এবং সনৎকুমার ; চতুর্থটির নাম পুঁথিতে বাদ পড়িয়াছে[১৫]। ইঁহারা বিবাহ না করিয়া যোগাভ্যাস করিতে সিদ্ধান্ত করায় ব্রহ্মা নিরুপায় হইয়া আবার দেবতা, নদনদী, সমুদ্র, পাহাড়পর্বত, সময়, রাত্রি, পক্ষ প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন। ইহার পর তিনি নয়জন দেবর্ষি সৃষ্টি করিলেন ; তাঁহাদের নাম হইল মরীচি, ভৃগু, অঙ্গির, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি, বশিষ্ঠ। অতঃপর ব্রহ্মার পরমেশ্বর নামক পুত্র হইল। রোমহর্ষণ এইবার ব্রহ্মা এবং পরমেশ্বরের বিভিন্ন রূপ ও নামের বিবরণ প্রদান করিলেন। ইহার পর দেবতা, অসুর, পিতর, মনুষ্য প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা আবার বৈদিক স্তোত্র, যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব, পিশাচ, পক্ষী প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন। ইহার পর আমরা পড়িতেছি যে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র সৃষ্টি হইল[১৬]।

এত সৃষ্টি করিয়াও জগৎ উন্নতি লাভ করিল না দেখিয়া ব্রহ্মা ক্ষুব্ধ হইলেন ; তিনি অবশেষে যোগ দ্বারা তাঁহার দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক ভাগ হইল স্বয়ম্ভুব মনু, অপর অংশটি হইল একজন নারী : নাম তার শতরূপা। ইহাদের সন্তানই হইলেন রতি[১৭]। ভারতীয় এবং যবদ্বীপের সাহিত্যে প্রায় সর্বত্রই রতিদেবী কামদেবের স্ত্রীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। ইহার পর স্বয়ম্ভুব মনুর বংশাবলী এবং নয়জন দেবর্ষির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে। ইহার পর আমরা দ্বাদশ যম এবং লক্ষ্মীর জন্মকাহিনী পড়িতেছি। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে বুদ্ধ ছিলেন বুদ্ধির পুত্র। ইহার পর লেখক নীললোহিতের কাহিনী পরিবেশন করিয়াছেন[১৮]। নীললোহিত হইলেন শিব, যাঁহার বর্ণ ছিল লোহিত এবং কণ্ঠ ছিল নীল। তাঁহার ভীষণদর্শন এক সহস্র পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ; ইহাদেরই নাম ছিল সহস্ররুদ্র। লেখক ইহার পর ভৃগুর কন্যা এবং বিষ্ণুর স্ত্রী শ্রীর কাহিনী পরিবেশন করিয়াছেন। অতঃপর আমরা মৃকণ্ড এবং বশিষ্ঠ কন্যা পুণ্ডরিকার বংশ পরিচয় পড়িতেছি। ইহাদের হইতেই যথাক্রমে মার্কণ্ডেয় এবং ভার্গব বংশের সৃষ্টি হইল। লেখক কর্তৃক সরস্বতীকে পৌর্ণমাসের (পূর্ণমাস) স্ত্রীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে[১৯]।

লেখক অগ্নিকে ভগবান অঙ্গির এবং স্মৃতির পুত্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বৃষ্টির দেবতা পর্জন্য ছিলেন এই বংশসম্ভূত[২০]। ইহার পর অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ প্রভৃতির বংশ পরিচয় প্রদান করিয়া রোমহর্ষণ বলিলেন যে ক্রতু সন্নতির সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলে তাঁহার ষষ্টিসহস্র বালিখিল্য (বাল্যখিল্য) সন্তান জন্মলাভ করিল[২১]। ইহার পরই আমরা দক্ষযজ্ঞের কাহিনী পড়িতেছি। এই যজ্ঞকালে দক্ষ তাহার অগ্রজা কন্যা সতী এবং জামাতা নীললোহিতের প্রতি

উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন না করায় সতী তাঁহার দেহ উৎসারিত অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। নীললোহিত দক্ষকে অভিসম্পাত প্রদান করিলে দক্ষও নীললোহিতকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। এই অভিসম্পাত অনুযায়ী পরজন্মে সতী হিমালয়-দুহিতা উমারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন ; দক্ষও চাক্ষুস মনুর রাজত্বকালে প্রচেতসগণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। নীল-লোহিতও দক্ষের অভিশাপের জন্য স্বীয় নাম পরিহার করিয়া বরুণের বেশে যজ্ঞ করিয়া অবশেষে সফলকাম হইলেন[২২]।

ঋষি এবং ব্রহ্মর্ষিগণের জন্মকাহিনী বিবৃত করিয়া এইবার রোমহর্ষণ বিভিন্ন রাজবংশের পরিচয় পরিবেশন করিলেন। তিনি বলিলেন যে মনু স্বয়ম্ভুবের দশটি পৌত্র ছিল ; তাহারা ছিল প্রিয়ব্রত এবং কাম্যার সন্তান। স্বায়ম্ভুব মনু এই দশজনের মধ্যে সাতজনকে সাতটি দেশের অধীশ্বর নিযুক্ত করিলেন। ইহাদের মধ্যে আগ্নিদ্র[২৩] হইলেন জম্বুদ্বীপের রাজা, মেধাতিথি হইলেন শাকদ্বীপের রাজা[২৪], জ্যোতিষ্মন্ত হইলেন শাল্মলি দ্বীপের রাজা[২৫], অব্য হইলেন গোমেদ দ্বীপের রাজা[২৬] সবন হইলেন পুষ্কর দ্বীপের রাজা, দ্যুতিমন্ত হইলেন ক্রৌঞ্চ দ্বীপের রাজা বপুষ্মন্ত হইলেন কুশ দ্বীপের রাজা[২৭]। এই বিভিন্ন দ্বীপের রাজগণের বংশ পরিচয়ও সঙ্গে সঙ্গে বিবৃত হইয়াছে[২৮]।

পৃথিবীর উপরোক্ত সপ্ত বিভাগ ভারতীয় এবং যবদ্বীপীয় সংস্করণে একই প্রকার। এই নামগুলি সপ্তভুবন নামক গ্রন্থে[২৯] বিকৃতরূপ ধারণ করিয়াছে। সেস্থলে আমরা পড়িতেছি : '...দিপ, জম্বুদিপ, সঙ্কদিপ, সম্মদীপ, গোমেনদীপ, সমদ্বীপ এবং ক্রোশদ্বীপ।' কোন্ গ্রন্থ বা কিম্বদন্তী হইতে গোমেনদীপ এবং সমদ্বীপ পরিগৃহীত হইয়াছে তাহা আমাদের অজ্ঞাত, তবে গোমেনদীপটি গোমেদ দ্বীপের বিকৃতরূপ হওয়া সম্ভবপর। এই সপ্তদ্বীপের বর্ণ এবং চতুরাশ্রম সম্বন্ধে বিবরণ প্রদান করিয়া রোমহর্ষণ অতঃপর বিবিধ রাজবংশ সম্বন্ধে নানাবিধ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন যে জম্বুদ্বীপের অধিপতি অগ্নিপুত্রের পুত্রগণের নাম হইল (১) নাভি (২) কিম্পুরুষ (৩) অরিবর্ষ (৪) ইলাবৃত (৫) রম্যক (৬) হিরণ্যক (৭) কুরু (৮) ভদ্র এবং (৯) কেতুমাল। এই নামগুলি আমরা ভারতীয় সংস্করণে সামান্য পরিবর্তিত রূপে দেখিতে পাই, যথা অরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, ভদ্র এবং হিরণ্যক নাম ভারতীয় সংস্করণে যথাক্রমে হরিবর্ষ, ইলাবৃত্ত বা ইলাবৃত, রম্য, ভদ্রাশ্ব এবং হিরণ্বান রূপে লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য নামগুলি একই প্রকার। ইহারা জম্বুদ্বীপের নয়টি বর্ষ শাসন করিতেন। নাভি হইলেন হিমবান অঞ্চলের অধীশ্বর ; হেমকুট অঞ্চলের শাসক হইলেন কিম্পুরুষ। হরিবর্ষ ছিলেন নিষাদবর্ষের অধীশ্বর। ইহার পর আমরা ইলাবর্ষের বিবরণ পড়িতেছি। এই স্থলটি ছিল পৃথিবীর মধ্যস্থলে সর্বোচ্চ স্থান এবং ইহা ইলাবৃত্ত কর্তৃক শাসিত হইত। রম্যক নীল পর্বতের উত্তর দিকে রম্যক নামক অঞ্চলের অধীশ্বর ছিলেন। শ্বেত পর্বতের উত্তরাঞ্চলের অধীশ্বর ছিলেন হিরণ্যক। ভারতীয় সংস্করণে এই অঞ্চলের নাম পড়িতেছি শ্বেতবর্ষ। শৃঙ্গবানের উত্তরাঞ্চলে ছিল কুরুর রাজ্য। ভদ্রাশ্ব হইলেন মাল্যবান অঞ্চলের অধীশ্বর[৩০]। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র কেতুমাল গন্ধমাদনের পশ্চিমে রাজত্ব করিতেন ; ভারতীয় সংস্করণে এই অঞ্চলের নাম হইল গন্ধমাদনবর্ষ[৩১]।

এই সমস্ত রাজগণের উপর নাভি কর্তৃত্ব করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল মান্নুদেবী[৩২] এবং তাঁহাদের ঋষভ নামে একটি পুত্র ছিল। ঋষভের একশতটি পুত্র হইয়াছিল; ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ভরত। ঋষভ ভরতকে হিমবানের দক্ষিণাঞ্চলের অধীশ্বর করিলেন; সুতরাং এইস্থল ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হইল। ইহার পর ভরতের পরবর্তী রাজগণের বংশ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই সমস্ত ঘটনা ত্রেতাযুগে ঘটিয়াছিল[৩৩]।

স্বয়ম্ভুব মনু আরো সৃষ্টি করিলেন একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, বারজন সাধ্য, দশজন বিশ্বদেব, দশজন অঙ্গিরস, বারজন ভার্গব, উনপঞ্চাশ মরুদ্দেব ইত্যাদি। গ্রন্থকার অতঃপর বিভিন্ন যুগে মানুষের আয়ুষ্কাল এবং দৈর্ঘ্য কত ছিল তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে দেবতা, পশুপক্ষী প্রভৃতির দৈর্ঘ্যও বর্ণনা করা হইয়াছে[৩৪]। ইহার পর মন্বন্তরের কথা বলা হইয়াছে; এই সময় মনু দেবর্ষি এবং পিতৃগণকে লইয়া মহালোকে প্রয়াণ করেন এবং অবশিষ্ট সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহার পরেই পরবর্তী মনুর রাজত্বকাল আরম্ভ হয়। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে মনু অতঃপর পুর্ববর্তী মনুদের আমলের শিষ্টগণের ব্যবহার এবং রীতিনীতি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। এই সমস্ত শিষ্ট রীতিনীতিই হইল ধর্ম। ত্রেতা যুগের ধর্ম হইল শ্রৌত এবং স্মার্ত। শিক্ষক যখন ইহা প্রতিপালন করেন তখন তাঁহার নাম হয় ব্রহ্মচারী, অন্য কেহ ইহা কার্যত অনুসরণ করিলে তাঁহার নাম হয় গৃহস্থ, বনবাসী ইহা প্রতিপালন করিলে তিনি বৈখানস নামে খ্যাত হইবেন, যোগী ইহা অনুসরণ করিলে তাঁহার নাম হইবে যতি। এইরূপে যাহারা চতুরাশ্রম ধর্ম প্রতিপালন করেন তাহাদের নাম হইল সাধক। লেখক বলিয়াছেন যে ধর্ম শব্দ ধা+ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। 'ধা' শব্দের অর্থ হইল ধারণ করা এবং 'ম' শব্দের অর্থ হইল 'মতি'। ইহার পর ধর্মের আরো বিশদ বিবরণ পরিবেশন করা হইয়াছে এবং এই প্রসঙ্গে চতুর্বেদের উল্লেখ করা হইয়াছে; উহাদের নাম হইল সাম, ঋক, যজুঃ, অথর্বন। ইহার পর বলা হইয়াছে যে প্রধান হইতে ব্রহ্মা বা চতুর্মুখের দেহ সৃষ্টি হইয়াছে এবং ব্রহ্মা হইতে আবার ভৃগু প্রভৃতি দশজন ঈশ্বর-মানসপুত্রের জন্ম হইয়াছে। তাঁহারা তপর্ষি নামে খ্যাত হইলেন। ইহার পর সত্যর্ষি, মহর্ষি, অঙ্গিরস, অত্রি, বশিষ্ট, বশিষ্টমিত্র, অগস্ত্য প্রভৃতির বংশ পরিচয় প্রদান করা হইল। গ্রন্থকার ইহার পর দ্বাপর এবং কলিযুগে বেদপাঠের প্রতিবন্ধকতার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন যে যখন ব্রহ্মার নিকট হইতে বেদ পাওয়া গেল তখন উহা ছিল এক; সায়ম্ভুব মনু উহাকে চারিখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

ইহার পর বৈবস্বত মনুর আমলে পরাশরপুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বেদগ্রন্থ সুসংবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইলেন। তাঁহার চারিজন সুপণ্ডিত শিষ্য ছিলেন। ইহাদের মধ্যে জৈমিনি ছিলেন সামবেদে পারদর্শী, পোলহ ছিলেন ঋগ্বেদে, বৈশম্পায়ন ছিলেন যজুর্বেদে এবং সুমন্তু ছিলেন অথর্ববেদে পারদর্শী। রোমহর্ষনও ইতিহাসপুরাণ সুসংবদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইলেন। ইহাদের মধ্যে বৈশম্পায়ন শেষ পর্যন্ত বৈদিক যাগযজ্ঞকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিলেন। কথিত হইয়াছে যে যজুর্বেদ-বিশেষজ্ঞ হইবেন অধ্বর্যপুরোহিত; পূজার সময় যজুর্বেদের স্থাপকপুরোহিত উপস্থিত থাকিবেন। ঋকের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবেন হোতৃ। যিনি

সামবেদ আবৃত্তি করিবেন তিনি সঙ্গীতবিস্থায় পারদর্শী হইবেন ; তাঁহাকে উদ্গাতৃ হইতে হইবে। অথর্ববেদজ্ঞগণ হইবেন শত্রুবিনাশক এবং রাজা বেদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া হইবেন রাজর্ষি। কথিত হইয়াছে যে ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র সামবেদসংহিতায় পরিগৃহীত হইয়া সামন-সঙ্গীতরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে ; এইগুলিই উদ্গাতৃর মন্ত্র এবং সঙ্গীত। সুতরাং গ্রন্থকারের মতে সামবেদ ঋগ্বেদ হইতেই উদ্ভূত। পুরাণ-সংহিতা হইল কাহিনী, উপকথা, সঙ্গীত প্রভৃতির সঙ্কলন। কথিত আছে যে দ্রফলব ঋক্‌বেদকে দুইভাগে বিভক্ত করেন এবং বাষ্কলের সময় উহা চারিভাগে বিভক্ত হয়[৩৫]। ইহার পর মৈথিলের রাজর্ষি জনকের অশ্বমেধ যজ্ঞের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই যজ্ঞে অসংখ্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ছিলেন শাকল্য এবং যাজ্ঞবল্ক্য। জনক এই সমবেত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠজনকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শাকল্য এবং যাজ্ঞবল্ক্য এই সম্মানের প্রার্থী হইলেন। স্থির হইল যে এই দুইজনের মধ্যে শাস্ত্রসম্বন্ধীয় তর্কযুদ্ধে যিনি পরাজিত হইবেন তিনি অপরজনের শাপদ্বারা ভস্মীভূত হইবেন। এই তর্কযুদ্ধে শাকল্য পরাজিত হইয়া ভস্মীভূত হইলেন[৩৬]। ইহার পর মুনিগণের বেদজ্ঞ শিষ্যগণ অঞ্চলানুযায়ী তিনটি দলে বিভক্ত হইলেন ; এই দলভুক্ত লোকগণের নাম হইল চরক এবং ইহাদের হাতেই যজুর্বেদ চরক-সংহিতা নামে খ্যাত হইল। ইহার পর বলা হইয়াছে কিরূপে যজ্ঞবল্ক্য অশ্বরূপী সূর্যের নিকট হইতে যজুর্বেদ লাভ করিলেন এবং যজ্ঞ-বল্ক্যের বেদ বাজিবেদ নামে খ্যাত হইল[৩৬ক]। ইহার পর যজ্ঞবল্ক্য, জেমিনি, পোরঞ্জিত প্রভৃতি ঋষিগণের বেদাধ্যায়ী শিষ্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত মহর্ষি, তপর্ষি, সত্যর্ষি এবং শ্রুতর্ষিগণ সকলেই বেদবিৎ ছিলেন[৩৭]। ইহার পর লেখক মিশ্রর্ষিগণের কথা বলিয়াছেন : তাঁহারা সকলেই মাতৃগর্ভে ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন কাব্য, বৃহস্পতি, ব্যাস এবং সারস্বত। ইহার পর নানাপ্রকার মন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে ; এমন কি একটি মন্ত্রবেদের কথাও বলা হইয়াছে। অতঃপর বিভিন্ন বেদের শ্লোকসংখ্যা বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু ইহা বাস্তবতাবর্জিত। গ্রন্থকার অতঃপর পাঁচ শ্রেণীর ব্রহ্মর্ষি, দেববংশসম্ভূত দেবর্ষি এবং রাজর্ষির লক্ষণ এবং বিশেষত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পর তিনি আবার বেদপ্রসঙ্গে ফিরিয়া গিয়া বলিয়াছেন যে বেদ দ্বাপর যুগে বৈবস্বত-মনুর আমলে ব্রহ্মর্ষিগণ কর্তৃক অষ্টবিংশতিবার বিভক্ত হইয়াছিল। কথিত হইয়াছে যে ব্যাস ইহা আরও একবার বিভক্ত করিয়াছিলেন। পরবর্তী দ্বাপর যুগে ইহা যে আরও বিভক্ত হইবে সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। ইহার পর আমরা আবার ব্রহ্মাতনয় প্রাচীনতম মনু অর্থাৎ স্বয়ম্ভুব মনুর কথা পড়িতেছি। গ্রন্থকার অতঃপর বলিয়াছেন যে ভগবান কেবলমাত্র কৃতযুগে সৃষ্টি করেন এবং ত্রেতাযুগে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। চতুর্দশ মনুর পর ব্রহ্মাণ্ড একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়। এই প্রলয়কাল ব্রহ্মার এক রাত্রিতে সংঘটিত হয়, কিন্তু এই সময়ের ব্যাপকতা চতুর্দশ মনুর শাসন-কালের সমান। ইহার পর জগৎ পুনরায় সৃষ্ট হয়। এই ধ্বংসের বৈপুল্য একশত বৎসরেও বর্ণনা করিয়া শেষ করা যাইবে না।

ইহার পর প্রত্যেক মনু কতকোটি বৎসর রাজত্ব করেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া

হইয়াছে[৩৮]। তাঁহারা কিরূপে মহালোকে, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক প্রভৃতি স্থলে সাধনা করেন তাহার বিবরণ সন্নিবেশিত করিয়া লেখক আবার নূতন সৃষ্টির কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। লেখক বলিয়াছেন যে এই সমস্ত তথ্য ব্রহ্মাণ্ড সংহিতার প্রক্রিয়াপাদ অংশে শ্রীমৎ ব্যাস কর্তৃক বিবৃত হইয়াছে। ইহার পর গ্রন্থে আমরা বিভিন্ন মনুর নাম পড়িতেছি, যেমন, স্বায়ম্ভুব মনু, মনু স্বারোচিষ, উত্তম, তাপস, চারিষ্ণু বা রৈবত, চাক্ষুস। এই ছয়জন হইলেন অতীত মনু; অনাগত মনুর সংখ্যা হইল আটজন, যথা, পাঁচজন সাবর্নি মনু, রৌচ্য মনু, ভৌত্য এবং বৈবস্বত। গ্রন্থকার এইবার অতীত মনুদের আমলের দেবতা, ঋষি এবং তাহাদের বংশ সংক্রান্ত বহু বৃত্তান্ত পরিবেশন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র এবং উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব অনাহারে থাকিয়া সহস্রবর্ষব্যাপী তপস্যা করিয়া চতুর্মুখের বরলাভ করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার এই কাহিনীটি বিশেষ প্রশংসার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পর ধ্রুবের দীর্ঘ বংশতালিকা পরিবেশন করা হইয়াছে। এই বংশের সন্তান বেন ছিলেন অত্যন্ত অসৎ; ইহার কাহিনী পরে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর আমরা বিখ্যাত বীর পৃথুর কাহিনী পড়িতেছি। পৃথু স্বনামধন্য রাজা ছিলেন। তিনি প্রেত মহাযজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং গাভীরূপিণী পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। দেবর্ষিগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব, অপ্সর প্রভৃতিও পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন।

ইহার পর অত্রিবংশোদ্ভূত বেনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে[৩৯]। বেন ছিলেন অসৎ এবং ভগবানে অবিশ্বাসী; তাঁহার সময় বেদপাঠ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অঙ্গির প্রমুখ মহর্ষিগণ বেনের নিকট গিয়া বলিলেন যে মহারাজের রাজ্যকাল শতবর্ষব্যাপী হইবে এবং তাঁহারাও শতবর্ষব্যাপী যাগযজ্ঞ করিবেন। মহারাজ বেন মহাক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবী ধ্বংসের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে মহর্ষিগণ তাঁহার বাম বাহুতে আঘাত করিলেন এবং সেইস্থল হইতে কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্রকায় নিষাদ বহির্গত হইল। এই নিষাদের শক্তি ছিল অপরিসীম; তাহার জন্ম হইয়াছিল বেনের সঞ্চিত পাপরাশি হইতে। এই নিষাদের পুত্র হইল শবর; সে বিন্ধ্য-পর্বতের সন্নিকটে বাস করিতে লাগিল। ইহার পর মহর্ষিগণ বেনের দক্ষিণ বাহুতে আঘাত করিলে সেইস্থল হইতে মহাবীর পৃথুর জন্ম হইল। তাঁহার কথা পুর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই পৃথু অতঃপর মহর্ষিগণ, গঙ্গাদেবী প্রভৃতি কর্তৃক রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। সমস্ত জগৎ পৃথুকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল; তিনিও পৃথিবী সুশাসন করিতে লাগিলেন। জগৎ ধনধান্যে সু-সমৃদ্ধ হইল। পৃথু তখন পেতামহা-যজ্ঞ করিলেন[৪০]। গ্রন্থকার অতঃপর সূত এবং মাগধ নামক দুইজন বর্ণবিকারের জন্মকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা উদ্ভূত হইয়াছিলেন যজ্ঞের অগ্নি হইতে এবং তাহার কার্য হইল পৃথুর গুণকীর্তন করা। মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে যথাক্রমে অস্পূপ এবং মগধ দেশ পুরস্কার স্বরূপ দান করিলেন[৪১]।

যজ্ঞান্তে ভোজনে অংশগ্রহণ করিবার জন্য সমগ্র পৃথিবীর লোকজন আগমন করিতে লাগিলেন। পৃথু তখন অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিলেন, কারণ তাঁহার সাম্রাজ্যে যাহা ছিল তাহা সম্পূর্ণ দান করিয়াছিলেন; অবশিষ্ট ছিল মাত্র বাণ, তুনীর, বর্ম প্রভৃতি। তিনি উহা লইয়া

পৃথিবীকে বাণবিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে বসুন্ধরা (বসুদরা) গাভীরূপে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ধনুহস্তে পৃথুও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাড়িতা হইয়া বসুন্ধরা জনলোক, তপোলোক এবং ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া অবশেষে দৈববাণীর নির্দেশানুযায়ী পৃথুর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। বসুন্ধরা বলিলেন যে পৃথু যদি তাঁহাকে হত্যা করেন তাহা হইলে তাঁহার স্ত্রীহত্যা হইবে এবং জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে ; বরঞ্চ তিনি যদি তাঁহাকে দোহন করেন তাহা হইলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সমৃদ্ধ হইবে এবং জীবনলাভ করিবে। বসুন্ধরা পৃথুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়া পৃথিবী নাম পরিগ্রহণ করিলেন[৪২]। এইবার স্বায়ম্ভুব মনু বৎস হইলেন এবং পৃথু বসুন্ধরাকে দোহন করিতে লাগিলেন ; ইহার পর ব্রহ্মর্ষিগণ যখন দোহন করিতে আসিলেন তখন সোম হইলেন বৎস এবং বৃহস্পতি তাঁহাকে দোহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবগণ, পিতৃগণ, অসুর, নাগ, যক্ষরক্ষ, স্থাবর-জঙ্গম সকলেই দুগ্ধ দোহন করিয়া তৃপ্ত হইলেন এবং ব্রহ্মাণ্ড সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল[৪৩]।

ইহার পর মহাদেশ, সমুদ্র, পাহাড়পর্বত প্রভৃতির বিবরণ পরিবেশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথমেই আমরা জম্বুদ্বীপের বর্ণনা পড়িতেছি। জম্বুদ্বীপ শতসহস্র যোজন প্রশস্ত এবং এখানে সিদ্ধর্ষি, চারণ এবং বিভিন্ন প্রকার লোক বাস করেন। ইহা লবণসমুদ্র কর্তৃক পরিবেষ্টিত। জম্বুদ্বীপে কয়েকটি বৃহৎ পর্বত আছে , উহা পুর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত। পর্বতগুলি হইল তুষারমণ্ডিত হিমবান পর্বত, স্বর্ণপর্বত হেমকূট, ধাতুময় নিষধপর্বত, চক্রাকার এবং মণিমুক্তা সমন্বিত মহামেরু, মূল্যবান প্রস্তর সমন্বিত নীলপর্বত এবং স্ফটিক পরিপুর্ণ শ্বেতপর্বত। সর্বশেষে শৃঙ্গবান পর্বতের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পর বিভিন্ন বর্ষ, পর্বতমালা এবং জম্বুদ্বীপের সপ্ত অঞ্চলের অবস্থান এবং বিস্তার বিশেষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যদেশ হইল ভারতবর্ষ এবং ইহার সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন[৪৪]। লেখক বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষ নয়টি অঞ্চলে বিভক্ত, কিন্তু অধিকাংশ নামগুলিই অপরিচিত[৪৫]। ভারতবর্ষের সাতটি পর্বতের নামের মধ্যে আমরা পড়িতেছি : মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষবান্, বিন্ধ্য, পারিপাত্র[৪৬]। নদীর নামের মধ্যে আমরা পড়িতেছি : সরস্বতী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, সরযু, যমুনা, এরাবতী, বিতস্তা, বিপাশা, দেবিকা, কুহু, গোমতী, ধৃতসর্প, বহুদা, দৃষদ্বতী, কোশিকী, কৃতিয়, নিশ্বর, গণ্ডকী, চক্ষু, লোহিত্য[৪৭]। ইহারা হিমবান হইতে নির্গত হইয়াছে। লেখক অতঃপর পারিপাত্র, ঋক্ষবান, বিন্ধ্য, মলয়, মহেন্দ্র, শুক্তিমান প্রভৃতি পর্বত হইতে বিনিঃসৃত নদনদীর নাম পরিবেশন করিয়াছেন। এই সমস্ত নামের মধ্যে বিখ্যাত নদনদী রহিয়াছে ; আবার অপরিচিত নদীর নামেরও অভাব নাই[৪৮]। এতদ্ব্যতীত কুরু, পাঞ্চাল, শূরসেন, মৎস্য, কলিঙ্গ, মধ্যদেশ, অভীর, যবন, মদ্রক, কাম্বোজ, তুখার, কিরাত, কাশ্মীর, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, পুণ্ড, বিদেহ, তাম্রলিপ্ত, ডেথন, পাণ্ড্য, কেরল, সতিয়, কলিঙ্গ, পুলিন্দ, দণ্ডক, কুন্তল, আন্ধ্র, সুরাষ্ট্র, উৎকল, ভোজ, কিষ্কিন্ধ, কোশল, ত্রিপুর, বেদিষ প্রভৃতি নাম পাঠের সঙ্গে সঙ্গে যেমন এই অঞ্চলের বা জাতির কীর্তিকাহিনী চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে তেমনি আবার অজ্ঞাতগোত্র বহু নাম সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হইলেও তাহা পুরণ করিবার

উপায় দেখি না[৪৯]। কোন কোন নাম একাধিকবার দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর লেখক বিভিন্ন বর্ষের বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে কিম্পুরুষবর্ষ চিত্ররথের উদ্যান নন্দনকাননের সমতুল্য, সেখানে বৃক্ষগুলি স্বর্ণনির্মিত। সেখানে মানুষের জীবনকাল দশসহস্র বৎসর, নারী-গণের দেহ হেমকান্তি, দেখিতে তাহারা বিদ্যাধরী ও অপ্সরাতুল্য। ইহার উত্তরে হইল হরিবর্ষ। এইস্থলের লোকগণের দেহ কাঞ্চনবর্ণ; স্ত্রীগণ কিম্পুরুষবর্ষের নারীগণের মতই, মনে হয় তাহারা যেন স্বর্গভ্রষ্টা দেবী। জরাব্যাধিমৃত্যু তাহাদের অঙ্গস্পর্শ করে না। ইলাবৃতের উত্তরে সূর্যোদয় হয় না, কিন্তু চতুষ্পার্শ্বস্থ মণিমুক্তার ঔজ্জ্বল্যে সেখানে দিনরাত্রির প্রভেদ অনুভূত হয় না। সেখানকার মানুষও যেন স্বর্গভ্রষ্ট, নারীগণ অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী[৫০]। ইহার পর লেখক বলিয়াছেন যে হিমবানের শীর্ষে কৈলাস নামক স্থানে বৈশ্রবণ বাস করেন। কৈলাস পর্বতের পাদদেশ-নিঃসৃত নদীর নাম মন্দাকিনী; উহার তীরে নন্দনবন অবস্থিত। ইহার পর ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়নের কাহিনীটিকে বর্ণনা করা হইয়াছে। পূর্বপুরুষগণের দেহভস্ম পাতালে চাপা পড়িলে ভগীরথ মর্ত্যে গঙ্গা আনয়নের জন্য তপস্যা করিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প হইল তিনি গঙ্গাবারি দ্বারা ঐ ভস্ম বিধৌত করিবেন। গঙ্গা পরমেশ্বরের (মহাদেবের) জটা হইতে নির্গত হইয়া হিরণ্যশৃঙ্গে পতিত হইলেন; এই স্থলই গঙ্গাদেবীর মর্ত্যে আগমন করিবার প্রথম সোপান। গঙ্গা এইবার সপ্তধারা হইয়া ছুটিলেন। লেখক তাঁহার গতিপথের ভূগোল রচনা করিয়াছেন[৫১]। ইহার পর হিরণ্যশৃঙ্গের রাজা কুবের এবং তাঁহার পার্শ্ববর্তী রাজগণের বিবরণ দিয়া গ্রন্থকার আবার কতগুলি নদনদী, পর্বতের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। ইহার পর আমরা শাকদ্বীপের বিবরণ পড়িতেছি[৫২]। এখানে পবিত্র পর্বতের সমারোহ, দেশ খাদ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ। লেখক ইহার নদনদী এবং পাহাড়পর্বতের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে এখানে বর্ণ এবং চতুরাশ্রম বিদ্যমান এবং এখানে কোন বর্ণশঙ্করের অস্তিত্ব নাই। শাকদ্বীপ শস্যফলাদিতে সুসমৃদ্ধ এবং লোকজন ধর্মাশ্রয়ী। ইহার পর আমরা কুশদ্বীপের বর্ণনা পড়িতেছি[৫৩]; ইহা শাকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ প্রশস্ত। এখানেও সাতটি পর্বতমালা বিদ্যমান এবং প্রত্যেকটি শাকদ্বীপের পর্বতাপেক্ষা দ্বিগুণ বড়। কুশদ্বীপের অন্তবর্তী হইল ক্ষীর সমুদ্র, কিন্তু ইহা আবার নদী ও সমুদ্র কর্তৃক পরিবেষ্টিত। ইহার পর লেখক ক্রৌঞ্চদ্বীপের বিবরণ পরিবেশন করিয়াছেন[৫৪]। ইহা কুশদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃহৎ। ক্রৌঞ্চদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পর্বতের নাম হইল ক্রৌঞ্চ। এই অঞ্চলের আরো বহু পর্বতের নাম লেখক বিবৃত করিয়াছেন। অতঃপর আমরা শাল্মলিদ্বীপের বিবরণ পড়িতেছি[৫৫]। লেখক বলিয়াছেন যে শাল্মলিদ্বীপে তিনটি পর্বত আছে; ইহার কেন্দ্রস্থলের পর্বতটি স্বর্ণমণ্ডিত, নাম সুমন। অপর দুইটির নাম পীত এবং সুবর্ণ। ইহার পর শাল্মলিদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলের বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই অঞ্চলে নদী, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম কিছুই নাই। এখানকার জনগণের ক্ষমতাবিশাল; তাহারা সর্বদাই সুখী। তাহাদের আয়ুষ্কাল দশ সহস্র বৎসর। সেখানে মহাসিদ্ধিগণ বাস করেন এবং ঐ দ্বীপের রাজার নাম হব্য। ইহার পর লেখক গোমেদ এবং পুষ্কর দ্বীপের বিবরণ পরিবেশন করিয়াছেন[৫৬]। গোমেদ দ্বীপের অন্তর্বর্তী হইল শর্করাসমুদ্র। পুষ্কর দ্বীপ গোমেদ দ্বীপের দ্বিগুণ

প্রশস্ত ; ইহার চতুষ্পার্শ্বে মানসোত্তর নামক পর্বত বিদ্যমান। এ দেশের রাজার নাম সবন। এখানে শাস্ত্র নাই, শাস্তি নাই, বেদ নাই, ধর্ম নাই, বৃষ্টি, নদী, শীত-গ্রীষ্ম কিছুই নাই।

ইহার পর গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে শাকদ্বীপে শাক বৃক্ষ আছে, কুশদ্বীপে কুশ ঘাস আছে, গোমেধদ্বীপে গোমেধ পর্বত বিদ্যমান, পুষ্করদ্বীপে আছে পুষ্কর বা বরিঙ্গিন বৃক্ষ[৫৭]। বরিঙ্গিন বৃক্ষের অপর নাম ন্যগ্রোধ। এখানে ব্রহ্মার উপাসনা প্রচলিত। ইহার পর লেখক বিভিন্ন দ্বীপের তুলনামূলক সমালোচনা করিয়াছেন[৫৮]। লেখক অতঃপর ভূতাদি, মহান, অহঙ্কার, প্রধান ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আবার সপ্তভুবন, সপ্তদ্বীপ প্রভৃতির বিবরণ পরিবেশন করিয়াছেন। ইহার পর ইন্দ্র, বরুণ এবং যমবৈবস্বতের বাসস্থানের বিবরণ দিয়া লেখক মধ্যাহ্ন-সূর্যের অবস্থানানুযায়ী ইহাদের দিনরাত্রির ইতিকথা বিবৃত করিয়াছেন। ইন্দ্রের বাসস্থানের নাম অমরাবতী, বরুণের বাসস্থানের নাম সুখাপুরী এবং যম বৈবস্বতের বাসস্থানের নাম সংযমন। ইহার পর সূর্যের গতিপথ, দক্ষিণায়ন, উত্তরায়ন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের জ্যোতিষিক তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে[৫৯]। এতদ্ব্যতীত আর্দ্রা, পুষ্য প্রভৃতি নক্ষত্রাদির অবস্থান, অজবীথি, নাগবীথি, সপ্তর্ষি, দ্বাদশরাশি, দিনের বিভিন্ন অংশ ইত্যাদির পর্যালোচনা করিয়া গ্রন্থের শেষ করা হইয়াছে[৬০]। গ্রন্থের শেষে কোন স্বস্তিবচন নাই। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন[৬১] যে এই গ্রন্থে বংশানুচরিত নাই এবং বংশানুচরিতই হইল পুরাণগুলির পঞ্চলক্ষণের মধ্যে অন্যতম। ইহা আশ্চর্যজনক মনে হইতে পারে, কারণ বায়ুপুরাণে এই বংশানুচরিতই প্রথমদিকে পরিবেশন করা হইয়াছে। গ্রন্থটি জ্যোতিষিক তথ্য পরিবেশন করিতে করিতে অনেকটা যেন আকস্মিকভাবে শেষ হইয়াছে। সুতরাং ইহা মনে হওয়া অসম্ভব নহে যে হয়তো ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের কোন পূর্ণতর পুঁথি আবিষ্কৃত হইতে পারে। গণ্ডার এই অভিমত আমার নিকট সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না, কারণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ কাকাবিনও একই স্থলে শেষ হইয়াছে। এইবার আমরা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ কাকাবিনটি আলোচনা করিব। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এই কাব্যটি পৃথুবিজয় নামেও পরিচিত এবং অষ্টগুণ এই গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। বস্তুত এই গ্রন্থের শেষে আমরা পড়িতেছি : 'সঙ্গ অষ্টগুণ পণ্ডিতেঙ্গ জগৎ অনিন্দ্য তুহু-তুহু বিদগ্ধ রিঙ্গ লনো।' এই কাব্যরচনায় শার্দূলবিক্রীড়িত, বিকৃতি, জগদ্ধিত, স্রগ্ধরা, বসন্ততিলক, অনুষ্টুভ্, প্রহর্ষিণী, ভ্রমরবিলসিত, দোধক, ভুজঙ্গপ্রয়াত, মত্তময়ূর, পৃথ্বী, কৃতি প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। গ্রন্থের স্থলে স্থলে কিঞ্চিৎ তান্ত্রিক শৈবপ্রভাবও অনুভূত হয়, কিন্তু ইহা যথেষ্ট সুস্পষ্ট নহে[৬২]।

গ্রন্থের প্রথম সর্গে অধার্মিক রাজা বেণের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তিনি সঙ্গ পরমর্ষি মুখ্য ভগবান অঙ্গির তুড়াতৃজ প্রমুখ ঋষিগণের অনুরোধ উপেক্ষা করিলে কুপিত ঋষিগণের আঘাতে তাঁহার একবাহু হইতে নিষাদ-শবর সৃষ্টি হইল। দ্বিতীয় সর্গে বলা হইয়াছে কিরূপে 'উমিজিল স্ববাহু নির সঙ্গ নৃপতি পৃথু ঙরণ্য' অর্থাৎ কিরূপে বেণের অপর বাহু হইতে নৃপতি পৃথুর আবির্ভাব হইল। প্রজাপুঞ্জ তাঁহার নিকট ভক্তিতে প্রণতশির হইল এবং তিনিও জগৎ রক্ষা করিতে লাগিলেন (মকচ্ছত্র নিঙ্ জগৎ)। তৃতীয় সর্গে বলা হইয়াছে যে 'রেসি (ঋষি)

শৈব সুগতগণও সঙ্গ নরেশ্বরের গুণ গাহিতে লাগিলেন। ইহার পর পৃথু প্রেতযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ইহা হইতে সুত এবং মগধের সৃষ্টি হইল; ইহাদের কাজ হইল সঙ্‌ নরেশ্বরের গুণগান করা। ইহার পর লোকজনের ভোজন ও পৃথিবীকে বাণবিদ্ধ করিবার প্রচেষ্টার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ সর্গে বলা হইয়াছে যে পৃথিবী জনলোক, তপলোক, সত্যলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পৃথুও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন, অবশেষে উপায়ন্তর না দেখিয়া পৃথিবী বশ্যতা স্বীকার করিয়া বলিলেন, 'স্ত্রীবধে কি দোষন্য' এবং 'পাপকর্ম' : স্ত্রীবধ দোষের এবং পাপের। পঞ্চম সর্গে বিভিন্ন দেবদেবী, গন্ধর্ব, অপ্সর প্রভৃতি দ্বারা পৃথিবীর দুগ্ধ-দোহনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ সর্গে জম্বুবর্ষ, ভারতবর্ষ, হেমকূট, নিসদ, শ্বেত নীলপর্বত, সুমেরু, মাল্যবান, গন্ধমাদন প্রভৃতির বিবরণ পরিবেশন করা হইয়াছে। ইহার পরবর্তী সর্গে বিভিন্ন বর্ষ এবং ইহার নরনারীর রূপ, যৌবন, চরিত্র প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টম সর্গে হিমবান, হেমকূট, নীলগিরি, কৈলাসগিরিতে অবস্থিত হিমাদ্রি এবং উহার লোকজনের কাহিনী পরিবেশিত হইয়াছে। নবম ও দশম সর্গে মন্দাকিনী, নন্দনবন, লোহিত-নদ প্রভৃতির বিবরণ পড়িতেছি। একাদশ হইতে চতুর্দশ সর্গে পড়িতেছি ভগীরথ কর্তৃক মর্ত্যে গঙ্গা আনয়নের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। দেবী গঙ্গা শ্রী সদারুদ্রের জটা হইতে বহির্গত হইলেন এবং মহীতলে অবতরণ করিলেন। চতুর্দশ সর্গে গঙ্গার সপ্তধারার বিবরণ পরিবেশন করা হইয়াছে। পঞ্চদশ সর্গে নগর ভারতবর্ষ এবং নগর দহন-এর উল্লেখ করা হইয়াছে[৬৩]। কবি ষোড়শ সর্গে আরো কিছু ভৌগলিক তথ্য পরিবেশন করিয়া পরবর্তী সর্গে জ্যোতিষিক তথ্য প্রদান করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে মধ্যাহ্ন সূর্যের অবস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন দেবতার বাসস্থলের অবস্থান নির্দেশ করিয়াছেন। অন্তিম সর্গে সূর্য অস্তমিত হইলে জগতের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। সকলের শেষে 'ভট্টার পরমশিবাদিত্য'-এর উল্লেখ করিয়া গ্রন্থের শেষ করা হইয়াছে।

খ. অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী

অধ্যাপক কার্ণ সত্যই বলিয়াছেন যে সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত কাহিনী পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। তন্তু পঙ্গেলরন, মাণিকমায়া, অগস্ত্যপর্ব, তত্ত্ব সবঙ্গ সুবুঙ্গ প্রভৃতি পুস্তক সৃষ্টি কাহিনীর বিষদ বিবরণ পরিবেশন করিয়াছে। আদিপুরাণেও উপকথা এবং ধর্মতত্ত্বমূলক অনেক বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথমে আমরা তন্তু পঙ্গেলরন গ্রন্থখানির আলোচনা করিব। ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্ব, পৌরাণিক কাহিনী এবং ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সুদূর প্রসারী আলোচনা আছে। কুঞ্জরকুঞ্জের মত কোন কেন্দ্রীয় প্লটের পরিকল্পনা ইহাতে বিদ্যমান নাই। এই গ্রন্থে মুখ্যতঃ ধর্মসংক্রান্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্ব এবং পৌরাণিক কাহিনী এই গ্রন্থে

বর্ণিত হইয়া থাকিলেও উহার স্থান এখানে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণতর। ডঃ পিগো এই গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়া ইহার আলোচনার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন[১]।

এই গ্রন্থে সাতটি অধ্যায় আছে এবং নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই সৃষ্টি কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে অতি প্রাচীনকালে যবদ্বীপে মানুষও ছিল না, মহামেরুও ছিল না। সুতরাং জগৎপ্রমাণ মানুষ সৃষ্টি করিবার জন্য সেইস্থলে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা মানুষকে দেবতাদের প্রতিমূর্তিরূপেই সৃষ্টি করিলেন। মানবজাতি অতঃপর বিপুল সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাহাদের না ছিল গৃহ, না ছিল পোষাক-পরিচ্ছদ। সুতরাং মহাকরণ সদয় হইয়া তাহাদের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্রহ্মা, বিশ্বকর্মা, ঈশ্বর, বিষ্ণু, মহাদেব, চিপ্তগুপ্ত (চিত্রগুপ্ত ?) এবং চিপ্তঙ্গ্‌কারকে (চিত্রকর ?) যবদ্বীপে পাঠাইলেন। এইরূপে বহুস্থলে গৃহ নির্মিত হইল এবং অবশেষে মেড়ঙ্গ-কমুলন রাজ্য স্থাপিত হইল। ঈশ্বর শব্দ, দশশীল এবং পঞ্চশিখা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া গুরুদেশ উপাধি লাভ করিলেন। বিষ্ণু এবং শ্রী মেড়ঙ্গণ নামক রাজ্য স্থাপন করিলেন এবং বিষ্ণু কণ্ড্যবন-উপাধি পরিগ্রহণ করিলেন। বিষ্ণু এবং শ্রীর পাঁচ সন্তান হইল; তাঁহাদের মধ্যে বৃত্তি কণ্ড্যবন পরে রাজা হইলেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখিতেছি যে দেবগণ গুরুর নিকট সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য আগমন করিলেন। গুরু দেবগণকে মহামেরু পুনরায় যবদ্বীপে সংস্থাপিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তখন তাঁহারা মন্দরপর্বত নামক মহামেরুর শৃঙ্গটি যবদ্বীপে টানিয়া আনিতে লাগিলেন; উহা উচ্চতায় ছিল একশত সহস্র যোজন। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে এই সময় হইতে মহামেরুর উচ্চতা প্রায় অর্ধেক হ্রাস পাইল। ঐ পর্বতশৃঙ্গটি যবদ্বীপে সংস্থাপিত করিতে আসিয়া দেবগণ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা—বিষ্ণু পর্বতটিকে বেষ্টন করিয়া সর্পরূপে অধিষ্ঠিত হইলেন, ব্রহ্মা হইলেন কূর্মরাজ এবং বায়ু কূর্মের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। এইরূপে সেই বিশালকায় পর্বতটি যবদ্বীপে আনিত হইল। দেবতাদের এই বিপুল প্রচেষ্টায় সমগ্র পৃথিবী শঙ্কায় চিৎকার করিয়া উঠিল। পরিশ্রান্ত দেবগণ তৃষ্ণার্ত হইয়া পর্বত নিঃসারিত কালকূট পান করিয়া মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পরমেশ্বর ইহা অবলোকন করিয়া নিজেও কিঞ্চিৎ কালকূট পান করিলেন এবং তিনি হইলেন নীলকণ্ঠ। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কণ্ঠ তত্ত্বামৃত দিয়া ধৌত করিলেন এবং দেবগণকেও উহা দিলে তাঁহারা পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিলেন। দেবগণ তাঁহাদের চেষ্টা পুনরায় আরম্ভ করিলেন এবং এই কার্যে দৈত্য, দানব এবং রাক্ষসগণ তাঁহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই সমবেত চেষ্টার ফলে পর্বতটিকে যবদ্বীপের পশ্চিমপ্রান্তে সংস্থাপিত করা সম্ভবপর হইল। পর্বতটির বিপুল চাপে পশ্চিম যবদ্বীপ নিম্নাভিমুখী হইল এবং পূর্ব যবদ্বীপ ঊর্ধ্বপানে উঠিতে লাগিল। সুতরাং পর্বতটিকে আবার পূর্ব যবদ্বীপে স্থানান্তরিত করিতে হইল। পরমেশ্বর খুব সন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে শ্বেতকায় বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করিবার অনুমতি দিলেন, ব্রহ্মাকে দিলেন হংসপৃষ্ঠে আরোহণের এবং বিষ্ণুকে দিলেন গরুড়ধ্বজে আরোহণ করিবার অনুমতি। দেবগণ সমস্ত মূল্যবান পদার্থ

লইয়া আসিলেও তাঁহারা কেতেক্ মেলেঙ্-নামক কমণ্ডলুটি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই কমণ্ডলুটি রাত্মজ এবং রাত্মজী নামক দুইটি রাক্ষসের কবলে পড়িয়াছিল। সূর্য এবং চন্দ্রের নিকট সংবাদ পাইয়া ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু সেইস্থলে গমন করিলেন। যখন সমস্ত অনুনয়-বিনয় ব্যর্থ হইল তখন বিষ্ণু অনুপমা সুন্দরীর ছদ্মবেশে কমণ্ডলুটি অপসারণ করিলেন। ইত্যবসরে রাক্ষস রাহু কমণ্ডলুর ভিতর যাহা ছিল তাহার খানিকটা পান করিলেন। বিষ্ণু ইহা চন্দ্র এবং সূর্যের নিকট জানিতে পারিয়া তাঁহার চক্র দ্বারা রাহুর মস্তক ছেদন করিলেন, কিন্তু রাক্ষসের মস্তকটি কমণ্ডলুস্থ জিনিস পান করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া গেল; উহা তখন চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করিতে লাগিল। এদিকে তত্ত্বামৃত বারি পান করিয়া শিব, ঈশ্বর, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু যোগাভ্যাস করিতে ব্রতী হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে জগৎপ্রমাণের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। জগৎপ্রমাণ এবং তাঁহার স্ত্রী উমার কামদেব এবং স্মরী নামক সন্তান ছিল। ইহাদের কথা বলিয়া লেখক অতঃপর গুরু এবং পরমেশ্বরীর তপস্যার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পর তাহাদের প্রেমলীলা এবং গণ ও কুমারের জন্মকাহিনী কিছুটা সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। এদিকে কামদেব স্মরীর জন্য কামনাচঞ্চল হইলেন, কিন্তু গুরুর ক্রোধের আশঙ্কায় তিনি স্মরীর দেহ দুই অংশে বিভক্ত করিলেন। ইহার এক অংশ হইল কামদেবের প্রিয়তমা রতি। অতঃপর রতি তুরুক মনিস রূপে এবং কামদেব বেঙ্গন রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং কালক্রমে তাহারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। অতঃপর লেখক গুরু এবং উমার কঠোর তপস্যা এবং গণ ও কুমারের বাল্য-কালের কাহিনী অনেকটা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন[২]। গুরু অতঃপর পাঁচজন দেবতা সৃষ্টি করিয়া তাঁহার পুত্রকে বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় সাহায্য করিবার জন্য উহাদিগকে নির্দেশ দিলেন। দেবগণ এই সম্বন্ধে উপদেশ চাইলে, গুরু তাহা উমার সমক্ষে প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। তিনি তাই উমাকে কৃষ্ণবর্ণা বকনা গরুর দুগ্ধ আনিতে প্রেরণ করিলেন। উমা সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াও এইরূপ দুগ্ধবতী বকনা গরুর সন্ধান পাইলেন না; অবশেষে তিনি কোন একটি রাখাল বালকের গৃহে ঐরূপ একটি গাভী দেখিতে পাইলেন, কিন্তু রাখাল বালকটি স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী না হইলে উমাকে ঐ গাভীর দুগ্ধ প্রদানে অস্বীকৃত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া উমা রাখাল বালকের সহবাস করিতে লাগিলেন এবং কালক্রমে তাহাদের তিন পুত্র হইল। পুত্রদের মধ্যে কনিষ্ঠ হইল ভিকু বোদ্ধ বা সোগত (ভিক্ষু বুদ্ধ বা সৌগত)।

চতুর্থ অধ্যায়ে ধর্মসংক্রান্ত বিবরণী পরিবেশন করা হইয়াছে এবং পরবর্তী অধ্যায়-গুলিতেও ইহার জের চলিয়াছে। কথিত হইয়াছে যে পরমেশ্বর যবদ্বীপে মণ্ডল স্থাপন করেন। গুরু ইহার প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম মণ্ডলের নাম সুকযজ্ঞ। অতঃপর অনেক লোক ভিক্ষুদের সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে গুরু তাহাদিগকে দীক্ষা দিলেন। প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করিলেন বৃহস্পতি, অতঃপর ক্রমে ক্রমে সোম, বুধ, শুক্র, রদিত্য, শনৈশ্চর এবং অঙ্গর (অর্থাৎ মঙ্গল) দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে সুকযজ্ঞের সময় ইহাই গুরুর শিষ্যসংখ্যা ছিল। দ্বিতীয় মণ্ডলের নাম হইল সুকযজ্ঞপক্ষময়ন। ইহার পর আরো কয়েকটি মণ্ডল বর্ণনা

করিয়া গ্রন্থকার ব্রাহ্মণ তেকেনবুবুঙ্গের কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। তেকেনবুবুঙ্গ ঈশ্বরের দয়ায় ম্পু সিদ্ধযোগ নামে খ্যাত হইলেন। সিদ্ধযোগ অতঃপর বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহার গুরু তাঁহাকে দেবী কসিঙ্গিকে বিবাহ করিতে অনুমতি দিলেন। দেবী কসিঙ্গি ছিলেন মেড়ঙ্গগণের রাজা ববু-লঙ্গিতের কন্যা। যদিও রাজকন্যা ছিলেন দৃষ্টিহীনা, তথাপি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আশীর্বাদে রাজকন্যা সর্বাঙ্গসুন্দরী হইলেন; তাঁহার নাম হইল বিকু সিদ্ধযোগী। চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে গুরুর নিকট উপদেশ লাভের জন্য ঈশ্বর, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু আগমন করিতেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ব্রাহ্মণ কচুণ্ডের কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। কচুণ্ড মহামেরু হইতে যবদ্বীপে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আগমন করিলেন। এতদ্ব্যতীত অগষ্টির (অগস্ত্য[৩]) কথাও বলা হইয়াছে। অগষ্টি যোগাভ্যাস করিয়া ধর্মরাজ নামে খ্যাত হইলেন এবং পরে তাহার পরিচয় হইল ঋষি সিদ্ধবংসিতদেব। দেবগণ তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইলেন; তখন গুরু তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার দেহ মহামেরুর শৃঙ্গে স্থাপন করিলেন। সেই সময় হইতে মহামেরুর শৃঙ্গকে চন্দ্র, সূর্য, মেঘ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। এইটি পবিত্র লিঙ্গ-স্থল। ঋষি তরুণ-তপ-যোবনের উল্লেখান্তে পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ হইল।

পরবর্তী অধ্যায় একটি নিদারুণ পারিবারিক কলহের পটভূমিকায় আরম্ভ হইয়াছে। কথিত হইয়াছে উমা কুমারের সহিত নির্দয় ব্যবহার করিলে গুরু তাঁহাকে অভিসম্পাত করিয়া দুর্গা নাম্নী রাক্ষসীতে পরিণত করিলেন[৪]। ক্রোধে এবং দুঃখে দুর্গা নিজেকে অভিসম্পাত দিলেন; ইহাতে তিনি কালরুদ্র নামক রাক্ষসে রূপান্তরিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু হইল তিনটি, হস্ত হইল চারিটি। কালরুদ্র চরাচর বিপর্যস্ত করিয়া মানুষ এবং জন্তু হত্যা করিতে লাগিলেন। সুতরাং ঈশ্বর, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু সৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করিলেন এবং একদল কনসার্ট পার্টি লইয়া পৃথিবীর সর্বত্র বয়াঙ-খেলা দেখাইয়া চলিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কালরুদ্র কঠোর তপস্যান্তে গুরু হইতে মনস্থ করিলেন। উমা পাতালে কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন, তিনিও গুরু হইতে মনস্থ করিলেন। কুমার এইবার তাঁহার প্রকৃতরূপে আবির্ভূত হইলেন।

সপ্তম বা শেষ অধ্যায়ে গুরুর বিবরণ দিয়া আরম্ভ হইয়াছে। তিনি শৈব-সম্প্রদায়ের ভুজঙ্গ শ্রেণীর বিকু (ভিক্ষু) হইলেন। তখন তাহার নাম হইল মহম্পু পল্যাৎ বা এম্পু মহাপল্যাৎ। তিনি পগুহনের দক্ষিণপুর্ব দিকে কল্যাসেমের শ্মশানে বাস করিতে লাগিলেন এবং সেইস্থলে ভৈরবসম্প্রদায়ের বিধি অনুযায়ী তপ করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যরাত্রে নরমাংস ভক্ষণ করিতেন। দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর তিনি জলপান করিবার জন্য মানুষের মাথার একটি খুলি এবং পাঁচটি পাত্র (কণ্টোর) লইয়া গলুরাজ্যের রাজার সমীপে উপনীত হইলেন। রাজা বলিলেন "ঐ লোকটি নরমাংসখাদক এবং ব্রহ্মার সৃষ্টি ধ্বংস করিতেছে; সুতরাং উহাকে যবদ্বীপ হইতে বিতাড়িত কর এবং সমুদ্রে নিক্ষেপ কর।" পল্যাৎ অট্টহাস্য করিয়া শ্মশানে ফিরিয়া আসিল। পরদিন প্রত্যুষে রাজার অনুচরগণ তাঁহাকে সাগরে নিক্ষেপ

করিলেন, কিন্তু পরবর্তী দিবসেই তিনি আবার যথারীতি শ্মশানে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন তাঁহাকে একটি প্রস্তরের সহিত নিবদ্ধ করিয়া আবার তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইল, কিন্তু আবার তিনি ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার দেহকে অগ্নি সৎকার করিয়া দেহভস্ম সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইল; কিন্তু পল্যাতের মৃত্যু হইল না। তখন রাজার অনুচরগণ তাঁহার পদপ্রান্তে ক্ষমাভিক্ষা করিলে তিনি বলিলেন যে তাঁহার বাসস্থান কম্বঙ্গনদ্বীপে এবং ঐস্থলে ভুজঙ্গ-মণ্ডল আছে। এই দেশের রাজা তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ; সুতরাং তিনি একটি প্রস্তরখণ্ডকে নৌকারূপে ব্যবহার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন। রাজানুচরগণ তখন তাঁহার শিষ্য হইয়া তাহার সঙ্গে অনুগমন করিলেন। ইহারা অতঃপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে গলু-রাজ উহাদের একজনকে তাঁহার গুরু এবং অপরজনকে তাঁহার পুরোহিত নিযুক্ত করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে এম্পু মহাপল্যাৎ যবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি অতঃপর তাঁহার দেহ দুইখণ্ডে বিভক্ত করিলেন, উহা হইতে সৌগত এম্পু বলুহ্-বঙ্গ এবং শৈব এম্পু বরঙ্গের উদ্ভব হইল। এম্পু বরঙ্গ অতঃপর হুঙ্গ পর্বতের কল্যাসেম-শ্মশানে বাস করিতে লাগিলেন এবং ভৈরব সম্প্রদায়ের অনেক লোক তাঁহার সহচর হইলেন। তাঁহারা মৃতদেহ স্তূপাকার করিয়া নরমাংস ভোজন করিতে লাগিলেন, মাথার খুলি হইতে জলপান করিতে লাগিলেন। দহ-রাজ তখন দুইজন ভ্রাতাকে পাঠাইলেন এম্পু বরঙ্গকে হত্যা করিবার জন্য; এই দুই ভ্রাতা বাস্তবিকপক্ষে ছিলেন বিষ্ণুর অবতার। তাঁহারা এম্পু বরঙ্গকে সমুদ্রে নিক্ষেপ এবং অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াও হত্যা করিতে পারিলেন না। তখন ঐ দুই ভ্রাতা এম্পু বরঙ্গের সহিত জম্বুদ্বীপে গমন করিলেন। সেখানে তিনি হরিচন্দনের উপাসক ব্রাহ্মণদিগকে দীক্ষিত করিয়া আবার যবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার পর তিনি জম্বুদ্বীপ হইতে আনীত একটি বিষ্ণুমূর্তি দহরাজকে উপহার প্রদান করিলেন। ইহার পর বৌদ্ধ বলুহ্-বঙ্গ এম্পু বরঙ্গের নিকট আসিয়া তাঁহাকে কস্তরি-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। তখন এম্পু বরঙ্গ কস্তরি-সম্প্রদায়ের প্রথম মণ্ডল স্থাপিত করিলেন এবং ত্যাগ-সম্প্রদায়ের দেবগুরু হইলেন। এইরূপে ভৈরব-সম্প্রদায় হইতে কস্তরি এবং ত্যাগ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল।

গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে রাজা ভততির জ্যেষ্ঠ পুত্র তকি দহ নামক স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। গ্রন্থকার অতঃপর জম্বুদ্বীপাগত রাজা চক্রবর্তীর আগমন ঘোষণা করিয়াছেন এবং আরো বলিয়াছেন যে ঐ দেশে বিষ্ণুর পূজা হয়। গ্রন্থের শেষাংশে লেখক দহের রাণী অজি নিনি, মার্কণ্ডেয়, তৃণবিন্দু এবং অঙ্গিরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

সংক্ষেপে ইহাই তন্তু পঙ্গেলরনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে গ্রন্থে যবদ্বীপের বিভিন্ন কিম্বদন্তী এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা প্রদান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মহামেরুকে জম্বুদ্বীপ হইতে জাভাতে স্থানান্তর করনের প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা যবদ্বীপীয় গ্রন্থকারের একটি উদ্দেশ্য নিহিত দেখিতে পাই; তাহা হইল ভারতীয় ঐতিহ্যের সহিত যবদ্বীপীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার সমীকরণ বা সামঞ্জস্যবিধান। অগস্ত্যির কিম্বদন্তীর পশ্চাতে ভারতীয় পটভূমিকা রহিয়াছে; কারণ ভারতবর্ষেও অনুরূপ কিম্বদন্তী বিদ্যমান। এই প্রসঙ্গে

ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে যদিও যবদ্বীপীয় গ্রন্থকার বিভিন্ন দেবদেবী, মণ্ডল, পর্বত ইত্যাদি ভারতবর্ষ হইতে যবদ্বীপে আমদানি করিয়াছেন তবুও তিনি তাঁহাদিগকে নির্মল ভারতীয় পটভূমিকায় সংস্থাপিত করেন নাই। গ্রন্থটি পড়িলে অনেক সময় মনে হইবে যে আমরা ভারতীয় পৌরাণিক জগতে বিচরণ করিতেছি, কিন্তু ঘটনার ক্রমবিকাশে অনেক নূতন তথ্য নূতন পরিবেশে পরিবেশন করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে স্থলে স্থলে প্রাক্-হিন্দুযুগের ধর্ম-বিশ্বাসের স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে। দেবদেবীগণের পারস্পরিক সম্পর্ক যে-আলোকে উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহা অনেক স্থলেই অভিনব। সুতরাং ইহা মনে করা অস্বাভাবিক নয় যে ভারত হইতে আগত ভাসমান কিম্বদন্তীগুলি দ্বীপময় ভারতের বিভিন্ন স্থলে গণমানসে বিভিন্নরূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে ; উহার সহিত স্বদেশী কিম্বদন্তীর ধারা সংমিশ্রিত হইয়াই এই তন্তু পঙ্গেলরনের সৃষ্টি করিয়াছে। স্থলে স্থলে কোন কোন ঘটনার অংশবিশেষকে হয়তো বিচ্ছিন্নভাবে ভারতীয় মূলের সহিত সংযোগসূত্রে গ্রথিত করা যায় ; কিন্তু দুর্লভ কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত সমগ্র ঘটনাকে ভারতীয় মূলের সহিত সংযোজিত করা অসম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে মঙ্গুকুহনের কাহিনীটি একান্তই স্বদেশী এবং দুর্গা সম্বন্ধে যে বিবরণী পরিবেশন করা হইয়াছে তাহা সংস্কৃত সাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। গ্রন্থের অনেকস্থল জুড়িয়া রহিয়াছে মণ্ডল, দেবগুরু এবং বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের বিবরণ। গুরু হইলেন মণ্ডলের অধ্যক্ষ এবং নারী ও পুরুষ তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেবগুরু এবং তাঁহার কয়েক-জন শিষ্য কয়েকটি মণ্ডলের স্থাপয়িতা ছিলেন। মণ্ডলদ্বারা সাধারণতঃ তান্ত্রিক ধর্মীয় সমাজ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উহার অধ্যক্ষকে বুঝাইত। রাজপতিগুণ্ডলের প্রথমাংশেও বহু মণ্ডলের উল্লেখ আছে। তান্ত্রিকপূজায় গুরু মণ্ডল বা চক্রবেষ্টনী আঁকিয়া উহাতে দেবতা বা প্রেতাত্মাকে আবাহন করিতেন এবং সাধারণতঃ তান্ত্রিক ধর্মীয় সমাজ উপস্থিত থাকিতেন। আলোচ্য গ্রন্থে যে সমস্ত মণ্ডলের উল্লেখ আছে তাহার কোন কোনটির উল্লেখ আমরা নাগরকৃতাগম[৫] অথবা রাজা হয়ম ভুরুকের বতুর-অনুশাসন[৬] লিপিতে দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং এই পর্যায়ের মণ্ডলের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব এবং গুরুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ডঃ পিগো বলিয়াছেন যে মণ্ডলের আভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কোন বিশদ বিবরণ না থাকায় আমরা ঐ সম্বন্ধে কোন সঠিক জ্ঞানলাভ করিতে পারি না[৭]। বস্তুতঃ মণ্ডলের তান্ত্রিক ধর্মাচরণ বিধিতে এত গোপনতা অবলম্বন করা হইত যে উহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া দুঃসাধ্য। তবে ভারত-বর্ষের আশ্রম, মঠ, বিহার প্রভৃতির সহিত যবদ্বীপীয় প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনামূলক আলোচনা করিলে হয়তো কিঞ্চিৎ ফললাভ হইতে পারে। গ্রন্থে ব্রহ্মচারী ভিক্ষুগণকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেও বিবাহিত ভিক্ষুর উল্লেখও রহিয়াছে। তন্তু পঙ্গেলরনের কোথাও বর্ণের উল্লেখ নাই। ডঃ পিগো বলিয়াছেন যে যে-স্থলে ব্রাহ্মণের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা বর্ণ-হিসাবে নহে, ধর্ম-সম্প্রদায়ের এক অঙ্গ হিসাবে। গ্রন্থে তান্ত্রিক মতবাদের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে। ধর্ম-শিক্ষার যিনি গুরু এবং যিনি নারীর সমক্ষে গুহ্য ব্যাপারে শিক্ষাদান করেন না, তিনি ভারতীয় তন্ত্র-সাহিত্যের প্রায় মধ্যমণি। এইরূপ শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু তন্তুপঙ্গলরনে একটি বিশিষ্ট স্থান

অধিকার করিয়া আছেন। এতদ্ব্যতীত ভৈরব-সম্প্রদায়ের যে-সমস্ত ভিক্ষু শ্মশানগমন করিতেন এবং শ্মশানে উপাসনা করিতেন তাহারা নিঃসন্দেহে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।

দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থের লেখকের নাম অপরিজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। গ্রন্থে বলিদ্বীপের উল্লেখ না থাকায় ডঃ পিগো গ্রন্থকারকে যবদ্বীপের অধিবাসী বলিয়া মনে করিয়াছেন[৮]। সে যাহাই হউক, গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও সম্ভবপর নহে। তন্তু পঙ্গেলরনের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুঁথির তারিখ ১৫৫৭ শকাব্দ। আভ্যন্তরীণ প্রমাণ অথবা ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্য হইতে এই সমস্যা সমাধানে কোন সাহায্য পাওয়া অসম্ভব। তৎ-কালীন যবদ্বীপীয় রাজা বা রাজ্যগুলি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের জ্ঞানও বিভ্রান্তিজনক, কারণ প্রাচীন মেড়ঙ্গ কমূলন, গলু, দহ রাজা ভর্তাত, রাণী অজি নিনি প্রভৃতির আবির্ভাব বিভিন্ন সময়ের স্বাক্ষরবহ। হরিচন্দনের পূজাও মধ্যযবদ্বীপে বিকাশলাভ করিয়া ঐ স্থানেই অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, যদিও পূর্ব-যবদ্বীপের অনুশাসনলিপির অভিশম্পাত-বাণী তাঁহার কথা একবারে বিস্মরণ করে নাই। সামাজিক তথ্য এবং ধর্মের বৃত্তান্তে বিভিন্ন যুগের চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে।

ডঃ কার্ণ বলিয়াছেন[৯] যে তন্তুর ভাষা এবং রচনাশৈলীর সহিত প্রাচীন যবদ্বীপীয় গদ্য-রচনা আদিপর্বের বিশেষ সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। সুতরাং তন্তুর ভাষার মধ্যে উত্তরকালে যে জঞ্জাল জমিয়াছিল তাহা পরিষ্কার করিলে তন্তুর আদিম ভাষা প্রকাশ পাইবে বলিয়া অধ্যাপক কার্ণ বিশ্বাস করিতেন। ডঃ পিগো কিন্তু মনে করেন যে ভাষার দিক হইতে বিচার করিলে তন্তু পঙ্গেলরনের সাদৃশ্য আছে কুঞ্জরকর্ণের সহিত। অধ্যাপক কার্ণের মতানুযায়ী কুঞ্জরকর্ণের রচনাকাল হইবে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে। ডঃ পিগো যে সমস্ত অতিরিক্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা হইল এই : (১) চেম্পার যে রাণীর কথা এখানে উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি পরবর্তী যুগের কিম্বদন্তী অনুযায়ী ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে সমাহিত হইয়াছিলেন (২) তিনি ইতিপূর্বেই দেবী শ্রীর অবতার হইয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি তন্তুর লেখকের নিকট কিম্বদন্তীর নায়িকারূপে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রথম যুক্তিটি সমসাময়িক প্রমাণের উপর নির্ভরশীল নহে; সুতরাং ইহার উপর কতটা আস্থা স্থাপন করা যায় তাহা বিবেচনার বিষয়। কারণ, এখনো আমরা শ্রীমতী বা কল্যাণী নারীকে তাঁহার জীবিতকালেই লক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি বলিয়া থাকি। এই সমস্ত কারণের জন্য তন্তু পঙ্গেলরনের রচনাকাল সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। তবে মনে হয় যে চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ যবদ্বীপের প্রথম যুগের মুসলিম ধর্মসাহিত্য, প্রাক্-মুসলিম বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের ব্যঞ্জনায় তন্তু পঙ্গেলরন গ্রন্থখানি কোরবাশ্রম এবং কুঞ্জরকর্ণের idiom-এর সহিত অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ[১০]।

আশা করি ইহা কেহ অস্বীকার করিবেন না যে তন্তু পঙ্গেলরনের রচনার তারিখ যাহাই হউক না কেন উহার পরিমণ্ডলটি ভারতীয়। লেখক গ্রন্থের যে নামকরণ করিয়াছেন তাহার অর্থ পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ; হয়তো এই নামকরণের কিছু সার্থকতা আছে।

মানিকমায়া নামক গ্রন্থখানি তন্তু পঙ্গেলরন অপেক্ষা অধিকতর অর্বাচীন; ইহা অনেকটা

আধুনিক যবদ্বীপীয় ভাষায় রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার "আল্লা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু উইণ্টার বলিয়াছেন যে উহা পুস্তকটির অর্বাচীনতার প্রমাণ নহে[১১]। তিনি মনে করেন যে এই গ্রন্থটি কর্তা মোসদ কর্তৃক কর্তাসুরাতে কবি জিতপ্সরের অনুকরণে রচিত হইয়াছিল। অধ্যাপক ভেথের মতানুযায়ী এই গ্রন্থখানি ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল[১২]। এইবার আমরা মানিকমায়া গল্পটির সংক্ষিপ্তসার নিম্নে পরিবেশন করিতেছি[১৩]।

লেখক বলিয়াছেন যে পৃথিবী এবং তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত সৃষ্ট হইবার পূর্বে কেবলমাত্র সঙ্-হ্যঙ্ বিশেষ বিদ্যমান ছিলেন। তিনি ভগবানের নিকট একটি বর প্রার্থনা করিলেন। ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া সঙ্ হ্যঙ্ বিশেষের মস্তকের উপর একটি গোলক ঝুলাইয়া রাখিলেন এবং সঙ্-হ্যঙ্ বিশেষ উহা তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। উহার একভাগ হইল স্বর্গ, পৃথিবী ইত্যাদি, দ্বিতীয় ভাগ হইল সূর্য, চন্দ্র, ইত্যাদি এবং তৃতীয় ভাগ হইল মানুষ বা মানিকমায়া।

সঙ্ হ্যঙ্ বিশেষ সমগ্র পৃথিবীর ভার মানিকমায়ার উপর অর্পন করিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্ হ্যঙ্ গুরু খেতাব দিলেন। সঙ্ হ্যঙ্ বিশেষের আশীর্বাদে মানিকমায়ার নয়টি পুত্র এবং পাঁচটি কন্যা হইল; কিন্তু তাহারা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। এই সমস্ত সন্তানের মধ্যে একজনের নাম ছিল মহাদেব এবং তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল মহাদেবী। মহাদেবকে পুর্বাঞ্চলের আধিপত্য দেওয়া হইয়াছিল; দক্ষিণাঞ্চলের কর্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছিল সঙ্ হ্যঙ্ সম্বুর (=শম্ভু) উপর। শম্বু সঙ্গ্যনকে বিবাহ করিলেন। তৃতীয় পুত্র সঙ্ হ্যঙ্ কমজয় দেবী রতেহ্‌কে (=রতি) বিবাহ করিলেন। তাঁহারা পশ্চিমাঞ্চলের আধিপত্য লাভ করিলেন। উত্তরাঞ্চল বিষ্ণুর কর্তৃত্বাধীনে স্থাপন করা হইল এবং বিষ্ণু শ্রীকে বিবাহ করিলেন। মানিকমায়ার পঞ্চম পুত্র সঙ্ হ্যঙ্ বয়ু (=বায়ু) দেবী সুমির সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং পৃথিবীর মধ্যভাগ শাসন করিতে লাগিলেন। উত্তর-পুর্বাঞ্চলের উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন ষষ্ঠপুত্র সঙ্ হ্যঙ্ প্রেবঞ্জল (প্রভঞ্জন ?); দক্ষিণপুর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল যথাক্রমে সঙ্ হ্যঙ্ কুবের এবং সঙ্ হ্যঙ্ মহযক্তি শাসন করিতে লাগিলেন। সঙ্ হ্যঙ্ শৈব (শিব) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্তা হইলেন।

অতঃপর মানিকমায়া বা সঙ্ হ্যঙ্ গুরু পাতালে গমন করিয়া সাতটি অংশের উপর সাতজন দেবতারূপী শাসনকর্তা নিয়োগ করিলেন। অতঃপর পাতাল হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি দেখিলেন যে পৃথিবী পশ্চিমদিকে কিঞ্চিৎ অবনমিত হইয়া পড়িয়াছে। দেবগণ বলিলেন যে পশ্চিমে একটি পাহাড় বিদ্যমান থাকার জন্য এই দিকটা এইরূপ নীচু হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তিনি উহাকে পুর্বাঞ্চলে স্থানান্তরিত করিয়া পৃথিবীর ভারসাম্য আনয়ন করিলেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সঙ্-হ্যঙ্ ধর্মজকের সৃষ্টি কথা বর্ণিত হইয়াছে; ধর্মজকের এক পুত্র হইল; তাহার নাম হইল চতুর কনক। এই চতুর কনকের পুত্রই হইল বিখ্যাত সঙ্ হ্যঙ্ কনকপুত্র যিনি সমুদ্রে তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন।

গ্রন্থের তৃতীয় অংশে বলা হইয়াছে যে দেবগণ পর্বত উপড়াইয়া লইয়া গিয়া পুর্বাঞ্চলে স্থাপন করিবেন। কথিত হইয়াছে যে দেবগণ ক্ষুধাতৃষ্ণায় ক্লান্ত হইয়া অজ্ঞাতসারে বিষাক্ত জল

পান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সঙ্ হ্যঙ্ গুরুও ইহা পান করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি উহা বিষাক্ত দেখিয়া বমন করিয়া ফেলিলেন। তথাপি এই বিষাক্ত জলের চিহ্ন তাঁহার কণ্ঠে রহিয়া গেল, কারণ ইহা নীল হইয়া গেল। সুতরাং তিনি নীলকণ্ঠ নামে খ্যাত হইলেন। তিনি ইহার পর কমণ্ডলু (!) নামক সুপেয় বারি আবিষ্কার করিলেন; ইহাতে মৃতদেহ পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া ওঠে। সঙ্ হ্যঙ্ গুরু স্বয়ং ইহার কিয়দংশ পান করিলেন এবং কিছু অংশ মৃত দেবগণকে দিলেন। ইহাতে মৃত দেবগণ পুনরায় জীবনলাভ করিলেন। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে পরিশ্রান্ত দেবগণের দেহ-নিঃসৃত ঘর্মে কেন্দু-অঞ্চলে অনেক নদনদীর সৃষ্টি হইয়াছে। এই গ্রন্থে দেবতা রমাদির কথাও বলা হইয়াছে; তিনি ব্রাহ্ম কদালির পিতা ছিলেন। এতদ্ব্যতীত লেখক গ্রন্থে এক লক্ষ একটি বিদ্যাধরীর কথা বলিয়াছেন; ইহাদের মধ্যে ভটারী রতিহ্ ছিলেন অন্যতমা। সঙ্ হ্যঙ্ গুরু ভটারী উমাকে বিবাহ করিলেন।

এই সমস্ত কার্য সমাপনান্তে দেবতা এবং বিদ্যাধরীগণ তেত কমণ্ডলু (=তীর্থ কমণ্ডলু) হইতে পান করিতে লাগিলেন। ইহা রেম্বু চুলুঙ্গ দেখিতে পাইলেন। তন্তু পঙ্গেলরনে রাত্মজ এবং রাত্মজী যে কার্য করিয়াছিলেন এস্থলে সেই কার্যটি করিলেন রেম্বু চুলুঙ্গ। চন্দ্র তখন বিষ্ণুর দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিলেন; বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ একটি শর নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষস রেম্বু কিছু গলাধঃকরণ করিবার পূর্বেই বিষ্ণুর তীর তাঁহার কণ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভোজনপথে বিঘ্নের সৃষ্টি করিল; সুতরাং কোন কিছুই তাঁহার উদরে প্রবেশ করিতে পারিল না। এই অবস্থায় রাক্ষসের মস্তকটি মৃত্যুঞ্জয়ী হইল এবং ইহা চন্দ্র এবং সূর্যের ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইল। ইহার পর সঙ্ হ্যঙ্ কাল সম্বন্ধে একটি বিবরণ পরিবেশন করা হইয়াছে। সেস্থলে উক্ত হইয়াছে যে সঙ্ হ্যঙ্ কালের চক্ষু চন্দ্রসূর্যের মত ভাস্বর। অতঃপর এই আখ্যায়িকাতেই আমরা পড়িতেছি যে সঙ্ হ্যঙ্ গুরু তাঁহার পত্নীর চরণ ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিলেন, তাঁহার পত্নী তখন একটি বিকটাকার রাক্ষসীতে পরিণত হইলেন। তাঁহার নাম হইল দুর্গা। দুর্গাকে সঙ্ হ্যঙ্ কালের নিকট সমর্পন করা হইল। সঙ্ হ্যঙ্ গুরু অতঃপর ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে রেম্বু চুলুঙ্গের ৪০ জন সন্তানকে হত্যা করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। এই চল্লিশটি সন্তানের মধ্যে যে সন্তানটি কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন এবং যাঁহার অধিকারে ক্ষুধা তৃষ্ণা উপশমকারক মণি ছিল কেবলমাত্র তিনিই রক্ষা পাইলেন। সঙ্ হ্যঙ্ গুরু ঐ মনিটি সঙ্ হ্যঙ্ কনকপুত্রের নিকট হইতে চাহিলেন, কিন্তু হস্তান্তর হইতে হইতে উহা অবশেষে সর্পরাজ অন্তবোগের (অনন্তভোগ) নিকট গিয়া পৌঁছিল; অন্তবোগ উহা ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন[১৪]। কনকপুত্র ইহার সন্ধানে বহির্গত হইয়া উহা খুঁজিয়া লইয়া সঙ্ হ্যঙ্ গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ঐ মণিটি যে বাক্সে রক্ষিত ছিল তাহা কেহই খুলিতে পারিলেন না। সঙ্ হ্যঙ্ গুরু উহা ভূতলে নিক্ষেপ করিলে উহা শতখণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল এবং উহা হইতে অপূর্ব এক সুন্দরী কন্যা বাহির হইয়া আসিলেন। সঙ্ হ্যঙ্ গুরু তাহাকে বিবাহ করিতে উদ্‌গ্রীব হইলে কন্যা কতকগুলি সর্তে সম্মত হইলেন। সর্তগুলি হইল এই যে সঙ্ হ্যঙ্ গুরু কন্যাকে তিনটি জিনিষ দিবেন, যথা (১) জমকালো পরিচ্ছদ, যাহা কখনো বিবর্ণ হয় না; (২) ক্ষুধা-তৃষ্ণাপহারী খাদ্য এবং (৩) মধুরতম বাদ্যযন্ত্র।

সঙ্ হ্যঙ্ গুরু এই সমস্ত জিনিষ সংগ্রহ করিবার জন্য সর্বত্র দূত প্রেরণ করিলেন ; ইহাদের মধ্যে কাল গমারঙ্ নামক একজন দূত স্নানরতা শ্রীর উলঙ্গ সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিয়া[১৫] তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। শ্রী ছিলেন বিষ্ণুর পত্নী। ঐ লোকটির চেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার জন্য বিষ্ণু এবং শ্রী উভয়েই দের্ম নস্তিতি এবং তাঁহার স্ত্রীর দেহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারাই যবদ্বীপের প্রথম রাজা এবং রাণী। শ্রীর অভিশম্পাতে কাল গমারঙ্ একটি শূকরে পরিণত হইলেন এবং উহা একটি কাল কুকুর ও সাদা বিড়ালের আক্রমনে নিহত হইল। এই শূকরটির আত্মীয়স্বজন প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য আগমন করিলে তাহারা রাজদেহে বিষ্ণুর আবির্ভাব দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা অতঃপর রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মুক্তিলাভ করিল। গল্পের শেষাংশে বর্ণিত হইয়াছে যে রাজা একদা ধান্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়া যাইবার সময় একজন সুন্দরী কুমারী-কন্যাকে দেখিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে সমুৎসুক হইলেন। কন্যাটির নাম ছিল লুয়ে এন্দহ্। কন্যা এই সর্তে সম্মত হইল যে রাজা প্রতিদিন প্রত্যুষে এবং সায়াহ্নে মাঠে আসিবেন। এই কথা বলিয়াই কন্যা অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা কন্যার অন্তর্ধানে খুব মর্মাহত হইলেন, কিন্তু দেশ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

এই প্রসঙ্গে আমরা ডঃ গণ্ডার মন্তব্য স্মরণ করিতেছি[১৬]। তিনি বলিয়াছেন যে পরবর্তী যুগের যবদ্বীপীয় এবং সুন্দনীজ রূপকথা এবং সাহিত্যে ধান্য চাষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন দেবি শ্রি (দেবী শ্রী)। তিনি নারীদিগের কলা-বিদ্যারও অধিষ্ঠাত্রী দেবী, উপরন্তু তিনি বিষ্ণুর সহধর্মিনী। তাঁহার বৃত্তান্ত আমরা পূর্বেই মন্ত্রসাহিত্যের আলোচনার সময় পরিবেশন করিয়াছি।

তন্তু পঙ্গেলরনের মত মানিকমায়ারও উৎস-স্থান আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য। এই গ্রন্থটি ভারতীয় পৌরাণিক কোন কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। বস্তুতঃ সঙ্ হ্যঙ্ গুরুর সন্তান সন্ততির মধ্যে কেহ কেহ ভারতীয় সাহিত্যে একই ব্যক্তি ; অনেক নূতন উপাদানও মানিকমায়ার অঙ্গসজ্জা বা কাহিনী বিন্যাসে পরিবেশিত হইয়াছে। কোন কোন নাম যবদ্বীপীয়। কাল গমারঙ্, রেম্বু চুলুঙ্গ প্রভৃতির নাম দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থও তন্তু পঙ্গেলরনের মতই বিভিন্ন ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী ও যবদ্বীপীয় কিম্বদন্তী এবং অন্যান্য গাথার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া এই অপূর্ব আকার ধারণ করিয়াছে। তবুও মানিক-মায়ার প্রারম্ভে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের কিঞ্চিৎ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, কারণ ঐ স্থলে পৃথিবী গোলক বা অণ্ড হইতে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শিব কিরূপে নীলকণ্ঠ হইলেন তাহা সংস্কৃত এবং প্রাচীন যবদ্বীপীয় আদিপর্বে সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য পৌরাণিক গ্রন্থেও এই কাহিনী বিদ্যমান। মহামেরুর ভারতবর্ষ হইতে যবদ্বীপে স্থানান্তরিত করার কাহিনী তন্তু পঙ্গেলরনে আছে ; মানিকমায়া সম্ভবতঃ এই কাহিনীটি তন্তু হইতে লইয়াছেন, কারণ তন্তু অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর গ্রন্থ। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, আদিপর্ব, তন্তু পঙ্গেলরন এবং অন্যান্য দেশী-বিদেশী (অর্থাৎ ভারতীয়) গ্রন্থ, আখ্যায়িকা এবং কিম্বদন্তীর সদ্ব্যবহার করিয়া যবদ্বীপীয় গ্রন্থকার এই রচনাটি আমাদের উপহার দিয়াছেন।

গ্রন্থের আখ্যায়িকা ভাগটিও সুসংবদ্ধ নহে। বাক্সে যে বালিকাটি বন্দিনী ছিলেন এবং

যিনি সঙ্‌্ হ্যঙ্‌্ গুরুর চিত্ত জয় করিয়াছিলেন তাহার পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের মনে কৌতুহল থাকিয়া যায়। মানিকমায়ার লেখক কোন উদ্দেশ্যে গ্রন্থের শেষে আর একটি তরুণীকে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা পরিষ্কাররূপে বোঝা যায় না। তিনি কি কালিদাসের বিক্রমোর্বশীর উর্বশী-স্বরূপা, যিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং দৃশ্যে রূপান্তরিত ও অবসিত হইলেন? আরো একটি জিনিষ যাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইল গ্রন্থের নৈতিক শিথিলতার পরিমণ্ডল। এই দিক দিয়া ইহা ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলির সমপর্যায়ভুক্ত বা নিম্নতর স্তরের।

ক্ষীর-সমুদ্র মন্থন কাহিনীর যে অংশটুকু তন্তু পঙ্গেলরন এবং মানিকমায়া মহাভারতের আদিপর্ব হইতে আহরণ করিয়াছে তাহার তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতে পারে। ডঃ যুইনবল এই প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া বহুদিন পুর্বে বলিয়াছিলেন[১৭] যে সংস্কৃত আদিপর্ব অনুযায়ী মন্দর পর্বতের (মহামেরুর শৃঙ্গ) উচ্চতা হইল ১১০০০ যোজন, তন্তু অনুযায়ী উহা একলক্ষ যোজন। এতদ্ব্যতীত আদিপর্বে বিষ্ণু কূর্মরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং বাসুকী হইয়াছিলেন রজ্জু; তন্তু পঙ্গলরনে কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণুর স্থান (অর্থাৎ কূর্মরূপে) অধিকার করিয়াছেন এবং বিষ্ণু আবার আদিপর্বের বাসুকীর স্থান (রজ্জুরূপে) অধিকার করিয়াছেন। মানিকমায়াতে এই কার্যগুলি তিনজন দেবতা নিষ্পন্ন করিয়াছেন; তাঁহারা হইলেন ব্রহ্মা, বায়ু এবং ইন্দ্র। ইহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে এই কাহিনীটি খ্মের শিল্পীগণ কাম্বোডিয়ার আঙ্কোরভাটে মৃত্যুঞ্জয়ীরূপ প্রদান করিয়াছেন; সেই স্থলে এই কাহিনীটি ৫০ গজ স্থান ব্যাপিয়া রূপায়িত হইয়াছে। এইস্থলে মন্থন করিবার দণ্ডটি হইল মন্দরপর্বত; তাহাকে বেষ্টন করিয়া অনন্তনাগ রজ্জুর কার্য সম্পাদন করিতেছে এবং বিষ্ণু কূর্মরূপে পর্বতটিকে ধারণ করিয়া আছে[১৮]। সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে খ্মের শিল্পীগণ যে উপাদান অবলম্বন করিয়া আঙ্কোরভাটের মন্দিরগাত্র সুসজ্জিত করিয়াছেন তাহা তন্তু পঙ্গেলরন এবং মানিকমায়ার কিম্বদন্তী হইতে বিভিন্ন। শিব কিরূপে নীলকণ্ঠ হইলেন তাহার পৌরাণিক বৃত্তান্ত উপরোক্ত গ্রন্থগুলির সহিত অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের কারণ সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত পরিবেশন করা হইয়াছে তাহা সংস্কৃত আদিপর্ব হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। ভারতীয় গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে চন্দ্র এবং সূর্য রাহু কর্তৃক অমৃত অপহরণের সংবাদ প্রথমে বিষ্ণুর নিকট জ্ঞাপন করেন। আঙ্কোরভাটে এই কাহিনীর বিশ্বস্ত প্রতিফলন ঘটিয়াছে। তন্তু পঙ্গেলরনে রাহুর স্থলে আমরা রাত্মজ এবং রাত্মজীকে দেখিতে পাইতেছি; ইহাদের নাম সংস্কৃত এবং প্রাচীন যবদ্বীপীয় আদিপর্বে নাই। আর কোন কোন কবি-গ্রন্থে এই কাহিনীটি বর্ণিত হইয়াছে তাহা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব। এই গল্পটি দক্ষিণপুর্ব এসিয়ায় নিঃসন্দেহে খুব জনপ্রিয় ছিল; কারণ এই কাহিনীটি যে কেবলমাত্র যবদ্বীপের গণমানসে স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছিল তাহা নহে, ইহার প্রভাবচিহ্ন আমরা ডয়ক, বটক, হালমাহারার আলফুর প্রভৃতি জাতি বা উপজাতির মধ্যেও দেখিতে পাই। ভারতীয় পুরাণের রাহু মালয়দেশে রহু হইয়া গিয়াছেন, ডয়কদের মধ্যে তিনি রহো, বটকদের মধ্যে তিনি অক্কলৌ (সংস্কৃত: কালরাহু)।

তত্ত্ব সবঙ্গ্ সুবুঙ্গ[১৯] নামক গ্রন্থখানিও সৃষ্টি তত্ত্ব বিষয়ক। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে সঙ্গ্ হ্যঙ্গ্ তয়্ যোগবলদ্বারা দুইজন দেবতা সৃষ্টি করিলেন; তাঁহাদের একজন হইলেন ব্রহ্মা এবং অপরজন বিষ্ণু। তাঁহারা যথাক্রমে তাঁহার দক্ষিণ এবং বাম নেত্র হইতে নির্গত হইলেন। যোগবল দ্বারা তিনি আরো একজন ব্যক্তিকে সৃষ্টি করিলেন; তাঁহার নাম হইল সঙ্গ্ হ্যঙ্গ্ অজি রুচি। অতঃপর সঙ্গ্ অজি ভয়ের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহার পর বায়ু, পৃথিবী এবং অগ্নির সৃষ্টিকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। অতঃপর সঙ্গ্ হ্যঙ্গ্ তয়ুর আদেশে ব্রহ্মা প্রথম মানুষ সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার নাম হইল ককি মনুহ্। নর এবং নারী সৃষ্টির পর, সূর্য এবং চন্দ্র সৃষ্টি হইল। কথিত হইয়াছে যে নিনি মনুহ্‌র পাঁচজন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহাদের নাম কলিবোন, বগে, পোন, পহি এবং মনিস[২০]।

আমরা এইবার আদিপুরাণ[২১] নামক গ্রন্থটির আলোচনা করিব। ইহা একাধারে সংহিতা, পৌরাণিক কাহিনী এবং পৌরাণিক বংশপঞ্জীর সংমিশ্রণ। ইহার প্রারম্ভেই দুইটি শ্লোকের ভগ্নাংশ আছে এবং উহাতে বেদের উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন দেবদেবীর বৃত্তান্তও এইস্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই কাহিনীর নায়ক হইলেন বিস্মনগর; তিনি ছিলেন প্রষ্টনগরের রাজা। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে তিনি অষ্টাদশধর্মে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন; এই অষ্টাদশধর্মকে তিন শ্রেণীতে বিন্যাস করা হইয়াছে, যথা কনিষ্ট(=কনিষ্ঠ), মন্থ (=মধ্য) এবং উত্তম। এই অষ্টাদশধর্মের বিভিন্ন অংশে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহা হইল: কার্য করা, ভোজন করা, বিবাহ করা। এতদ্ব্যতীত গুরুজন, বৃদ্ধ, বন্ধু-বান্ধব এবং পীড়িত ব্যক্তিগণের প্রতি কর্তব্যও ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে ক্রীড়া, ব্যবসা, ভৃত্যের প্রতি প্রভুর কর্তব্য, জীবজন্তুর প্রতি আচরণ, উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীও আলোচিত হইয়াছে। বিচার, ধর্মসংক্রান্ত কর্তব্য এবং শাসকবর্গ কিরূপে শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন তাহারও বিষদ বিবরণ পরিবেশিত হইয়াছে। এই কাহিনীতে আরো বলা হইয়াছে যে বিস্মনগর জীবনের নশ্বরত্ব উপলব্ধি করিয়া ভটার পরমেশ্বরের উপদেশানুযায়ী স্বীয় জন্মরহস্য জানিবার জন্য মহিষী গিরিমূর্তির সহিত পণ্ডিত বেকস্ ইঙ্গ তুঙ্গল রিঙ্গ জগতে চলিয়া গেলেন। সেস্থলের পুরোহিত তাঁহার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিলেন না। সেই সময় তিনি একটি দৈববাণী শুনিতে পাইলেন এবং সেই অনুযায়ী তিনি তাঁহার মহিষী সমভিব্যাহারে একটি নৌকায় চড়িলেন। নৌকাটি গবঙ্গন অভিমুখে একা একাই ভাসিয়া চলিল। গবঙ্গনে বিখ্যাত মুনি মুখিতসন বাস করিতেন; তিনি রাজা ও রাণীর নিকট সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে সঙ্গ্ হ্যঙ্গ্ অবরুন্তিঙ্গের দেহের বিভিন্নস্থলে অনেকগুলি চক্ষু ছিল[২২]; এই চক্ষুসমূহ হইতে ময়নিস্পৃহ, পৃথিবী, বায়ুমণ্ডল, আকাশ, ভরুণ (বরুণ?), দেবগণ এবং আরো অনেকে সৃষ্ট হইলেন। ত্রিভুবনন্দ (ত্রিভুবনাণ্ড?) তাঁহার ওষ্ঠ হইতে সৃষ্টি হইল এবং ভটার বিশেষ তাঁহার নাভি হইতে উদ্ভূত হইলেন। অবরুন্তিঙ্গ তাঁহার চক্ষু হারাইলে ভগবান সদ্রড়কে সৃষ্টি করিলেন এবং সদ্রড় বিন্দুপুঅনকে সৃষ্টি করিলেন। বিন্দু-পুঅনের হস্তে কলিমহোসদ্-নামক পুস্তক থাকায় তিনি পৃথিবীতে শৃঙ্খলার বিধান করিয়া অনেক

দেবতা, elements বা ভূত এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিলেন। গ্রন্থকার অতঃপর চতুর্বর্ণের সৃষ্টি কাহিনী বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন যে ভগবান সুক্ষ্মসদক ব্রাহ্মণগণের স্রষ্টা, ত্রিপুর্বন বেশ্যগণকে (=বৈশ্য) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ভগবান রূপতুরঙ্গা শুদ্রগণকে (শূদ্র) সৃষ্টি করিয়াছেন। ভগবান তুর্যন্তপদ ক্ষত্রিয়গণের সৃষ্টিকর্তা। ইহার পর তুর্যন্তপদের বংশপঞ্জী, জীবজন্তু এবং অন্যান্য লোকের বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহার পর কতকগুলি আদিরসাশ্রিত বিবরণী দেওয়া হইয়াছে, যাহা কালিদাস রচিত কুমারসম্ভব[২৩], ভট্টিকাব্য[২৪] ও যবদ্বীপীয় রামায়ণের অংশবিশেষের[২৫] কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহার পর গ্রন্থকার দুর্মিখের কঠোর তপস্যার কথা বিবৃত করিয়াছেন ; এই দুর্মিখের ঔরসে ভূতগণ, ত্রিপুরুষ এবং মানবপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের মাতা তাহাদিগকে শ্বেত কিদঙ্গ, করচরণ এবং একপ্রকার অদ্ভুত প্রস্তর আনিতে প্রেরণ করিলেন। ইহাদের অভিযান কাহিনীর অনেক বিবরণ পরিবেশন করা হইয়াছে। অবশেষে দুর্মিখ স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

বিস্মনগর অতঃপর মূর্খিতসনের নিকট তুর্যন্তসুক্ষ্মের পৌত্রদের বংশাবলীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যথোচিত উত্তরলাভ করিলেন। গ্রন্থকার আরো বলিয়াছেন যে মহামুনি ভগবান সুক্ষ্মসদক সঙ্গকস্তুরি নামক পর্বতে কঠোর তপস্যায় নিরত থাকার সময় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ লাভ করিয়াছিলেন। মুনি এইস্থলে বলিয়াছেন যে শূদ্র এবং চণ্ডালগণ রূপতুরঙ্গা হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন ; তাঁহার শিষ্য প্রষ্টনগরের রাজা মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে এই সমস্ত লোক একই পুর্বপুরুষ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। রাজা বিস্মনগর অতঃপর অমৃত সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে উহা পাতাল হইতে আনীত হইয়া কিরূপে সমুদ্রগর্ভের শ্বেতকমণ্ডলুতে স্থান পাইল মুনি তাহার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে নারায়ণ এই অমৃত লাভ করিয়া উহা দেবগণকে পান করিতে দিলেন, কিন্তু সুরদানবগণ এবং হেন্দ্রাররবু সিঙ্গিকাও এই অমৃত পান করিতে সমুৎসুক হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের দাবী অগ্রাহ্য করা হইল। এই অমৃত সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা হইলেও সিঙ্গিকা ইহা অপহরণ করিতে সমর্থ হইল। সুর্য এই সংবাদ বিষ্ণুকে জানাইলে বিষ্ণু সিঙ্গিকার কণ্ঠে অস্ত্রনিক্ষেপ করিলেন এবং সিঙ্গিকার মস্তক দেহচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করায় সিঙ্গিকার মস্তক অমর হইয়া গেল এবং উহা চন্দ্র ও সূর্যকে ভক্ষন করিতে লাগিল। ইহা লক্ষ্যণীয় যে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের এই কাহিনীটি যদিও তন্তু পঙ্গেলরন, মানিকমায়া, সংস্কৃত ও প্রাচীন যবদ্বীপীয় আদিপর্বের বিবরণের সহিত অনেকটা সামঞ্জস্যপুর্ণ তবুও খুঁটিনাটি ব্যাপারে উহাদের মধ্যে বৈশাদৃশ্যও বিদ্যমান। যে যাহাই হউক দানবগণকে তাহাদের অসদাচরণের জন্য অভিশম্পাত প্রদান করিয়া সঙ্‌ হ্যঙ্‌ বেনঙ্গ দেবগণকে অমৃতরক্ষায় অমনোযোগিতা প্রদর্শনের হেতু তিরস্কার করিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ঈশ্বর এবং অন্যান্য দেবগণ কিরূপে পৃথিবী রক্ষাকল্পে বিভিন্ন রাজারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, তাহাই মুর্খিতসন বর্ণনা করিলেন। ইহা অনেকের নিকট আশ্চর্য বলিয়া মনে হইবে যে পঞ্চমহাভূত এবং তন্মত্র (=তন্মাত্র) দেহধারীজীবরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। নন্দীশ্বর এবং মহাকালকে পৃথিবীর দ্বার রক্ষা করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইল। গ্রন্থকার অতঃপর দৈত্যকুল, যক্ষ, ভটার,

নিরন্তর, বিন্দুপুঅন এবং অন্যান্য রাজার সুদীর্ঘ বংশলতা উপস্থাপিত করিয়াছেন। অবশেষে বিস্মনগর মহামুনির নিকট মুক্তির উপায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। মুখিতসন বলিলেন যে তিনি রাজ্য এবং রাজকীয় মহিমা পরিত্যাগ করিলে জীবনের অমৃত লাভ করিতে পারেন। অনেক অসমসাহসিকতাপুর্ণ কার্যের পর রাজা এবং রাণী অমৃতলাভ করিলেন এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মোক্ষলাভ হইল।

গ্রন্থখানির সর্বাঙ্গে পৌরাণিক সাহিত্যের গন্ধ বিজড়িত। গুরুশিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে দার্শনিক বা ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা পৌরাণিক গ্রন্থগুলির অন্যতম বিশেষত্ব; বর্তমান গ্রন্থেও তাহার সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়া গিয়াছে। গ্রন্থের অনেকগুলি নামের উৎসভূমি ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্য; কতকগুলি সংস্কৃত নাম যবদ্বীপীয় প্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদেয় স্বরূপ বুঝিবার উপায় নাই। ইহা অদ্ভুত মনে হইতে পারে যে কতকগুলি ভারতীয় দর্শনের শব্দকে ব্যক্তিহিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন নামধারী একই দেবতা গ্রন্থকারের লেবরেটরী হইতে বিভিন্ন সত্বারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই, কারণ ভারতের সহিত যোগসূত্র নানা কারণেই ক্ষীণ হইয়া আসার জন্য অনেক তত্ত্বকথা এবং কাহিনী বিকৃতরূপ পরিগ্রহণ করিয়াছিল। যদিও আদিপুরাণের অনেক মানুষ এবং দেবদেবীর কাহিনী আমাদিগকে ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যের পরিমণ্ডলে লইয়া যায় তবুও সমগ্র গ্রন্থটির প্লট লেখকের সৃজন প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কোন কোন কিম্বদন্তী হয়তো তৎকালীন জনসমাজে প্রচলিত কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, কোন কোন কিম্বদন্তীর উৎসভূমি হয়তো ভারতবর্ষ, কিন্তু উহা দ্বীপময় ভারতের পটভূমিকায় অনেকটা বিচিত্র এবং স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। যে ভটার গুরু দ্বীপময় ভারতের ক্লাসিকাল যুগের শেষ পর্যায়ের কোন কোন গ্রন্থেও সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তিনি স্থলে স্থলে যবদ্বীপীয় নাম পরিগ্রহণকারী দেবতার নিকট নতিস্বীকার করিয়াছেন। ডঃ পিগো[২৬] সম্ভবতঃ ঠিকই অনুমান করিয়াছেন যে এই গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ রাজা বিস্মনগরের প্রশস্তি বা মহিমাপ্রচার করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ এই গ্রন্থের অজ্ঞাত লেখক রাজা বিস্মনগরের কোন উত্তরাধিকারীর রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

এই গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। একখানি লম্বক-পুঁথির অন্তে (কলোফন) ১৭৯৯ লেখা আছে। অন্য প্রমাণ সাপেক্ষে আমরা ইহাকে ষোড়শ শতাব্দীর রচনা বলিয়া বর্তমানে গ্রহণ করিতেছি। ডঃ যুইনবল বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থের ভাষা তন্তু, কোরবাশ্রম এবং কুঞ্জরকর্ণের মত।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা সম্ভবতঃ পরিস্ফুট হইয়াছে যে আলোচিত গ্রন্থগুলিতে যে আধ্যাত্মিক জীবনের ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা ভারতবর্ষ হইতে খুব বেশী বিভিন্ন নহে। উভয় স্থলেই দেবগণ অনেকক্ষেত্রে বরাভয়বাণী লইয়া সমুপস্থিত হইয়াছেন এবং আমরা তাহাদিগকে কলা, শিল্প, উদ্ভিজ্জগৎ এবং পৃথিবীর রক্ষাকর্তারূপে দেখিতে পাইতেছি। দেবগণ

কোথাও স্বয়ম্ভু, কোথাও আবার তাঁহারা অত্যধিক ক্ষমতাশালী কোন দেবতার বিভিন্ন অঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন; কাহারো কাহারো সম্বন্ধে আবার বলা হইয়াছে যে তাঁহারা মাতৃগর্ভ সম্ভূত নহেন; কেহ কেহ আবার নিজেদের পিতামহকে সৃষ্টি করিয়াছেন[২৭]। ঐ দেশের অনেক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাও হইলেন ভারতীয় দেবগণ। গ্রন্থগুলিতে স্থান মাহাত্ম্য এবং নাম-মাহাত্ম্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের অনেক বিখ্যাত স্থানকে যবদ্বীপে সংস্থাপিত করা হইয়াছে। ত্রিভুবন এবং সপ্তপাতালের অধীশ্বর—যাহাদিগকে আমরা ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যে সর্বদা সর্বত্র বিচরণ করিতে দেখি—তাঁহারা এখানেও সমুপস্থিত। ত্রিভুবন এবং সপ্তপাতালের বিবরণ যবদ্বীপীয় গ্রন্থকারের নিকট অনেকটা সুপরিচিত। ঐ দেশের মুনিঋষিগণ অনেকসময় ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ তপস্যা করিয়াছেন, কেহ কেহ অভিশপ্ত হইয়া বিকট মূর্তি পরিগ্রহণ করিয়া মুক্তির অপেক্ষা করিতেছেন। দেবগণ অনেক সময় পৃথিবীতে নরপতিরূপেও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন[২৮]।

অগস্ত্যপর্ব নামক গ্রন্থখানিতে পৌরাণিক কাহিনী এবং ধর্মতত্ত্বের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এইবার আমরা এই গ্রন্থখানি আলোচনা করিব। এই পর্যায়ের গ্রন্থগুলির মধ্যে অগস্ত্যপর্ব প্রধান। ডঃ গণ্ডা এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন[২৯]। এই গ্রন্থের একাধিক পুঁথির অন্তিমে লেখা আছে; "ইতি পিতুরুন্ সঙ্ হঙ্ ব্রহ্মাণ্ড-মতেকাল-পুরাণ মন সঙ্গসিপ্ত নি নয়॥০॥ ইতি অগস্ত্যপর্ব সমাপ্ত॥০॥ অগস্ত্যপর্ব পড়িলে ইহার বিভিন্নস্থলের বিবরণী কখনো কখনো আমাদিগকে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু ইহার উপাদানসমূহ বিভিন্ন পুরাণের কাহিনী হইতেই সঙ্কলিত হইয়াছে: কোন একখানি পুস্তক যে ইহার আদর্শ ছিল তাহা মনে হয় না। বস্তুতঃ ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, নীতি এবং প্রাচীন ভারতের বিশ্বোৎপত্তি সম্বন্ধীয় সাহিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থখানি গদ্যে রচিত এবং মধ্যে মধ্যে শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক আকীর্ণ রহিয়াছে। এই সংস্কৃত শ্লোকগুলির আবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

গ্রন্থারম্ভে আমরা পড়িতেছি: ওম্ অবিঘ্নম্ অস্তু এবং ইহার ষষ্ঠ লাইনেই আছে:

"আসীদগস্ত্যপুত্রস্তু লোপামুদ্রাসমুদ্ভবঃ
দৃঢ়স্যুর্নাম ধর্মাত্মা সন্তানে তুরনিন্দিতঃ"

বস্তুতঃ গ্রন্থের আরম্ভটি হইয়াছে একেবারে পৌরাণিক রীতিতে। তরুণ সিদ্ধপণ্ডিত দৃঢ়স্যু ছিলেন ভগবান অগস্ত্যের পুত্র। দৃঢ়স্যু পিতার নিকট ত্রিভুবন এবং ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকাহিনী জানিতে উৎসুক হইলে ভগবান অগস্ত্য মহাপ্রলয়ের কাহিনী বিবৃত করিলেন; ঐ মহাপ্রলয়ে জগতের সমস্ত জীবজন্তু বিনষ্ট হইল। তখন ভট্টার সদাশিব পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করিলেন। ক্রমে ক্রমে চতুর্ভূত[৩০] অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, পৃথিবী এবং তেজ সৃষ্ট হইল। অতঃপর অণ্ড হইতে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর উদ্ভব হইল। প্রজাপতি, সনক, নন্দন, সনৎকুমার, ব্যাস, ব্রহ্মর্ষি, মনুগণ এবং পিতৃগণকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলেন। দৃঢ়স্যু অতঃপর দক্ষ, মরীচি, রুচি, নীললোহিত, ভৃগু, অত্রি, অঙ্গির, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ট নামক দশজন ব্রহ্মর্ষি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। এই দশজন

ব্রহ্মর্ষির তালিকা ভারতবর্ষ এবং যবদ্বীপ উভয় স্থলেই বিকৃতরূপে পরিগ্রহণ করিয়াছিল, কারণ ঋষিগণের নাম এবং পূর্বানুক্রমিক সংখ্যা সর্বত্র অভিন্ন নহে[৩১]। ব্রহ্মার চক্ষু হইতে মরীচির উদ্ভব স্বভাবতঃই মনুসংহিতার অনুরূপ বিবরণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়[৩২]। অগস্ত্য অতঃপর ব্রহ্মর্ষিগণ হইতে চতুর্দশ মনুর উদ্ভবকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন ; এই চতুর্দশ মনুর নাম হইল : স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তবস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণ, রোহিত, লোহিত, পিসঙ্গু, সমপিসঙ্গু, রৌচ্য, কোত্য। সম্ভবতঃ নকলনবীশের প্রমাদের ফলে এই নামগুলি সংস্কৃত তালিকা হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্নরূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে[৩৩]। গ্রন্থে অতঃপর উল্লিখিত হইয়াছে যে এই মনুগণ প্রত্যেকেই একাত্তর যুগ বিদ্যমান ছিলেন[৩৪]।

"চতুর্যুগাণি বর্ষাণি মনূনাম্ এক সপ্ততিঃ
মন্বন্তরম্ ইতি খ্যাতম্ হস্য (?) যেন সদাস্মৃতঃ[৩৫]"

দৃঢ়স্য অতঃপর দক্ষের বংশধরগণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে অগস্ত্য বলিলেন যে দক্ষ এবং তাঁহার স্ত্রী প্রস্তুতির একপঞ্চাশটি কন্যা হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে তেরজন প্রজাপতিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রজাপতির এই তেরজন স্ত্রীর নাম হইল : শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, মুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, সিদ্ধি এবং কীর্তি। দক্ষের অপর কন্যাগণের মধ্যে সতী নীল-লোহিতকে বিবাহ করিলেন, ভৃগু করিলেন খ্যাতিকে, অঙ্গির করিলেন স্মৃতিকে, পুলস্ত্য প্রীতিকে, পুলহ ক্ষমাকে, ক্রতু সন্নতিকে, অত্রি অনসূয়াকে, ঊর্জা বশিষ্টকে, স্বাহা অগ্নিকে এবং স্বধা পিতৃকে বিবাহ করিলেন[৩৬]।

দক্ষ অসিক্তিকিকেও বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের দশটি কন্যা হইয়াছিল। উহাদের বিবাহ হইয়াছিল ধর্মের সহিত[৩৭]। তাহাদের সন্তান হইল দশবিশ্ব এবং অষ্টবসু[৩৮]। যে সপ্তবিংশতি নক্ষত্র চন্দ্রের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহারাও দক্ষ এবং অসিক্তিকির সন্তান ছিলেন[৩৯]। দৃঢ়স্য অতঃপর অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন[৪০] :

"কেন নিরয়লোকে বা বা সঃ স্বর্লোকম্ আগতঃ
সংক্ষেপেন যথা প্রোক্তম্ তত্ত্বতঃ তত্ত্বম্ মে বচ।"

অর্থাৎ মানুষ কেন নিরয়লোকে বা স্বর্গলোকে যায় তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। অগস্ত্য বলিলেন যে ইহা উলহ্, শব্দ এবং অম্বেকের জন্য হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে উলহ্ সর্বনিম্ন এবং অম্বেক্ সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই প্রসঙ্গে আরো বলা হইয়াছে যে লোকে বিভিন্ন প্রকার পাপের জন্য বিভিন্ন অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। কথাগুলি সংস্কৃত শ্লোকে বিধৃত হইয়াছে :

"শরীরজৈঃ কর্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাম্ নরঃ
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাম্ মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্।"

অর্থাৎ শারীরিক কর্মদোষের জন্য মানুষ স্থাবর হইয়া জন্মে, বাচিক দোষের জন্য হয় পক্ষিমৃগ প্রভৃতি এবং মানসিক পাপের জন্য ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অন্ত্যজ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই শ্লোকটি সম্পূর্ণরূপে মনুসংহিতাতেও বর্তমান আছে[৪১]।

অগস্ত্য অতঃপর বলিয়াছেন যে মানুষ চক্ষুদ্বারা পাপ করিয়া এবং অসৎ কার্য হইতে

আনন্দলাভ করিয়া অন্ধদশা প্রাপ্ত হয়। অনুরূপভাবে উত্তমজিনিষ সম্বন্ধে নিন্দাবাদ করিয়া লোকে মূক হয়; কুৎসিৎ বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকে বধির হয় এবং লোকে অগম্যাগমন অর্থাৎ অপবিত্র কার্য, চৌর্য এবং মিথ্যাভাষণের জন্য ব্যাধিগ্রস্থ হয়। ইহার পর আমরা পড়িতেছি যে আত্মন্ অতিবাহিত-শরীর দ্বারা স্বর্গে বা নরকে পরিচালিত হয়। স্বর্গে গমনের পর উহা দিব্যশরীর ধারণ করে; নরকে গেলে উহা পূর্বজন্মের পাপ অনুযায়ী ধর্মকর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। সে আবার কোথায় জন্মগ্রহণ করিবে তাহাও যমরাজ স্থির করিয়া দেন। লেখক বলিয়াছেন যে তিনটি কার্য দ্বারা লোকে স্বর্গে যাইতে পারে। যথা তপ, যজ্ঞ এবং কীর্তি। ইহাকে বলা হইয়াছে প্রবৃত্তি ধর্ম এবং যোগকে বলা হইয়াছে নিবৃত্তিধর্ম। এই প্রসঙ্গে পাঁচ প্রকার যজ্ঞের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে; উহাদের নাম হইল দেব, ঋষি, পিতৃ, ভূত এবং মনুষ্যযজ্ঞ[৪২]। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে মৃত ব্যক্তির আত্মার স্বর্গবাস সমাপ্ত হইলে উহা আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। লেখক যে কর্মফল এবং আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করিতেন তাহা এই সমস্ত বিবরণী হইতে প্রতিপন্ন হয়। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে বহু তপশ্চরণে মানুষ পুনঃজন্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে এবং আরো অধিকতর কঠোর তপস্যা করিলে লোক সগর, দিলীপ, রঘু, রাম, দশরথ এবং পাণ্ডবগণের সমতুল্য হয়।

এই গ্রন্থে ধর্মার্চনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে কেহ ধূপধুনাবিহীন পূজা করিলে ক্ষণিকের জন্য সুখী হইতে পারে, কিন্তু সে তৎপরবর্তীকালে দুঃখে অতিবাহিত করিবে। অনুরূপভাবে বলা হইয়াছে যে কেহ যদি দরিদ্র এবং সহায়হীনের প্রতি বিমুখ হয় তাহা হইলে সে ধনশালী এবং জীবনে সুপ্রতিষ্ঠ হইলেও লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবে না। যদি দেবপূজা নির্ভুলভাবে পরিচালিত না হয় তাহা হইলে উপাসক বিত্তবান হইলেও পরে হীনজন্মা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। আবার যদি কেহ ধর্মের অনুশাসন নির্মলচিত্তে গ্রহণ না করে তাহা হইলে সে সুন্দর দেহধারী চণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। আবার যদি কেহ শুচিবায়ুগ্রস্থ হয় তাহা হইলে সে উচ্চবংশে কুৎসিৎ দেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিবে।

গ্রন্থকার অতঃপর আবার বিভিন্ন বংশের বিবরণ পরিবেশন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যার কশ্যপের সহিত বিবাহ হইয়াছিল; উহাদের মধ্যে অদিতি দ্বাদশ সন্তানের জননী হইলেন। অদিতি দেবগণকে কেন গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন এই কথা দৃঢ়স্যু জিজ্ঞাসা করিলে অগস্ত্য বলিলেন যে অদিতির স্বভাব ছিল কোমল এবং তিনি কোন কিছু উপেক্ষা করিতেন না। অতঃপর কশ্যপ এবং দিতির কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে; তাহাদের সন্তান হইল হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ এবং সিভিকা; সিভিকা ছিলেন রাহুজননী। হিরণ্যকশিপুর চারিসন্তান এবং তাহাদের বংশধরগণ সম্বন্ধেও কিছু বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক অতঃপর প্রহ্লাদপুত্র বৈরোচনের বংশতালিকা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন[৪৩]।

গ্রন্থকার অতঃপর বলিয়াছেন যে ইন্দ্র মরুৎ বা পবনদেবকে হত্যা করিয়া ব্রহ্মহত্যা বা ভ্রূণ-হত্যার পাপক্ষালনের জন্য স্বর্গ ত্যাগ করিলেন[৪৪]। লেখক অতঃপর ভ্রূণহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন:

"বালঃ স্ত্রী গর্ভিনী গৌশ্চ ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণোনৃপঃ
আচার্যো যজমানস্তু তদ্বধো ভ্রূণহা স্মৃতঃ।"

ইহার পর লেখক প্রহ্লাদ, হিরণ্যকশিপু, নিবাতকবচ এবং অন্যান্য দৈত্যের বংশতালিকা দিয়া রামায়ণ এবং মহাভারতের কয়েকটি আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন। মণিমান্তক, অর্জুন, নিবাতকবচ, দমলুঙ্ নামধারী বরাহে রূপান্তরিত মুকের উল্লেখ স্বভাবতঃই অর্জুনবিবাহ বা বিবাহ কবির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাটক (তাড়কা) রাক্ষসী, মারীচি, কিদঙ্গ কনক (স্বর্ণ মৃগ), ভট্টারী সীতা, পঞ্চবদি (= পঞ্চবটী) ইত্যাদির উল্লেখে রামায়ণের প্রভাব দেখিতে পাই। এমন কি রামসীতা যখন পঞ্চবটী বনে ছিলেন সেই সময়কার জয়ন্ত কাকের কাহিনীও রামায়ণ হইতে এই স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে :

"সঙ্ জয়ন্ত ঙ্গরন্ ইর কাকাবতার, ইকঙ্
মতেমহন গগক, সেড়েঙ্গ শ্রী রামভদ্র মস্নুস্নুপন
মুয়ঙ্গ্ জনকপুত্রী ইরিকঙ্ পতপন পঞ্চবদি।"

মহাভারতের যযাতি-দেবযানী-শর্মিষ্ঠার কাহিনী, সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী, এমন কি দেবর্ষিগণ কর্তৃক পরিবাহিত এবং অগস্ত্য কর্তৃক অভিশপ্ত নহুষের কাহিনীও এখানে উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থে দানবগণকে কশ্যপ এবং দনুর সন্তানরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। মন্দোদরীর পিতা এবং রাবণের শ্বশুর যম ইহাদের একজন ছিলেন। গ্রন্থকার অতঃপর বলিয়াছেন যে কৃষ্ণ এবং বলদেব মধুরা (মথুরা) নামক স্থানে কেশী দৈত্যকে নিহত করিয়াছিলেন[৪৫]। যুদ্ধের আরো বিবরণ পরিবেশিত হইয়াছে। হয়গ্রীব এবং কৃষ্ণের সংগ্রাম[৪৬] কাহিনীও এখানে বর্ণিত হইয়াছে। দৃঢ়স্যু অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন যে কশ্যপের স্ত্রী প্রভা কেন গন্ধর্ব-সন্তান লাভ করিয়াছিলেন ; তখন অগস্ত্য বলিলেন যে উহা তাঁহার বুদ্ধিসামর্থ্য এবং কলাবিলাসী মনের জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে। কশ্যপবণিতা কদ্রুও তাঁহার স্বভাবের বিশেষত্বের জন্যই আবার একসহস্র নাগসন্তানের জননী হইয়াছিলেন। কদ্রু-বিনতা-নাগসন্তান এবং গরুড়ের উল্লেখ স্বভাবতঃই আমাদিগকে মহাভারতের আদিপর্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। গ্রন্থকার অতঃপর বলি, সুমালি, মালি এবং রাবণাদি রাক্ষসগণের বংশাবলী বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন কিরূপে মধু নামক রাক্ষস ভট্টার বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইয়াছিল এবং বিষ্ণু মধুসূদন নামে পরিচিত হইয়াছিলেন[৪৭]। গ্রন্থকার সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যে মধুরা-রাজ লবণাসুর কিরূপে শত্রুঘ্ন কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন তাহা রামায়ণ-চরিত হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহা সংস্কৃত রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে[৪৮]। ইহার পর দেবদানবগণ কর্তৃক মন্দরপর্বত দ্বারা ক্ষীরসাগর মন্থনের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার অতঃপর পরমার্থিক আলোচনার সূত্রপাত করিয়া বলিয়াছেন যে যিনি ষড়বর্গ দমন করিতে পারেন না তাঁহাকে ত্রিকায়পরমার্থ অর্থাৎ কায়িক, বাচিক এবং মানসিক পবিত্রতা অবলম্বন করিতে হইবে। মন্ত্রোচ্চারণ এবং বাক্যে ও চিন্তায় পবিত্রতা রক্ষা দ্বারা ইহার পথ সুগম হইবে। অগস্ত্য অতঃপর ইরাবতী, পুলহ, "মৈথিলীহরণ-দশগ্রীবরোধনকার" জটায়ু, পঞ্চবটীবনে "জনকরাজপুত্রী" ইত্যাদির কথা উল্লেখ

করিয়াই আবার গভীর দার্শনিকতত্ত্বে সমাহিত হইয়াছেন। মানুষ কিরূপে সংসার এবং মহারৌরব নরক হইতে মুক্তি পাইতে পারে এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়াই তিনি আবার বিভিন্ন মুনিঋষির বংশপরিচয় ও লতাগুল্মবৃক্ষের সৃষ্টিকাহিনী প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার পর পরশুরামের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দৃঢ়স্যু জিজ্ঞাসা করিলে অগস্ত্য বলিলেন যে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ত্রিপুরুষের মত একত্ব অর্জন করা :

"এয়াণাম্ দেবতানাম্ হি একত্বম্ গন্তুম্ ইচ্ছতি।"

ইহাকেই মুক্তপদ এবং ষোড়শতত্ত্বের শ্রেষ্ঠফল বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমরা যে সমস্ত নাম পড়িতেছি তাহার মধ্যে কৌতূহলোদ্দীপক হইতেছে : "অনন্তপরমানন্দ ঙ্গরণ্য রি সঙ্গ ভৈরবমার্গ", "যোগাদিপরমগুহ্য ঙ্গরণ্য রি সঙ্গ সিদ্ধান্ত শৈব পাশুপত" "নিস্ফলপরমশূন্য ঙ্গরণ্য রি বৈষ্ণবপক্ষ"। ইহার নামগুলি তান্ত্রিকগন্ধবাহী। অগস্ত্য আরো বলিয়াছেন যে কেহ যদি মনকে শরীর হইতে পৃথক করিতে না পারে এবং সে যদি উপরন্তু ষড়বর্গের দাস হয় তাহা হইলে সে কখনও কমোক্ষণ অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিতে পারিবে না। গ্রন্থকার এইরূপে আত্মিক ও কায়িক জগতের মধ্যে একটি সীমারেখা টানিয়া দিয়াছেন। অগস্ত্য আরো বলিয়াছেন যে কেহ যদি তিনটি ব্রত অর্থাৎ অক্রোধ, অলোভ এবং শোকবর্জিত হওয়ার ব্রত গ্রহণ করেন তাহা হইলে তিনি উহা হইতে দেবত্বলাভ করিতে পারেন :

"কিম্ চিদ্ ব্রতম্ তৃতীয়ম্ তু অক্রোধম্ শোকবর্জিতম্
অলোভম্ কারয়েদ্ যস্ত তস্মাদ্ দেবত্বম্ আপ্নুয়াৎ ॥"

এইপ্রকার সংযম মানুষের পক্ষে সম্ভবপর না হওয়ায় অগস্ত্য বলিলেন যে পণ্ডিতগণকে সেস্ব বা প্রণাম করিতে হইবে এবং যোগ্য গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। গুরু তাহাকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া ভগবদতত্ত্বে পারদর্শী করিবেন এবং এইরূপে মুক্তিলাভ হইবে। তবে অগস্ত্য বলিয়াছেন যে দীক্ষারপুর্বে শিক্ষাদান করা গুরুর পক্ষে ব্রহ্মহত্যাতুল্য।

অতঃপর অগস্ত্য পুনরায় বংশতালিকায় মনঃসংযোগ করিয়াছেন। গ্রন্থে আমরা পড়িতেছি অঙ্গির, বালি-সুগ্রীব, হনুমান, কৃপ, দ্রোণ, কুন্তী, পুলস্ত্য, কণ্ব, শকুন্তলা, মহারাজ দুষ্মন্ত প্রভৃতির কথা। ইহার প্রায় প্রত্যেকটি নামের পশ্চাতে একাধিক কাহিনী বিদ্যমান; সুতরাং মনে হয় যে গ্রন্থলেখক এই সমস্ত কাহিনীর সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। লেখক ভগবান ব্যাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "সির ত মগবে ইকিঙ্গ অষ্টাদশপর্ব, কচরিতন সঙ্গ পাণ্ডব" অর্থাৎ তিনি এই অষ্টাদশপর্ব রচনা করিয়াছিলেন ; উহা হইল পাণ্ডবগণের কাহিনী। কথিত হইয়াছে যে তিনি "ইতিপুরাণ" "ধর্মশাস্ত্র" প্রভৃতিও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যাস নামের ব্যাখ্যা স্বরূপে বলা হইয়াছে—

"ব্যাস্যতি বেদান্ ইতি ব্যাস :"

গ্রন্থকার অতঃপর আদিত্যের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। আদিত্য সজ্ঞাকে সুমেরুর উত্তর পার্শ্বস্থ উত্তর কুরু প্রদেশ পর্যন্ত অশ্বের ছদ্মবেশে অনুসরণ করিলেন। সংস্কৃতপুরাণে কথিত হইয়াছে যে সজ্ঞা সূর্যের ঔজ্জ্বল্য সহ্য করিতে না পারিয়া ছায়া নামধারিণী নকল-সজ্ঞাকে স্বামার

নিকট প্রেরণ করিয়া স্বয়ং তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন[৪৯]। গ্রন্থের শেষাংশে চতুর্বর্ণ এবং তাহাদের স্বধর্ম পালন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিয়া অগস্ত্য বলিয়াছেন

"স্বধর্মসাধনাৎ কুর্বাৎ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ঃ পুনঃ
বৈশ্যঃ শূদ্রো যথাকার্যম্ স্থিতম্ এতজ্জগত্ত্রয়ম্ ॥"

গ্রন্থকার চণ্ডাল এবং ডোম্বদিগকে শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন যে ম্লেচ্ছগণ চতুর্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত নহে। গ্রন্থে বর্ণসঙ্করের কথাও বলা হইয়াছে, কিন্তু কেহই ইহাকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে গ্রহণ করিতে পারে নাই।

গ্রন্থে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীর বিভিন্ন স্রোত মিলিয়া গঙ্গোত্রী রচনা করিয়াছে। সাধারণতঃ সংস্কৃত শ্লোকগুলি ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করা হইয়াছে। এই মূলশ্লোকসম্বলিত কোন সংস্কৃতগ্রন্থ ভারতবর্ষে কিংবা যবদ্বীপে কোনদিন বিদ্যমান ছিল কিনা তাহা আজ বলিবার উপায় নাই, কিন্তু এই শ্লোকগুলির কিছু অংশ যে বিক্ষিপ্তভাবে সংস্কৃত সাহিত্যে বিদ্যমান আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কোন একখানি গ্রন্থে এই সংস্কৃতশ্লোকগুলি বিদ্যমান না থাকিলে অনুমান করিতে হয় যে যবদ্বীপের সঙ্কলয়িতা বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে এইগুলি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে তিনি ইহার মাধ্যমে একদিকে যেমন পৌরাণিক কাহিনী পরিবেশন করিবেন তেমনি আবার ধর্মতত্ত্বের কথাও শুনাইবেন। এই উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ অনেকাংশে সার্থক হইয়াছিল।

পুরাণ শ্রেণীর আর একখানি গ্রন্থ হইল ভুবনপুরাণ। ইহা প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত। এই গ্রন্থে বশিষ্ঠ এবং পরমেশ্বরের কথোপকথন বিবৃত হইয়াছে। পরমেশ্বর অর্থাৎ শিব কৈলাসে আসীন ছিলেন। বশিষ্ঠ তাঁহাকে চতুরাশ্রম এবং বর্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। গ্রন্থে ম্লেচ্ছ এবং ওয়েয়াঙ্ নটদের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে[৫০]। গ্রন্থখানি অদ্যাপি সম্পাদিত হয় নাই।

পা দ টী কা

(ক)

১. যথা : ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, বায়ু, ভাগবত, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড় এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

২. For reference to old literature, vide Gonda, *Het Oud-Jav. Brahmāṇḍapurāṇa* (text) p. 1 ff.

৩. Vide Gonda, *Sanskrit in Indonesia*, p. 119.

৪. The same author, *Het Oud-Jav. Brahmāṇḍapurāṇa* (text) p. 23.

৪. (ক) Gonda, *Sanskrit in Indonesia*, p. 119.

৫. Gonda, *Het Oud-Jav. Brahmāṇḍapurāṇa* (text) p. 4.

৬. *Ibid* pp. 16-17.

৭. যবদ্বীপীয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের সহিত কলিকাতা সংস্করণের সাধারণভাবে তুলনা করিতে গিয়া দেখিয়াছি যে যবদ্বীপীয় গ্রন্থকার কলিকাতা সংস্করণ অনুযায়ী বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত করিতে করিতে অনেকদূর অগ্রসর হওয়ার পর আবার বহু পশ্চাৎ হইতে বিক্ষিপ্তভাবে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং কলিকাতা-সংস্করণ যবদ্বীপীয় ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের আদর্শ ছিল বলিয়া আমার মনে হয় না।

৮. Vide Gonda, *Sanskrit in Indonesia*, p. 113.

৯. *Ibid*, p. 118.

১০. *Ibid*, p. 113. Cf. *Oud-Jav. Brahmāṇḍapurāna*, (text) pp. 20-21.

১১. *Het Oudjavaansche Brahmāṇḍapurāna*, Bandoeng, 1932; Dutch translation, Bandoeng, 1933.

১২. পূর্বোল্লিখিত সংস্কৃত শ্লোকে তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছে অসীমকৃষ্ণ।

১৩. সংস্কৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও এই ব্যাখ্যাটি আছে (১।১৪)।

১৪. সংস্কৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের এই স্থলে আছে: "অগ্রে সসর্জ বৈ ব্রহ্মা মানসানাত্মনঃ সমান্ (৯।৬৭)।" এই শ্লোকাংশটি আবার সংস্কৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ৬।৬৭-তেও আছে।

১৫. সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার নাম একস্থলে দেওয়া হইয়াছে সনাতন।

১৬. তুলনীয় সংস্কৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৬।৭৪। উপরে যে সংস্কৃত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছি সেই অংশ হইতে এই অংশ পর্যন্ত বিষয়বস্তু সংস্কৃত গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের অনুরূপ।

১৭. দ্রষ্টব্য: সংস্কৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ১০।৮-১২। এই অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে শতরূপাকেই রতি বলা হইয়াছে: "তয়া স রমতে সার্দ্ধং তস্মাৎ সা রতিরুচ্যতে।" এই গ্রন্থেরই অন্যত্র আবার রতিকে কামদেবের স্ত্রীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (১০।৩৭)।

১৮. সং: ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ২৮।৪-১৬।

১৯. ভারতীয় সংস্করণেও তিনি পূর্ণমাসের স্ত্রী। দ্রষ্টব্য: ২৯।১০-১১; প্রাচীন যবদ্বীপীয় বৃত্তসঞ্চয়ে তিনি ব্রহ্মার স্ত্রী।

২০. সং: ব্রহ্মাণ্ড ২৯।১৭

২১. ঐ, ২৯।৩২।

২২. ঐ, ৩১।৪০ হইতে।

২৩. ভারতীয় সংস্করণে ইহার নাম অগ্নীধ্র।

২৪. সং: ব্রহ্মাণ্ড: ৩৪।১১ শ্লোকে তাঁহাকে প্লক্ষদ্বীপের রাজা বলা হইয়াছে।

২৫. ঐ ৩৪।১২ শ্লোকে তাঁহাকে কুশদ্বীপের রাজা বলা হইয়াছে।

২৬. ঐ ৩৪।১৩ হব্যকে শাকদ্বীপের রাজা বলা হইয়াছে। ইহার পর ৫৩।৫-৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে প্লক্ষদ্বীপে গোমেদক নামক এক পর্বত আছে; ঐ নাম হইতেই এই অঞ্চলের নাম গোমেদকবর্ষ হইয়াছে।

২৭. সং: ব্রহ্মাণ্ড: তালিকায় ইহার নাম নাই, তবে কুশদ্বীপের রাজা হিসাবে জ্যোতিষ্মানকে পাইতেছি।

২৮. সং: ব্রহ্মাণ্ড: ৩৪।১৪-৩৫।

২৯. Goris, *Theologie*, p. 109 ff.

৩০. সং: ব্রহ্মাণ্ড: ৩৪ অধ্যায়ে এই সমস্ত অঞ্চলের বিস্তৃত বিবরণ পরিবেশিত হইয়াছে।

৩১. ভারতীয় সংস্করণে বিভিন্ন বর্ষগুলির নাম হইল: হিমাহ্বর্ষ, হেমকূটবর্ষ, নিষাদবর্ষ, শ্বেতবর্ষ, কুরুবর্ষ, মাল্যবানবর্ষ, গন্ধমাদনবর্ষ।

৩২. ভারতীয় সংস্করণে (৩৪।৫৩) ইঁহার নাম মরুদেবী এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র ঋষভ হইলেন ক্ষত্রিয়কুলের জনয়িতা।

৩৩. সং : ব্রহ্মাণ্ড : ৩৪।৫৪-৬৮।

৩৪. ঐ, ৬৫।১-১৩।

৩৫. এই তথ্যগুলি সং ব্রহ্মাণ্ড : ৬৬ অধ্যায়ের ১ হইতে ৩২ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

৩৬. এই তথ্যগুলি সং : ব্রহ্মাণ্ড : ৬৭ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোক হইতে চতুর্বিংশ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

৩৭. সং : ব্রহ্মাণ্ড : ৬৭।৮৩-৯৬।

৩৮. দ্রষ্টব্য সং : ব্রহ্মাণ্ড : ৬৮ অধ্যায়।

৩৯. বেণ এবং পৃথুর কাহিনীর জন্য দ্রষ্টব্য সং : ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৬৮।১০৮ শ্লোক হইতে।

৪০. ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ কাকাবিনে ইহাকে প্রেতযজ্ঞ বলা হইয়াছে :

"মঙ্কে শ্রীনরনাথ যজ্ঞ দিনমেল্ নির
অতিশয় দিব্য তন্ সিপি।
প্রেতযজ্ঞ ঙরণ্য যজ্ঞ নির সঙ্ প্রভু গিনেলর্
ইর যথাক্রমঃ।"

৪১. এই বৃত্তান্তটির জন্য দ্রষ্টব্য সং : ব্রহ্মাণ্ড : ৬৮।১৩৭-১৪৮।

৪২. দ্রষ্টব্য ঐ।

৪৩. দ্রষ্টব্য সং : ব্রহ্মাণ্ড ৬৮।১৫০-১৯৩।

৪৪. ঐ, ৪৯ অধ্যায়।

৪৫. ঐ, ৪৯।১২ হইতে।

৪৬. ঐ, ৪৯।২২-২৩।

৪৭. সংস্কৃত সংস্করণের অতিরিক্ত নাম হইল : গঙ্গা, যমুনা। অন্যান্য নামগুলিও কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে, যথা : ধুতসর্প = ধুতপাপা, বহুদা = বাহুদা, কৃতিয় = তৃতীয়া, নিশ্চর = নিশ্চীরা, চক্ষু = ইক্ষু, লোহিত্যা = লোহিত।

৪৮. তুলনীয় ঐ ৪৯।৩১ হইতে।

৪৯. নামগুলির তালিকা এবং উহার বিন্যাসে সংস্কৃত সংস্করণের সহিত সামঞ্জস্য নাই।

৫০. সং : ব্রহ্মাণ্ড ৫০।১-২০।

৫১. ঐ, ৫১।৩০-৬১।

৫২. ঐ, ৫৩।৭৬-১১২।

৫৩. ঐ, ৫৩।৪৯-৬০।

৫৪. ঐ, ৫৩।৬১-৭৫।

৫৫. ঐ, ৫৩।৩১-৪৮।

৫৬. ঐ, ৫৩।১১১-১২৯। সংস্কৃত সংস্করণে গোমেদদ্বীপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্লক্ষদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

৫৭. ঐ, ৫৩।১৪২-১৪৪ ; "ন্যগ্রোধঃ পুষ্করদ্বীপে তত্রত্যৈঃ স নমস্কৃতঃ।"

৫৮. ঐ, ৫৩।১৪৫ হইতে।

৫৯. ঐ, ৫৫।৪০-৪৭।

৬০. উপরোক্ত জ্যোতিষ সংক্রান্ত তথ্যগুলি সংস্কৃত সংস্করণের ৫৫-৫৮ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

৬১. *Het Oudjavaansche Brahmāṇḍapurāṇa* (text) p. 24.

৬২. দৃষ্টান্তস্বরূপ 1/1, 1/2, 1/4, 2/2 ইত্যাদি।

৬৩. এই দহন যবদ্বীপের দহন-নগরী হইলে ইহা কৌতূহলের বিষয় হইবে এবং ইহার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন।

(খ)

১. T. G. T. Pigeaud, *Tantu Panggelaran*, 1924.

২. এই অংশে গ্রন্থকার ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং গুরুর কলহের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের কলহের কাহিনী বায়ু, লিঙ্গ, শিব এবং কূর্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে (তুলনীয়, টি. এ. গোপীনাথ রাও, *Elements of Hindo Iconography*, vol. II, pp. 1 p. 105 ff., p. 296 ff.)। আলোচ্য গ্রন্থের অনুরূপ প্রতিধ্বনি পাইতেছি আলবেরূনী (সেচৌ, ২, পৃঃ ১৪৭) এবং কূর্মপুরাণে। উভয় গ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছে কিরূপে ব্রহ্মার একটি মস্তক কর্তিত হইয়াছিল।

৩. Cf. Poerbatjaraka. *Agastya in den Archipel*, 1926, p. 32 ff.

৪. ইহাকে সুন্দমলের কাহিনীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

৫. নাগরকৃতাগম।

৬. Pigeaud, *Java in the 14th Century*, I pp. 113-14, III p. 163-5.

৭. এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, Pigeaud, *Tantu Panggelaran*, p. 28.

৮. আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃঃ ৫৩ হইতে।

৯. *BKI*, 5th series II, 1887, p. 575 ; *VG* IX, p. 287.

১০. Cf. Pigeaud, *Java in the 14th Century*, IV, pp. 362, 493.

১১. *TBG* V, 1, p. 23.

১২. ভ্রিদে কর্তৃক উদ্ধৃত। দ্রষ্টব্য Vrecde, *Cat, Jav. Mad. Hss*, 1892, p. 13 ff. , Cf. Gonda, *De letterkunde van de Indische Archipel* p. 28-9.

১৩. *TBG*, 1840, 3rd yr. 1, 67 , *Ibid* 1843, 5th yr, 1, 1 ; Raffles, *History of Java*, vol. I, Appendix. Cf. Pigeaud, *op. cit.*, IV pp. 362, 493.

১৪. গল্পটি বিষ্ণুপুরাণের স্যমন্তকোপাখ্যানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

১৫. ভাবের পরিমণ্ডলটি ভারত-পলিনেশীয়।

১৬. *Sanskrit in Indonesia*, p. 132.

১৭. *BKI*, 1895, 6th Series, vol. I, p. 95 ff.

১৮. Cf. Aymonier, *Le Cambodge*, t III, pp. 233-34, 612 ; Moura, *Le Royaume du Cambodge*, t. II, pp. 289, 325-26 ; also BCAI, 1911-12, pp. 189 and the plate facing p. 190.

১৯. Juynboll, *suppl* dl-II. Cod. 3981 (1).

২০. ইহা দ্বীপময় ভারতে প্রচলিত পাঁচটি দিনের নাম।

২১. Juynboll, *suppl.* dl. II, p. 172 ff. cod 5019 ; Pigeaud, *Tantu Panggelaran* p. 304 ff.

২২. ইহা আমাদিগকে সহস্রলোচন ইন্দ্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

২৩. কুমারসম্ভব। ৪র্থ হইতে ১০ম সর্গে, বিক্ষিপ্তভাবে।

২৪. একাদশ সর্গ, ১-৩৭।

২৫. দ্বাদশ সর্গের ১-৪৬ দ্রষ্টব্য।

২৬. *De Tantu Panggelaran*, p. 310.

২৭. তুলনীয় ঋগ্বেদ ১০।৫৪।৪, ১০।৭২।৪, ১০।৯০।৫ ; অথর্ববেদ ১৩।৪।২৯-৩৯।

২৮. "মহতী দেবতাহ্যেষাম্ নররূপেণ তিষ্ঠতি।" মনুসংহিতা।

২৯. পূর্বে এই গ্রন্থকে অগস্ত্যপর্ব বলা হইত। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য : Pigeaud, *Tantu Panggelaran*, 1924, pp. 319-26 ; Juynboll, *suppl* II, p. 170 ff. ; Poerbatjaraka, *Agastya* pp. 39 ff. ; Gonda, *BKI* 90 (1933) pp. 329-419 ; *BKI* 92, pp. 331-458.

৩০. সংস্কৃত শ্লোকে এই স্থলে আর একটির নাম বেশী দেওয়া হইয়াছে ; উহা হইল আপঃ। চতুর্ভূত স্থলে পঞ্চভূত লিখিলে সংস্কৃত শ্লোকের সহিত সামঞ্জস্য বিধান হইত কিন্তু যবদ্বীপীয় ব্যাখ্যার সহিত আবার বিরোধ সৃষ্টি হইত।

৩১. তুলনীয় মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অধ্যায় ৫০, ৫ম শ্লোক হইতে ; অগ্নিপুরাণ, অধ্যায় ২০, নবম শ্লোক হইতে ; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, দশম অধ্যায় ইত্যাদি।

৩২. মনুসংহিতা ১।৩৫, Juynboll, *suppl* II, p. 171.

৩৩. দ্রষ্টব্য সং : ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, অধ্যায় ৬৮।

৩৪. সং ব্রহ্মাণ্ডঃ (১০।১২) : "তস্মৈকসপ্ততিযুগম্ মন্বন্তরমিহোচ্যতে"। তুলনীয় মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অধ্যায় ৫৩।৩।

৩৫. *Agastyaparwa* (Text in *BKI*, 90) p. 345.

৩৬. তুলনীয় অগ্নিপুরাণ ২০।৯ হইতে, বিষ্ণুপুরাণ ১।৭ ; সৌরপুরাণ, অধ্যায় ২৬। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৫০।১৯ হইতে) ঊর্জকে অত্রির স্ত্রী রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

৩৭. তুলনীয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৬৯।৪১। মার্কণ্ডেয় পুরাণ (৫০ অধ্যায়) এবং সৌরপুরাণে (অধ্যায় ২৬) উক্ত হইয়াছে যে ধর্মের সহিত তাঁহার ত্রয়োদশ কন্যার বিবাহ হইয়াছিল।

৩৮. দ্রষ্টব্য : অগ্নিপুরাণ ১৮।৩৫, সৌরপুরাণ, অধ্যায় ২৮।

৩৯. তুলনীয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৬৯।৪১।

৪০. Text in *BKI*, 90, p. 351.

৪১. মনুসংহিতা ১২।৯। এইরূপ বিভিন্ন যোনিপ্রাপ্তির কারণসমূহ প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যের বিভিন্ন স্থলে আলোচিত হইয়াছে। ডঃ গণ্ডা এই প্রসঙ্গটি R. C. Majumdar Felicitation Volume-এ আলোচনা করিয়াছেন।

৪২. মনুসংহিতায় (৩।৬৯ হইতে) পঞ্চমহাযজ্ঞের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, যথা ব্রহ্ম, পিতৃ, দৈব, ভূত এবং মনুষ্যযজ্ঞ।

৪৩. এই বিবরণগুলির জন্য দ্রষ্টব্য : অগ্নিপুরাণ, অধ্যায় ১৯।৪-৯ ; বিষ্ণুপুরাণ, ১ম খণ্ড, ১৫ অধ্যায়।

৪৪. দ্রষ্টব্য : বিষ্ণুপুরাণ, ১ম খণ্ড, অধ্যায় ২১ ; অগ্নিপুরাণ, ১৯ অধ্যায়, শ্লোক ১৯ হইতে। স্কন্দপুরাণে (মাহেশ্বরখণ্ডে কেদারখণ্ড, অধ্যায় ১৫) বর্ণিত হইয়াছে যে ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রকে সর্বত্র অনুসরণ করিলে ইন্দ্র অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া জলমধ্যে নিমগ্ন হইলেন।

৪৫. তুলনীয় খিল হরিবংশ, ৮০ অধ্যায় ; বিষ্ণুপুরাণ, ৫ম খণ্ড, অধ্যায় ১৬।

৪৬. তুলনীয় মহাভারত, ৫।১৩০।

৪৭. তুলনীয় খিল হরিবংশ, অধ্যায় ২১৪-১৫।

৪৮. সর্গ ৭৫।

৪৯. তুলনীয় মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অধ্যায় ৭৭।

৫০. Juynboll, *suppl*, dl. II, p. 174.

সপ্তম অধ্যায়

দর্শনশাস্ত্র এবং ধর্মতত্ত্ব

আমরা এই অধ্যায়ে কয়েকখানি হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের আলোচনা করিব যাহাতে দর্শন এবং ধর্মতত্ত্ব প্রধানতঃ আলোচিত হইয়াছে। এই দর্শন এবং ধর্মতত্ত্ব প্রধানতঃ শৈব এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রথম যুগে হয়তো ডিহঙ্গ অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া শৈব ধর্ম প্রাম্বানান অঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছিল। ইহার ব্যাপকতর স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে তুকমাস, চঙ্গল, দিনজ-অনুশাসন লিপিতে এবং প্রাম্বানানের স্থাপত্য ও মূর্তিশিল্পে। বস্তুতঃ যবদ্বীপের অধিকাংশ মন্দির এবং মূর্তি শিব এবং শৈব দেবদেবীগণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইয়াছে। যবদ্বীপে যখন শৈবধর্মের প্রবল প্রতাপ তখন দ্বীপময় ভারতে শৈলেন্দ্র রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মেরও বিপুল প্রসার ঘটিয়াছে। এই বৌদ্ধধর্ম হীনযানমতাবলম্বী বৌদ্ধধর্ম নহে; ইহা মহাযানের বজ্রযান বা তান্ত্রিকশাখা। যবদ্বীপে শৈব তান্ত্রিক মতবাদ কোন সময়ে কিরূপে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা ঠিক করিয়া নির্দেশ করা সম্ভবপর নহে, তবে মনে হয় যে ইহা অষ্টম শতাব্দীর ঘটনা। পালবাঙ্‌লায় এই সময়ে যে শৈব ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদের সংমিশ্রণ ঘটিতেছিল, যবদ্বীপে তাহাই সম্ভব প্রতিফলিত হইয়াছে। নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়, শৈলেন্দ্র-রাজবংশ এবং পাল-বাঙ্‌লার এই ব্যাপারে অবদান স্বীকার করিতে হইবে। জাভা এবং বলিদ্বীপের শৈব এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদের মধ্যে কঠোর গণ্ডীরেখা টানা ছিল না। মনে হয় যে কতকগুলি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ব্যতীত উভয় ধর্মের মধ্যে যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য ছিল যাহার জন্য শিববুদ্ধ cult সৃষ্টি হইতে পারিয়াছিল। সাহিত্যে এবং অনুশাসনলিপিতে ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় রহিয়া গিয়াছে এবং প্রাচীনযুগের যবদ্বীপে এবং আধুনিক যুগের বলিদ্বীপে আজিও বুদ্ধকে শিবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিসাবে পরিগণিত করা হয় অথবা অভিন্ন মনে করা হয়। ইহার কিছু কিছু বিবরণ পূর্বেই পরিবেশন করিয়াছি। এই সংমিশ্রণের ছাপটি শৈব এবং বৌদ্ধ-সাহিত্যের স্থলে স্থলে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে[১]।

প্রথমেই আমরা ভুবনকোষ নামক গ্রন্থটির আলোচনা করিব[২]। ভুবনকোষ গ্রন্থটি শৈব-মার্গের যোগপদ্ধতির প্রক্রিয়া-পুস্তক। এই মার্গের মূল বিশ্বাস যে বিশ্বজগৎ এবং অনু-জগৎ[৩] একই জিনিস এবং শিবই জগতের মূলাধার। এই মার্গের উদ্দেশ্য ভগবানের সহিত যোগ-

সাধনার দ্বারা একত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং এই কার্যের জন্য সহায়ক হইল বিভিন্ন রহস্যময় ধ্বনি, যেমন সপ্তওঙ্কার ইত্যাদি[৪]। এই গ্রন্থে একাদশটি পটল বা অধ্যায় আছে এবং প্রত্যেক পটলের শেষে একটি অন্তিমবাক্য বা colophon আছে। প্রথম পাঁচটি পটলে ব্রহ্মরহস্য বিবৃত হইয়াছে; ষষ্ঠ পটলের নাম জ্ঞান সিদ্ধান্তশাস্ত্রম্। সপ্তম এবং অষ্টম পটলের নাম যথাক্রমে ভস্ম-মন্ত্র এবং সকল-বিধি শাস্ত্রম্। অবশিষ্ট পটলগুলির বিশেষ কোন নাম নাই। গ্রন্থটি পড়িয়া মনে হয় ইহা যেন সংস্কৃত অনুবাদ এবং অংশতঃ ব্যাখ্যা; যেখানে সংস্কৃত শ্লোক আছে তাহার পরেই প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় উহার অনুবাদ বা ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ডঃ গোরিস বলিয়াছেন যে এই পুস্তককে বৌদ্ধ সঙ্ হ্যঙ্ কমহাযানিকনের প্রতিপক্ষ হিসাবে উপস্থাপিত করা যায় এবং ইহা সিদ্ধান্ত মতের তান্ত্রিক সাহিত্যান্তর্ভুক্ত। গ্রন্থে পৌরাণিক প্রভাবের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রহিয়াছে এবং ডঃ গোরিস ভুবনকোষ এবং অগ্নিপুরাণ হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া উহাদের পারস্পরিক সাদৃশ্য পরিদর্শন করিয়াছেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত এখানে পরিবেশন করা যাইতে পারে। ভুবনকোষে আমরা পড়িতেছি: "ইতি ভুবন-সানিদ্ধ্য-নামশাস্ত্র, ব্রহ্মরহস্যম্, প্রথমঃ পটলঃ," ইহার সহিত অগ্নিপুরাণের "ইতি আগ্নেয়ে মহাপুরাণে জ্যোতিঃ শাস্ত্রসারো নাম এক-বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ" অংশটি তুলনীয়। অনুরূপভাবে আমরা ভুবনকোষের "ইতি ভস্মমন্ত্রসকলবিধিশাস্ত্রম্ দ্বিতীয়ঃ পটলঃ"—এর সহিত অগ্নিপুরাণের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের "ইতি আদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে স্নানবিধিকথনম্ নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ"—এর তুলনা করিতে পারি। এই প্রসঙ্গে আমরা এইটুকু মন্তব্য করিতে পারি যে অনেক অপৌরাণিক গ্রন্থেও এই বিশেষত্বটুকু পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রন্থের প্রথমদিকে আমরা পড়িতেছি:

"অবিঘ্নম্ অস্তুঃ[৫]

সসংগ্রহ কারি সির মোবুস্, লিঙ্ নির:

(১) প্রণম্য, শিরসে (শিরসা ?), দেব, বাক্যম্

মুনিরমন্মথ

দেবদেব, মহাদেব, পরমেশ্বর, শঙ্কর

শ্রী মুনি ভার্গব, সির মহ্যন তুমক্যনকেন্ ইকঙ্ পদ নির্বাণ রি ভটার, মঙ্কন পুয়াভিপ্রায়নির, মনম্বহ্ ত সির রি ভটার, "সিরসা," মককারণ হুলুনির সির, রি তেলসনির মনম্বহ্, মোজর ত সির: হে "দেবদেব," কিত দেব নিঙ্ দেবতা কবেহ্, হে "মহাদেব," কিত ভটার মহাদেব ঙরন্ত, হে "[মহেশ্বর]," কিত ভটার মহেশ্বর ঙরন্ত, হে "সঙ্কর," কিত ত ভটার শঙ্কর ঙরন্ত"

উপরোক্ত সংস্কৃত শ্লোকগুলি এবং সংশ্লিষ্ট যবদ্বীপীয় টীকার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

"অবিঘ্ন বা শান্তি হউক।

সমস্ত জ্ঞাত হইয়া তিনি (ভার্গব) নিম্নলিখিতরূপে বলিলেন:

(১) দেবতাকে শিরদ্বারা প্রণাম করিয়া মুনি বলিলেন: "দেব দেব, মহাদেব, পরমেশ্বর, শঙ্কর"। ইহার পর যবদ্বীপীয় টীকাকার ব্যাখ্যা করিতেছেন:

ভার্গব মুনি ভট্টারককে[৬] নির্বাণের অবস্থা বর্ণনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, ইহাই

তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; তিনি ভট্টারকের সম্মুখে শির নত করিয়া প্রণাম করিলেন, "শিরসা"— তিনি ইহা তাঁহার মস্তকের মধ্যভাগ দিয়া করিলেন। প্রণাম শেষ হইলে তিনি বলিলেন "হে দেবদেব" অর্থাৎ তুমি সকল দেবতার দেবতা, "হে মহাদেব" অর্থাৎ তুমি ভট্টারক মহাদেব নামে পরিচিত, "হে মহেশ্বর" (সংস্কৃত অংশে পরমেশ্বর আছে) অর্থাৎ তুমি ভট্টারক মহেশ্বর নামে পরিচিত, "হে শঙ্কর", অর্থাৎ তুমি ভট্টারক শঙ্কর নামে পরিচিত" ইত্যাদি।

প্রথম অধ্যায়ে শূন্যশিব, ষোড়শবিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। শূন্যের যেমন কোন পরিবর্তন নাই সেইরূপ শূন্যশিবেরও কোন পরিবর্তন নাই, তিনি নির্বিকার। লেখক বলিয়াছেন যে হৃদয়ের মধ্যে পাঁচটি বিভিন্ন বর্ণ আছে, যথা রক্ত, ত্রিবর্ণ, অসিত, দীপ্ত এবং স্ফটিক ; এই বর্ণগুলি অঘোর, তৎপুরুষ, সাধ্য, বামদেব এবং ঈশানের চিহ্নবিশেষ[৭]। প্রাচীন যবদ্বীপীয় বৃহস্পতিতত্ত্বেও[৮] আমরা এই নামগুলির পরিচয় লাভ করিতেছি। সেখানে পড়িতেছি :

"ঈশান মূর্দ্ধা য। তৎপুরুষ বক্ত্র য। অঘোর হৃদয় য। বামদেব গুহ্য য।
সদ্যোজাত মূর্তি য। ঔম্।"

গ্রন্থকার অতঃপর ভারতীয় দর্শনের সূত্রানুযায়ী বলিয়াছেন যে ঈশান বা শিবের সহিত একাত্ম হইলেই (শিবাত্মক) মোক্ষ বা নির্বাণ লাভের পথ সুগম হয়। জীবনের ইহাই উদ্দেশ্য। নিজেকে জানিবার পন্থা (আত্মানম্ বিদ্ধি) অবশেষে ভগবানের সহিত এক আত্মিক বন্ধনের সৃষ্টি করে ; ইহা উপনিষদে, ভগবদ্গীতায় কীর্তিত হইয়াছে। এই ধ্যানধারণা শৈবসিদ্ধান্তেও অনুপস্থিত নহে[৯]। ভগবানকে উপলব্ধি করিবার যে পন্থা তাহাতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে এবং এই পথের দিগ্‌দর্শন হইল (ক) তত্ত্বরূপ (খ) তত্ত্বদর্শন (গ) তত্ত্বশুদ্ধি (ঘ) আত্মরূপ (ঙ) আত্মদর্শন (চ) আত্মশুদ্ধি (ছ) শিবরূপ (জ) শিবদর্শন (ঝ) শিবযোগ এবং (ঞ) শিবভোগ।

এই সাধনপথের পঞ্চম অবস্থা শিবজ্ঞানবোধম-এর অষ্টম সূত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে : "যখন মল (পাপ ইত্যাদি) ক্রমশঃ কমিতে থাকে এবং আত্মা জ্ঞান ও ধর্মে অগ্রসর হয়, তখন আত্মার মধ্যে ভগবানের আশীষ ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইতে থাকে ; যখন আত্মা ধর্মে ও জ্ঞানে, দানে ও বিশ্বাসে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে তখন ভগবান দেখা দেন এবং উপদেশ দান করেন।" এই অবস্থাতে অহম্ জ্ঞান এবং অবিদ্যার কুজ্ঝটিকা ক্রমশঃ অপসৃত হয়। যখন নিজের সম্বন্ধে অহংকার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তখন আত্মাটি বিশ্বজনীন আত্মার সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত হয় ; এই পরিভাবটি এস্থলে শিবাত্মক শব্দ দ্বারা ব্যঞ্জিত হইয়াছে[১০]। ভারতীয় দর্শনের এই ভাবগুলটি উচ্চাদর্শে সমুজ্জ্বল, কিন্তু তান্ত্রিকগণের সাধনামার্গে ইহা অনেকস্থলে অপরিমেয় কলুষতার সৃষ্টি করিয়াছে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রিভুবনের কিছু কিছু বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই বিবরণগুলিতে ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যের গন্ধ বিজড়িত। গ্রন্থে বিভিন্ন লোকের বিবরণও দেওয়া হইয়াছে। লেখক বলিয়াছেন যে ব্রহ্মা মহালোকের অধীশ্বর এবং তিনি ও তৎপুরুষ অভিন্ন ; বিষ্ণু বা সাধ্য জনলোকের অধীশ্বর। তপলোক বামদেবের স্থান। সর্বোচ্চ স্বর্গের নাম

হইল সত্যলোক, ইহা রুদ্রের স্থান এবং কণ্ঠমূলে ইহার অধিষ্ঠান। অন্যান্য স্থানগুলি নাভিমূলে অবস্থিত। এইস্থলে মানবদেহকে সমগ্র জগতের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে ; এই দেহজগতের বিভিন্নস্থলে বিভিন্ন দেবগণ বাস করিতেছেন। ইহা সম্ভবতঃ হিন্দুদর্শনের পতমুক্তি-স্বর্গের অনুরূপ ; মনে হয় যবদ্বীপীয় ধর্মগ্রন্থকারগণ এই দেহজগৎকেই স্তূপপ্রাসাদ নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যদর্শনের তত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে। পতঞ্জলদর্শনে ২৬টি তত্ত্ব আছে, ইহার মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব একটি। এই তত্ত্বগুলির নাম হইল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র (অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ,) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, মনস, পঞ্চমহাভূত এবং পুরুষ। এইগুলিকে সাধারণ বিশেষত্ব অনুযায়ী সাংখ্য কারিকায় চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে :—

"মূল প্রকৃতির্বিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ।"

প্রকৃতি হইল পার্থিব কারণ এবং বিকৃতি হইল কার্য (effect)। স্বভাবতঃই প্রকৃতি অন্য কোন আদিম জিনিষ হইতে সৃষ্ট হইতে পারে না। অপর পক্ষে, কোন কিছু যদি পার্থিব কারণ হইতে উদ্ভূত হয় তাহা হইলে তাহাকে বিকৃতি বলা হয়, যেমন মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র। এখানে মহৎ হইতে অহঙ্কারের সৃষ্ট হইয়াছে ; সুতরাং অহঙ্কার মহতের বিকৃতি। এই দৃষ্টান্তটিতে মহৎ হইল প্রকৃতি, পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয় হইল বিকৃতি, কারণ ইহারা একটি আদিম মূল হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোনটি যদি অপর আর একটির আদিম কারণের ফল হওয়া সত্ত্বেও নূতন কোন ফলের সৃষ্টি করে তাহা হইলে ইহাকে প্রকৃতি-বিকৃতি বলিবে। পুরুষ প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে, ইহা হইল অনুভয়রূপ অর্থাৎ উভয় হইতেই সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। এই গ্রন্থে এই সমস্ত সূক্ষ্মতত্ত্বের কোন কোন বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে পঞ্চভূতের বিবরণও দেওয়া হইয়াছে, যথা আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সলিল, এবং মহী ; সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার পরিচয় : ক্ষিত্যপতেজঃ মরুদ্ব্যোমঃ। গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গে দ্বাদশতত্ত্বও বর্ণনা করিয়াছেন, যথা রুদ্র, পুরুষ, অব্যক্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র (এইগুলিকে একটি ধরিয়া), মনস্, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, আপঃ এবং পৃথ্বী। চিন্তার এই পরিমণ্ডল সাংখ্যদর্শনের।

এই গ্রন্থের লেখক মনে করেন যে তাঁহার পুস্তকের "জ্ঞানসিদ্ধান্তশাস্ত্রম"—নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ে তান্ত্রিক সিদ্ধান্তশাস্ত্রের মূলকথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভাবনার ধারাগুলি কতকটা শিবজ্ঞান সিদ্ধিয়ার নামক পুস্তকে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থটি চৌদ্দটি শৈব সিদ্ধান্তশাস্ত্রের অন্যতম। ইহাতে বলা হইয়াছে[১১] : "ভগবানের কার্য-কারিতার কারণ হইল যে আত্মা মল বা পাপ হইতে উদ্ধার পাইবে এবং মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করিবে। আত্মার জন্ম অজ্ঞানে এবং উহা জ্ঞানলাভ করিলেই মুক্তি অর্জন করিবে।" এই জ্ঞান-সিদ্ধান্তশাস্ত্রের প্রথম পটলে আমরা পড়িতেছি[১২] :—

"ওম্ গিরৈশ্বর্যায় নমঃ

১। কিম্ পুনঃ জন্ম মোহশ্চ, ন জ্ঞানঃ ন কুতোধনঃ ন শীলো ন বয়স্তপঃ

২। তেন জ্ঞানেন হে স্কন্দ (হি স্কন্দঃ ?) বৃদ্ধবৃদ্ধতর স্মৃতঃ
ন দীর্ঘ নাশুভিঃ কেশো, ন স্বেতঃ রূপজাতিভিঃ

৩। সর্বশাস্ত্রম্ অধিয়িত, ত্যজস্তি, জ্ঞানম্ উত্তমম্
জ্ঞানস্বাপি ন বিন্দেত, অহো ময়া বিমোহিতঃ

৪ ক। সর্বশাস্ত্রস্য যৎপরম্

৪ খ। সিদ্ধান্তজ্ঞানম্ উত্তমম্

৪ গ। আদিত্য মানবো লোকে

৪ ঘ। সফলন্ তস্য জীবিতম্

৫ ক। ইহাত্র চ মহাদেবী

৫ খ। পরাত্র শিবতাম্ ব্রজেৎ

৫ গ। এবম্ এতানি যুক্তানি

৫ ঘ। ন সন্দেহো বরাননে

৬ ক-খ। এবং এতানি সর্বানি, বচনানি সুপুত্রকাঃ।

৬ গ-ঘ। এবম্ জ্ঞানম্ মহাদেবী, (ন) প্রকাশাতিত তত্ত্ববিৎ

৭ ক। রহস্যন্ নিরতঃ ত্বয়া

৭ খ। পঞ্চপদ ধনম্ যদি

ইতি জ্ঞানসিদ্ধান্তশাস্ত্রম্ প্রথমঃ পটলঃ।

এই শ্লোকগুলির মধ্যে কোথায় যে সিদ্ধান্তজ্ঞানের মর্মবাণী ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে যিনি এই "সিদ্ধান্তজ্ঞানম্ উত্তমম্" ভালরূপে অধিগত করিবেন তিনি অবশ্যই "শিবলোকে" প্রয়াণ করিবেন (অথবা 'শিবাত্মক' হইবেন) এবং যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন এই মানবলোকে 'আদিত্যের' মত বিরাজমান থাকিবেন। এতৎসত্ত্বেও আমরা বলিব যে গ্রন্থকার এই অধ্যায়ে এই দর্শনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিবার বিশেষ কোন প্রচেষ্টা করেন নাই। পরবর্তী অধ্যায়ে স্বর্গলক্ষণম্ বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে যে-সমস্ত বিবরণ পরিবেশন করা হইয়াছে তাহা একমাত্র শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে।

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে হিন্দু ত্রিমূর্তিকে উৎপত্তি, স্থিতি এবং (প্র)লীনের পটভূমিকায় উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই ত্রিমূর্তি হইলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং ঈশ্বর। জগতের এই ত্রিবিধ অবস্থাকে প্রণবমন্ত্র অর্থাৎ অ+উ+ম=ওম্ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এস্থলে এই প্রণব-মন্ত্রের প্রত্যেকটি অক্ষরের স্থলে একটি বিন্দুকে সংস্থাপিত করা হইয়াছে; সুতরাং আমরা সর্বশুদ্ধ তিনটি বিন্দু পাইতেছি। প্রথম বিন্দুটি হইল ব্রহ্মার স্থলাভিষিক্ত এবং ইহা উৎপত্তি বা সৃষ্টির কারণস্বরূপ; দ্বিতীয় বিন্দু বা বিষ্ণু স্থিতি বা রক্ষার দায়িত্ব বহন করিতেছেন; তৃতীয় বিন্দু বা ঈশ্বর প্রলীন বা ধ্বংসের কারণস্বরূপ[১৩]। এই প্রণবমন্ত্র যেমন ভারতীয় মন্ত্রের গোড়ার কথা, তেমনি ইহা যবদ্বীপীয় এবং বলিদ্বীপীয় ধর্ম-তত্ত্বেও উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক

হিন্দু বিশ্বাস করেন যে বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে কেবলমাত্র প্রণবধ্বনি বিদ্যমান ছিল, ইহা একটা বিরাট শূন্যতার ধ্বনির ব্যঞ্জনা। হয়তো এই প্রকার প্রাচীন বিশ্বাস হইতেই প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণ্যমন্ত্রের প্রারম্ভিক ধ্বনি হইল ওম্; বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণও হয়তো হিন্দুদের নিকট হইতে এই ওম্ ধ্বনি তাঁহাদের ফর্মুলা বা মন্ত্রে পরিগ্রহণ করিয়াছেন। প্রণবমন্ত্রের এই গূঢ়রহস্য বা গুরুত্ব যবদ্বীপ এবং বলিদ্বীপের হিন্দু বৌদ্ধ সমাজে সুপরিচিত ছিল বলিয়াই তাহাদের ধর্ম-সাহিত্যে ইহার আসন স্থায়ী হইয়াছে।

গ্রন্থকার অতঃপর বলিতেছেন যে ত্রিমূর্তির এই তিন দেবতা ক্রমপর্যায়ে প্রকৃতি, পুরুষ এবং পুত্ররূপে জগতের স্থিতি বিধান করেন। প্রণবমন্ত্রের সহিত ত্রিমূর্তির যে সমীকরণ করা হইয়াছে তাহাতে ইহার মধ্য হইতে যে কোন একটিকে পরিত্যাগ করিলেই পৃথিবী অচল হইয়া উঠিবে। ত্রিমূর্তিকে এই নূতন পরিবেশে সংস্থাপিত করিলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইবে তাহা কয়েকটি ফর্মূলা বা সূত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে। যথা :

ক) ব্রহ্মা চ প্রকৃতি বিদ্ধি বিষ্ণুঃ পুরুষ এব চ ঈশ্বরঃ পুত্র এব চ	ত্রিবিধম্ স্বর্গমোক্ষদম্
খ) বিষ্ণুৎপত্তি-মহাদেবি ঈশ্বরঃ পুরুষেব চ ব্রাহ্মা পুত্রস্ত সংবিধম্	ত্রিবিধম্ স্বর্গলক্ষণম্
গ) প্রধানম্ ঈশ্বরম্ প্রোক্তম্ ব্রাহ্মা পুরুযাএব চ বিষ্ণুঃ পুত্রস্ তথৈব চ	এতৎ ত্রিভেদলক্ষণম্

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ত্রিমূর্তি সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়ের জন্য কতকগুলি নির্ধারিত কার্য সুসম্পন্ন করিয়া যাইতেছেন। সম্ভবতঃ যবদ্বীপীয় ধর্মতত্ত্বের এই ভাবনাগুলি কয়েকটি সূত্রে প্রকাশ করা যাইতে পারে, যথা :

অ = এক বিন্দু = ব্রহ্মা = ভূঃ-লোক
উ = দ্বি বিন্দু = বিষ্ণু = ভুবঃ-লোক
ম = ত্রি বিন্দু = ঈশ্বর = স্বঃ-লোক[১৪]

সুতরাং উৎপত্তি, স্থিতি এবং (প্র)লীন এই তিনটি কার্য সম্পাদন করিবার জন্য অ+উ+ম ত্রিমূর্তিতে রূপান্তরিত হইতেছেন। হিন্দু ধর্মতত্ত্বেও ওম্-কে পরম ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে[১৫]।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে অন্ততঃ এইটুকু স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইবে যে গ্রন্থখানি মুখ্যতঃ শৈব-ভাবনার জারকরসে রঞ্জিত, যদিও ইহার স্থলে স্থলে সাংখ্যদর্শনের প্রভাব বিদ্যমান। প্রকৃতি এবং পুরুষের ধ্যান-ধারনা ইহার পরিচায়ক। তবুও আমরা বলিব যে গ্রন্থকার সাংখ্য-দর্শনের দুইশাখার মূল সূত্রগুলিকে সংমিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন। বিখ্যাত বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য

সাংখ্যদর্শনের তত্ত্বগুলির শ্রেণীবিন্যাস করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে কপিল নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রবক্তা, আর সেশ্বর সাংখ্যের প্রবক্তা হইলেন পতঞ্জলি। কপিলের মতানুযায়ী জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তি অর্জন করিতে হইবে, পতঞ্জলির মতে যোগের মাধ্যমে। বর্তমান গ্রন্থকার ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং ঈশ্বরের ত্রিমূর্তিকে গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং তিনি কপিলের জ্ঞানাশ্রয়ী নিরীশ্বর সাংখ্যের মতাবলম্বী হইতে পারেন না। এই গ্রন্থকারই আবার ষষ্ঠ অধ্যায়ে "জ্ঞানম্ উত্তমম্"-এর প্রশস্তি গাহিয়াছেন; সুতরাং এইস্থলে তিনি পতঞ্জলি অপেক্ষা কপিলের পন্থানুসারী।

আমরা এইবার আর একখানি গ্রন্থের আলোচনা করিব; ইহার নাম হইল ভুবনসংক্ষেপ। এই গ্রন্থখানিও শৈবমতের পরিপোষক। গ্রন্থারম্ভে আমরা পড়িতেছি "ওম্ অবিঘ্নম্ অস্তু নমো শিবায়।" ইহাতে উমা এবং কুমার ঈশ্বর বা শিবের নিকট হইতে উপদেশ প্রার্থনা করিতেছেন। সিদ্ধান্ত-মার্গের ভুবনকোষের মত এই গ্রন্থটিও বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার বিভিন্নস্থলে সংস্কৃতশ্লোক বিকীর্ণ রহিয়াছে এবং তাহার পরে পরেই প্রাচীন যবদ্বীপীয় অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় পৌরাণিক গ্রন্থের মতই প্রণব, বিন্দু, ওঙ্কার-সংক্রান্ত তাত্ত্বিক মুন্সীয়ানার পরিচয়ও এই গ্রন্থে বিদ্যমান। এই গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল যেস্থলে বিখ্যাত পরমতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল[১৬] :—

১) ন ভূমি, ন জলম্ ব্যাপিঃ, না তেজো, না চ্ছা, মরুতঃ
না সূর্যা, ন চন্দ্র শ্চেব, না কশত রজস্ থতম্
সিদ্ধ্যানিঙ্গ সঙ্গ হঙ্গ সূক্ষ্ম ইকা।

২) উদ্ধ জ্ঞানে ন, মোক্ষঞ্চা সুদ্ধ লিলাম্প্রয়োত্মকা
শুদ্ধ সূক্ষ্মান্তরে যোগী অকশম্মুহু নির্মলম
সিদ্ধ্যান্ সঙ্গ্ হঙ্গ্ সূক্ষ্মতর ইকা

৩) ন স্বার্গ, ন যতিমোক্ষ, ন শিবম্পদ, সূন্যতম্
ন বিয়ৎ, ন দি চিথ্যন্থে, দিক্ শত সুপ্তম্ অপ্লুয়ৎ
সিদ্ধ্যান্ সঙ্গ্ হঙ্গ্ পরমসূক্ষ্মা ইকা

৪) ন বুদ্ধিঃ, ন মনঙ্কারাঃ, ন বিষ্ণু ন ব্রহ্ম ঈশ্বরম্
ন নিষ্টে, ন মধ্যোত্তমঃ, ন মিব দেবতা পুনঃ
সিদ্ধ্যান্ সঙ্গ হঙ্গ্ অত্যন্ত সূক্ষ্মা ইকা

৫) ন তিজ্ঞানন্ ভুবেৎ শূন্যঃ নিরব্যক্তস্ত নিষ্কালম্
নিরুপণ সর্ব ভবেষু, মোক্ষম্ এতৎ প্রকীর্তিতঃ
সিদ্ধ্যান সঙ্গ্ হঙ্গ্ আতীসূক্ষ্ম ইকা

৬) ন বোদ্ধিঃ, ন মনো নিত্যম্, নিশ্চিত্ত শ্চ নিরাত্মকঃ
নিরোগী নিরাভিপ্রায়ম, মুনী সুস্থত সিয়তে
সিদ্ধ্যান্ সঙ্গ্ হঙ্গ কমোক্ষন ইকা।

এই বিকৃত সংস্কৃত রচনার সহিত প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার কিঞ্চিৎ মিশাল দিয়া যে

অদ্ভুত জিনিষটি রচিত হইয়াছে তাহার মর্মগ্রহণ দুরূহ নহে। মনে হয় যে গ্রন্থের মধ্যে এই অংশটুকুই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু গ্রন্থকার এই স্থলে যে শূন্যতার জয়গান গাহিয়াছেন তাহা হিন্দু তান্ত্রিক এবং বৌদ্ধসাহিত্যে সুপরিচিত। গ্রন্থকারের মতে এই বিরাট শূন্যতাই মোক্ষ। যখন সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, জল, ত্রিমূর্তি প্রভৃতি কিছুই থাকে না, যখন মানবদেহের বিভিন্ন চেতনার অবলুপ্তি ঘটে, যখন সমস্তই শূন্য এবং স্থান ও কালের অতীত, তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাই মোক্ষ। একজন হীনযানী বৌদ্ধও উদাত্তস্বরে না হইলেও প্রায় একই সুরে বলিতে পারেন যে, বর্তমান জীবনের পরে আর পুনর্জন্ম হইবে না এবং "দেহের অবলুপ্তির পর জীবনের পরপারে দেবগণ এবং মানবগণ কেহই তাহাকে দেখিতে পাইবেন না[১৭]।"

অনুরূপ সুরের প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতেছি বলিদ্বীপের বুদ্ধবেদস্তুতিতেও[১৮]:

নির্মলে নির্বুদ শূন্য বরদ মহাপবিত্র।
নিক্ষিতিমহাপদ্মায় সূক্ষ্মতয় মহামৃতম্॥
সপ্তশূন্য মহাসূক্ষ্ম পবিত্রম্ মহানুক্ষণম্।
সর্বভূক্তিমহামৃতং সূক্ষ্মামৃতং মহা ইনম্॥
নির্বিঘ্নং নির্মলং শূণ্যং সর্বপাপমোক্ষংকরম্।
নিঃস্বরং শূন্যধর্মং চ সূক্ষ্মমূতিমহামৃতম্॥
শূন্য নির্মলানুক্ষণং সপ্তযোগমোক্ষংকরম্।
অনুক্ষণ সর্বকান্তায় একস্থান মহাশূন্য॥
নির্বিঘ্নং নির্মলং শূন্যং সর্বপাপমোক্ষংকরম্।
নির্যুক্তিরোগশূন্যদং সর্বশক্রমোক্ষং করম্॥

এই স্তবটির অন্তর্নিহিত ভাবের পরিমণ্ডলটি উপরে উল্লিখিত ভাবধারার সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নহে। দৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে প্রায় অনুরূপ বর্ণনা শূন্যপুরাণে নিরঞ্জনের প্রকাশ হইবার পূর্বে দেখিতে পাওয়া যাইবে। হিন্দু ত্রিমূর্তি না থাকিলেও যে এই মোক্ষলাভ সম্ভব তাহা গ্রন্থকার সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করিয়া এই গ্রন্থে শৈব ধর্মতত্ত্বের এক নূতন সুর সংযোজনা করিয়াছেন। হিন্দুদের মোক্ষ সম্বন্ধে ধারণা এই যে ইহাতে দেহাশ্রয়ী আত্মা সর্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত লীন হইয়া যায়। একটি পাত্র ভাঙ্গিয়া গেলে উহার বায়ু যেমন বিশ্বব্যাপী বায়ুতে বিলীন হয় ইহাও সেইরূপ। যবদ্বীপীয় গ্রন্থকার এই সর্বব্যাপকতাকে এক বিরাট নঞ্-ব্যঞ্জক শূন্যতায় পর্যবসিত করিয়াছেন। ভারতীয় ধ্যানধারণা যেন দ্বীপান্তরের নূতন বেশে দেখা দিল। শূন্য ব্রহ্ম ইন্দো-যবদ্বীপীয় ধর্মতত্ত্বে উল্লেখযোগ্য স্থান পরিগ্রহণ করিলেও আলোচ্য গ্রন্থের লেখক এই ধারণাকে আগে বহুদূর অগ্রসর করাইয়া উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে শূন্যতাই সর্বশ্রেষ্ঠ,—এমন কি ইহা স্থান, কাল এবং দেবগণেরও উর্ধে। বৃহস্পতিতত্ত্ব শেষ হইলে উহার অনুলেখক এই সুরেই লিখিয়াছেন:

ভটার পশুপতি সির মাজরকেন শাস্ত্র। লিঙ্গ নির।
ন ভূমির্ণ জলম্ বাপি। ন তেজো, ন চ মারুতঃ।
ন চ ব্রহ্মা, ন চ বিষ্ণুর। নৈর চাপি মহেশ্বরঃ[১৯]॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শূন্যবাদের এই প্রশস্তি কেবলমাত্র শৈব তান্ত্রিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বস্তুতঃ ইহা ভারতবর্ষ এবং যবদ্বীপের সমস্ত তান্ত্রিকগণকে একই চন্দ্রাতপতলে আনয়ন করিয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে পঞ্চাক্ষর (নমঃ শিবায় এই পাঁচটি অক্ষর); আত্মার পঞ্চাবস্থা অর্থাৎ জাগ্রত, সুপ্ত, স্বপ্ন, সুষুপ্ত, তুর্য অবস্থা ; ওম্ তত্ত্ব এবং ইহার পাঁচটি বিভাগ ও সমীকরণ ; এই শব্দ প্রতীকানুযায়ী আকাশের বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন দেবতার অধিষ্ঠান,—এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। এই গ্রন্থ লেখকের মতে নিষ্কল[২০] অবস্থাই জগতে সর্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় বিষয় এবং ইহা হইতেই মাত্র, নাদান্ত, নাদ, বিন্দু, চন্দ্র, বিশ্ব, ত্র্যক্ষর, ব্রহ্ম প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে। কোন কোন দিক দিয়া এই গ্রন্থ ভুবন-কোষের সমগোত্রীয়। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে সপ্তদ্বীপ, সপ্তপর্বত, সপ্তসমুদ্র এবং সপ্ততীর্থের বিবরণও পরিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে দেহের মধ্যে পাঁচটি ভূত বা পঞ্চভূত বিদ্যমান। যেমন মাংস হইল ক্ষিতি, শোণিত হইল অপ্‌ ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত দেহের বিভিন্ন স্থানে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান নামক পঞ্চপ্রাণ বিদ্যমান ; এই পঞ্চপ্রাণতত্ত্ব যবদ্বীপের অন্যান্য গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার পর আমরা ত্রিতত্ত্বের ব্যাখ্যা পড়িতেছি। ইহাতে অহঙ্কার, মন এবং বুদ্ধির সহিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের সমীকরণ করা হইয়াছে এবং সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃকে শিবের ত্রিমূর্তি অর্থাৎ মহাদেব, রুদ্র এবং শঙ্করের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা মুস্কিল। কোন কোন কারণে মনে হয় যে এই গ্রন্থখানি এই পর্যায়ের অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে যেন অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন[২১]।

এইবার আমরা বৃহস্পতিতত্ত্ব নামক গ্রন্থখানির আলোচনা করিব। এই গ্রন্থের অপর নাম শিবতত্ত্ব ছিল বলিয়া মনে হয়[২২]। এই গ্রন্থে যবদ্বীপীয় শৈবদর্শনের বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। কিছু কাল পূর্বে শ্রীমতী সুদর্শনাদেবী এই গ্রন্থখানি সম্পাদনা করিয়া ইহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। গ্রন্থের সংস্কৃত শ্লোকসংখ্যা ৭৪। শ্লোকগুলির প্রত্যেকটি দুই চরণে নিবদ্ধ, কেবলমাত্র ৪২, ৪৪, ৭৩, ৭৪ সংখ্যক শ্লোক চতুষ্টয় এক চরণে রচিত। গ্রন্থারম্ভে আমরা পড়িতেছি :

অবিঘ্নম্ অস্তু
কৈলাসশিখরে রম্যে তিষ্ঠমানো মহেশ্বরঃ।
বৃহস্পতিমুবাচেতি শিবতত্ত্বমনুত্তমম্ ॥

এইরূপ ভাবে সংস্কৃত শ্লোক দিয়া তৎপরেই আবার প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কোথাও এই ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্ত ; কোথাও বা এই ব্যাখ্যা সুদীর্ঘ। উপরোক্ত সংস্কৃত শ্লোকটির নিম্নেই যবদ্বীপীয় ভাষায় পড়িতেছি :

"ভটার ঈশ্বর হনে পুচক নিঙ্‌ কৈলাসপর্বত। সেড়েঙ্‌ মবরঃ অজ্ঞি রি সঙ্‌ বতেক্ দেবতা কবেহ্‌। কঞ্চিৎ বিনেঃ শাস্ত্র পঙ্গর্চন নিরর্থ অবক্ ভটার পরম কারণ। ইরিকঙ্‌ কাল। হন সির বিকু রিঙ্‌ স্বর্গ। ভগবান্ বৃহস্পতি ঙরন্ ইর। সির ত মসো মমুজা রি ভটার। সহ পঞ্চোপচার।

রি হুবুস্ নিরান্ পমুজা। মনেম্বঃ ত সির। রি হুবুস নিরান্ মনেম্বঃ। মলুঙ্গুহ্ ত সির। তুম-কবনকেন্ সারি সঙ্ হ্যঙ্ অজি কবেহ্। লিঙ্ নির।"

ইহার বাঙ্লা অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"ভট্টারক ঈশ্বর কৈলাস পর্বতের শিখরে সমাসীন ছিলেন। সেইখানে সমবেত দেবগণের সভায় তিনি সেই পবিত্র শিক্ষাদান করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি তাঁহাকে (অর্থাৎ নিজেকে) পরমকারণরূপে পূজা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে শাস্ত্র দান করিলেন।

তৎকালে স্বর্গে মহাসম্মানিত বৃহস্পতি নামক এক ঋষি ছিলেন। তিনি আসিয়া ভট্টারককে পঞ্চোপচার সহ পূজা করিলেন। পূজা শেষ করিয়া তিনি শির নত করিয়া প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিয়া তিনি উপবেশন করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত পবিত্র জ্ঞানের সার সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার কথাগুলি এই :"

তিনি বলিলেন : "ভগবন্ দেব দেবনামনাদিপরমেশ্বর,
সমাখ্যাহি তত্ত্বং সর্বং রময়ন্ সচরাচরম্ ॥"

সুতরাং সংস্কৃত শ্লোকের সহিত যবদ্বীপীয় অংশের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে যবদ্বীপীয় অংশ সংস্কৃত অংশের আক্ষরিক অনুবাদ নহে, উহার ব্যাখ্যা মাত্র। সুতরাং একথা আমরা হয়তো বলিতে পারি যে এই গ্রন্থের মূল সংস্কৃত শাস্ত্রটি ভারতবর্ষে বা যবদ্বীপে রচিত হইয়াছিল। যবদ্বীপে তান্ত্রিক শৈবমতের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল এবং এই ধর্মের দার্শনিক তথ্য ব্যাখ্যা করিবার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত বৃহস্পতিতত্ত্ব যবদ্বীপের সাধারণ লোকের বুঝিবার পক্ষে দুরূহ ছিল; সুতরাং মনে হয় যে তান্ত্রিকমতে যাঁহারা বিশ্বাসী ছিলেন তাঁহাদের শিক্ষাদান করিবার জন্যই এই যবদ্বীপীয় ব্যাখ্যার সংযোজনা করা হইয়াছিল।

যাহা হউক বৃহস্পতি মহেশ্বরকে উপাসনা করিয়া ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় (যেমন শৈব, পাশুপত এবং অলেপক) এবং শাস্ত্রগুলির বিভিন্ন তথ্য জানিতে চাহিলেন[২৩]। মহেশ্বর বলিলেন যে কর্মফলের জন্য জন্ম হয়। জীবগণ পৃথিবীতে কর্ম অনুযায়ী দেবযোনি, বিদ্যাধরযোনি, রাক্ষসযোনি, দৈত্যযোনি, নাগযোনি প্রমুখ বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। অপকর্ম হইলে আত্মন্ নরকগামী হয় এবং ইহার পাপক্ষয় হইলে জীব নিম্নস্তরের প্রাণী হইয়া জন্মগ্রহণ করে; সৎকর্ম করিলে স্বর্গে জন্ম হয়, সৎকর্মের ফলভোগ শেষ হইলে জীব রাজ বা বিত্তশালী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তখন সমস্ত বস্তুকে (reality) দেখেন; তাঁহার সংবেগ বা মুক্তির আকাঙ্খা জন্মে। তাঁহার চোখে তখন জন্মবাসনা, ক্ষুধাতৃষ্ণা, শীতগ্রীষ্ম এবং পুনর্জন্মের বেদনা ভাসিয়া উঠে। তখন তিনি ঋষির নিকট জ্ঞানলাভের জন্য গেলে ঋষি তাঁহাকে বিভিন্ন প্রকার উপদেশ প্রদান করেন; ইহা হইতেই বিভিন্ন শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। বৃহস্পতি অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন যে শৈব, পাশুপত এবং আলেপক জ্ঞানের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ। মহেশ্বর বলিলেন যে ইহাদের মধ্যে কোনটিই বড় বা কোনটিই ক্ষুদ্র নহে, তবে ইহাদের সম্বন্ধে লোকের জ্ঞানের তারতম্য হওয়ার জন্য এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মহেশ্বর বলিলেন :

"অন্ধা অন্ধৈঃ সমাযুক্তা গজস্যাপ্তুং শরীরকম্।
চক্ষুষানাপ্তসাদৃশ্যমন্যোঽন্যেন ভ্রমাপ্যতে ॥"

এখানে অন্ধগণের সেই বিখ্যাত কাহিনীটি বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন অন্ধ ব্যক্তি হস্তীর বিভিন্ন অংশে হস্তাবলেপন করিয়া হস্তীর বিভিন্ন বর্ণনা দিল। কেহ হস্তীর লেজ স্পর্শ করিয়া বলিল যে হস্তী সর্পের মত, কেহ তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিল যে হস্তী কুম্ভের মত, কেহ আবার তাহার কর্ণ স্পর্শ করিয়া বলিল হস্তী ব্যজনের মত, কেহ আবার তাহার পদস্পর্শ করিয়া বলিল যে হস্তী স্তম্ভের মত[২৪]। মনুষ্যও এইরূপ 'ব্যামোহ' এবং অন্ধতার দ্বারা পরিচালিত হইয়া শাস্ত্র এবং জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে পারে না; সুতরাং ইহা হইতেই ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

অতঃপর বৃহস্পতি অন্ধতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে চাহিলে মহেশ্বর বলিলেন যে তিনি বৃহস্পতিকে জ্ঞানদান করিবেন। অতঃপর বৃহস্পতি হইবেন দেবগুরু এবং বৃহস্পতির শিষ্যগণ হইবেন মনুষ্যজাতির গুরু। ইহার পর মহেশ্বর চেতন এবং অচেতনের প্রভেদ বুঝাইয়া পরম-শিবতত্ত্ব, সদাশিবতত্ত্ব এবং শিবতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানদান করিলেন।

পরমশিবতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া ঈশ্বরকে বলা হইয়াছে যে তিনি অপ্রমেয়, অনির্দেশ্য, অনৌপম্য, অনাময়, সূক্ষ্ম, সর্বগত, নিত্য, ধ্রুব এবং অব্যয়। গ্রন্থকার আরো বলিয়াছেন যে এই জগৎ শিবের দ্বারা "উতপ্রোত।"

"উতপ্রোতজ্জগদিদং শিবেন পরমেশিনা।
উতং ব্যাপ্তমিতি প্রোক্তং-প্রোতঞ্চ মণিসূত্রবৎ।"

ইহার পর বলা হইল "নাহন ইকলঙ্গ গুণ রি সির" অর্থাৎ ইহাই হইল তাঁহার (ভটারের) গুণ, যথা—দূরশ্রবণ, দূরসর্বজ্ঞ, দূরদর্শন। তাঁহার অষ্টৈশ্বর্যগুণের নাম: অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, যত্রকামাবসায়িত্ব। ইহারই নাম হইল সদাশিবতত্ত্ব। সদাশিব-তত্ত্বের নিম্নে হইল মায়াশরীরতত্ত্ব: ইহা হইল অষ্টবিদ্যাসনের স্থান। ইহার নাম হইল অনন্ত, সূক্ষ্ম, শিবতম, একরুদ্র, একনেত্র, ত্রিমূর্তি, শ্রীকণ্ঠ এবং শিখণ্ডী। ইহারা পর্যায়ক্রমে ভুবন এবং জগতে পরিব্যাপ্ত হয় এবং (সংসার হইতে) আত্মাকে মুক্ত করে। ভটার এইস্থলে কিরূপে কামদেবকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন। ইহাই হইল অষ্টবিদ্যাসন এবং মায়াশরীরতত্ত্ব। ইহার পর গ্রন্থকার মায়াতত্ত্ব বা অচৈতন্যভাবের ব্যাখ্যা এবং ইহার সহিত শিবতত্ত্ব বা চৈতন্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

ইহার পর আমরা পড়িতেছি ত্রিগুণতত্ত্বের ব্যাখ্যা অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ সম্পর্কিত আলোচনা। এইগুলি হইল মনের বা চিত্তের বিশেষত্ব। মন বা চিত্ত যদি সত্ত্ব, রজঃ বা তমঃ ভাবাপন্ন হয় তাহা হইলে উহা সেই গুণানুযায়ী মুক্তি, স্বর্গ, নরক, প্রাণীদেহ এবং মনুষ্যদেহ ধারণ করিবে। এই গুণগুলির মধ্যে সত্ত্বগুণ উত্তম; রজঃ এবং তমঃ গুণ নিকৃষ্ট। এই সমস্ত গুণাগুণের সংমিশ্রণে কি বিপর্যয় হইতে পারে গ্রন্থকার অতঃপর তাহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

লেখক ইহার পরে ধর্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন:

"শীলং যজ্ঞস্তপো দানং প্রব্রজ্যা ভিক্ষাহ্যেব চ।
যোগশ্চাপি সমাসেন ধর্মস্ত্বেক বিনির্ণয়ঃ ॥"

অর্থাৎ শীলসংযুক্ত ব্যবহার, যজ্ঞ, তপ, দান, প্রব্রজ্যা এবং যোগ—সংক্ষেপে ইহাই হইল ধর্মের লক্ষণ।

ইহার পর ... হইয়াছে জ্ঞানের কথা। জ্ঞান উপলব্ধি হয় তিনটি প্রমাণের দ্বারা, যথা প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম। আগম হইল গুরুপ্রদত্ত উপদেশ। লেখক ইহার পর বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য (অর্থাৎ ভোগ, উপভোগ, পরাভোগ) সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া তৎপর ধর্মবুদ্ধি, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্যের সুফল এবং ইহার বিরুদ্ধভাবের কুফল বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা ইহার পর পড়িতেছি অষ্টসিদ্ধির কথা :

"দানমধ্যয়নং শব্দস্তর্কঃ সৌহৃদমেব চ।
ত্রয়ো দুঃখবিধাতাশ্চ সিদ্ধয়োঽষ্ট প্রকীর্তিতাঃ ॥"

গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে দান, অধ্যয়ন, যোগ-শব্দ, আলোচনা, সৌহার্দ্য এবং তিনটি দুঃখের প্রতিবিধান—এই কয়টি হইল অষ্টসিদ্ধি। উপরোল্লিখিত তিনটি দুঃখ হইল আধ্যাত্মিক দুঃখ, আধিদৈবিক দুঃখ এবং আধিভৌতিক দুঃখ। আধ্যাত্মিক সিদ্ধি অর্জন করিলে এই সকল দুঃখের অবসান হয়। ইহার পর বুদ্ধি, অহঙ্কার, অহঙ্কারের বিকৃতি, পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ), পঞ্চতন্মাত্র হইতে সৃষ্ট পঞ্চ মহাভূত (আকাশ, বায়ু, তেজ, আপঃ, পৃথিবী), ষড় রস (লবণ, অম্ল, কটুক, তিক্ত, কষায়, মধুর) এবং ভ্রূণসৃষ্টির রহস্য বর্ণনা করা হইয়াছে। অতঃপর শকট এবং দেহ-প্রাসাদের রূপক কাহিনী বর্ণনা করিয়া লেখক দশটি নাড়ী[২৫] এবং দশটি প্রাণের[২৬] নাম এবং ইহাদের ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহার পর আত্মার পঞ্চপদ বা পঞ্চ অবস্থার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই অবস্থাগুলির নাম হইল জাগ্রপদ, স্বপ্নপদ, সুষুপ্তপদ, তূর্যপদ এবং তূর্যান্তপদ। এইবার ভট্টারক পরমার্থের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া বলিলেন :

"সদ্‌ভাবেন পরিত্যক্তমসদ্‌ভাববিবর্জিতম্।
সদসদ্‌ভাবরহিতম্ নিষ্কলান্তমলক্ষণম্[২৭] ॥

অর্থাৎ সৎ বা অস্তিত্বের ভাব পরিত্যাগ করা এবং অসৎ বা অনস্তিত্বের ভাব বর্জন করা ; সৎ-অসৎ অর্থাৎ অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের ভাব রহিত হওয়া ; ভেদের অন্ত হওয়া এবং সংজ্ঞাবিহীন বা অলক্ষণ : ইহাই হইল পরমার্থ।

পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে ইহারই ব্যাখ্যা সুপরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। লেখক বলিয়াছেন যে দুগ্ধে যেমন ননী থাকে, কাষ্ঠে যেমন অগ্নি থাকে, মেঘে যেমন জল থাকে, শূন্যে যেমন বায়ু থাকে সেইরূপ মানুষে থাকে রজঃ, তমঃ, মনঃ। ইহাদের অস্তিত্ব আছে, আবার অস্তিত্ব নাইও[২৮]। এখন ভট্টারকের যদি অস্তিত্ব থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে ধরা যাইতে পারে এবং তিনি পৃথিবীর সুখদুঃখের অধীন হইবেন। আবার তিনি যদি অ-সৎ বা অস্তিত্ববিহীন হন তাহা হইলে এই সমগ্র জগৎ এবং জগতস্থ প্রাণী সমূহের জীবন কিরূপে বিদ্যমান থাকিবে ? সদ্ হৃদ্ বিশেষ বা সর্বোচ্চ সত্য এই ননী এবং জলের মত। গ্রন্থকার

বলিয়াছেন যে নিদ্রার সময় আত্মা প্রধানতত্ত্বে প্রবেশ করিয়া অজ্ঞান অবস্থায় থাকে, কেবলমাত্র পঞ্চবায়ু আত্মাকে ধরিয়া রাখে; সেইজন্য নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির মৃত্যু হয় না।

ইহার পরে ভট্টারক মোক্ষের তিনটি পথ নির্দেশ করিয়া দিলেন। এই পথগুলি হইল : (১) গভীর প্রজ্ঞালাভ করা, (২) ইন্দ্রিয়যোগমার্গ বা ইন্দ্রিয়গুলির সহিত সংযুক্ত না হওয়া (অ-যোগ) এবং (৩) তৃষ্ণাদোষক্ষয় অর্থাৎ বাসনামুক্ত হওয়া। মৃত্যুর সহিত আত্মা এবং সুখ-দুঃখের সম্বন্ধ কি তাহা বিস্তৃতভাবে যবদ্বীপীয় টীকায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহার পর ৫৩ হইতে ৫৯ শ্লোকে ছয়টি যোগের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই ছয়টি যোগের নাম হইল প্রত্যাহার, ধ্যান, প্রাণায়াম, ধারণ, তর্ক ও সমাধি। প্রত্যাহার যোগ দ্বারা যোগী তাহার ইন্দ্রিয়-গণকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তু হইতে প্রত্যাহার করিয়া লন। ধ্যান এবং প্রাণায়াম যোগ হিন্দুগণের অতিপরিচিত রূপেই বর্ণিত হইয়াছে।

তত্ত্বসমাহিত হৃদয়ে ওঙ্কার ধারণ করাকে ধারণযোগ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তর্ক-যোগের তর্ক শব্দের অর্থ হইল চিন্তা বা ভাবনা করা। তর্ক-যোগ সম্বন্ধে আমরা পড়িতেছি :

"আকাশ ইব তদ্রূপমাকাশঃ সন্ততং ধ্রুবম্।
নিঃশব্দং তর্কয়েন্নিত্যং স তর্ক ইতি কথ্যতে ॥"

যবদ্বীপীয় টীকাতে বলা হইয়াছে যে আকাশকে পরমার্থরূপে চিন্তা করিতে হইবে। কথাটি আমাদিগকে একটি উপনিষদের বাণী স্মরণ করাইয়া দেয় :

স যঃ আকাশং ব্রহ্মেতি উপাস্তে[২৯]।

চিন্তাধারার সামঞ্জস্য আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত করে এবং স্বভাবতঃই মনে হয় যে এই চিন্তাধারা ভারতীয় উৎস হইতেই পরিগৃহীত হইয়াছে। সমাধিযোগেও ভারতীয় চিন্তাধারার স্বাক্ষর রহিয়াছে। ইহার লক্ষণ হইল :

নিরুপেক্ষং নিরাকল্পং নিঃস্পৃহং শান্তমব্যয়ম্।
অলিঙ্গং চিন্তয়েন্নিত্যম্ সমাধিস্তেন কথ্যতে ॥"

সমাধিযোগে তাঁহাকে সর্বদা নিরপেক্ষ, নিরাকল্প, নিস্পৃহ, শান্ত, অব্যয় এবং লক্ষণবিহীনরূপে ধ্যান করিতে হইবে। গ্রন্থকার ইহার পর অহিংসা প্রভৃতি দশশীলের নাম (পাঁচটি যম[৩০] এবং পাঁচটি নিয়ম) এবং উহার ব্যাখ্যা পরিবেশন করিয়াছেন। আমরা অতঃপর গ্রন্থে সপ্তাঙ্গ[৩১], সপ্তাগ্নি[৩২], সপ্তামৃত[৩৩], শিবাগ্নি এবং অষ্টৈশ্বর্যের ব্যাখ্যা পড়িতেছি। সর্বশেষে যোগের প্রতি-বন্ধকতা দূর করিবার উপায় নির্দেশ করিয়া বৃহস্পতিতত্ত্ব শেষ হইয়াছে।

এই শ্রেণীর আর একখানি গ্রন্থের নাম হইল সঙ্ হ্যঙ্ মহাজ্ঞান[৩৪]। ইহা ভারতীয় পুরাণ এবং প্রাচীন যবদ্বীপীয় বৃহস্পতিতত্ত্ব ও গণপতিতত্ত্বের মত প্রশ্নোত্তর ছলে রচিত হইয়াছে। এখানে কুমার হইলেন প্রশ্নকর্তা এবং উত্তর দিতেছেন ভটার (শিব)। এই গ্রন্থে সংস্কৃত শ্লোকের বাহুল্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংস্কৃত শ্লোকের পরে প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় লেখা টীকা-টিপ্পনী আছে, কিন্তু এই টীকা-টিপ্পনী স্থলে স্থলে শ্লোকের ভাবার্থ সম্প্রসারণ করিয়াছে, কোথাও বা ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছে।

গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে : ওম্ অবিঘ্নমস্তু ওম্ বলিয়া। অতঃপর কুমার প্রশ্ন করিলে ভটার প্রারম্ভিক তিনটি সংস্কৃত শ্লোকে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত এবং তূর্যাবস্থার বিশ্লেষণ করিয়া চতুর্থ শ্লোকে বলিলেন :

"একা ভার্যা ত্রয়ঃ পুত্রাঃ দ্বে হলে দশ ধেনবঃ।
সুক্ষেত্রে মম বসতির্যো বেত্তি স রবিং ব্রজেৎ॥"

অর্থাৎ যিনি একটি ভার্যা, তিনটি পুত্র, দুইটি হল, দশটি ধেনু এবং সুক্ষেত্র জানেন, তিনি রবি (শিবাদিত্য) প্রাপ্ত হইবেন। পরবর্তী শ্লোকে এই রহস্যময় বাণীর উপর কিঞ্চিৎ আলোকসম্পাত করা হইয়াছে। লেখক বলিতেছেন যে ভার্যা হইল প্রধান; তিন পুত্র হইল ত্রিগুণ, উহা প্রধান হইতে সমুৎপন্ন; দুইটি হল হইল বুদ্ধি এবং মন; দশটি ধেনু হইল দশেন্দ্রিয়; সুক্ষেত্র হইল হৃদয়। মুক্তিকামেচ্ছু ব্যক্তি ইহাদিগকে অবশ্যই জানিবেন। এই প্রকার রহস্যময় বাণীর জের পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকেও বিবৃত হইয়াছে। লেখক ষষ্ঠ শ্লোকে বলিতেছেন : মাতা এবং পিতা, দুইটি চোর, দুইটি ব্রাহ্মণ, রাষ্ট্র এবং নগরকে হত্যা করিয়া রুদ্রলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনে হইবে আমরা যেন সন্ধা-ভাষা পাঠ করিতেছি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পূর্বভারত হইতে যে বৌদ্ধ গান ও দোহা সঙ্কলন করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই প্রকার ভাবনা অজস্র। ইহার মধ্যে একটি এখানে সঙ্কলন করিয়া দিলাম[৩৫] :

"(অনাদি ভববাসনারূপ পল্লব সকলের আশ্রয় বলিয়া) মন (একটি) তরু (বিশেষ), পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহার শাখা (বিশেষ), আশা (তাহার) বহু বহু পত্র, ফল এবং ফলবাহক। তত্ত্বজ্ঞ গুরুর বচনরূপ কুঠার দ্বারা (সেই তরুকে তুমি) ছেদন কর।......(সুতরাং অবিদ্যারূপ সেই) শূন্য তরুবরকে (প্রকৃতি-প্রভাস্বর)-গগনরূপ কুঠার দ্বারা ছেদন কর, (যাহাতে) সেই তরুর মূল ও ডাল (কিছুই) না থাকে।"

ভাবের অভিব্যক্তিতে, রচনার সাদৃশ্যে, নিহিত অর্থের ছদ্মবেশে এই সমস্ত শ্লোক যেন চর্যাপদ গীতিকা, সহজিয়া, আউল-বাউল গানের পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। ইহা নিঃসন্দেহে পূর্ব ভারতের প্রভাবের পরিচায়ক। ব্যাখ্যা ভিন্ন এই সমস্ত শ্লোকের নির্গলিতার্থ পাওয়া সহজ নহে। উপরোক্ত সংস্কৃত শ্লোকটির মধ্যে মাতা হইলেন প্রকৃতি, পিতা হইলেন পুরুষ, চোর হইল ধর্ম এবং অধর্ম, দুইটি ব্রাহ্মণ হইল বুদ্ধি এবং মন, দশেন্দ্রিয় হইল রাষ্ট্র এবং শরীর হইল নগর। এইগুলির বন্ধন হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইলে লোকে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয় (৭-৮)[৩৬]। এই প্রকার রহস্যময় শ্লোক নবম শ্লোকেও পরিবেশিত হইয়াছে।

"আকাশে জায়তে পুষ্পং নদ্যাম্ জ্বলতি পাবকঃ।
মৃদুপৃষ্ঠানি কূর্মানাং রাত্রৌ চ জায়তে রবি॥"

সহজ অর্থে ইহার মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকে তাই বলা হইয়াছে যে দেহ হইল আকাশ, মন হইল পুষ্প, ওঙ্কার হইল পাবক, নাড়ীগুলি হইল নদী, দশেন্দ্রিয় হইল কূর্ম, প্রকৃতি হইল রাত্রি এবং পুরুষ হইল সূর্য। যাহারা এই রহস্য অবগত আছেন তাঁহারা অবশ্যই মুক্তিলাভ করিবেন। লেখক অতঃপর ত্রয়োদশ শ্লোকে বলিয়াছেন যে পঞ্চভূতের

এই দেহই হইল রাত্রি এবং দশেন্দ্রিয় হইল সূর্য। অতঃপর বলা হইয়াছে যে সূক্ষ্ম শরীরের উপাদান হইল মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং পঞ্চবায়ু (১৪)। ইহার পরেই বলা হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়-গুলি হইল রথ, পুরুষ হইল সারথি, ধর্মাধর্ম হইল আকাশ এবং প্রকৃতি হইল দেহ। রথের সমার্থক হইলেন বিষ্ণু, ব্রহ্মা বৃষরূপে যেন এই রথ আকর্ষণ করিতেছেন, ইহাতে ঈশ্বর যেন সারথি এবং শিব হইলেন রথের জীব অর্থাৎ আত্মা (১৬)। ইহার পর বলা হইয়াছে ত্রিভুবনের কথা ; সংস্কৃত শ্লোকে ত্রিভুবনের নামোল্লেখ নাই, কিন্তু যবদ্বীপীয় টীকায় উহার নাম দেওয়া হইয়াছে ব্রহ্মালোক, বিষ্ণুলোক এবং রুদ্রলোক। ইহার কেন্দ্রস্থলে সংস্থিত হইল শিবস্থান : নাম তাহার ত্রিকোণ (১৭)। ইহার পর বলা হইয়াছে যে হৃদয়ে অমৃক্র বা অষ্টৈশ্বর্য সংস্থিত ; ইহাই ভটার ঈশ্বরের স্থান। তাঁহাকে ওম্ স ব ত অ ই বা ওম্ ন-মঃ শি-বা-য় বলিয়া উপাসনা করিতে হইবে (১৮)। উপাসকের হৃদয়ে, মূলে এবং কণ্ঠে পদ্ম সংস্থিত ; ইহার ঔজ্জ্বল্য সূর্যের মত (১৯)। ইহাই ভটার শিবের স্থান ; তিনিই যোগীগণের আরাধনার বস্তু (২০)। ইহার পর স্বলিঙ্গ, পরলিঙ্গ, রত্নলিঙ্গ, শিবলিঙ্গ, অক্ষিলিঙ্গ, আত্মলিঙ্গ প্রভৃতির মর্যাদা বর্ণনা করিয়া (২১-২৪) লেখক এ্যক্ষর এবং ত্রিপদকে (ব্রহ্মপদ, বিষ্ণুপদ এবং রুদ্রপদ) ওঙ্কার সংজ্ঞা দিয়া (২৫) বলিয়াছেন যে ইহা মনকে দৃঢ় করিয়া উহা শিবলিঙ্গে সংস্থিত করে। ইহার পর প্রাচীন যবদ্বীপীয় গ্রন্থে বিভিন্ন স্থলে উদ্ধৃত সেই শ্লোকটি পাইতেছি যাহার প্রারম্ভে আছে : অপ্সু দেবো দ্বিজাতীনাম্ ইত্যাদি (২৬)। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্ত পদের উল্লেখ করা হইয়াছিল ; এইবার তাহাদের অবস্থিতি-ক্ষেত্র বর্ণনা করা হইল (৩১)। এই ত্রিপদের ত্রিমণ্ডলে এবং ত্রিভুবনের ত্রিকোণে থাকিয়া শিব মায়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন (৩৩)। অতঃপর ত্রিপদের সহিত পদ্মনালের সম্পর্ক বর্ণনা করিয়া (৩৪-৩৫) লেখক বলিয়াছেন যে সুষুপ্তপদ পদ্মনালের কেন্দ্রে : উহাই ভটারের স্থান। দেহের বিভিন্ন স্থলে উহা সংস্থিত হইলে উহার ঔজ্জ্বল্য কিরূপ হয় তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে (৩৬-৩৮)। ইহার পর লেখক সপ্তাকাশের বর্ণনা করিয়াছেন ; উহা হইল জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত, তুর্য, কৈবল্য, পরম কৈবল্য এবং তুর্যন্ত (৩৯)। এই সপ্তপদের বা সপ্তাকাশের মধ্যে প্রথম চারিটিকে চতুর্যুগের সহিত সমন্বয়সাধন করা হইয়াছে (৪০), কিন্তু বলা হইয়াছে যে ইহাদের অবস্থিতিও দেহের মধ্যেই এবং যবদ্বীপীয় টীকা অনুযায়ী ইহাদের নাম হইল সপ্তসূক্ষ্মপিণ্ড (৪২)। ইহার মধ্যে পরমকৈবল্য মোক্ষের সোপান (৪৫)। উপরোক্ত সাতটি পদ সাতজন দেবতার আবাস স্থল। এই দেবতাদের বিবরণী ৪৯ হইতে ৫৫ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। তবে উহা ৪৭ সংখ্যক শ্লোক সংখ্যার বর্ণনা হইতে বিভিন্ন। ভটারকে দেহের মধ্যেই অভিষেক করিয়া তাঁহার ধ্যান করিতে হইবে (৫৬-৫৮)। লেখক বলিয়াছেন যে ওঙ্কার হইল পরমশূন্য (৬৩), সর্পকুলে গরুড়স্বরূপ (৬৪) এবং মন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (৬৫-৬৭)। ওঙ্কারের এই মহিমা কীর্তন করিতে গিয়া লেখক আবার বলিয়াছেন যে অ হইল জাগ্রতের বীজ, উ হইল স্বপ্নের, ম্ হইল সুষুপ্তের এবং ওম্ হইল তুর্যের (৭০) ; ইহাদের স্থান হইল যথাক্রমে নাভিতে, হৃদয়ে, কণ্ঠে এবং শিরে (৭১)। বস্তুতঃ এই ওঙ্কার নৌকারূপে আমাদিগকে সংসার-সমুদ্র পার করিয়া দেয় (৭৪)। এই ওঙ্কারের অগ্নিতে সাধক কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ

এবং মাৎসর্য দমন করিবেন (৭৬)। গুরুর উপদেশেই শিষ্য দুঃখ হইতে পরিত্রান পাইয়া মোক্ষ লাভ করে (৭৭); সুতরাং গুরু হইলেন মহাদেব তুল্য (৮২)। তবে এই মহাজ্ঞান হইল মহাগুহ্য জিনিষ (৮৪)।

এই শ্রেণীর আর একখানি পুস্তকের নাম সঙ্ হ্যঙ্ তত্ত্বজ্ঞান। ইহাতে পঞ্চাশটি অনুচ্ছেদ আছে। ইহা প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত, কিন্তু সংস্কৃত শব্দ বা সংজ্ঞার বাহুল্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভুবনোৎপত্তির কাহিনী লইয়াই এই গ্রন্থের সূচনা; ইহার মূল তত্ত্ব হইল চেতন এবং অচেতন পদার্থ লইয়া। ইহার পর লেখক প্রমাণ, প্রমাণ বিশেষ এবং শুভাশুভকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে আত্মা যে পদে সংস্থিত থাকেন তাহার নাম হইল জাগ্রৎপদ, স্বপ্নপদ, সুষুপ্তপদ, তূর্যপদ, তূর্যান্তপদ বা তূর্যাতীত। এতদ্ব্যতীত আছে বিভিন্ন প্রকারের যোনি(যেমন সাত্ত্বিক, রাজস, তামস প্রভৃতি) যাহা হইতে জীবন উৎসারিত হইতেছে।

জীবনের মূলে রহিয়াছে শুভাশুভ কর্ম; পৃথিবীর বন্ধন এবং সুখদুঃখ হইতে মুক্তি পাইতে হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হয়। ব্রত, তপ, যোগ এবং সমাধির উপরই তত্ত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। আত্মা তূর্যপদে অধিষ্ঠান করে, কিন্তু ভটারের ক্রিয়াশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া আত্মা এই চলমান সংসারে অহংকার, বায়ু এবং নাড়ী দ্বারা স্ফীত হইয়া থাকে। আত্মা এমনিতে অচেতন, কিন্তু সকল জিনিষই দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষায় ইহা ভটার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রধানতত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং চেতনের মত আচরণ করিতে থাকে। এই সক্রিয় আত্মার নাম হইল প্রমাণ। নিষ্ক্রিয় আত্মা তূর্যপদে অবস্থিত থাকে; ইহার নাম হইল সূক্ষ্ম। চেতনাত্মা থাকে জাগ্রৎপদে; ইহাই নিষ্ক্রিয় আত্মার স্থূলরূপ। আত্মা যদি আবার অহংকারের সহিত সম্মিলিত হয় তবে উহা পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত এবং মনের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

সংসারে ভটার সর্বস্থলেই পরিব্যাপ্ত; সুতরাং তিনি সর্ব জীবের জীবন। লেখক বলিয়াছেন যে আত্মা অহংকার দ্বারা পরিচালিত হইলে উহা অস্থির থাকে। বস্তুতঃ যে আত্মা সৎ এবং অসতের পার্থক্য বুঝিতে পারে তাহা তির্যক আত্মা অপেক্ষা মহত্তর। এইরূপ আত্মা চেতন এবং কখনো কখনো শুভকর্মসম্পন্ন হইলেও শাস্ত্রাগম দ্বারা পরিচালিত না হওয়ায় উহা অসম্পূর্ণ থাকে।

লেখক বলিয়াছেন যে ভটার যখন শরীর পরিগ্রহণ করেন, তখন জাগ্রৎপদে এবং তূর্যপদে অবস্থিত আত্মাও দেহ পরিগ্রহণ করে। আত্মার এইরূপ বিভিন্ন অবস্থাপ্রাপ্তি গ্রন্থের বহু স্থল জুড়িয়া রহিয়াছে। অতঃপর বর্ণনা করা হইয়াছে মানুষের জন্মবৃত্তান্ত। আত্মা ভুবনশরীরে বাস করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে এবং ষড় রসের সম্ভোগের ভিতর দিয়া কাম ও রতির সৃষ্টি হয়। মনুষ্যদেহ অণু হইলেও ইহার মধ্যেই বিশালকে (macrocosm) ধারণ করিয়া আছে। ইহার মন হইল শুভাশুভের আধার এবং দশেন্দ্রিয় হইল ইহার যন্ত্র। মুক্তিলাভ করিতে হইলে দশেন্দ্রিয়কে মনে, মনকে প্রমাণে, প্রমাণকে প্রমাণবিশেষে, প্রমাণবিশেষকে ধর্মবিশেষে, ধর্মবিশেষকে অন্তবিশেষে এবং অন্তবিশেষকে অনন্তবিশেষে সংহৃত করিতে হইবে। এইরূপে আত্মা মুক্তিলাভ করে, কিন্তু ইহা প্রয়োগসন্ধি এবং সম্যগ জ্ঞান ব্যতীত সম্ভবপর নহে।

গণপতিতত্ত্ব নামক গ্রন্থখানিও একখানি দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক৩৬ক। ইহাতে ৬০টি সংস্কৃত শ্লোক আছে, উহা অনুষ্টুভ ছন্দে বিরচিত, কিন্তু শ্লোকগুলি অত্যন্ত বিকৃত। সংস্কৃত শ্লোকগুলির পরে আছে প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় ব্যাখ্যা, কিন্তু এই ব্যাখ্যা কখনো কখনো মূলকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। গ্রন্থখানি শৈবদর্শনের অন্তর্ভুক্ত এবং ইহা প্রশ্নোত্তর ছলে রচিত হইয়াছে। প্রশ্ন করিতেছেন গণপতি এবং উত্তর দিতেছেন শিব।

গণপতি পঞ্চ দৈবাত্মার সৃষ্টিকাহিনী জিজ্ঞাসা করিলে শিব বলিলেন যে ওঙ্কার হইতে বিন্দুর উদ্ভব ; বিন্দু হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, আমি (শিব) এবং সদাশিব। সৃষ্টি সম্বন্ধে পুনরায় প্রশ্ন করিলে শিব পুনরায় বলিলেন যে পঞ্চ দৈবত্মা হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের সৃষ্টি, যথা ব্রহ্মা হইতে গন্ধ, বিষ্ণু হইতে স্বাদ, রুদ্র হইতে রূপ, আমা (শিব) হইতে স্পর্শ এবং সদাশিব হইতে শব্দ। এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে আবার ক্ষিত্যপতেজমরুদ্ব্যোমের সৃষ্টি হইয়াছে। গণপতি অতঃপর মানুষের সৃষ্টিকাহিনী জানিতে উৎসুক হইলে শিব বলিলেন যে মানুষও বিন্দু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার রূপায়নে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু দিয়াছেন দেহ, রুদ্র দিয়াছেন চক্ষু, আমি (শিব) দিয়াছি নিঃশ্বাস এবং সদাশিব দিয়াছেন কণ্ঠধ্বনি।

গণপতি অতঃপর দেহ এবং জগতের কোথায় কোথায় দেবতারা বাস করেন জিজ্ঞাসা করিলে শিব বলিলেন যে ব্রহ্মা জগতের দক্ষিণ দিকে বাস করেন, বিষ্ণু উত্তর দিকে, রুদ্র পশ্চিম দিকে, আমি (শিব) পূর্বে এবং সদাশিব কেন্দ্রে। ইহারা যথাক্রমে ক্ষিতি, আপঃ, গ্রহ, বায়ু এবং গগনমণ্ডল রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। দেহের মধ্যে ব্রহ্মার স্থান হইল মূলাধারে, বিষ্ণুর নাভিতে, রুদ্রের হৃদয়ে, আমার (শিবের) কণ্ঠে এবং সদাশিবের জিহ্বাগ্রে। শিব অতঃপর দেহে ইহাদের অবস্থিতি, ইহাদের আকৃতি, রঙ্ প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে দেহের মধ্যেই চন্দ্র, সূর্য, কুবলয় পুষ্প, প্রাণলিঙ্গ প্রভৃতি বিদ্যমান। শিশু জন্মের প্রথম মাসে থাকে ফেনাপুঞ্জ এবং দুগ্ধরূপে। তৃতীয় মাসে উহা পরিণত হয় ডিম্বে, চতুর্থ মাসে শিবলিঙ্গে, পঞ্চমে মায়ারেখায়, ষষ্ঠে অগ্নিতে, সপ্তমে হরিদ্রাবর্ণ শিশুতে ; নবম মাসে ইহার নখ এবং চুল জন্মে। দশম মাসে হয় ইহার পরিণত রূপ। গর্ভাবস্থায় শিব, ওঙ্কার এবং লিঙ্গ বা শুক্র-শোণিত শিশুকে রক্ষা করে। মানুষের মৃত্যুর পর আত্মা জীবে প্রবেশ করে ; জীব প্রবেশ করে নির্বাণে, নির্বাণ শূন্যে এবং শূন্য সূক্ষ্মরূপে। কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে নাভি হইতে ধূমের মত একটি জিনিষ বহির্গত হয় ; ইহাই শিবাত্মা। শিবাত্মা শিবমণ্ডলে প্রবেশ করে ; এখানে চিরসুখ এবং চির-কল্যাণ। আত্মা আবার পাঁচটি, যথা : আত্মা, পরাত্মা, অন্তরাত্মা, নিরাত্মা এবং শূন্যাত্মা। এই পাঁচটি আত্মার মিলনক্ষেত্র হইল শিবাত্মা। আত্মার আবার শ্রেণীবিভাগ আছে ; উহা হইল শ্বাস, নিঃশ্বাস এবং সংযোগ (২)। ইহার পর শিব বর্ণনা করিয়াছেন ষড়যোগ (৩) প্রত্যাহার, ধ্যান, প্রাণায়াম, ধারণ, তর্ক, সমাধি, লোকনাথ, শিবালয়, শিবলিঙ্গ, পরলিঙ্গ, স্বলিঙ্গ বা আত্ম-লিঙ্গ (৪-১৪)। দেবতাদের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে শিব আবার বলিলেন :

অপ্সু দেবো দ্বিজাতীনাম্ ঋষীনাম্ দিবি দেবতা।
শিলাখণ্ডম্ চ লোকানাম্ মুনীনাম্ আত্মৈব দেবতা ॥

এই শ্লোকটি তত্ত্ব সঙ্, হঙ্, মহাজ্ঞান নামক পুস্তকেও আছে। লেখক বলিয়াছেন যে হৃদ্-পদ্মে দেবতাদের অধিষ্ঠান; এইখানেই থাকেন ভটার শিব (১৮)। ত্রিমূর্তির মধ্যে বিষ্ণু থাকেন পশ্চিমে, ব্রহ্মা থাকেন দক্ষিণে এবং মহেশ্বর থাকেন মধ্যে (২১)। শিব থাকেন উপাসকের হৃদয়ে; সেখানে ১৪টি অক্ষরের সুগন্ধ পুষ্প দল মেলিয়া রহিয়াছে। এই চৌদ্দটি অক্ষর হইল: সং বং তং অং ইং নং মং শিং বং যং অং উং মং ওং (২৪)। ইহার পর বলা হইয়াছে যে নিষ্কল হইতে নাদ সমুত্থিত হয়, নাদ হইতে বিন্দু, বিন্দু হইতে চন্দ্র এবং চন্দ্র হইতে বিশ্ব (২৫)। বিশ্বের সঙ্গে চলে চন্দ্র এবং বিন্দুর সঙ্গে নাদ; ইহাদের সম্মিলনে হয় ওঙ্কার (২৬)। ইহার পর লেখক মায়াতত্ত্ব (২৭), পঞ্চব্রহ্ম (২৮-৩১), পঞ্চাক্ষরের অর্থাৎ যং, বং, শিং, মং এবং নং-এর সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলীনাবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন (৩৩)। লেখকের মতে মানুষ মুক্তিলাভ করিলে যে-অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহার বিশেষত্ব হইল 'সকল' বা কেবল-শুদ্ধত্ব প্রাপ্তি; এই প্রকার গুণ, অনুভূতি এবং বিকল্পের বিনাশের পর লোকে যোগী হইয়া থাকে (৪৩)। সদ্‌দ্‌ভ্রান্তি বা ধর্মের পথে লোকে মুক্তি লাভ করে, ব্যদ্‌ভ্রান্তির পথে পুনর্জন্ম (৪৫-৪৭)। লেখক বলিয়াছেন যে আত্মা দ্বাদশাঙ্গুলীর স্থান হইতে মুক্তি লাভান্তে যথাক্রমে পরমশিব, শূন্য এবং পরমশূন্য হইয়া থাকে (৪৮)। ইহার পর আত্মার বিফল, শূন্য এবং কেবল অবস্থার বর্ণনা করিয়া (৪৯), লেখক সকল, সকল-নিষ্কল, নিষ্কল-শূন্য, অতিশূন্য (৫১-৫৩), বীজাক্ষর, পঞ্চকাণ্ড (৫৪-৫৫) প্রভৃতির বর্ণনা করিয়া গণপতি এবং সরস্বতীর নমস্কারান্তে গ্রন্থের শেষ করিয়াছেন।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে গ্রন্থখানি শৈবতান্ত্রিক পরিমণ্ডলের এবং এখানে আলোচিত বিষয়বস্তুর সহিত ভুবনকোষের যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয় গ্রন্থই প্রশ্নোত্তর ছলে রচিত হইয়াছে; দেবতার দেহের মধ্যে বিভিন্ন স্থলে অবস্থিতি, নাদ-বিন্দু তত্ত্ব, বীজাক্ষর তত্ত্ব প্রভৃতি একই প্রকার ধ্যান-ধারণার অভিব্যক্তি সন্দেহ নাই।

প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মতত্ত্বসংক্রান্ত আর একখানি গ্রন্থের নাম হইল চতুর্পক্ষোপদেশ। গ্রন্থের নাম দেখিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক যে গ্রন্থে চারিটি পক্ষ আছে, কিন্তু ইহা বাস্তবিকপক্ষে পাঁচটি পক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা। প্রথম পক্ষের নাম হইল পৃথিবী পক্ষ বা বলি; দ্বিতীয় পক্ষের নাম হইল ভুজঙ্গ বা আপঃপক্ষ; তৃতীয় এবং চতুর্থ পক্ষের নাম হইল যথাক্রমে তেজঃপক্ষ এবং বায়ুপক্ষ বা ত্যাগ; পঞ্চম পক্ষের নাম হইল আকাশ পক্ষ।

গ্রন্থে ঋষিগণকে পাঁচটি সম্প্রদায় বা পক্ষে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং ইহাদের নাম হইয়াছে যথাক্রমে পঞ্চভূতের নামানুযায়ী: পৃথিবী, আপঃ, তেজ, বায়ু, আকাশ (ক্ষিত্যপতেজ-মরুদ্ব্যোম)। গ্রন্থে এই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণ, ব্রত এবং জীবন ধারণের প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। এই সম্প্রদায়গুলির লক্ষ্য হইল স্বর্গ বা মোক্ষলাভ করা অথবা পৃথিবীতে ধনসম্পদশালী এবং সর্বগুণান্বিত হইয়া বাস করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হইল তপ, ব্রত, যোগ, সমাধি, পুণ্য এবং ধর্ম। ঋষিগণের মধ্যে কেহ হইলেন ফলাহারী, কেহ বা মূলাহারী, কেহ সলিলাহারী, কেহ আবার বায়ু-আহারী, কেহ হইলেন নিরাহারী। গ্রন্থে রাগ এবং দ্বেষ বর্জন করিবার জন্য

উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে, কারণ উপরোক্ত পঞ্চশ্রেণীর ঋষি যদি রাগ এবং দ্বেষ দ্বারা অভিভূত হন তাহা হইলে তাহারা, মর্কট, শূকর বাড়বানল, সর্প এবং প্রস্তরতুল্য হইবেন। রিপু হইতে মুক্ত না হইলে কেহ পণ্ডিত হইতে পারেন না; যিনি এই সমস্ত রিপুকে দমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহার নিকট সকল বাসস্থলই সমান। গ্রন্থকার ধর্মের মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য আলোচনা করিলেও বলিয়াছেন যে আত্মা এক এবং ঈশ্বর বিভিন্ন প্রকাশের মধ্য দিয়াও অদ্বিতীয়। কোন লোক বিভিন্ন পরিচ্ছদ পরিধান করিলেও তিনি যেমন একই ব্যক্তি থাকিয়া যান, তেমনি ভগবানও বিভিন্ন লোক ও সম্প্রদায়ের চোখে বিভিন্ন রূপে দেখা দিলেও তাঁহার সনাতন রূপের কোনও পরিবর্তন হয় না। আকাশের সূর্য যেমন সহস্র ভাণ্ডে সহস্র সহস্র রূপে প্রতিফলিত হইয়াও এক এবং অদ্বিতীয় থাকিয়া যান, ভগবানও সেইরূপ। সুতরাং একই ভগবান সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন। গ্রন্থকার বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের বিভিন্ন আচরণবিধি সম্পর্কে বলিয়াছেন যে এইগুলি হইল মানুষের মূল্যবান মণিমুক্তার মত। যাহাদের মূল্যবান মণিমুক্তা আছে তাহারা বলে যে তাহাদের মণিমুক্তাগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহার পর হয়তো এই সমস্ত বহুমূল্যবান দ্রব্যাদি হারাইয়া যায় এবং শুধু শূণ্য রত্নপেটিকাটিই থাকে। বর্তমান ধর্মসম্প্রদায়গুলিও যেন সেইরূপ। তাহাদের মণিমুক্তা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক গৌরব অবলুপ্ত হইয়াছে; তাহারা বাহ্য শুষ্ক আচরণবিধি লইয়াই মত্ত আছে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে এই সকল সম্প্রদায় রাগ এবং দ্বেষের দ্বারা অভিভূত হইয়া এই আধ্যাত্মিক সম্পদ হারাইয়াছে। সুতরাং ইহাদিগকে বাহ্যিক আড়ম্বরে লিপ্ত না হইয়া পুনরায় সেই আধ্যাত্মিক গৌরব অর্জন করিতে হইবে।

গ্রন্থের এই উচ্চ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নাই। গ্রন্থের মধ্যে একেশ্বরবাদের স্বাক্ষর রহিয়াছে। এই একেশ্বরবাদ বহুর মধ্যে একের অভিব্যক্তি, যাহা হিন্দু দর্শনের অন্যতম প্রধান বক্তব্য বিষয়।

শিবঠাকুর দ্বীপময় ভারতের সাহিত্যে যেমন স্থায়ী আসন করিয়া লইয়াছেন, তেমনি তাঁহার স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে ভাস্কর্যে এবং শিলালিপি-তাম্রলেখে। একদা দক্ষিণপূর্ব এসিয়ায় শিবের অসংখ্য উপাসক ছিল। তাঁহাকে আঙ্কোর ভাটের মন্দিরগাত্রের রিলিফে এবং অন্যত্র বিভিন্নরূপে রূপায়িত দেখিতে পাই। চাম-ভাস্কর্যে তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাই দ্বাররক্ষী হিসাবে; সেখানে তিনি শরীরের ভার গদার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন অথবা ভীষণভাবে মুখভঙ্গী করিতেছেন। যবদ্বীপেও আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই বিভিন্নরূপে: কোথাও বা তাঁহার চারিটি বাহু, তিনটি নেত্র, শরীরে নরমুণ্ডের মাল্য দোদুল্যমান; দেহ সর্প-উপবীত বা মেখলায় সুসজ্জিত এবং জটামুকুটে অর্ধচন্দ্র বিরাজমান। ইহা শিবের তান্ত্রিকমূর্তি। অন্যত্র আবার তাঁহাকে দেখিতে পাই শান্তরূপে। তাঁহার মঙ্গলময়রূপে তিনি ভটার গুরু, তাণ্ডবরূপে তাঁহার নাম মহাকাল। তাঁহাকে লিঙ্গরূপেও উপাসনা করা হইত। মহারাজ সঞ্জয়ের চঙ্গল অনুশাসন-লিপি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল[৩৭]। কাম্বোডিয়ার মত এই লিঙ্গমূর্তি কোথাও চতুষ্কোণ, অষ্টকোণ বা দীর্ঘ সুগোল আকৃতির। ইহা সু-অলংকৃত বেদীর উপর সংস্থাপিত হইত এবং লিঙ্গস্নানের ব্যবহৃত পুতবারি অনেক সময় সুন্দররূপে নির্মিত সর্পের মুখবিবর দিয়া নিঃসৃত

হইয়া যাইত। সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই যে যবদ্বীপীয় বিভিন্ন গ্রন্থকার শিব এবং লিঙ্গ উপাসনার কথা বিভিন্ন গ্রন্থে সাড়ম্বরে পরিবেশন করিয়াছেন।

এইবার আমরা যবদ্বীপের বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাহিত্যের দুইখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের আলোচনা করিব। ইহার একখানির নাম হইল সঙ্ হ্যঙ্ কমহাযানন মন্ত্রনয় এবং অপরটি হইল সঙ্ হ্যঙ্ কমহাযানিকন[৩৮]। সঙ্ হ্যঙ্ কমহাযানিকন গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ শৈলেন্দ্র রাজগণের আমলে মধ্য যবদ্বীপে রচিত হইয়াছিল এবং ইহা দশম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে রাজা সিণ্ডোকের আমলে সম্ভরসূর্যাবরণ কর্তৃক সংশোধিত হইয়াছিল। সম্ভরসূর্যাবরণের নামটি একটি পুঁথির মুখচন্দ্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সম্ভরসূর্যাবরণ আরো একখানি গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন ; গ্রন্থখানির নাম হইল সুভূতিতন্ত্র[৩৯]। এই গ্রন্থখানি যবদ্বীপের রাজা কৃতনগরের (১২৬৮-১২৯২) বিশেষ প্রিয় ছিল। অধ্যাপক কার্ণ বলিয়াছেন যে মহাব্যুৎপত্তি গ্রন্থে মহাযান গ্রন্থসমূহের নামের যে তালিকা আছে তাহার মধ্যে সুভূতিতন্ত্রের নাম নাই। যাহাই হউক সুভূতিতন্ত্র যদি সম্ভরসূর্যাবরণের রচনাই হইয়া থাকে তাহা হইলে বলিতে হইবে যে এই গ্রন্থখানি দশম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত যবদ্বীপে বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল ; এমন কি একজন রাজা পর্যন্ত এই গ্রন্থখানির পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন[৪০]। দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থখানি অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। •

পূর্বেই বলিয়াছি যে সঙ্ হ্যঙ্ কমহাযানিকন গ্রন্থখানি যবদ্বীপে রচিত হইয়াছিল এবং উহা পূর্ব যবদ্বীপে রাজা সিণ্ডোকের রাজত্বকালে সংশোধিত রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছিল। ডঃ গোরিস এই গ্রন্থখানির মধ্যে বিভিন্ন যুগের রচনাশৈলী আবিস্কার করিয়া অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহার রচনাশৈলীর এই স্তর-বিন্যাস পণ্ডিতমহলে সাধারণভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। ডঃ গোরিস এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন : "ইহা অসম্ভব নহে যে এই গ্রন্থের প্রাচীনতর অংশ একটি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা স্বরূপে শৈলেন্দ্র যুগে প্রচলিত ছিল। অর্বাচীন অংশ সহ এই গ্রন্থের ক-সংস্করণটি সিণ্ডোকের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল, তবে গ-সংস্করণটি পুনঃসংশোধিত হওয়ায় ইহাকে পূর্ব যবদ্বীপীয় সংস্করণ বলা চলে। ইহা সিণ্ডোকের আমলে অথবা পরে সংশোধিত হইয়াছিল[৪১]। এই গ-সংস্করণটিও হয়তো কোন মৌলিক বৌদ্ধ রচনার শৈবায়ন বা শৈবরূপান্তর হইতে পারে[৪২]। ডঃ গোরিসের অভিমত সত্য হইলে বলিতে হইবে যে সঙ্ হ্যঙ্ কমহাযানিকনের প্রাচীনতম অংশটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যবদ্বীপীয় গ্রন্থখানি (বিরাটপর্ব, ৯৯৬ খৃষ্টাব্দ) অপেক্ষাও প্রায় একশত বৎসরের পূর্বের রচনা হইবে[৪৩]।

আমরা প্রথমে সঙ্ হ্যঙ্ কমহাযানন মন্ত্রানয় গ্রন্থটি আলোচনা করিব। পূর্বে ডঃ ক্রোম[৪৪] প্রমুখ লেখক মনে করিতেন যে মন্ত্রানয় শব্দটি মন্ত্রযান=বজ্রযান=তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম। ডঃ গণ্ডা মনে করেন যে মন্ত্রানয় শব্দের 'আনয়' অংশটুকু 'উপনয়ন' শব্দটির অপভ্রংশ এবং ইহার অর্থ হইল গুরুর নিকট আনয়ন। এই অভিমত কতদূর গ্রহণযোগ্য হইতে পারে বলিতে পারি না, তবে আমি আরো একটি সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করিতে চাই : আমি বলিতে চাই যে মন্ত্রানয় শব্দটি 'মন্ত্রাম্ন্য়' শব্দের যবদ্বীপীয় বিকৃতি হওয়াও অসম্ভব নহে। এই অর্থের সহিত গ্রন্থখানির

বিষয়বস্তুরও যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে ; কারণ এই অর্থ গ্রহণ করিলে গ্রন্থের নামের অর্থ হইবে : সঙ্ ্ হ্যঙ্ ্ কমহাযানিকন (নামক গ্রন্থের) মন্ত্রের অণ্বয় বা ব্যাখ্যা। তবে যবদ্বীপে অকার ও আকারের মধ্যে পার্থক্য না থাকায় মন্ত্রানয় শব্দটি মহাযানের তান্ত্রিকশাখা মন্ত্রনয়কে বুঝাইতেছে বলিয়াই মনে হয়[৪৪ক]।

এই গ্রন্থে ৪২টি সংস্কৃত শ্লোক আছে এবং প্রত্যেকটি সংস্কৃত শ্লোকের পরে পরেই যবদ্বীপীয় ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকগুলি অনুষ্টুভ ছন্দে বিরচিত। ডঃ গণ্ডা অনুমান করিয়াছেন যে লেখক যে-সংস্কৃত গ্রন্থখানিকে তাঁহার আদর্শস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে আরো সংস্কৃত শ্লোক ছিল, কিন্তু গ্রন্থকার তাহার সবগুলি গ্রহণ করেন নাই[৪৫]। যবদ্বীপীয় ব্যাখ্যাটি কেবলমাত্র সংস্কৃত শব্দের অনুবাদ নহে ; উহার মর্মার্থ পরিস্কার রূপে বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার অনেক সময় অতিরিক্ত বিষয়েরও অবতারণা করিয়াছেন। কোথাও আবার তিনি কিছু কিছু সংস্কৃত শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যাখ্যার মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থের সংস্কৃত অংশে ব্যাকরণ এবং ছন্দের ভুল থাকিলেও সংস্কৃত মূল গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ ভারতবর্ষেই রচিত হইয়াছিল[৪৬]।

গ্রন্থকার প্রথমেই বুদ্ধ, ত্র্যক্ষর প্রভৃতিকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটি দিয়া তাঁহার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন :

"এহি বৎস, মহাযানম্ মন্ত্রচর্যানয়ম্[৪৭] বিধিম্
দেশয়িষ্যামি তে সম্যক, ভাজনস্ত্বম্ মহানয়ে।"

গ্রন্থের দ্বিতীয় শ্লোকটির যবদ্বীপীয় টীকায় বলা হইয়াছে যে অতীত বুদ্ধ, যথা বিপশ্যী, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি এবং কাশ্যপ ; অনাগত বুদ্ধ, যথা মৈত্রেয় এবং সমন্তভদ্র ও বর্তমান বুদ্ধ যথা, শাক্যমুনি —ইহারা সকলেই জগতের কল্যাণ কামনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। এই সমস্ত বুদ্ধ পরম মন্ত্রবিধিকে জানিয়া সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন (৩)। গ্রন্থকার অতঃপর বলিয়াছেন যে এই মার্গশ্রেষ্ঠ মহাযানপথে চলিলে বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক সুখ লাভ করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করা যাইবে (৬)। ইহা অস্তি-নাস্তির উর্ধ্বে স্থিত আকাশের মত নির্মল (৭) ; ইহা গম্ভীর, সকল তর্কের মধ্যে অতর্ক্য এবং অনাবিল (৮)। ইহার পর বজ্রোদকের গুণ বর্ণনা করিয়া লেখক শিষ্যকে আশ্বাস দিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্মের নিয়ম পালন করিলেই সিদ্ধিলাভ হইবে (১০), তবে যাঁহারা বজ্র, ঘণ্টা, মুদ্রা ইত্যাদি সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাবান তাঁহারা কখনো উদ্ধারপ্রাপ্ত হইবেন না (১১)। যদি কেহ মণ্ডলকে শ্রদ্ধা বা গৌরবের সহিত দেখেন তাহা হইলে তিনি অবশ্যই বুদ্ধকুলে জন্মলাভ করিবেন (১৪)। ইহার পর যেন আমরা হিন্দুশাস্ত্রের 'জ্ঞানাঞ্জনশলাকার' প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেছি (১৬) :

"অজ্ঞানপটলম্ বৎস অপনীতং জিনৈস্তব
শলাকৈর্বৈদ্যরাজেন্দ্রৈঃ যথালোকস্য তৈমিরম্।"

বুদ্ধ অজ্ঞানপটল অপনোদন করিবেন এবং বজ্রসত্ত্বও হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেন (১৯) ; তখন ধর্মের শংখও সর্বত্র বাজিয়া উঠিবে (২০) এবং বজ্রধরগণ সকলকে রক্ষা করিবেন (২২)। সুতরাং আশঙ্কাশূন্য হইয়া 'কামপঞ্চকং' উপভোগ করাই যুক্তিসংগত (২৩), বস্তুতঃ যিনি 'রহস্যোত্তমমণ্ডলে' প্রবিষ্ট হইবেন তিনি সর্বপাপ হইতে নির্মুক্ত হইবেন (২৬) ; সুতরাং

মহাসুখে অকুতোভয় হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতে বাধা নাই (২৭)। বোধিচিত্ত অত্যাজ্য (২৯); অজ্ঞানতা বা মোহবশে সদ্ধর্মকে পরিত্যাগ করিতে নাই (৩০)। ইহার পরবর্তী শ্লোকে (৩১) বলা হইয়াছে যে তপদ্বারা দেহকে ক্লিষ্ট করা অযৌক্তিক ; বস্তুতঃ 'যথাসুখ'-এ চলিয়া বুদ্ধত্ব অর্জন করাই শ্রেয়ঃ[৪৮]। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে যিনি আচার্য, তিনি 'সর্ববুদ্ধসম' (৩২); তাঁহাকে অবমাননা করিলে নিত্য দুঃখ লাভ হয় (৩৩)। সেইজন্য বজ্রাচার্য মহাগুরুকে কখনো অবমাননা করিতে নাই ; তিনি সর্ববুদ্ধসম (৩৪)। এই সর্ববুদ্ধকে দান করিলে দান অক্ষয় হয় এবং তাহা হইলে পুণ্যসম্ভার ও উত্তম সিদ্ধি লাভ হয় (৩৬)। এই আচার্যকে প্রাণ দ্বারা ভজনা করিতে হইবে, এমন কি পুত্র এবং দারা দ্বারাও ; বৈভব সম্বন্ধে তো কথাই নাই (৩৭)।

যস্মাৎ সুদুর্লভম্ নিত্যম্ কল্পসংখ্যেয়কোটিভিঃ
বুদ্ধত্বং উদ্যোগবতে দদাতীহৈব জন্মনি।

বুদ্ধত্ব লাভ করিতে হইলে কত কল্প-কোটি বৎসর কাটিয়া যায়, কিন্তু আচার্য বা গুরু এই জন্মেই এই বুদ্ধত্ব শিষ্যকে প্রদান করেন (৩৮) ; সুতরাং আজ সকলের সফল জীবন :

অদ্য বঃ সফলম্ জন্ম যৎ অস্মিন্ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ

*   *   *

অদ্য মারম্ বিনির্জিত্য প্রবিষ্টাঃ পরমং পুরম্
প্রাপ্তং অদ্যৈব বুদ্ধত্বং ভবদ্ভির্নাত্র সংশয়ঃ। (৩৯ ও ৪১)

এই গ্রন্থখানিতে বজ্রধরগণের উল্লেখ করা হইয়াছে। ডঃ ষ্টুটেরহাইম মনে করেন যে বরবুদুরের বৌদ্ধগণ এই বজ্রধরসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন[৪৯]।

এইবার আমরা সঙ্ হ্যঙ্ কমহাযানিকম্ গ্রন্থখানির আলোচনা করিব।

সঙ্ হ্যঙ্ কমহাযানিকম্ গ্রন্থখানি যবদ্বীপের বজ্রযানী বৌদ্ধগণের গীতাস্বরূপ। গ্রন্থখানি তাহাদের জন্যই রচিত হইয়াছিল যাঁহারা 'মণ্ডলে আছেন এবং যাঁহারা বিশ্বাসী।' তিনি আরো বলিয়াছেন যে অতীতের এবং ভবিষ্যতের বুদ্ধগণ বজ্রযানে জ্ঞানার্জন করিয়া সর্বজ্ঞ হন এবং এই বজ্রযানের পথই শ্রেষ্ঠ পথ। সুতরাং যবদ্বীপীয় বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের আচরণ এবং বিধি সম্বন্ধে ইহার গুরুত্ব অসামান্য সন্দেহ নাই এবং ক্রোম-ষ্টুটেরহাইম প্রমুখ পণ্ডিতগণ ইহার সাহায্যে বরবুদুরের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত এবং ইহাতে সংস্কৃতের প্রাদুর্ভাব মন্ত্রানয়ের মত সুলভ নহে। যে-স্থলে সংস্কৃত আছে, তাহাও এত অনুন্নত স্তরের যে উল্‌ফ ইহাকে যবদ্বীপীয় গ্রন্থকারের লেখনীপ্রসূত বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

গ্রন্থের আরম্ভে সঙ্ হ্যঙ্ কমহাযানন মন্ত্রানয়ের সুরেই[৫০] বলা হইয়াছে যে দেহের সাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য, কারণ ইহার উপরই সুখ নির্ভর করে, সুখ হইতে মন স্থিতিলাভ করে, ইহা হইতে সমাধি এবং নির্বাণলাভ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়।

জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি হইতে মুক্ত হওয়া। ইহা লাভ করিবার জন্য যেমন তর্ক, ব্যাকরণ, পুরাণ, আগম, সময়কোষ, তন্ত্র প্রভৃতিতে পাণ্ডিত্য অর্জন

করিবার প্রয়োজন নাই, তেমনি আবার আবৃত্তি, নৃত্য, সঙ্গীত প্রভৃতিতেও আসক্ত হইবার প্রয়োজন নাই।

গ্রন্থকার উপদেশ দিয়াছেন যে ষট্-পারমিতাকে অবলম্বন করা সর্বদা শ্রেয়ঃ। ষট্-পারমিতা বা ছয়টি শ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণের মধ্যে আমরা পাইতেছি : (১) দান, (২) শীল, (৩) ক্ষান্তি, (৪) বীর্য, (৫) ধ্যান, (৬) প্রজ্ঞা। প্রথম পারমিতা দান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ইহার স্বরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হইতে পারে ; ইহা খাদ্য এবং পানীয় দান হইতে আরম্ভ করিয়া স্ত্রী-সন্তান এমন কি নিজের দেহের মাংস পর্যন্ত দানও হইতে পারে[৫১]। দ্বিতীয় পারমিতা (শীল) সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ইহার উদ্দেশ্য হইল কায়, মনঃ এবং বাক্য দ্বারা কাহারও অনিষ্ট করা হইতে নিবৃত্ত থাকা। কায়দ্বারা ক্ষতিসাধন করা হইল : জীবহত্যা, যৌন-প্রমোদ, অন্যের জিনিষ পরিগ্রহণ করা এবং মিথ্যা ভাষণ। ক্ষান্তি হইল ক্ষমার নামান্তর। এইপ্রকার মানসিক অবস্থায় লোকে শত্রুমিত্র, উচ্চনীচ প্রভৃতির ভেদাভেদ ভুলিয়া যায়। চতুর্থ পারমিতা হইল বীর্য ; ইহা দ্বারা লোকে দিবারাত্র সকলের কল্যাণে নিযুক্ত থাকেন এবং সদ্‌কার্য করিয়া থাকেন। এই সদ্‌কার্যের তালিকায় আছে ধর্মগ্রন্থ লেখা, দেবতাদের উপাসনা করা, ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন, বৌদ্ধমূর্তি এবং স্তূপ প্রতিষ্ঠা করা, যোগাভ্যাস করা, বুদ্ধ এবং দেবীগণের মূর্তি সমক্ষে মন্ত্রোচ্চারণ করা, সর্ব জীবের কল্যাণকামনায় প্রার্থনা করা। ধ্যান-পারমিতা হইল সর্বজীব ও বস্তুকে নিজের সহিত অভিন্ন রূপে ধারণা করা, সত্যকে অবলম্বন করা এবং সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা। প্রজ্ঞা-পারমিতা সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন :

"যাবন্তি সর্ব বস্তূনি দশদিকসংস্থিতানি চ
তানি শূন্য স্বভাবানি প্রজ্ঞাপারমিতাঃ স্মৃতাঃ।"

কমহাযানন মন্ত্রানয়ে আমরা পড়িয়াছি যে অস্তি-নাস্তির উর্ধ্বে আকাশের মত নির্মল হইল মহাযানপথ। প্রজ্ঞা-পারমিতার উদ্দেশ্য হইল সেই শূন্যকে উপলব্ধি করা। এই শূন্যবাদের হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক প্রশস্তি আমরা পূর্বেও আলোচনা করিয়াছি।

গ্রন্থকার এই ছয়টি পারমিতার সহিত আরো চারটি পারমিতার আলোচনা করিয়াছেন, যথা (১) মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা। ইহার মধ্যে মুদিতার অর্থ হইল আনন্দ এবং উপেক্ষার দ্বারা সমদর্শিতা বুঝাইতেছে। এই ষট্ পারমিতা এবং চতুর্ পারমিতা[৫২] লইয়া দশ-পারমিতা হইল। উপরোক্ত ষট্ পারমিতা বজ্রধাত্বীশ্বরীতে অন্তর্লীন হইয়াছেন। বজ্রধাত্বীশ্বরীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে তিনি প্রজ্ঞাবতী, সুন্দরী এবং স্বামীপরায়ণা। অপর চারিটি পারমিতার সহিত আরো চারিটি দেবী সংশ্লিষ্টা হইয়াছেন, অর্থাৎ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন যথাক্রমে লোচনা, মামকী, পাণ্ডরবাসিনী এবং তারা।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ষট্ পারমিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন বজ্র-ধাত্বীশ্বরী এবং চতুর্ পারমিতার দেবী হইলেন অপর চারিজন।

গ্রন্থকার ইহার পর চারিটি যোগের আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে যোগাচার্য দিঙ নাগের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে[৫৩]। এতদ্ব্যতীত চারিটি ভাবনা এবং চারিটি আর্যসত্যেরও

আলোচনা করা হইয়াছে। উপরোক্ত চারিটি যোগ হইল : ভরাল দেবের[৫৪] (১) আকাশে (২) দেহে (৩) পৃথিবীতে এবং (৪) শূন্যমণ্ডলে অবস্থিতি সম্বন্ধে বিশ্বাস। এই যোগগুলির তান্ত্রিক নাম হইল মূলযোগ, মধ্যযোগ, বসানযোগ এবং অন্তযোগ। এই যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে চারিটি ভাবনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এই ভাবনাগুলি হইল রাগ, দ্বেষ, মোহ এবং ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ। ইহার পর গ্রন্থকার চারিটি আর্যসত্য বা পরম পবিত্র সত্যের কথা বর্ণনা করিয়াছেন; এইগুলি হইল দুঃখ-সত্য বা দুঃখের অস্তিত্ব, নিরোধ-সত্য অর্থাৎ দুঃখের নিরোধ, সমুদয়-সত্য বা দুঃখের সৃষ্টি এবং মার্গ-সত্য বা (মহাযান) পথের সত্য। উপরোক্ত দশ পারমিতা, চারিটি যোগ, চারিটি ভাবনা এবং চারিটি আর্যসত্য অবলম্বন করিয়া সঙ্ হ্যঙ্ কমহাযানিকনে যে তত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা হইল একান্তভাবেই মহাগুহ্য।

গ্রন্থের যে অংশটুকু পরমগুহ্য নামে খ্যাত সেখানে কোন সংস্কৃত শ্লোক নাই, কিন্তু সেখানে প্রাণায়াম, অদ্বয়জ্ঞান, বজ্রজ্ঞান, সপ্তসমাধি প্রভৃতির ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। এই স্থলে পরমদেব ভরালের স্বকীয় দেহ সংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই স্থলের বিবিধ তত্ত্ব মহাযানের যোগাচার বিধি অনুযায়ী সন্নিবেশিত হইয়াছে। কথিত আছে যে অদ্বয়ের সহিত অদ্বয়জ্ঞানের সংযোগ হইতে দিব্যরূপের সৃষ্টি হইয়াছে; ইহা হইতে হইয়াছেন ভটার বুদ্ধ এবং ভটার বুদ্ধ হইতে সৃষ্টিলাভ করিয়াছেন শাক্যমুনি। শাক্যমুনির দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে লোকেশ্বর এবং বামপার্শ্ব হইতে বজ্রপাণি উদ্ভূত হইলেন। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে শাক্যমুনি হইলেন শ্বেতবর্ণ এবং তাঁহার মুদ্রা হইল ধ্বজমুদ্রা, লোকেশ্বর হইলেন রক্তবর্ণ এবং তাঁহার মুদ্রা হইল ধ্যানমুদ্রা, বজ্রপাণি হইলেন নীলবর্ণ এবং তাঁহার মুদ্রা হইল ভূস্পর্শমুদ্রা। এই তিনজন আবার ত্রিরত্ন অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘের সহিত সংশ্লিষ্ট। গ্রন্থকার অতঃপর বলিয়াছেন যে শাক্যমুনি হইতে বৈরোচন সৃষ্ট হইয়াছেন এবং লোকেশ্বর দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অক্ষোভ্য এবং রত্নসম্ভব সৃষ্টি করিয়াছেন। অমিতাভ এবং অমোঘসিদ্ধি উদ্ভূত হইয়াছেন বজ্রপাণি[৫৫] হইতে। এই পাঁচজনকে পঞ্চ তথাগত বা ভটার সর্বজ্ঞান বলা হয়। এই গ্রন্থে বুদ্ধগণকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—

ক) অতীত বুদ্ধ : ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি এবং কাশ্যপ।

খ) অনাগত বুদ্ধ : মৈত্রেয় এবং সমন্তভদ্র।

গ) বর্তমান বুদ্ধ : ইনি হইলেন শাক্যমুনি।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে যেস্থলে মানুষী বুদ্ধগণের উল্লেখ করা হইয়াছে সে স্থলে বিপশ্যী এবং বিশ্বভূর নামোল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু অতীত বুদ্ধগণের তালিকার মধ্যে তাহাদের নাম বিদ্যমান[৫৬]। অনাগত বুদ্ধ সম্বন্ধে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মৈত্রেয় মানুষী বুদ্ধ এবং সমন্তভদ্র ধ্যানী বোধিতত্ত্বের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন[৫৭]।

ইহার পর উক্ত হইয়াছে যে বৈরোচনের শাশ্বতজ্ঞান হইতে ঈশ্বর (শিব), ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর উদ্ভব হইল। ইহা স্বভাবতঃই আমাদিগকে কেলুরক অনুশাসন লিপির দুইটি চরণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় :

"অয়ম স বজ্রধৃক শ্রীমান ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরঃ
সর্বদেবময়ঃ স্বামী মঞ্জুবাক্ ইতি গীয়তে।"

যে পঞ্চ তথাগত সঙ্‌ হ্যঙ্‌ কমহাযানিকনের মধ্যে এত বড় স্থান পরিগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও মঞ্জুশ্রীর উষ্ণীষে এবং চতুর্দিকে বিদ্যমান। সুতরাং কেলুরকের ও সঙ্‌ হ্যঙ্‌ কমহাযানিকনের ধর্ম পরিমণ্ডল বিশেষ বিভিন্ন নহে এবং ইহার মধ্যে দুইটি বিশাল ধর্মের তান্ত্রিক মতবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। যাহাই হউক, গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে বৈরোচনের আদেশানুযায়ী ঈশ্বর, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল সৃষ্টি করিলেন।

ইহার পরে গ্রন্থে কতকগুলি বৌদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বের বিবরণ পরিবেশন করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে পঞ্চ স্কন্ধ হইল: রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান; পঞ্চ বীজাক্ষরের নাম দেওয়া হইয়াছে: ওঁম্, হুম্, ত্রম্, হ্রীঃ, অঃ। ত্রিখল হইল রাগ, দ্বেষ এবং মোহ; ত্রিমলের নাম দেওয়া হইয়াছে: অর্থ, কাম এবং শব্দ। ইহার পর আমরা ত্রিকায়ের নাম পড়িতেছি: কায়, বাক্ এবং চিত্ত; ত্রিপরার্থের নাম হইল: অসিহ্‌ বা প্রেম, পুণ্য এবং ভক্তি। গ্রন্থে পঞ্চ ধাতুর নাম দেওয়া হইয়াছে পৃথ্বী, আপঃ, তেজঃ, বায়ু, আকাশ; পঞ্চরূপস্কন্দ হইল: কলল, অর্বুদ, মন, পেশি এবং প্রশাখ। ইহার পর পঞ্চজ্ঞানের নাম পরিবেশন করা হইয়াছে; ইহা হইল: নিষ্প্রপঞ্চ বা শাশ্‌ব্রত, প্রভাস্বর বা অদর্শন, গ্রাহ্য-গ্রাহকরহিত বা আকাশমত, সর্ব ধর্ম-নৈরাত্ম বা প্রত্যবেক্ষণ এবং কৃত্যানুষ্ঠান জ্ঞান।

গ্রন্থের শেষে পঞ্চ তথাগতের পাঁচটি শক্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ধাত্বীশ্বরী হইলেন বৈরোচনের শক্তি, লোচনা হইলেন অক্ষোভ্যের শক্তি, মামকী হইলেন রত্ন-সম্ভবের শক্তি, পাণ্ডরবাসিনী অমিতাভের এবং তারা অমোঘ সিদ্ধির শক্তি। এই পঞ্চ শক্তির মধ্যে ধাত্বীশ্বরী এবং লোচনা মূলতঃ এক এবং তাঁহারা শাশ্বত জ্ঞানের অধিকারিনী।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে ভারতীয় তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের সহিত সঙ্‌ হ্যঙ্‌ কমহাযানিকনের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বৌদ্ধ ধর্মের যে স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহার সহিত অসঙ্গ-দিঙ্‌নাগ-ধর্মপাল এবং নালন্দা ও পালবাঙ্‌লার তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের গভীর তথ্যানুযায়ী আলোচনা প্রয়োজন। তবে এই বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যেও যে হিন্দু ধর্মের স্বাদ বিদ্যমান তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং ইহা সমসাময়িক ভারতবর্ষ ও যবদ্বীপের তান্ত্রিক ধর্মের সাধারণ লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

পা দ টী কা

১. এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: H. B. Sarkar, Some contributions of India to the ancient civilisation of Indonesia and Malaysia, Chap. IX.

২. Goris, *Theologie* pp. 75, 94-98; Juynboll, *Supplement*, II, p. 261.

৩. Macrocosm and Microcosm.

৪. For a detailed study of Śaivism and its philosophy see Zieseniss, *Studien zur geschichte des Sivaismus in BKI*, 98 (1939), p. 75 ff.

৫. প্রায় সমস্ত যবদ্বীপীয় গ্রন্থের প্রারম্ভেই এই স্বস্তি বচনটি দেখিতে পাওয়া যায় ; কোথাও কোথাও ইহার পূর্বে 'ওম্'-শব্দটি সংযোগ করা থাকে।

৬. এই স্থলে ভট্টারক দ্বারা তন্ত্রশাস্ত্রের শিবকে বুঝাইতেছে। Vide *Tantrāloka*, 16. 256, vol. 10, p. 101.

৭. হিন্দুদের তন্ত্র অনুযায়ী শিবের সপ্তমুখের নাম তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত, বামদেব, ঈশ্বর, নীলকণ্ঠ এবং চৈতন্য। ইহার মধ্যে শেষোক্ত দুইটি দৃষ্টিগোচর হয় না বলিয়া শিবকে সাধারণতঃ পঞ্চবক্ত্র বা পঞ্চানন বলা হয়। মনে হয় যবদ্বীপীয় সাধ্য নামটি ভারতীয় সদ্যোজাত শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। তুলনীয় সুদর্শনা দেবী *Wṛhaspati Tattwa*, Notes p. 94 f.n.

৮. Ed. Sudarshana Devi, *Wṛhaspati Tattwa*, pp. 39, 78.

৯. দ্রষ্টব্য শৈবসিদ্ধান্ত, দশকার্যানি।

১০. প্রাচীন মিশরের 'Chapters of Coming Forth by Day' বা Book of the Dead নামক সুপরিচিত গ্রন্থে সমপর্যায়ের ভাব পরিলক্ষিত হয় :

"I am prince in the field,
I am Osiris,
I am Horus and Ra,
One with Osiris—"

Mark van Doren, *An Anthology of World Poetry*, p. 206.

১১. শিবজ্ঞানসিদ্ধিয়ার, সূত্র ১।৩৬।

১২. Goris, *op. cit.*, p. 84.

১৩. কাশ্মিরী শৈবাগম বা তর্কসিদ্ধান্তে পতি, পশু এবং পাশ-এর যে স্থান, দক্ষিণ ভারতের তান্ত্রিক সাহিত্যে বিন্দু, শক্তি এবং শিবেরও সেইরূপ উচ্চ স্থান। এই বিন্দুকে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে :

"জায়তেঽধ্বা যতঃ শুদ্ধো বর্ততে যত্র লীয়তে
স বিন্দু পরনাদাখ্যো নাদবিন্দ্বণুকারণম্।"

ভারতবর্ষের অনেক তন্ত্রশাস্ত্রে এই বিন্দুর উল্লেখ আছে। প্রপঞ্চসার অনুযায়ী ইহার তিনটি স্বরূপ আছে, যথা : স্থূল, সূক্ষ্ম এবং পর। তন্ত্র সাহিত্যে ইহাদিগকে সাধারণতঃ বিন্দু, নাদ ও বীজ নামে আখ্যাত করা হয়। এই নাদ-বিন্দু তত্ত্ব বা দর্শন যবদ্বীপ এবং ভারতবর্ষের তান্ত্রিকগণের নিকট সুপরিচিত ছিল এবং ইহা ইন্দো-যবদ্বীপীয় গ্রন্থের বিভিন্ন স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। বলিদ্বীপে আবিষ্কৃত বুদ্ধবেদের মধ্যে (Levi, *Sanskrit Texts from Bali*, p. 83) আমরা পড়িতেছি :

"মহাদেবোঽর্ধচন্দ্রশ্চ বিন্দুশ্চৈব সদাশিবঃ
নাদমূলে স্থিতো দেবঃ শূন্যশ্চ পরমঃ শিবঃ।"

১৪. তুলনীয় :

"অকারস্তথ ভূর্লোক উকারো ভুব উচ্যতে
সব্যঞ্জনোঙ্কারশ্চ স্বর্লোকশ্চ বিধীয়তে।" ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ১৯।৯

১৫. তুলনীয় কঠোপনিষদ্, ১।১৮।

১৬. দ্রষ্টব্য : Goris, *op. cit.*, pp. 96 ff.

১৭. দ্রষ্টব্য : ব্রহ্মজালসুত্ত। Vide Rhys Davids, *Dialogues of the Buddha*, vol. II, p. 54 ; সামঞ্‌ঞ-ফল সুত্ত, ঐ পৃঃ ৯৩।

১৮. Levi, *Sanskrit Texts from Bali*, p. 73.

১৯. Ed. Sudarshana Devi, *Wṛhaspati Tattwa*, pp. 8-11.

২০. নিষ্কল-অবস্থার সংজ্ঞা বৃহস্পতিতত্ত্বে দেওয়া হইয়াছে। ইহা পরে বর্ণিত হইবে।

২১. Goris, *op. cit.*, p. 74.

২২. *Meded. Kirtya Liefrinck van der Tuuk*, afl. 4 (1935), p. 86.

২৩. শৈব এবং পাশুপত সম্প্রদায় সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য : Bhandarkar, *Vaiṣṇavism, Śaivism and minor religious systems* (collected works) pp. 165 ff. ডঃ গোরিস বিভিন্ন প্রাচীন যবদ্বীপীয় পুঁথি আলোচনা করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। উহাতে নিম্নলিখিত সম্প্রদায়গুলির নাম পরিবেশন করা হইয়াছে, যথা : (১) শৈব বা সিদ্ধান্ত (বিকৃতি : সিদন্ত, শ্রিদন্ত) ; ইহাকে কোন কোন সময় শৈবসিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্তশৈব বলা হয় ; (২) পাশুপত (৩) ভৈরব (৪) বৈষ্ণব (৫) বৌদ্ধ বা সৌগত (৬) ব্রাহ্মণ (৭) ঋষি (Goris, *Theologie*, pp. 101-4)। ইহার সহিত সম্ভবতঃ অলেপক বা লেপক, সোর বা সৌর এবং যোগিত সম্প্রদায়ের নাম সংযুক্ত করিতে হইবে। Vide Majumdar, *Suvarṇadvipa* II, p. 132. পূর্বাদিগমের মধ্যে আরো কয়েকটি নূতন নাম পাইতেছি, যথা : চানক, রত্নহর, শম্ভু, শিবপক্ষ (Juynboll, *supplement*, dl. II).

২৪. এই কাহিনীটি সিংহল, বর্মা, কম্বোডিয়াতেও প্রচলিত ছিল। দ্রষ্টব্য : Sudarshana Devi, *op. cit.*, pp. 32-47.

২৫. ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, যশা অলম্বুষা, কুহূ, শঙ্খিনী।

২৬. প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়।

২৭. নিষ্কল সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য : Sudarshana Devi, *op. cit.*, Notes p. 278.

২৮. Sudarshana Devi, *op. cit.*, Notes pp. 282-3. সুদর্শনা দেবী এইস্থলে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস তৃতীয় খণ্ড (p. 27) হইতে জয়াখ্য সংহিতার একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন : "তিনি অনাদি এবং অসীম এবং তাঁহাকে সৎ বা অসৎ (ন সৎ তন্নাসদ্ উচ্যতে) রূপে বর্ণনা করা যায় না।...তিনি সর্বত্র বিদ্যমান কিন্তু তবুও তাঁহাকে অসৎ বলা হয় কারণ তাঁহাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন করা যায় না...সমস্ত জিনিসই তাঁহার সত্তায় বিদ্যমান এবং সময় বা স্থান দ্বারা তিনি সীমিত নহেন।...কাষ্ঠের অগ্নি এবং দুগ্ধের ননীর মতই তাঁহার সর্বব্যাপী অস্তিত্ব অবর্ণনীয় এবং অপরিমেয়। একমাত্র সাক্ষাৎ অনুভূতি (intuition) দ্বারাই তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়। কাষ্ঠখণ্ড যেমন অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া বিলীন হয়, নদী যেমন মহাসাগরে বিলীন হয়, সেইরূপ যোগিগণও ভগবানের সারবস্তুতে (essence) প্রবেশ করেন।

২৯. ছান্দোগ্যোপনিষদ, ৭।১২।২।

৩০. ইহাদের নাম : অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, সত্য, অব্যবহারিক, অস্তেয়। শ্লোকান্তরে ইহাদের নাম পাইতেছি : অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, শুদ্ধি, আহার-লাঘব, অস্তেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দশটি যমের নামও পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য : Kane, *History of Dharma Sastras*, IV, pp. 121, 124 ; Sharada Rani, *Ślokāntara*, Notes pp. 89 ff. S. Levi তাঁহার *Sanskrit Texts from Bali* নামক গ্রন্থের ১০৯ পৃষ্ঠায় দশটি যম এবং দশটি নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সংজ্ঞায় সাধারণতঃ আমরা পাই : তপ, ব্রত, যোগ, সমাধি, শান্ত, সম্মত, মৈত্রি, করুণ-করুণী, মুদিত, তোবেক্ষা (*KBWdb*, II, 435, s. v. দশশীল)। শ্লোকান্তরে ইহার নাম হইল দশপরমার্থ, যথা : তপঃ, ব্রত, সমাধি, শান্ত, সম্মত, করুণা, করুণী, উপেক্ষা, মুদিত, মৈত্রী। See also Sudarshana Devi, *Wṛhaspati Tattwa*, Notes pp. 348-57.

৩১. পৃথিবী, আপঃ, তেজ, বায়ু, আকাশ, বুদ্ধি, মনঃ।

৩২. ঘ্রাতা, রসয়িতা, দ্রষ্টা, স্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা।

৩৩. শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সংকল্প, বুদ্ধি।

৩৪. এইখানি এবং ইহার পরে উল্লিখিত গ্রন্থখানি শ্রীমতী সুদর্শনা দেবী সিংহল কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে (১৯৬২)। প্রকাশক International Academy of Indian Culture, New Delhi.

৩৫. বৌদ্ধ গান ও দোহা ; চর্যাপদগুলির পাঠ সংস্কার ও ব্যাখ্যা, পৃঃ ২॥।

৩৬. বন্ধনীর অন্তর্বর্তী সংখ্যাগুলি শ্লোকসংখ্যা।

৩৬ ক. সম্পাদিকা সুদর্শনা দেবী সিংঘল, প্রকাশক International Academy of Indian Culture, New Delhi.

৩৭. Latest edition by H. B. Sarkar, *JAS-L* 1959 pp. 183 ff.

৩৮. এই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য : J. Kats, *Sang Hyang Kamahāyānikan, Oudjavaansche Tekst met inleiding, Vertaling, aanteekeningen*, the Hague, 1910. Re-edited and translated by K. Wulff, *Sang Hyang Kamahayanan Mantranaya*, Copenhagen, 1935.

৩৯. এই সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Goris, *Theologie*, p. 156 ; Krom, *Geschiedenis*, pp. 219-20.

৪০. বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদের বিকাশের জন্য দ্রষ্টব্য : Waddell, *Lamaism*, pp. 129 ff. এই সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ আছে।

৪১. Goris, *Theologie*, pp. 151 ff. See also Wulff, *op. cit.*, pp. 9-10.

৪২. Goris, *Ibid*, p. 155.

৪৩. Wulff, *op. cit.*, p. 10.

৪৪. *Ibid*, p. 8 ; Krom, *Inleiding* (1920) p. 305.

৪৪ ক. বজ্রযান, সহজযান এবং কালচক্রযানের দার্শনিক পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল যোগাচার এবং মাধ্যমিক দর্শন। এই শ্রেণীর তান্ত্রিক মতবাদের গূঢ় অংশ সাধারণতঃ মন্ত্রনয় নামে পরিচিত ছিল। দ্রষ্টব্য : H. B. Sarkar, *Evolution of the Śiva-Buddha cult in Java* in *JIH*, XLV (1967) pp. 637, specially p. 642.

৪৫. Gonda, *Sanskrit in Indonesia*, p. 112.

৪৬. Gonda, *op. cit.*, p. 113.

৪৭. পুঁথিতে লিখিত আছে : °বার্য। দ্রষ্টব্য Wulff, *op. cit.*, p. 16 f.n. 1.

৪৮. এই শ্লোকের Wulff ধৃত পাঠ হইল : তপোভির্নাথ পীড়য়েৎ। ইহা সম্ভবতঃ "তপোভির্নাতি পীড়য়েৎ" হইবে।

৪৯. Vide Stutterheim, *Studies in Indonesian Archaeology* (1956) p. 54.

৫০. শ্লোক ২৩, ২৭, ৩১ ইত্যাদি।

৫১. নিজ দেহের মাংসদানের কাহিনীতে মহাভারতের শিবি উপাখ্যান এবং জাতকমালার শিবিজাতকের কথা স্মরণ হয়।

৫২. এই চারি পারমিতা শ্লোকান্তরেও উল্লিখিত হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : Sharada Rani, *Ślokāntara*, pp. 345-50.

৫৩. এই দিঙ্‌নাগ সম্ভবতঃ অসঙ্গের (ষষ্ঠ শতাব্দী) শিষ্য এবং নালন্দার বিখ্যাত আচার্য ধর্মপালের গুরু ছিলেন। ধর্মপাল জীবনের শেষ কয়েক বৎসর সুবর্ণদ্বীপে কাটাইয়াছিলেন। সুতরাং ইহাদের সহিত সঙ্‌ হ্যঙ্‌ কমহাযানিকনের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা এবং থাকিলে তাহা কি প্রকারের ছিল তাহা অনুসন্ধান করা কর্তব্য।

৫৪. এই ভরালদেবকে অবলম্বন করিয়া ঐরলঙ্গের যুগের তান্ত্রিক ঋষি ভড়ঢ় কল্পিত হইয়াছেন কিনা তাহা বিবেচ্য। সম্ভবতঃ ঐরলঙ্গের রাজ্য বিভক্ত করার ব্যাপারকে অলঙ্ঘ্য, অপরিবর্তনীয় এবং ইতিহাসমূলক করার জন্য এই তান্ত্রিক দেবতা ভরাল দেবকে পরবর্তী যুগের কিম্বদন্তীতে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। দ্রষ্টব্য: নাগরকৃতাগম, সর্গ ৬৮।২-৪।

৫৫. Cf. Waddell, *Lamaism*, the table on p. 336.

৫৬. *Ibid*, pp. 346, 350 ; Cf. Juynboll in *BKI*, 7th series VI, p. 58.

৫৭. Cf. Juynboll, *op. cit.*

অ ষ্ট ম অ ধ্যা য়

আগম বা ধর্মশাস্ত্র

ক. নীতিকাহিনী

আমরা এই অধ্যায়ে জাভা এবং বলিদ্বীপের (ক) নীতিকাহিনী (খ) নীতিশাস্ত্র বা তুতুর এবং (গ) স্মৃতিশাস্ত্র আলোচনা করিব। বৃহত্তর পটভূমিকায় বিচার করিলে নীতিকাহিনী এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, কারণ নীতিশাস্ত্রে যে মূলসূত্রগুলি আলোচিত তাহারই দৃষ্টান্ত নীতিকাহিনীতে পরিবেশিত হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে আবার জীবনচরণের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু উহাও ধর্মের রাখিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ প্রাচীন যুগের জীবন ধর্মের নাগপাশে এরূপ আবদ্ধ ছিল যে নীতিকাহিনী, নীতিশাস্ত্র এবং স্মৃতিগ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে কল্পনা করা দুরুহ। সুতরাং আমরা এই তিন শ্রেণীর গ্রন্থকেই বর্তমান আলোচনা-চক্রের অন্তর্ভুক্ত করিলাম।

প্রশ্ন হইতে পারে আলোচ্য আগমশাস্ত্রের সংজ্ঞা কি? সংস্কৃতে আগম শব্দের অর্থ হইল ঐতিহ্যমূলক বা প্রাচীন যুগাগত নীতি, কিংবা ধর্মমত, নীতিসমষ্টি ইত্যাদি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে যাহা কিছু প্রাচীন যুগাগত এবং ঐতিহ্যের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ তাহাই আগম নামে খ্যাত হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, শিব এবং শক্তিকে অবলম্বন করিয়া যে তান্ত্রিক শৈব-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাও আগম শাস্ত্র। প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত বৃহস্পতিতত্ত্বে আমরা পড়িতেছি (পৃঃ ৪৪): আগম ঙরন্য ইকঙ্ অজি ইনুপপত্যান দে সঙ্ গুরু। যেক আগম ঙরন্য। অর্থাৎ আগমের অর্থ হইল গুরু প্রদত্ত উপদেশাবলী। প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষাতে এই শব্দটি ব্যাপকতর অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। সেখানে এই শব্দ দ্বারা লৌকিক আইন বা ধর্মশাস্ত্র এবং নৈতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য প্রভৃতিকে বুঝাইয়াছে। ইহার ধর্মীয় বা নৈতিক গৌরব বুঝাইবার জন্য ইহার নামের পূর্বে সঙ্ হ্যঙ্ সংযোজিত হইয়াছে।

সুতরাং ভারতবর্ষ এবং জাভা বলিদ্বীপের ঐতিহ্যানুযায়ী আমরা এই সাহিত্যশাখাকে সচ্ছন্দে আগম নামে অভিহিত করিতে পারি। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমরা নীতিকাহিনী আলোচনা করিব।

কুঞ্জরকর্ণের কাহিনীটি নীতিমূলক। এই গ্রন্থে ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচন উপমা দিয়া ধর্মের

মর্মবানী যক্ষ কুঞ্জরকর্ণকে বুঝাইয়া দিতেছেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ডঃ কার্ণ এই কাহিনীটির অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সি. এম প্লাইতেও ইহার আলোচনা করিয়াছিলেন[১]। ইহাতে আমরা পড়িতেছি যে কোন এক যক্ষ পরবর্তী জন্মে উচ্চতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য বৈরোচনের নিকট ধর্ম এবং বিনয় সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। বৈরোচন তখন বোধিচিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন। বৈরোচন তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে প্রথমে যমরাজের নিকটে যাইয়া পাপীগণ কিরূপে শাস্তিভোগ করে তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। সুতরাং কুঞ্জরকর্ণ নরকে গমন করিয়া "আত্মার অন্য দেহে গমন" সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিলেন। কোন কোন দিক দিয়া কুঞ্জরকর্ণ এইস্থলে কঠোপনিষদের নচিকেতার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন[২], যদিও ধর্মতত্ত্বের বিশ্লেষণের দিক দিয়া আলোচ্য উপনিষদের স্থান কুঞ্জরকর্ণ অপেক্ষা উচ্চে। আত্মা অবিনশ্বর ইহা এই গ্রন্থের মূল সুর এবং গ্রন্থের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্ব বা দর্শন আলোচিত হইয়াছে। যমরাজ ধর্ম সম্বন্ধে দীর্ঘ উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন যে নরকে এইবার একজন জঘন্য পাপী আগমন করিবে। কুঞ্জরকর্ণ অবাক বিস্ময়ে শুনিলেন যে সে তাহার পুরতন বন্ধু বিদ্যাধর পুর্ণবিজয়।

কুঞ্জরকর্ণ তৎক্ষণাৎ যমের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পুর্ণবিজয়ের গৃহে গমন করিলেন। পুর্ণবিজয় তখন গভীর নিদ্রামগ্ন ছিলেন, তাঁহার পত্নী কুসুমগন্ধবতী তাঁহার গৃহের দ্বার খুলিলেন। অতিথির আগ্রহাতিশয্যে কুসুম গন্ধবতী তাঁহার স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করিলেন; পুর্ণবিজয় হতবুদ্ধি হইয়া নরকে তাঁহার কি অবস্থা হইবে তাহার বিবরণ শুনিলেন। পুর্ণবিজয় তাঁহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল হইলেন এবং তিনি ইহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে সংকল্প করিলেন। সুতরাং তিনি বৈরোচনের আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন; কুঞ্জরকর্ণও তাঁহাকে বৈরোচনের নিকট লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন। অতঃপর তাহারা উভয়ে বৈরোচনের নিকট গমন করিলেন। কুঞ্জরকর্ণ তাঁহার নিকট বলিলেন যে তিনি যমলোকের শিক্ষা পাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন এবং তিনি এক্ষণে আত্মশুদ্ধি এবং মুক্তির অভিলাষী। কুঞ্জরকর্ণ অবশ্য তাঁহার হতভাগ্য বন্ধু পুর্ণবিজয়ের কথা ভুলিলেন না।

বৈরোচন ধ্যানভঙ্গ করিয়া কুঞ্জরকর্ণকে দর্শন এবং ন্যায়নীতি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন। ইহাতে তাঁহার যক্ষাকৃতির বিলুপ্তি ঘটিল। পুর্ণবিজয়ও তখন বৈরোচনের পদতলে বসিয়া ধর্মশিক্ষা করিতে লাগিলেন। বৈরোচনের শিক্ষায় তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল, কিন্তু তাঁহার ললাটের লিপি খণ্ডিত হইল না। সুতরাং তিনি বৈরোচনের নিকট প্রার্থনা করিলেন যাহাতে তাঁহার নরকের কষ্ট অনেকটা লাঘব হয়। বৈরোচন তাঁহাকে সেই বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করিলেন; তখন তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন এবং বৈরোচনের নির্দেশানুযায়ী ধর্মকার্যে মনোনিবেশ করিলেন। এইরূপ ভাবে আত্মশুদ্ধি করিয়া পুর্ণবিজয় তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন যে তিনি এইবার মৃত্যু সমাধিতে নিমগ্ন হইবেন এবং একাদশতম দিবসে তাঁহার আত্মা নরকযন্ত্রনা ভোগ করিয়া আবার দেহে প্রবেশ

করিবে। নরকে থাকিবার সময় যখন তাঁহার আত্মা একটি তপ্ত কটাহে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল তখন একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটিল। কটাহ স্থলে একটি সুন্দর কল্পতরু জন্মিল, উহার শাখা-গুলি পুষ্পিত সরোবরের উপর দুলিতে লাগিল। পুর্ণবিজয়ের দেহেরও পরিবর্তন ঘটিল; মনে হইল যেন তাঁহার আত্মা দৈবীভাবে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল।

যম আশ্চর্য হইয়া পুর্ণবিজয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই সমস্ত বিস্ময়কর ঘটনার অর্থ কী। পুর্ণবিজয় বলিল যে ইহা বৈরোচনের আশীর্বাদেই সম্ভব হইয়াছে; যম পুর্ণবিজয়ের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নরকবাসের মেয়াদ শেষ করিয়া দিলেন। পুর্ণবিজয় একাদশতম দিবসে নিজের শবদেহে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে সমস্ত বিদ্যাধর এবং বিদ্যাধরিগণকে আমন্ত্রণ জানাইতে বলিলেন; তাঁহারা বৈরোচনের গুণগান এবং স্তবস্তুতি করিবেন। বৈরোচন ইত্যবসরে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন; সেখানে ইন্দ্র এবং যম বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা এইবার অবাক হইয়া বৈরোচনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পুর্ণবিজয়কে একশত বৎসরের জন্য দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছিল, সে কিরূপে এত শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিল! বৈরোচন তখন আনুপুর্বিক ঘটনা বিবৃত করিলেন এবং বলিলেন যে পুর্ণবিজয় এবং কুঞ্জরকর্ণ পুর্বজন্মে মুলধর এবং কীর্ণগত নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা উৎসাহধর্ম নামে একজনের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করিতেন। ভুবনতত্ত্ব পরিচয়[৩] নামক গ্রন্থে তাঁহাদের পুর্বজন্মের কাহিনী এবং অন্যান্য বিবরণ সন্নিবেশিত করা গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে মুলধরের স্ত্রীর নাম কুঞ্জরকর্ণ প্রদত্ত হয় নাই, ভুবনতত্ত্ব পরিচয়ে তাঁহার নাম সুমলিনী। কুঞ্জরকর্ণের কাহিনীতে উৎসাহধর্মের স্ত্রীর নাম সুধর্ম, ভুবনতত্ত্ব পরিচয়ে তাঁহার নাম সুধর্মিকা। কীর্ণগতের নামও শেষোক্ত গ্রন্থে কর্ণগোত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।

এই সমস্ত লোকের অতীত জীবন বিবৃত করিয়া বৈরোচন নিজের স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। এদিকে পুর্ণবিজয় তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন যে তিনি দ্বাদশ বৎসরের জন্য তপশ্চর্যা করিবেন। তিনি এইজন্য মহামেরুতে গমন করিলে সেখানে তাঁহার বন্ধু কুঞ্জরকর্ণকে দেখিতে পাইলেন। তখন উভয়ে সেইস্থলে আশ্রম নির্মাণ করিয়া কঠোর তপশ্চর্যায় ব্রতী হইলেন এবং দ্বাদশ বৎসর পর বৈরোচনের অনুগ্রহে সিদ্ধ হইলেন এবং সিদ্ধ-স্বর্গে গমন করিলেন। ইহাই সংক্ষেপে কুঞ্জরকর্ণের কাহিনী।

এই গ্রন্থে যে বিশ্বাসের উপর গুরুত্ব স্থাপন করা হইয়াছে তাহা হইল আত্মার দেহান্তর আশ্রয়। পুর্বজন্মের কর্মফলানুযায়ী ভবিষ্যৎ জীবনের নিয়ন্ত্রণ এবং সমাধি ও তপস্যার ফলস্বরূপ মুক্তিলাভ। দ্বাদশ বৎসরের জন্য তপশ্চরণ ভারতীয় সাহিত্যের অনেক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। এই বিশেষত্বগুলি হিন্দু দর্শনের মধ্যে গুরুত্বপুর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে; হিন্দু দেবদেবিগণের আবির্ভাব এই পটভূমিকাকে আরো সুপরিস্ফুট করিয়াছে। ভারতবর্ষ এবং জাভা-বলিদ্বীপে হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মে যে সামঞ্জস্য সাধনের পালা চলিয়াছিল ইহা তাহারই প্রভাবের পরি-চায়ক। গ্রন্থখানির কাহিনীভাগ মহাযান বৌদ্ধধর্মের মহিমায় মুখর; ইহার ধর্মমত এবং নীতি গল্পচ্ছলে এবং অন্যান্য উপায়ে গ্রন্থের বিভিন্ন স্থলে পরিবেশিত হইয়াছে[৪]।

ডঃ কর্ণ অনুমান করিয়াছেন যে কুঞ্জরকর্ণের রচনাকাল দ্বাদশ শতাব্দী। ডঃ য়ুইনবল মনে করেন যে কোরবাশ্রম, আশ্রমবাসপর্ব এবং কুঞ্জরকর্ণ চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা[৫]। এই তিনখানি গ্রন্থে কয়েকটি interjection ব্যবহৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে কুঞ্জরকর্ণে "সেগ্ লেস্ রেপ্" ব্যবহৃত হইয়াছে। এই চিহ্নটি সমসাময়িক সুন্দ সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। সুতরাং কেহ কেহ বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থগুলি পশ্চিম যবদ্বীপেও রচিত হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে ডঃ কর্ণ কর্তৃক ব্যবহৃত কুঞ্জরকর্ণের সর্বপ্রাচীন পুঁথি পশ্চিম যবদ্বীপ হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। Coedes ইহাকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা হিসাবে পরিগ্রহণ করিয়াছেন[৬]।

এই নীতিকাহিনী পর্যায়ের আরেকখানি গ্রন্থ হইল পলুটুক। এই গ্রন্থে স্পু লুটুক এবং অহস্কর একটি মৃত আত্মার ভাগ্য সম্বন্ধে কথোপকথন করিয়াছেন। নীতিব্রত[৭] গ্রন্থখানিও নামের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নীতিমূলক একখানি রচনা। ইহার ভাষা প্রাচীন যবদ্বীপীয়, কিন্তু লেখার রীতিটি প্রাঞ্জল নহে। এই গ্রন্থে চিপ্তবরণ এবং বলকুলের মধ্যে কথোপকথনের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। নীতিকাহিনী পরিচয়ের আর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল রণযজ্ঞ[৮]। ইহার স্থলে স্থলে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই আমরা পড়িতেছি : অবিঘ্নম্ অস্তু। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে লোক কিরূপভাবে নিহত হইলে কোন স্বর্গে গমন করিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হইয়াছে কেহ শরাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তিনি বায়ুলোকে গমন করিবেন। এই গ্রন্থে রণক্ষেত্রকে একটি বিরাট যজ্ঞকুণ্ডরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে ; এই যজ্ঞকুণ্ডে যেন নরদেহ আহুতিস্বরূপ প্রদত্ত হইতেছে। এই কল্পনাটুকু ব্রাহ্মণ্যধর্মের যজ্ঞাহুতি হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি মন্ত্রও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

খ. নীতিশাস্ত্র বা তুতুর

রাজপতি গুণ্ডল নামক গ্রন্থখানি[৯] আমরা নীতিশাস্ত্রের পর্যায়ে আলোচনা করিতে পারি। ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয় ধর্ম-মণ্ডলের বিধানাবলী ; সুতরাং ইহা এক হিসাবে ধর্ম-সংক্রান্ত আচরণবিধি। প্রাচীন যুগের ভারতবর্ষ ও জাভা-বলিদ্বীপে আইনশাস্ত্র এবং ধর্মের মধ্যে নিগূঢ় বন্ধন ছিল। বস্তুতঃ একটিকে বাদ দিয়া অপরটি চিন্তা করা অসম্ভব ছিল। রাজপতি-গুণ্ডলটি সেই হিসাবে নীতিশাস্ত্র বা তুতুরের পর্যায়ে পড়ে না। ইহার প্রবক্তাও শিব-ঠাকুর নহেন। তবুও ইহার মধ্যে ধর্ম-সংক্রান্ত বিধি-বিধান লিপিবদ্ধ হওয়ায় এবং দেবশাসনের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করায় আমরা ইহার সম্বন্ধে এই স্থলেই আলোচনা করিতেছি। বস্তুতঃ গ্রন্থের একস্থলে বলা হইয়াছে :

"লোকে যদি উন্নতি করিতে চাহে তাহা হইলে তাহাদের স্ব স্ব 'ভুক্তি'-র (আইনগত

ব্যবস্থা) সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে : তাহারা তাহাদের স্ব স্ব কেগুঙ্গ-সেঙ্কের বা বিধানাবলী সম্বন্ধে মনোযোগী হইবে।"

গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে রাজা ভতডি ইহার গ্রন্থকার এবং গ্রন্থের শেষাংশে বলা হইয়াছে যে ভতডি এবং রাজা কৃতনগর একই ব্যক্তি :

"ইতি সঙ্গ হ্যঙ্গ রাজপতিগুণ্ডল, চিনন্দি লবন দেবশাসনা, পঙ্গরয়নি সঙ্ রতু রিঙ্গ ঙ্গলবস, শ্রী ভতডি, আপসেঙ্গহন শ্রী কৃথনগর" অর্থাৎ ইহা হইল পবিত্র রাজপতিগুণ্ডল ; ইহা দেবশাসনের সহিত সংযুক্ত হইল। এই রচনা প্রাচীনকালের রাজা শ্রী ভতডি স্বনামধন্য শ্রী কৃতনগরের। সম্ভবতঃ ভতডি নামটি রাজা কৃতনগরের স্বদেশী ডাক-নাম ছিল। উপরোক্ত উক্তি সত্য হইলে ইহা মনে করা স্বাভাবিক যে এই গ্রন্থখানির মূল নীতিগুলি রাজা কৃতনগরের (১২৬৮-৯২ খৃঃ) সময়ে প্রবর্তিত হইয়াছিল।

গ্রন্থারম্ভে আমরা পড়িতেছি :

"॥ ওম ॥ বিঘ্নম্ অস্তু ॥ ওম্ ॥ ওম্ আদিত্যাহ্ নমঃ স্বাহা, ওম্, সিদ্ধ্য ত্রিগ দেবয় নম স্বাহা।" একটু পরেই আবার বলা হইয়াছে "ওম্ উমা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু।" রাজা যে পবিত্র মণ্ডলকে দান করিলেন সেই পবিত্র মণ্ডলটির নামই রাজপতিগুণ্ডল। এই গ্রন্থের প্রথমদিকে যোগীশ্বর এবং দেবগুরু হইতে কাহারা অধিকারী তাহার বিশদ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। যবদ্বীপের এবং দ্বীপান্তরাগত ব্রাহ্মণ পুত্রগণকে বঙ্ বঙ্-নামে খ্যাত করা হইয়াছে। গ্রন্থে আরো আমরা পড়িতেছি যে "শৈবমতাবলম্বীর পুত্র শৈব হইবে, বৌদ্ধের পুত্র বৌদ্ধ হইবে, রাজার পুত্র রাজা হইবে, মন্নর (সাধারণ লোক) পুত্র মন্ন হইবে, শূদ্রের পুত্র শূদ্র হইবে" ইত্যাদি। অন্যত্র পড়িতেছি : "যদি ব্রাহ্মণেরা কোন ব্রাহ্মণের দ্বারা দীক্ষিত না হন তাহা হইলে তাঁহারা (সত্যকার) ব্রাহ্মণ নহেন ; শৈবমতাবলম্বীগণ শৈবদ্বারা দীক্ষিত না হইলে তাঁহারা (সত্যকার) শৈব নহেন ; বৌদ্ধগণও কোন বৌদ্ধ দ্বারা দীক্ষিত না হইলে তাঁহারা বৌদ্ধ নহেন।"

গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে যাঁহারা অগ্নিকে লইয়া ধর্মচর্যা করেন তাঁহাদিগকে যোগীশ্বর এবং দেবগুরু বলা হয়। ইহার পর যোগীশ্বরের বেশভূষা এবং অধিকার বর্ণনা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে শঙ্করবর্ণের ব্যক্তিগণ এবং বিকলাঙ্গ লোকেরা দেবগুরু হইবার উপযুক্ত নহে। জগৎ তাহাদের স্পর্শে অশুচি হয়। অতঃপর দেবগুরুর দীক্ষা কিরূপে হয় তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে স্ত্রী বিকু (ভিক্ষু)-র উল্লেখও করা হইয়াছে। ইহার পর চরু প্রদান করা, ভিক্ষুগণকে স্বর্ণরৌপ্য দান করার কথা বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমরা দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ এবং তোয়যজ্ঞের উল্লেখ পাইতেছি। ইহার পর আবার যোগীশ্বর, শৈব এবং বৌদ্ধগণের ভৌমিক অধিকারের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

রাজা কৃতনগর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে : "সম্মানিত প্রভু যোগীশ্বরগণের পতপান (ধর্মানুষ্ঠানের জায়গা), ঋষিগণের পতপান, ব্রাহ্মণগণের পতপান এবং সোগত, শৈব এবং বৌদ্ধগণকে রক্ষা করিবেন।" গ্রন্থকার সোগত বা সৌগত এবং বোদ্ধ বা বৌদ্ধগণের মধ্যে কি পার্থক্য

বুঝাইতে চাহিতেছেন তাহা সুস্পষ্টরূপে বোঝা গেল না। ইহার পর রাজা যোগীশ্বরকে রক্ষা করিবার জন্য সকলকে আদেশ দিতেছেন, কারণ "যোগীশ্বর ধূপধুনা প্রজ্জ্বলিত করেন সমস্ত লোকের কল্যাণের জন্য এবং সম্মানিত প্রভুর চিরস্থায়ী রাজত্বের জন্য।" গ্রন্থের একস্থলে আমরা পড়িতেছি, "গুষ্টি (গৃহকর্তা) তণ্ডকে (গ্রাম প্রধান) সম্মান করিবেন, তণ্ড করিবেন মন্ত্রীকে, মন্ত্রী করিবেন রতুকে (রাজা), রতু করিবেন বিকুকে (ভিক্ষু বা পুরোহিত), বিকু করিবেন দেবকে, দেব আবার করিবেন হ্যঙ্গকে (প্রেতাত্মা) এবং হ্যঙ্গ করিবেন শূন্যকে (সর্বোচ্চ অনস্তিত্ব)।" এই অংশটির একটি স্বতন্ত্র গুরুত্ব আছে। কারণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমরা যবদ্বীপে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের যে পরিণতি লক্ষ্য করিতেছি, তাহা বুঝিতে এই অংশটি সহায়ক। দার্শনিকতত্ত্বের দিক দিয়া আমরা সামান্য হইতে অসামান্যে এবং স্থূল হইতে মহানির্বাণ বা শূন্যে অবসিত হওয়ায় বিভিন্ন স্তরের ক্রমবিকাশ এই স্থলে পর্যবেক্ষণ করিতেছি। ইহার পর আমরা গ্রন্থের প্রায় শেষাংশে অভিসম্পাত পর্ব পড়িতেছি। যদি কেহ রাজপতিগুণ্ডলের বিধান মান্য না করে তাহাদের জন্য এই অভিসম্পাত বর্ষিত হইল। কথিত হইয়াছে যে অভিসম্পাত বাণী যবদ্বীপের প্রাচীন রাজা ভতভির কীর্তি। এই উক্তি অবশ্য সত্য নহে[১০]। গ্রন্থের শেষে বলা হইয়াছে যে ইহা এবং দেবশাসন-নামক গ্রন্থ প্রাচীন যুগের রাজা ভতভির কীর্তি।

প্রণীতি রাজ কপ কপ[১১] নামক একখানি গ্রন্থকেও আমরা নীতিশাস্ত্রের পর্যায়ে আলোচনা করিতে চাই। মূল গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ নাগরকৃতাগম নামক ঐতিহাসিক কাব্যে অজর ইঙ্‌ রাজ কপ কপ নামে অভিহিত হইয়াছে। ডঃ পিগো অনুমান করিয়াছেন যে নাগর-কৃতাগম কাব্যে যে গ্রন্থখানির উল্লেখ করা হইয়াছে আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহার অংশবিশেষ এবং ইহার একটি আধুনিক সংস্করণও ড়ণ্ডঙ্গ-গুল ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে[১২]। এই পুস্তিকায় সমাজের ধর্মনৈতিক দিকটি আলোচিত হয় নাই। ইহাতে অবশ্য ভুজঙ্গদের কথা বলা হইয়াছে, কারণ তাঁহারা ছিলেন রাজকীয় পণ্ডিত। চতুর্দশ শতাব্দীর যবদ্বীপে যে সমস্ত মণ্ডল এবং দেবোত্তর সম্পত্তি বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি মর্যাদার দিক দিয়া জাতীয় জীবনের পুরোভাগে আসিয়া গিয়াছিল ইহাতে তাহাদের পরিচয় নাই। এমন কি শৈব-বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরও কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে প্রণীতি রাজ কপ কপ রাজদরবারের জন্য রচিত একখানি পুস্তিকা যাহার সহিত ধর্মের সম্পর্ক নাই কিংবা ক্ষীণ। এই দিক দিয়া এই গ্রন্থখানি নবনত্যের পর্যায়ভুক্ত।

ডঃ পিগো বলিয়াছেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মধ্য যবদ্বীপের রাজদরবারে যে সমস্ত প্রাচীন যবদ্বীপীয় গ্রন্থের আধুনিক সংস্করণ করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে ছিল অজর ইঙ্‌ রাজ কপ কপ। ইহার একটি ড়ণ্ডঙ্গ গুল এবং অপরটি অস্মরদন ছন্দে বিরচিত হইয়াছিল[১৩]। এই ড়ণ্ডঙ্গ-গুল ছন্দে বিরচিত সংস্করণটির মূল, অনুবাদ এবং টীকা-টিপ্পনি ডঃ পিগো প্রকাশ করিয়াছেন। সম্পাদকদের হাতে মূল যথাসম্ভব রক্ষিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ অস্মরদন ছন্দে রচিত সংস্করণের লেখক বলিয়াছেন যে তিনি মূলগ্রন্থ হইতে কিছুই পরিত্যাগ করেন নাই। ইহার সহিত ড়ণ্ডঙ্গ-গুল ছন্দে বিরচিত সংস্করণের তুলনা করিলে দেখা যায় যে

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিপুল নহে[১৪]। আমরা নিম্নে ড়ওঙ্গ-গুল ছন্দে রচিত গ্রন্থটির সারমর্ম পরিবেশন করিলাম।

এই গ্রন্থে দশটি শ্লোক আছে এবং প্রত্যেকটি শ্লোক দশটি চরণে নিবদ্ধ। এই গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে মন্ত্রী শব্দের অর্থ বিশ্লেষিত হইয়াছে। রাজভক্তিকে এইরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে : "পীড়ায়, বিপদে এবং অসম্মানে প্রভুর অনুগামী হওয়া উচিত। দ্বিতীয় শ্লোক হইতে চতুর্থ শ্লোকে নগরের পাঁচজন কর্মকর্তার অধিকার ক্ষেত্রের বিবরণ পরিবেশন করা হইয়াছে। এই পাঁচজন কর্মকর্তার সমবেত নাম হইল মন্ত্রি মঞ্চনগর ; তাঁহাদের স্বতন্ত্র নাম হই তুমেঙ্গুঙ্গ, দেমুঙ্গ, রঙ্গ[১৫], কণ্ডুরুহন[১৬] এবং পতিহ্। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্লোকে মন্ত্রি ভুজঙ্গ বা ধর্মসংক্রান্ত কার্যে নিয়োজিত রাজকর্মচারীগণের অধিকারক্ষেত্রের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তী তিনটি শ্লোকে অন্যান্য রাজকর্মচারীগণ সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পরিবেশন করা হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির মূল সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল।

নবনত্য[১৭] গ্রন্থখানিও প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত একখানি পুস্তিকা। পিগো নবনত্য নামটির অর্থ করিয়াছেন নয় রকমের 'চেহারা' বা সৌজন্যমূলক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত। অর্থটি আরো একটু পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। রাজ দরবারের রাজকর্মচারিগণের সর্বদাই রাজার মন জোগাইয়া চলিতে হয় ; সুতরাং অবস্থা বিশেষে রাজকর্মচারিগণের অনেক সময় মুখের ভোল পরিবর্তন করিয়া প্রভুর মন রক্ষা করিতে হয়। ইহা হয়তো সেই যুগের মাপকাঠিতে শালীনতার পরিচায়ক ছিল।

এই গ্রন্থের আরম্ভে আমরা পড়িতেছি : "ওম অবিঘ্নম অস্তু।" ইহাতে রাজপ্রাসাদের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিবার নিয়মকানুন, রাজার প্রধান প্রধান কর্মকর্তাদের উপাধি ও পদের গুণাবলী, স্পু (অ)ধ্যক্ষ বা বিচারপতিগণের যোগ্যতার মাপকাঠি, সাধারণ এবং অসাধারণ ব্যক্তিগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, রাজা কিরূপ ব্যক্তি রাজকার্যে নিয়োগ করিবেন প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। রাজার প্রধান মন্ত্রী বা আপতিহ্ অমঙ্গ্কু ভূমি সম্বন্ধে নবনত্যে উক্ত হইয়াছে—

"একসহস্র আজ্ঞাবাহী লোকের জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে কিংকর্তব্য নির্ধারণ করিবার অধিকার তাঁহার আছে। তিনি যে বাহন পছন্দ করেন সেই বাহনেই আরোহন করিতে পারেন। তিনি সরকারী হলুদ বর্ণ ছত্র, রক্তবর্ণ ড়ম্প বা পাল্কী এবং স্বর্ণনির্মিত তাম্বুলাধার ব্যবহার করিতে পারেন। তাঁহার গায়কগণ সহকারে চলিবার অধিকার আছে। দরবার কক্ষে তাঁহার অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে নমস্কার গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। তিনি পঙ্গস্ত্রায়নে বা রাজকীয় আঙ্গিনার প্রধান চত্বরে অশ্বারোহণে অথবা শকটে আরোহণ করিতে পারেন।" ইহার পর স্পু (অ)ধ্যক্ষ বা বিচারকগণের কার্য, গুণাবলী এবং অধিকার বর্ণিত হইয়াছে ; তৎপর শৈবাচার্যগণের অধিকার-সীমা বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার পর বিভিন্ন রাজকর্মচারীর পদমর্যাদা এবং অধিকারের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রকৃরিয়ান তুমেঙ্গুঙ্গ হইলেন প্রধান সেনাপতি, রকৃরিয়ান দেমুঙ্গ হইলেন বিলাস-ব্যবস্থার অধিকর্তা, রকৃরিয়ান কন্থুরুহন হইলেন উৎসব-আয়োজনের অধিকর্তা।

রকরিয়ান কম্বুরুহন কবোলু, গোলুঙ্গন বরিগ, প্রভৃতি উৎসবের সময় শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করেন। রাজা যখন রাজদরবারে দর্শন দেন তখন দ্বিজগণ ঘণ্টাধ্বনি সহকারে বেদ আবৃত্তি করেন[১৮]। রাজার পার্শ্বচর হইলেন রকরিয়ান রঙ্গ; তিনি খেলাধূলায় বিশেষজ্ঞ এবং অস্ত্র ব্যবহারে সব্যসাচী তুল্য। রাজা দরবার কক্ষে আগমন করিলে রাজকর্মচারীগণ পদমর্যাদানুযায়ী উপবেশন করেন। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের স্থান সর্বাগ্রে। অতঃপর রাজকার্যে কিরূপ লোক নিযুক্ত হইবে তাহার বিবরণ পরিবেশন করা হইয়াছে। লেখক বলিয়াছেন "যাঁহারা যুদ্ধে সাহসী এবং গণ্ডগোল সৃষ্টিকারী তাঁহাদিগকে নগরের বহির্দেশে নিযুক্ত করিতে হইবে; তাঁহারা নাগরিকগণকে রক্ষা করিবেন।" রাজা এবং রাজকুমারগণের উপাধি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তথ্যও এই গ্রন্থে পাইতেছি: "রতুগণ এবং রাজকুমারগণ স্বাধীন হইলেও প্রভু-উপাধি ব্যবহার করিতে পারেন না, তাঁহাদের উপাধি হইল হ্যঙ্। প্রভুগণের পুত্র স্বাধীন হইলে তাঁহারাও প্রভু উপাধি ব্যবহার করিতে পারেন। রতুগণ অধীন হইলে তাঁহারা রাজপুত্র উপাধির অধিকারী নহেন; তাঁহাদের উপাধি হইল ঙ্যহ্। তাঁহাদের পুত্র হইলে তাঁহাদিগকে 'রাজপুত্র' বলা হইবে, কারণ তাঁহারা সমশ্রেণীয় রতু হইতে জাত।"

এইবার আমরা নীতিশাস্ত্র কাকাবিন এবং কামন্দক নামক রাজনীতি গ্রন্থের আলোচনা করিব। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করিয়াছেন স্যর ষ্ট্যাম্ফোর্ড র‍্যাফল্স্ এবং পূর্বচরক; ইদানীং সি. হুইকাশও এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন[১৯]।

আলোচ্য গ্রন্থটির বলিদ্বীপীয় সংস্করণের নাম নীতিসার এবং যবদ্বীপীয় সংস্করণের নাম নীতিশাস্ত্র। এই গ্রন্থটিতে ১২০টি শ্লোক আছে, উহা ১৫টি সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থে সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা: শার্দূলবিক্রীড়িত, বংশপত্রপতিত, পদ্মকেশর, রাগকুসুম, কুসুমবিচিত্র, অশ্বললিত, ভ্রমরবিলসিত, প্রবীরললিত এবং বসন্ততিলক। এই গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত হইয়াছিল, অন্ততঃ ১৫০০ খৃষ্টাব্দের বেশী পরে নহে[২০]। গ্রন্থখানির আধুনিক যবদ্বীপীয় সংস্করণও প্রচলিত আছে[২১]।

গ্রন্থখানি পাঠ করিলে মনে হইবে যে ইহার উৎস সংস্কৃত কোন গ্রন্থ, কিন্তু এরূপ কোন গ্রন্থ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই; হইবে কিনা তাহাও সন্দেহ। কারণ, ইহা সারসমুচ্চয়ের মতই যেন কতকগুলি নীতিমূলক সংস্কৃত শ্লোকের চয়নিকা যাহা সংস্কৃত সাহিত্য-সাগর মন্থন করিয়া সুসংবদ্ধ করা হইয়াছে। যবদ্বীপীয় লেখক যে ইহাতে কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেন নাই তাহাও নিশ্চিতরূপে বলিবার উপায় নাই। সে যাহাই হউক, ইহার কিছু কিছু শ্লোক সংস্কৃত গ্রন্থ মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে[২২]। তবে এই গ্রন্থের সহিত সংস্কৃত কামন্দকীয় নীতিসারের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু প্রাচীন যবদ্বীপীয় কামন্দকের সহিত সংস্কৃত গ্রন্থটির কিছুটা মিল পরিলক্ষিত হয় বিষয়-বিন্যাসের পারম্পর্য অনুধাবন করিলে। গ্রন্থের নাম-সমস্যাটিও আলোচনার যোগ্য। যবদ্বীপীয় পুঁথিগুলির সূচনায় আছে: অবিঘ্নং অস্তু। অতঃপর ভগবান কামন্দক বলিতেছেন যে তিনি শিষ্যগণকে সঙ্ অজি রাজনীতি (অত্যন্ত পবিত্র রাজনীতি) শিক্ষা দিবেন; অন্য পুঁথিতে ইহার পাঠান্তর হইল অজি কমন্দক। বস্তুতঃ গ্রন্থের নাম যে

কমন্দক ছিল তাহা গ্রন্থশেষের পরিসমাপ্তি-শব্দগুচ্ছ হইতেও প্রতীয়মান হয়। বিভিন্ন পুঁথিতে এই স্থলে আছে ইতি কমন্দক, ইতি হজি কমন্দক, সঙ্ হঙ্গ্ রাজনীতি কমন্দক সমাপ্ত প্রভৃতি বাক্য। সংস্কৃত গ্রন্থটিকে এই স্থলে কামন্দকী নীতিসার রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই ভারতীয় রাজনীতি বিশারদের নাম দ্বীপময় ভারতের কয়েকটি গ্রন্থের সহিত কেন জড়াইয়া পড়িল তাহা বলা সুকঠিন ; শেষোক্ত শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে আছে তন্ত্রি কামন্দক এবং বাবাদ পসির বা কামন্দকের রোমান্স। আধুনিক যবদ্বীপীয় ভাষায় কামন্দক বা ঙমন্দক শব্দ দ্বারা 'ভ্রান্তপথে পরিচালিত করা, জাল করা' প্রভৃতি বোঝায়, কিন্তু চিরকালই এইরূপ মন্দ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে ইহা মনে করিবার হেতু নাই। হুইকাশ মনে করেন যে নামটির বহুল প্রচলনের জন্য ইহা তন্ত্রির নামের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া থাকিবে। তন্ত্রি কামন্দক আলোচনা করিবার সময় এই প্রসঙ্গে আমরা আর একবার ফিরিয়া যাইব।

পূর্বেই বলিয়াছি প্রাচীন যবদ্বীপীয় কামন্দকের সহিত সংস্কৃত কামন্দকীয় নীতিসারের কিঞ্চিৎ মিল আছে। সংস্কৃত নীতিসারটিতে ১৯টি অধ্যায় আছে, উহার শ্লোকসংখ্যা হইবে ১২০০। প্রাচীন যবদ্বীপীয় কামন্দক গ্রন্থটি গদ্যে রচিত ; উহাতে আছে মাত্র ১৯টি ভূর্জপত্র ; প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আছে ৪ লাইন করিয়া লেখা। প্রথম পৃষ্ঠার আরম্ভের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে উত্তম রাজা পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, আচার্য, বেদপারগ প্রভৃতি ব্যক্তির যত্ন লইবেন ; তাঁহার মিত্র হইল মাত্র তিনটি : ধর্ম, কাম এবং অর্থ। লেখক অতঃপর রাজাকে ২০ শ্রেণী লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন ; ইহাদের নাম সংস্কৃতে দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চম পৃষ্ঠায় লেখক বলিয়াছেন যে রাজার সপ্ত মিত্র হইল সত্য, আর্য, ধর্ম প্রভৃতি। পরবর্তী পৃষ্ঠায় লেখক ইহার দৃষ্টান্ত পরিবেশন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে সমান শক্তিশালী রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলে উভয়ের ধ্বংস অনিবার্য। এই উপলক্ষ্যে লেখক বরাহরূপী নিবাতকবচ এবং অর্জুনের মধ্যে সংগ্রাম ও একটি কন্যাকে (তিলোত্তমা) লইয়া নিসুন্দ পসুন্দের যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। সপ্তম পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে যুদ্ধ করিতে হইলে চাই উপযুক্ত সময় ; আরো দেখিতে হইবে শত্রুর সংখ্যা কত এবং তাহার মিত্রসংখ্যা কতদূর হ্রাস করা সম্ভবপর। যুদ্ধে বিজয়ী হইলে রাজা তিনটি জিনিষ লাভ করেন। যথা : রাজ্য, মিত্র এবং অর্থ। লেখক বলিয়াছেন যে সেই সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করা সুকঠিন যাঁহাদের আছে (ক) জন্মের অধিকার (খ) যাঁহারা সত্য ভাষী (গ) শক্তিমান (ঘ) অবিচল বুদ্ধিতে সংস্থিত (ঙ) গুণবান (চ) বিবেকবান (ছ) ধন (বা দান)-শূর এবং (জ) অনুচর বলে বলীয়ান্। সুতরাং প্রত্যেক রাজার বিবেকবান এবং শাসনে দৃঢ় হওয়া চাই। পরবর্তী পৃষ্ঠায় লেখক শত্রুর দুর্বলস্থান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন, অর্থাৎ শত্রু স্ত্রীলোকে আসক্ত কিনা এবং পান, ভোজন, শিকার, দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত কিনা এবং বিরুদ্ধ দেবভাবসম্পন্ন (উৎপথ) কিনা। তাহা হইলে তাঁহাকে সহজেই পর্যুদস্ত করা যাইবে। দ্বৈধীভাবও শত্রুনাশ করার অন্যতম উপায় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে লেখক পাণ্ডবগণের বিরাট নগরে মৎস্যপতির আশ্রয় গ্রহণ করা এবং তাঁহার সাহায্যে কৌরবশতকে ধ্বংস করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী পৃষ্ঠায় এই

প্রসঙ্গের জের টানিয়া সুগ্রীব-বালি-রাম কিরূপে 'উপায় সংশ্রয়ের' দ্বারা লাভবান হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। লেখক তাই ষড়গুণের মধ্যে স্থান দিয়াছেন: সন্ধি, বিগ্রহ, স্থান, দ্বৈধীভাব, যান এবং সংশ্রয়। বস্তুতঃ যে রাজা যথেষ্ট বিবেকবান নহেন, এবং যিনি মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, শৈব, সৌগত এবং নয়ে-পারদর্শী ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে উদাসীন তিনি সিংহাসন রক্ষায় অসমর্থ। দশম পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে রাজার মন্ত্রী সংখ্যায় হইবেন ১২, ১৬ অথবা ২০ জন। রাজা যতদিন অজি রাজনীতি এবং রাজ শাসনের নির্দেশানুযায়ী রাজ্য পরিচালনা করিবেন ততদিন তিনি অপরাজেয় থাকিবেন। রাজনীতি পরিচালনায় রাজা গুপ্তচর এবং রাজদূতের সাহায্য গ্রহণ করিবেন। পরবর্তী পৃষ্ঠায় রাজা কিরূপে শত্রুর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবেন তাহার উপায় বলা হইয়াছে। নিজের সৈন্যবাহিনী সম্বন্ধেও রাজা নিশ্চিন্ত না থাকিয়া এখানে 'সম-ভেদ' প্রভৃতি সপ্তোপায় অবলম্বন করিবেন। দ্বাদশ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে রাজাকে বিজয়ী হইতে হইলে কার্যে ক্ষিপ্র, ব্যবহারে ধর্মশীল এবং বিদগ্ধ হইতে হইবে; বস্তুতঃ তাঁহাকে গুণগ্রাহী ও প্রিয়ম্বদ না হইলে চলিবে না। পরবর্তী পৃষ্ঠায় লেখক ধর্ম, উত্তম, মধ্যম এবং অধম স্থানের বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, যে রাজা একদিকে যেমন পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, আচার্য, শৈব, সৌগত, মহেশ্বর প্রভৃতিকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন, তেমনি তিনি সম, ভেদ, ধন (=দান), দণ্ড, মায়া, উপেক্ষা, ইন্দ্রজাল এই সপ্ত উপায় দ্বারাও শত্রুকে পর্যুদস্ত করিবেন। এই সপ্ত উপায়গুলির বিস্তৃত বিবরণী পরিবেশন করা হইয়াছে ষোড়শ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। লেখক সপ্তদশ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি আর্যদেশসম্ভূত 'সু-জন্ম' পুরুষ হইবেন; তিনি হইবেন হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন, মন্ত্রিগণের প্রিয়, রাজার অনুগ্রহভাজন, প্রজাদের প্রিয়। তাঁহার দণ্ডনীতি, রাজনীতি এবং ষোড়শ ব্যূহে প্রগাঢ় জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পরবর্তী পৃষ্ঠায় রাজার সৈন্যবাহিনীতে কে কোথায় অবস্থান করিবেন, কিরূপে ইহারা অগ্রসর হইবেন এবং শত্রুদেশে কিরূপে ব্যূহরচনা করিবেন তাহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ব্যূহগুলির নামের মধ্যে আছে সিংহ, গজ, গরুড়, মকর, চক্র, পদ্ম, বুকির-সাগর, অর্ধচন্দ্র বা বজ্র-তীক্ষ্ম ব্যূহ। অতঃপর উভয় পার্শ্ব এবং পশ্চাদ্দেশ হইতে আক্রমণ করিয়া শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে হইবে। শেষ পৃষ্ঠায় শত্রুকে ছলনা করিয়া পরাজিত করার কথাও বলা হইয়াছে এবং এই প্রসঙ্গে পাণ্ডবগণের তীর্থগমনের সময় অশ্বত্থামন কিরূপে নৈশকালে পাণ্ডব শিবির আক্রমণ করিয়া বহুজনকে নির্বিচারে হত্যা করিয়াছিলেন তাঁহার কথা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ রাজার সর্বদিকে প্রখর দৃষ্টি থাকা চাই; ইহা হইতে প্রজাগণ রাজার প্রতি অনুরক্ত হয় এবং ভুবনও স্ব-স্থ ভাব প্রাপ্ত হইয়া শান্তি লাভ করে।

কামন্দকের মত ভগবান ব্যাস অপর আর একখানি গ্রন্থে উপদেষ্টার স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানির নাম নিতিপ্রয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে নিতিপ্রয় গ্রন্থটি কামন্দক-গ্রন্থের সম্প্রসারিত অংশ; সুতরাং ইহা এই স্থলে আলোচনা করা যাইতে পারে। ইহার একখানি পুঁথির সারাংশ ডঃ হুইকাশ প্রকাশ করিয়াছেন; নিম্নের বিবরণ তাহা হইতেই পরিবেশিত হইল[২৩]।

প্রথম পৃষ্ঠার আরম্ভ হইল: অবিঘ্নম্ অস্তু দিয়া একটি বিকৃত সংস্কৃত শ্লোক। অতঃপর

বলা হইয়াছে যে প্রাচীনকালে ভগবান রত্নভূমি তাঁহার পুত্র রবেয় সহ স্বগণ (বা স্বগণ) দিপের আশ্রমে বাস করিতেন। তাঁহারা জানিতেন রাজনীতি এবং শ্লোক-পদার্থ-সমন্বিত স-রস নীতিপ্রিয়। এই সময়ে অযোধ্যার রাজা ছিলেন রহদেন সুপর্কদেব। তখনো তাঁহার অভিষেক হয় নাই ; তাঁহার কোন রাজপত্নীও ছিল না। তিনি অভিষেক সম্পন্ন করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করিবেন ঠিক করিয়া দলবল সহ শিকারে বহির্গত হইলেন। অতঃপর তিনি স্বগণদিপে উপনীত হইলে ভগবানগণ তাঁহাকে স্বাগত জানাইলেন।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পড়িতেছি যে রাজা কেবলমাত্র পানীয়জল প্রার্থনা করিলেও ভগবানগণ রাজা এবং তাঁহার অনুচরগণকে তৃপ্তিসহকারে ভোজন করাইলেন এবং অজি রাজনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন। রাজা সেই রাত্রি আশ্রমেই কাটাইলেন। পরদিন প্রভাতে রাজা ভগবান রত্নভূমিকে অনুরোধ করিলেন যে তিনি তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং তাঁহার রাজপুরোহিত হন। রাজা অবিবাহিত থাকায় তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সুসম্পন্ন করা গেল না, কিন্তু তিনি তাঁহাকে সংস্কার দিলেন এবং রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহাকে "ভোগোপভোগ, রত্নমণিময়" প্রভৃতি উপভোগ করিবার অনুমতি দিলেন। এইরূপে তিনি 'গুরু-সুশ্রূষ' হইলেন এবং ক্ষত্রিয়জনসুলভ অনুগ্রহ লাভ করিলেন। কিছুদিন পরে তিনি রাজ-প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া সৈন্যগণের অভিনন্দন লাভ করিলেন।

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দনবু-অবুর প্রভু অজি অঙ্গবঙ্গের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তিনি ছিলেন 'সুপুত্র, ব্রহ্মকুলবংশজ, বীর্যবান' এবং 'জনানুরাগ'। তিনি মন্ত্রিগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সপ্তাহ-কাল মধ্যে অযোধ্যা আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। রাদেন সুপর্কদেব এই সংবাদ শুনিয়া আচার্য পুরোহিতের সহিত পরামর্শ করিতে চলিয়া গেলেন। ভগবান রত্নভূমি তখন শিষ্যগণকে শিক্ষাদান করিতেছিলেন ; ভগবান রবেয়ও সন্নিকটে আসীন। এই সময়ে রাদেন সুপর্কদেব বিনীতভাবে গুরুর নিকট সমুপস্থিত হইলেন।

ভগবান রাজাকে স্বাগত জানাইয়া তাঁহার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুপর্কদেব তাঁহার বিপদের কথা জ্ঞাপন করিলে গুরুর আদেশানুযায়ী ভগবান রবেয় সুপর্কদেবকে নিতিপ্রিয় শিক্ষা দিলেন :

"নিতিপ্রয়েন ত্বম্ অনক্কে পূর্বং বিষ্ণুঃ মহাপুণ্যম্
ত্বম্ যন্তু প্রজমলোকে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নম্ ইদম্।"

ইহার নির্গলিতার্থ হইল : নিতিপ্রিয় বলিয়া একটি গ্রন্থ আছে ; উহা ভট্টার বিষ্ণু রচনা করিয়াছিলেন। ইহা পৃথিবীতে শ্রী ভগবান দ্বৈপায়নের নিকট প্রকাশিত হয় ; তিনি পরে ভগবান ব্যাস নামে খ্যাত হন।

ভগবান রবেয় বলিলেন যে কোন রাজা যদি শত্রুকে পরাজিত এবং প্রজাকে শাসন করিতে চান তাহা হইলে তাঁহাকে কাক এবং মোরগের মত হইতে হইবে। তিনি বলিলেন যে নির্দোষ লোকের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে নাই ; অর্থঘটিত অপরাধে জরিমানা করাই শ্রেয়ঃ, হত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আগমের 'স-রস' প্রতিপালন করিতে হইবে এবং দণ্ড দ্বারা শাসন

করিতে হইবে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে সুদূরে নিকটে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের সকলকে রক্ষা করিতে হইবে; শত্রুকে সর্বদা দূরে রাখিতে হইবে এবং শত্রুকে যাঁহারা পীড়ন করেন তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। দরিদ্র, উচ্চবংশসম্ভূত লোক এবং ব্রাহ্মণগণকে ধন এবং ভূদান করিতে হইবে। সৈন্যগণকেও সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। পঞ্চম পৃষ্ঠায় আমরা পড়িতেছি রাজা যেন মোরগের মত গুণসম্পন্ন হন। মোরগ সঙ্গ ভালবাসে, বহুস্ত্রী থাকিলেও পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করে না এবং শত্রুকে জলেস্থলে অরণ্যে সর্বত্র সর্বাবস্থায় যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক। ইহাই মোরগের 'মেধা'; রাজাও সেইরূপ হইবেন। রাজা সর্বদা ধর্মাচরণ করিবেন। পরের পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে রাজা সৈন্যদের নিকট গুরুতুল্য; সুতরাং রাজার ধর্মসম্মত ব্যবহারে সৈন্যদের সাহস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। ভগবানও ধর্মশীল রাজার প্রতি সুপ্রসন্ন। ধর্মের জন্যই হউক বা যুদ্ধের জন্যই হউক রাজা কখনো রাজদ্রব্য, রাজভরণ, রাজ-পেনি, ধান্য এবং ভূদান করিতে কার্পণ্য প্রকাশ করিবেন না। কারণ যুদ্ধে বিজয়ী হইলে প্রদত্ত জিনিষের পঞ্চ গুণ ফিরিয়া আসিবে; আর মৃত্যু হইলে স্বর্গে ভট্টারের সঙ্গে মিলিত হইবেন এবং বিদ্যাধর বিদ্যাধরী তাঁহার সেবা করিবেন। ৭ম পৃষ্ঠায় পাইতেছি যে রাজার সঙ্গে যাঁহারা রণক্ষেত্রে অনুগমন করিবেন রাজা তাঁহাদের পোষাক পরিচ্ছদ দান করিয়া তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিতেছেন এবং রণক্ষেত্রে কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সেই পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব লইতেছেন। যাঁহারা মহাপণ্ডিত তাঁহারা রাজার জয়ের জন্য পূজা, ভূত-যজ্ঞ (মানুষ যজ্ঞ ও দেব যজ্ঞ) করিবেন এবং সমগ্র সৈন্যবাহিনী, তণ্ড মন্ত্রী এবং নিজের জন্য হোম-এয় করিবেন। যুদ্ধে যাত্রা করিলে সর্বদা সৈন্যবাহিনীর খাদ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সৈন্যবাহিনীর বিশ্রামের সময় হইলে দিবস অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; স্থান হইবে বৃহৎ নদীর বৃক্ষবহুল তীর। অষ্টম পৃষ্ঠায় পড়িতেছি যে রাজা শত্রুর দেশে পদার্পণ করিলে সর্বদা সাবধানে থাকিবেন। শত্রুর দেশে তলগ পঙ্কুর নামক হ্রদটি যুদ্ধের সম্পূর্ণ উপযোগী; ঐ স্থানে শত্রু উপনীত হইলে শত্রুর একাংশকে হ্রদ অতিক্রম করিতে দিয়া শত্রুদলকে পর পর ধ্বংস করিতে হইবে। রাজা এই উপদেশ গ্রহণ করিয়া তণ্ড মন্ত্রিগণ সহ প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরদিন রাজা রাজপ্রাসাদে তণ্ড মন্ত্রি, সৈন্য, কৃষকগণকে রাজভরণ, রাজপেনি, রত্নকাঞ্চন, পোষাকপরিচ্ছদ, ধান্য ভূমি প্রভৃতি দান করিলেন। ইহার পর দেব পূজা হইল; মহাপণ্ডিত, শৈব, সৌগত প্রভৃতিকে দান করা হইল এবং সমগ্র সৈন্যের কল্যাণকামনায় হোম এবং প্রায়শ্চিত্ত করা হইল। মৃদঙ্গ, ভেরি, শংখ বাজিয়া উঠিল। এইরূপ ভগবান রবেয়ের পরামর্শ অনুযায়ী রাজা যুদ্ধে গমন করিলেন। তখন (নবম পৃঃ) তলস পঙ্কুরে ভীষণ যুদ্ধ হইল, কিন্তু অজি বঙ্ বঙ্ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। সুপর্কদেব বহু ধনরত্ন, অজি বঙ্ বঙ্গের কন্যা দেবী যজ্ঞবতী এবং মৃত রাজার বহু উপপত্নী লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরাজিত দেশে একজন রাজপ্রতিভূ রহিল। পরবর্তী পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে রাজা ভগবান রবেয়, ভগবান রত্নভূমি এবং ঋষিগণের পদবন্দনা করিয়া সকলকে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান লুণ্ঠনদ্রব্য দান করিলেন। অতঃপর (১১ পৃঃ) সুপর্কদেব স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রধান মন্ত্রী আর্য বীরসিংহ হইতে

সামান্যতম কর্মী পর্যন্ত সকলকেই দানে সন্তুষ্ট করিলেন। পরের দিন তিনি আবার ভগবান রত্নভূমির সমীপে গমন করিলেন। ইহার পর ভগবান রত্নভূমি রাজাকে কিছু উপদেশ প্রদান করিলেন। ইহার পর (পৃঃ ১৩) ভগবান রত্নভূমি সশরীরে শিবলোকে চলিয়া গেলে (পৃঃ ১৪) ভগবান রবেয় স্থপর্কদেবকে শ্রীমহারাজ উপাধিতে ভূষিত করিলেন এবং রাজকুমারী যজ্ঞবতী তাঁহার পরমেশ্বরী বা প্রধানা মহিষী হইলেন।

ইহার কিছুকাল পরে ভগবান রবেয়ের মৃত্যু হইল এবং তিনি ইন্দ্রভবনে চলিয়া গেলেন। ভট্টার ইন্দ্র তাঁহার প্রতি খুব সুপ্রসন্ন হইলেন, কিন্তু একদিন সুগন্ধি গ্রহণ করিয়া নাগসরিপুষ্প নিক্ষেপ করিবার সময় উহা অকস্মাৎ ভট্টার ইন্দ্রকে আঘাত করিল। ইন্দ্রের অভিশাপে ভগবান রবেয় পরকীৎ-পক্ষীতে রূপান্তরিত হইয়া মর্ত্যে আগমন করিলেন, কিন্তু তাঁহার বেদশান্তিমন্ত্র প্রভৃতি উচ্চারণ করিবার শক্তি পূর্ববৎ রহিয়া গেল। অযোধ্যার কোন শিকারী পক্ষীটিকে লইয়া রাজদরবারে গেলে পক্ষীটি তাহার জন্ম পরিচয় জ্ঞাপন করিল। রাজা তাহার কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলে পরকীৎ অতঃপর (পৃঃ ১৬) তাহার দুর্ভাগ্যের কাহিনী বর্ণনা করিল এবং রাজাকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিল (১৭ পৃঃ)। অতঃপর বেদমন্ত্র গাহিতে গাহিতে পক্ষীটি অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়া স্বর্গে গমন করিল। রাজা স্থপর্কদেবও ধর্মাচরণ করিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। সমাপ্তি অংশে আছে : ইতি নিতিপ্রয় সমাপ্ত এবং সর্বশেষে আছে ওম্ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওম্ গণপতয়ে নমঃ, ওম্ শ্রী গুরুভ্যো নমঃ।

গ্রন্থে সংস্কৃত শ্লোকের উপস্থিতি, সংস্কৃত নাম ও শব্দ দেখিয়া হুইকাশ মনে করেন যে গ্রন্থখানির উৎস ভারতবর্ষে, কিন্তু ইহাতে বিস্তৃত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি আধুনিক যবদ্বীপীয় ভাষায় ও ছন্দে রূপান্তরিত হইয়াছে[২৪] ; ইহার বিবরণ স্যার ষ্ট্যামফোর্ড র‍্যাফল্‌সের গ্রন্থেও সন্নিবেশিত হইয়াছে[২৫]।

এই শ্রেণীর আর একখানি গ্রন্থের নাম সারসমুচ্চয়। যবদ্বীপীয় নীতি এবং স্মৃতিশাস্ত্রের জগতে ইহার স্থান ছিল যথেষ্ট উচ্চে এবং পূর্বাদিগম নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে যিনি প্রাগ্-বিবাক হইবেন তিনি সারসমুচ্চয়ে যেন সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করেন। ডঃ ফ্রিড্‌রিখ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত একখানি গ্রন্থে এই নীতিশাস্ত্রখানির উল্লেখ করিয়াছিলেন ; ডঃ যুইনবলও এই গ্রন্থ-খানির কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন[২৬]। সম্প্রতি ডঃ রঘুবীরের সম্পাদনায় এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে[২৬ক]।

এই গ্রন্থে ৫১৭টি সংস্কৃত শ্লোক আছে এবং মহাভারতের পাঠ-সমালোচনায় ইহার অবদান অসামান্য হইবে। ডঃ রঘুবীর এই সমস্ত সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে ৩২১টি মহাভারতের পুণা-সংস্করণের মধ্যে খুঁজিয়া পাইয়াছেন ; পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশেও কিছু আছে। সংস্কৃত-সাহিত্যের সমুদ্রে আরো গভীরভাবে অবগাহন করিলে হয়তো অন্যান্য শ্লোকগুলিও উদ্ধার করা যাইতে পারে। যে-সমস্ত শ্লোক মহাভারতে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই অরণ্য, উদ্যোগ, শান্তি এবং অনুশাসন পর্ব হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। সামান্য কয়েকটি শ্লোক আদি, সভা এবং ভীষ্মপর্বে পাওয়া গিয়াছে।

যবদ্বীপে সারসমুচ্চয় এবং গীতা উভয়ই বিদ্যমান। সুতরাং নীতিশাস্ত্র এবং মহাকাব্যের অন্তর্ভুক্ত এই দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ যেন দ্বীপময় ভারতের সামাজিক জীবনে এক অত্যুচ্চ নৈতিক আদর্শের পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল।

গ্রন্থকারের নাম বররুচি। ৬ নং শ্লোকের যবদ্বীপীয় টীকায় আমরা পড়িতেছি : "মঙ্কন লিং ভগবান্ বররুচি ন্ পনমস্কার রিং ভগবান্ ব্যাস। নহর্ উমুজরকন্ কোত্তমন্ ইকিং ভারত-কথা। ইকিং ইনরনন্ সারসমুচ্চয়। সার ঙ্গরনিং বিশেষ। সমুচ্চয় পপুপুল্ন্য। নহন্ মতংঙ্গন্ সারসমুচ্চয় ঙ্গরনিকিং সং হ্যং অজি। দমল্ ভগবান বররুচি। নিহন্ পিন্কৎ ভগবান্ বৈশম্পায়ন ইং মহারাজ জনমেজয়। ই কাল নির চুমরিতাকন্ ইকং ভারতকথা। যতিকি বিতন্ ইং সারসমুচ্চয়।" অর্থাৎ ভগবান ব্যাসকে প্রণতি জানাইবার সময় ভগবান বররুচি এইরূপ বলিলেন। এখন হইতে তিনি ভারত মহাকাব্যে যাহা সর্বোত্তম তাহাই বলিবেন। ইহার আখ্যা হইল সারসমুচ্চয়। 'সার' মানে হইল নির্যাস ; সমুচ্চয় হইল ইহার সংগ্রহ। এই কাজ ভগবান বররুচি করিয়াছিলেন। ভগবান বৈশম্পায়ন যখন মহারাজ জনমেজয়কে ভারত মহাকাব্যের বিবরণ পরিবেশন করিতেছিলেন তখন এই নীতিমূলক ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছিল।

সারসমুচ্চয় নামক কোন গ্রন্থ ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয় নাই, যদিও বররুচির নাম এদেশে সুপরিচিত। মহাভারতের যে-পাঠ সারসমুচ্চয়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা ভারতীয় কোন নির্দিষ্ট সংস্করণের পাঠ অনুযায়ী নহে। গ্রন্থে প্রথমে সংস্কৃত শ্লোক পরিবেশন করা হইয়াছে ; তৎপরই দেওয়া হইয়াছে যবদ্বীপীয় অন্বয় এবং ব্যাখ্যা প্রাচীন যবদ্বীপীয় রচনা-শৈলীতে যেন সংস্কৃত টিপ্পনী-রীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে ওম অবিঘ্নমস্তু বলিয়া। প্রকৃত উপদেশামৃত বর্ষিত হইয়াছে ৭ম শ্লোক হইতে। চতুর্দশ শ্লোকে লেখক বলিতেছেন যে মানবদেহ লাভ করা সুকঠিন এবং উহা বিদ্যুৎ-প্রভার মতই ক্ষণস্থায়ী ; সুতরাং সকলে এই দেহ এবং উহার উপকরণের অবক্ষয়ে যত্নবান হইবেন। ইহার জন্য প্রয়োজন ধর্মের সুকঠিন আবরণ (১৪-৩৭), কারণ শ্মশানের পরপারে ধর্ম ব্যতীত আর কিছুই সঙ্গে যায় না (৩৮) ; শ্রুতি এবং স্মৃতি এই ধর্মকে ধারণ করিয়া থাকে (৪৩)। এই ধর্মকে রাষ্ট্রও নিতে পারেনা, চোরেও চুরি করিতে পারেনা, মৃত্যুর সময়ও ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয় না (৫৫)। লেখক অতঃপর বর্ণনা করিয়াছেন চতুর্বর্ণ কিরূপে স্ব স্ব ধর্মে সংস্থিত থাকিতে পারেন (৬২-৬৬) এবং ইহার ব্যত্যয়ে কিরূপ সর্বনাশ হইতে পারে (৬৭-৬৮)। লেখক অতঃপর জীবনে যাহা প্রেয় ও শ্রেয়ঃ সেই সমস্ত বর্ণনা করিয়াছেন ; ইহার মধ্যে আছে অহিংসা, সত্য ভাষণ, বিশ্বস্ততা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, সংযম, দান প্রভৃতি (৭০-৭৮)। ইহা কায়-মন-বাক্য দ্বারা সম্পাদিত হয় (৮৩), কিন্তু ইহার মধ্যে মনই শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহাই দেহ এবং বাক্যের পরিচালক (৮২)। একই জিনিষ বিভিন্ন জনের মনোমুকুরে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, যেমন নারীবক্ষ শিশু ও স্বামীর নিকট ; নারীর মৃতদেহ সন্ন্যাসী, প্রেমিক ও কুকুরের নিকট ; পুরুষেরা মুখের লালাকে ঘৃণা করিবে, আবার "মুখমদের ছিটা" মনে করিলে উহার আস্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে (৮৭-৯৩)। সুতরাং লোভ, ঘৃণা, ঈর্ষা পরিত্যাজ্য

(৯৪-৯৭) এবং ক্ষমা ও সহনশীলতা অনুশীলন করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম (৯৮-১০২)। ইহার পর ক্রোধের বিষময় ফলের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে (১০৩-১১৪)। লেখক অতঃপর নাস্তিকদের সম্বন্ধে বিষোদ্গার করিয়া (১১৬-১২২) বলিয়াছেন যে যদি পরলোক নাও থাকে তাহা হইলেও প্রাজ্ঞগণ অশুভ কর্ম সর্বদা পরিত্যাগ করিবেন, কারণ যদি পরলোক না থাকে তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইবে না, কিন্তু পরলোক থাকিলে নাস্তিকগণের সর্বনাশ (১১৭)। লেখক বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে প্রিয় বাক্য বলাই সঙ্গত (১২৩), কারণ বৃক্ষকে কুঠার দ্বারা ছেদন করিলে উহা ক্রমশঃ পুনর্জীবিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু কঠিন বাক্যের ক্ষত কখনো নিরাময় হয় না (১২৮)। লেখক এই বাক্য সংযমের প্রয়োজনীয়তা এবং বিকলাঙ্গের প্রতি অশালীন বাক্য ব্যবহার না করা প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া (১২৯-১৩২) সত্যের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন (১৩৩-১৪০)। তিনি বলিয়াছেন যে যাহা সর্বজীবের চরম হিতার্থে তাহাই সত্য, অপর সমুদয় মিথ্যা (১৪০)।

লেখক বলিয়াছেন যে মানুষের জীবন ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের উৎস; সুতরাং যাহারা জীবনকে নষ্ট করে তাহারা সবই নষ্ট করে; যাহারা জীবনকে রক্ষা করে তাহারা সকলই রক্ষা করে। বলপূর্বক গ্রহণ করাও অসমীচীন (১৪১-১৫৭)। বস্তুতঃ চিন্তায়, বাক্য এবং কার্যে যেন কখনো ইহা প্রকাশ না পাইয়া দয়া এবং দানই প্রকাশ পায় (১৬৩)। লেখক অতঃপর শীলের গুণকীর্তন করিয়াছেন; ইহার মূলে রহিয়াছে ধর্ম, সত্য, ন্যায়, শক্তি এবং ধন। ইহা ব্যতীত সমস্তই নিরর্থক (১৬৪-১৭১)। দরিদ্র এবং আর্তজনকে শরণ ও সাহায্য দেওয়াও শ্রেষ্ঠ কার্য (১৭২), কিন্তু দানের মত পুণ্য নাই (১৭৪-২৩৭)। ইহার পর লেখক ঋত্বিক, পুরোহিত, গুরু, শিষ্য, মাতা-পিতা, আত্মীয় স্বজন এবং অন্য কাহাকে কাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে বলিয়াছেন (২৩৮-২৫৭); তিনি বলিয়াছেন যে পিতা তিনজন: যথা, যিনি দেহ দিয়াছেন, যিনি প্রাণ দিয়াছেন এবং যিনি আহার্য দিতেছেন (২৪৮)। ইহার পর করুণা প্রভৃতি দশটি যমের ও দশটি নিয়মের ব্যাখ্যা করিয়া (২৬৪-২৬৬) লেখক আবার ধর্মের প্রশস্তিতে ফিরিয়া গিয়াছেন (২৬৭-২৮১)। ইহার পর আমরা সৎ এবং অসৎ, দরিদ্র এবং কৃপণের পাপপুণ্যের ফলাফল পড়িতেছি (২৮৪-৩০৫)। লেখক বলিয়াছেন যে গুণের অনুশীলন করা এবং সাধুসঙ্গ করা কর্তব্য, কারণ ইহাই সর্বোত্তম (৩০৬-৩২৩)। শুভ কার্যের প্রতিধ্বনি মর্ত্যে এবং স্বর্গে উত্থিত হয়; যতদিন এই প্রতিধ্বনি শোনা যায় ততদিনই মানুষ মানুষ থাকে (৩২৫-২৬)। ইহার পর অসৎ লোকের দোষাবলীর ফিরিস্তি দিয়া লেখক উহাদিগকে পরিহার করিতে বলিয়াছেন (৩২৮-৩৫৯), কারণ গোবৎস যেমন তাহার মাতাকে সহস্র গাভীর মধ্য হইতেও খুঁজিয়া বাহির করে, সৎ এবং অসৎ কর্মও সেইরূপ উহার কর্তাকে অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহার পর লেখক কর্মফল, মৃত্যু, জীবনের অনিত্যতা এবং উপযুক্ত সময়ে সৎকর্মের প্রয়োজনীয়তার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (৩৬০-৩৯৬)। অজ্ঞতা, ক্রোধ এবং অহঙ্কার হইতেও নানারূপ দোষ সঞ্জাত হইয়া থাকে, সুতরাং উহাও পরিহার করিতে হইবে (৪০৫-৪১৮), কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিষময় ফলদায়ক হইল নারীর প্রলোভন এবং কামের দাসত্ব (৪৩০-৫০)। লেখক বলিয়াছেন যে কোন মানুষের যদি সহস্র জিহ্বা থাকে, সে যদি শতায়ুও

হয় এবং তাহার যদি স্ত্রীলোকের দোষকীর্তন ব্যতীত অন্য কোন কার্য না থাকে তাহা হইলেও সে উহা শেষ না হইতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে (৪৩৮)। তৃষ্ণা এবং লোভও পরম শত্রু (৪৫৪-৬৬), অর্থও কম নহে (৪৬৭-৭১)। পারিবারিক মমতার বন্ধনও মানুষকে বারংবার সংসারের বেড়াজালে টানিয়া আনে (৪৭৯-৮৭), সুতরাং মোক্ষলাভ করিতে হইলে এই বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে (৪৮৮-৯৬)। জ্ঞানবানেরা তাই অনুভূতিলভ্য দ্রব্যে কখনো মত্ত হন না (৫০২-১৭)।

লেখক ধর্মে সম্ভবতঃ শৈব ছিলেন, কারণ ৩৯৮ সংখ্যক শ্লোকে তিনি জ্ঞানবানদিগের পরম পবিত্র এবং বিমল মুক্তিদায়ক শিবকে উপাস্য দেবতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

নীতিশাস্ত্র পর্যায়ের আর একখানি গ্রন্থের নাম হইল ব্রতীশাসন। গ্রন্থখানিতে ৩৭টি সংস্কৃত শ্লোক আছে ; ইহার পরই দেওয়া হইয়াছে প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় লেখা টীকা। যবদ্বীপীয় টীকা কোথাও কোথাও শুধুমাত্র অনুবাদ, আবার কোথাও বিস্তৃততর ব্যাখ্যা। কোথাও যেন এই ব্যাখ্যা মূলকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত ; শ্রীমতী সারদা রাণী এই গ্রন্থের সম্পাদনা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইহার ইংরাজী বা হিন্দী ভূমিকায় গ্রন্থের রচনাকাল ও ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করেন নাই। ভাব, ধর্মের পরিমণ্ডল ও যবদ্বীপীয় ভাষ্য বিবেচনা করিলে গ্রন্থখানি দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া মনে হইবে। তবে সমপর্যায় ভুক্ত গ্রন্থগুলির গভীর আলোচনা ব্যতীত কোন স্থিরসিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর নহে।

গ্রন্থারম্ভে পড়িতেছি :

॥ ওঁ ॥ অবিঘ্নমস্তু ॥ ওঁ ॥
ওম্ নমঃ শিবায়
প্রণম্য ভাস্করং দেবং ভুক্তিমুক্তিবরপ্রদম্
সর্বলোকহিতার্থায় প্রবক্ষে ব্রতিশাসনম্ ॥

পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে (২-৪) পঞ্চযম এবং পঞ্চ নিয়মের কথা বলা হইয়াছে। পঞ্চম হইতে অষ্টম শ্লোকে ব্রতী বা শিক্ষাকালীন সাধু কোন কোন দ্রব্য আহার করিবেন না তাহার তালিকা পরিবেশন করা হইয়াছে। ইহার পরই লেখক বলিয়াছেন যে ব্রতী তাঁহার মস্তকস্থ শিখা জিহ্বা এবং শিবদ্বার সর্বদা পবিত্র রাখিবেন। এই স্থলের বিস্তৃত ব্যাখ্যা অনেকটা যেন মূলকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইহার পর (১০) লেখক একটি বিখ্যাত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন :

নাস্তি বিদ্যা সমং মিত্রং নাস্তি ক্রোধসমো রিপুঃ
ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্ ॥

যবদ্বীপীয় টীকায় বলা হইয়াছে যে ব্রতী গুরুপাদে থাকিবেন ; পঞ্চ শিক্ষা, দশশীল এবং ক্রিয়া উপদেশে পারদর্শী হইবেন। নিয়মিত সূর্যসেবন এবং শিবানুষ্ঠান, অঙ্গে ভস্মধারণ করা, জপ, স্নানবিধি প্রভৃতি তাঁহার কর্মের অন্তর্ভুক্ত। ব্রতীগণকে জহ্লাদ, ঋণীব্যক্তি, সুদখোর, জুয়া

খেলার আড্ডায় যাইতে সাধারণভাবে বারণ করা হইয়াছে। তাঁহারা (১১) পঞ্চ চণ্ডালের (শুঁড়ী, সুদখোর, জহ্লাদ, কুম্ভকার এবং স্বর্ণকার) গৃহেও প্রবেশ করিতে পারিবেন না। অতঃপর সন্তান বা শিষ্যগণ সম্বন্ধে পিতা বা গুরুর কর্তব্য নির্ধারিত হইয়াছে (১২-১৪)। পঞ্চদশ শ্লোকে ব্রহ্মহত্যা কাহাকে বলে তাহা বলা হইয়াছে ; এই প্রসঙ্গে ব্রতী কিরূপে পতিত (মর্যাদাভ্রষ্ট) ও গুরুতল্পক হইতে পারেন তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। পতিত হইবার কারণ মধ্যে আছে নিকটাত্মীয় সঙ্গম এবং গুরুতল্পকের মধ্যে আছে গুরুর পত্নী, কন্যা, নিকটাত্মীয়া বা উপপত্নী সঙ্গম। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে স্তেয় (চুরি, ছুরিদ্বারা রক্তপাত করা, আঘাত করা, হত্যা করা, মানুষ অপহরণ করা এবং পরদ্রব্য আত্মসাৎ করা এবং ষড়াততায়ী ক্ষমার অযোগ্য। অতঃপর বলা হইয়াছে (১৬-১৮) যে ব্রতী ছয় প্রকারে পবিত্র হইবেন, যথা : আগ্নেয় ভস্ম, বারুণ (বারি), মন্ত্র (ব্রাহ্ম্য), গোক্ষুরোত্থিত ধূলি (বায়ব্য), জপমন্ত্র (মনস) এবং তীর্থ-মৃত্তিকা (পার্থিব) দ্বারা। তবে সর্বশ্রেষ্ঠ বিধি হইল সেই শাস্ত্র সমুদ্রে অবগাহন করা যাহা হৃদয় শতদলে বিকশিত এবং যম-নিয়মে নিরুদ্ধ। ইহার পর অজ্ঞাতসারে অখাদ্য দ্রব্যের ভোজন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া (২০) লেখক প্রাণায়াম, ধারণ, প্রত্যাহার, ধ্যান প্রভৃতি আচরণের গুণকীর্তন করিয়াছেন (২১)। পরবর্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ব্রতী দশধর্ম অবলম্বন করিবেন ; ইহার মধ্যে ধৃতি, ক্ষমা, দম প্রভৃতি আছে। ইহার পর দশ নিয়ম (২৩), দশ যম (২৪) প্রভৃতির বর্ণনা করা হইয়াছে। লেখক বলিয়াছেন যে দ্বিজগণ দশধর্ম আচরণ করিলে তাঁহারা "পরমা গতি" লাভ করেন (২৫)। ব্রতগুলি সংখ্যায় অনেক ; ইহার মধ্যে যবদ্বীপীয় টীকায় পুষ্পসাত্ত্বিক, জাগ্রসাত্ত্বিক এবং জ্ঞানসাত্ত্বিকের কথা বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে ব্রতিগণ যোগীশ্বর এবং তপের পথ অনুসরণ করিবেন নিষ্কামভাবে ; ফল আশা করিলেই তিনি পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইবেন (২৬)। পরবর্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ব্রতীর মন দাক্ষিণ্যে চন্দ্র সূর্যের মত উদার হইবে ; তাঁহার নিকট উচ্চনীচ, প্রভৃতির তারতম্য থাকিবে না। তিনি একদিকে যেমন তাঁহার বৈদগ্ধ্য বা গুণাবলি সাড়ম্বরে প্রচার করিবেন না, তেমনি তিনি আবার ত্রিমল (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) দ্বারাও অভিভূত হইবেন না। পরবর্তী শ্লোকে (২৮) বলা হইয়াছে যে ব্রতী তাঁহার চিহ্নাবলি, অর্থাৎ পবিত্র ভস্ম, বল্কল-পরিচ্ছদ, অক্ষ-মালা, শংখ এবং কটি-বাস সর্বদা যত্ন সহকারে রাখিবেন এবং কদাপি এইগুলি লইয়া পানাগারে প্রবেশ করিবেন না। তিনি ভটার রুদ্রের নির্দেশিত উপায়ে যম এবং নিয়ম রক্ষা করিবেন। চতুর্থ এবং নবম শ্লোকের প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে উনত্রিংশ শ্লোকে। পরবর্তী শ্লোকে অষ্টচোরের বর্ণনা করা হইয়াছে ; ইহার কথা যবদ্বীপীয় অন্যান্য গ্রন্থেও আলোচিত হইয়াছে। লেখক অতঃপর পূর্ববর্ণিত পঞ্চ নিয়ম, দশ যম, দশশীল প্রভৃতির আলোচনায় ফিরিয়া গিয়াছেন। দ্বাত্রিংশ শ্লোকে লেখক ব্রতীকে তাঁহার যজ্ঞসূত্র, ভস্ম, অক্ষমালা প্রভৃতি সযত্নে রক্ষা করিতে বলিয়াছেন, নতুবা তিনি নিরয়গামী হইবেন। গুরু ব্রতীকে সঠিক উপদেশ দান করেন ; সুতরাং লেখক বলিয়াছেন যে এই উপদেশ পালন করাই প্রকৃত গুরু দক্ষিণা। অতঃপর (৩৩) বলা হইয়াছে যে মানুষের দেহে পঞ্চ রিপু বাস করে। যথা ক্রোধ, লোভ, মোহ, রাগ এবং দ্বেষ ; এইগুলি (৩৪) কলুষাদি দোষের সঙ্গে

সংযুক্ত হইয়া চতুর্দশ দোষের সৃষ্টি করিয়া থাকে। পরবর্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে যে নারী, পান, দ্যূতক্রীড়া, শিকার ইত্যাদির প্রতি আসক্তি যোগীশ্বরের পক্ষে বিশেষভাবে হানিকর। ব্রতী পরম জ্ঞান লাভ করিলে শিবপদ প্রাপ্ত হইবেন ; যদিও বা যোগী শূন্যপদ লাভ না করেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ধনশালী ও ক্ষমতাবান হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। এইরূপ লোকের বর্ণনা পড়িতেছি আমরা ৩৬ সংখ্যক শ্লোকে। সেখানে বলা হইয়াছে যে তিনি সৎকুলে জন্মগ্রহণ করিবেন ; তিনি হইবেন রূপবান, চরিত্রবান, ধনশালী, শাস্ত্রজ্ঞ, দয়াশীল, বীর, আত্মত্যাগে সমুৎসুক, কিন্তু তাঁহার অর্থের প্রতি কোন আসক্তি থাকিবে না। তিনি হইবেন সৌভাগ্যবান ও বন্ধুবৎসল। এইরূপ লোক জীবিতকালে যোগীশ্বর হইয়া থাকেন ; মৃত্যুর পর তিনি রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন। তিনিই রুদ্রের অবতার এবং তাঁহাকে মহাপুরুষ সংজ্ঞা দেওয়া যায়। কোন ব্রতী দশশীলে পারদর্শী হইতে চাহিলে অবশ্যই ব্রতীশাসন পাঠ করিবেন।

এই শ্রেণীর নীতিশাস্ত্র পর্যায়ের আর একখানি গ্রন্থের নাম শ্লোকান্তর। ইহা ৮৩টি সংস্কৃত শ্লোকে বিরচিত হইয়াছে। ইহার পরেই প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় টীকা লেখা হইয়াছে। ইহার সম্পাদিকা বলিয়াছেন[২৭] যে শ্লোকান্তর গ্রন্থখানি সংস্কৃত নীতিশাস্ত্র পর্যায়ের গ্রন্থ, যদিও ইহার কোন কোন অংশকে স্মৃতিশাস্ত্রের অঙ্গীভূত করা যায়, যেমন এই গ্রন্থের পাতকের ৪টি শ্রেণী বিন্যাস করা : (১) পাতক (২) উপপাতক (৩) মহাপাতক (৪) অতিপাতক। ষট্ আততায়ী সম্বন্ধেও সংস্কৃত স্মৃতিশাস্ত্রে আলোচনা করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে কোন মঙ্গলাচারণ নাই এবং শ্লোকগুলির প্রত্যেকটি দুইটি চরণে নিবদ্ধ। গ্রন্থারম্ভে আমরা পড়িতেছি :

"ব্রাহ্মণো বা মনুষ্যাণামাদিত্যো বাপি তেজসাম্।
শিরো বা সর্বগাত্রেষু ধর্মেষু সত্যমুত্তমম্।"

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে হইলেন ব্রাহ্মণ, তেজের মধ্যে আদিত্য, শরীরের মধ্যে শির এবং সর্বধর্মের মধ্যে সত্যই উত্তম বা শ্রেষ্ঠ। যবদ্বীপীয় টীকায় ইহার বিস্তৃততর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কথা বলিয়াছেন যথা শুক্লব্রহ্মচারী, শবল-ব্রহ্মচারী এবং কৃষ্ণব্রহ্মচারী। সমগ্র জীবন যাহারা অবিবাহিত রহিয়াছেন এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গে জীবনে একদিনও কথা বলেন নাই তাহারাই শুক্ল ব্রহ্মচারী। শবল ব্রহ্মচারী জীবনে একটি মাত্র স্ত্রী পরিগ্রহণ করিয়াছেন, কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী অনধিক চারি স্ত্রী পরিগ্রহণ করিতে পারেন[২৮]। দ্বিতীয় শ্লোকে দানকার্যের উপযুক্ত সময় কি তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। অতঃপর পরবর্তী ৩টি শ্লোকে ব্রাহ্মণকে দান, শ্রদ্ধার সহিত দান এবং ক্রোধের সহিত দান করিলে কি হয় তাহার ফলাফল বর্ণনা করা হইয়াছে। ক্রোধের সহিত দানের সম্বন্ধে লেখক বলিয়াছেন :

"অনন্তদানং দত্তং বৈ দাতৃনাং রোষমিশ্রিতম্।
তৃণ-সংনিপাতো হ্যগ্নেঃ সাধনে নিয়তং ভস্ম ॥"

অর্থাৎ ক্রোধের সহিত যদি অনন্ত দানও করা যায় তাহা হইলে উহার ফল অগ্নিসংস্পৃষ্ট তৃণভস্মের তুল্য।

ইহার পর ষষ্ঠ শ্লোক হইতে অষ্টম শ্লোক পর্যন্ত সত্য এবং অসত্যের পুণ্যাপুণ্য বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীমতী শারদা রাণী বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থের ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্লোক মহাভারতের (১।৭৪।১০২ ও ১।৭৪।১০৫) অনুরূপ ; সুতরাং ইহা মহাভারত হইতে লওয়া হইয়াছে[২৯]। লেখক অতঃপর বলিয়াছেন যে রূপ, যৌবন, বিত্ত, প্রিয়জন-সংযোগ অনিত্য এবং একমাত্র ধর্মই চিরস্থায়ী, সুতরাং সর্বদা ধর্মাচরণ করিবে[৩০]। ইহার পর লেখক দশম শ্লোকে সুন্দর একটি ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন :

"অর্থা গৃহে নিবর্তন্তে শ্মশানে মিত্রবান্ধবাঃ।
সুকৃতং দুষ্কৃতং চৈব ছায়াবদনুগচ্ছতি ॥"

অর্থ গৃহেই পড়িয়া থাকে, প্রিয় বান্ধবগণ থাকেন শ্মশানে ; কেবলমাত্র সুকৃতি এবং দুষ্কৃতিই (আত্মাকে) ছায়ার মত অনুসরণ করিয়া থাকে। লেখক অতঃপর বলিয়াছেন যে যাহারা যমালয় হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পৃথিবীতে পুনঃ জন্মগ্রহণ করে তাহারা নানাপ্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকে। সুতরাং কুচিন্তা পরিত্যাগ করিতে হইবে। পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণিগণের পাপের ফলভোগস্বরূপ নিম্নতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করার বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার পর পাঁচটি যম-ব্রতের (অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, শুদ্ধি, আহারলাঘব, অস্তেয়) কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীমতী শারদা রাণী বলিয়াছেন[৩১] যে এই পাঁচটি যমের মধ্যে অহিংসা, ব্রহ্মচর্য এবং অস্তেয় সমস্ত তালিকাতেই পাওয়া যায়, কিন্তু শুদ্ধি এবং আহারলাঘব অন্যত্র যম হিসাবে পরিগৃহীত হয় নাই। বৃহস্পতিতত্ত্ব এবং ব্রতিশাসনেও আহারলাঘব যম হিসাবে উদ্ধৃত হয় নাই, তবে মনুসংহিতার (৪।২০৪) কুল্লূকভট্ট কৃত টীকার পঞ্চ-নিয়মের মধ্যে আহারলাঘব আছে[৩২]। লেখক অতঃপর বলিয়াছেন যে যাঁহারা ধার্মিক তাঁহাদের কোন কিছু ভয় করিবার কারণ নাই এবং তাঁহারা অধর্ম করিয়া অধর্মকে প্রতিহত করেন না। এইরূপে তাঁহারা শিবলোকে গমন করিয়া থাকেন। ইহার পর রাজা ভীরু হইলে রাজার এবং দেশের কি দুর্দশা হয় তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। লেখক ইহার পর একটি সুন্দর শ্লোকে বলিয়াছেন (১৯ শ্লোক) :

"সিংহাকৃতী রণমধ্যে স্ত্রীমধ্যে মধুরংকথ।
মুনিমধ্যে তু তত্ত্বজ্ঞঃ স যুক্তো নগরং গতঃ ॥"

যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহতুল্য, স্ত্রীকুলে প্রিয়ম্বদ এবং মুনিমধ্যে তত্ত্বজ্ঞ—এইরূপ নাগরিক উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হওয়া উচিত।

ইহার পরবর্তী শ্লোকে (২০) ধর্মাধ্যক্ষের যোগ্যতা পরিমাপক গুণাবলীর বর্ণনা করা হইয়াছে। লেখক অতঃপর বলিয়াছেন যে যাহার চিত্ত স্থির, সরস্বতী (বিদ্যা) এবং লক্ষ্মী (ঐশ্বর্য) দ্বারা বিভ্রান্ত হয় না ("মাদয়তি ন চেতাংসি") তিনিই পুরুষ নামে আখ্যাত হইবার যোগ্য।

দ্বাবিংশ শ্লোকে আমরা পড়িতেছি যে কেহ যদি রহস্যচ্ছলে, প্রাণ এবং বিত্ত রক্ষার জন্য কিংবা স্ত্রীলোকদিগের নিকট অথবা বিবাহকালে মিথ্যা ভাষণ করেন তাহা হইলে এই

পঞ্চ-অনৃত ভাষণের জন্য তাঁহার পাতক হইবে না[৩৩]। ইহার পর লেখক নারীগণের চরিত্র এবং সম্ভ্রান্তবংশের সুন্দর মূর্খ যুবকগণ সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করিয়াছেন। তিনি অতঃপর বলিয়াছেন যে জগতে গুণেরই সমাদর, বংশের নহে (২৫-২৬)। ইহার পর (২৭-২৮) বৈশ্য এবং শূদ্রের কর্তব্য নির্ধারণ করা হইয়াছে, কিন্তু শূদ্রের কর্তব্যের মধ্যে যাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা সাধারণতঃ হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত নহে, কারণ ইহার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যেরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, দ্বিজাতিগণের সেবা করা নহে[৩৪]। ইহার পর (২৯) অন্ত্যজাতির অন্তর্ভুক্ত অষ্ট চণ্ডালের নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে আছে : চূর্ণ, সুরা, নীল প্রস্তুতকারক, রজক, কুম্ভকার, কসাই, ধাতুদগ্ধা (যবদ্বীপীয় টীকায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে : স্বর্ণকার) এবং তন্তুবর্ণ[৩৫]। শেষোক্ত শব্দটির অর্থ সম্ভবতঃ যে তন্তু বা সুত্রকে রঞ্জন করে ; যবদ্বীপীয় ভাষ্যটির অর্থ সুস্পষ্ট নহে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন (৩১) যে উচ্চবর্ণের কেহ যদি নিম্নবর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করেন তবে তাহাকে শূদ্র বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ইহার পর (৩২) গ্রন্থকার ষড়াততায়ীর কথা বর্ণনা করিয়াছেন ; ইহাদের কথা আমরা পূর্বেই আগম বা ধর্মশাস্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। গ্রন্থকার ৩৪ নং শ্লোকে ধূর্ত এবং পরবর্তী শ্লোকে কর্মফলের কথা বর্ণনা করিয়াছেন[৩৬]। ইহার পর (৩৬-৩৮) ধর্ম, স্বর্গচ্যুত ব্যক্তি এবং কাহারা পৃথিবী উপভোগ করিবে তাহাদের সম্বন্ধে সংস্কৃত শ্লোকে এবং বিস্তৃততর যবদ্বীপীয় টীকায় আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার অতঃপর রাজগণের পক্ষে অকরণীয় ৪টি কাজের ফিরিস্তি দিয়াছেন (৩৯)। ইহার পর দুর্বৃত্ত প্রভুকে পরিত্যাগ করা, পুর্বজন্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফলাফল প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়া (৪০-৪১) লেখক কিরূপ স্ত্রী এবং রাজাকে পরিত্যাগ করা যায় তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন (৪২)। ইহার পর পঞ্চচণ্ডাল[৩৭] এবং সর্বাপেক্ষা দুষ্টচণ্ডালের বর্ণনা দিয়া (৪৩-৪) লেখক সংসর্গ হইতে সঞ্জাত দোষগুণের বর্ণনা দিয়াছেন (৪৫)। লেখক এই প্রসঙ্গে দুইটি সবুজবর্ণের টিয়াপাখীর কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন ; তিনি বলিয়াছেন যে পরিবেশের জন্য ইহাদের মধ্যে ব্যাধ-পালিত পক্ষীটি দুর্ভাষী এবং মুনি-প্রতিপালিত পক্ষীটি হইল প্রিয়ম্বদ। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে কেহই দোষশূন্য নহে (৪৬), এমন কি দেবতাদেরও দোষ আছে (৪৭)। ইহার পর লেখক ৪৮ সংখ্যক শ্লোকে বলিয়াছেন :

"রাজবৎ পঞ্চবর্ষেষু দশ বর্ষেষু দাসবৎ।
মিত্রবৎ ষোড়শবর্ষ ইত্যেতৎ পুত্রশাসনম্ ॥"

অর্থাৎ পুত্রকে পাঁচ বৎসর রাজার ন্যায় প্রতিপালন করিবে, দশ বৎসর করিবে দাস বা ভৃত্যের মত এবং ষোড়শবর্ষ হইতে তাহার সহিত মিত্রের মত ব্যবহার করিবে। চাণক্যের লেখায় আমরা পড়িতেছি :

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষানি দশবর্ষানি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ ॥"

শ্রীমতী শারদা রাণী ইহার অনুরূপ বহু দৃষ্টান্ত পরিবেশন করিয়াছেন[৩৮]। ইহার পর পুত্রকে শাসন করিবার পন্থা নির্দেশ করিয়া (৪৯) লেখক বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে এমন কয়েকটি

কার্য আছে যাহাতে কালহরণ করা কর্তব্য নহে, যেমন কন্যার বিবাহ, ঋণ পরিশোধ, দান, ধনার্জন, শত্রুনিপাত, বিদ্যার্জন, অগ্নি নির্বাপণ এবং রোগ নিরাময় (৫০)। ইহার পর শত্রুমিত্র নির্ণয়, সুপুত্র[৩৯], বিভিন্ন চরিত্রের ভ্রাতার কথা (৫১-৩) বর্ণনা করিয়া লেখক বলিয়াছেন (৫৪) যে লোভের একমাত্র প্রতিষেধক হইল ত্যাগ। স্ত্রী পরিগ্রহণ ব্যাপারে লেখক উপদেশ দিয়াছেন যে ধনশালিনী বৃদ্ধা, সপ্রতিভা কুদর্শনা নারী বা অপূর্ব সৌন্দর্যশালিনী দরিদ্র নারীকে বিবাহ করা পুরুষদের পক্ষে কর্তব্য (৫৫)। গ্রন্থকার ইহার পর বিত্তশীল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বেদজ্ঞানহীন দ্বিজ এবং অনুচরবিহীন রাজাকেও শ্রদ্ধার যোগ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পর তিনি বলিয়াছেন (৫৭) যে অনার্যগণের শক্তি হইল হিংসা[৪০], গুণবানগণের শক্তি হইল ক্ষমা এবং রাজার শক্তি হইল দণ্ডবিধি। গ্রন্থকার অতঃপর কোন কোন জিনিষ বিষ বা বিষতুল্য তাহা বর্ণনা করিয়াছেন (৫৮-৯)। ইহার মধ্যে আমরা পড়িতেছি যে অনভ্যাসে শাস্ত্র, অজীর্ণে ভোজন, দরিদ্রগণের পক্ষে গোষ্ঠী এবং বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা বিষতুল্য[৪১]। স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া (৬০) তিনি বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোকগণকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা : কন্যা (কামভাবরহিতা), যুবতী (রজস্বলা), কান্তা (পীন পয়োধরা) এবং প্রমদা (কামাতুরা)[৪২]। ইহার পর লেখক কোন্ কোন্ জিনিষ হইতে শঙ্কা উৎপাদিত হইতে পারে তাহার বর্ণনা দিয়া (৬১) বলিয়াছেন (৬২) যে রাজা বিত্ত সঞ্চয় করিয়া, মহাসমুদ্র নদীর জল ধারণ করিয়া, পণ্ডিতগণ সুভাষিতাবলী দ্বারা এবং আঁখি প্রিয়জনকে দর্শন করিয়াও অতৃপ্ত রহিয়া যায়[৪৩]। তিনি আরো বলিয়াছেন (৬৩) যে পণ্ডিতগণের জ্ঞান পাত্রান্তর্বর্তী দীপশিখার তুল্য। ইহার পর লেখক সত্যশীল ব্যক্তিগণের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া (৬৪) পরবর্তী শ্লোকে বলিয়াছেন যে কৃতযুগে তপই হইল শ্রেষ্ঠ, ত্রেতায় হইল জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কলিযুগে শ্রেষ্ঠ হইল দান[৪৪]। ইহার পর লেখক একটি শ্লোকে প্রধানকে শকট এবং পুরুষকে বৃষভের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঈশ হইলেন সারথি সংযুক্ত জগতের মত যাহা চক্রবৎ ভ্রমণ করিতেছে[৪৫]।

লেখক ৬৭ শ্লোকে দানের শ্রেণীবিন্যাস করিয়া কন্যাদানকে সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইল বিদ্যাদান, যাহার ফল সীমাহীন। লেগক ইহার পর (৬৮) পাতক, উপপাতক, মহাপাতক, অতিপাতকের ফলাফল বিভিন্ন (৬৯-৭২) শ্লোকে এবং বিস্তৃততর যবদ্বীপীয় টীকায় বর্ণনা করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এই শ্রেণীবিন্যাস সম্বন্ধে মতৈক্য নাই, তবে পঞ্চ মহাপাতকের তালিকা ছান্দোগ্য উপনিষদের (৫।১০।৯) যুগ হইতে একই প্রকার রহিয়াছে। শ্রীমতী শারদারাণী বলিয়াছেন যে পাতকের মধ্যে অন্যতম হইল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিবার পূর্বে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ; ইহা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের (৩।২।৮।১১) যুগেই পাতক বলিয়া গণ্য হইয়াছে[৪৬]। সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থে ইহার শ্রেণীবিন্যাস পাওয়া যায় প্রায়শ্চিত্তবিবেক, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, কাত্যায়ন, বশিষ্ট ধর্মসূত্র প্রভৃতিতে[৪৭]। লেখক ৭৫নং শ্লোকে বলিয়াছেন যে কাঞ্চন বারংবার দগ্ধ হইয়াও তাহার কান্তিভ্রষ্ট হয় না, চন্দন বারংবার ঘর্ষিত হইয়াও তাহার চারুগন্ধ হারায় না এবং ইক্ষুদণ্ডও পুনঃ পুনঃ কর্তিত হইয়াও শর্করাহীন

হয় না। বস্তুতঃ যাহারা উত্তম তাহারা অন্তিমেও তাহাদের প্রকৃতি বিসর্জন দিতে পারে না। লেখক চতুর্বর্ণের সৃষ্টি সম্বন্ধে বলিয়াছেন (৭৮) :

"ললাটাজ্জায়তে বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বাহুজস্তথা।
উরুভ্যাং জায়তে বৈশ্যঃ শূদ্রাস্তু পাদজস্তথা ॥"

এই শ্লোকটি এবং ইহার ভাবার্থ সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন স্থলে পরিবেশিত হইয়াছে। ৮২নং শ্লোকটিও সংস্কৃতে সুপরিচিত বলিয়া এখানে উদ্ধৃত করিলাম :

"আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষিতেন চ।
নেত্রবক্ত্রবিকারেণ জায়তে চ পরীক্ষিতঃ ॥"

অর্থাৎ কোন লোককে পরীক্ষা করা যায় তাহার আকার, ইঙ্গিত, গতি, কার্য, বাক্য এবং চোখ ও মুখের বিকারের দ্বারা। এই শ্লোকটি হিতোপদেশেও (২।৫০) বিদ্যমান। এই গ্রন্থের শেষ অংশে[48] দশ পরমার্থ, দশ মল এবং নব সঙ্গের বর্ণনা দিয়া গ্রন্থের উপসংহার হইয়াছে। এই স্থলে দশ পরমার্থের নাম হইল : তপ, ব্রত, সমাধি, শান্ত, সন্মত, করুণা, করুণী, উপেক্ষা, মুদিতা, মৈত্রী। অন্যত্র ইহাকে দশশীল বা দশ পরমার্থ রূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে[49]।

দশ মল হইল চিত্তের দশটি মল বা অপবিত্রতা, যথা : তন্দ্রী (আলস্য প্রভৃতি), ক্লেদ (কার্যে অনিচ্ছা), লেজ (তামসিক মন), কুটিল (অন্যের ক্ষতিকারক), কুহক (রাগান্বিত মন), মৈত্রয় (দুর্ভাষী), রগণ্ড্রী (লজ্জাশীলা মহিলাদের শালীনতা হানিকর), ভক্ষ-ভুবন (অপরের প্রতি অত্যাচারী), কিম্বুরু (সৎ লোকের সম্পত্তি হরণের মনোবৃত্তি) এবং মেগও। শেষোক্ত শব্দটির অর্থ বোঝা গেল না। ইহার পর গ্রন্থকার নয়টি সদ্গুণের কথা বলিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন ; ইহা লক্ষণীয় যে এই সদ্গুণাবলীর মধ্যে কুটারমানব পাঠ একটি।

এইবার আমরা তত্ত্ব নিঙ্ ব্যবহার নামক গ্রন্থখানির আলোচনা করিব। এই গ্রন্থখানি খুব প্রাচীন না হইলেও ইহাতে চতুর্বর্ণের সৃষ্টির ইতিহাস এবং জগৎ-উৎপত্তির কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ যথাক্রমে ব্রহ্মার ললাট, বাহু, উরু এবং পদ হইতে উদ্ভূত হইলেন। ভারতীয় ধর্মগ্রন্থে ললাটের স্থলে আমরা পাই "মুখম্"[50]। ইহাতে রাজার কর্তব্য নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ পরিবেশন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তুমপেল, কেদিরি এবং মজপহিতের রাজা সম্বন্ধেও কিছু কিছু সংবাদ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। অবশ্য এই সংবাদে ঐতিহাসিক তথ্য বিবৃত হয় নাই। ইহাতে বলা হইয়াছে কেদিরিতে বিষ্ণুর বংশধর এবং মজপহিতে ব্রহ্মার বংশধরগণ রাজত্ব করিতেন। এই গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ রাদেন বিজয় কর্তৃক মজপহিত রাজ্য স্থাপনের পরে কোন সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে[51]।

এইবার আমরা যবদ্বীপীয় নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচনা শেষ করিব। যবদ্বীপীয় নীতি-শাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই, সুষ্ঠুভাবে আলোচিতও হয় নাই। তবুও যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতি সংক্রান্ত পুস্তক অর্থাৎ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র দ্বীপময় ভারতে কোনদিন প্রচলিত ছিল না। যদিও তাঁহার নাম যবদ্বীপে

অজ্ঞাত ছিল না[৫২], তথাপি দ্বীপময় ভারতে চাণক্য শ্লোকের ছিন্নাংশ ব্যতীত আর কিছুই অত্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তবুও যবদ্বীপীয় নীতিশাস্ত্রের কোন কোন অংশ পড়িয়া মনে হয় যে উহার মধ্যে যেন কৌটিলীয় ধারণার প্রতিফলন দেখিতেছি।

গ. স্মৃতিশাস্ত্র

ধর্ম এবং প্রশাসনিক সমস্ত আইনকানুন দেবতাদের অবদান এই মতবাদ মনুসংহিতায় প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রীয় গ্রন্থের মধ্যে মনুসংহিতার মর্যাদা সর্বোচ্চে ; সুতরাং মনু-সংহিতার বিধান ভারতবর্ষের সর্বত্র শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইয়াছে। বৃহস্পতির একখানি গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে-স্মৃতি বা নিয়ম মনুসংহিতায় সমর্থিত হয় নাই তাহা গ্রহণীয় নহে, কারণ মনু-সংহিতায় বেদ বা শ্রুতির মর্মার্থ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে[৫৩]। সুতরাং মনুসংহিতার মধ্যে যে বৈদিক বিধান প্রতিফলিত হইয়াছিল তাহা প্রাচীন হিন্দু ধর্মশাস্ত্রবেত্তাদের অনেকেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ স্মৃতিশাস্ত্র যে ভগবানের আশির্বাদলব্ধ এই ধারণা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিত্তমান ছিল। আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে পড়িতেছি[৫৪] :

"সনৈববব্যভবৎ তৎ শ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্মম্"

ঐ গ্রন্থেরই অন্যত্র আমরা পড়িতেছি :

"তম্ দেবাশ্রক্রিরে ধর্মম্ স এবাদ্য স উশ্চ।"[৫৫]

জাভা এবং বলিদ্বীপের আগম বা স্মৃতিশাস্ত্রও যে দেবতাদের আশীর্বাদলব্ধ তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ যবদ্বীপের কোন কোন গ্রন্থের প্রবক্তা ছিলেন শিব। শিবমানস বা পূর্বাদিগম নামক আগমশাস্ত্র শিবপ্রোক্তবিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছে বলিয়া খ্যাত। যবদ্বীপীয় আগম-সাহিত্যেও মনুর স্থান সর্বোচ্চে নির্ধারিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কয়েকটি প্রাচীন যবদ্বীপীয় গ্রন্থে মনু পুরাকালের একজন রাজা এবং আইনদাতা হিসাবে কীর্তিত হইয়াছেন। ঋষিশাসন গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে মনুই প্রথম নরপতি যিনি শৈবগণের জন্য শিবশাসন প্রচলন করিলেন। শিবশাসন গ্রন্থখানি প্রশস্তি বা উপদেশদান পদ্ধতিতে বিধৃত হইয়াছে ; উহাতে কথিত হইয়াছে যে উহা মেড়ঙ্গ-রাজ "ভটার প্রভু মনু পাদুক শ্রী মহারাজ" কর্তৃক প্রচলিত হইয়াছে। তবে যবদ্বীপীয় কোন কোন রাজাও যে আগম বা আইনশাস্ত্র সঙ্কলন করিবার জন্য লোক নিয়োগ করিয়াছেন সাহিত্যে তাহার পরিচয় আছে। রাজা কৃতনগরের সময়ও একখানি আইনশাস্ত্র সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়[৫৬]। তবে ইহা সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, পরবর্তী যুগে আইনশাস্ত্রের যে-সমস্ত সঙ্কলন হইয়াছিল তাহা প্রধানতঃ মনুসংহিতাকেন্দ্রিক। কারণ এ পর্যন্ত যে-সমস্ত যবদ্বীপীয় আইনশাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মূল উৎসই ছিল মনুসংহিতা। কুটার-মানব, স্বয়ম্ভু প্রভৃতি গ্রন্থ প্রধানতঃ মনুসংহিতাকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে।

বস্তুতঃ মনুসংহিতার অসামান্য প্রভাব সাহিত্যেও উল্লিখিত হইয়াছে। ভোমকাব্য[৫৭], প্রাচীন যবদ্বীপীয় অনুশাসনলিপি[৫৮], ঋষিশাসন[৫৯], প্রতত্তি ভুবন, পুরুষদসস্ত[৬০] প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ এই গ্রন্থের উচ্চ মর্যাদার পরিচায়ক।

মনুসংহিতার এই উচ্চ মর্যাদা থাকিলেও যবদ্বীপীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একমাত্র মনুসংহিতার বিধান মানিয়া চলা একান্তই অসম্ভব ছিল। যবদ্বীপের সামাজিক ব্যবস্থা এবং স্বদেশী আইনকানুনের নাগপাশ ইহার জন্য অনেকটা দায়ী ছিল এবং এই অস্বাভাবিক অবস্থা বিভিন্ন স্থলে প্রতিফলিত হইয়াছে। পুর্বাদিগম গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে যিনি সৎ বিচারক হইবেন তিনি "অষ্টাদশব্যবহার", প্রচলিত রীতিনীতি, উহা হইতে উদ্ভূত শিক্ষণীয় বিষয় এবং অনুরূপ প্রাক্তন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারকার্য নিষ্পন্ন করিবেন। এই উপদেশ যে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইত তাহার নিদর্শন পাই প্রাচীন যবদ্বীপীয় অনুশাসনলিপিগুলি হইতে। তুমপেল-মজপহিত যুগের একখানি অনুশাসন লিপিতে দুই পক্ষের বিবাদ উপলক্ষ্যে কুটারমানবাদির উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে :

"পিনমেতেকেন শাস্ত্রদৃষ্ট, দেশঋষ্ট, উদাহরণ, গুরুকক, মকতঙ্গবন রসাগম রি সঙ্ হঙ্ কুটারমানবাদি"[৬১] অর্থাৎ শাস্ত্রানুশাসন, অলিখিত সামাজিক রীতি, উদাহরণ, প্রাচীন গুরুগণের নির্দেশ প্রয়োগ করিতে হইবে; পবিত্র কুটারমানবাদি গ্রন্থের মুখ্য উপদেশাবলীর উদ্দেশ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে।

আমরা বেন্দোসরি এবং প্রেসিকের জয়পত্র বা আদালতের রায় পাঠ করিলেও জানিতে পারি যে বিচারকগণকে আইনশাস্ত্র ব্যতীত প্রচলিত সামাজিক বিধি, উদাহরণ, প্রাচীন আচার্যগণের উপদেশাবলী এবং কুটারমানবের মূল নির্দেশ মান্য করিয়া চলিতে হইত।

এই নির্দেশটি আরো সুস্পষ্ট রূপে প্রতিফলিত হইয়াছে পুর্বাদিগম নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থের একটি প্রয়োজনীয় অংশে আমরা পড়িতেছি[৬২] : "নিহন্ লুইর সঙ্ প্রাগ্ বিবাক। যন্ হন সির ড়ঙ্গ আচার্য সম্পূর্ণ ক্রুহ নির রিঙ্ সর্বশাস্ত্র, মকাদি ঙ্গ ধর্মশাস্ত্র, কুটারমানবাদি, সারসমুচ্চয়, চাণক্য, কামন্দকাদি, তন্ কেবেরন্ সির রিঙ্গ রুসিৎ বেলহনিঙ্ পদার্থনিকঙ্গ অষ্টদশব্যবহার মুয়ঙ্ লোকিক প্রয়োগণ্য সহোপদেশন্য তেকেঙ্, মবস্, ক্রুহ্; নিরেবিক কবেহ, সক রি কসর্বজ্ঞত্ব নিররিকেঙ্ সর্ব শাস্ত্র, সঙ্ সমঙ্গকন ক্রমনির প্রাগ্ বিবাক ঙ্গরনির। সির ব্যবহার বিচ্ছেদক, রি দেনির ন্ বেলঙ্ মেগতকেন সর্ব ব্যবস্থানিঙ্গ লোক মুয়ঙ্ বাদ নিঙ্ বুয়ঙ্ রিঙ্ সর্ব রাজ্য। নাহন্ হেতু নির ন্ সিনঙ্গুহন প্রাগ্ বিবাক।"

ইহার বাংলা অনুবাদ হইবে : "এখন একজন প্রাগবিবাক[৬৩] এইরূপ হইবেন : (তিনি হইবেন) একজন আচার্য, যাঁহার সর্বশাস্ত্রে, (যথা) প্রথমতঃ ধর্মশাস্ত্র, কুটারমানব, সারসমুচ্চয়, চাণক্য, কামন্দক ইত্যাদিতে জ্ঞান হইবে সম্পূর্ণ। তিনি (নিম্নলিখিত) দুইটি বিষয়ের পার্থক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিবার মুস্কিল দেখিয়া হতাশ হইবেন না : (১) অষ্টাদশব্যবহার এবং (২) লোকাচার ও তাহা হইতে উদ্ভূত উপদেশ এবং উদাহরণ। এই সমস্ত বিষয়ে তাঁহার শাস্ত্রের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি হইবে প্রখর। এইরূপ লোককে বলা হয় প্রাগ্ বিবাক। তিনি আইনগত বিবাদে

বিচারক ; সুতরাং সামাজিক রীতিনীতি এবং সমগ্র রাজ্যের লোকদের মধ্যে বিবাদ সম্বন্ধে তাঁহাকে সুনিপুণ রায় প্রদান করিতে হইবে। এইজন্যই (এইরূপ) একজন (ব্যক্তি) প্রাগবিবাক নামে আখ্যাত হইয়াছেন।"

ডঃ ভান নায়েরসেন বলিয়াছেন যে এই প্রাগ্‌বিবাক দ্বারা ধর্মাধ্যক্ষ এবং সপ্তোপপত্তিকে নির্দেশ করিতেছে ; তাঁহারা প্রাগ্‌বিবাকও বটেন, আবার ব্যবহার বিচ্ছেদকও বটেন। অনুশাসনলিপিগুলিতেও ধর্মাধ্যক্ষ এবং উপপত্তিকে প্রাগ্‌বিবাক এবং ব্যবহার-বিচ্ছেদক বলা হইয়াছে[৬৪]। উপরোক্ত উদ্ধৃতি হইতে বোঝা যাইতেছে যে একজন সৎ বিচারককে ধর্মশাস্ত্র, কুটারমানব, সারসমুচ্চয়, চাণক্য এবং কামন্দকীয় শাস্ত্র ইত্যাদিতে পারদর্শী হইতে হইবে। উপরোল্লিখিত ধর্মশাস্ত্র দ্বারা যে শ্রেণীর গ্রন্থগুচ্ছকে বুঝাইতেছে তাহা ভারতবর্ষের অনুরূপ কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে বলা মুস্কিল ; কুটারমানব দ্বারা হয়তো কোন আইনবিধির সঙ্কলন বুঝাইতেছে[৬৫] ; বর্তমান সারসমুচ্চয় গ্রন্থটি নীতিবাক্যের সঙ্কলন। চাণক্য দ্বারা তাঁহার অর্থশাস্ত্র এবং কামন্দক দ্বারা তাহার রাজনীতি অথবা তদ্ভিন্ন কামন্দক জাতীয় নীতিমূলক কাহিনীর সঙ্কলন বুঝাইতেছে এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এই সংস্কৃত গ্রন্থ বা ইহার অংশবিশেষ যে যবদ্বীপে প্রচলিত ছিল তাহা যবদ্বীপীয় সাহিত্যে চাণক্য শ্লোকের ছিন্নাংশের উদ্ধৃতি হইতেই প্রতীয়মান হয়। যাহাই হউক এই সমস্ত শাস্ত্র, লোকাচার, উদাহরণ প্রভৃতিকে হিন্দু আইন-শাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্যবিধান করা সহজসাধ্য ছিল না এবং তাহাই সম্ভবতঃ পূর্বাধিগমে উল্লিখিত হইয়া থাকিবে। অন্য গ্রন্থেও এই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করা হইয়াছে। বস্তুতঃ কুটার-মানবে বলা হইয়াছে যে বিচার করিতে হইলে চতুর্‌দ্রেস্তের (সংস্কৃত : চতুর্দ্রিষ্ট) দিকে লক্ষ্য করা চাই। চতুর্‌দ্রেস্ত হইল চারিটি বিষয়, যথা (ক) লোকদ্রেস্ত অর্থাৎ যে-সমস্ত লোকের উপর আইন প্রয়োগ করা হইতেছে তাহাদের ব্যক্তিগত সুনাম, (খ) পূর্বদ্রেস্ত বা পুর্বতন কালের সামাজিক বিধান বা রীতিনীতি, (গ) দেসদ্রেস্ত বা গ্রামাঞ্চলের প্রচলিত রীতিনীতি এবং (ঘ) সস্ত্রদ্রেস্ত অর্থাৎ শাস্ত্র বা আগমে বর্ণিত বিধানাবলী[৬৬]। এই সমস্ত বিষয় বিচার বিবেচনা করিয়া বিচারক বা ধর্মাধ্যক্ষকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে গ্রামাঞ্চলের শাসনব্যবস্থায় স্বদেশী সামাজিক রীতিনীতি ও আইনকানুনের প্রভাব যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল, কিন্তু রাজধানীতে এবং যে-স্থলে কেন্দ্রীয় শাসন প্রখরভাবে বিদ্যমান ছিল সেইস্থলে স্বদেশী আইনকানুনগুলিকে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিতে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। বিভিন্ন আইন গ্রন্থগুলি আলোচনা করিবার সময় এই বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হইবে।

যাহাই হউক উপরোক্ত বিভিন্ন বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিচারপতিকে একটি সিদ্ধান্তে আসিতে হইত। এই সিদ্ধান্তে আসিতে তাঁহাকে ত্রিপ্রমাণের উপর নির্ভর করিতে হইত ; বলিদ্বীপীয় ভাষায় ত্রিপ্রমাণের নাম হইয়াছে ত্রিপমন। এই ত্রিপ্রমন হইল (১) সক্ষি (সাক্ষী), (২) লেকিত বা লিখিত প্রমাণ এবং (৩) তৃতীয় হইল বুক্তি। বুক্তি শব্দটি সম্ভবতঃ ভোগ করা বা দখল করা অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। ডঃ গণ্ডা[৬৭] এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে

ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রেও অনুরূপ প্রমাণের বিধান রহিয়াছে, যথা যাজ্ঞবল্ক্যে (২।২২) আমরা পড়িতেছি "প্রমাণম্ লিখিতম্ ভুক্তিঃ সাক্ষিনঃ।" বলিদ্বীপের আইনে বিধিবদ্ধ আছে যে সাক্ষী হইতে লেকিত বা লিখিত প্রমাণ বলবত্তর, ভুক্তি আবার লেকিত প্রমাণ অপেক্ষা বলবত্তর[৬৮]। অর্থাৎ ভোগ-দখল অপেক্ষা বড় প্রমাণ আর কিছু হইতে পারে না।

জাভা-বলিদ্বীপের আইনশাস্ত্রে শপথবাণী এবং সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে দৈব প্রমাণের (ordeal) অনেক উল্লেখ আছে। যেক্ষেত্রে সাধারণ বিচারে দোষী নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত সেইস্থলে সাধারণতঃ দৈব প্রমাণের ব্যবস্থা করা হইত। এই ব্যবস্থা কেবলমাত্র ভারতীয় আর্য এবং অষ্ট্রোনেশীয়ান জনগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল না, ইহার প্রচলন টিউটন-জাতির মধ্যেও ছিল। সুতরাং এই প্রথা ভারতবর্ষ হইতেই গিয়াছে এমন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা ভুল হইবে। তবুও একথা স্মরণে রাখিতে হইবে যে আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন জিনিস যখন জাভা-বলিদ্বীপে গিয়াছিল, তখন বিচার ব্যবস্থায় শপথ গ্রহণ প্রথা এবং দৈব প্রমাণের প্রথাটিও ভারতবর্ষ হইতে যাওয়া অসম্ভব নহে। তবে হয়তো স্থানীয় রীতিনীতি এবং সামাজিক অনুশাসনের জন্য ইহার মধ্যে কিছু কিছু স্বদেশী খাদ অনুপ্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে। জাভা এবং বলিদ্বীপের বিচার ব্যবস্থা বুঝিতে হইলে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ঐস্থলে ভারতবর্ষের মতই চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং বিচার ব্যবস্থায় উচ্চনীচ ভেদে শাস্তির তারতম্য হইত। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে জাভা-বলিদ্বীপের শূদ্রগণকে শপথ গ্রহণ করাইতে তাহাদিগকে মন্ত্রপুত বারি পান করাইতে হইত। ঐ বারিতে পূর্বেই শপথমন্ত্র লিখিত লণ্টারপত্র নিক্ষেপ করিয়া উহা পবিত্র করা হইত। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদিগকে শপথ বারি ছিটাইয়া দিলে এবং ব্রাহ্মণগণকে শপথ মন্ত্রটি পাঠ করিয়া শুনাইলেই যথেষ্ট হইত[৬৯]। সঙ্গে সঙ্গে যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে তাহাদিগকে ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর অবস্থার কথাও শুনাইয়া দেওয়া হইত[৭০]। ভারতবর্ষে এবং জাভা-বলিদ্বীপে যাহারা শপথ গ্রহণান্তে সাক্ষ্য প্রদান করিত তাহাদিগকে অনেক সময় মন্দিরে উপস্থিত হইতে হইত (মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণের সম্মুখে)। এই উপলক্ষ্যে মন্দিরে যে শপথবাণী উচ্চারিত হইত জাভা-বলিদ্বীপে তাহার নাম ছিল মদেবসাক্ষী। মদেব-সাক্ষী দ্বারা দেবতাকে সাক্ষী করা বুঝাইতেছে ; উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে এই শপথ গ্রহণের ব্যাপার নিষ্পন্ন হইলে উহাকে 'মদেবগম' বলা হইত। এতদ্ব্যতীত পাপক্ষালনের জন্য প্রয়শ্চিত্ত বা প্রায়শ্চিত্ত বলিদ্বীপে এখনো করা হইয়া থাকে।

মনুসংহিতায় আমরা পড়িতেছি যে শপথবাণী গ্রহণ করাইবার সময় ব্রাহ্মণগণকে বলিতে হইবে "বল", ক্ষত্রিয়গণকে বলিতে হইবে "সত্যকথা বল", বৈশ্যগণকে বলিতে হইবে "গরু, বীজ এবং স্বর্ণের নামে শপথ করিয়া বল" এবং শূদ্রগণকে বলিতে হইবে "তোমার সমস্ত পাপের নামে শপথ গ্রহণ করিয়া বল।" শূদ্রগণ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় অন্য প্রকার ব্যবস্থারও বিধান আছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে শূদ্রগণকে অগ্নি বা জলের ordeal দ্বারা অথবা স্ত্রীপুত্রগণের শিরে হস্ত রাখিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। যদি তাহারা অগ্নিদগ্ধ না হয় অথবা শীঘ্র জলে ভাসিয়া না উঠে তাহা হইলে তাহাদের শপথের যথার্থতা স্বীকার করিয়া লওয়া হইত[৭১]।

মনু কোথাও স্পষ্টরূপে বলেন নাই যে ভারতবর্ষের প্রাচীন বিচারালয়ে শপথ-বারির প্রয়োজন ছিল কিনা।

হিন্দুগণের সাক্ষ্যসংক্রান্ত বিধানে কাহারো কাহারো সাক্ষ্য সাধারণতঃ গৃহীত হইত না, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ছিল। প্রথমোক্ত শ্রেণীর সাক্ষীর মধ্যে আছেন অন্ধ, দাস, স্ত্রীলোক, নাবালক। মনু "স্ত্রীবুদ্ধেরস্থিরত্বাৎ" স্ত্রীলোকদিগকে সাক্ষ্য প্রদানের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। বলিদ্বীপের লৌকিক বিধানে যাহাদের অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়াছে তাহারাও সাক্ষ্য দিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত দেবতাগণকে সাক্ষী দিতে আবাহন করা হইত। আদি আগমে উল্লিখিত "ত্রয়োদশ সক্ষির" মধ্যে আছেন : বিয়োঃ (=দ্যৌ), বুমি·(=ভূমি), চন্দ্র, অর্ক, গেনি (=অগ্নি), যম, অনিল, রত্রিঅ (=রাত্রি), দ্বিসন্দে (=দ্বিসন্ধ্যা), দসদিয় (দশদিশঃ), হৃদয়, দর্ম্ম (ধর্ম), আপঃ, যব (?)। এইরূপ একটি তালিকা য়ুইনবল সম্পাদিত যবদ্বীপীয় আদি পর্বেও আছে ; এই স্থলে সংস্কৃত মহাভারতের ১, ৭৪, ৩০ উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐস্থলে দেবগণের ক্রমবিন্যাস হইল : অর্ক, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, দ্যৌ, ভূমি, অপঃ, হৃদয় বা আত্ম, যম, দিন, রাত্রি, প্রত্যুষ ও প্রদোষ এবং ধর্ম। এই দেবগণ মানুষের কুকার্য দর্শন করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে মনুসংহিতা ৮, ৮৬ দ্রষ্টব্য[৭২]।

বলিদ্বীপে এখনো চতুর্বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিটি বর্ণ বিদ্যমান। প্রাচীন যবদ্বীপীয় অনুশাসনলিপিতেও এই চতুর্বর্ণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দ্বিজাতি, ত্রিবংশ, চতুর্বংশ এমন কি শূদ্রকে বুঝাইবার জন্য একজাতি শব্দ পর্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে "উত্তম নিঙ্গ উত্তম" শব্দগুচ্ছ দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে বুঝাইতেছে ; কেহ কেহ বলেন উহা দ্বারা কেবলমাত্র পুরোহিতগণকে বুঝাইতেছে। এই শব্দগুচ্ছের আক্ষরিক অনুবাদ হইবে, 'উত্তমের উত্তম'। বলিদ্বীপে শৈব এবং বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ[৭৩] আছে এবং তাঁহারা মিলিতভাবে প্রধান প্রধান উৎসবাদি নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। জাভা-বলিদ্বীপে প্রাচীন যুগে এই চতুর্বর্ণের অসামান্য প্রভাব ছিল এবং বলিদ্বীপে ইহার স্বাক্ষর এখনো বিদ্যমান রহিয়াছে।

বস্তুতঃ ভারতীয় এবং জাভা-বলিদ্বীপের আইন-গ্রন্থে ব্রাহ্মণগণের স্থান তুলনাবিহীন। ব্রাহ্মণ্য অধিকারের মুখপাত্র মনু উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন :

"ন জাতু ব্রাহ্মণম্ হন্যাৎ সর্বপাপেষ্বপি স্থিতম্
রাষ্ট্রাদেনম্ বহিষ্কুর্যাৎ সমগ্রধনম্ অক্ষতম্"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ পাপী হইলেও তাহাকে হত্যা করা যাইবে না ; তাহাকে সমস্ত ধনসম্পদসহ দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইবে। কারণ মনু বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ হত্যার তুল্য আর পাপ নাই। সুতরাং রাজা স্বপ্নেও যেন ব্রাহ্মণ-পাপীকে দণ্ডদান না করেন। জাভা-বলিদ্বীপের আইন গ্রন্থ এই ভাবনালোকেই সৃষ্ট হইয়াছে। আগমের ২৪৫ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার না করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা যাইতে পারে। ইহা আমাদিগকে কৌটিল্যের একটিমাত্র বিধানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় যেস্থলে ব্রাহ্মণকে জলে ডুবাইয়া হত্যা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যদি কোন ব্রাহ্মণ রাজদ্রোহে লিপ্ত হন তাহা

হইলেই এই বিধান প্রযোজ্য হইবে বলিয়া উল্লিখিত আছে[৭৪]। এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে শাস্তির জন্য যে জরিমানা দিতে হইবে তাহার পরিমাণ নির্ভর করিবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদার উপর। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে শূদ্র-তস্করকে হত্যা করিলে ৪০০০০ কেপেঙ্গ হইতে বাড়িতে বাড়িতে ব্রাহ্মণ-তস্করকে হত্যা করিলে ১৬০০০০ কেম্পেঙ্গ জরিমানা দিতে হইবে। আগম অনুযায়ী ইহাই সর্বাপেক্ষা বেশী জরিমানা। দেবদন্ত এবং অন্যান্য গ্রন্থে সামাজিক পদমর্যাদার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় রাষ্ট্র ন্যায়বিচারের লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে।

ডঃ পিগো চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ব-যবদ্বীপের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন[৭৫] যে এই অঞ্চলে ভারতীয় চতুর্বর্ণের কথা অজ্ঞাত ছিল না বটে, কিন্তু উহা তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয় নাই। সুতরাং চতুর্বর্ণ শব্দটি দরবারী সাহিত্যের পাণ্ডিত্যের চমকমাত্র। নাগরকৃতাগমের ৮১ সর্গে ভারতীয় চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার সহিত তৎকালীন সমাজজীবনের সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছিল। পিগোর মতানুযায়ী তৎকালীন যবদ্বীপীয় সমাজকে যে-চারিটি বর্ণে বিভক্ত করা যায় তাহা হইল (১) শাসক, (২) ধর্মাচারী, (৩) সাধারণ, (৪) দাস। এই যুক্তিটি সঠিক বোঝা গেল না; কারণ শাসক সম্প্রদায় হইল ক্ষত্রিয়, ধর্মাচারী সম্প্রদায় হইল ব্রাহ্মণ-শৈব-সৌগত-ঋষির দল, সাধারণ লোক হইল কৃষিজীবি বা ব্যবসায়ী অর্থাৎ বৈশ্য। চতুর্থ সম্প্রদায় হইল ভের্ত্য, কবুল বা দাস; ইহাদিগকে শূদ্র বলিলে ভুল হইবে না। যবদ্বীপ-বলিদ্বীপে চতুর্বর্ণ বিদ্যমান না থাকিলে, তথায় হিন্দু যবদ্বীপীয় আইনশাস্ত্রের প্রয়োগ হওয়া অসম্ভব ছিল। বস্তুতঃ যবদ্বীপীয় আইনশাস্ত্রের বিধিবিধানে স্থলে স্থলে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার সহিত যবদ্বীপীয় অনুশাসনলিপিগুলি একত্রে পাঠ করিলে মনে হইবে যে দ্বীপময় ভারতে মিশ্র হিন্দু-যবদ্বীপীয় স্মৃতিশাস্ত্রের প্রয়োগ হইয়াছিল।

জাভা এবং বলিদ্বীপের আইনশাস্ত্রে রাজাই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, কিন্তু বিচারবিধানের সময় তাঁহাকে উপরোক্ত সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের কথা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইয়াছে। রাজা বিচারের ব্যাপারে প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সাহায্য লইয়া থাকেন বলিয়া ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে[৭৬]। যবদ্বীপীয় শ্লোকান্তর নামক গ্রন্থের বিংশতি সংখ্যক শ্লোক ও টীকায় আমরা পড়িতেছি: "যিনি শাস্ত্রজ্ঞ, যিনি উত্তমকুলসম্ভূত, তত্ত্বধর্মপরায়ণ, অপক্ষপাত, মেধাবী—তিনিই ধর্মাধ্যক্ষ হইবার উপযুক্ত[৭৭]।"

এই সমস্ত ধর্মাধ্যক্ষগণ পূর্বালোচিত "চতুর্‌দ্রেস্তে"র দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিচারকার্য নিষ্পন্ন করিতেন।

বিচারকে বলিদ্বীপীয় ভাষায় বলা হয় 'মবিচার', বাঙ্‌লা ভাষায় আমরা ইহাকে বলি মামলা দায়ের করা। কুটারমানবে মবিচার শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ডঃ গণ্ডা[৭৮] বলিয়াছেন যে বলিদ্বীপের কোন অধিবাসীকে বিচারে অভিযুক্ত করা হইলে তাঁহাকে নির্দিষ্ট সময়ে সাক্ষী, জামিন, পুষ্প এবং পিষ্টকসহ পাত্র, পূর্ণকুম্ভ এবং বিচারকের জন্য মাদুর লইয়া আসিতে হইবে। এইরূপে বিচার আরম্ভ হইত এবং এই বিচারের বিধানাবলীই প্রাচীনতর

রূপে জাভা এবং বলিদ্বীপীয় স্মৃতি গ্রন্থগুলিতে বা আগমে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বলিদ্বীপের বিচার-প্রক্রিয়ার চারিটি স্তর ছিল, যথা (ক) স্বরৎ সেঙ্কের তেতগিহন (খ) স্বরৎ সেঙ্কের পমিচর (গ) স্বরৎ কণ্ড (ঘ) স্বরৎ পেপেগতন। এই চারিটির মধ্যে প্রথমটি হইল মামলার চার্জ গঠন করা, দ্বিতীয়টি হইল মামলা দায়ের করা, তৃতীয়টি হইল পক্ষ সমর্থন করা এবং চতুর্থটি হইল বিচারের রায়দান করা। পক্ষ সমর্থন করা এবং আগমশাস্ত্র দেখার পর, বিজয়ীদল বা উভয় দল যে রায় লাভ করেন তাহাই জয়পত্র নামে পরিচিত[৭৯]। এইরূপ বিচারে অনেক সময় নিরপেক্ষ লোকের ডাক পড়িত ; ৮৪৪ শকাব্দের বৈশাখ মাসে দক্ষিণ-বুরুডু গ্রামের ধনদীকে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বেক-কিললান বলিয়া গালি দিলে উহাতে গ্রাম্য-মোড়ল ব্যতীত পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি হইতে অনেক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন[৮০]।

উপরোক্ত সাধারণ আলোচনার পর আমরা এইবার কুটারমানব গ্রন্থটি আলোচনা করিব। ইয়ঙ্কার এই গ্রন্থখানি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সম্পাদনা করিয়া ইহার ভারতীয় উৎসের সন্ধান করিয়াছিলেন[৮১]। পুর্বেই বলিয়াছি যে এই গ্রন্থখানি চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উৎকীর্ণ বেন্দেসারি অনুশাসনলিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহার প্রামাণিকতার কথা সেই স্থলে স্বীকৃত হইয়াছে। এবুলন-লিপিতেও (১৩৫৮ খৃষ্টাব্দ) ধর্মাধ্যক্ষ সপ্তোপপত্তিকে বলা হইয়াছে : "কুটার-মানবাদি-শাস্ত্র-বিবেচন-তৎপর[৮২]।" এতদ্ব্যতীত শিবশাসনের একটি স্থলে আমরা পড়িতেছি "ধর্মশাস্ত্রকুটরমানবাদি" অর্থাৎ কুটর-মানব প্রমুখ ধর্মশাস্ত্র। সুতরাং কুটর-মানব বা কুটার-মানব গ্রন্থখানি যে আইনশাস্ত্রগুলির মধ্যে অতি উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থের কুটর-মানব নামটি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে কুটর-মানব শব্দটি "উত্তম-মনু" শব্দের বিকৃতিমাত্র। এই অভিমত ইয়ঙ্কার গ্রহণ করেন নাই[৮৩] এবং আমাদের নিকটও গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থলে কুটার শাস্ত্র এবং মানব শাস্ত্রের বিধিগুলি একই সঙ্গে পাশাপাশি আলোচিত হইয়াছে[৮৪] ; সুতরাং ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে এই গ্রন্থে প্রধানতঃ কুটার-শাস্ত্র এবং মানব ধর্মশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল, কিন্তু এই দুই গ্রন্থের মধ্যে আবার মনুসংহিতার স্থানই ছিল সর্বাগ্রে। এই দুই গ্রন্থের প্রাধান্যের জন্যই সম্ভবতঃ গ্রন্থের নাম কুটর-মানব বা কুটার-মানব হইয়াছে। ভারতবর্ষে ধর্মশাস্ত্র পর্যায়ের কোন গ্রন্থের মধ্যে কুটার-শাস্ত্র নামক কোন গ্রন্থ নাই। গ্রন্থে পরশুরামের উল্লেখ দেখিয়া মনে হইতে পারে যে তাঁহার প্রতীক 'কুঠার' শব্দ হইতে 'কুটার' শব্দটির সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও এই অংশের ভারতীয় উৎসের সন্ধান করা সহজসাধ্য হইতেছে না। এই গ্রন্থে আইনসংক্রান্ত সংজ্ঞার ব্যাখ্যা, ব্যবহারিক নিয়ম এবং আইনঘটিত ব্যাপারের ব্যাখ্যা পরিবেশন করা হইয়াছে। "পুর্বাদিগম শাসন শাস্ত্র সরোদৃত (সারোদ্ধৃত)" শব্দগুচ্ছের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় যে এই গ্রন্থটি পুর্বকার অধিগম-শাসনশাস্ত্রের সার উদ্ধৃত করিয়া রচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থের মধ্যে "ভুজঙ্গ শিবন্ পিনকস্থবির রিঙ্গ নগর" শব্দাদির ব্যবহার দেখিয়া ডঃ পিগো ইহা বলিদ্বীপীয় শৈব সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন[৮৫]।

আমরা এই গ্রন্থের একস্থলে পড়িতেছি : "কোন একটি বন্ধকী বলদ বা গাভী তিন বৎসরের মধ্যে মুক্ত না করিলে উহা উত্তমর্ণের (creditor) প্রাপ্য। কুটারাগমে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। মানবাগমে এই সময় হইল পাঁচ বৎসর। এই দুইটির মধ্যে একটিকে অনুসরণ করিতে হইবে। ইহা অনুমান করা অন্যায় যে এই দুইখানি আগমের মধ্যে একটি অপরটি অপেক্ষা প্রধানতর, কারণ দুইখানিই প্রামাণ্য। মানবশাস্ত্রের প্রবক্তা ছিলেন মহারাজ মনু; তিনি ছিলেন বিষ্ণুতুল্য; কুটারশাস্ত্র ভৃগু কর্তৃক ত্রেতাযুগে প্রোক্ত হইয়াছিল; তিনি বিষ্ণুতুল্য ছিলেন। কুটারশাস্ত্রটি পরশুরাম এবং সমগ্র পৃথিবী কর্তৃক প্রতিপালিত হইতেছে; ইহা বর্তমান সময়ের সৃষ্টি নহে[৮৬]।"

ডঃ ব্র্যাণ্ডেস মনে করিতেন যে কুটার-মানব গ্রন্থখানি বাস্তবিক পক্ষে দুইটি গ্রন্থের সমবায়। উহাদের মধ্যে একটি ছিল ভৃগু সংহিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত কুটারশাস্ত্র, অপরটি ছিল মনুর আদর্শে অনুপ্রাণিত মানবশাস্ত্র। অনুমিত হইয়াছে যে গ্রন্থের প্রথমাংশে যে গভীর স্বদেশী প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাহা এই অংশটুকুর স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। ব্র্যাণ্ডেসের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ গ্রন্থে বলিদ্বীপীয় প্রভাব কিছু বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও[৮৭] গ্রন্থের ভাষা সর্বত্র একই প্রকারের। সুতরাং গ্রন্থের প্রারম্ভে অধিকতর স্বদেশী প্রভাব থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থের ভাষা দেখিয়া মনে হয় যে ইহা দুইটি বিভিন্ন গ্রন্থের সম্মিলন নাও হইতে পারে। গ্রন্থের রচয়িতা সম্বন্ধে কিছু বলিবার উপায় নাই। ডঃ ব্র্যাণ্ডেস একটি মালয় ইতিবৃত্তের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে উক্ত গ্রন্থ অনুযায়ী কুটারমানব দেমকরাজ সূর্য আলমের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। এই উক্তিটি সত্য হইলেও ইহা যে কুটারমানবের আদিম সংস্করণ নহে তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই।

কুটার-মানব শাস্ত্রে যে বিভিন্ন অনুচ্ছেদ আছে তাহা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে মনুসংহিতার যে অংশ এই গ্রন্থে পরিগৃহীত হইয়াছে তাহার বিষয়বস্তুর সংবিন্যাস প্রধানতঃ মনুসংহিতাকে অনুসরণ করিয়াই হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করিতে হয় যে গ্রন্থকারের সংস্কৃত জ্ঞান প্রখর ছিল অথবা তিনি মনুসংহিতার কোন যবদ্বীপীয় অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শেষোক্ত শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে স্বরজম্বু ছিল এবং ইহা সম্ভবতঃ কুটারমানবের গ্রন্থকার ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ রচনায় মনুসংহিতার অষ্টম-নবম অধ্যায় বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল। গ্রন্থকার মনুসংহিতার নিকট প্রধানতঃ ঋণী হইলেও তিনি অন্যান্য স্মৃতি-শাস্ত্রও যে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার স্বাক্ষরও গ্রন্থেই বিদ্যমান রহিয়াছে।

কুটারমানবে যে সমস্ত আইনকানুন বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহাকে আমরা ফৌজদারী এবং দেওয়ানী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। ফৌজদারী ব্যাপার যবদ্বীপেও গুরুত্বের দিক দিয়া সম্ভবতঃ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল, কারণ কুটারমানবের প্রথম বিধিই হইল নরহত্যা সম্বন্ধে। ইহাতে যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে অষ্টদুষ্ট আখ্যা দেওয়া হইয়াছে[৮৮]। ইহাদের মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ ভাবে হত্যার সহিত সংশ্লিষ্ট, যেমন

যে নির্দোষকে হত্যা করে, যে উহাতে উৎসাহ দেয় এবং যে তাহাকে আহত করে তাহাদের মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেওয়া হইয়াছে। রাজা ইচ্ছা করিলে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে ইহাদিগকে ৪০০০০ মুদ্রা অর্থদণ্ড করিতে পারেন। যাহারা আবার এই সমস্ত লোকের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে সেইরূপ পাঁচ শ্রেণীর লোককে ২০০০০ মুদ্রা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। উপরোক্ত তিন শ্রেণী এবং শেষোক্ত পঞ্চ শ্রেণীর দুষ্ট লোক লইয়া অষ্টদুষ্ট হইয়াছে।

একই ভাবে অস্তচোর অর্থাৎ অষ্টচোর সম্বন্ধে বিধান দেওয়া হইয়াছে[৮৯]। অষ্টচোরের মধ্যে আছে: যে চুরি করে, যে অপরকে চুরি করিতে উৎসাহিত করে, যে চোরকে খাদ্য প্রদান করে, যে চোরকে গৃহে স্থান দেয়, যে চোরের সহিত সখ্যতা রক্ষা করে, যে চোরকে ইঙ্গিত প্রদান করে, যে চোরকে সাহায্য প্রদান করে এবং যে চোরকে লুকাইয়া রাখে[৯০]। যে বাস্তবিক পক্ষে চুরি করে তাহার বিধান হইল মৃত্যুদণ্ড এবং তাহার পরিবার ও যাবতীয় সম্পত্তি রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। তবে চোর রাজাকে ৪০০০০ মুদ্রা এবং যে গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি হইয়াছে তাহাকে অপহৃত সম্পদের দ্বিগুণ মূল্যের খেসারত দিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে পারে।

যবদ্বীপীয় আগম শাস্ত্রে সড্‌ততয়িকেও ফৌজদারী আইনের আওতায় আনা হইয়াছে। সড্‌ততয়ি হইল সংস্কৃত ষড়-আততায়ী শব্দগুচ্ছের যবদ্বীপীয় রূপ। এই ছয় শ্রেণীর আততায়ীর মধ্যে আছে: গৃহে অগ্নিপ্রদানকারী, বিষ প্রদানকারী, দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, রাজার সম্বন্ধে কুৎসা রটনাকারী, ডাইনী, বিবাহিতা নারীর ধর্ষণকারী[৯১]। ডঃ গণ্ডা ইহার সহিত বশিষ্টের ধর্মশাস্ত্র (৩।১৬) এবং বিষ্ণুস্মৃতির (৫।১৯১ হইতে) তুলনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে এই শ্রেণীর অপরাধিগণ সম্বন্ধে যে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা যবদ্বীপীয় গ্রন্থের একটি সংস্কৃত শ্লোকে উদ্ধৃত হইয়াছে:

"অগ্নিদঃ বিশ্বদশ্‌ চেব অস্ত্রোত্ততকরস্‌ ততঃ
অপরবনেস্‌ চ হন্‌ ততঃ পেস্থনেশ্‌ চেব রজনি।"

শ্লোকটি বিকৃত এবং ইহার মধ্যে অপরবনেস্‌ শব্দটি আথর্বন (যাদুকর) শব্দের বিকৃতি[৯২]।

উপরোক্ত সংস্কৃত শ্লোকটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ দেখিতেছি শ্লোকান্তর নামক যবদ্বীপীয় গ্রন্থের ৩২ সংখ্যক শ্লোকে। উহাতে আছে:

"অগ্নিদো বিষদাথর্বৌ শস্ত্রঘ্নো দারাতিক্রমঃ।
পিশুনস্তত্র তদ্রাজ্ঞি ষণ্ডে তে হ্যাততায়িনঃ॥"

শ্রীমতী শারদারাণী সংস্কৃত সাহিত্য হইতে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়াছেন[৯৩]।

কুটারমানবে বাকপারুষ্য এবং দণ্ডপারুষ্য সম্বন্ধে বিধান দেওয়া হইয়াছে। বাক্‌পারুষ্য হইল কাহারো অঙ্গ, স্বভাব, জন্ম-বংশ প্রভৃতি লইয়া ক্রোধ সহকারে অপমানসূচক কথা বলা; দণ্ড-পারুষ্য হইল কাহাকেও আঘাত দেওয়া, অন্যের পশু হত্যা করা, কাহাকেও নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করা ইত্যাদি[৯৪]। এই সমস্ত ব্যাপারে চতুর্বর্ণের পদমর্যাদানুযায়ী শাস্তির বিধান করা হইত। ইহাতে ব্রাহ্মণের শাস্তি ছিল লঘুতম এবং শূদ্রদের চরম শাস্তি পর্যন্ত দেওয়া হইত। ইহার বিধানাবলী

সাধারণতঃ মনুসংহিতাকে অনুসরণ করিয়াই রচিত হইয়াছে[৯৫]। বাক্‌পারুষ্যের প্রতিধ্বনি অনুশাসনলিপিতেও প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

জাভা-বলিদ্বীপের ফৌজদারী আইনের সহিত হিন্দু ফৌজদারী আইনের তুলনা করিলে কয়েকটি বিশেষত্বের দিকে সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়[৯৬]। প্রথমতঃ নরহত্যা এবং চৌর্য সম্বন্ধে যবদ্বীপীয় আইন অপেক্ষাকৃত ব্যাপকতর, কারণ ইহার পরিধির মধ্যে অপরাধীর বন্ধু-বান্ধব এবং পরিজনবর্গও আনীত হইয়াছে। ডঃ মজুমদার আরো বলিয়াছেন[৯৭] যে ফৌজদারী অপরাধগুলি রাজার বিরুদ্ধে অপরাধ ইহা ভারতীয় এবং যবদ্বীপীয় স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যবদ্বীপীয় আগম শাস্ত্রগুলিতে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিগণকে ক্ষতিপূরণ দিবার নীতি অধিকতর ব্যাপকতার সহিত পরিগৃহীত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ জাভা-বলিদ্বীপ এবং ভারতবর্ষে যদিও ব্রাহ্মণের লঘুদণ্ড এবং ব্রাহ্মণেতর বর্ণের অপেক্ষাকৃত গুরুতর দণ্ডের বিধান দেওয়া হইয়াছে, জাভা-বলিদ্বীপে নরহত্যা এবং চৌর্য অপরাধে অপরাধী ব্রাহ্মণ-শূদ্রকে একই প্রকার শাস্তির বিধান করা হইয়াছে।

এইবার আমরা জাভা-বলিদ্বীপের দেওয়ানী আইন আলোচনা করিব।

কুটারমানবশাস্ত্রে বিবাহ-সম্বন্ধীয় যে আইনকানুন বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উদারতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বিবাহের পূর্বে বরপক্ষ কন্যা-পক্ষকে শুল্ক বা বিবাহমূল্য প্রদান করিয়া থাকেন; ইহা গ্রহণ করিলেই বিবাহ সম্বন্ধীয় আইনগত বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি হয়। এই চুক্তি ভঙ্গ হইলে দোষী ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রকার দণ্ডের সম্মুখীন হইতে হয়। বিবাহ সম্পন্ন করিতে হইলে গ্রামের মোড়লের নিকট দলিল সম্পাদন করিতে হইত বলিয়া মনে হয়[৯৮]। আইনে যে রূপ বিধান আছে তাহাতে মনে হয় যে পত্নীর পূর্ব-বিবাহ সঞ্জাত কন্যা ব্যতীত আর কাহাকেও বিবাহ করার পক্ষে আইনগত বাধা বিদ্যমান ছিল না[৯৯]। নারীগণ ইচ্ছা করিলে অঙ্গবিহীন বা বিকৃতাঙ্গ, উন্মাদ, গোপনাঙ্গ ব্যাধিগ্রস্থ প্রভৃতি শ্রেণীর ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিতে পারিতেন।

প্রাচীন ভারতীয় স্মৃতিগ্রন্থে নারীকে স্বামী পরিত্যাগ করিবার সাধারণ অধিকার প্রদত্ত হয় নাই; এই অধিকার যেস্থলে প্রদত্ত হইয়াছে সেস্থলে উহা একান্তই দুর্বল, দ্বিধাগ্রস্থ অথবা নির্দেশগুলি পরস্পর বিরোধী[১০০]। সাধারণভাবে বলিতে গেলে সমগ্র হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রই নারীর বিবাহ-বিচ্ছেদ করার বিরুদ্ধে। সুতরাং হিন্দু নারীর পক্ষে বিবাহবিচ্ছেদ করা কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। যবদ্বীপীয় নারীগণ এই বিষয়ে অনেকটা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এইস্থলে আমরা অ-হিন্দু স্বদেশী রীতিনীতির প্রাধান্য পর্যবেক্ষণ করি। বধূ এবং তাঁহার পিতা ক্ষতিপূরণ দিলেই যেস্থলে বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়া সম্ভবপর ছিল[১০১], ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্রে তাহা ছিল অভাবনীয় ব্যাপার। যবদ্বীপের আইন অনুযায়ী বিবাহের এক বৎসর পরেও স্বামী যদি বধূর গ্রহণযোগ্য না হইত তাহা হইলে বিবাহ-মূল্যের দ্বিগুণ প্রত্যর্পণ করিলেই বধূ স্বামীকে পরিত্যাগ করিবার স্বাধীনতা পাইতেন[১০২]। স্বামীকেও অবশ্য এই ব্যাপারে অনুরূপ স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল। নারীগণ আবার স্বামী উন্মাদ, বিকলাঙ্গ, মৃগীরোগগ্রস্থ বা ক্লীব হইলে

পত্যন্তর গ্রহণ করিতেও পারিতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জাভা এবং বলিদ্বীপীয় স্মৃতি-শাস্ত্রে নারীগণের মর্যাদা ভারতবর্ষ অপেক্ষা যথেষ্ট উন্নততর ছিল।

যবদ্বীপীয় নারীর এই মর্যাদা আইনশাস্ত্রে অনেকটা রক্ষিত হইলেও ইহা নীতিশাস্ত্রের সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই, কারণ আমরা নীতিশাস্ত্র কাকাবিনে পড়িতেছি : "কথায় বলে, কাকে শ্বেতবর্ণ ধারণ করিতে পারে এবং তঞ্জঙ্গ (মৃণাল) প্রস্তরময় স্থানে জন্মিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোক ন্যায়বতী হইতে পারে না।" শ্লোকান্তর[১০৩] নামক প্রাচীন যবদ্বীপীয় গ্রন্থের ত্রয়োবিংশ শ্লোকে আমরা পড়িতেছি :

"নদীনাং চ লতানাং চ স্ত্রীনাং চ কুটিলা গতি।
যদি সত্যা ভবেন্নারী শিলায়াং কুমুদং ভবেৎ ॥"

অর্থাৎ নদী, লতা এবং স্ত্রীলোকদের গতি কুটিল ; যদি স্ত্রীলোক সতী হন তাহা হইলে কুমুদও পাহাড় হইতে প্রস্ফুটিত হইবে। এই গ্রন্থেরই অন্যত্র (শ্লোক ৫৮) আমরা পড়িতেছি : "নারীষু কুটিলা গতি"। আর একস্থলে (শ্লোক ১৫) আমরা পড়িতেছি : "কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী তাঁহার স্ত্রী এবং সন্তানাদির প্রতি কঠোর (?) বাক্য ব্যবহার করিতে পারেন যাহাতে তাহাদের ভাবনা অসৎ পথে পরিচালিত না হয় ; কারণ কেহ যদি স্ত্রীলোক এবং সন্তানদের পরুষবাক্য ব্যবহার না করেন তাহা হইলে তাহাদের মন অসৎ হয়। এমন কোন স্ত্রীলোক নাই যিনি সরল ; তাহার হৃদয় কুটিল। এই কারণের জন্য রক্তচক্ষু এবং কঠোর বাক্য দ্বারা তাহাদের হৃদয়কে রাখিতে হইবে সরল এবং বিশ্বস্ত।"

এই বর্ণনায় অতিশয়োক্তি আছে সন্দেহ নাই ; ইহা হয়তো রচয়িতার ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলও হইতে পারে। সমাজে নারীর স্থান কোথায় তাহা বুঝিতে হইলে এইরূপ দুই চারিটি দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর না করিয়া আইনশাস্ত্রে তাহাকে কি স্থান বা মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে তাহাই বিচার করিতে হইবে। সেই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিলে যবদ্বীপীয় সমাজে নারীর স্থান নিঃসন্দেহে উচ্চে ছিল। ইহার স্বাক্ষর রহিয়াছে বিভিন্ন অনুশাসনলিপিতে[১০৪]। যবদ্বীপের নারীগণ রাজ্য পরিচালনা করিয়াছেন ; শিক্ষায়, দীক্ষায়, নৃত্যগীতে, শাসন দক্ষতায়, ধর্মকর্মে নারীর স্বাক্ষর রহিয়াছে যবদ্বীপের ইতিহাসে ; সুতরাং উপরে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি নারীগণের হীন বা অমর্যাদাপূর্ণ অবস্থার পরিচায়ক হইতে পারে না।

এইবার আমরা কুটারমানব হইতে সুদ সংক্রান্ত বিধি আলোচনা করিব[১০৫]। উহাতে সুদের নাম দেওয়া হইয়াছে বৃদ্ধি। সুদ সংক্রান্ত বিধির সহিত ভারতীয় শাস্ত্রেরও সাধারণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। প্রধানতঃ অর্থ ঋণ দিয়াই সুদ আহরণ করা হইত। এই সুদ অধমর্ণের কায়িক শ্রম হইতে উশুল হইতে পারিত, কোন কোন ক্ষেত্রে বন্ধকী গাভীর দুগ্ধ, ক্রীতদাস বা ষাঁড়ের শ্রম হইতেও এই সুদ আহরিত হইত। এই শ্রেণীর সুদের নাম হইয়াছে 'কায়িকা বৃদ্ধি'। ইহার প্রাচীন যবদ্বীপীয় ব্যাখ্যাও ভারতবর্ষের অনুরূপ : "কায়িকা কর্মসংযুক্তা।" এতদ্ব্যতীত কালবৃদ্ধি, কারিতা-বৃদ্ধি, চক্রবৃদ্ধি, ভোগবৃদ্ধি প্রভৃতি নামধেয় সুদের কথাও গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে[১০৬]।

সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্রের মত কুটারমানবেও দাসগণের সম্বন্ধে বিবিধ বিধান লিপিবদ্ধ করা

হইয়াছে। যবদ্বীপে দাস-দাসীর সংখ্যা ছিল বিপুল এবং তাহাদের কথা শুধু আইন গ্রন্থেই আলোচিত হয় নাই, বিভিন্ন অনুশাসনলিপিতেও তাহাদের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। অনুশাসনলিপিগুলি পাঠ করিলে মনে হইবে যে দাসগণের মধ্যেও কিছুটা শ্রেণীবিভেদ ছিল এবং তাহাতে সম্ভবতঃ ভাগ্যেরও কিছু পরিবর্তন হইত। রাজার অধীনে যে সমস্ত দাস থাকিত তাঁহাদের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোককে কখনো কখনো পতিহ্-রূপে নিয়োগ করা হইত[১০৭]। দাসদাসী সম্পূর্ণরূপে মনিবের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত।

লোকে দাস হইত নানা কারণের জন্য। কেহ দাস হইত যুদ্ধে বন্দী হওয়ার জন্য (ধ্বজহৃত), কেহ হইত দাসবংশে জন্মগ্রহণ করার জন্য (গৃহজ), ঋণ বা জরিমানা পরিশোধ করিতে অসামর্থ্য হেতু, কেহ আবার বিচারানুযায়ী দাসে পরিণত হইত (দণ্ড-দাস), কেহ আহার এবং আশ্রয় লাভের জন্য দাস হইত (ভক্তদাস)[১০৮]। নারদ-স্মৃতিতে পঞ্চদশ প্রকার দাসের উল্লেখ আছে, কিন্তু দাসের উপরোক্ত শ্রেণীবিন্যাস মনুসংহিতার বিধান অনুযায়ী[১০৯]। ভারতবর্ষে দাসদাসীর মুক্তি লাভ করা মনিবের সাধু ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিত বলিয়া মনে হয়। যবদ্বীপে দাসগণ কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়েও মুক্তিলাভ করিতে পারিত[১১০]। এতদ্ব্যতীত তাহাদের কিছু কিছু মানবিক অধিকারও আইনশাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছিল[১১১]।

কুটারমানবে বন্ধকী জিনিস, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনও আলোচিত হইয়াছে। বন্ধকী আইন এবং সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানগুলি মোটামুটি ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানের অনুরূপ, কিন্তু উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের মধ্যে নূতনত্ব বিদ্যমান। বলিদ্বীপের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনে একটি বিধি আছে যে সম্পত্তি পঞ্চভাগে বিভক্ত করিতে হইবে; এই বিধানকে পঞ্চ-উদর (সং: পঞ্চ-উদ্ধার) বলা হয়। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের বিধান সর্বত্র পরিষ্কাররূপে বোধগম্য নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে মনে হয় যে জ্যেষ্ঠপুত্র চারি-পঞ্চমাংশের উত্তরাধিকারী হইবে[১১২]। এই গ্রন্থেরই আবার অন্যত্র পড়িতেছি যে কোন ব্রাহ্মণের বিভিন্ন বর্ণের চারি পত্নী থাকিলে সম্পত্তি এগার ভাগে বিভক্ত হইবে। অনুশাসনলিপি পড়িয়া মনে হয় যে নারী সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারিতেন; কুটারমানবেও ইহার কিঞ্চিৎ স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে[১১৩]।

আমরা পূর্বে পূর্বাদিগম নামক একখানি আগম শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছি। ইহাতে কিছু কিছু সংস্কৃত শ্লোক প্রকীর্ণ রহিয়াছে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রিড্‌রিখ এই গ্রন্থখানির আলোচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থারম্ভে আমরা পড়িতেছি:

"অবিঘ্নম অস্তু। নিহন পুর্বাদিগম শাসন শাস্ত্রসরোদৃত পুর্ব রম সজ্ ৎলস্ বৃদ্ধাচার্য রাজপুরোহিত, সর্বগুণজ্ঞ, বসুরশ্মি সদৃশ সর্বজনহৃদয় ত মিশ্রহরণ, সকালাচূড়ামণি সিরশি প্রতিষ্ঠিত—"

সংস্কৃত শব্দগুলির বানানে ভুল থাকিলেও উপরোক্ত উদ্ধৃতি হইতে মনে হইবে যে পুস্তকখানি মিশ্রহরণ রচনা করিয়াছিলেন; তিনি ছিলেন বৃদ্ধাচার্য, রাজপুরোহিত, সর্বগুণজ্ঞ, সকল চূড়ামণি ইত্যাদি। তিনি এই গ্রন্থখানির সঙ্কলয়িতা কিংবা রচয়িতা তাহা পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে না।

পূর্বাদিগম গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থে লেখা হইয়াছে যে ইহা "পর স্পুক্ষু মকবেহন, সহন সঙ্গ্ গুমেগো শিবাগম" অর্থাৎ ইহা শিব উপাসকগণের সকলের জন্যই রচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই গ্রন্থে (অ)লেপক, চানক, রত্নহার, শম্ভু, শিবপক্ষ প্রভৃতি শৈব সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে গ্রন্থ রচনাকালে যে সমস্ত ধর্ম-সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল তাহারা সকলেই নানাপ্রকার সুখসুবিধা উপভোগ করিত।

ডঃ ভান নায়েরসেন বলিয়াছেন যে কোন কোন পুঁথির শেষে আছে : "ইতি শিবশাসন", সুতরাং এই গ্রন্থ শিবশাসন হইতে অভিন্ন[১১৪]। এই গ্রন্থ শিবশাসন হইতে অভিন্ন হউক বা না হউক ইহাতে যে শিবশাসনের সার উদ্ধৃত হইয়াছে সে সম্বন্ধে হয়তো দ্বিমত থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ পূর্বাদিগম গ্রন্থে অনেকবারই বলা হইয়াছে যে ইহা অধিগম, শাসন এবং শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া বিরচিত হইয়াছে। ডঃ ভান নায়েরসেন অনুমান করিয়াছেন যে নাগর-কৃতাগমের ৮১।১ শ্লোকের চতুর্থপাদে এই গ্রন্থকে উল্লেখ করিয়াই বলা হইয়াছে :

"তন্ বিস্মৃত্য নিরেঙ্গ্ চারাধিগম শাস্ত্র[১১৫] লেন শাসন"

অর্থাৎ অধিগম, শাস্ত্র এবং শাসনে যে বিধি বিবৃত হইয়াছে তাহা বিস্মৃত না হইয়া (চলিতে হইবে)। ইহা আশ্চর্য মনে হইবে যে এই যবদ্বীপীয় ভাষার গহনে সংস্কৃত অসমাপিকা ক্রিয়া "বিস্মৃত্য" শব্দটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করে নাই। সে যাহাই হউক, ডঃ ভান নায়েরসেন আরো বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থখানিকে আদর্শরূপে ব্যবহার করিয়া সেই যুগের প্রশস্তিগুলি রচিত হইত। বস্তুতঃ প্রাচীন যবদ্বীপীয় দানপত্রগুলিতে যেমন রাজকর্মচারিদের নামের ও উপাধির তালিকা পাওয়া যায়[১১৬], তেমনি আমরা এখানে পাইতেছি শৈব ধর্মাধ্যক্ষগণ এবং সপ্তো-পত্তিকে। এতদ্ব্যতীত এখানে শপথবাক্য এবং তুমপেল-মজপহিত যুগের কোন কোন প্রশস্তিতে যে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাও এই গ্রন্থশেষে বিদ্যমান। ইহা ছাড়াও, এই গ্রন্থে আমরা অনুশাসনলিপিগুলির অনেক পরিচিত শব্দ বা শব্দগুচ্ছের (expression) ব্যাখ্যা পাইতেছি[১১৭]।

এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া ডঃ ভান নায়েরসেন বলিয়াছেন[১১৮] যে পূর্বাধিগম[১১৮ক] গ্রন্থখানিকে আভ্যন্তরীণ প্রমাণের বলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে বা মজপহিত যুগের প্রারম্ভে সংস্থাপিত করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ মজপহিত সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল এবং আমরা উহা যে আকারে পাইতেছি সেই আকারেই উহা বিদ্যমান ছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি কোন কোন লেখকের মতে এই গ্রন্থ রাজা ঐরলঙ্গের পূর্ববর্তী যুগে বিদ্যমান ছিল এবং এই গ্রন্থই ৯১৩ খৃষ্টাব্দের অনুশাসনলিপিতে "শিবশাসন" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ডঃ ক্রোমও এই অভিমত পোষণ করিতেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ ভান নায়েরসেন বলিয়াছেন[১১৯] যে এই অভিমত সম্ভবতঃ ভান দের তুক কর্তৃক পরিবেশিত ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই গঠিত হইয়াছিল। ৯১৩ খৃষ্টাব্দের অনুশাসনলিপিতে যে "শ্রী ধর্মবংশ তেগুহ অনন্তবিক্রমোত্তুঙ্গদেব"-এর উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার নাম পূর্বাধিগম গ্রন্থে নাই ; তাঁহার নাম আধুনিক যুগে রচিত বলিদ্বীপীয় glossary বা পরিশিষ্ট তালিকায় পাওয়া যায় বটে কিন্তু এই glossary অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টীকাকারের কল্পনাপ্রসূত। পূর্বাধিগম গ্রন্থে ধর্মবংশের নাম না

থাকিলেই যে ইহা তাঁহার সমসাময়িক কালে রচিত হইতে পারে না ইহা যুক্তিসঙ্গত কথা নহে। বিশেষতঃ পুর্বাধিগম গ্রন্থের অন্তিমে কোন কোন পুঁথিতে লেখা আছে "ইতি শিবশাসন" বা "শিবশাসনসরোদ্ধৃতসন" এবং এই 'শিবশাসন' শব্দটি ৯১৩ খৃষ্টাব্দের একটি অনুশাসনলিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং প্রশ্ন হইতেছে যে পুর্বাধিগম-শিবশাসন এবং ৯১৩ খৃষ্টাব্দের উল্লিখিত 'শিবশাসন' একই গ্রন্থ কিনা। পুর্বাদিগম গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণে ইহা যদি স্বতঃই মনে হয় যে এই গ্রন্থ তুমপেল-মজপহিত যুগে বা মজপহিত যুগে বিরচিত হইয়াছিল, তাহা হইলে অনুমান করিতে হইবে যে লেখক পুর্বাদিগম-শিবশাসন গ্রন্থ রচনা করিবার সময় ৯১৩ খৃষ্টাব্দের উল্লিখিত শিবশাসন গ্রন্থকে যুগোপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন অথবা উহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে পুর্বাদিগম গ্রন্থের অন্তিমে লিখিত "শিবশাসন" বা "শিবশাসন-সারোদ্ধৃতসন" বাক্যাংশটির তাৎপর্য পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি হইবে না।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভিক দিকের কিছু অংশ ভান দের তুক তাঁহার বিখ্যাত অভিধানে উদ্ধৃত করিয়াছেন[১২০]। উহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে ভুজঙ্গ-শিব বা শৈব ধর্মমহামাত্রগণ ছিলেন সহরের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি; তাঁহারা ছিলেন পবিত্র অধিগম-শাস্ত্রসারোদ্ধৃতের রক্ষক। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ধর্মাধ্যক্ষ। সম্ভবতঃ এস্থলে শৈব ধর্মাধ্যক্ষকেই বুঝাইতেছে, বৌদ্ধ-ধর্মাধ্যক্ষকে নহে। সে যুগের ধর্মাধ্যক্ষদের কাজ ছিল ধর্ম এবং বিচারবিভাগে। জাভা-বলিদ্বীপের বিচার-ব্যবস্থা ধর্মের সহিত এত ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত ছিল যে উহার মধ্যে সীমারেখা টানা সম্ভবপর ছিল না। এই সমস্ত বিশিষ্ট ভুজঙ্গ-শিবের মধ্যে ছিলেন: তির্বন, কণ্ডমুহি, পম্বতন, পঞ্জঙ্গজীব, মংঘুরি, জম্বি, লেকন এবং তঙ্গর। এই তালিকায় যে-সমস্ত ভুজঙ্গ পাইতেছি তাহার সহিত অনুশাসনলিপি, প্রণিতি রাজ কপ কপ বা নাগরকৃতাগমের তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করা দুরূহ। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে এই গ্রন্থে প্রাক্তন যুগের শিবশাসন বা অধিগম-শাস্ত্রের সার উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং এখানে দশম এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাজকর্মচারিগণের মিলনক্ষেত্র রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ৩৯৫৮(২) সংখ্যক পুঁথিতে ওয়েয়াঙ বা ছায়ানাটকের উল্লেখ আছে।

দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থখানি অদ্যাপি সম্পাদিত হয় নাই।

এইবার আমরা স্বরজম্বু বা স্বরজম্ভু গ্রন্থখানি আলোচনা করিব। এই গ্রন্থখানি মুখ্যতঃ মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়কে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে স্বরজম্বু শব্দগুচ্ছ স্বয়ম্ভু শব্দের বিকৃত রূপ। এই গ্রন্থে মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের ২৭, ৫৯, ১৫৯, ২২৪, ২৩০, ২৩২, ২৩৪, ২৪২, ২৪৬, ২৫০, ২৬০, ২৯০, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭ এবং অন্যান্য শ্লোক অনুদিত হইয়াছে অথবা ইহাদের ভাবানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ মনুসংহিতার অষ্টাদশব্যবহার নামক অংশটির অনেকাংশই এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই অষ্টাদশ ব্যবহারবিধি মনুসংহিতার অষ্টম এবং নবম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকগুলি যবদ্বীপীয় ভাষায় সুন্দরভাবে অনুদিত হইয়াছে। ডঃ ভান নায়েরসেন ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্তের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। মনুসংহিতার এই অংশের প্রথম শ্লোকেই আমরা পড়িতেছি:

"ব্যবহারান্দিদৃক্ষুস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহ পার্থিবঃ
মন্ত্রজ্ঞৈর্মন্ত্রিভিশ্চৈব বিনীতঃ প্রবিশেৎসগম্।"

প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় অনুবাদও মূলের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ; সেখানে আমরা পড়িতেছি:

"কুনঙ্গ উলহ সঙ্গ প্রভু উনিঙ্গা নির তঙ্
ব্যবহার নিকঙ্ রাৎ, অরোবঙ্গ ত সির ভাহ্মণ
বিহিকন মঙ্গজি লবন মন্ত্রি রিঙ্ ক্রহ্ মবিবেক
সুলক্ষণ অথা সির তুমমহ রিঙ্ সভা[১২১]।"

অনুবাদ করিবার সময় কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রন্থকার গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃত শব্দগুলি পরিহার করেন নাই, যেমন ২৬ ধারাতে আমরা পড়িতেছি:

"অকরেঃ ইঙ্গিতঃ, লকুন্য উলহ্ন্য শব্দন্য
বিকার নিঙ্গ উলৎন্য বেনেস্ নিঙ্গ মুথন্য (কক্রহন্য ইক)।

মূল সংস্কৃতে আমরা পড়িতেছি:

"আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষিতেন চ
নেত্রবক্ত্রবিকারৈশ্চ গৃহ্যতেঽন্তর্গতং মনঃ[১২২]।"

যবদ্বীপীয় গ্রন্থকার আকারৈরিঙ্গিতৈঃ স্থলে লিখিয়াছেন অকরেঃ ইঙ্গিতঃ।

মানবধর্মশাস্ত্রের অষ্টাদশব্যবহার বিধির সহিত প্রাচীন যবদ্বীপীয় স্বরজম্বুর তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া এযাবৎ উভয়ের সৌসাদৃশ্যই বড় করিয়া দেখান হইয়াছে; বস্তুতঃ উহাদের মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান তাহা সুচারুরূপে উপস্থাপিত করা হয় নাই এবং এই পার্থক্যটি গভীর অর্থবহ। এই পার্থক্যের আলোচনা করিতে গিয়া ডঃ ভান নায়েরসেন বলিয়াছেন যে বিভিন্ন যবদ্বীপীয় লেখক এই গ্রন্থকে বিভিন্ন অঞ্চলের রীতিনীতির সহিত সামঞ্জস্যবিধান করিতে গিয়াই এই পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ তিনি মনুসংহিতার ৮ম অধ্যায়ের ১৩১-১৩৭ শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। যবদ্বীপীয় স্বরজম্বুর অনুরূপ ধারায় মুদ্রার আনুপাতিক হার যেখানে বর্ণনা করা হইয়াছে সেখানে একদিকে যেমন সংস্কৃত কৃষ্ণল, ধরণ, পণ প্রভৃতি রহিয়া গিয়াছে তেমনি আবার যবদ্বীপীয় টাকার মা. সু. কু. প্রভৃতিও উল্লিখিত হইয়াছে। জরিমানার অর্থ টাকায় প্রকাশ করিবার সময় পূর্বে পণ-শব্দের উল্লেখ থাকিলেও উহা বিশেষভাবে মা. সু. কু. প্রভৃতি যবদ্বীপীয় মুদ্রাব্যঞ্জক শব্দ দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থটি বর্তমান আকার পরিগ্রহণ করিবার পূর্বে আরো দুইটি স্তর অতিক্রম করিয়াছিল বলিয়া ভান নায়েরসেন মনে করেন, যথা (১) প্রথম স্তরে সংস্কৃত মুদ্রার নামই একমাত্র বিদ্যমান ছিল (২) দ্বিতীয় স্তরে যবদ্বীপীয় মুদ্রার নাম প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং ইহার স্বাক্ষর অনুশাসনলিপিগুলিতেও রহিয়া গিয়াছে। তৃতীয় স্তরে মুদ্রার অঙ্কগুলি বৃহৎ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইয়ঙ্কার কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থখানি এই শেষ পর্যায়ের স্বাক্ষরবহ[১২৩]।

যবদ্বীপীয় স্বরজম্বু রচনায় লেখক বিশেষভাবে সংস্কৃত মানবধর্মশাস্ত্র অনুসরণ করিলেও তিনি কোথাও কোথাও আবার টীকা-টিপ্পনী সংযোগ করিয়াছেন যাহা সংস্কৃত গ্রন্থে

অনুপস্থিত[১২৪]। ডঃ ভান নায়েরসেন অনুমান করিয়াছেন যে হয়তো যবদ্বীপীয় গ্রন্থকার মানব-ধর্মশাস্ত্রের একখানি সংস্কৃত টীকা বা নিবন্ধের সাহায্য লইয়া স্বরজম্বু রচনা-কার্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন, কারণ স্বরজম্বুর সহিত মানবধর্মশাস্ত্রের যেস্থলে পার্থক্য রহিয়াছে সেখানে আমরা পড়িতেছি : "(মক্কন) লিঙ্গ সঙ্গ পণ্ডিত" অর্থাৎ আচার্য এইরূপ বলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত স্বরজম্বুর বিভিন্ন অংশের যে-সংস্কৃত নামকরণ করা হইয়াছে তাহা সর্বত্র মানবধর্মশাস্ত্রানুযায়ী নহে। সম্ভবতঃ এইরূপ অংশবিভাগ সংস্কৃত কোন টীকা বা নিবন্ধে ছিল যাহা আমরা এখনো খুঁজিয়া পাই নাই[১২৫]। এই টীকা সর্বজ্ঞ নারায়ণ কিম্বা নন্দনের কিংবা অপর কাহারো অথবা এই গ্রন্থে আমরা যে পার্থক্য অবলোকন করিতেছি তাহার মধ্যে যবদ্বীপীয় গ্রন্থকারের অবদান আছে কিনা এবং থাকিলে কতটুকু তাহা নিঃসংশয়ে বলা মুস্কিল। এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণীয় যে মানব-ধর্মশাস্ত্রের ৮ম অধ্যায়ের যে যে শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, যবদ্বীপীয় স্বরজম্বুতে তাহার কিছু কিছু বিদ্যমান[১২৬]।

এই গ্রন্থখানি সর্বজ্ঞ নারায়ণের মন্বর্থ-বিবৃতির উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইয়া থাকিলে ইহার রচনাকাল চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইবে ; নন্দনের সঠিক তারিখ জানা যায় না। এই সকল টীকাকারের আবির্ভাবকাল সঠিকভাবে জানা না গেলেও এই গ্রন্থকে চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া সম্ভবতঃ গ্রহণ করা যায়[১২৭]।

আদিগম নামক গ্রন্থখানি আরো আধুনিক বলিয়া মনে হয় ; ইহা রাজনীতিকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে বলিয়া দম্ভের সহিত ঘোষণা করা হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই আমরা পড়িতেছি : "ওম্ নমো বুদ্ধায় নমঃ।" গ্রন্থের ভাষা প্রাচীন যবদ্বীপীয়, মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত বিকীর্ণ রহিয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে কুটারমানবের মত অষ্টদুষ্টের কথা বর্ণিত হইয়াছে ; ইহার মধ্যে আমরা অষ্টচোরের সংজ্ঞা ও তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থার কথাও পড়িতেছি। গোচারণের নিয়মাবলী, অপরাধীর চতুর্বর্ণানুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা ইত্যাদিও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

আর একখানি স্মৃতি গ্রন্থের নাম ক্রম নিঙ্ সাক্ষী ; ইহাতেও কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক আছে। ডঃ যুইনবল বলিয়াছেন যে নিম্নলিখিত বিকৃত সংস্কৃত শ্লোকটির অনুরূপ শ্লোক মনু-সংহিতায়[১২৮] পাওয়া যায় :

"গৃহিণঃ পুত্রিণমোলঃ ত্রময়ঃ ক্ষত্রিয়ঃ ইত্যস্তঃ
সাক্ষ্যঃ মহার্তি স্বদঃ যেদপ্যানিনৃত্রিতঃ।"

অষ্টাদশ ব্যবহার নামক গ্রন্থখানিও আইনশাস্ত্রের পর্যায়ে পড়ে[১২৯]। ইহার ৮৮২ সংখ্যক পুঁথির আরম্ভে আমরা পড়িতেছি : অবিঘ্নম্ অস্তু[১৩০]। এই গ্রন্থখানি প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত এবং ইহার মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক বা শ্লোকাংশ বিকীর্ণ রহিয়াছে। ইহাতেও আদিগমের মত অষ্টদুষ্টের কথা বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থে মজপহিতের উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে এই গ্রন্থের রচনাকাল ১২৯২ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে হইবে।

দেবদণ্ড[১৩১] নামক একখানি আইনগ্রন্থও যবদ্বীপে বিদ্যমান ; ইহার অপর নাম ধর্মবিচার। উভয় নামই সংস্কৃত হইতে পরিগৃহীত। ইহাতে বলা হইয়াছে যে বিষ্ণু দুষ্ট লোকদিগকে শাস্তি-

প্রদান করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩৯৫৭ (১)-সংখ্যক পুঁথির ২৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ৩৫টি অনুচ্ছেদ আছে। গ্রন্থখানি প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত।

এই গ্রন্থে যে-সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে আছে : দাস, স্বর্ণ বা মুদ্রা ঋণ দেওয়া, দংশনকারী হিংস্র কুকুর, মাঠের আইল কাটিয়া দেওয়া প্রভৃতি বিষয়।

প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত আর একখানি গ্রন্থের নাম ঋষিশাসন। ইহা এখনো প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে যাহারা ধর্মচর্যা করেন তাহাদের সামাজিক অবস্থার কথা বিবৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থে দেবশাসনের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে উক্ত গ্রন্থখানি সকল পর্যায়ের ধর্মাচারী ব্যক্তিগণের জন্য রচিত হইয়াছে। এই ধর্মাচারিগণের মধ্যে আছেন সোগত, সল্‌বির ড়ঙ্গহ্যঙ্গ সলিঙ্গসিঙ্গন্‌, বুলুসন, তিগঙ্গরৎ, রজজম্বি, ঐরবুলঙ্গ, ঐরসি, মঙ্গলিহি, তজি কমুলন, পরবঙ্গন্[১৩২]। এই সমস্ত শব্দের অধিকাংশের অর্থ অজ্ঞাত।

পা দ টী কা

(ক)

১. দ্রষ্টব্য *TBG* 56 (1914) pp. 365 ff.

২. প্রথম এবং দ্বিতীয় বল্লী।

৩. দ্রষ্টব্য : Juynboll, *Supplement* I (1907), ৫০২৩ (১) নং পুঁথি।

৪. ইহার ধর্মমত এবং দার্শনিকতত্ত্ব আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Krom, *Borobudur*, vol. II, pp. 302 ff , Kern, *VG* IV, pp. 149-177.

৫. *BKI*, 72 (1916) pp. 401 ff.

৬. Coedes, *Les etats* etc., p. 316.

৭. Cod. 3623 (1) in Juynboll, *Supplement*, II

৮. *Ibid*, Cod. 3868 (3).

(খ)

৯. Pigeaud, *Java in the 14th Century*, vol. I pp. 87-90 ; vol. III pp. 129-137.

১০. প্রাচীন যবদ্বীপীয় শিলালেখ-তাম্রশাসন পাঠ করিলেই এই উক্তির অসারতা প্রমাণিত হইবে।

১১. Pigeaud, *op. cit.*, vol. I pp 92-95 ; vol. III pp. 139-40.

১২. *Ibid*, vol. IV, pp. 288, 370.

১৩. Brandes in *VBG* 51 (1900), Appendix III.

১৪. Cf. Pigeaud *op. cit.*, vol. II pp. 128-9.

১৫. নবনত্যো ইহার স্থলে পাই : জুরু পঙ্গলসন।

১৬. নবনত্যো ইহার নাম পড়িতেছি ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে : কমুরুহন। অনুশাসনলিপিগুলিতে এই নামই সুপ্রচলিত।

১৭. Pigeaud, *op. cit.*, vol. I pp. 81-86 ; vol. III pp. 119-28 ; vol. IV pp. 351-9.

১৮. ইহা চতুর্বেদের কোন অংশ মনে হয় না, কারণ উহা অনধিকারীর শ্রোতব্য বিষয় ছিল না। সুতরাং রাজ-দরবার বেদমন্ত্র পাঠ করিবার অনুকূল স্থান ছিল না।

১৯. Raffles, *The History of Java*, 2nd ed., 1830 ; Poerbatjaraka, *Nitiśāstra, Oudjav. tekst met vertaling*, etc., Bibl. Jav. .no. 4 (1933). See also Juynboll, *Supplement* I (1907), II (1911). Also C. Hooykaas in *JGIS* XV (1956) pp. 18 ff.

২০. C. Hooykaas, *op. cit.*, p. 21.

২১. *Tijdchr. Ned. Ind.*, 5th year (1843) 2nd part, pp. 236 ff.

২২. C. Hooykaas in *Djawa* 20 (1940) pp. 42-46.

২৩. গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : C. Hooykaas, *JGIS* XV (1956) pp. 34 ff.

২৪. A. C. Vreede, *Cat. Jav. Mad. Hss*, (1892) pp. 283-5, 372, 377.

২৫. Raffles, *The History of Java*, 2nd ed., I pp. 305-7, 351.

২৬. দ্রষ্টব্য : *BKI*, 6th series VIII (1901) pp. 393 ff.

২৬ ক. International Academy of Indian Culture, New Delhi, publ. 1962.

২৭. *Ślokāntara*, Ed. Sharada Rani, publ. International Academy of Indian Culture, 1957, Nagpur.

২৮. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Sharada Rani ; *Op. cit.*, *Notes*, pp. 6-12.

২৯. *Op. cit*, p. 43 ff.

৩০. শ্রীমতী শারদা রাণী (*Op. cit* , *Notes* pp. 53-57) অনুরূপ শ্লোক সংস্কৃত মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, চাণক্যরাজনীতিশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ এবং প্রাচীন যবদ্বীপীয় নীতিশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৩১. *Op. cit.*, *Notes* p. 91.

৩২. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : *Ibid*, p. 93 ff.

৩৩. শ্রীমতী শারদা রাণী অনুরূপ শ্লোক সংস্কৃত মহাভারত, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি হইতে আহরণ করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য : *Op. cit.*, *Notes* pp. 118 ff.

৩৪. মনু ১।৯১। শূদ্রগণ কেবলমাত্র কষ্টে নিপতিত হইলেই উচ্চতর বর্ণের ব্যবসা বা কর্ম অবলম্বন করিতে পারে, নতুবা উচ্চ বর্ণের সেবা করাই তাহাদের সাধারণ ধর্ম। শ্রীমতী শারদারাণী আপস্তম্ব, গৌতম, মহাভারত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি হইতে ইহার বহু দৃষ্টান্ত পরিবেশন করিয়াছেন।

৩৫. সংস্কৃত স্মৃতি গ্রন্থাদিতে অন্ত্যজগণকে সাধারণতঃ শূদ্রবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে ; তবে কোথাও কোথাও চণ্ডালগণকে পৃথক করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। Kane, *Op. Cit.* II, I pp. 167-8 quoted by Sharada Rani, *Op. Cit. Notes* pp. 149 ff.

৩৬. ইহার মধ্যে ধূর্তের যে লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ মুখ পদ্মদলের মত, বাক্য চন্দনশীতল এবং হৃদয় scissors (কর্ত্র = ক্ষুর) তুল্য—তাহার অনুরূপ অনেক শ্লোক সংস্কৃতে বিদ্যমান। শারদারাণী *Notes*, pp. 178 ff.

৩৭. এই পাঁচটি নাম অষ্ট চণ্ডালের নামের মধ্যেও আছে। ব্রতীশাসন (১১) গ্রন্থেও পঞ্চ চণ্ডালের নামোল্লেখ আছে।

৩৮. *Op. cit.*, *Notes* pp. 229 ff.

৩৯. সুপুত্র সম্বন্ধে যে শ্লোক দেওয়া হইয়াছে তাহা তন্ত্রী কামন্দকেও দেখা যায়। দ্রষ্টব্য : শারদা রাণী *op. cit. Notes* pp. 239-40.

৪০. যবদ্বীপীয় টীকায় হিংসাকে হত্যা করা অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে।

৪১. অনুরূপ অন্যান্য সংস্কৃত শ্লোকের জন্য দ্রষ্টব্য : শ্রীমতী শারদা রাণী, *op. cit.*, pp. 251 ff.

৪২. বিস্তৃত টীকার জন্য দ্রষ্টব্য : শারদা রাণী, *op. cit. Notes* pp. 254-256.

৪৩. অনুরূপ সংস্কৃত শ্লোকের জন্য দ্রষ্টব্য : শারদা রাণী, *op. cit. Notes* pp. 262 ff.

৪৪. শ্রীমতী শারদা রাণী ইহার সহিত তুলনীয় করিয়াছেন মনু ১।৮৬, মহাভারত ১২।২৩১।২৮, পরাশর (১।২৩), বায়ুপুরাণ ৮।৬৫-৬, কূর্মপুরাণ অধ্যায় ২৬।

৪৫. ঠিক এই শ্লোকটি বৃহস্পতিতত্ত্বের ৩৪ শ্লোকে বিধৃত হইয়াছে, কেবলমাত্র প্রথম দুইটি শব্দের স্থান পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

৪৬. *Op. cit.*, *Notes* p. 293.

৪৭. *Ibid* pp. 289-307.

৪৮. এখানে সংস্কৃত শ্লোক নাই।

৪৯. *K. B. Nwdb* II, 455 s. v. দশশীল, quoting from *Sutasoma* 145/2 and Sharada Rani (*op. cit.*, p. 345) quoting from *Navaruci*, p. 47.

৫০. মনুসংহিতা ১।৩১।

৫১. এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : Vreede, *Cat. Jav. Mad. Hss. Cod.* 2218 এবং Raffles, *History of Java*, II, 1830 p. 112 ff.

৫২. Calcutta stone-iniscription of Airlangga, 965 śaka.

(গ)

৫৩. G. C. Sarkar, Tagore Law Lectures, 1891, pp. 72 ff.

৫৪. ১।৪।১৪।

৫৫. ঐ ১।৫।২৩ ; দ্রষ্টব্য মনুসংহিতা ১।৫৮ ; ২।১১।

৫৬. Vide Pigeaud, *Tantu* pp. 291-93 ; Krom, *Geschiedenis* p. 340.

৫৭. ১।৫।

৫৮. KO XVI.

৫৯. Pigeaud, *Tantu* p. 300.

৬০. *Ibid*, p. 294 ; Juynboll, *Supplement* dl. I, p. 211.

৬১. *OJO* LXXXV, 5b-6a ; vide also *KO* XVI, la ; cf. *BKI* 100 (1941) p. 357 ; Pigeaud, *Java in the 14th century*, I (1960) p. 106.

৬২. Text in *BKI*, 100 (1941) p. 359-60.

৬৩. সংস্কৃত : প্রাড্‌বিবাক।

৬৪. ডঃ ভান নায়েরসেন এই প্রসঙ্গে ত্রবুলন (*OV* 1918 pp. 109-10), গুমুঙ্গবুটক (*VBG* LXII, p. 94), সিদোটেক (*OJO* LXXXIII), বেন্দোসরি (*OJO* LXXXV) এবং সেকরের (*TBG* LIII, p. 433) অনুশাসনলিপিগুলির উল্লেখ করিয়াছেন।

৬৫. Cf. Jonker, *Een Oudjav. Wetboek* etc., 1885.

৬৬. কৌটিল্যের মতানুযায়ী আইনশাস্ত্রের চারিটি স্তম্ভ হইল : (১) ধর্মশাস্ত্র (২) ব্যবহার বা সাক্ষ্য (৩) চরিত্র (ইতিহাস বা কিম্বদন্তী) (৪) রাজশাসন।

৬৭. Cf. Gonda, *Sanskrit in Indonesia* p. 177.

৬৮. Korn, *Het adatrecht van Bali*, the Hague, 1924, p. 254 ; Gonda, *op. cit.*

৬৯. দ্রষ্টব্য : Lekkerkerker, *Hindoe-recht in Indonesie*, পৃঃ ১২৯।

৭০. মনুসংহিতা ৮।৮৮-১০১ , দ্রষ্টব্য Lekkerkerker, *Hindoe-recht in Indonesie* p. 129.

৭১. দ্রষ্টব্য : মনুসংহিতা ৮।১১৪-১১৫ ।

৭২. Gonda, *op. cit* , p. 188 f.n. 135.

৭৩. বৌদ্ধ ব্রাহ্মণের সংখ্যা কম এবং তাহারা মৌলিক বৌদ্ধ পরিবার-সম্ভূত ; পেদণ্ড বুদ বা বৌদ্ধ পুরোহিতগণ বৌদ্ধ পরিবার সম্ভূত। Gonda quoting Korn in *Sanskrit in Indonesia* p. 171. C. Hooykaas এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। Vide *BKI*, 120 (1964) pp. 231 ff.

৭৪. Vide Shama Sastri, *Arthaśāstra*, chap. XI, p. 277. See also *Ibid*, p. 270. Edition of 1923.

৭৫. *Java in the 14th Century*, vol. IV, p. 468.

৭৬. তুলনীয় মনুসংহিতা ৭।২০-২১, ১৪১ , ৮।৯ , দ্রষ্টব্য : Lekkerkerker, *Hindoe-recht in Indonesie*, p. 116 ff.

৭৭. Ed. Sudarshana Devi, *Ślokāntara*, pp. 44, 86-7.

৭৮. Gonda, *op. cit.*, p. 179.

৭৯. See Brandes in *TBG* 32 pp. 140-41. এই ধরণের একটি জয়পত্র ষ্টুটেরহাইম প্রকাশ করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য : *OV* 1925 Bijl. D ; *TBG* 75 pp. 444-56.

৮০. Stutterheim, *op. cit.*, Recto, lines 9-13.

৮১. *Een Oudjavaansche wet-boek vergeleken met Indische rechtbronnen*, 1885.

৮২. লেখক কর্তৃক এই ত্রবুলন অনুশাসন-লিপিটি *Indian Culture*, vol. II-তে প্রকাশিত হইয়াছে।

৮৩. Jonker, *op. cit.*, Introd, pp. 11-15.

৮৪. তুলনীয় § 137, 143 ইত্যাদি।

৮৫. *Java in the 14th Century*, II p. 126.

৮৬. *Kuṭārmānava*, sec, 121.

৮৭. Jonker, *op. cit.*, p. 34-35.

৮৮. ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন (*op. cit.*, p. 175) কুটারমানবে চোর এবং দুষ্ট শব্দ যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হইলেও অষ্টদুষ্ট বলিতে হত্যাকারীকেই বুঝাইয়াছে। Vide Jonker, *op. cit.*, p. 36 and 163 ff.

৮৯. Jonker, *op. cit.*, sec, 21-28.

৯০. কুটারমানব, sec 21 ; Jonker, *op. cit.* p. 40 ff. ; মনুসংহিতা ৯।২৭৮ ।

৯১. Jonker, *op. cit.*, p. 86, sec 245. See also *Wratiśāsana*, ed. by Sharada Rani, Śloka no. 15, p. 99.

৯২. Gonda, *op. cit.*, p. 186 ; f.n. 79.

৯৩. Ed. Sharada Rani, *Ślokāntara*, pp. 48, 90-91 and *Notes* pp. 166 ff.

৯৪. Vide *Kuṭāramānava*, sec 219, 225 etc.

৯৫. মনুসংহিতা ৮।২৬৭-২৬৯, ২৭৯। মনুসংহিতার এই অংশ হইতে ফৌজদারী আইন সংক্রান্ত আরো বহু বিষয় পরিগৃহীত হইয়াছে; যথা ৮।২৭৯-৮৪, ২৮৬-২৮৮, ২৯৫-৩০০, ৩২০-২১, ৩২৫, ৩২৮-৩০, ৩৩৭, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫৬-৫৭, ৩৬১।

৯৬. দ্রষ্টব্য: Majumdar, *Suvarṇadvipa*, II, pp 10-11.

৯৭. *Ibid*, p. 10.

৯৮. *Kuṭāramānava*, sec. 191.

৯৯. *Ibid*, sec 149.

১০০. মনুসংহিতা, ৯।৭৬-৭৮, নারদস্মৃতি ১২, ১৬, ৯৬, ৯৭ হইতে।

১০১. *Kuṭāramānava*, sec 19, 125-6, 257 etc.

১০২. Jonker, *op. cit.*, sec 257.

১০৩. Ed. Sharada Rani, *Ślokāntara*.

১০৪. *TBG*, XXXII (1898) pp. 98-149, *OJO* XXXII ইত্যাদি।

১০৫. Jonker, *op cit.*, p. 91, sec 262 ff., Kane, *History of Dharmaśāstra* III (1946), p. 418; Gonda, *op. cit.*, pp. 174-5.

১০৬. এই সমস্ত নামের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Gonda, *op. cit.*, pp. 175-6, cf. *Bṛhaspati-Smṛti* 11.5.

১০৭. Pigeaud, *Java in the 14th Century*, IV, p. 474.

১০৮. Jonker, *op. cit.*, sec 169, 270.

১০৯. মনুসংহিতা, ৮।৪১৫।

১১০. Jonker, *op. cit.*, sec 166-167.

১১১. *Ibid*, sec 24, 31, 158, 165.

১১২. Jonker, *op. cit.*, sec 197.

১১৩. তুলনীয় Jonker, *op. cit.*, sec 195, 196.

১১৪. *BKI* 100 (1941) p. 358.

১১৫. অধ্যাপক স্রিকে এইস্থলে "শিক্ষ" না পড়িয়া 'শাস্ত্র' পড়িয়াছেন। দ্রষ্টব্য *BKI* 100 (1941) p. 361.

১১৬. Van Naerssen quoting *BKI*, dl. 95 (1937) pp. 447-8.

১১৭. দ্রষ্টব্য: *BKI* 100 (1941) p. 358.

১১৮. *BKI* 100 (1941) p. 360.

১১৮ ক. পূর্বাদিগাম এবং "ধিগাম একই গ্রন্থকে বুঝাইতেছে

১১৯. *BKI* 100 (1941) p. 360.

১২০. *KBNWdb*: Sub-voce: Dharmmādhyakṣa; see also Pigeaud, *Java in the 14th Century*, I, p. 91; II, p. 126; III, p. 138, IV pp. 368-9.

১২১. Van Naerssen in *BKI* 100 (1941) p. 363.

১২২. এই শ্লোকটি শ্লোকান্তরের ৮২ সংখ্যক শ্লোক এবং সংস্কৃত হিতোপদেশেও (২।৫০) আছে।

১২৩. *BKI* 100 (1941) pp. 364-65.

১২৪. ঐ পৃঃ ৩৬৯।

১২৫. Van Naerssen in *BKI* 100 (1941) p. 372 and f.n. 2. যবদ্বীপীয় গ্রন্থের এই অংশবিভাগগুলির নাম হইল : ইতি ধর্মচরিত, ইতি স্ত্রীসত্য সরক্ষণ, ইতি মর্যদচরিত, ইতি রেনচরিত, ইতি সাক্ষি চরিতাদি, ইতি চর চরিত। ইতি নিক্ষেপ চরিত, ইতি অস্বমি চরিত, ইতি দতনম চরিত, ক্রয় বিক্রয় চরিত, ইতি সীম চরিত, ইতি বাকপারুষ্য চরিত। ইতি স্ত্রীসংগ্রহণ চরিত।

১২৬. *Ibid* p. 374 ff.

১২৭. Cf. Van Naerssen in *Ibid*, p. 375 ff.

১২৮. মনুসংহিতা, ৮।৬২।

১২৯. অষ্টাদশ ব্যবহার মনুসংহিতাতেও বিবৃত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য : অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক হইতে।

১৩০ Juynboll, *Supplement*, dl. II.

১৩১. *TBG* 18 (1872) pp. 295 ff.

১৩২. Pigeaud, *Java in the 14th Century*, IV, p. 373.

নবম অধ্যায়

ব্যাকরণ, শব্দকোষ, ছন্দ এবং অলঙ্কার

যবদ্বীপীয় মহাকাব্য সাহিত্যের ঐশ্বর্য সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে ; সুতরাং আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই যে এই ঐশ্বর্য সৃষ্টিতে সংস্কৃত ব্যাকরণ, শব্দকোষ, ছন্দ এবং অলঙ্কারের অবদানও অসামান্য। বস্তুতঃ সাহিত্যের এই সমস্ত অঙ্গসজ্জা ভিন্ন সাহিত্য কখনো উচ্চাঙ্গের হইতে পারে না। ভারতীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া এইগুলিই বাস্তবিক পক্ষে দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। যবদ্বীপীয় সাহিত্যের এই সমস্ত বিদেশী উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করিলেই জাভা এবং বলিদ্বীপের সাংস্কৃতিক জীবনে ভারতীয় প্রভাবের পরিমাপ করা অনেকটা সহজসাধ্য হইবে। বাহ্যতঃ মনে হইবে যে প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যেরই প্রতিচ্ছবি। বস্তুতঃ যবদ্বীপীয় লেখকগণ সংস্কৃত ছন্দ এবং অলঙ্কার ব্যবহারে ভারতীয় লেখকগণ অপেক্ষা কম কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন নাই। ব্যাকরণ এবং শব্দকোষের মত ছন্দশাস্ত্রেরও কোন কোন পুস্তক আমাদের হস্তে পৌছিয়াছে। সম্ভবতঃ অলঙ্কার সম্বন্ধেও প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থ ছিল : যবদ্বীপীয় কবিগণ অলঙ্কারে যে অসামান্য মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র গভীরভাবে চর্চা ব্যতীত সম্ভবপর হইত না। সুতরাং ছন্দশাস্ত্র শিখিবার জন্য যেমন বৃত্তসঞ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থ বিদ্যমান, তেমনি অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধেও যবদ্বীপীয় ভাষায় গ্রন্থাদি বিদ্যমান ছিল ইহা মনে করাই স্বাভাবিক। কোন কোন লেখক সংস্কৃত শব্দকোষের অনুকরণে শব্দকোষ রচনা করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কেহ কেহ বা মিশ্র সংস্কৃত-যবদ্বীপীয় ব্যাকরণও রচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের মতই প্রাচীন যবদ্বীপের কোন কোন লেখক শিক্ষাদান এবং কাব্যরচনা একসঙ্গেই করিয়াছেন বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এইবার আমরা যবদ্বীপের (ক) ব্যাকরণ, শব্দকোষ, (খ) ছন্দ এবং অলঙ্কার শাস্ত্র আলোচনা করিব। আমরা প্রথমে আলোচনা করিব ব্যাকরণ এবং শব্দকোষ।

ক. ব্যাকরণ ও শব্দকোষ

সৌভাগ্যক্রমে যবদ্বীপীয় সাহিত্যের ব্যাকরণ এবং শব্দকোষ বিভাগের কিছু কিছু গ্রন্থ প্রাচীন যুগ হইতে আমাদের হস্তে আসিয়া পৌছিয়াছে। ইহাদের মধ্যে স্বরব্যঞ্জন, আদিস্বর,

কৃতবস, সুক্ষবস, কারক সংগ্রহ এবং ইহার সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী গ্রন্থগুলি প্রধান। প্রথমোক্ত গ্রন্থখানি এবং কারকসংগ্রহে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখাইবার বিশেষ প্রয়াশ পরিলক্ষিত হয়। ডঃ যুইনবল কৃতবস[১] (=[সং]স্কৃত ভাষা) এবং ৩৮৯৬ (১) সংখ্যক পুঁথি হইতে ব্যাকরণের নিয়ম কিছু পরিবেশন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সিল্‌ভা লেভীও কারকসংগ্রহের শ্লোকগুলি প্রকাশ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন[২]। যবদ্বীপীয় সাহিত্য এবং অনুশাসনলিপিতে সংস্কৃত বৈয়াকরণগণের মধ্যে পাণিনি এবং চান্দ্র ব্যাকরণের উল্লেখ আছে; কাতন্ত্র ব্যাকরণের কারক সংক্রান্ত নিয়মাবলীও যে যবদ্বীপে অপরিজ্ঞাত ছিল না তাহা স্মরণ করিলে এই গ্রন্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও বিশ্বাস হওয়া স্বাভাবিক[৩]। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখ হইতে অবশ্য পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী এবং কাতন্ত্র ব্যাকরণের সম্পূর্ণ গ্রন্থ যে যবদ্বীপে বিদ্যমান ছিল তাহা প্রমাণিত হয় না, কিন্তু এ কথা সম্ভবতঃ স্বীকার করা চলে যে উপরোক্ত বৈয়াকরণগণের কিছু সংস্কৃত সূত্র যবদ্বীপীয় শিক্ষার্থীদের শিখিবার উপযোগী করিয়া পরিবেশন করা হইয়াছিল। হয়তো এই উপলক্ষ্যে ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করিবার জন্য কিছু কিছু সংস্কৃত শ্লোকও যবদ্বীপে আমদানী হইয়াছিল।

এই সমস্ত ব্যাকরণশাস্ত্র যে যবদ্বীপের শিক্ষিত মহলে যত্নসহকারে অধীত হইত তাহার প্রমাণ অনুশাসনলিপিগুলিতেও রহিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা জয়সোঙ্গ অনুশাসনলিপির (আনুমানিক ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ) উল্লেখ করিতে পারি। উহাতে ড়ঙ্গ আচার্য শিবনাথ প্রমুখ কয়েকজন "ন্যায়ব্যাকরণশাস্ত্র পরিসমাপ্ত" করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা অর্থহীন অত্যুক্তি মনে হয় না; কারণ এই সমস্ত কর্মচারীদের মধ্যে ড়ঙ্গ আচার্য কনকমুনিকে বলা হইয়াছে "বোদ্ধশাস্ত্রব্যাকরণ পরিসমাপ্ত"। আবার ড়ঙ্গ আচার্য জয়স্মরকে বলা হইয়াছে "শঙ্‌ক্যশাস্ত্র পরিসমাপ্ত (সাংখ্য, সংখ্যা ?)[৪]। এই সমস্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের মধ্যে কেহ ছিলেন শৈব, কেহ বৌদ্ধ, কেহ সৌর, কেহ বা ভৈরবসম্প্রদায়ভুক্ত। ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দের খেয়ানৌকা সংক্রান্ত অনুশাসনলিপিতেও এই প্রকারের উপাধি বা গুণাবলী উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণের নামের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে[৫]।

এইবার আমরা স্বরব্যঞ্জন[৬] গ্রন্থটি আলোচনা করিব। এই গ্রন্থটি দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে স্বর এবং ব্যঞ্জনবর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে, দ্বিতীয় ভাগে ধাতুরূপ এবং সংস্কৃত রচনা আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থে কতকগুলি সন্ধির নিয়ম পর্যালোচনা করা হইয়াছে। স্বরবর্ণের তালিকায় আমরা পাই : অ, আ, ই, উ, ঋ, ৯, এ, ঐ, ও, অঃ, ওম্; এই সমস্ত স্বরবর্ণের কোন কোনটির দীর্ঘ উচ্চারণ এই তালিকায় অনুপস্থিত। ডঃ যুইনবল অনুমান করিয়াছেন যে পরিত্যক্ত অক্ষরগুলি হয়তো এই পুঁথির মূলগ্রন্থে বিদ্যমান ছিল[৭]। ৩৮৯৬ (১) সংখ্যক পুঁথিতেও অনুস্বার এবং ব্যঞ্জনবর্ণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আছে।

ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকা ইহতে থ, ছ, ঝ, ধ, এবং ঢ় বাদ পড়িয়া গিয়াছে এবং বর্ণমালাতে শ, ষ ও স-এর ক্রমিকবিন্যাস সম্বন্ধে (অর্থাৎ কে কাহার পরে বসিবে) কিঞ্চিৎ গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে যবদ্বীপের ব্যঞ্জনবর্ণ তালিকায় থ, ছ, ঝ, ধ, এবং ঢ

স্থান ছিল না ; সুতরাং স্বরব্যঞ্জনের গ্রন্থকার যে এই সংস্কৃত বর্ণগুলি বাদ দিয়াছেন তাহা একান্ত অপ্রত্যাশিত নহে। তবুও স্বীকার করিতে হইবে যে এই বর্ণগুলি দ্বীপময় ভারতে একান্ত অপরিচিত ছিল না। কারণ বলিদ্বীপে আবিষ্কৃত বুদ্ধ বেদের মধ্যে বর্ণমালার যে তালিকা পরিবেশন করা হইয়াছে তাহার মধ্যে আমরা পরিতেছি :

"স্বরব্যঞ্জন : অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ং ঃ ক খ গ ঘ ঙ প ফ ব ভ ম য র ল ব চ ছ জ ঝ ঞ শ স হ ত থ দ ধ ন।" ইহার মধ্যে ট ঠ প্রভৃতি অনেকগুলি বর্ণ বাদ পড়িয়া গিয়াছে[৮]। বেদপরিক্রমসারসংহিতাকিরণ[৯] নামক পুঁথিতে উপরোল্লিখিত স্বরবর্ণ ছাড়াও আমরা পড়িতেছি এ, ঐ, ও, ঔ। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাসও সংস্কৃতের অনুরূপ, তবে শেষের ব্যঞ্জনবর্ণগুলি নিম্নলিখিতরূপে পরিবেশিত হইয়াছে : য, র, ল, ব, শ, ষ, স, অং, অঃ। এই তালিকায় হ ড ঢ ৮ নাই।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে স্বরব্যঞ্জন গ্রন্থে শ, ষ ও স এর ক্রমিক অবস্থান লইয়া গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে ; ইহার কারণ কি তাহা বলা মুস্কিল। তবে যবদ্বীপে দশম শতাব্দীতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের স্বাভাবিক বিন্যাস যে অপরিচিত ছিল না তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে সঙ্গ হ্যঙ্গ কমহাযানিকন গ্রন্থে[১০]।

হ্রস্ব স্বরগুলিকে (যেমন অ, ই প্রভৃতি) একমাত্র এবং দীর্ঘস্বরগুলিকে (যেমন আ প্রভৃতি) দ্বিমাত্র বলা হইয়াছে অর্থাৎ এক মাত্রাবিশিষ্ট স্বরবর্ণে একটি মাত্রা এবং দুই মাত্রা বিশিষ্ট স্বরবর্ণে দুইটি মাত্রা বিদ্যমান আছে। দ্বৈত স্বরগুলিকে (যেমন : ঐ, অঃ ইত্যাদি) সংস্কৃতের পথ অনুসরণ না করিয়া 'ত্রিমাত্র' রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। স্বরবর্ণকে আবার দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা দীর্ঘ অর্থাৎ গুরু এবং লঘু অর্থাৎ হ্রস্ব। ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে ঘোষ, অনুনাসিক, অন্তস্বর প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থকার উদস্ত্য (সম্ভবতঃ 'উদাত্ত' শব্দের বিকৃত রূপ) এবং অনুদস্ত (অর্থাৎ 'অনুদাত্ত') বর্ণের কথাও বলিয়াছেন। গ্রন্থকার ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকেও মূর্ধণ্য, তালব্য, দন্ত্য, মহাপ্রাণ এবং অল্পপ্রাণ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই স্থলে আমরা কণ্ঠ এবং জিহ্বামূলীয় শ্রেণীর উল্লেখ পাইতেছি না। যবদ্বীপীয় লেখক এই সমস্ত সংজ্ঞার অর্থ বুঝিতেন মনে হয়, কারণ তিনি এই সমস্ত শব্দের ব্যাখ্যাও দিয়াছেন, যেমন মূর্দ্ধণ্যকে বলা হইয়াছে "ইকঙ্গ অক্ষর মেঙ্গল ইঙ্গ্ শিরঃ" : অর্থাৎ যে অক্ষরের ধ্বনি শির বা মূর্দ্ধা হইতে উৎসারিত হয়[১১]। এই ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ নূতন শিক্ষার্থীদের জন্যই প্রয়োজন হইয়াছিল।

ইহার পর সন্ধির নিয়ম বর্ণনা করা হইয়াছে। এই আলোচনায় গ্রন্থকার প্রক্রিয়সন্দি অর্থাৎ সন্ধির প্রক্রিয়া, স্বরসন্দি (স্বরসন্ধি), ব্যঞ্জনসন্দি (ব্যঞ্জনসন্ধি) এবং বিসর্গসন্ধির বিবরণ পরিবেশন করিয়াছেন[১১ক]। লেখক বলিয়াছেন "ইকঙ্গ ইকার দদি য" অর্থাৎ 'ই' পরিবর্তিত হইবে 'য়' তে। তিনি ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়াছেন ঐ+অম্=অয়ম্। সংস্কৃত নিয়মানুসারে[১২] ইহা আয়ম্ হইবে। অন্যান্য নিয়ম হইল "উকার দদি ব" অর্থাৎ 'উ' রূপান্তরিত হইবে "ব"-তে ; লেখক ইহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ব+উ+ই=ববি। পূর্বের দৃষ্টান্তটি আমরা যে সংস্কৃত

নিয়ম দিয়া পরীক্ষা করিয়াছি এখানেও তাহা প্রযোজ্য। লেখক আরো বলিয়াছেন যে যদি 'অ' এর পরে 'উ' থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া 'ও' হইবে এবং ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি আমাদের বিখ্যাত গঙ্গোদক (গঙ্গা+উদক) শব্দটি উপস্থাপিত করিয়াছেন[১৩]। অন্যান্য দৃষ্টান্তের মধ্যে আমরা পাই ক+উলহ্=কোলহ্। দৃষ্টান্তের মধ্যে যবদ্বীপীয় শব্দ থাকায় ডঃ গণ্ডা[১৩ক] বলিয়াছেন যে সংস্কৃত নিয়ম সহজে বুঝাইবার জন্যই গ্রন্থকার যবদ্বীপীয় শব্দে উপরোক্ত নিয়ম প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছেন। স্বরসন্ধির পর ব্যঞ্জন এবং বিসর্গসন্ধি আলোচনা করা হইয়াছে। এইগুলিও পূর্বোল্লিখিত রূপেই আলোচিত হইয়াছে। যুইনবলের সাপ্লিমেণ্টের[১৪] ৩১৭৩ (১)-সংখ্যক পুঁথিতে এই প্রকারের আর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে; উহার নাম হইল স্বলমৎ সেরৎ সন্ধি সেস্ত্র; অধ্যাপক ভ্রিদের ক্যাটালগেও[১৫] একটি সেরৎ সন্ধি সূত্রের উল্লেখ আছে[১৬]। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কোন কোন গ্রন্থের স্থলে স্থলে অনুস্বর (=অনুস্বার) এবং ব্যঞ্জনের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে[১৬ক]।

স্বরব্যঞ্জন গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশের নাম কৃতবস (সম্ভবতঃ ইহা সংস্কৃত ভাষার বিকৃত রূপ)। ইহাতে সংস্কৃত রচনা কিরূপে করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রারম্ভেই আমরা পড়ি : সঃ বৃক্ষঃ=ইকঙ্ কয়ু। সঃ বৃক্ষঃ তিষ্ঠতি=লাগি যঃ। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে লেখক প্রথম দুইটি শব্দের অনুবাদ করেন নাই, কারণ প্রথম দৃষ্টান্তেই এই দুইটি শব্দের অনুবাদ দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং এস্থলে উহার পুনরাবৃত্তি না করিয়া লেখক কেবলমাত্র তিষ্ঠতি শব্দের অনুবাদই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃত 'ইত্যর্থ' শব্দের ব্যবহারের প্রায় অনুরূপ। আর একটি দৃষ্টান্ত ঐ স্থল হইতে গ্রহণ করা যাউক। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন : সঃ গজঃ=ইকঙ্ লিমন অর্থাৎ হস্তীটি, অভিহতঃ=সিনিম্বৎ ইয় অর্থাৎ ইহা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল; দেনিঙ্গ অপ=কিসের দ্বারা? সঃ বৃক্ষঃ=ইকঙ্ কয়ু বা ঐ বৃক্ষ, তেন বৃক্ষেন=দে নিক সিনিম্বৎ ইয় অর্থাৎ ইহা দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল; নিপাতিতঃ=তিবা য অর্থাৎ ইহা পড়িয়া গেল, সঃ গজঃ অভিহতঃ ভবতি=সিদ্ধ য অর্থাৎ এই কার্য সম্পাদিত হইল[১৭]। গ্রন্থকার অতঃপর ক্লীবলিঙ্গের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন :

তৎ কাননম্=ইকঙ্ অলস্
তৎ কাননম্ কুসুমিতম্=মকম্বঙ্ ইয়।

ইহা লক্ষণীয় যে অনুবাদকারক সংস্কৃত হইতে প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে কোন ভুল করেন নাই। লেখক ইহার পর ক্লীবলিঙ্গের আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়া অবশেষে স্ত্রীলিঙ্গ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন :

সঃ লতা=ইকা উদ্বদ্

এস্থলে সঃ লতা স্থলে সা লতা পড়িতে হইবে। লেখক করণ কারকের দৃষ্টান্তও উপস্থাপিত করিয়াছেন, যথা—'তেন বৃক্ষেন'; বহুবচনের দৃষ্টান্ত পরিবেশন করিতেও তিনি ভুলেন নাই। কৃতবসের ৪২৫৯ সংখ্যক পুঁথির[১৮] শেষাংশে ধাতুরূপ আলোচনা করা হইয়াছে। স্থা-ধাতু সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে :

তিষ্ঠতি, তিষ্ঠতঃ, তিষ্ঠন্তে

ইহা তিষ্ঠতি, তিষ্ঠতঃ, তিষ্ঠন্তি রূপে পড়িতে হইবে।

লম্বক-সংগ্রহের ৫০৭৫ সংখ্যক পুঁথির মধ্যে একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ সংস্থিত এবং উহার প্রতি লাইনের প্রাচীন যবদ্বীপীয় অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার প্রথমাংশে কারক লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে এবং ইহার সমাপ্তিতে লেখা আছে : ইতি কারকসংগ্রহ(ম্) সমাপ্তম্। দ্বিতীয় অংশের আরম্ভ হইয়াছে স্বস্তিবাচন করিয়া : অবিঘ্নম্ অস্তু। ইহাতে বিভিন্ন সমাসের নামের তালিকা এবং উহার নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত পরিবেশন করা হইয়াছে। গ্রন্থের মধ্যে পাণিনির উল্লেখ কৌতুহলোদ্দীপক। যে শ্লোকটিতে তাহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা এই : "দ্বিগুঃ তৎপুরুষো দ্বন্দ্বো কর্মধারয় তথৈব চ, বহুব্রীহ্যাম্ ব্যয়ীভাবঃ সমাসঃ পাণিনেস্তু ষট্[১৯]।" চম্পার রাজা তৃতীয় ইন্দ্রবর্মনও কাশিকাসহ পাণিনির ব্যাকরণ, আখ্যান এবং শৈবদের উত্তরকল্পে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে[২০]। সুতরাং ইহা মনে করা অস্বাভাবিক নহে যে পাণিনির ব্যাকরণ বৃহত্তর ভারতে পরিচিত ছিল। ইহা যবদ্বীপে প্রচলিত ছিল কিনা এবং প্রচলিত হইয়া থাকিলে তাহার কাল নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার ; কারণ এই শ্লোকটি মুখস্ত-করা-বিদ্যার মত যবদ্বীপে কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের মাধ্যমে প্রচলিত হইয়া থাকিতে পারে। ইহার জন্য পাণিনির মূলগ্রন্থের যবদ্বীপে বিদ্যমান থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না। আলোচ্য পুঁথিটির সমাপ্তিতে লেখা হইয়াছে : "ইতি সমাসঃ সমাপ্তম্।"

বলিদ্বীপে এই শ্রেণীর আরো পুস্তিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শ্রেণীর পুস্তিকার দুইখানি হস্তলিখিত পুঁথির শেষে গ্রন্থখানির নাম দেওয়া হইয়াছে কারকসংগ্রহ[২১]। ইহাতে লেখক একে একে কারকগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারকসংগ্রহটি অনধিক ৪৫টি শ্লোকবদ্ধ চরণে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পঞ্চম চরণ হইতে আমরা পড়িতেছি :

"কর্মকর্তা তয়োর্যোগং যো বেত্তি স বিচক্ষণঃ।
যৎকৃতং কর্ম তৎ প্রোক্তং স কর্তা যঃ করোতি বা ॥
তৃতীয়া প্রথমা ষষ্ঠী ত্রিগ্রঃ কর্তৃত্বজাতয়ঃ।
পঞ্চমী সপ্তমী তাভ্যাম্ ঋতে তৎ কর্ম শব্দ্যতে ॥
সদ্বিতীয়া তৃতীয়া চ পঞ্চমী ষষ্ঠিকা তথা।
বিভক্তয়শ্চতগ্রস্তাঃ করণং সম্প্রকাশিতাঃ ॥
তৃতীয়কা চতুর্থী চ ষষ্ঠী তিস্রো বিভক্তয়ঃ।
সম্প্রদানে সমুদ্দিষ্টাস্তুপাদানে পি পঞ্চমী ॥
বিভক্তী দ্বেঽধিকরণং ষষ্ঠিকা সপ্তমী তথা।
তৎসর্বং যুক্তিতশ্চিন্ত্যং শেষে ষষ্ঠী তু মন্যতে ॥"

ইত্যাদি। পুঁথিশেষে আমরা পড়িতেছি :

"কাতন্ত্রং চ মহাতন্ত্রং দৃষ্ট্বা তেন উবাচ—
বালাববোধ(ন)ার্থায় কৃতঃ কারকসংগ্রহঃ ॥"

সিল্‌ভা লেভী বলিয়াছেন যে এই উপলক্ষ্যে কারকগুলির যে সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে তাহা যথার্থই সর্ববর্মণের কাতন্ত্র ব্যাকরণের (২।৪, ১৪ হইতে) অনুরূপ[২২]। আলোচ্য গ্রন্থখানির সংস্কৃত মূল পুস্তক এখনো আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু ইহার রচনায় যে কাতন্ত্র ও মহাতন্ত্রের সাহায্য লওয়া হইয়াছে তাহা গ্রন্থের মধ্যেই ঘোষিত হইয়াছে। বলিদ্বীপীয় টীকাকার আরো বলিয়াছেন যে কারকসংগ্রহের প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে যে "বকাভ্যাম্" শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে তাহার উদ্দিষ্ট দেবতা বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা এবং পরবর্তী শ্লোকে যে কবীন্দ্রকে উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি পাণিনি ব্যতীত আর কেহই নহেন[২৩]।

এই কারকসংগ্রহের শ্লোকগুলি বলিদ্বীপীয় টীকায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই পুস্তিকাগুলি সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনী এবং সংস্কৃত হইতে বলিদ্বীপীয় ভাষায় অনুবাদ শিক্ষা দিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল। এই ধরণের অনুশীলনী পুস্তকের খণ্ডিতাংশ কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। উহা হইতে আমরা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিবার প্রণালী কিরূপ ছিল তাহা কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারি। ডঃ গণ্ডা এইরূপ একখানি পুস্তিকা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া (অনুবাদ ব্যতীত) আমাদিগকে উপহার দিয়াছে[২৪]। যথা :

সঃ অহম্‌······তং রামলক্ষ্মণৌ রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ রামঃ···লক্ষ্মণঃ·· সিতাসিতৌ সিতশ্চ অসিতশ্চ সিতঃ অসিতঃ···ভ্রাতরৌ···বিচরন্তৌ···তৎ[২৫] বনং···তস্মিন্ বনে ··সীতা জনকাত্মজা জনকস্যাত্মজা জনকঃ···আত্মজা···তং রামলক্ষ্মণৌ সিতাসিতৌ ভ্রাতরৌ বিচরন্তৌ তাং সীতাং জনকাত্মজাং নমস্কৃত্বা সঃ অহম্ নমস্কৃত্বা চ সঃ অহম্ তৎ রামায়ণম্ রামস্য অয়নং রামঃ··· অয়নং···ইত্যাদি। এই অংশটি রামায়ণের সংক্ষিপ্তসারে প্রথম শ্লোকটির অনুশীলনী। প্রথম শ্লোকটি এই :

"রামলক্ষ্মণৌ ভ্রাতরৌ নমস্কৃত্যা সিতাসিতৌ
বনে তস্মিন্ বিচরন্তৌ সীতাংচ জনকাত্মজাং[২৫ক] ॥"

রামায়ণের এই সংক্ষিপ্তসারের নাম চরিত্র-রামায়ণ বা কবি জানকী, ইহা বলিদ্বীপে বিদ্যমান আছে। ডঃ গণ্ডা অনুমান করেন যে ইহা সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র শিখাইবার জন্য অথবা ক্লাশের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে রচিত হইয়াছিল[২৬]। সিলভা লেভী বলিয়াছেন যে পিতাম্বর শর্মন ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্তসার অবলম্বন করিয়া সারসংগ্রহ নামক একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন; উহাতে ক্রিয়াপদ শিখাইবার জন্য রামায়ণের সংক্ষিপ্তসার কাব্যাকারে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল[২৭]। চরিত্র-রামায়ণ নামক পুঁথিটিতেও[২৮] সেইরূপ ব্যাকরণ শিখাইবার প্রয়াস পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার প্রথমেই আমরা পড়িতেছি[২৯] :

"বিটপোচ্চিতায় বিটপেন উচ্চিত বিটপ···উচ্চিত···তেন বৃক্ষেণ···পর্ণেন বিটপোচ্চিত-শাখিনা···তে যাচকাঃ সঙ্গপাত্রা···আকৃত্যস্তে···পুমান্ দাতা···দাতুং তচ্ছীলঃ···তেন পুংসা দাত্রা তে আলয়াঃ···হৃষ্টঃ তে আলয়াঃ হৃষ্টাঃ প্রহৃষ্যন্তি···সঃ বৃক্ষঃ···স্তবকেন আঢ্যঃ···গন্ধবত্যা গন্ধং বহতি···গন্ধঃ বহতি···তস্মৈ বৃক্ষায় স্তবকাঢ্যাঢ্যায় গন্ধবহিনে" ইত্যাদি।

মিশ্র ব্যাকরণ-অভিধান শ্রেণীর একখানি গ্রন্থের নাম হইল একলব্য[৩০]। ইহার আরম্ভে

পড়িতেছি : "ওম্ অবিঘ্নম্ অস্তু নমঃ সিদ্ধম্" [পুঁথি ৫১৪০ (২)]। ডঃ ভান দের তুক[৩১] বলিয়াছেন যে নামটি সম্ভবতঃ একলাপ্য-শব্দের বিকৃতি ; ডঃ গপ্তা[৩২] অনুমান করেন যে ইহা সম্ভবতঃ 'একার্থলভ্য' শব্দের বিকৃতি। উভয় স্থলেই শব্দ দুইটির অর্থ একই, অর্থাৎ একই শব্দার্থ লাভ করা। গ্রন্থে মাত্রা বিচার না করিয়া সমান ধ্বনি-বিশিষ্ট শব্দের আলোচনা করা হইয়াছে। যেমন, বর, বরি, বরু, বর্ণের সংখ্যাগত মূল্য, বৃক্ষ, ধাতু, পৃথিবী, জল, মেঘ, নক্ষত্র, বিভিন্ন দেবতা, পশু, রাজপুত্র, ব্রাহ্মণ, দেহের বিভিন্নাঙ্গ, দর্পণ, গৃহ, বালক প্রভৃতি শব্দের প্রতিশব্দ পরিবেশন করা হইয়াছে। বিষ্ণু, কাম এবং অন্যান্য দেবতাদের অপর নামও ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এক শব্দের বিভিন্নার্থও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে, যেমন, সুর : পণ্ডিত ; সুর : বুট (=ভূত) ; সুর : দেব্ব (=দেব) ; সুর : সজোন্ (=সুরা) ইত্যাদি।

যবদ্বীপে কয়েকটি শব্দকোষও বিদ্যমান আছে ; উহার মধ্যে আদিস্বর[৩৩] একটি। ইহার বানানগুলি অত্যন্ত প্রমাদপূর্ণ, যেমন, 'ক্ষিতি'কে লেখা হইয়াছে 'সিতি', 'ভূতল' হইয়াছে 'বুটল', 'ভাষা' হইয়াছে 'বষ' ইত্যাদি। সুক্ষ্মবস (=সূক্ষ্মভাষা) নামক গ্রন্থখানি একটু স্বতন্ত্র ধরণের[৩৪]। ইহাতেও শব্দতালিকা পরিবেশন করা হইয়াছে ; গ্রন্থকার ইহাতে ধর্মগ্রন্থের নাম এবং ঘটনার রূপক বা রহস্যময় ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

আমরা পুর্বেই কৃতবসের আলোচনা করিয়াছি। উহাতে গণেশ, বরুণ, সমাধি, পূজা, ব্রত একচিত্ত প্রভৃতি শব্দের যথাসম্ভব প্রতিশব্দ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আমরা এইস্থলে ইন্দ্রের ২৯টি নাম, অগ্নির ৩১টি, বায়ুর ২৭টি, কামদেবের ২৯টি, চন্দ্রের ৪৮টি, পণ্ডিতের (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের) ৫৯টি, পক্ষীর ২৮টি, সর্পের বা উলার ৪৮টি, যমের ৯টি, বৃহস্পতির ৮টি এবং রাজার ২৯টি নাম পাইতেছি। ৫১৭৫ সংখ্যক পুঁথিতেও পদ্মমূর্তি, তঞ্জুঙ্গ বিরু, গগর ময়ঙ্গ এবং সুলসিহ্ প্রমুখ স্বর্গের অপ্সরাগণের নামের তালিকা পাওয়া যাইতেছে[৩৫]। এই পুঁথিতে এবং অধ্যাপক ভ্রিদের ক্যাটালোগের ২০৪৯ (৫) সংখ্যক পুঁথিতে[৩৬] আমরা চন্দ্রের দশটি নাম পাইতেছি। এই দশটি নাম হইল : শশী, সিতংসু, সসঙ্গকু, চোন্দ্র, বস্সন্ত, রতি, সসদর, এন্দুঙ্গ্, প্রবঞ্চ এবং তিয়েন। গদ্যে রচিত চণ্টকপর্বের একাংশে আমরা সূর্য, চন্দ্র, দেবগণ, সপ্ত বিদ্যাধরী প্রভৃতির নামের ব্যাখ্যা পাইতেছি ; উক্ত গ্রন্থ 'সমস্ত উপকথার' ব্যাখ্যা প্রদান করিবার অভিমানও পোষণ করিয়াছে। এই গ্রন্থটি যেরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাতে ইহাকে প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না, কারণ ইহাতে কিছু চীনা এবং আরবী শব্দও অনুপ্রবেশ করিয়াছে।

জাকার্তার লাইব্রেরীতে একটি সংস্কৃত-কবি অভিধান আছে। ইহা সংস্কৃত কোষ বা অভিধানের মত। ইহাতে বিভিন্ন শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। উহা হইতে 'দেব' শব্দের সংস্কৃত প্রতিরূপ নিম্নে দেওয়া হইল :

"অমরাস্ ত্রিদশাঃ প্রোক্তাঃ গীবাণা বিবুধাঃ সুরাঃ
বৃন্দারকা অদিতিজাঃ নির্জরা দানবদ্বিষঃ ॥
লেখাঃ স্বর্বাসিনোহ্ স্বপ্নাঃ ত্রিদিবেশাঃ সুধাশিনঃ।
দেবাঃ স্বর্গসদোঽমর্ত্যাঃ ঋভবোহ্ মৃতপাস্ তথা ॥

আদিতেয়াঃ সুমনসঃ সুপর্বাণো দিবৌকসঃ।

দেবতাস তাঃ স্ত্রিয়ামুক্তাঃ ষণ্ডেহ্‌থ দৈবতানি চ ॥"

এই তালিকা[৩৭] এবং এইরূপ অন্যান্য তালিকার সহিত বিখ্যাত অমরকোষের তালিকার তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে শব্দগুলির ক্রমিকবিন্যাস একই রূপ নহে এবং উভয় স্থলেই নূতন শব্দ রহিয়াছে। তবে শব্দগুলি উভয় স্থলে প্রায়ই সমান। শিবের নামের তালিকাটিও এইস্থলে চয়ন করা যাইতে পারে; কারণ দ্বীপময় ভারতে দেবতাদের মধ্যে তাঁহার স্থান ছিল খুব উচ্চে। এই তালিকার শেষের অংশ পড়া যায় না; কিন্তু যেটুকু পড়া যায়[৩৮] তাহা এই :

"শিব সর্ব বিরূপাক্ষাঃ[৩৯] মহাদেবো মহেশ্বরঃ।

শ্রীকণ্ঠঃ শঙ্করো ভর্গঃ সোমধৃৎ[৪০] নীললোহিতঃ ॥

কপর্দীচ কৃত্তিবাসাঃ রুদ্রো গঙ্গাধরো হরঃ ॥

কৃশানুরেতাঃ কামারিঃ পিনাকী বৃষকেতনঃ ॥

দূর্জতিস্[৪১] এ্যম্বকো ভীমঃ সর্বজ্ঞো গিরিশো মৃঢ়ঃ।

উগ্রঃ পশুপতিঃ শূলী বামদেবো গণাধিপঃ ॥

ঈশ ঈশ্বর ঈশানঃ কপালী পরমেশ্বরঃ।

শিপিবিষ্টো ব্যোমকেশঃ ত্রিপুরারিস ত্রিলোচনঃ ॥

বৃষভধ্বজঃ ক্রতুঃ(ধ্বংসী ভূতেশশ্ চন্দ্রশেখরঃ[৪২])।

শম্ভুঃ শর্বো ভবঃ স্থানুঃ শূলভৃৎ সোমভৃদ্ ধরঃ।"

*   *   *

এই প্রকারে অন্যান্য শ্লোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু শ্রী, বুদ্ধ, কুবের, কামদেব প্রভৃতি দেবদেবীগণের বিভিন্ন নাম-তালিকা পরিবেশন করা হইয়াছে। এই প্রকার তালিকা আলোচনা করিতে গিয়া অধ্যাপক কার্ণ বলিয়াছেন যে, সংস্কৃতে যবদ্বীপীয় কোষ রচনাকালে যে সমস্ত দেব দেবী প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিলেন কেবলমাত্র তাঁহারাই ইহাতে স্থান পাইয়াছিলেন[৪৩]।

অধ্যাপক ক্রোম ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে এই তালিকাগুলিতে যে সমস্ত দেবতা বা জিনিষের নাম সন্নিবেশিত করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কিছু কিছু নাম এমন থাকিতে পারে যাহা সংস্কৃত হইতে যবদ্বীপীয় গ্রন্থে অনূদিত হইলেও ঐ নামগুলি যবদ্বীপে তখনো অজ্ঞাত ছিল; দ্বিতীয়তঃ এই নামগুলির মধ্যে কিছু কিছু শব্দ হয়তো প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিতে পারে[৪৪]।

এই শ্রেণীর আর একখানি পুস্তিকার একাংশের নাম চণ্ডকিরণ[৪৫]। 'চণ্ডকিরণ' শব্দের অর্থ প্রখর রৌদ্র অথবা বহুব্রীহি সমাস ধরিলে ইহার অর্থ হইবে প্রখর কিরণ যাহার, অর্থাৎ সূর্য। সেই ক্ষেত্রে পুস্তিকার নামের ব্যাখ্যা হইবে যাহা সূর্যের মত (জ্ঞানের) আলো বিতরণ করে। অপর পক্ষে বলা যায় যে ইহা ছন্দকরণ বা চন্দ্র (ব্যা)করণ শব্দের বিকৃতিও হইতে পারে। তাহা হইলে বইয়ের নামের সহিত বক্তব্য বিষয়ের অনেকটা সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। যাহা হউক

এই পুস্তিকার প্রথমাংশে আছে ছন্দাদির আলোচনা, দ্বিতীয়াংশের প্রথম দিকে আছে ভারতীয় শব্দকোষের মত তালিকা। প্রতি শব্দগুলি অবশ্য সংস্কৃত শ্লোকে বিধৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক শব্দের প্রতিশব্দ দেওয়া শেষ হইলে উহা আবার প্রাচীন যবদ্বীপীর ভাষায় পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে, যেমন : অমর, ত্রিদশ গীর্বাণ, বিবুধ, সুর, বৃন্দারক, অদিতিজ, নির্জর, দানবদ্বিট্‌···ঙ্গরন ইঙ্গ্‌ দৈবত ইক কবেঃ অর্থাৎ এই সকল হইল দেবতাদের নাম[৪৬]। এই তালিকাগুলি অনেকটা সংস্কৃত অমরকোষের মত এবং গ্রন্থের মধ্যেও অমরমালা নামটির উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে এই গ্রন্থ রাজা জিতেন্দ্রের আদেশানুযায়ী অনূদিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় কোন অনুশাসনলিপি হইতে আমরা জিতেন্দ্র নামক কোন রাজার নাম জানিতে পারি না। কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা এক একটি শব্দ পাই যাহা ভারতীয় শব্দকোষে নাই। কার্ণ বলিয়াছেন[৪৭] যে হেমচন্দ্রের তালিকার সুধাভুজ স্থলে এখানে আছে সুধাশিন্‌ (দেবতা) অর্থাৎ যাঁহারা সুধা পান করিয়া থাকেন। ইহার পর শিব (ভটার গুরু), উমা, ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাদের নামের প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে ব্রহ্মার নাম যে গদ্যাংশে উল্লিখিত হইয়াছে সেখানে অগ্নিদেবতার নামের তালিকাও অনুপ্রবেশ করিয়াছে ; গ্রন্থকার বা অনুলেখক বলিয়াছেন যে এই সমস্ত নামই ব্রহ্মার নাম। এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণীয় যে যবদ্বীপে অনেক সময় ব্রহ্মার সহিত অগ্নির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। অনুশাসনলিপিগুলিতে ইহার স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, পুঁথির দ্বিতীয়াংশের শব্দ তালিকায় আছে লতা, জীবজন্তু, বিভিন্ন শ্রেণীর লোক, মাস, শরীরের বিভিন্নাংশ, গৃহ, নদী প্রভৃতি এবং উহাদের অর্থ সুবিন্যস্তভাবে পরিবেশন করা হইয়াছে। পুস্তিকায় নানার্থবোধক শব্দের তালিকাও আছে যথা : পাংশু, ক্ষোদ, রেণু, চূর্ণ ইত্যাদি। কার্ণ ও গণ্ডা মনে করেন[৪৮] যে ইহা সংস্কৃত শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিবার জন্য রচিত হয় নাই, রচিত হইয়াছিল প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থের সংস্কৃত শব্দগুলি বুঝিবার জন্য। ডঃ গণ্ডার মতানুযায়ী ইহা মুখ্যতঃ প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিবার পথে যে বাধা ছিল তাহা দূর করিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল[৪৯]। ডঃ ক্রোম[৫০] বলিয়াছেন যে প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার সহিত অপরিচিত হিন্দুর নিকট এইরূপ গ্রন্থের কোন মূল্য ছিল না ; সুতরাং এইরূপ গ্রন্থের অন্য উদ্দেশ্যও বিদ্যমান ছিল।

এইবার আমরা যবদ্বীপের প্রাচীন ছন্দ এবং অলঙ্কার সম্বন্ধে এবং ইহাতে সংস্কৃত প্রভাব কতটা বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহা আলোচনা করিব। ইহা আলোচনার পূর্বে আমরা দুই একটি সাধারণ মন্তব্য করিব। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে যবদ্বীপীয় লেখকগণ সাধারণতঃ সংস্কৃত গ্রন্থকারগণের মতই স্বস্তিবাচন দিয়া রচনার আরম্ভ করিয়াছেন। এই প্রথাটিকে বিশ্বনাথ কবিরাজের ভাষায় প্রকাশ করা যাইতে পারে : "আদৌ নমস্ক্রিয়াশীর্বা বস্তুনির্দেশ এব বা।" সুতরাং যবদ্বীপের অনেক প্রাচীন গ্রন্থের আরম্ভেই আমরা পাই "ওম্‌ অবিঘ্নম্‌ অস্তু" ; ইহার পরই শিব, সরস্বতী, বুদ্ধ, গণেশ বা অন্যান্য দেবদেবীগণকে প্রণাম নিবেদন করা হইয়াছে। লেখকগণ কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন তাহার আভাষ সম্ভবতঃ এইস্থলে পাওয়া যাইতে পারে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ভুবনকোষ এবং ভুবনসংক্ষেপ নামক যবদ্বীপীয় গ্রন্থের প্রারম্ভিক অংশের সহিত রঘুবংশ এবং মুদ্রারাক্ষসের প্রারম্ভিক অংশের তুলনা করিতে পারি। এই প্রথা কেবলমাত্র যে গ্রন্থের প্রথমদিকেই অনুসরণ করা হইয়াছে তাহা নহে, কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা গ্রন্থের শেষাংশেও সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত কৃষ্ণান্তক, শিবশাসন, সঙ্ হ্যঙ্ হয়ু, ব্রতীশাসন প্রভৃতি গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠা খুলিলেই ইহার প্রমাণ মিলিবে। কবিরা কোন কোন সময় তাঁহার নিজের এবং পরিবারের বিবরণ তাঁহাদের রচনায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন; এই বিশেষত্ব প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষ এবং যবদ্বীপ উভয় স্থলেই প্রচলিত ছিল। প্রপঞ্চ রচিত নাগরকৃতাগম, ম্পু কণ্বের অর্জুনবিবাহ, মাঘের শিশুপালবধ, বাণের হর্ষচরিত ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রাচীন যবদ্বীপীয় কবিগণ সংস্কৃত ছন্দ এবং অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া তাহাদের কাব্যের অঙ্গসজ্জা ও প্রসাধনকার্য সংসাধন করিয়াছেন। স্রগ্ধরা, ত্রিষ্টুভ্, রুচিরা, বসন্ততিলক, মন্দাক্রান্তা, শিখরিণী ইত্যাদি ছন্দে যবদ্বীপীয় কাব্য সুসজ্জিত করা হইয়াছে; অনুপ্রাস, যমক, অপহ্নুতি প্রভৃতি অলঙ্কারেও কাকাবিনগুলির ভারতীয় পরিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে। এই বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করিব; এইস্থলে শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে যদিও যবদ্বীপীয় কবিগণ সাধারণতঃ "একবৃত্তময়ৈঃ পদ্যৈঃ[৫১]" এই অনুজ্ঞাটি পালন করিয়াছেন, তাঁহারা "অবসানেঽন্য বৃত্তকৈঃ' এই নিয়মটি সর্বদা পালন করেন নাই। এই নিয়ম দুইটি সংস্কৃত লেখকেরা সাধারণতঃ নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছেন। যবদ্বীপীয় রামায়ণ লেখক এই বিষয়ে যথেষ্ট উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ প্রথম এবং দ্বিতীয় সর্গে আগাগোড়া এক ছন্দ ব্যবহার করিয়া এবং অবসানে অন্য ছন্দ ব্যবহার করিলেও তৃতীয় সর্গের শেষে তিনি বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন। চতুর্থ সর্গে আবার বিভিন্ন ছন্দের লীলা দেখান হইয়াছে, কিন্তু পঞ্চম সর্গে একটি মাত্র ছন্দই আগাগোড়া ব্যবহৃত হইয়াছে। ভট্টিকাব্যে যেমন ব্যাকরণের কসরৎ দেখান হইয়াছে, এই কাব্যের লেখক কি সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ছন্দের কসরৎ দেখাইয়াছেন?

এই কথা বলিবার কারণ যে যোগীশ্বর বিভিন্ন সর্গের শেষে অন্ততঃ ১৯টি বিভিন্ন ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন; কাব্যের অন্যান্য অংশেও ছন্দের যে বাহুল্য ও বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহা অসামান্য। বস্তুতঃ যবদ্বীপীয় রামায়ণে ৮১টি বিভিন্ন ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং শ্লোক সংখ্যার দিক দিয়া বিবেচনা করিলে প্রতি দশটি শ্লোকে একবার করিয়া ছন্দ পরিবর্তন হইয়াছে[৫২]। সুতরাং এই কাব্যে ছন্দ ব্যবহারের যে মুন্সীয়ানা দেখান হইয়াছে তাহা একান্ত আকস্মিক নাও হইতে পারে। বস্তুতঃ হুইকাশ ইহাকে ছন্দশাস্ত্রের পাঠ্যপুস্তক বলিয়া অনুমান করিয়াছেন[৫৩]।

যাহাই হউক ডঃ হুইকাশ কয়েকটি প্রাচীন যবদ্বীপীয় কাব্যের ছন্দ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে যবদ্বীপীয় রামায়ণের ২৬টি সর্গের প্রত্যেকটি সর্গ[৫৪] বিভিন্ন ছন্দে বিরচিত, কিন্তু ভোমকাব্যের ১৮৮টি সর্গ, হরিবংশের ৫৪টি সর্গ, স্মরদহনের ৪০টি সর্গ, অর্জুনবিবাহের ৩৬টি সর্গ, ভারতযুদ্ধের ৫২টি সর্গ এবং নাগরকৃতাগমের ৯৮টি সর্গ এই দিক দিয়া ব্যতিক্রম। কারণ ইহাদের প্রত্যেকটি সর্গ "একবৃত্তময়ৈঃ পদ্যৈঃ" এই অনুজ্ঞা পালন করিয়াছে।

ডঃ হুইকাশ আরো বলিয়াছেন প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণের কোন কোন সর্গের অন্তিমে "অবসানেঽন্যবৃত্তকৈঃ" নিয়মটি প্রতিপালন করা হইয়াছে বটে কিন্তু কোথাও কোথাও সেই ছন্দের শ্লোক সংখ্যার আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। তিনি এই প্রসঙ্গে রামায়ণের চতুর্থ, ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং পঞ্চবিংশ সর্গের উল্লেখ করিয়াছেন[৫৫]। ইহা সম্ভব যে প্রথম যুগের কাব্যগুলিতে আলঙ্কারিকগণের এই নিয়ম যথাসম্ভব প্রতিপালিত হইয়াছিল কিন্তু কালক্রমে ইহাতে অনেকটা স্বাধীনতা অবলম্বিত হয়; অবশেষে ইহা যথেচ্ছাচারে পরিণত হয়। কারণ সর্গের অবসানে একছন্দ ব্যবহার না করিয়া বহুছন্দের প্রচলন কালক্রমে দেখা দিল। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, কিরাতার্জুন, শিশুপালবধ প্রভৃতি কাব্যে ইহার বহু দৃষ্টান্ত মিলিবে[৫৬]। এই সমস্ত কাব্যের মধ্যে শ্রীহর্ষের নৈষধীয় অনেকটা আলঙ্কারিকের নির্দেশ মানিয়া চলিয়াছেন; কারণ তাহার প্রত্যেকটি সর্গের অন্তিমে আমরা শার্দূল বিক্রীড়িত ছন্দের বিন্যাস দেখিতেছি।

যবদ্বীপের একখানি বিখ্যাত ছন্দশাস্ত্রের নাম বৃত্তসঞ্চয়। এই গ্রন্থখানি ডঃ ফ্রিড্‌রিখ একশত বৎসরের অধিককাল পূর্বে সম্পাদনা করিয়াছিলেন[৫৭]। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন যে এই গ্রন্থটির উৎসভূমি ভারতবর্ষ এবং ছন্দের নিয়মগুলি স্মরণে রাখিবার জন্য ইহা সূত্র হিসাবে রচিত হইয়াছে, যেমন আমরা পাণিনির ব্যাকরণে দেখিতে পাই। লেখক চতুর্থ শ্লোকে রামশর্মন এবং সপ্তম ও ১০৯ সংখ্যক শ্লোকে পিঙ্গল এবং পিঙ্গলশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। পিঙ্গলশাস্ত্রের নামটি দেখিয়া ভারতবর্ষের পিঙ্গলছন্দঃসূত্রের কথা স্বভাবতই মনে পড়িবে। এই পিঙ্গলকোষ গ্রন্থখানি মুনি পিঙ্গলের রচিত ছিল বলিয়া প্রবাদ এবং ইহাকে ভিত্তি করিয়াই কবি তানাকুঙ্গ এই বৃত্তসঞ্চয় গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে পিঙ্গলমুনি একটি নাগের ছদ্মবেশে উপদেশাবলী বিতরণ করিতেন। পিঙ্গলকোষ এবং পিঙ্গলছন্দঃসূত্রের নাম দুইটি প্রায় একই রকমের হওয়ায় ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে গ্রন্থ দুইটি সম্ভবতঃ অভিন্ন, কিন্তু অধ্যাপক কার্ণ বৃত্তসঞ্চয়, সংস্কৃত পিঙ্গলছন্দঃসূত্র এবং কেদারের বৃত্তরত্নাকরের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহারা সগোত্র বা সমগোত্র নহে[৫৮]। এই দিক হইতে আলোচনা আপাততঃ বিশেষ ফলপ্রসূ না হইলেও একথা সম্ভবতঃ বলা যাইতে পারে যে সংস্কৃত ছন্দের গভীরতম আলোচনা করিতে হইলে ইহার যবদ্বীপীয় রূপের পরিচয় জানাও প্রয়োজন। আমরা হয়তো আশা করিতে পারি যে বৃত্তসঞ্চয় যে গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছিল সেই পিঙ্গলকোষটি একদিন ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইবে[৫৯]। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণীয়। বৃত্তসঞ্চয়ে কেবলমাত্র 'বৃত্ত' লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে; ইহাতে মাত্রাছন্দ এবং গণছন্দের আলোচনা করা হয় নাই।

বৃত্তসঞ্চয়ের যে স্থলে থিয়োরী বা সূত্র পরিবেশন করা হইয়াছে সে-স্থলে গ্রন্থকার বিভিন্ন শ্রেণীর ছন্দের নাম পরিবেশন করিয়াছেন। এই ছন্দগুলির শ্লোকাংশ ৪×১ চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া ৪×২৭ চরণ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। কেবলমাত্র থিয়োরীগুলি ৩-৮ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে; দৃষ্টান্ত বা মডেল-শ্লোকগুলি ৯ হইতে ১০৮ পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছে। এই ১০০টি শ্লোকের মধ্যে ১০৪, ১০৫, ১০৬ এবং ১০৭ নম্বরের শ্লোক কয়টি গ্রন্থের প্রথমদিকে যে ছন্দ

আলোচিত হইয়াছিল তাহারই দৃষ্টান্ত হওয়ায় আমরা এখানে ৯৬টি খাঁটি ভারতীয় ছন্দ পাইতেছি। গ্রন্থকার দণ্ডকেরও আলোচনা করিয়াছেন ; ইহা অর্ধেক গদ্য এবং অর্ধেক পদ্যের মত বলিয়া মনে হয়। সুতরাং যদিও দণ্ডকের শেষাংশ ছান্দসিক, তবু দণ্ডক-রচনা কানে শুনিতে গদ্যের মতই অনুভূত হয়।

এই গ্রন্থে একটি যবদ্বীপীয় কবি-ছন্দও সংযোজিত হইয়াছে, যদিও ইহার কোন নামকরণ করা হয় নাই। ডঃ গণ্ডা ৮, ১০৯ এবং ১১১ সংখ্যক শ্লোকের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে এই ছন্দ একপ্রকার বিকৃতি এবং ইহা প্রাচীন যবদ্বীপীয় কাকাবিনে অনেক সময় দৃষ্টিগোচর হয়। সম্ভবতঃ গ্রন্থকার দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে ভারতীয় ছন্দগুলি কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া কিংবা বিভিন্নরূপে সংযোজন করিয়া নূতন নূতন ছন্দের উদ্ভব করা যাইতে পারে[৬০]। বৃত্তসঞ্চয়ের ৯৬টি ভারতীয় ছন্দের স্থলে ৫১০৯ (২) সংখ্যক পুথিতে[৬১] আমরা মাত্র ৮৫টি ছন্দের পরিচয় পাই। ডঃ য়ুইনবল বলিয়াছেন যে চণ্টকপর্বের[৬২] ছন্দগুলিও তানাকুঙ্গের বৃত্তসঞ্চয় হইতে অনেকটা বিভিন্ন। মধ্যযুগের কিডুঙ্গ শ্রেণীর যবদ্বীপীয় কাব্যে আমরা আবার নূতন শ্রেণীর ছন্দের সহিত পরিচয় লাভ করি, যেমন—মচপৎ-ছন্দ, তেনগহ্ণ-ছন্দ ইত্যাদি।

এই গ্রন্থেই লিখিত হইয়াছে যে ইহার লেখক স্পু তানাকুঙ্গ। যদিও কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন যে কবির দ্বিতীয় নাম ছিল চক্রবাক, তবুও এই সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসা দুঃসাধ্য। কারণ গ্রন্থের অন্তে কবি যে স্থলে চক্রবাক শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার অর্থ এবং উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট নহে। ঐস্থলে লেখা আছে :

"ইতি বৃত্তসঞ্চয় ॥ চক্রবাক দূতচারিত ॥ তানাকুঙ্গ ॥"

সংশ্লিষ্ট অংশের আক্ষরিক অনুবাদ হইবে 'চক্রবাক-দূতের ইতিহাস।' শব্দ কয়টি কালিদাসের বিখ্যাত মেঘদূত এবং ধোয়ীর পবনদূতের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেও এই প্রকারের নাম এইস্থলে পরিবেশন করিবার সার্থকতা কি তাহা বোধগম্য নহে। এই কাকাবিনের রচনাকাল প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়নের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং ইহার বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা যাইতেছে। ডঃ গণ্ডা মনে করেন যে এই গ্রন্থের রচনাকাল আনুমানিক ১২০০ খৃষ্টাব্দ[৬৩]।

বৃত্তসঞ্চয় ব্যতীত ছন্দের অন্যান্য গ্রন্থও প্রাচীন যবদ্বীপে রচিত হইয়াছিল। এইরূপ একখানি গ্রন্থের নাম বৃত্তায়ন। দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থখানি আজিও সম্পাদিত হয় নাই এবং ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনাও হয় নাই। এই গ্রন্থে বৃষভ গতি বিলসিত, মণিগুণনিকর এবং অন্যান্য ছন্দ আলোচিত হইয়াছে[৬৪]। পূর্বে আমরা চণ্ডকিরণ গ্রন্থের আলোচনা করিয়াছি, উহাতেও ছন্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আছে।

ছন্দ সংক্রান্ত এই সমস্ত গ্রন্থ ভারতীয় ছন্দের কাহিনী বা বিবরণীতেই পর্যবসিত হয় নাই ; পরন্তু উহা যবদ্বীপীয় প্রাচীন কাব্যরচনায় উদারভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। উপরে ছন্দ সম্বন্ধে আমরা যে প্রাথমিক আলোচনা করিয়াছি তাহাতেও সম্ভবতঃ উহা পরিস্ফুট হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রাচীন যবদ্বীপীয় কাব্যগুলির হস্তলিখিত পুঁথি পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেক

সর্গের শিরোনামে সেই সর্গের ছন্দের নামও পরিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক পাদের মাত্রা হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে যবদ্বীপীয় কবিগণ ভারতীয় ছন্দের বিশেষত্ব সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত না করায় উহাতে স্থলে স্থলে ভুলও করিয়াছেন; অবশ্য এমনও হওয়া সম্ভবপর যে প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় লোকের জ্ঞান সীমাবদ্ধ হওয়ায় অনুলেখকগণ স্থলে স্থলে না বুঝিয়া ভুল করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা ছন্দের নামও লিখিতে ভুল করিয়াছেন, যেমন প্রবর ললিতের স্থলে প্রবির ললিত, শিখরিণী স্থলে সিকরিন ইত্যাদি[৬৫]। কোন কোন পুঁথিতে জাভায় রচিত ছন্দের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে অর্জুনবিবাহ কাকাবিনের দ্বিতীয় সর্গ সংস্কৃত বিকৃতি ছন্দে বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু যবদ্বীপের ঐ গ্রন্থের একটি পুঁথিতে উহার নাম দেওয়া হইয়াছে বেগঙ্গ স্থলঞ্জরি। তবে এই প্রকার ঐতিহ্যের বাস্তবভিত্তি কতদূর তাহা বলা দুঃসাধ্য[৬৬]।

এইবার আমরা প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণের ষষ্ঠ সর্গ যদি ছন্দের দিক দিয়া বিশ্লেষণ করি তাহা হইলে এই কথার যথার্থতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিব। এই সর্গের প্রথম ১৮টি শ্লোক উপেন্দ্র বজ্রাতে রচিত হইয়াছে; ১৯-২৬ শ্লোক শার্দুল ছন্দে; ২৭ ঔপচ্ছন্দসিকে; ২৮-৬৩ মালিনীতে; ৬৪-১১৩ অনুষ্টুভে; ১১৪-১৪১ চন্দ্রাবর্তাতে; ১৪২-১৫৯ বসন্ততিলকে; ১৬০-১৭১ শিখরিণীতে; ১৭২-১৯৫ উপজাতিতে; ১৯৬ ইন্দ্রবজ্রাতে; ১৯৮ উপেন্দ্র বজ্রাতে; ১৯৯-২০০ একপ্রকারের ধৃতিতে; ২০১-৩ মত্তমায়ূরে রচিত হইয়াছে। কিন্তু নাগরকৃতাগম নামক ঐতিহাসিক কাব্যটি এই দিক দিয়া একবৃত্তময়। উহার ৪৪ সর্গের ছন্দ হইতেছে সুবদনা, ৪৫ সর্গের ছন্দ কৃতি; ৪৬ সর্গের ছন্দ শার্দূলবিক্রীড়িত; ৪৭ সর্গের ছন্দ বসন্ততিলক ইত্যাদি। আমরা এস্থলে যবদ্বীপীয় কাব্যসাহিত্য হইতে যথেচ্ছভাবে ছন্দের দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়াছি; ইহার দৃষ্টান্ত যথেচ্ছভাবে বৃদ্ধি করা আদৌ কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে। প্রাচীন যবদ্বীপীয় কাব্যে একটি সংস্কৃত ছন্দ কিরূপে সংযোজিত হইয়াছে এইবার তাহার বিশ্লেষণ করা যাউক। আমরা এইস্থলে ভুজঙ্গপ্রয়াতের একটি দৃষ্টান্ত লইব; উহার সূত্রটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, যথা:

"ভুজঙ্গপ্রয়াতম্ চতুর্ভির্যকারৈঃ।" ছন্দের মাত্রা এইরূপ:

⏑ – – ⏑ – – ⏑ – –

শ্লোকের চরণগুলি এই:

য য	য য
অনেঙ্গ্ নেরিঁতী প্	সকেঙ্গ পর্বতা গোঙ্গ্

য য	য য
গুহুঙ্গ মাস্ অরুন্ধা	ঙরন্ধা সুতেজ

য য	য য
য তা চঙ্ক্রম শ্রী	মহানীল কণ্ঠা

য য	য য
করিঙ্গ মুঞ্চবান্ মাস্	পুচক্র্যাতি শোভ[৬৭]

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতিভাত হইবে যে যবদ্বীপের গ্রন্থকারগণ ছন্দশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং তাহারা যথেষ্ট মুন্সীয়ানার সহিত বিভিন্ন ভারতীয় ছন্দ তাহাদের কাব্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। অলঙ্কারশাস্ত্রেও যে তাঁহাদের অসামান্য দক্ষতা ছিল তাহাও যবদ্বীপীয় কাব্যগুলি গভীরভাবে অনুশীলন করিলে সুপরিস্ফুট হইবে। বস্তুতঃ অনেক ক্ষেত্রে কবিগণ উপযুক্ত শব্দচয়ন দ্বারা কল্পনায় এক বিশেষ ভাবমণ্ডল পরিগঠিত করিবার চেষ্টা করিতেন[৬৮]। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই যবদ্বীপীয় কবিগণ অনুপ্রাস, যমক, অপহ্নুতি, উপমা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কার বিশেষ কুশলতা সহকারে কাব্যে প্রয়োগ করিয়া উহার সৌন্দর্য বর্ধিত করিয়াছেন। অনুপ্রাস সম্বন্ধে দণ্ডী বলিয়াছেন :

> "বর্ণাবৃত্তিরনুপ্রাসঃ পাদেষু চ পদেষু চ
> পূর্বানুভবসংস্কারবোধিনী যদ্যদূরতা।"[৬৯]

একই বা অনুরূপ অক্ষরের পুনরাবৃত্তি সংস্কৃত অনুপ্রাসের বিশেষ লক্ষণ ; ইহার দৃষ্টান্ত যবদ্বীপীয় কাব্যেও দুর্লভ নহে। তুলনার জন্য বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্য দর্পণ[৭০] হইতে ছেকানুপ্রাসের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতেছে :

> "উন্মীলন্ মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যাধূত চূতাঙ্কুর ক্রীড়ৎ
> কোকিল-কাকলী-কল-কলৈরুদ্গীর্ণ কর্ণজ্বরাঃ —"

এই শ্রেণীর অনুপ্রাস প্রাচীন ইংরাজী এবং অন্যান্য টিউটনিক ভাষায় পদ্যরচনার শৈলীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। যদিও সংস্কৃত এবং যবদ্বীপীয় অনুপ্রাসের নিয়মাবলী ইংরাজী অ্যালিটারেশনের (alliteration) সহিত সর্বথা সমগোত্রীয় নহে, তবুও সাধারণভাবে উহাদিগকে একই পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পূর্বোদ্ধৃত চরণে 'ধ' এবং 'ক' সংস্কৃত অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত। যবদ্বীপের কথাসাহিত্যের লেখকগণও এই প্রকার অলঙ্কারের প্রচুর প্রয়োগ করিয়াছেন। যবদ্বীপীয় রামায়ণের লেখক যোগীশ্বর লিখিয়াছেন :

> "বিক শুচি সুদ্ধ সৈব শির সাত্বিকসান্ত" ইত্যাদি[৭১]

ইহাতে বিভিন্ন স-এর প্রয়োগে সংস্কৃত অনুপ্রাস মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। উপরোক্ত দৃষ্টান্ত খেয়াল-খুশীভাবে আহরণ করা হইয়াছে ; পরবর্তী দৃষ্টান্তটিও তাহাই। ম্পু ধর্মজ রচিত স্মরদহন কাব্যে আমরা একস্থলে পড়িতেছি :

> "অক্রাক্ তন্ কতহেন্ তজিস্নির তুমোন্ তুন্বন্
> স্মরাবেহ্ সেকেল"[৭২]

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে (১৩৬৫ খৃষ্টাব্দ) প্রপঞ্চ রচিত নাগরকৃতাগম কাব্য হইতে একটি সুন্দর অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত নিম্নে পরিবেশন করা যাইতেছে। উহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে এইপ্রকার অলঙ্কার তখনো যবদ্বীপে সুপ্রচলিত ছিল। প্রপঞ্চ লিখিয়াছেন :

"প্রপঞ্চ প্রচচঃ পঞ্চ, প্রচচদ্ পোচপন্ চেচেদ্
প্রপোঙ্গ্ পোঙ্গ্ পিপি পুচ্ছে প্রেম্ প্রচোঙ্গ্ চোঙ্গ্
চেৎ পচেহ্ পচেহ্
তন্ ততভীত তন্ তুতেন্, তন্ তেতেস্ তন্ তুৎ
ইঙ্গ্ তুতুর্
তিতিক্ তন্ত্রী ততেঙ্গ্ তন্ত্ব, তুহুন্ তাম্ তাম্ তিতির্
ত্তিতিঃ"

অনুপ্রাস রচনায় সিদ্ধহস্ত বলিয়া কথিত সেকালের মদগর্বী ঘটকর্পর এই শ্লোকটি পড়িলে নিশ্চয় হৃতগর্ব হইতেন। প্রথম দৃষ্টান্তের 'স', দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'ত' এবং তৃতীয় দৃষ্টান্তের 'প' ও 'ত'-এর প্রয়োগ মনোহারী। প্রপঞ্চের দৃষ্টান্তটি অবিস্মরণীয়[৭৩]। এইবার আমরা যবদ্বীপের কাব্যসাহিত্য হইতে সংস্কৃত যমকের দৃষ্টান্ত পরিবেশন করিব। যমক কাহাকে বলে? কাব্যাদর্শে লেখক নিম্নলিখিতরূপে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

"অব্যাপেতব্যপেতাত্মা ব্যাবৃত্তির্বর্ণসমূহতেঃ
যমকম্ তচ্চ[৭৪] পাদানাম্ আদিমধ্যান্তগোচরম্"[৭৫]

যখন কতকগুলি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ একত্র হইয়া একই রূপে পুনঃপ্রকাশিত হয়, কিন্তু শব্দ-যুগলের অর্থ পরিবর্তিত হইয়া যায়, তখন উহাকে 'যমক' অর্থাৎ যুগ্ম আখ্যা দেওয়া হয়। যমক-গুলি চরণের আদিতে, মধ্যে বা অন্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে সাহিত্য দর্পণের বিখ্যাত দৃষ্টান্তটির কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। প্রারম্ভে আছে "নব পলাশ-পলাশবনম্ পুরঃ" ইত্যাদি[৭৬]। অঙ্গসজ্জার দিক দিয়া সম্ভবতঃ ম্পু ধর্মজের যমক-রচনাটি অনবদ্য, কারণ ইহাতে দণ্ডীর বিভিন্ন নির্দেশ একই শ্লোকে সংকলিত হইয়াছে :

"রেম্বঙ্গ্-রেম্বঙ্গ্ অপন্তরন কলিহিবেন্
পাঙ্গ পুঙ্গ পকিস্ পঙ্গগ। রেম্বৎ
নম্পু কজর-কজর কমুমু লেন
সুঙ্গ্-সুঙ্গ্ গুয়ুন্যানঙ্গিস্। ক্বানে দূন্য
সবঃ কপঙ্গিহ্ অলঙ্গো স্বঃ গুঙ্গ্ গুঙ্গ্
অকৃবেহ পকিস্। সর্বেচ্ছাবিকুটক্ তলুক্তক্
অকিটুক্ স্তোক্ স্তোক্ ধ্বনিন্যাঙ্গেতেক্"[৭৭]

বাহির হইতে দেখিলে মনে হইবে যে এই চরণগুলিতে আমরা যবদ্বীপীয় যমক ব্যবহারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি। রেম্বঙ্গ্, কজর, সুঙ্গ্, গুঙ্গ্ এবং স্তোক শব্দযুগলের বিভিন্ন স্থলে ব্যবহারে দণ্ডীর সংজ্ঞার কথাই মনে পড়িবে, কিন্তু ইহা সংস্কৃত যমকের খাঁটি

নিদর্শন নহে। উপরোক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের প্রথমার্ধে সংস্কৃত অনুপ্রাসের লক্ষণও সুস্পষ্ট-রূপে বিদ্যমান। যমকের আর একটি প্রকারভেদ হইল সন্দষ্ট-যমক। ইহাতে পূর্ববর্তী চরণের শেষাংশ লইয়া পরবর্তী চরণের আরম্ভ হইয়াছে। সংস্কৃত আলঙ্কারিক দণ্ডী ইহার একটি চমৎকার নিদর্শন উপস্থাপিত করিয়াছেন :

"উপোঢ়রাগাপ্যবলা মদেন সা
মদেনসা মন্যুরসেন যোজিতা
ন যোজিতাত্মানম্ অনঙ্গতাপিতাম্
গতাপি তাপায় মমাস নেয়তে।"

উপরোক্ত দৃষ্টান্তের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ চরণের 'মদেন সা', 'ন যোজিতা' এবং 'গতাপি তা' পূর্ববর্তী চরণের শেষাংশ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহা বিস্ময়কর যে এই প্রকার যমকও যোগীশ্বরের অপরিজ্ঞাত ছিল না। যোগীশ্বর প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণের একটি শ্লোকে এই অলঙ্কারটি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রয়োগ করিয়াছেন। অলঙ্কারের দিক দিয়া এই শ্লোকটিতে ভট্টিকাব্যের ছাপ পড়িয়া গেলেও অনুবাদটিতে যে যোগীশ্বর সেই প্রভাব ধরিয়া রাখিবেন ইহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। সংস্কৃত শ্লোকটি এই :

"ন তজ্জলম্ যন্ন সুচারুপঙ্কজম্।
ন পঙ্কজম্ তদ্ যদ্ অলীনষট্পদম্
ন ষট্পদো'সৌ ন জুগুঞ্জ যঃ কলম্
ন গুঞ্জিতম্ তন্ন জহার যন্ মনঃ"[৭৮]

যমকের এই সুন্দর সংস্কৃত দৃষ্টান্তটি যবদ্বীপীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে গিয়া যোগীশ্বর অনুবাদেও যমক-অলঙ্কারের সুন্দর প্রয়োগ করিয়াছেন। নিম্নে উহা প্রদত্ত হইল।

"সক্বেহ্ নিকঙ্ তলগ তন্ হন তন্প তুঞ্জঙ্ ;
তুঞ্জঙ্ন্য তন্ হন কুরঙ্ পড় মেসি কুম্বঙ্ ;
কুম্বঙ্ন্য কপ্ব মুনি তন্ হন তন্প সব্দ ;
সব্দন্য কর্ণসুক তন্ হন তন্ মনোজ্ঞ"[৭৯]

উপরে সংস্কৃত সাহিত্য হইতে যে শ্লোক উৎকলিত হইয়াছে তাহার সহিত এই যবদ্বীপীয় শ্লোকটির তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে যবদ্বীপীয় কবিও এই প্রকার যমক রচনায় কম কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন নাই। কখনো কখনো ভারতীয় ও যবদ্বীপীয় কবি শ্লোকের মধ্যে পূর্বগামী শব্দের শেষাংশ দিয়া পরবর্তী শব্দের পূর্বাংশ রচনা করিয়া স্থলে স্থলে অপূর্ব শব্দের ঝঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার একটি তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। গীতগোবিন্দের এক জায়গায় (১/৩) আমরা পড়িতেছি "মৃগমদ-সৌরভ-রভস-বশংবদ-নব-দলমাল-তমালে।" ইহার সহিত আমরা সহজেই নাগরকৃতাগমের একটি চরণাংশ তুলনা করিতে পারি, যথা : "তম সন্সর রিঙ্ গত্যা-ত্যাগ রিঙ্গ রস সন্মত।" এই চরণের আর একটি বিশেষত্ব এই যে ইহার প্রথম 'ত্যা' হইতে বামদিকে পড়িয়া গেলেই ডানদিকের শব্দগুলি প্রায় সম্পূর্ণই পাওয়া যাইবে।

যবদ্বীপীয় লেখকগণ সংস্কৃত অলঙ্কার-সমুদ্র মরালের মত স্বচ্ছন্দ গতিতে অতিক্রম করিয়াছেন; এমন কি অপহ্নুতির মত কঠিন অলঙ্কারও তাঁহারা সার্থকভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। অপহ্নুতির সংজ্ঞা দিতে গিয়া বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন :

"গোপনীয়ম্ কমপ্যর্থম্ দ্যোতয়িত্বা কথঞ্চন
যদি শ্লেষেণান্যথাবাহ্‌ন্যথয়েৎ সাপ্যপহ্নুতিঃ।"[৮০]

কোন গোপন বিষয় প্রকাশ করিয়া যদি উহার অর্থ অন্যরূপে করা হয়—Paronomasia দ্বারাই হউক বা অন্য প্রকারেই হউক, তাহা হইলে উহাকে অপহ্নুতি বা সঙ্গোপন করা বলে। বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণ[৮১] হইতেই ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে :

"কালে বারিপারাণাম্ অপতিতয়া নৈব শত্যকে স্থাতুম্
উৎকণ্ঠিতাসি তরলে! নহি নহি সখি! পিচ্ছিলঃ পন্থাঃ"

ইহার এইরূপে অর্থ করা যায় : "বর্ষাকালে পতিবিহীন অবস্থায় থাকা অসম্ভব (অথবা পতিত না হইয়া থাকা অসম্ভব। অপতিতয়া শব্দ দ্বারা এই দুই প্রকার ভাবই প্রকাশ করা যাইতে পারে)। "চপলা বালিকা, তুমি কি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" "না, না, প্রিয় সখি, পথটি পিচ্ছিল।" চমৎকার দৃষ্টান্ত! এখানে অপতিতয়া শব্দটি এমন কৃতিত্বের সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে যে উভয় প্রকার অর্থই সহজভাবে প্রকাশিত হইতে পারে। নিম্নে যোগীশ্বরের রামায়ণ হইতে অপহ্নুতির একটি যবদ্বীপীয় দৃষ্টান্ত পরিবেশন করা যাইতেছে :

"শব্দ নিঙ্ ভ্রমর মত্ত য অপুয
যক্ রেঙ্গো য মহুয়ঙ্গ হতি মপনস্
তুল্য পর্বত সে ড়েঙ্গ মতুন্‌ মুরুব।"[৮২]

ডঃ গণ্ডা সংস্কৃত শ্লেষ প্রয়োগের সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়াছেন[৮৩]। এই অলঙ্কারের শব্দগুলিকে এমনভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে যে উহাতে দ্বৈত অর্থ অথবা বিপরীত ভাব প্রকাশ পাইতে পারে। এই প্রকার শ্লেষের প্রয়োগ যবদ্বীপীয় কাব্যে বিরল নহে। প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় যে জটিলতা আছে তাহার সহিত আবার এই প্রকার সমস্যা জড়িত হইয়া স্থলে স্থলে দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে, কারণ কবি যে কি বলিতে চাহিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট সর্বদা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। আলোচ্য শ্লেষের দৃষ্টান্তটি হরিবংশ ২।১০ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। এই স্থলে উচ্চ একটি দরবার কক্ষকে একটি দীর্ঘ উপমা দিয়া অগ্নি-পর্বতের সহিত তুলনা করা হইয়াছে : ইহার ছাদ হইল স্বর্ণ নির্মিত এবং গৃহ নির্মাণের প্রস্তর-গুলি হইল মণিমুক্তা; কবি বলিয়াছেন যে পবনের রাজ্যে মেঘগুলি হইল বিশ্রামের আস্তানা। প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় 'ঘন' (মেঘ) এবং 'গণ' (জনতা) শব্দ একই রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং হরিবংশের "রস্তন-রস্তনন্ ইঙ্ ঘনাজজর অনিঙ্গিলিস ই নগর নিঙ্ সমীরণ" বাক্যাংশটির ঘনাজজর শব্দটিকে মেঘার্থে বুঝিলে 'মেঘের আস্তানা' বুঝাইবে এবং জনতা অর্থ বুঝাইলে 'জনতার আস্তানা' বুঝাইবে। এই প্রসঙ্গে ডঃ গণ্ডা অশোক (বৃক্ষ) এবং অ-শোক (শোকহীন) শব্দটির উল্লেখ করিয়াছেন।

এই স্থল পর্যন্ত আমরা যবদ্বীপীয় সাহিত্যে সংস্কৃত অলঙ্কারের প্রভাব সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারি, কিন্তু উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি বিষয়ে সেরূপ করা সম্ভবপর নয়। কারণ মানুষের কল্পনার স্বাভাবিক ধর্মই হইতেছে একই প্রকার জিনিসের মধ্যে তুলনা করা। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করিব। ইংরেজ কবি শেলি যখন লিখিলেন, "Make me thy lyre even as the forest is" ('Ode to the west wind'), তখন আমরা স্বাভাবিক ভাবেই উপলব্ধি করিতে পারি যে এই তুলনাটি কবির কল্পনায় সৃষ্টি হইয়াছিল। যবদ্বীপীয় কবিগণও কখনো কখনো বাঁশ ঝাড়কে বাঁশরীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন; কারণ যখন ঝোড়ো হাওয়া বাঁশবনের ভিতর দিয়া উন্মত্ত বেগে ছুটিয়া চলে তখন বাঁশের বনে বাঁশরীর ধ্বনি ফুকারিয়া উঠে। কালিদাসও[৮৪] তাই লিখিয়াছেন :

"যঃ পূরয়ন্ কীচকরন্ধ্রভাগান্
দরীমুখোত্থেন সমীরণেন।
উদ্‌গাস্যতামিচ্ছতি কিন্নরাণাম্
তানপ্রদায়িত্বমিবোপগন্তুম্ ॥"

ইহার সারমর্ম এই হইল যে পর্বত গহ্বর হইতে সমুত্থিত সমীরণ বাঁশগাছের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া মর্মরধ্বনি তুলিতেছে; ইহা হইতে মনে হইতেছে যে হিমালয় পর্বত যেন কলকণ্ঠা কিন্নরীগণের সঙ্গে তালে তালে বাঁশী বাজাইতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতায় এই ভাবটি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন :

"আজি রোদের প্রখর তাপে
বাঁধের জলে আলো কাঁপে
বাতাস বাজে মর্মরিয়া
সারি বাঁধা তালের বনে।"[৮৫]

বর্ষামঙ্গলের কবিতায়ও অনুরূপ ভাবপ্রকাশ ঘটিয়াছে :

"তুলিছে পবনে শন্‌শন্ বনবীথিকা
গীতময় তরুলতিকা।"[৮৬]

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের কবিগণ পবনবিক্ষুব্ধ তরুর সহিত বীণা বা বাঁশরীর তুলনা করিয়াছেন। আধুনিক যুগের কবি রবীন্দ্রনাথের কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্যান্য কবিগণ নিশ্চয়ই পরস্পরের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না; সুতরাং একজন আর একজনকে প্রভাবিত করিয়াছেন এ প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এই দিক হইতে বিচার করিলে সংস্কৃত ও যবদ্বীপীয় সাহিত্যের উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উৎকলিত করিয়া খুব বেশী লাভ হইবে না। তথাপি আমরা এই কথা স্মরণে রাখিতে পারি যে যবদ্বীপীয় গ্রন্থকারগণ যখন সংস্কৃত ছন্দ এত ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তখন তাহারা যে অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে আদৌ কিছু পরিগ্রহণ করিবেন না তাহা কল্পনা করা অস্বাভাবিক! এই কথা কয়টি মনে রাখিয়া আমাদিগকে যবদ্বীপীয় অলঙ্কারের অন্যান্য দিক আলোচনা করিতে হইবে।

প্রথমেই আমরা উপমা (simile) এবং রূপক (metaphor) লইয়া আলোচনা করিব। ভারতযুদ্ধের বিখ্যাত কবি শ্পু সেড়হ্ ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন :

"উরুক বর্ণনি বন্দিরণিয় কদি সোক
মকেমোলি পিঙ্গল লিঙ্ প্রিঅ"

অর্থাৎ বেদনাবিধুরা স্ত্রী স্বামীর বিরহ ভোগ করিলে যেইরূপ হন, ডম্বুর-বৃক্ষটিকেও সেইরূপ বিষণ্ণ দেখাইতেছে। নাগরকৃতাগমে আমরা পড়িতেছি (৩৭।৫) :

"হির স্ত্যগ্রিঙ্ অঙ্‌রনেহি রাগি মোল্ম্ ইকনঙ্
চবিস্তেন্ অব্‌নেস।"

অর্থাৎ অসুস্থ, অবসন্ন, বিরহবিধুর ক্ষীয়মান নারীর মত ম্রিয়মান চবরিবৃক্ষকে দেখাইতেছিল।

ইহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে এরূপ অজস্র রচনা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যাইতে পারে। কালিদাস ঋতুসংহারে হেমন্ত ঋতুর বর্ণনায় বলিয়াছেন :

"প্রিয়ে! প্রিয়ঙ্গুঃ প্রিয়বিপ্রযুক্তা বিপাণ্ডুতাং যাতি বিলাসিনীব।" (১০)

প্রিয়ে! প্রিয়ঙ্গুলতিকা প্রিয়বিরহিণী বিলাসিনীর ন্যায় দুঃখের মূর্তি পরিগ্রহণ করিতেছে।

উপরোক্ত চরণগুলির মর্মবাণী রঘুবংশ[৮৭], রত্নাবলী[৮৮], মেঘদূত[৮৯] প্রভৃতি গ্রন্থের স্থলে স্থলে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। কেবল বিরহের বর্ণনাতে নহে, রমণীদের দেহকান্তি বর্ণনাতেও ভারতীয় ও যবদ্বীপীয় লেখকগণের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। নারীগণের ভ্রু-বর্ণনা করিতে গিয়া যোগীশ্বর বলিয়াছেন,

"তোমার সুন্দর ভ্রূগুলি তোমার ধনুকতুল্য।
তোমার আঁখির পক্ষ্মগুলি শায়কের পালক[৯০]।

কালিদাসকে সাধারণতঃ শৃঙ্গারতিলকের লেখক বলিয়া গণ্য করা হয়। উহাতে আমরা পড়িতেছি[৯১] :

"ইয়ং ব্যাধায়তে বালা, ভ্রূরস্যাঃ কার্মুকায়তে।
কটাক্ষাশ্চ শরায়ন্তে, মনো মে হরিণায়তে।"

অর্থাৎ এই বালিকা ব্যাধের তুল্য, ইহার ভ্রূদ্বয় কার্মুকের মত, কটাক্ষ শরের মত, আমার মনটাও হরিণের মত হইল!

অনুরূপভাবে যোগীশ্বরের রামায়ণে[৯২] শিশিরবিন্দুকে অশ্রুধারার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহা ভট্টিকাব্যের 'নিশাতুষারৈর্ণয়নাম্বু কল্পৈঃ'-র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যোগীশ্বর ভট্টিকাব্যের সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া এই তুলনা আরো গভীর অর্থব্যঞ্জক। যোগীশ্বরের রামায়ণে রাজাকে কল্পবৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে[৯৩]; তন্তু পঙ্গেলরণ গ্রন্থেও কুমারের মাতাকে এই সম্ভাষণে সম্মানিত করা হইয়াছে[৯৪]। এতদ্ব্যতীত, যবদ্বীপীয় এবং সংস্কৃত সাহিত্য হইতে অজস্র দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়া দেখান যাইতে পারে কিরূপে সুন্দরী নারীগণকে কমলের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। তাহাদের আঁখিকে তুলনা করা হইয়াছে হরিণীর আঁখির সহিত, তাঁহাদের সুন্দরাননকে চন্দ্রের সহিত এবং বাহুকে লতার সহিত তুলনা

করা হইয়াছে। প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণের দ্বাদশ সর্গের ৪৬ শ্লোকে আমরা পড়িতেছি :

"এখন রমণীগণ মুখমণ্ডল ধৌত করিলেন এবং সুসজ্জিত হইলেন ; রাজধানী লঙ্কা হইল একটি বিরাট হ্রদের মত, রমণীগণের বদন হইল কমলতুল্য। তাহাদের দ্রুত কটাক্ষের চাহনি হইল গুঞ্জরমান প্রেমাস্পদ ভ্রমরের তুল্য।"

এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ভারতযুদ্ধ নামক কাব্য হইতে সংশয়োপমারও একটি দৃষ্টান্ত আমরা সঙ্কলিত করিয়া দিতেছি :

"এন্দহ্ ঋির্ মহুরূপ্ লঙ্গো গগন লেন্ ভূমী,
সেড়েঙ্গ্ নিঙ্গ্ কুলেম
কয়্বন্ ষাঙ্গ্দদি মেঘ মেঘ মতেমঃ কয়বন
হিড়েপ্ নিঙ্গ্ মঙ্গো
বিন্তঙ্গ্ কেম্বঙ্গ্ কেম্বঙ্গ্ অঙ্গ্‌ভ্রঃ অতেমঃ বিন্তঙ্গ্
হনেঙ্গ্ অম্বর
লুয়াহ্ন্যাদত্মন্ উরুৎ মহাঙ্গ্ উরুৎ অদত্মন
লুয়ঃ লরিন্যালরিস্—"

বঙ্গানুবাদ :

চমৎকার! কিরূপে স্বর্গ এবং মর্ত্যের সৌন্দর্য রাত্রিকালে পরস্পরের উপর প্রতিফলিত হয়। অরণ্যানী মেঘের উপর (ছায়াপাত করে), মেঘগুলি অরণ্যানীর উপর (ছায়াপাত করে)—ইহাই কবির নিকট মনে হয়। ইহা কি হইতে পারে যে এই নক্ষত্রগুলিই পুষ্প? পুষ্পগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া স্বর্গের নক্ষত্রে রূপান্তরিত হয়। নদীগুলি মেঘে চলিয়া যায়, মেঘগুলি নদীর দিকে ছুটিয়া চলে—ইত্যাদি[৯৫]।

যবদ্বীপের কবি-সাহিত্যের মধ্যে ইহা সংশয়োপমার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ছন্দ এবং অলঙ্কারের জগৎ হইতে এইবার ভাবের পরিমণ্ডল এবং বর্ণনার বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক। এখানেও আশ্চর্যজনক সৌসাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইবে। নিম্নোক্ত শ্লোকটি ইন্দ্রবংশ ছন্দে রচিত হইয়াছে :

"সামর দিবা-রাত্রিনিকাঙ্গ্ সুরালয়
দেনিঙ্গ্ প্রকাশাত্মক সর্ব ভাস্বর
অজ্ঞিঘঙ্গ্ সেকর্নিঙ্গ কুমুদাজরিঙ্গ কুলেম
মুয়াঙ্গ্ চক্রবাকান্ পপসঃ লবন প্রিয়।"

বঙ্গানুবাদ :

সুরালয়ে দিন এবং রাত্রির পার্থক্য বোঝা যায় না, কারণ ভাস্বর জিনিষসমূহ আলোক বিতরণ করিতেছে। কেবলমাত্র কুমুদগণ জ্ঞাপন করিতেছে যে ইহা রাত্রি; প্রিয়া-বিরহী চক্রবাকগুলি জ্ঞাপন করিতেছে যে ইহা রাত্রি[৯৬]।

এই শ্লোকের মর্ম উদ্ভটসাগরের[৯৭] নিম্নোদ্ধৃত চরণগুলিতে সুপরিস্ফুট হইয়াছে :

ঘনতর ঘনবৃন্দাচ্ছাদিতে ব্যোমলোকে
দিনমণি-রজনীশৌ নামমাত্রাবশেষৌ।
দিবস-রজনীভেদম্ মন্দবাতাঃ শশমৃসুঃ
কমল-কুমুদ-গন্ধান্ আহরন্তঃ ক্রমেণ॥"

অর্থাৎ ব্যোমলোক ঘন মেঘে আচ্ছাদিত হইয়াছে; সূর্য এবং চন্দ্র নামমাত্র অবশিষ্ট আছে। মৃদুমন্দ বায়ু পর্যায়ক্রমে কমল এবং কুমুদের গন্ধ আহরণ করিয়া দিবস এবং রজনীর পার্থক্য জ্ঞাপন করিতেছে।

আমরা যদি ভাস্বর জিনিষসমূহের স্থলে 'ঘন মেঘ' পড়ি তাহা হইলে যবদ্বীপীয় ও সংস্কৃত কবির ভাবের পরিমণ্ডল এক হইয়া যাইবে।

আমরা এইবার স্পু সেদহ্ রচিত ভারতযুদ্ধ হইতে একটি দৃশ্য বর্ণনা করিব[৯৮]। কৃষ্ণ কুরুরাজ সভায় আগমন করিতেছেন। জনগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য উদ্দামভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে; কেহ কেহ তাহাদের বেশভূষাও ঠিকমত পরিতে পারে নাই; কেহ কেহ কেশবন্ধন করিতে করিতে ছুটিল, কেহ প্রসাধন ত্যাগ করিয়া ছুটিল অথবা দর্পণ এবং তুলি হস্তেই ছুটিল; তাহাদের মাল্য অসমাপ্ত রহিয়া গেল। এমন কি, রাস্তায় পরিচ্ছদ পর্যন্ত খসিয়া পড়িয়া গেল। এই চিত্রটি স্বভাবতঃই অজের স্বয়ম্বরে গমনের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে[৯৯]। কবি বর্ণনা করিয়াছেন কিরূপে স্ত্রীলোকগণ অজকে দেখিবার জন্য বাতায়নপার্শ্বে ছুটিয়া গেল; তাহাদের কুন্তল আলুলায়িত হইল এবং পুষ্পমাল্য ছিন্নভ্রষ্ট হইল; তাহাদের প্রসাধন অসমাপ্ত রহিল এবং তাহারা রাজকুমারকে দেখিবার জন্য তুলি হস্তে ছুটিয়া গেল। তাহাদের বসনভূষণ পথে পড়িয়া গেল।

ঠিক অনুরূপ দৃশ্য অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে[১০০], বাণভট্টের কাদম্বরীতে[১০১], কালিদাসের কুমারসম্ভবে[১০২] এবং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে পরিবেশিত হইয়াছে।

একথা কেহ বলিতে পারিবে না যে এই সমস্ত গ্রন্থ দ্বাদশ শতাব্দীর লেখক স্পু সেড়হ্ পাঠ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে এই বিস্ময়কর সাদৃশ্যের কারণ কি? এই সাদৃশ্য হইতে সম্ভবতঃ আমরা এইটুকু অনুমান করিতে পারি যে এইপ্রকার বর্ণনা অন্ততঃ দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে ভারতীয় কবিগণের নিকট প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং কালক্রমে উহা stereotyped বা মামুলী হইয়া যায়। সুতরাং অশ্বঘোষ, কালিদাস, বাণভট্ট প্রভৃতির রচনায় আমরা যে একই প্রকার বর্ণনার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইতেছি, তাহা অলঙ্কারের দাবীতেই হইয়াছে: ইহার জন্য কেহ কাহারো নিকট ঋণী নাও হইতে পারেন।

যবদ্বীপের কবিগণ রমণীগণের হরিণ-নয়নে কাজল পরাইয়াছেন, পুষ্প দ্বারা অঙ্গ সৌষ্ঠব বর্ধন করিয়াছেন, মুখমণ্ডল সুগন্ধি দ্রব্যে মধুর করিয়াছেন, কটিদেশ ক্ষীণরূপে রচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অজস্র গ্রন্থে এইরূপ রমণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথ মালবিকা নিপুণিকা প্রভৃতির যে জয়গান গাহিয়াছেন কালিদাস প্রমুখ সংস্কৃত কবিগণই তাহার পথিকৃৎ। আমরা মেঘদূত[১০৩], রঘুবংশ[১০৪], মালবিকাগ্নিমিত্র[১০৫], কুমারসম্ভব[১০৬], রত্নাবলী[১০৭], গীত-গোবিন্দ[১০৮] প্রভৃতি কাব্য এবং নাটক পাঠ করিলেই এইরূপ অনেক বরনারীর সাক্ষাৎ পাইব।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে যবদ্বীপীয় কবিগণ ছন্দ এবং অলঙ্কারে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বিভিন্ন শাখায় তাঁহারা স্বচ্ছন্দগতিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহাদের একটি সাহিত্যিক বিচ্যুতির কথা আলোচনা করিব। এ পর্যন্ত দ্বীপময় ভারতে যে সমস্ত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ভিত্তিতে আমরা এই কথা বলিতে পারি যে যবদ্বীপীয় লেখকগণ সংস্কৃত poetics-এর অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়াছেন ইহার কোন প্রমাণ বিদ্যমান নাই। যে সাহিত্যিক সমালোচনার জন্য কালিদাসের ন্যায় কবিও দিঙ্‌নাগাচার্যের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন তাহার আভাষ যবদ্বীপের প্রাচীন সাহিত্যে অনুপস্থিত। ধ্বনি ও রসকে সৌন্দর্যানুভূতির দিক দিয়া আলোচনা করা, রসকে উপলব্ধি করিবার উপায় প্রভৃতি ব্যাপারেও যবদ্বীপীয় লেখকগণ একান্ত উদাসীন রহিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সাহিত্যের দোষগুণ, রচনাশৈলী প্রভৃতি বিষয়েও কোন আলোচনা করেন নাই। ইহা নিঃসন্দেহে দুঃখের বিষয়। এই সম্বন্ধে যদি কোন গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকে, তবে তাহা এখনো অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে অথবা উহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দিঙ্‌নাগাচার্যের মত সমালোচকের এই ভূমিকাটুকু গ্রহণ করিয়া আমরা এইবার প্রসঙ্গান্তরে যাইব এবং দ্বীপময় ভারতের উসদ এবং বারিগ-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

পা দ টী কা

১. *Supplement* dl. II, p 281.

২. *Sanskrit Texts from Bali*, pp. 87-88.

৩. Cf. Gonda, *Sanskrit in Indonesia* p. 106.

৪. For text see *OJO* II 1913, p. 207 and Pigeaud, *Java in the 14th Century*, I, p. 105.

৫. Pigeaud, *op. cit.* p. 109.

৬. Juynboll in *Supplement* dl. II, pp. 216 ff; now published by International Academy of Indian Culture, Nagpur, 1956. *BKI*, 6th Series, VII, p. 630 ff.

৭. আলোচ্য গ্রন্থটি লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর ৪৩১৫-এইচ্‌ সংখ্যক পুঁথি।

৮. Levi, *op. cit*, p. 75.

৯. *Ibid* p. 16.

১০. দ্রষ্টব্য : J. Kats, *Sang Hyang Kamahayanikan*, 1910, pp. 53-55.

১১. সংস্কৃত নিয়ম হইল "ঋটুরষাণাম্ মূর্ধা"

১১ক. Gonda, *op. cit.*, p. 105.

১২. এচোয়বায়াবঃ—এচঃ ক্রমাদয় অব্‌ আয় আব্‌ এতে স্যরচি। দ্রষ্টব্য : পাণিনি, ৬. ১. ৭৮ এবং এই সম্বন্ধে ভট্টোজির বৃত্তি।

১৩. সংস্কৃত নিয়ম : "আদ্‌গুণঃ। অবর্ণাদচি পরে পূর্বাপরয়োরেকো গুণাদেশ : স্যাৎ।" পাণিনি, ৬. ১. ৮৭ এবং এই সম্বন্ধে ভট্টোজির বৃত্তি।

১৩ক. Gonda, *op. cit.*, p. 105.

১৪. *Supplement* dl, II. p. 218.

১৫. Vreede, *Cat. Jav. Mad. Hss.* 1892, pp. 362-363.

১৬. কবি-ব্যাকরণের সন্ধি নিয়ম সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য : Kern, *VG* VIII, p. 185 ff ; also IX, p. 4 ff.

১৬ক. Gonda, *op. cit.*, p. 105.

১৭. Quoted by Gonda, *op. cit.*, p. 106.

১৮. Juynboll, *Supplement* dl II, p. 207 ; BKI. 3rd series VI, 1872, pp. 80-81.

১৯. শ্লোকটি বিকৃত এবং ছন্দও দূষিত হইয়াছে। ইহার মূল সম্ভবতঃ এই ছিল : "দ্বিগুস্তৎপুরুষোঽদ্বন্দ্বস্তথা চ কর্মধারয়ঃ বহুব্রীহ্যব্যয়ীভাবৌ সমাসাঃ পাণিনেস্তু ষট্।"

২০. Majumdar, *Champā*, 1927, p. 232.

২১. Levi, *op. cit.*, p. XXXI and p. 87-88 (text).

২২. *Op. cit.*, p. XXXI

২৩. *Ibid.*

২৪. *Op. cit*, p. 106.

২৫. এই অংশ হইতে বিচরন্তৌ পর্যন্ত গণ্ডার উদ্ধৃতি হইতে সম্ভবতঃ মুদ্রাকর প্রমাদের জন্য বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

২৫ক. Text in Levi, *op. cit.*, p. 89 ; Gonda, *op. cit.*, p. 106.

২৬. *Sanskrit in Indonesia*, p. 106, Levi, *op. cit* ; p. XXXII and 89 ff.

২৭. *Ibid* p. XXXII.

২৮. Text in Levi, *op. cit.*, pp. 93-107.

২৯. Levi, *op. cit.*, p. 93.

৩০. Juynboll, *Supplement* dl. II, Codices 3906(1) and 5140(2).

৩১. *KBNWdb* I, p. 146.

৩২. *Sanskrit in Indonesia*, p. 125, fn. 38.

৩৩. Juynboll, *Supplement* dl. II, Cod. 4009.

৩৪. *Ibid* p. 216 no. 4518.

৩৫. *Ibid.*

৩৬. Vreede, *Cat. Jav. Mad. Hss*, 1892.

৩৭. তুলনীয় অমরকোষ, ১. ১. ১. কোলব্রুকের সংস্করণ, ১৮০৮।

৩৮. তুলনীয় ঐ, পৃঃ ৫-৬। পূর্বোক্ত মন্তব্য এইস্থলেও প্রযোজ্য।

৩৯. পঠনীয় : শিবসর্ববিরূপাক্ষা।

৪০. পঠনীয় : সোমধূম্রনীললোহিতঃ।

৪১. পঠনীয় : ধূর্জটিস্।

৪২. আমরা এই অংশে উপরোক্ত সংশোধন করিতে পারি। 'ক্রতুঃ' অন্ত্যশব্দের সঙ্গে সংযুক্ত না হইয়া কখনও শিবের নাম হইতে পারে না ; সুতরাং বিসর্গটি সম্ভবতঃ ভুল। এই তালিকাটি অনেকটা অমরকোষের

তালিকার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ; সুতরাং আমরা শেষোক্ত তালিকা হইতে 'ক্রতুধ্বংসী' শব্দটি আহরণ করিতে পারি। এখানে যে সমস্ত শব্দ নাই, তাহার মধ্যে অমরকোষের 'ভূতেশশ্চন্দ্রশেখরঃ'—শব্দটি এখানে আহরণ করিলে ছন্দের দাবী মিটিয়া যায়, যদি আমরা 'বৃষভধ্বজঃ' স্থলে 'বৃষধ্বজঃ' পড়ি।

৪৩. Kern, *VG* IX, p. 281.

৪৪. Krom, *Geschiedenis*, p. 151.

৪৫. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: Kern, *VG*. IX, p. 273 ff; Juynboll, *Supplement* I, p. 170 ff; Krom, *Meded. Amsterdam Academy* LVIII, p. 203 ff; Gonda, *op. cit.* p. 107.

৪৬. Gonda, *op. cit.*, p, 107.

৪৭. *Op. cit.*

৪৮. Gonda, *op. cit.*, p. 107.

৪৯. *Ibid.*

৫০. *Geschiedenis*, p. 151.

৫১. এই নিয়ম ভঙ্গের দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যবদ্বীপীয় রামায়ণের ষষ্ঠ সর্গে, শিশুপাল বধের চতুর্থ সর্গে, কিরাতার্জ্জুনীয়ের পঞ্চম সর্গে, রঘুবংশের নবম সর্গে এই নিয়ম প্রতিপালিত হয় নাই।

৫২. C. Hooykaas in *VKI* 16 (1955) p. 19. The table there may be consulted with profit.

৫৩. *Ibid* p. 28.

৫৪. ব্যতিক্রম কেবলমাত্র পঞ্চম সর্গ, কিন্তু এই সর্গ বর্তমানে পচলিত ষষ্ঠ সর্গের ২৭ শ্লোকে আসিয়া শেষ হইয়াছিল বলিয়া ডঃ হুইকাশ মনে করেন। কারণ চতুর্থ সর্গের শেষ ছন্দ পুষ্পিতাগ্রা এবং ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গের শেষ যবদ্বীপীয় রামায়ণের ২।২৭, এইস্থলেও পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। হুইকাশ মনে করেন যে কোন নকল-নবীশ প্রাচীনকালেই এইস্থলে কোন ভুল করিয়াছিলেন। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে এই একটি মাত্র সর্গ যেখানে দ্বিতীয় ছন্দ ব্যবহৃত হয় নাই। সুতরাং হুইকাশের অভিমত সহসা অগ্রাহ্য করা সম্ভবপর নহে। Vide Hooykaas, *op. cit.*, pp. 23-24.

৫৫. *VKI*, 16 (1955) p. 25; এই প্রসঙ্গে হুইকাশ ভারবীর কিরাতার্জ্জুনের অষ্টম সর্গ, কালিদাসের রঘু-বংশের নবম সর্গ এবং শ্রীহর্ষের নৈষধীয়ের সপ্তদশ সর্গের উল্লেখ করিয়াছেন।

৫৬. ইহার বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: *VKI* 16 (1955) pp. 25-30.

৫৭, *VBG*, 1849, dl. XXII; Kern, *VG* IX, p. 67 ff.

৫৮. Kern, *VG.*, IX p. 95 ff.

৫৯ পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্রের বিখ্যাত টীকাকার ছিলেন যাদবপ্রকাশ। যাদবপ্রকাশ প্রথমে ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক রামানুজের গুরু এবং পরে তিনি তাঁহার শিষ্য হন। পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্র সম্বন্ধে যাদবপ্রকাশের ভাষ্যরাজটীকা এবং হলায়ুধের মৃতসঞ্জীবনী টীকা সমসাময়িক, কিন্তু যাদবপ্রকাশের টীকা বৈদিক এবং ক্লাসিক ছন্দ উভয়ক্ষেত্রেই অধিকতর নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছে। পিঙ্গল ছন্দঃসূত্রের অধিকতর নির্ভরযোগ্য Text যাদবপ্রকাশের টীকাতেই ধৃত হইয়াছে। এই টীকাটি প্রকাশিত হইলে বৃত্তসঞ্চয়ের সহিত পিঙ্গল ছন্দঃসূত্রের আর একবার তুলনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬০. *Sanskrit in Indonesia*, p. 126 f. n. 46.

৬১. Juynboll, *Supplement* dl. II, p. 289.

৬২. *Ibid*, p. 219, Cod. 4573,

৬৩. *Sanskrit in Indonesia*, p. 108.

৬৪. Gonda, *op. cit.*, p. 108.

৬৫. Kern, *VG* IX, p. 75 ff ; Gonda, *op. cit.*, p. 108.

৬৬. দ্রষ্টব্য Kern, *Kawi Studien*, p. 100 ; Gonda, *op. cit.* ; pp. 108-9.

৬৭. *Brahmāṇḍapurāṇa Kakawin*, canto XI, str. 1.

৬৮. তুলনীয় : "যেষাম কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয় তন্ময়ীভাবনযোগ্যতা তে হৃদয সংবাদভাবাঃ সহৃদয়াঃ"—অভিনব গুপ্ত, ধ্বন্যালোকলোচন, পৃঃ ১১। কাব্যমালা সংস্করণ।

৬৯. কাব্যাদর্শ, ১, ৫৫ হইতে।

৭০. জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ, তৃতীয় মূদ্রণ, দশম অধ্যায়, পৃঃ ৫৩৪।

৭১. পঞ্চম সর্গ।

৭২. পূর্বচরক, স্মরদহন, বিব্লিওথেকা জাভানিকা সংস্করণ, ৩নং গ্রন্থ, ১৯৩১, পৃঃ ২৯, ১৩।

৭৩. ইহার সহিত তুলনীয় শিশুপাল বধের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি :

(ক) "ভূরিভির্ভূরিভির্ভোবৈর্ভূভাবৈবভিরোভিয়ে।
ভেরীরেভিভির ভ্রাভৈর ভোবার্ভিরিভৈরিভাঃ।

(খ) "দাদদো দূদ্দ দূদ্দাদী দাদাদো দূদদী দদোদদঃ।
দূদ্দাদম্ দদদে দুদ্দে দদাদদ দদোদদঃ॥

৭৪. কাব্যাদর্শঃ, ৩।১।

৭৫. এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : কাব্যাদর্শঃ ১।৬১।

৭৬. জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ, পৃঃ ৫৩৮।

৭৭. স্মরদহন, পূর্বোল্লিখিত সংস্করণ, পৃঃ ২৮।

৭৮. ভট্টিকাব্য ২।১৯।

৭৯. *OLZ*, 29, 1926, p. 935. অর্জুনবিবাহে সন্দষ্ট যমকের কোন নিদর্শন খুঁজিয়া পাই নাই।

৮০. সাহিত্যদর্পণ, জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ, পৃঃ ৫৮৯।

৮১. ঐ, পৃঃ ৫৮৯।

৮২. Vide *OLZ*, 29 (1926) p. 937.

৮৩. *Sanskrit in Indonesia*, p. 398.

৮৪. কুমারসম্ভব ১।৮ ; তুলনীয় ভারতযুদ্ধ ৫০।৫ ; বৃত্তসঞ্চয় ৯৩।

৮৫. রবীন্দ্র রচনাবলী দ্রষ্টব্য।

৮৬. ঐ

৮৭. রঘুবংশ, ১৪।১

৮৮. রত্নাবলী ২।৩

৮৯. মেঘদূত, উত্তর মেঘ, ২২।

৯০. রামায়ণ ১২।৩৮

৯১. শৃঙ্গারতিলক, ১৪ ; তুলনীয় কুমারসম্ভব ১।৪৭ ; গীতগোবিন্দ ৩।৩।

৯২. সর্গ ৮।৯৬

৯৩. ৬।১৪৮

৯৪. তুলনীয় : "ক্রহ্ সির সঙ্ কুমার, তিন্দুৎ নির ভটারি মহমহন ত সির কল্পতরু—"অর্থাৎ কুমার ইহা পছন্দ

করিলেন এবং ভট্টারিকাকে অনুসরণ করিলেন; তিনি ছিলেন কল্পতরু। দ্রষ্টব্য: Pigeaud, *Tantu Panggĕlaran*, pp. 72, 143.

৯৫. Vide *OLZ*, 29 (1926) p. 938.

৯৬. *BKI*, 1926, p. 210 ; অর্জুনবিবাহ, ১৩।৯।

৯৭. সঃ পূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভটসাগরঃ, ৩।২২৮

৯৮. ভারতযুদ্ধ, ২৩-২৬।

৯৯. তুলনীয় রঘুবংশ ৭।৫-১৩ ; কুমারসম্ভব ১।৪

১০০. ৩য় সর্গ; তুলনীয় শিশুপাল বধ, দ্বাদশ সর্গ।

১০১. কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব সম্পাদিত, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯২৮, পৃঃ ১৬৪ হইতে।

১০২. ৭।৫৬-৬২।

১০৩. পূর্বমেঘ, ২৭ ; উত্তর মেঘ ২, ১১।

১০৪. ১৬।৪৮ ; ১৩।৪৯ ; ৯।২৮ ; ১৬।৫৯ ; ৭।২৭ ইত্যাদি।

১০৫. ৩।১২৫

১০৬. ৭।২০ ; ৭।৫৯

১০৭. ১।১১

১০৮. ৩।৫

দশম অধ্যায়

চিকিৎসাশাস্ত্র এবং জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিদ্যা

গ্রীক উপকথা অনুযায়ী মানুষের ব্যাধি প্যাণ্ডোরার বাক্স হইতে নির্গত হইয়াছে এবং উহাকে নিরোধ করিবার জন্যই ঔষধ বা চিকিৎসাশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারত এবং দ্বীপময় ভারতের অধিবাসীদের প্যাণ্ডোরার বাক্স অবশ্য ছিল না, কিন্তু ব্যাধি ছিল। সুতরাং উহা নিরাময়ের চেষ্টা প্রাচীন যুগ হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়[১]। সেখানে একটি সূক্তে রুদ্রকে শ্রেষ্ঠ ভিষকরূপে অভিহিত করা হইয়াছে: 'ভিষক্তমম্ ত্বা ভিষজাম্ শৃণোমি' অর্থাৎ আমি শুনিতেছি যে তুমি ভিষক্‌দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের দুইটি প্রাচীন গ্রন্থ চরক এবং সুশ্রুতে ব্রহ্মাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্রষ্টা হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ সুশ্রুত-সংহিতায় (১ম অধ্যায়) স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে, "প্রথমতঃ ব্রহ্মা এই বেদ ব্যাখ্যা করিলেন। দক্ষ তাঁহার নিকট হইতে ইহা শিক্ষালাভ করিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্দ্রকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন; তাঁহারা এই বিজ্ঞান দক্ষের নিকট হইতে শুনিলেন। আমি স্বয়ং ইহা ইন্দ্রের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছি।"

চরক (আনুমানিক দ্বিতীয় শতাব্দী) এবং সুশ্রুতের সময় (আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দী) এই বিদ্যা এত প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত হইত যে লেখকদ্বয় এই বিজ্ঞানকে দেবতাদের দান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; এমন কি ইহাকে অন্যতম বেদরূপে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় দ্বীপময় ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্রষ্টা কে সেই সম্বন্ধে কোন প্রকার কিম্বদন্তী বিদ্যমান নাই। এতদ্ব্যতীত যে-সমস্ত পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ বলিয়া এই সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করাও দুরূহ। প্রাচীন যুগের ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রারম্ভে দেবদেবী সম্বন্ধে কোন প্রকার স্বস্তিবাচন নাই; পরবর্তীযুগের ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে এবং যবদ্বীপে যে সমস্ত চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে এই প্রথাটি অনিবার্যরূপে বিদ্যমান। যবদ্বীপীয় চিকিৎসা সংক্রান্ত পুঁথিগুলি ও ভারতীয় ভেষজবিদ্যার গ্রন্থগুলির মধ্যে আমরা বিশেষ কোন যোগসূত্র আবিষ্কার করিতে না পারিলেও, যবদ্বীপীয় গ্রন্থগুলির সহিত প্রাচীন বেবিলোনীয়, সিরিয়াক্ এবং হিব্রু গ্রন্থগুলির মধ্যে যেন একটি যোগসূত্র দেখিতে পাই। কারণ শেষোক্ত গ্রন্থগুলিতে "প্রায়শঃই ঔষধের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার

কার্যকারিতা হইল মন্ত্র এবং ব্যক্তিগত প্রেতাত্মা (personal "devil") সম্বন্ধে জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল[২]।" হিন্দু লেখকগণ অবশ্য কখনো কখনো ব্যাধি নিরাময় করিবার জন্য প্রার্থনার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু যাদুমন্ত্র এবং ঝাড়ফুক তাহাদের প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে স্থান পায় নাই। কিন্তু তাহাই বলিয়া মন্ত্রতন্ত্র এবং ঝাড়ফুক যে ভারতবর্ষে ছিল না তাহা নহে। অথর্ববেদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্যাপারটি আজিও চলিয়া আসিতেছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক এবং তথাকথিত চিকিৎসকগণ ভারতবর্ষে এবং দ্বীপময় ভারতে যুগ যুগ ধরিয়া ঝাড়ফুক তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদি দিয়া ব্যাধি নিরাময় করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। বস্তুতঃ দ্বীপময় ভারতে এখনো স্বদেশী চিকিৎসা প্রণালী ধর্ম, মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুক প্রভৃতির সহিত সম্পর্কবিহীন নহে। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে আজিও মালয় উপদ্বীপের গ্রামাঞ্চলে বোমোর চিকিৎসকগণ ব্যাধিগ্রস্ত লোককে রোগমুক্ত করিবার জন্য সময় সময় নানান প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া থাকেন যাহার সহিত ধর্ম এবং ঝাড়ফুকেরও সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে যে দীর্ঘ মন্ত্রাদি পড়া হয় তাহার মধ্যে মুসলিম নাম বিদ্যমান থাকিলেও প্রাক্-মুসলিম যুগের হিন্দু নামও বিদ্যমান, যথা : রঞ্জুন (=অর্জুন), বেতরকাল (ভট্টার কাল), বিম (=ভীম), নরদ (নারদ), দেব সঙ্গ্ সম্ব (কৃষ্ণের পুত্র সাম্ব) ইত্যাদি[৩]। এই সমস্ত মন্ত্রের সবটুকুর অর্থ পরিগ্রহণ করা মুস্কিল এবং খানিকটা হয়তো ইচ্ছা করিয়াই রহস্যাবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। কারণ এই রহস্যের মধ্যেই মন্ত্রের শক্তি এবং বোমোরগণের কৃতিত্ব নির্ভর করিতেছে। ভারতবর্ষে যাহারা এই প্রথায় চিকিৎসা করিয়া থাকেন (যেমন ওঝা প্রভৃতি) তাহাদের অনেক মন্ত্রই এইরূপ দুর্বোধ্য রহস্যময় শব্দের দ্বারা ভারাক্রান্ত। মালয় উপদ্বীপে এই শ্রেণীর মন্ত্রে হিন্দু ও মুসলিম যুক্ত-প্রভাব সুস্পষ্ট। তবে অনেক ক্ষেত্রেই এই মুসলিম প্রভাব বহিরাবরণের মত ; অন্তঃস্থলে রহিয়াছে হিন্দু মন্ত্রটি[৪]।

এই ধরণের চিকিৎসার কথা প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে আলোচিত না হইলেও প্রাচীন যবদ্বীপীয় শাস্ত্রে একেবারে আলোচিত হয় নাই তাহা নহে। ইহার প্রণালী এইবার আলোচনা করিব। প্রথমতঃ তথাকথিত চিকিৎসকগণ এক প্রকার ঔষধ (!) প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর অবোধগম্য বা অর্ধবোধগম্য ভাষায় মন্ত্রতন্ত্র পড়ে এবং উহার উপর ভগবানের আশীর্বাদ যাজ্ঞা করে ; এমন কি পীড়ার উপশম না হইলে তথাকথিত চিকিৎসকগণ অনেক সময় বিধাতাকে পর্যন্ত শাসাইয়া থাকে। এইরূপ ঔষধ প্রস্তুত হইলে উহা চিকিৎসকের নির্দেশানুযায়ী রোগী পান করিয়া বা অন্যরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা হইতে স্বতঃই প্রতীয়মান হইবে যে যদিও প্রাচীন যবদ্বীপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের সহিত প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের লক্ষ্যণীয় কোন বিশেষ সাদৃশ্য নাই, তথাপি অপরিচ্ছন্ন লোক-চিকিৎসার ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে। ভৌগোলিক দূরত্বের পটভূমিকায় আমরা এই অনুমান করিতে পারি যে প্রাচীন যবদ্বীপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে পশ্চিম এসিয়ার অবদান অনুপস্থিত। আমরা যে-যুগের কথা বলিতেছি সে-যুগে অধিকাংশ মানুষই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল ; সভ্যজগতের সংস্পর্শ সত্ত্বেও এখনো বহুদেশে একই অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং এই প্রকার অ-

বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপ্রণালী একটা বিশেষ যুগে যে প্রত্যেক দেশেই বিদ্যমান ছিল তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহাও সম্ভবতঃ স্বীকার করা যাইতে পারে যে এই প্রণালীর চিকিৎসার জন্য একদেশ অন্যদেশের নিকট প্রগাঢ়ভাবে ঋণী ছিল না। তবে ইহা সম্ভব যে দ্বীপময় ভারতের লৌকিক চিকিৎসাপ্রণালী ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণের হস্তে হয়তো কিছুটা রূপান্তরিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার স্বরূপ এবং গভীরত্ব সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

মালয় উপদ্বীপের পবঙ্ বা বোমোর নামক স্বদেশী চিকিৎসকগণ (তাহারা আবার যাদুকরও বটেন) যে বিধান দিয়া থাকেন তাহা অনেক ক্ষেত্রেই প্রাক্-মুসলিম যুগের এবং তাহাদের ব্যবহৃত শব্দ-তালিকায় শরীর তত্ত্ববিদ্যা বা অ্যানাটমীর কিছু কিছু শব্দ বিদ্যমান। মালয় বহু, নড়ি, সেন্দি, পঞ্চইন্দেরিয়, কেপল, রোম্, সেলেসেম, মুর্চ বা মের্চ, চের্ণ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বাহু, নাড়ী, সন্ধি (অস্থির সংযোগস্থল) পঞ্চেন্দ্রিয়, কপাল, রোম (লোম), শ্লেষ্মা, মূর্ছা, জীর্ণ শব্দকে বুঝাইয়া থাকে। ঔষধের মধ্যে গুল দেরব (গুড় দ্রব = সিরাপ), কয়ু চন্দন বা চন্দন বৃক্ষ (ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত) মালয় উপদ্বীপে খুব ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া জ্বরে যখন শরীরে উত্তাপ খুব বেশী থাকে তখন মালয়গণ চন্দনবৃক্ষের উপাদান সংযুক্ত মাড়-ভাত (ফেন সংযুক্ত অন্ন) ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডঃ গঞ্জা এইরূপ আরো দৃষ্টান্ত পরিবেশন করিয়াছেন[৫]।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে উসদ-সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ পুঁথি সংরক্ষিত আছে[৬]। এই গ্রন্থে রোগ নিরাময়ের জন্য মিক্‌চার (mixture) এবং অন্যান্য ঔষধের বাহ্য প্রয়োগের কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে ; ইহাতে কয়েকটি ঔষধের উপাদানকে চর্বন করিয়া হজম করিবার বিধানও দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে মন্ত্র ও তুকতাকের কথাও বলা হইয়াছে ; মন্ত্র এবং তুকতাকের নাম দেওয়া হইয়াছে মেমন্ত্রনিন। এই মেমন্ত্রনিনগুলি প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত হইলেও ইহার অর্থোদ্ধার করা দুরূহ ব্যাপার। ইহাতে চিকিৎসার যে প্রণালী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা হইল এই : প্রথমতঃ রোগের নামোল্লেখ করিয়া, একটি মন্ত্র পড়িতে বা ঝাড়ফুক করিতে হইবে। এই মন্ত্র বা ঝাড়ফুকের আরম্ভে আছে সংস্কৃত 'ওম্' শব্দটি। আমাদের পুজাপার্বণে যেমন সংস্কৃত-মন্ত্র না পড়িলে অনেকে উহাকে অসম্পূর্ণ বা বিধিবহির্ভূত-বলিয়া গণ্য করেন, তেমনি প্রাচীন যবদ্বীপের চিকিৎসক বা ওঝাগণ এই অপূর্ব "ওম্" শব্দটি সহযোগে ঔষধের ব্যবস্থা দিয়া রোগ নিরাময়ের অপূর্ব দাওয়াই বাতলাইয়া দিয়াছেন। এই 'ওম্'-মন্ত্রটি গমুগণ, কেঞ্চুর, পল, জহে, মুসি, কেতন এবং গজিহ্-নামক মিক্‌চারের উপর পড়িয়া ঔষধ রোগীকে খাওয়াইয়া দেওয়া হইত। ভারতবর্ষের সভ্যতার নেপথ্যে যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন জগৎ রহিয়াছে সেখানে এই প্রথার এখনো অসীম প্রতাপ বিদ্যমান।

উসদ সম্বন্ধীয় কোন কোন গ্রন্থের প্রারম্ভে নানাপ্রকার দেবদেবীর আবাহন করা হইয়াছে। ৪৬২০ নং পুঁথির প্রারম্ভে আমরা পড়িতেছি :

"ওম্ শিবঃ ভটারঃ, পৃমন্ শিবঃ, নির্বহ শিবঃ, আদিত্য-শিবঃ[৭]।"

৪৬১৯ নং পুঁথির আরম্ভে আছে : "ওম্ অবিঘ্নম্ অস্তু নমস্ স্বাহা[৮]।" ৪৬১৮ নং পুঁথির আরম্ভও এই প্রকার[৯]। ৩৯৪২ নং পুঁথিটি অনেকটা কৌতূহলোদ্দীপক : কারণ ইহার ৫ পৃষ্ঠায় আমরা ধ্যানী বুদ্ধদের নাম পড়ি, যথা—অমোঘসিদ্ধ (অর্থাৎ অমোঘসিদ্ধি) এবং স্ব্যমিতাভ—(অমিতাভ)।

কয়েকটি যবদ্বীপীয় চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক পুঁথিতে ঐস্লামিক প্রভাবের স্বাক্ষর বিদ্যমান। উপরোক্ত ৩৯৪২ নং পুঁথি স্থলেমানের নাম এবং কিছু কিছু মুসলমানী মন্ত্রতন্ত্রের পরিচয় বহন করিতেছে। অনুরূপভাবে, ৩৯৪৩ (১) নং পুঁথিতে কেবলমাত্র যে জিন্ন্ (জীন)-এর নাম রহিয়াছে তাহা নহে ; উহাতে রসুল-আল্লার নামও বিদ্যমান[১১]। ৮৭৯ নং পুঁথিতে মহম্মদের নাম আছে, কিন্তু ইহার সমাপ্তি ঘটিয়াছে, সঙ্গ্ হঙ্গ্ বোঙ্গ্কর (= ওম্), ঙ্গ, ওঙ্গ, ৎলস উল্লেখে। ৩৯৪৩ (১) নং পুঁথিতে কিছু সংস্কৃত শ্লোক আছে এবং ৪৬১৮ নং পুঁথি শিবলিঙ্গকে আবাহন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে যবদ্বীপের এই সমস্ত চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থে হিন্দু-বৌদ্ধ-ঐস্লামিক উপাদানসমূহ পরস্পর ভীড় করিতেছে। সম্ভবতঃ ইহাদের রচনাকাল মজপহিত সাম্রাজ্যের পতনের কিছুকাল পূর্বে এবং পরে, অর্থাৎ ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর অন্তর্বর্তীকালে।

বলিদ্বীপেও চিকিৎসা-সংক্রান্ত অনেক প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার সংখ্যা শতাধিক হইবে[১২]। এই পুঁথিগুলির নামও উসদ ; ঔষধের সঙ্গে বিসদ-শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরাও বাংলা ভাষায় অনেক সময় ওষুধ-বিশুদ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। মনে হয় যে বলিদ্বীপের বিসদ এবং আমাদের বিশুদ শব্দ একই সংস্কৃত মূল হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। বিশুদ্ শব্দটি সংস্কৃত বিশুদ্ধ শব্দটির বিকৃতরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। বলিদ্বীপের চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে উদস মল, ধর্ম উসদ, বুদ বা বুদ্ধ কেচপি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ডঃ গণ্ডা[১৩] বলিয়াছেন যে বলিদ্বীপের চিকিৎসকগণ পীড়াগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—তপ্ত, ঈষদুষ্ণ এবং শীতল। এই তিন পর্যায়ের পীড়া আবার যথাক্রমে ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু হইতে সঞ্জাত বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। তাহারা আরো বিশ্বাস করে যে মানুষ জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ৪টি প্রেতাত্মার প্রভাবাধীন। এই প্রেতাত্মাগুলির সংস্কৃত এবং স্বদেশী নাম আছে। এতদ্ব্যতীত বলিদ্বীপীয় শারীরতত্ত্বের মধ্যে পঞ্চ মহাভূতের বিশেষ স্থান আছে। ইহারা চিকিৎসার ব্যাপারে প্রন, অপন, সমন, সদন (বা উদন), ব্যন প্রভৃতির সাহায্যে নাসিকা, চক্ষু, মুখ, রক্ত চলাচল ইত্যাদির কার্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে ; ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন নাড়ীও বলিদ্বীপের চিকিৎসকগণের সুপরিচিত ছিল, যেমন ইড়া, পিঙ্গল, সুষুম্ন প্রভৃতি নাড়ী[১৪]।

আমরা এইবার বারিগ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই আলোচনায় আমরা জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতিষ উভয় শাস্ত্র সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। এই সম্বন্ধে আমরা চীনের ট্যাঙ্গ-বংশের নূতন ইতিহাস (৬১৮-৯০৬ খৃঃ)[১৫] হইতে জানিতে পারি যে সমসাময়িক জাভার লোকেরা সাহিত্য এবং জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে পরিচিত ছিল, তবে তাহাদের

মধ্যে যে জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ প্রচলিত ছিল ইহার কোন প্রমাণ নাই। বরিগ-শব্দের উল্লেখ অনেক প্রাচীন অনুশাসনলিপিতেও পাওয়া যায়। ৮০৯ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ ত্বকের অনুশাসনলিপিতে[১৬] এই উপাধিধারী ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইতেছি একটি গ্রাম্য সমাজের উৎসব উপলক্ষ্যে। ইহাদের কর্তব্যের ফিরিস্তি যেমন অজ্ঞাত, শব্দটির ব্যুৎপত্তিও তেমনি সুস্পষ্ট নহে। তবে সময়পঞ্জী এবং জ্যোতিষের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক সুবিদিত।

বস্তুতঃ হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী জটিল সময়ের হিসাব পরিমাপ করিবার জন্য সম্ভবতঃ রাজ-দরবারে এবং অন্যত্র বিশেষজ্ঞ ছিলেন। যবদ্বীপের কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থে উচ্চপদস্থ ধর্ম মহামাত্রের[১৭] তালিকায় এক শ্রেণীর লোকের সাক্ষাৎ পাইতেছি ; তাঁহাদের উপাধি হইল পন্দেলেগণ বা পদেলেগণ। অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর বতু-আজি নামক একখানি টীকাতে পন্দেলেগণ শব্দটির √দেলেগ অর্থাৎ যাদুকর বা জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে[১৮]। এতদ্ব্যতীত যবদ্বীপের জঙ্গন বা গ্রাম্য বৈদ্যগণ ভবিষ্যৎ গুনিয়া এবং জ্যোতিষ-চর্চার মাধ্যমে কৃষিকার্যের উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করিতেন। ইহার স্বাক্ষর বরিগশাস্ত্রে রহিয়া গিয়াছে[১৯]। সুতরাং ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে যে প্রাচীন যবদ্বীপের রাজ কপ কপ নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে : "প্রত্যেক স্বচ্ছল ব্যক্তিকে বৎসর, মাস, দিন, সঙ্কলগণনা (চন্দ্রসঙ্কল) এবং কবিভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইবে।" ভারতীয় বার মাসের ব্যবহার দ্বীপময় ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

বলিদ্বীপে আমরা ভারতবর্ষের বারটি মাসের সাক্ষাৎ পাইতেছি। এই বার মাসের সংযুক্ত নাম হইল চন্দ্র পরিলেক বা চন্দ্র প্রলেক। এই বার মাসের সংস্কৃত এবং বলিদ্বীপীয় নাম বিদ্যমান, যথা : শ্রবন (শ্রাবণ), বদ্রবদ (ভাদ্রপদ), অসুজি (আশ্বিন), কাতিক, মর্গসির্শা (মার্গশীর্ষ), গোস্ত (পৌষ), মঘ (মাঘ), পল্গুন (ফাল্গুন), মদুমস বা চেত্র (মধুমাস বা চৈত্র), বেসক (বৈশাখ), জ্যেস্ত (জ্যৈষ্ঠ), অসদ (আষাঢ়)। মজপহিত যুগে সৌর বৎসরের প্রথম মাসই ছিল শ্রাবণ, কারণ নাগরকৃতাগমের ২০।২ সর্গে অষ্টম মাসের উৎসব ফাল্গুন মাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এদিকে আবার বলিদ্বীপের দ্বাদশাদিত্য সূর্যস্তবে[২০] বার মাসের বারটি সূর্যের নামের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে সর্বপ্রথমে উল্লিখিত মাসের নাম হইল মাঘ মাস। এই সূর্যস্তবটি যদি ভারতবর্ষাগত হইয়া থাকে তাহা হইলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন মনে জাগে যে ভারতবর্ষেই বা কেন দ্বাদশাদিত্যের সূর্যের প্রথম নামটি মাঘ মাসের নামের সহিত সংযুক্ত হইল? এই প্রসঙ্গে অবশ্য একটি ক্ষীণ সম্ভাবনার কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না ; তাহা হইল এই যে বলিদ্বীপীয় সূর্যস্তবের লেখক মাঘ-মাসকে বৎসরের প্রথম মাস মনে করিয়া এই সূর্যস্তব রচনা করেন নাই। সে যাহাই হউক, এদিকে আবার যবদ্বীপীয় একটি বরিগশাস্ত্রে[২১] চৈত্রমাসকে বৎসরের প্রথম মাস হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। গণ্ডগোল আরো সৃষ্টি হইয়াছে এইজন্য যে কেহ কেহ অগ্রহায়ণ মাসের নামের অর্থব্যঞ্জনা হইতে মনে করেন যে ভারতবর্ষে একদা এই মাসই বৎসরের প্রথম মাস হিসাবে পরিগণিত হইত। দ্বীপময় ভারতের এই পরস্পর-বিরোধী বা আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী সংবাদগুলির মধ্যে প্রপঞ্চ কর্তৃক নাগরকৃতাগমে

পরিবেশিত সংবাদটি গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত হইবে। বলিদ্বীপে উপরোক্ত নামগুলি এখন আর বিশেষ প্রচলিত নাই, তবে বিশেষ বিশেষ উৎসব বা পর্ব উপলক্ষ্যে ভারতীয় মাসের নামগুলির তলব হইয়া থাকে। উপরোক্ত সংস্কৃতজ নামগুলি যবদ্বীপেও প্রচলিত ছিল; যবদ্বীপের প্রাচীন অনুশাসনলিপিগুলি পাঠ করিলেই ইহার যথার্থতা উপলব্ধি হইবে।

বৎসরের কালনির্ণয় সম্বন্ধে বৃগুগর্গ এবং অজিশকে লেখা আছে যে শকাব্দ ভারতবর্ষ হইতেই প্রচলিত হইয়াছিল। বলিদ্বীপে ৩৬০ দিনে চান্দ্র বৎসর হইয়া থাকে এবং সেই অনুযায়ী কালগণনা করা হইয়া থাকে। এই ৩৬০ দিন আবার ১২টি অসমভাগে বিভক্ত; ইহাদের প্রত্যেকটিকে আমাদের দেশের মত ১২ মাস বলা হইয়া থাকে। প্রথম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং দ্বাদশ মাস ৪১ দিনের। দ্বিতীয় এবং একদশ মাসটি ২৩ দিনের, তৃতীয় এবং চতুর্থ মাস ২৪ দিনের, পঞ্চম এবং অষ্টম মাস ২৬ দিনের, নবম এবং দশম মাস ২৫ দিনের[২২]। ৩৬০ দিনের এই চান্দ্র বৎসরকে ব্রাহ্মণগণ সৌর বৎসরে রূপান্তরিত করিয়া থাকেন।

মাসের দিনগুলিকে আবার পঞ্চাহ, ষষ্ঠাহ এবং সপ্তাহে ভাগ করা হইয়াছে। এই পঞ্চাহের নাম হইল: পহিঙ্গ, পুয়ন বা পোন, বগে, কলিবুয়ণ বা কলিবোন এবং উমনিস বা মনিস। পঞ্চাহের নাম ব্যাপকভাবে অনুশাসনলিপিগুলিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। ষষ্ঠাদের নাম হইল; তুঙ্গলে (সংক্ষেপে: তু), হরিয়ঙ্গ (হ), বুরুকুঙ্গ (বু), পনিরুয়ন (প), বস (ব), মবুলু (ম)। যবদ্বীপের অনুশাসনলিপিগুলিতে এই সমস্ত পঞ্চাহ এবং ষষ্ঠাহের সহিত ভারতীয় সপ্তাহের নামও প্রচলিত ছিল কিন্তু সপ্তাহের নাম হইয়া গিয়াছিল বিকৃত, যথা: দিতে বা রেদিতি (=অদিতি, আদিত্য), সোম, অঙ্গর (মঙ্গল), বুদ বা বুদ্দ (বুধ), বেস্পতি বা বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনেশ্চর (শনৈশ্চর) বা তুম্পক। বলিদ্বীপে ইহাদের নাম হইল দিতে বা রেদিতে, সোম বা চোম, অঙ্গর, বুদ, ব্রেহস্পতি বা ব্রেস্পতি, সুক্র এবং শনিশ্চর। এই সমস্ত নাম এতই সংস্কৃত-ঘেঁসা যে ইহার আর সংস্কৃতরূপ দিবার প্রয়োজন নাই। র‍্যাফল্‌স বলিয়াছেন: "সাতদিনের সপ্তাহের সহিত সমন্বয় করিয়া উহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'বুকু'। বটু গুনুঙ্গের উপর বিজয়ের স্মারকচিহ্নস্বরূপ এইরূপ ত্রিশটি 'বুকু' প্রচলন করা হইয়াছিল। এই ত্রিশটি বুকু আবার প্রধানতঃ ছয়টি ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি ভাগে ৩৫টি দিন আছে; যে দিনে বুদ্দ কলিবোন এবং গলুঙ্গন একসঙ্গে পড়িবে সেইদিন হইতে বুকুগুলির আরম্ভ[২৩]।

এই ত্রিশটি বুকুর নাম হইল: (১) সিন্ত (২) লন্দেপ (৩) বুকির (৪) কুরন্তিল (৫) তোলু (৬) গুমব্রেগ (৭) বরিগ অলিৎ (৮) বরিগ অগুঙ্গ (৯) জুলুঙ্গ বঙ্গি (১০) সুঙ্গ সঙ্গ (১১) গলুঙ্গন (১২) কুনিঙ্গন (১৩) লঙ্‌কির (১৪) মন্দসিজ (১৫) জুলুঙ্গ পুজুৎ (১৬) পহঙ্গ (১৭) কুরু ব্লুৎ (১৮) মরকিহ্‌ (১৯) তম্বির (২০) মেড়ঙ্গ কুঙ্গন্‌ (২১) মকৃতল (২২) বুয়ৈ (২৩) মনহিল (২৪) প্রঙ্গ বকৎ (২৫) বল (২৬) বুগু (২৭) বয়ঙ (২৮) কুলবু (২৯) ডুকুৎ (৩০) বতু গুনুঙ্গ[২৪]।

উপরে আমরা যে ভারতীয় বিভিন্ন মাসের নাম পরিবেশন করিয়াছি তাহা একদা দক্ষিণ সিলিবিসে অত্যন্ত বিকৃতরূপে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু উহা এখন আর বর্তমান নাই[২৫]।

পঞ্চবার এবং সপ্তবারের উল্লেখ বরিগশাস্ত্রে প্রায়শঃই দেখা যায়। ৩৯৮১ (৪) নং পুঁথিতে উভয়েরই উল্লেখ আছে[২৬]; ৪৬৬০ এবং ৪৯৮৩ সংখ্যক পুঁথিতে সপ্তবারের উল্লেখ আছে[২৭]। ৪৬৬০ নং পুঁথিতে লেখা আছে যে এই সাতদিনের প্রত্যেকটির একজন করিয়া অধিপতি আছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হইয়াছে যে প্রথম দিনের অধিপতি একজন দেবতা, দ্বিতীয় দিনের অধিপতি একজন মানুষ, তৃতীয় দিনের অধিপতি একটি বৃক্ষ, চতুর্থ দিনের অধিপতি একটি পক্ষী, পঞ্চম দিনের অধিপতি বুত (=ভূত) এবং ষষ্ঠ দিনের অধিপতি হইল একটি সত্ত্ব (পশু)। সপ্তম দিনের অধিপতির নাম এই পুঁথিতে দেওয়া হয় নাই। সুন্দরি তেরুস্ এবং সুন্দরি বুঙ্গকহ্ নামক গ্রন্থগুলিও বরিগশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক যুগে যবদ্বীপের মুসলমানেরা প্রাক্মুসলিম যুগ বুঝাইতে জমন-বুদ বা বুদ্ধ-সম্বৎ শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকে।

যবদ্বীপের লেখকগণ বৎসর বুঝাইতে ব্যাপকভাবে চন্দ্রসঙ্কল ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি রাজ কপ কপের মতানুযায়ী ইহার জ্ঞান শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। ৩৯৮১ (৩)-নং পুঁথিতে চন্দ্রসঙ্কলের একটি বিষদ বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা আছে। উহাতে আমরা পড়িতেছি[২৮]:

চন্দ্র, শশি (=শশী), জন্ম (=চন্দ্র, মানুষ)			=এক
নেত্র, চক্ষু, নয়ন	...	...	=দুই
বহ্নি, পাবক ইত্যাদি	...	...	=তিন
বেরঙ্গ, সাগর ইত্যাদি	...	...	=চারি
ভূত, পাণ্ডব, তলগ (=তড়াগ) ইত্যাদি			=পাঁচ
রস, যড়রস ইত্যাদি	...	...	=ছয়[২৯]

এই চন্দ্রসঙ্কল যে বৎসরের সংখ্যা বুঝাইতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইত তাহার স্বাক্ষর প্রাচীন যবদ্বীপীয় গ্রন্থগুলিতে রহিয়া গিয়াছে। দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া বাবাটেকান হইতে একটা তালিকা পরিবেশন করিতেছি। প্রথমতঃ ইহা উপরোক্ত মন্তব্যের পরিপোষক; দ্বিতীয়তঃ ঐ তালিকায় যবদ্বীপীয় কতকগুলি বিখ্যাত গ্রন্থ ও তাহার লেখকগণের নাম সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। উহাতে আমরা পড়িতেছি:

(ক) রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন স্পু যোগীশ্বর;
রচনাকাল: "ষষ্ঠি জন শুদ্ধ মনঃ"—অর্থাৎ ১০১৩ শকাব্দ

(খ) ভোমকাব্য রচনা করিয়াছেন স্পু ব্রদহ্;
রচনাকাল: "সঙ্গঙ্গ্ অবক্ কিলঙ্গো মুর্তি" অর্থাৎ ১০১৯ শকাব্দ।

(গ) সুমনসান্তক রচনা করিয়াছেন স্পু মোনগুণ;
রচনাকাল: "শুদ্ধ ত্রেত্ত বর হির" অর্থাৎ ১০২০ শকাব্দ।

(ঘ) স্মরদহন রচনা করিয়াছেন স্পু ধর্মজ;
রচনাকাল: "জনাঙ্গরেঙ্গো বিন্দু বচন" অর্থাৎ ১০২১ শকাব্দ।

(ঙ) অর্জুনবিবাহ রচনা করিয়াছেন স্পু কণ্ব;

রচনাকাল : "নয়কাঙ্গ্‌রেঙ্গো বিন্দু বোঙ্গ" অর্থাৎ ১০২২ শকাব্দ।

(চ) অর্জুনবিজয় রচনা করিয়াছেন স্পু তন্তুলার ;
রচনাকাল : "হতো তুন গুরু বাক্‌" অর্থাৎ ১০৩১ শকাব্দ।

(ছ) কৃষ্ণায়ন রচনা করিয়াছেন স্পু ত্রিগুণ ;
রচনাকাল : "বক্‌ বর্ণ নানির" অর্থাৎ ১০৪১ শকাব্দ।

(জ) লুব্ধক রচনা করিয়াছেন স্পু তানাকুঙ্গ ;
রচনাকাল : "নোর প্রপঞ্চ পেতেঙ্গ হতি" অর্থাৎ ১০৫০ শকাব্দ।

(ঝ) ঘটোৎকচাশ্রয় রচনা করিয়াছেন স্পু পমুলুহ্‌ ;
রচনাকাল : "ইকু তুন রস বক্‌" অর্থাৎ ১০৬১ শকাব্দ।

(ঞ) পার্থযজ্ঞ রচনা করিয়াছেন স্পু বিদ্যাত্মক ;
রচনাকাল : "হেন্নু বিকু ঙম্বরে লেমঃ" অর্থাৎ ১০৭৫ শকাব্দ।

(ট) ভারতযুদ্ধ রচনা করিয়াছেন……[৩০] ;
রচনাকাল : "সঙ্গ কুদ সুদ্ধ চন্দ্রম" অর্থাৎ ১০৭৯ শকাব্দ।

(ঠ) উসন বলি রচনা করিয়াছেন নিরর্থ ;
রচনাকাল : "বুয়ৎ বলি বংশ প্রভু" অর্থাৎ ১১৪১ শকাব্দ।

বাবাটেকান-লেখকের তারিখ অনেক ক্ষেত্রেই ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে ; সুতরাং অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত উহা নির্বিচারে গ্রহণ করা সমীচীন নহে। আমরা এইস্থলে কেবলমাত্র চন্দ্রসঙ্কল ব্যবহারের কয়েকটি নিদর্শন উপস্থাপিত করিলাম ; এই উপলক্ষ্যে দ্বীপময় ভারতের কয়েকখানি বিখ্যাত গ্রন্থ ও তাহাদের রচয়িতার নামও আমাদের পরিচিত হইয়া গেল। এই সমস্ত তারিখের ঐতিহাসিক মর্যাদা কতদূর তাহা আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে পুনরায় আলোচনা করিব। কবি-গ্রন্থগুলি হইতে আমরা আর চন্দ্রসঙ্কলের দৃষ্টান্ত উৎকলিত করিতেছি না, কারণ তাহাদের সংখ্যা অজস্র।

জাভা এবং বলিদ্বীপের জনসাধারণও চম্পাদেশের[৩১] লোকদের মত বিভিন্ন 'যুগে' বিশ্বাস করিত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে চারিটি যুগের নামই উল্লিখিত হইয়াছে ; আরো অনেক প্রাচীন যবদ্বীপীয় গ্রন্থে বিভিন্ন যুগের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ কলিযুগের ভয়াবহ বিবরণ প্রাচীন যবদ্বীপীয় মৌসলপর্বে প্রদত্ত হইয়াছে[৩২]। প্রাচীন যবদ্বীপীয় আদিপর্বে[৩৩] কলিযুগের উল্লেখ করা হইয়াছে। ত্রেতাযুগের কথাও ঐ গ্রন্থের[৩৪] অপর একস্থলে এবং চণ্টকপর্ব নামক আর একটি প্রাচীন যবদ্বীপীয় গদ্যগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে[৩৫]। উত্তরকাণ্ড নামক গদ্যগ্রন্থখানিও ত্রেতাযুগের উল্লেখ করিয়াছে। দ্বাপরযুগের কথা প্রাচীন যবদ্বীপীয় আদিপর্ব[৩৬], সুমনসান্তক[৩৭] প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সময়ের যে বিভাগটিকে ভারতীয় সাহিত্যে কল্প বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার উল্লেখও প্রাচীন যবদ্বীপীয় আদিপর্বে আছে[৩৮]। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত যদৃচ্ছভাবে যবদ্বীপীয় সাহিত্য হইতে সঙ্কলিত করা হইয়াছে ; সুতরাং ইহাদের সংখ্যার বাহুল্য সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা হইতে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে কল্প

এবং যুগের যে প্রকার সময় বিভাগ ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল (অন্ততঃ পৌরাণিক সাহিত্যে) দ্বীপময় ভারতেও তাহা নিতান্ত অপরিজ্ঞাত ছিল না। যবদ্বীপের প্রাচীন গ্রন্থে, বিশেষতঃ তাম্রশাসন এবং শিলালেখগুলিতে, আমরা বৎসর এবং মাসের বিভিন্ন বিভাগের সহিত সর্বদাই পরিচিত হইয়া থাকি। ভারতীয় তিথিগুলি, যেমন একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, পুর্ণিমা, অমাবস্যা, নক্ষত্র এবং গ্রহের সংস্থান প্রভৃতি বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শিলালিপি-তাম্রশাসনে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে ভারতবর্ষে সময় হিসাব করিবার বিভিন্ন প্রণালী দ্বীপময় ভারতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছিল।

আমরা এইবার দ্বীপময় ভারতের জ্যোতিষচর্চার কাহিনী আলোচনা করিব। যবদ্বীপ এবং বলিদ্বীপে প্রাপ্ত কোন কোন পুঁথিতে নক্ষত্র এবং রাশির অবস্থান পর্যবেক্ষণ করিয়া দিন ও রাত্রির শুভ ও অশুভক্ষণ নির্ধারণের প্রণালী আলোচনা করা হইয়াছে। ৫২৩৩ নং পুঁথির প্রথমাংশে মুহূর্তলক্ষণ আলোচনা করা হইয়াছে ; দ্বিতীয়াংশে মুহূর্তলক্ষণ বিধিশাস্ত্রের আলোচনা করা হইয়াছে এবং তৃতীয়াংশে আলোচনা করা হইয়াছে শুভাচার দিবস বিদ্যাশাস্ত্রের[৩৯]। জাভা এবং বলিদ্বীপের অধিবাসীরা বিশ্বাস করিতেন যে দিনের মধ্যে পাঁচটি ক্ষণ বিদ্যমান যথা, অমৃত, শূন্য, কাল, পতি এবং লিন্যোক। বলা হইয়াছে যে কেহ অমৃতক্ষণে জন্মগ্রহণ করিলে সৌভাগ্যবান হন, শূন্যক্ষণে জন্মগ্রহণ করিলে দরিদ্র, কালক্ষণে জন্মগ্রহণ করিলে রিপুর বশীভূত, পতিক্ষণে জন্মগ্রহণ করিলে মৃত্যু অবধারিত এবং লিন্যোকক্ষণে জন্মগ্রহণ করিলে লম্পট হইয়া থাকেন। একখানি চেরিবন-পুঁথিতে[৪০] বিভিন্ন রাশির নাম ঈষৎ বিকৃতরূপে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে ; উহাদের নাম মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনঃ, মকর, কুম্ভ এবং মীন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন যবদ্বীপীয় অগস্ত্যপর্বে[৪১] জ্যোতিষবিদ্যা সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে আরো বলা হইয়াছে যে আকাশের ২৭টি নক্ষত্রই দক্ষ এবং অসিকতিকির কন্যা এবং কৃত্তিকা, পুর্ণবসু (পুনবসু), বিশকা (বিশাখা), মুলা, মঘা প্রভৃতি নক্ষত্র দক্ষ অসিকতিকির সন্তান। এইস্থলে নক্ষত্রগুলির নাম এবং সংখ্যা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই প্রসঙ্গে ছায়াপথ এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের কথাও বলা হইয়াছে।

শুভদিনে এবং শুভক্ষণে পূজাপার্বণ, ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি আরম্ভ করিবার জন্যই জ্যোতিষশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। বোর্ণিওর বটকগণের মধ্যেও ভবিষ্যৎ গুনিবার জন্য দিনকে পাঁচটি মুহূর্তে বণ্টন করা হইয়াছে। কার্যে সুফল লাভ করিবার জন্য এই পাঁচটি পোরমমিস বা শুভ মুহূর্তকে জানা একান্তভাবে প্রয়োজন। এই পাঁচটি মুহূর্তের মধ্যে প্রথমটি হইল মমিস এবং ইহা হইতেই স্বদেশী পোরমমিস শব্দের উৎপত্তি। পরবর্তী নামগুলি যথাক্রমে হইল : হল, সোরি, বোর্ম, বিগ্নু। এইগুলি সংস্কৃত কাল, শ্রী, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু শব্দের বিকৃতরূপ এবং ইহার সহিত মালয় কেটিক লিম বা পাঁচ মুহূর্তের তুলনা করা যাইতে পারে। এইস্থলে প্রথম মুহূর্ত হইল মহেশ্বর[৪২]। এতদ্ব্যতীত বটকেরা পঙ্গোর্দা-নামক একপ্রকার রাশিচক্র (diviners' table) ব্যবহার করিয়া থাকে শুভমুহূর্তগণনা করিবার জন্য। এই পঙ্গোর্দার আটটি নামের মধ্যে অধিকাংশই সংস্কৃত। যথা মুসিহ (মূষিক), গোর্দ (গৃধ্র)

ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত তাহারা যে বারটি রাশি ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ভারতীয়, যথা মেস (মেষ), মোরসিব (বৃষভ), নিতুন (মিথুন), হরহত (কর্কট), সিঙ্গ (সিংহ), কন্যা, তুলা, মোরতিহ (বৃশ্চিক) ধনু, মহর (মকর), কুম্ভ, মেন (মীন)।

জ্যোতির্বিদ্যা, বিশেষতঃ গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে যবদ্বীপীয় পণ্ডিতগণের জ্ঞানের পরিমাপ করা যায় যবদ্বীপের অনুশাসনলিপিগুলি হইতে। অনুশাসনগুলির রচনায় এবং পূজা-পার্বণ উপলক্ষ্যে জ্যোতির্বিদ্যা গভীর নিষ্ঠার সহিত অধ্যয়ন করার প্রয়োজন ছিল। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই আমার বক্তব্য আরো সুপরিস্ফুট হইবে। ৭৩২ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর বেলা ১টার সময় একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবার সময় একটি শিলালিপি উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। সেই শুভক্ষণটির বর্ণনা দিয়াই শিলালিপিটি আরম্ভ হইয়াছে। লিপিটির ভাষা সংস্কৃত :

"শাকেন্দ্রে তিগতে শ্রুতীন্দ্রিয়রসৈরঙ্গীকৃতে বৎসরে বারেন্দৌ ধবল ত্রয়োদশিতিথৌ ভদ্রোত্তরে কার্তিকে লগ্নে কুম্ভময়ে স্থিরাংশবিদিতে প্রাতিষ্ঠিপৎ পর্বতে লিঙ্গম্ লক্ষণলক্ষিতন্নরপতিশ্‌শ্রীসঞ্জয়শ্‌শান্তয়ে[৪৩] ॥"

৮২৪ এবং ৮২৫ শকাব্দের পঙ্গুমুলন (কেম্বঙ্গ আরুম) তাম্রলেখের আরম্ভেই আমরা পড়িতেছি : "স্বস্তি শকবর্ষাতীত ৮২৪ পৌষ মাস তিথি দশমি কৃষ্ণ পক্ষ, তুঙ্গলে, কলিবুয়ন, সোমবার, দক্ষিণস্থ, জৈষ্ঠনক্ষত্র, মিত্রদেবতা সুকর্মাযোগ[৪৪]।"

এইবার আমরা দুই একখানি বরিগশাস্ত্রের গ্রন্থ আলোচনা করিব। ৫০৫৩ নং পুঁথি বরিগশাস্ত্রের একখানি গ্রন্থ ; ইহার অন্তে লেখা আছে "ওম্ বিষ্ণু কুমারমূর্তি ষ নমঃ স্বাহা" ইত্যাদি। ৪৬৫৬ নং পুঁথিখানির প্রারম্ভে লেখা আছে "ইতি ত্রিলিঙ্গ[৪৫]।" আর একখানি বরিগশাস্ত্রের (৪৬৬২ নং পুঁথি) বইয়ের প্রারম্ভে আমরা পড়িতেছি "ওম্ অবিঘ্নম্ অস্তু সিদ্ধা[৪৬]।" ৩৯৮১ (৪) নং পুঁথিতে সাতটি দেবতার নাম দেওয়া হইয়াছে ; তাঁহারা হইলেন শ্রী, ইন্দ্র, গুরু, যম, লুদ্র (=রুদ্র), ব্রহ্ম (=ব্রহ্মা) এবং উমা। এই পুঁথিখানিও বরিগশাস্ত্র সম্বন্ধীয়[৪৭]। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দেবদেবীকে এই সমস্ত গ্রন্থের রচয়িতাগণ গ্রন্থারম্ভে বা শেষে আবাহন করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় কোন বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায় এই বরিগশাস্ত্রের উদ্ভাবয়িতা নহেন। তবে ইহা লক্ষ্যণীয় যে, যে-সমস্ত বরিগশাস্ত্রের গ্রন্থ আমরা উপরে আলোচনা করিয়াছি, তাহার মধ্যে (অন্ততঃ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করিয়া যাহা মনে হয়) ঐশ্লামিক প্রভাব অনুপস্থিত। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থগুলি পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে।

দ্বীপময় ভারতে জ্যোতির্বিদ্যা কিরূপে কোথা হইতে প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা নির্ণয় করা বর্তমানে দুঃসাধ্য। ইহা সাক্ষাৎভাবে ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছে অথবা দক্ষিণপূর্ব এসিয়ার কোন দেশের মাধ্যমে ইহা দ্বীপময় ভারতে সম্প্রসারিত হইয়াছে তাহা আজ আর বলিবার উপায় নাই। তবে ইহার আবির্ভাব এবং প্রসার সম্বন্ধে বলিদ্বীপে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তাহাতে ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বরিগশাস্ত্র ভারতবর্ষ হইতেই সাক্ষাৎভাবে দ্বীপময় ভারতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

বলিদ্বীপের যে গ্রন্থখানিতে এই কিম্বদন্তী লিপিবদ্ধ আছে তাহার নামও বরিগ। ইহার ভাষা সম্পূর্ণরূপে বলিদ্বীপীয় ভাষা নহে[৪৮]। বুলেবুগের পুরোহিতগণের মতানুযায়ী এই বরিগের রচয়িতা ছিলেন সঙ্গ যঙ্গ লিচিন[৪৯]। এই বরিগের মূল কাহিনীটি সংস্কৃত মহাভারতে আছে এবং এই বিজ্ঞানের যাত্রা যে ভারতবর্ষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। এই কিম্বদন্তীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

একদা ভগবান সেমিতির পিতা মেতপ এক পর্বতশিখরে মহাতপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। একদা প্রবু পরিকেসিৎ (=প্রভু পরীক্ষিৎ) একটি হরিণের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে তাঁহার আশ্রমে আগমনপূর্বক কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি গভীর তপস্যায় নিমগ্ন থাকার জন্য তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা ঋষির কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া একটি সর্প নিক্ষেপ করিলেন এবং রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সর্পটি নাগ তক্ষক ব্যতীত আর কেহই ছিলেন না ; সুতরাং তিনি এইরূপভাবে নিপীড়িত হইয়া প্রবু পরিকে-সিৎকে (পরীক্ষিৎ) উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। প্রবু নাগের সঙ্কল্পের কথা জানিতে পারিয়া পরিকেসিৎ নিজেকে সুরক্ষিত করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিলেন। তিনি ইদজ্-গদে বা শ্রেষ্ঠ পুরোহিতগণকে প্রশ্ন করিয়া সর্পের সম্ভাব্য আগমনকাল সম্বন্ধে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিলেন। পুরোহিতগণ তাহাদের বরিগশাস্ত্র আলোচনা করিয়া সর্পের আগমনকাল সম্বন্ধে একটি সম্ভাব্য সময় নির্ধারণ করিয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হইল। এই ব্যর্থতার কারণ হইল যে নাগ তক্ষক মহারাজের বিপুল আয়োজনের কথা জানিতে পারিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তিনি প্রকৃতরূপে দেখা দিলে ব্যর্থকাম হইবেন। সুতরাং এই অবস্থায় কি করা কর্তব্য তাহা জানিবার জন্য তিনি সর্পরাজ অনন্তভোগের সঙ্গে পরামর্শ করিতে সপ্তপাতালে গমন করিলেন। অনন্তভোগ নাগ তক্ষককে একটি জম্বুদলের মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া স্বয়ং পুরোহিতবেশে প্রবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। অজ্ঞাত কুলশীল ঋষিকে দর্শন করিয়া প্রভু তাঁহার পরিচয় এবং আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষি বলিলেন যে তিনি ব্রাহ্মণ এবং তিনি মহারাজকে আশীর্বাদ করিবার জন্য কয়েকটি ফলমূল লইয়া পর্বত হইতে আগমন করিয়াছেন। প্রবু ফলের মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া উহা মুখের কাছে লওয়া মাত্র তক্ষক কর্তৃক দষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পুরোহিতগণ সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে না পারায় পরিকেশিতের পিতা জনমেজয় (!) তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হইলেন এবং তাঁহাদের মূল্যহীন বরিগশাস্ত্র অগ্নিদগ্ধ করিয়া বিনষ্ট করিবার আদেশ দিলেন। এই আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল, কিন্তু দমকা হাওয়ার স্রোতে বরিগের কয়েকটি পৃষ্ঠা বলিদ্বীপে উড়িয়া চলিয়া গেল।

আমরা বলিদ্বীপের কিম্বদন্তীর যে বৃত্তান্ত উপরে পরিবেশন করিয়াছি তাহার শেষের লাইনটিতে বরিগশাস্ত্রের উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিত আছে। ইহা নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিতেছে।

পা দ টী কা

১. ২।৭।১৬

২. *Cambridge Ancient History*, vol. III, *The Assyrian Empire*, p. 240.

৩. Gonda, *Sanskrit in Indonesia*, p. 190

৪. ঐ, পৃঃ ১৯১

৫. দ্রষ্টব্য : Gonda, *op. cit.*, p. 190.

৬. *BKI* 1883, *p.* 151.

৭. Juynboll, *Supplement* dl. II, p. 250 ff.

৮. ঐ

৯. ঐ

১০. ঐ

১১. ঐ

১২. Goris in *Djawa*, 1937, p. 281 , Gonda, *op cit* , p. 192 f.n. 32.

১৩. *Op. cit.*, p. 192.

১৪. নাগরকৃতাগমের ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গে পরমেশ্বরীকে সুষুম্না দেবীর সহিত, পজঙ্গের রাজকুমারীকে ইড়ার সহিত এবং লসেমের রাজকুমারীকে পিঙ্গলার সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

১৫. *New History of the T'ang Dynasty.* Vide Groeneveldt, *Notes on the Malay Archipelago and Malacca.*

১৬. *OJO* 1, p. 14.

১৭. এইস্থলে ধর্মসংক্রান্ত রাজকর্মচারী অর্থে ধর্মমহামাত্র শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।

১৮. Vide pigeaud, *Java in the 14th Century*, IV, p. 400.

১৯. *KBNWdb* : Sub. voce : *Tampad*

২০. Levi, *Sanskrit Texts from Bali*, p 66

২১. *KBNWdb* : Sub. voce : *Titir.*

২২. Crawfurd, *Asiatic Researches*, XIII, p. 148.

২৩. Raffles, *History of Java*, I (1830) pp. 531 ff.

২৪. Vide Pigeaud, *Jav-Neder. Handwoordenboek*, p. IX ; Damais in *BEFEO* 47 (1955) pp. 252 ff.

২৫. Gonda, *op. cit.*, p. 201.

২৬. Juynboll, *Supplement* dl. II, pp. 289-90

২৭. *Ibid* pp. 229, 237.

২৮. ঐ, পৃঃ ২৮৭।

২৯. ইহার সুবিস্তৃত তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য : Pigeaud, *Jav.-Neder Handwoordenboek*, pp. XI-XII.

৩০. এইস্থলে হইবে স্পু সেড়হ্।

৩১. R. C. Majumdar, *Champā*, pp. 206-7.

৩২. Juynboll, *Drie boeken van het Mahabharata*, etc., Mausalaparva pp. 128-131.

৩৩. আদিপর্ব, ৩।

৩৪. আদিপর্ব, ২।

৩৫. চণ্টকপর্ব, ২০৬।

৩৬. আদিপর্ব, ৩।

৩৭. সুমনসান্তক ১।৪।

৩৮. আদিপর্ব, ৩৬।

৩৯. Juynboll, *Supplement* dl. II.

৪০. Raffles, *History of Java*, vol. I, p. 534.

৪১. Pigeaud, *De Tantu Panggĕlaran*, 1924, pp. 319-20 ; It has since been edited by Gonda.

৪২. Gonda, *op. cit.*, p. 201.

৪৩. সবশেষ সংস্করণ লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। দ্রষ্টব্য : *JAS* I (1959) pp. 183 ff.

৪৪. *OV*, 1925, Bijl B, pp. 41-49. এই তাম্রলিপির অনুবাদ সহ বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ বিবরণ আমি অন্যত্র প্রকাশ করিয়াছি। দ্রষ্টব্য : *JGIS*, vol. V, 1938.

৪৫. Juynboll, *Supplement* dl. II, p. 225.

৪৬. ঐ, পৃঃ ২৩৩।

৪৭. ঐ, পৃঃ ২৯০।

৪৮. Cf. Van Eck in *BKI*, 1883, p 154

৪৯. ঐ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

একাদশ অধ্যায়

ইতিহাস বা মহাকাব্য (প্রথম পর্যায়)

রামায়ণ কাকাবিন

বাল্মীকির রামায়ণ এবং ব্যাসদেবের মহাভারত সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। রামায়ণের কোন কোন নাম ঋগ্বেদে পর্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন: ইক্ষ্বাকু, দশরথ, রাম প্রভৃতি। বর্তমানে যে সংস্কৃত রামায়ণ প্রচলিত আছে তাহাতে প্রাক্-বৌদ্ধযুগের কিছু কিছু উপাদান বিদ্যমান। শ্রাবস্তী, রাজগৃহ এবং কৌশাম্বী বৌদ্ধ যুগের বিখ্যাত নগর, কিন্তু ইহার স্থাপনের কাহিনী আমরা রামায়ণেই শুনিতে পাই[১]। ওয়েবার সাহেব[২] অনুমান করেন যে রামায়ণের আদিম রূপটি বৌদ্ধ আখ্যায়িকা দশরথ-জাতকে[৩] নিহিত রহিয়াছে। এই দশরথ জাতকের কাহিনীভাগ বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহণ করিয়া ভারহুত এবং সাঁচীস্তূপের (খৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতক) প্রাচীরগাত্রে রূপায়িত হইয়াছে। দশরথজাতক রচিত হওয়ার সময় রাম আখ্যায়িকা কোন নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করে নাই, কারণ ইহাতে দক্ষিণের রাক্ষসদিগের কোন উল্লেখ নাই এবং সীতা এখানে দশরথের কন্যা হিসাবে বর্ণিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষাংশে সম্ভবতঃ সংস্কৃত-রামায়ণ বর্তমান রূপ পরিগ্রহণ করে এবং কাহিনীটি ভারতের মধ্যভাগ হইতে চতুষ্পার্শ্বে বিস্তৃত হইতে থাকে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক সিলভা লেভী[৪] রাম কাহিনীর চৈনিক সংস্করণের সংবাদটি জনসমক্ষে প্রচারিত করেন। তিনি বলিয়াছেন যে ১২১টি অবদান সংগ্রহের মধ্যে প্রথমটি হইল কি-কিঅ-য়ে এবং উহা রামের কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহার তারিখ ৪৭২ খৃষ্টাব্দ। ইহা অনেকাংশে দশরথ-জাতকের অনুরূপ, কারণ ইহাতে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের কাহিনী নাই; সুতরাং রাম এবং লক্ষ্মণের লঙ্কা অভিযানের বিবরণ এই পটভূমিকায় নিতান্তই বাহুল্য। এই গল্পের মূল আখ্যায়িকাভাগ হইল দুই ভ্রাতার বনবাস এবং এইস্থল হইতে প্রত্যাবর্তন। এই সংস্করণে দশরথের নাম দেওয়া হইয়াছে চেউ-চে, রামের নাম হইয়াছে লো-মো লক্ষ্মণের নাম হইয়াছে লো-মন ইত্যাদি। জাতক কাহিনীগুলির অপর একটি চৈনিক সংস্করণে এই আখ্যায়িকাটিই অন্যরূপে পরিবেশিত হইয়াছে। সগডিয়ানার একজন সন্ন্যাসী ২২২-২৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই জাতকগুলির চীনা অনুবাদ নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। যদিও এই সংস্করণে রামায়ণের নায়ক-নায়িকাগণের নাম দেওয়া হয় নাই, তথাপি ইহা বাল্মীকি রামায়ণের অধিকতর নিকটবর্তী, কারণ ইহাতে রাম-সীতার বনবাস, রাবণ কর্তৃক সীতা অপহরণ, জটায়ু এবং রাবণের যুদ্ধ, বালি এবং সুগ্রীবের দ্বৈত সংগ্রাম, সেতুবন্ধন, সীতার

অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি ঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই কাহিনী কেবল যে চীন দেশেই প্রচলিত ছিল তাহা নহে। ডঃ এফ্. ডব্লিউ টমাস[৫] চীনা তুর্কীস্থান হইতে এই কাহিনীর একটি তিব্বতী সংস্করণও আবিষ্কার করিয়াছেন ; ইহার রচনাকাল ৭ম হইতে নবম শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে হইবে। ইহা নির্বিচারে বালকাণ্ড হইতে উত্তরকাণ্ড পর্যন্ত উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু ঘটনাগুলি বাল্মীকির রামায়ণ হইতে অনেকাংশে পৃথক। বস্তুতঃ ডঃ টমাস বলিয়াছেন "এই কাহিনীটির রূপ এবং বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় এবং ইহাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিতার চরণগুলি রচনারীতিতে এবং ভাবের দিক দিয়া সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়। কিন্তু আমরা যদি এই রামায়ণের এমন কোন ভারতীয় সংস্করণ খুঁজিতে চাই যাহার সহিত ইহার গভীর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইতে পারে তাহা হইলে আমরা ব্যর্থমনোরথ হইব। এই রামায়ণের কাহিনীটি অনেকাংশে মহাভারতানুসারী (বনপর্ব, অধ্যায় ২৭০-২৯০), কিন্তু ঘটনা এবং নামের দিক দিয়া উভয়ের বৈসাদৃশ্য অত্যন্ত ব্যাপক ; ইহাকে অদ্ভুতও বলা যাইতে পারে।"[৬]

রামায়ণের কাহিনী দক্ষিণ পুর্ব এসিয়ায় বিশেষভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ভীল কস্তেলের অনুশাসনলিপিতে[৭] বলা হইয়াছে যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে কাম্বোডিয়ার একটি মন্দিরে রামায়ণ, (মহা)ভারত এবং পুরাণ প্রতিদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে পাঠ করা হইত। চম্পারাজ্যের ত্রা-কিয়েন নামক স্থানে রাজা প্রকাশধর্ম (আনুমানিক ৬৫৩-৬৭৯ খৃষ্টাব্দ) একটি প্রতিমূর্তি এবং মন্দির রামায়ণের লেখক বাল্মীকির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত করেন। এই অনুশাসন-লিপিটিতে বাল্মীকিকে বিষ্ণুর অবতাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে কথিত হইয়াছে যে বাল্মীকি দুঃখে যে শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা ব্রহ্মা কর্তৃক নন্দিত হইয়াছিল :

"যস্য শোকাৎ সমুৎপন্নম্ শ্লোকম্ ব্রহ্মাভিপুজতি
বিষ্ণোঃ পুংসঃ পুরাণস্য মানুষস্যাত্মরূপিণঃ।"[৮]

এই শ্লোক চক্রবাক-দম্পতীর মিথুনলগ্নে একটির মৃত্যু হওয়াতে স্বতঃউৎসারিত বেদনা সঞ্জাত প্রথম শ্লোক : ভারতের প্রথম মহাকবির প্রথম ছন্দোময় বাণী :

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম শাশ্বতী সমা—"

এই অনুশাসনলিপিটিতে বাল্মীকি-ব্রহ্মা সাক্ষাৎকারের যে ইঙ্গিত পাইতেছি তাহা রামায়ণের বালকাণ্ডের অনুরূপ কাহিনীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই রাজার মাইসন অনুশাসনলিপিতে বাল্মীকির রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একটি ঘটনার ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং চম্পাতে ৭ম শতাব্দীতে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয়। আঙ্কোরভাট, বাপুয়ন প্রভৃতি মন্দিরের প্রাচীরগাত্রেও রামায়ণ কাহিনীর অনেক বিষয়বস্তু উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাইতেছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণের আলোচনা করিব, কারণ যবদ্বীপের বিভিন্ন সংস্করণগুলির মধ্যে ইহাই সর্ব-প্রাচীন এবং বাল্মীকি রামায়ণের অধিকতর নিকটবর্তী। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে আলোচ্য গ্রন্থটি রচিত হইবার পুর্বেই রামায়ণ কাহিনী যবদ্বীপে সুপ্রচলিত হইয়াছিল। প্রাম্বানানে ইহার পরিচয় রহিয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত নবম শতাব্দীর পুর্বে মধ্যযবদ্বীপে যে-

সমস্ত অনুশাসনলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহার মধ্যেও স্থলে স্থলে রামায়ণের নায়ক-নায়িকাগণের নাম পাইতেছি।

দক্ষিণ পুর্ব এসিয়ায় রামায়ণের অনেকগুলি সংস্করণ প্রচলিত আছে। থাইল্যাণ্ডের রামকিয়েন নামক রাম-কাহিনীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা মালয় সাহিত্যের হিকায়ৎ সেরি রামের মতই জনপ্রিয়। সেরৎরম নামক গ্রন্থটিও যবদ্বীপে বিভিন্ন অনুবাদের মাধ্যমে সুপ্রচলিত আছে। এই বিভিন্ন সংস্করণগুলি সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। বর্তমানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই গ্রন্থের ১২০০টি পুর্ব-যবদ্বীপীয় সংস্করণ আছে; ইহা হইতে যবদ্বীপে রামায়ণের প্রভাব অনুমিত হইতে পারে[৯]। এই সমস্ত সংস্করণের মধ্যে যোগীশ্বরের কাকাবিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; সুতরাং এই কাব্যটির এইস্থলে আলোচনা করিতেছি।

ভারতবর্ষে সংস্কৃত রামায়ণের অন্ততঃ তিনটি সংস্করণ বিদ্যমান আছে, যথা (১) বঙ্গদেশীয় সংস্করণ (২) কাশ্মীরী সংস্করণ (৩) এবং আর একটি সংস্করণ যাহাকে ইয়াকবি গ-সংস্করণ আখ্যা দিয়াছেন। বর্তমানে যে রামায়ণটি বাল্মীকির নামে প্রচলিত আছে উহাতে সাতটি কাণ্ড আছে এবং উহার প্রত্যেকটি কাণ্ড আবার বিভিন্ন সর্গে বিভক্ত হইয়াছে। যোগীশ্বরের প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণ কাকাবিনটি ২৬টি সর্গে বিভক্ত এবং উহাতে ২৭৭৪টি শ্লোক আছে। ইহা মূল রামায়ণের মত সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত নহে; ইহার সর্গগুলি বিভিন্ন ভারতীয় ছন্দে বিরচিত হইয়াছে[১০]। ডঃ পূর্বচরকের মতানুযায়ী ষষ্ঠ, দ্বাদশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ, ত্রয়োবিংশ, চতুর্বিংশ, পঞ্চবিংশ এবং ষড়বিংশ সর্গের কোন কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে শেষোক্ত তিনটি সর্গে ইহার বাহুল্য অসাধারণ[১১]। বস্তুতঃ কার্ণ যবদ্বীপীয় রামায়ণের শতকরা চারিভাগ, য়ুইনবল ছয়ভাগ এবং পুর্বচরক আটভাগ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। এই অভিমত অবশ্য সকলে গ্রহণ করেন নাই এবং ভট্টিকাব্যের সহিত যবদ্বীপীয় রামায়ণের তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহাদের কাহারো কাহারো অভিমত অতিরঞ্জিত।

শেষ সর্গের ৪৯ সংখ্যক শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া য়ুইনবল অনুমান করিয়াছিলেন যে এই কাব্যের লেখক শৈব মতাবলম্বী ছিলেন। বস্তুতঃ এই কাব্য পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ইহাতে[১২] দশরথকে শিবের উপাসকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে; রাবণ যখন সীতাকে অপহরণ করিতে আগমন করেন তখন তাঁহার শৈব বেশ। অবশ্য এই শৈব ছদ্মবেশে পাশুপত সম্প্রদায়ের লক্ষণ ছিল না, কারণ তপস্বী রাবণের দেহে ভস্মের প্রলেপ বিদ্যমান ছিল না। সম্ভবতঃ লেখক ছিলেন তান্ত্রিক শৈব; যোগীশ্বর নামটিও ইহার স্বাক্ষরবহ; এই সম্বন্ধে পরে আরো আলোচনা করিব। এস্থলে এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ করা প্রয়োজন যে সংস্কৃত ভট্টিকাব্যেও শৈব প্রভাব বিদ্যমান; সুতরাং যবদ্বীপীয় গ্রন্থ ইহার আদর্শে রচনা করিবার সময়ে যোগীশ্বরও তাঁহার রচনায় শৈব প্রভাবকে বর্জন করেন নাই। বস্তুতঃ ডঃ হুইকাশ মনে করেন যে ভট্টিকাব্য শৈবপরিমণ্ডলে রচিত হওয়ার জন্যই যোগীশ্বর এই কাব্যকে তাঁহার আদর্শ হিসাবে পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন[১৩]।

রামায়ণ কাকাবিনের লেখক যোগীশ্বর নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা সম্ভবতঃ তাহার প্রকৃত নাম ছিল না। শৈব তান্ত্রিকগণ সিদ্ধিমার্গের একটি বিশেষ স্তরে উপনীত হইলেই যোগীশ্বর আখ্যা লাভ করিতেন। বৃহস্পতিতত্ত্বের একস্থলে পরিতেছি : "কুনঙ্গ ইকঙ্ কুয়ঙ্গ্ সিনঙ্গুহ্ উত্তমসিদ্ধি ঙরন্য সঙ্গ্ যোগীশ্বর। সঙ্গ্ উমঙ্গগুহকেন অণিমাদিগুণ ম্ন" অর্থাৎ যিনি উত্তমসিদ্ধি বলিয়া অভিহিত তিনিই যোগীশ্বর। তিনি অণিমা এবং অন্যান্যগুণ লাভ করিয়াছেন[১৪]। রাজপতিগুণ্ডল এবং নাগরকৃতাগমে ইহার বিস্তৃততর ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। রাজপতিগুণ্ডলে আমরা পড়িতেছি: "যাহারা অগ্নিকে লইয়া ধর্মচর্চা করেন তাহাদিগকে যোগীশ্বর এবং দেবগুরু বলা হয়।" ইহার পর যোগীশ্বরগণের বেশভূষা এবং অধিকার বর্ণনা করা হইয়াছে। রাজা কৃতনগর সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে সম্মানিত প্রভু যোগীশ্বরগণের পতপন বা ধর্মানুষ্ঠানের জায়গা রক্ষা করিবেন। কেবল তাহাই নহে ; তিনি যোগীশ্বরকে রক্ষা করিবার জন্য সকলকে আদেশ দিলেন, কারণ "যোগীশ্বর ধূপধুনা প্রজ্বালিত করেন সমস্ত লোকের কল্যাণের জন্য এবং সম্মানিত প্রভুর চিরস্থায়ী রাজত্বের জন্য[১৫]।" রামায়ণে আমরা যে প্রখর শৈব-প্রভাব বিদ্যমান দেখিতেছি তাহার সহিত রামায়ণ লেখকের এই উপাধির যথেষ্ট সঙ্গতি আছে। বলিদ্বীপের কিম্বদন্তী অনুযায়ী[১৬] ম্পু রাজকুসুম এবং কুসুমবিচিত্র অভিন্ন এবং ইনিই যোগীশ্বর নামে প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণের গ্রন্থকার হিসাবে সুপরিচিত। অধ্যাপক কার্ণ[১৭] এই প্রবাদের যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কারণ উভয় নামের মধ্যে কেবলমাত্র কুসুম শব্দটি ভিন্ন আর কোন সামঞ্জস্য বিদ্যমান নাই ; এতদ্ব্যতীত উভয় নামের অভিন্নত্ব প্রমাণ করিবার অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য পৃথক সাক্ষ্যও বিদ্যমান নাই। ইহা অতীব সত্য কথা, কিন্তু যাঁহারা যবদ্বীপের ইতিহাস চর্চা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে যবদ্বীপের লোকেরা তাহাদের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার সময় ঐ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়াই তাঁহাদের নাম পরিবর্তিত করিয়া অপর নাম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের দেশেও গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবার সময় আজিও সাধু ব্যক্তিগণ এইরূপ নাম পরিবর্তন করিয়া থাকেন। সুতরাং রাজকুসুমের কুসুমবিচিত্র হওয়া অথবা কুসুমবিচিত্রের রাজকুসুম হওয়া এবং সর্বশেষে তান্ত্রিক শৈবমত গ্রহণ করিয়া যোগীশ্বর নাম পরিগ্রহণ করা আদৌ আশ্চর্য নহে।

যাহাই হউক এই বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর না হইলেও উপরোক্ত সম্ভাবনার কথা একেবারে অস্বীকার করা চলে না।

যবদ্বীপীয় সাহিত্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশে রামায়ণ কাকাবিনটি অমূল্য সম্পদ, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার রচনাকাল আজ পর্যন্ত সংশয়াতীতরূপে নির্ধারিত হয় নাই। ডঃ ব্র্যাণ্ডেস[১৮] বলিয়াছেন যে সর্বপ্রাচীন কাকাবিনগুলির ভাষা ঐরলঙ্গের (৯৫০ শকাব্দ) অনুশাসনলিপিগুলির ভাষার অনুরূপ, কিন্তু যোগীশ্বরের ভাষায় যে প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর (archaism) রহিয়া গিয়াছে তাহা এই রাজার আমলে পরিলক্ষিত হয় না; বরঞ্চ রাজা সিণ্ডোকের (৮৫১ শকাব্দ) আমলের ভাষার সহিত ইহার যোগসূত্র পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে রামায়ণ-কাকাবিন অন্ততঃ—ইহার মৌলিক আখ্যানভাগ—রাজা সিণ্ডোকের যুগে

রচিত হইয়াছিল। ডঃ পূর্বচরক ব্র্যাণ্ডেসের এই অভিমত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন[১৯]: "রামায়ণে যে শব্দ ও বানান ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা ৮৫০ শকাব্দ বা তাহার পূর্বের মধ্যযবদ্বীপীয় অনুশাসনলিপির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ; ইহা অন্ততঃ ৯০০ শকাব্দের পরবর্তী কালের নহে।" ইহার সমর্থনে তিনি কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন[২০]:

(ক) Hiaat-গুলি প্রাচীনতর অনুশাসনগুলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ:

(খ) স্ত্রীলোককে বুঝাইতে 'অনকৃবি'-শব্দের ব্যবহার সিণ্ডোকের সময়ের অনুশাসন-লিপিগুলিতেই দেখা যায়।

(গ) 'ই'-র স্থলে 'উ'-র ব্যবহার খুব বেশী দেখিতে পাই; সেইরূপে পঙ্গুহ্ এবং লুঙ্গুহ্ (=পঙ্গিহ্ এবং লিঙ্গিহ্)-র ব্যবহার প্রাক্-ঐরলঙ্গ যুগের অনুশাসনলিপিতেই বিশেষভাবে বিদ্যমান।

(ঘ) গ্রাম্য অফিসারগণের উপাধি যাহা প্রাচীনতর অনুশাসনলিপিগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন রাম মরতা, মগ্মন প্রভৃতি।

ডঃ পূর্বচরকের এই অভিমত সকলে গ্রহণ করেন নাই। বস্তুতঃ ডঃ গোরিস ইহার বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন[২১]। ডঃ পূর্বচরক অন্যান্য তথ্যাদির আলোকে আবার তাঁহার পূর্বের মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থ সিণ্ডোকের রাজত্বকালেই রচিত হইয়াছিল[২২]। ডঃ হুইকাশ এই গ্রন্থের রচনাকাল ৯১৯ হইতে ৯২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন[২৩]। এই সময়ের অন্য কোন প্রাচীন যব-দ্বীপীয় গ্রন্থ নাই যাহার সহিত আমরা রামায়ণের তুলনা করিতে পারি; সুতরাং বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে অনুশাসনলিপিগুলির সহিত রামায়ণের তুলনা করিতে হয়। পরবর্তী যুগের সমসাময়িক দরবারী সাহিত্যের সহিত (যেমন নাগরকৃতাগম) অনুশাসনগুলির তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে অনুশাসনলিপিগুলি অপেক্ষা দরবারী সাহিত্য অধিকতর রক্ষণশীল[২৪]। এই ঘটনা যদি রামায়ণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয় তাহা হইলে ইহার রক্ষণশীলতাকে আমরা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতে পারি না। সিণ্ডোকের আমলে পূর্ব যবদ্বীপীয় যুগ পূর্ণভাবে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং রাম মরতা, মগ্মান প্রভৃতি মধ্য যবদ্বীপীয় উপাধি রামায়ণে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া অনেকেই এই গ্রন্থের রচনাকাল এমন সময়ে ফেলিতে চাহিবেন যখন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন মধ্য যবদ্বীপ হইতে পূর্ব যবদ্বীপে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং এই সময় (৮৯৮ হইতে ৯২৯ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে হওয়াই স্বাভাবিক।

এই প্রসঙ্গে ডাঃ কার্ণের অভিমতটি উল্লেখ না করিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ডঃ কার্ণ বলিয়াছেন[২৫] যে কতকগুলি সুপ্রাচীন ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও এই কাকাবিনটি প্রাচীন যবদ্বীপীয় আদিপর্ব, অর্জুনবিবাহ এবং ভারতযুদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর অর্বাচীন, কিন্তু সুতসোম এবং ভোমকাব্য অপেক্ষা প্রাচীনতর। সুতরাং তিনি মনে করেন যে এই রামায়ণের রচনাকাল খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইলেই যুক্তিসঙ্গত হইবে। ডঃ কার্ণের অভিমত সম্বলিত গ্রন্থ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিগত অর্ধশতাব্দীতে প্রাচীন

যবদ্বীপীয় সাহিত্য, বিশেষভাবে রামায়ণ সম্বন্ধে এত গবেষণা এবং নূতন তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে যে ডঃ কার্ণের অভিমত এখন আর কেহ গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন না।

এইবার আমরা যবদ্বীপীয় রামায়ণের মূল উৎসের কথা আলোচনা করিব। বর্তমান গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত ইংরাজী সংস্করণ[২৬] ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করিবার সময় আমি ভট্টি-কাব্যের একটি শ্লোকের সহিত প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণের[২৭] অনুরূপ একটি শ্লোকের অভূতপূর্ব সাদৃশ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। এই বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখিয়া এবং উক্ত গ্রন্থে প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণের যে সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা পাঠ করিয়া ডঃ মনোমোহন ঘোষ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে যবদ্বীপীয় রামায়ণটি অংশতঃ ভট্টিকাব্যের অনুবাদ এবং অংশতঃ উহার মর্মানুবাদ[২৮]। ডঃ ঘোষের এই অভিমতের স্বপক্ষে তখন প্রচুর তথ্য বিদ্যমান ছিল না, কিন্তু ডঃ বাল্‌কে এবং ডঃ হুইকাশ এই বিষয়ে গভীরতর তথ্যানুসন্ধান করিয়া ডঃ ঘোষের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন[২৯]। ডঃ বাল্‌কে[৩০] যবদ্বীপীয় রামায়ণ এবং ভট্টিকাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণের দুই-তৃতীয়াংশই ভট্টিকাব্যকে অনুসরণ করিয়া রচিত হইয়াছে। ডঃ হুইকাশও[৩১] বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে কোন কোন স্থলে যোগীশ্বর ভট্টিকাব্যের অংশবিশেষ সংক্ষেপ করিয়াছেন (৩, ৬, ৭, ৯ সর্গ), কোথাও আবার তিনি উহার সহিত বিস্তৃততর আলোচনা সংযোজনা করিয়াছেন (১, ২, ৪-১১, ১৫, ২৩-২৪, ২৬ সর্গ), কোথাও আবার তিনি অতিরিক্ত তথ্যাদি ইচ্ছাপূর্বক যোগ করিয়াছেন (৩, ৬, ৭, ৮, ১১, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ সর্গ)। তবে এই উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত অংশ রামায়ণের অন্য সংস্করণ হইতে সংগৃহীত না হইয়া তৎকালে জনমুখে প্রচলিত বা অন্যভাবে সংগৃহীত রাম-কাহিনী হইতেও পরিগৃহীত হইয়া থাকিতে পারিত। ডঃ হুইকাশ এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে একদিন হয়তো ইহা প্রমাণিত হইতে পারে যে যোগীশ্বরের গভীর সংস্কৃত জ্ঞান এবং বিভিন্ন রামায়ণের সহিত পরিচয় হয়তো সাক্ষাৎভাবে ভারতবর্ষেই ঘটিয়াছিল। ইহা অসম্ভব নহে যে যোগীশ্বর একদা সংস্কৃত শিখিবার তাগিদে আমাদের মতই ভট্টিকাব্য পাঠ করিয়াছিলেন; সম্ভবতঃ এই কাব্যের শৈব পরিমণ্ডল তাঁহার রুচি অনুযায়ী হওয়ায় তিনি ভট্টিকাব্যকে আদর্শ স্বরূপে গ্রহণ করিয়া যবদ্বীপীয় রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে ভট্টিকাব্য যেমন ব্যাকরণ শিখাইবার জন্য রচিত হইয়াছিল তিনি তেমনি রামায়ণ রচনা করিয়া যবদ্বীপীয় শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত ছন্দ শিখাইবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবেন[৩২]।

এইবার আমরা প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিবেশন করিব। কবি যোগীশ্বর ভট্টিকাব্যের মতই মঙ্গলাচরণ ব্যতীত তাঁহার কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। যবদ্বীপীয় কাকাবিনে ইহা এক অভাবনীয় ব্যাপার এবং ডঃ হুইকাশ ইহার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কবি প্রথম সর্গের ১-৬০ শ্লোক আর্যাছন্দে রচনা করিয়াছেন এবং ৬১-৬২ শ্লোক রচনা করিয়াছেন মালিনী ছন্দে।

প্রথম সর্গের[৩৩] প্রারম্ভেই রাজা দশরথের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে; তিনি ত্রিবিক্রম বা

বিষ্ণুর পিতা (২)[৩৪]। রাজা খুব ধর্মপরায়ণ এবং বেদজ্ঞ (৩)। তিনি শৈবধর্মের পৃষ্ঠপোষক (৭) এবং তাঁহার ক্ষমতা ইন্দ্রতুল্য (৯)। রাজার রাজধানী অযোধ্যায় (১১) এবং তাঁহার তিন পত্নী কৈকেয়ী, সুমিত্রা এবং কৌশল্যা যথাক্রমে দুর্গা, গঙ্গা এবং গৌরীর সহিত তুলনীয়। গ্রন্থকার উনবিংশ শ্লোকে বেদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এখানে অথর্ব বেদের নাম নাই। রাজা দশরথ পুত্র কামনায় ব্যাকুল হইয়া (২১) ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে এইজন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন (২২)। এই উৎসবে প্রেত, পিশাচ প্রভৃতির মনস্তুষ্টি করা হইল (২৫)। শিব (২৬) এবং ঋষিগণকে বিশেষভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হইল (৩০)। কালক্রমে কৌশল্যার সন্তানরূপে রাম জন্মগ্রহণ করিলেন (৩২); কৈকেয়ীর পুত্র হইল ভরত এবং সুমিত্রা লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্নকে প্রসব করিলেন (৩৩)। অতঃপর মহামুনি বশিষ্ঠকে তাঁহাদের শিক্ষক নিযুক্ত করা হইল (৩৫) এবং বালকগণও অদ্ভুত কৃতিত্বের সহিত বিভিন্ন বিদ্যা আয়ত্ত করিলেন (৩৬)। এই সময়ে গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র রাজসভায় আগমন করিলেন (৩৮); তিনি মুণিগণের যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্য রামের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন (৩৯)। মুনির আগমণের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে (৪১) বিশ্বামিত্র মুনিগণের যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বিঘ্নাদির কথা জ্ঞাপন করিলেন (৪২-৪৪)। দশরথ ইতস্ততঃ করিতে থাকিলে (৫১) মুনিবর রামের অলৌকিক ক্ষমতার কথা বর্ণনা করিলেন (৫৮-৫৯)। অবশেষে রাম-লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা যাত্রা করিলেন। এই স্থলে প্রথম সর্গ শেষ হইল। ভট্টিকাব্যে প্রথম সর্গটি ২৭ শ্লোকে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় সর্গের[৩৫] প্রারম্ভেই নৈসর্গিক দৃশ্যের বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনার জের চলিয়াছে উনবিংশ শ্লোক পর্যন্ত। এই স্থলে কবি ভট্টিকাব্যের লেখকের মত বলিয়াছেন :

"সক্‌বেহ্‌ নিকঙ্গ্‌ তলগ তন হন তন্‌প তুঞ্জুঙ্গ্‌
তুঞ্জুঙ্গন্য তন্‌ হন কুরঙ্গ্‌ পড় মেসি কুমবঙ্গ্‌
কুম্বঙ্গন্য কপ্‌ব মুনি তন্‌ হন তন্‌প শব্দ
শব্দন্য কর্ণসুক তন হন তন মনোজ্ঞ।"

তড়াগ সকলের মধ্যে এমন একটিও ছিল না যাহাতে পঙ্কজ ছিল না; পঙ্কজের সংখ্যাও কম ছিল না এবং সবগুলিই ভ্রমরে পরিপূর্ণ ছিল। সব ভ্রমরই গুঞ্জরণ শব্দ করিতেছিল, কোন ভ্রমরই নিঃশব্দ ছিল না। তাহাদের শব্দ ছিল কর্ণসুখদায়ক, এমন কিছুই ছিল না যাহা মনোজ্ঞ ছিল না। অবশেষে রাম এবং লক্ষ্মণ মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং মুনিগণ তাঁহাদের নিকট আসিলেন (১৯)। তাঁহারা বালকদ্বয়কে অতিদুর্জয়া, জয়া, বিজয়া এবং জয়ন্তী নামক দিব্যাস্ত্র প্রদান করিলেন (২২)। অতঃপর তাঁহারা তাড়কা রাক্ষসীকে দেখিলে (২৩) রাম তাঁহার গাণ্ডীবধনু হইতে শরনিক্ষেপ করিলেন এবং রাক্ষসী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল (২৪)। মুনিগণ তখন রাম এবং লক্ষ্মণকে নারায়ণের অবতাররূপে পূজা করিতে লাগিলেন (৩০)। অতঃপর রাক্ষস মারীচ প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে আসিলে তাহার প্রতি বায়ু-অস্ত্র নিক্ষেপ করা হইল (৩৬-৪৩)। তখন দুই ভ্রাতাকে পুনরায় আরাধনা করা হইল (৪৭)। পরবর্তী শ্লোকে বলির কাহিনী, ক্ষীরসমুদ্র মন্থন এবং রাহুর কাহিনী বিবৃত করা হইয়াছে। কবি অতঃপর জনক-

নন্দিনী সীতার স্বয়ম্বর কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন (৪৯)। রাম অতঃপর শিবের ধনুক দুইখণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ; ইহা দ্বারা শিব পুরাকালে ত্রিপুরাসুরকে হত্যা করিয়াছিলেন (৫৬-৫৭)। এইরূপ পুত্রের জনক হওয়ার জন্য সকলে দশরথকে স্তুতিবাদ করিতে লাগিল (৬২-৬৩)। ইহার পর বরযাত্রীদল যখন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন রাম ভার্গব পথে পড়িয়া গেলেন (৬৮)। তাঁহার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া (৭১-৭৭) বরযাত্রীদল আবার অযোধ্যার পথে অগ্রসর হইলেন। ভট্টিকাব্যের দ্বিতীয় সর্গ এইস্থলে ৫৫ শ্লোকে শেষ হইল ; বাল্মীকির রামায়ণের শেষ হইল ১ম কাণ্ড। যবদ্বীপীয় কবি এই সর্গের ১-৭৭ শ্লোক বসন্ততিলকে রচনা করিয়াছেন এবং ৭৮ শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন মালিনীতে।

তৃতীয় সর্গ আরম্ভ হইল[৩৫ক]। দশরথ রামকে উত্তরাধিকারী করিবার কথা চিন্তা করিতেছিলেন (৩)। রাণী কৈকেয়ী ভরতকে রাজা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন (৬); সুতরাং তিনি দশরথের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে রামকে বনবাসে পাঠাইয়া ভরতকে রাজা করা হউক (৮-১৩)। এইরূপে রাম, লক্ষ্মণ এবং মৈথিলী অযোধ্যা ত্যাগ করিলেন এবং সুমতি তাঁহাদিগকে বনের পথে লইয়া চলিলেন (১৪)। এই সংবাদটি দাবানলের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং ভরতও ইহা শুনিতে পাইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিলেন। তিনি সমগ্র অযোধ্যানগরীকে বিষাদমগ্ন এবং পরিত্যক্তপ্রায় দেখিতে পাইলেন (২৫)। রাজা দশরথ ইহার কিছুকাল পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (২৬)। ভ্রাতৃভক্ত ভরত মাতাকে তাঁহার ষড়যন্ত্রের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন (৩০)। তিনি পিতৃদেহ সৎকারের জন্য এখন আদেশ প্রদান করিলেন (৩২)। রাম ইত্যবসরে চিত্রকূট গিয়া পৌঁছাইয়াছিলেন ; ভরত তাঁহার নিকটে গেলেন (৪১)। লক্ষ্মণ তাঁহাকে শত্রু মনে করিয়া ধনুকে শরযোজনা করিলেন (৪২), কিন্তু তিনি পরক্ষণেই দেখিতে পাইলেন যে ভরতের অঙ্গে অস্ত্রাদি নাই (৪৩)। ভরত শীঘ্র রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া পিতার মৃত্যুর কথা জ্ঞাপন করিলেন (৪৪)। রাম ভরতকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ দিলেন, কারণ তিনি পিতৃসত্য ভঙ্গ করিবেন না (৪৫-৪৬)। রাম এবং ভরতের আলাপনের ভিতর দিয়া তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত হইল। এইস্থলে ভট্টিকাব্যের তৃতীয় সর্গ ৫৬ শ্লোকে পরিসমাপ্ত হইল ; বাল্মীকির শেষ হইল ২য় কাণ্ড। যোগীশ্বর এই সর্গের ১-৫১, ৭০-৭ শ্লোক রচনা করিয়াছেন পৃথ্বীতল ছন্দে, ৫২, ৮৬ শ্লোক মালিনীতে, ৫৭-৮ রুচিরতে, ৬২-৯ পবিত্র-ছন্দে, ৭৮-৮৫ শিখরিণী ছন্দে ; ৫৩-৬, ৫৯-৬১ শ্লোকের ছন্দ অজ্ঞাত।

চতুর্থ সর্গের[৩৬] আরম্ভে অত্রিমুনির আশ্রমের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে (২)। সেইস্থল হইতে রামসীতা প্রভৃতি দণ্ডকারণ্যের দিকে যাত্রা করিলেন (৩)। পথিমধ্যে রাজপুত্রদ্বয় এবং সীতা বিরাট নামক রাক্ষসের সম্মুখীন হইলেন এবং তাহাকে নিহত করা হইল (৪-৮)। অতঃপর তাঁহারা শরভঙ্গের আশ্রমের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন (৯)। ঋষিবর রামচন্দ্রকে নারায়ণের অবতার বলিয়া স্তব করিলেন (১১)। কবি অতঃপর সুতীক্ষ্ণের আশ্রম বর্ণনা করিয়াছেন (১২)। ইহার পর সূর্পনখার আবির্ভাব হইল (২৭)। সূর্পনখা দেখিলেন যে রাজকুমার লক্ষ্মণ পুষ্পচয়নে ব্যাপৃত (২৯)। তিনি রাজকুমারের মনোহরণ করিবার জন্য এক

রূপসী নারীর ছদ্মবেশ গ্রহণ করিলেন (৩০) এবং লক্ষ্মণকে তাঁহার প্রেম নিবেদন করিলেন (৩৪-৩৫)। লক্ষ্মণ তাঁহার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহাকে রামের নিকট প্রেরণ করিলেন (৩৬-৪৮), কিন্তু রাম তাঁহাকে পুনরায় লক্ষ্মণের নিকট ফেরৎ পাঠাইলেন (৫১-৫৩)। লক্ষ্মণ তাঁহাকে রাক্ষসী সন্দেহ করিলেন (৫৪) এবং তাঁহার নাসিকা কর্তন করিলেন (৫৪)। সে তখন শূন্যপথে উড়িয়া চলিল। সুর্পনখা কিরূপে রাবণ, খর এবং দূষণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল তাহা ৫৮নং শ্লোক হইতে ৬৪ শ্লোক পর্যন্ত বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ত্রিশিরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া সুর্পনখার প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য এক বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন (৭০)। এইরূপে সংগ্রাম আরম্ভ হইল (৭১-৭৩)। এই স্থলে ৪৫ শ্লোকে ভট্টিকাব্যের ৪র্থ সর্গ শেষ হইয়াছে, কিন্তু বাল্মীকির তখনো ৩য় কাণ্ডের জের চলিতেছে। যোগীশ্বর এই সর্গের ১-১৫, ৩১-৮, ৬৫-৭৩ শ্লোকে ঔপছন্দসিক ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ১৬-৩০, ৩৯-৬৪ শ্লোকে ব্যবহার করিয়াছেন বৈতালীয় ছন্দ। এদিকে ত্রিশিরার মৃত্যু হইল (৭৫-৬)। পঞ্চম সর্গের[৩৭] সূচনা এই যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত হইয়াছে।

ত্রিশিরার পতনের পর খর এবং দূষণ যুদ্ধ করিতে আসিল (১), কিন্তু তাহারা সকলেই নিহত হইল (২)। সুর্পনখা রাবণকে যুদ্ধের ফলাফল নিবেদন করিলে (৩) রাবণ সুর্পনখাকে গুপ্তচর হিসাবে প্রেরণ করিলেন। সুর্পনখা সীতার সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়া (১৩) রাবণকে অবশেষে বলিলেন, "তোমার নয়ন অসার্থক যদি উহা সীতার সৌন্দর্য অবলেহন না করিয়া থাকে··· তোমার কর্ণদ্বয় অসার্থক যদি উহা সীতার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য শ্রবণ না করিয়া থাকে" (১৪)। পরবর্তী দুইটি শ্লোকেও (১৫-১৬) সীতার সৌন্দর্যের বর্ণনার জের চলিয়াছে। রাবণ অতঃপর সুর্পনখাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া (১৭) মারীচকে তাঁহার দুরভিসন্ধির কথা জ্ঞাপন করিলেন (২২)। মারীচ রাবণকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন (২৩-২৮)। রাবণ ক্রুদ্ধ হইলে মারীচ অবশেষে রাবণ কর্তৃক ন্যস্ত কাজের ভার নিলেন এবং নিজেকে স্বর্ণমৃগে রূপান্তরিত করিলেন (৩৯)। সীতা স্বর্ণমৃগের সৌন্দর্যে বিমোহিত হইয়া রামকে উহা ধরিয়া আনিতে অনুরোধ করিলেন (৪১)। রাম ঐ অবাস্তব মৃগের অনুসরণ করিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ পশ্চাতে রহিয়া গেলেন (৪২)। ইহার পর সীতা যেন শুনিতে পাইলেন যে রাম লক্ষ্মণের সাহায্যের জন্য করুণভাবে আহ্বান জানাইতেছেন (৪৫)। সুতরাং সীতা লক্ষ্মণকে পাঠাইতে চাহিলেন কিন্তু লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন (৪৯)। সীতা লক্ষ্মণকে এই বলিয়া তিরস্কার করিলেন যে লক্ষ্মণ রামের মৃত্যুর ভিতর দিয়া সীতাকে পাইবার পরিকল্পনা করিয়াছেন (৫৭)। অবশেষে লক্ষ্মণ রামের সাহায্যার্থে বাহির হইলেন (৬৪) এবং সীতা পুষ্পচয়ণ করিতে লাগিলেন। নিম্নলিখিত কয়েকটি চরণে রাবণের আবির্ভাব বর্ণনা করা হইয়াছে এবং চরণগুলি সুন্দর।

"যখন সীতা সেই সুন্দর অরণ্যটিতে পুষ্পচয়ণ করিতেছিলেন তখন দশানন তাঁহাকে একজন মুনির ছদ্মবেশে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। দশাননকে পবিত্র, ন্যায়বান, ধার্মিক এবং পূতচরিত্র শৈব মুনির মত মনে হইল। তাঁহার মস্তক ছিল মুণ্ডিত, কেবল মাত্র শীর্ষদেশে একগুচ্ছ শিখা ছিল।

"তাঁহার দন্তগুলি স্ফটিকের মত শুভ্র ছিল। তিনি সীতার নিকট একটি গোলাপ পুষ্পের মাল্য এবং কাঁধে ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য একটি অলাবু-পাত্র পাওয়ার আশা করিতেছিলেন। তাঁহার মুনিবেশ ছিল সুন্দরভাবে রক্তিম এবং লাক্ষারঞ্জিত। তিনি ভিক্ষা চাহিবার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং এইরূপেই তিনি তাঁহার দুরভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন রাখিবার প্রয়াসী হইলেন।

"অগ্রসর হইবার সময় তিনি মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন, তাঁহার ওষ্ঠ হইতে ধর্মবাণী নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাঁহার দৃষ্টি ছিল কোমল এবং প্রীতিপূর্ণ; বাহ্যতঃ ইহা ছিল বন্ধুত্বসূচক এবং হৃদয়গ্রাহী। মনে হইল তাঁহার আসুর-ভাবের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। তিনি নির্বিঘ্নে সেই সুন্দর এবং নির্জন বনভূমির ভিতর দিয়া অগ্রসর হইলেন।

"অতঃপর তিনি সেই বনভূমে জনকনন্দিনীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি নির্ভয়ে সেই বনভূমিতে পদচারণা করিতেছিলেন। রাবণ খুব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইয়া রাবণ তাঁহাকে সম্মান সহকারে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

"দেবি, আপনি এই বনে কিরূপে বাস করেন এবং পুষ্পচয়ণ করেন? এই পৃথিবীতে এমন কিছুই নাই যাহা আপনার অতুলনীয় সৌন্দর্যের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। বস্তুতঃ আপনি নিখুঁত। চন্দ্রের রূপ আপনার সহিত তুলনীয় হইতে পারে না; কারণ তাহার সৌন্দর্য দিনের বেলায় অবলুপ্ত থাকে।

"যদি সুগন্ধি রক্তিম এবং শুভ্র কমল পূর্ণ বিকাশের সময় চয়ণ করা হয় তাহা হইলেও তাহারা আপনার সৌন্দর্যের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না; কারণ তাহারা নিশা-সমাগমে মুদিত এবং অবসন্ন হইয়া পড়ে[৩৮]।

"আপনি যে স্থলে বাস করেন তাহা বিপদসঙ্কুল। লোকজনের পক্ষে দুর্গম, আরণ্যক-ভূমি! আপনি কি হিংস্র সর্প ও হস্তীকে ভয় করেন না? আপনাকে যদি ব্যাঘ্র আক্রমণ করে তাহা হইলে আপনার অভিভাবকগণ কিরূপে ইহা জানিতে পারিবেন? হে ভগিনী, আপনার এইরূপ দেহ-সৌন্দর্যের জন্য নরগণ নিঃসঙ্কোচে রক্তপাত করিতে পারে।

"বাস্তবিক আপনি অত্যধিকরূপে কোমল, নম্র এবং বাস্তবিকপক্ষে সুচারু; মনে হয় বনভূমি যেন আপনার উপস্থিতিতে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। যে মানুষটিকে আপনি স্বামী-রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তিনি কি সৌভাগ্যবান! এই মুহূর্তে তিনি আপনার অধীশ্বর হওয়ার জন্য নিতান্তই প্রশংসার যোগ্য! আমি এই পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছি কিন্তু আমি কখনও আপনার মত কাহাকেও দেখি নাই! অন্ততঃ আপনি আমার নিকট সৌন্দর্যের চরম নিদর্শন। এখন আমি আপনাকে জানিয়াছি; সুতরাং আমার বর্তমান জীবন আর অসার্থক হইবে না।" ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ এইস্থলে শেষ হয় নাই; বাল্মীকির তখনও ৩য় কাণ্ডের জের চলিতেছে। যোগীশ্বর এইস্থলে পঞ্চম সর্গ শেষ করিয়াছেন। তিনি ১ হইতে ৮৯ সংখ্যক শ্লোক রচনা করিয়াছেন রজনীছন্দে; সর্গের অবসানে অন্য ছন্দ ব্যবহার করেন নাই।

ষষ্ঠ সর্গের প্রারম্ভে[৩৯] রাবণের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। রাবণ এখন সীতাদেবীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন (১-৫)। সীতাদেবী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া রাবণ সীতাকে

লইয়া শূন্যে উড়িয়া চলিলেন (৬)। কবি অতঃপর সীতার বিলাপ বর্ণনা করিলেন (৭-১৪)। যাত্রাপথে বিশালকায় জটায়ুপক্ষী রাবণকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিলে উভয়ের সংগ্রাম আরম্ভ হইল (১৫-২৫)। পক্ষীটি পরাজিত হইলে (২৬) তাঁহারা আবার লঙ্কা অভিমুখে যাত্রা করিলেন (২৭)[৪০]। রাবণ আবার সীতার পাণিগ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন (৩০)। এদিকে সীতাকে দেখিতে না পাইয়া রাম ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কবি তাঁহার কান্নার বিবরণ ৪৭ শ্লোক পর্যন্ত দিয়াছেন। অবশেষে রাম এবং লক্ষ্মণ ভ্রমণ করিতে করিতে যে-স্থলে জটায়ু রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল সেই স্থলে উপনীত হইলেন (৫০)। পক্ষী সীতাকে ভক্ষণ করিয়াছে এই আশঙ্কা করিয়া রাম তাহাকে হত্যা করিতে অগ্রসর হইলে জটায়ু রামকে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল (৬৫-৬৭)। জটায়ু রামকে জানাইল যে সে রাজা দশরথের মিত্র (৬৮)। পক্ষীটির মৃত্যু হইলে উভয় ভ্রাতা তাহার দেহ দাহন করিলেন (৭৪)। কবি অতঃপর দীর্ঘবাহুর কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে রাম দীর্ঘবাহুকে নিহত করিলে তিনি দিব্য-দেহ ধারণ করিলেন (৭৬-৭৮)। দীর্ঘবাহু অতঃপর রামকে তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন (৮৩)। ইহার পর রাম এবং লক্ষ্মণ একজন শবরীকে দেখিতে পাইলেন (৯৮); শবরী রামকে তাঁহার শাপমোচন করিবার জন্য আকুল আবেদন জানাইলেন (১১০)। তাঁহারা অতঃপর প্রতীতকল্প বনে যাত্রা করিলেন (১১৪)[৪১]। যাত্রাপথে বিশাল পম্পা হ্রদ তাঁহাদের নয়নগোচর হইল (১১৫), কবি এই প্রসঙ্গে চতুষ্পার্শ্বের নৈসর্গিক দৃশ্যের বর্ণনা পরিবেশন করিলেন (১১৫-১২৪)। অতঃপর তাঁহারা ঋষ্যমূকে উপনীত হইলেন (১৩০)। হনুমান এই সময় দূতরূপে রামের সমক্ষে উপনীত হইলেন (১৩২) এবং সুগ্রীবের দৌত্য নিবেদন করিলেন (১৩৪)। তিনি বলিলেন যে বালির ভয়ে তাঁহার প্রভু মলয়পর্বতে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছেন (১৪৬)। তিনি এখন রামের সাহায্যপ্রার্থী (১৪৭)। এইরূপে রাম এবং সুগ্রীবের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হইল (১৫০)। সুগ্রীব রামের নিকট বালির শৌর্যের পরিচয় দিলে (১৫২) রাম সাতটি তালবৃক্ষ ভেদ করিয়া তাঁহার শক্তির প্রমাণ দিলেন (১৫৮)। এখন বালি এবং সুগ্রীবের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইল (১৬২), কিন্তু রাম উহাদের পার্থক্য বুঝিতে না পারায় (১৬৬) সুগ্রীব মৃতপ্রায় অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিল (১৬৭)। রাম তাঁহাকে কোন বিশেষ চিহ্ন গ্রীবাদেশে ধারণ করিতে বলিলেন (১৭০)। বালির পতন হইলে (১৭২) বালি রামকে তাঁহার জঘন্য চাতুরীর জন্য দোষারোপ করিলেন (১৭৪-১৮৪)। রাম এই বলিয়া দোষক্ষালন করিলেন যে ইহা ক্ষত্রিয়গণের কর্মানুযায়ীই (Practice) হইয়াছে (১৮৬)। এতদ্ব্যতীত বালির চরিত্রও দোষমুক্ত ছিল না, কারণ তিনি সুগ্রীবের প্রেয়সী তারাকে হরণ করিয়াছিলেন (১৮৯)। বালি ইহাতে লজ্জিত হইয়া (১৯০) বলিলেন যে ইহা নিয়তি স্থির করিয়াছেন যে তাঁহাকে ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে (১৯৪)। বালি স্বর্গে গমন করিলে (১৯৭) সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন (২০৩)। এইস্থলে ১৪৩ শ্লোকে ভট্টিকাব্যের ৬ষ্ঠ সর্গ শেষ হইল; বাল্মীকির তখনো চতুর্থ কাণ্ডের জের চলিতেছে।

যোগীশ্বর এই সর্গের ১-১৮ শ্লোক রচনা করিয়াছেন বংশস্থ ছন্দে, ১৯-২৬ শার্দূল-

বিক্রীড়িত ছন্দে, ২৭ পুষ্পিতাগ্রাতে, ২৮-৬৩ মালিনীতে, ৬৪-১১৩ অনুষ্টুভ (বক্ত্র) ছন্দে, ১১৪-২৯ তুরঙ্গগতিতে, ১৩০-৫৯ বসন্ততিলকে, ১৬০-৭১ শিখরিণী ছন্দে, ১৭২-৯৫ উপজাতিতে (ইন্দ্রবজ্র এবং উপেন্দ্রবজ্রের মিশ্রণ), ১৯৬-৭ ইন্দ্রবজ্র ছন্দে, ১৯৮ উপেন্দ্রবজ্রে, ১৯৯-২০০ চিত্রলেখা ছন্দে, ২০১ দোধক, ২০২ তনুমধ্যা এবং ২০৩ মত্তময়ুর ছন্দে।

ইহার পর সপ্তম সর্গ[৪২] আরম্ভ হইল। সুগ্রীবের এখন কোন আশঙ্কার কারণ ছিল না। সুতরাং রাম এবং লক্ষ্মণ পুনরায় বনে গমন করিলেন। তাঁহাদের গন্তব্যস্থল ছিল মাল্যবান পর্বত (১)। রাম প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই মন্মথ বা মনোভবের চিহ্ন পরিস্ফুট দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার চিত্ত প্রিয়তমা সীতার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ইন্দ্রধনু তাঁহার চোখে মনোভবের ধনু বলিয়া প্রতিভাত হইল (৫) এবং খদ্যোতিকাগুলিকে অনঙ্গের স্ফুলিঙ্গ বলিয়া মনে হইল। চাতকপক্ষীর সঙ্গীতে তাঁহার বেদনা জাগ্রত হইল (১৬)। তিনি বলিলেন, "তোমার সুন্দর দৃষ্টিকে আমি হরিণীর দৃষ্টির সহিত তুলনা করিব ; চন্দ্রের সহিত তোমার উজ্জ্বল বদনের কথাও আমার মনে পড়ে। উঃ, তুমি কিরূপে আমাকে প্রেমাচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছ!" (২৪)। তিনি আবার বলিলেন, "গভীর সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের চাঞ্চল্য তোমার ভ্রূভঙ্গিমায়। মনে হয় নৃত্যশীল ময়ুরের উজ্জ্বল পালক যেন তোমারই দীপ্ত কুন্তলদাম (২৫)।" তিনি মাল্যবানে উপনীত হইলেন (৩১)। সুগ্রীব তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন না করায় রাম ক্রুদ্ধ হইলেন, কারণ সুগ্রীব বালির দুর্ভাগ্যের কথা বিস্মৃত হইয়া তখনও স্বীয় প্রাসাদে প্রেমলীলায় সময় কর্তন করিতেছিলেন। সুতরাং রাম অনুজ লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের নিকট প্রেরণ করিলেন (৩৪-৩৮)। বিশ্বস্ত লক্ষ্মণ তখন কিষ্কিন্ধ্যা অভিমুখে যাত্রা করিলেন (৩৯)। সুগ্রীব ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন যে এইবার কার্যারম্ভ করিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে (৪০-৪২)। অতঃপর তিনি বানর সৈন্যবাহিনীকে সমবেত হওয়ার আদেশ প্রদান করিয়া মাল্যবানের দিকে অগ্রসর হইলেন (৪৩-৪৪)। সুগ্রীব বিলম্ব হওয়ার জন্য রামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন (৪৫-৪৬) এবং তিনি হনুমান, নীল, অঙ্গদ এবং জাম্ববানকে সীতার অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন (৪৮-৫১)। রামের অঙ্গুরী লইয়া (৫২) তাহারা শূন্যে লম্ফ প্রদান করিল এবং বিন্ধ্য পর্বতে আসিল (৫৩)। সেখানে তাঁহারা এক পরমা সুন্দরী কন্যার সাক্ষাৎলাভ করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল (৬৫)। কন্যাটি বলিলেন যে তাঁহারা যে সুন্দর প্রাসাদ দেখিতেছেন উহা বিশ্বকর্মা নির্মাণ করিয়াছেন (৭২) এবং তিনি রাক্ষস কন্যা স্বয়ম্প্রভা। তাঁহার পিতার নাম মেরুসাবর্ণি (৭৪)। অতঃপর সেই কন্যা কিরূপে বানরগণকে প্রতারিত করিলেন কবি তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন (৭৬-৮৪)। বানরগণ অতঃপর সম্পাতিপক্ষীর সাক্ষাৎলাভ করিলে তাঁহারা পক্ষীটির নিকট তাঁহাদের বিপদের কাহিনী বর্ণনা করিলেন। সম্পাতি তখন লঙ্কা যাওয়ার পথ বলিয়া দিলেন এবং লঙ্কার বর্ণনা করিলেন (৯৯-১০৫)। বানরগণ অতঃপর মহেন্দ্র পর্বতে উপনীত হইলে (১০৬), হনুমান লঙ্কায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন ; আর সকলে পশ্চাতে রহিয়া গেলেন (১১৩)।

এইস্থলে ১০৯ শ্লোকে ভট্টিকাব্যের সপ্তম সর্গ শেষ হইল ; বাল্মীকির শেষ হইল চতুর্থ

কাণ্ড। যোগীশ্বর এই সর্গের ১-৩০ শ্লোক রচনা করিয়াছেন রথোদ্ধত গতিতে, ৩১-৪২ পৃথ্বীতে, ৪৩-৫৪ শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে, ৫৫-৭০ ত্বরিতগতি ছন্দে, ৭১ তনুমধ্যা ছন্দে ৭২-৫ আর্যাতে, ৭৬-৭ উপজাতিতে, ৭৮-১১০ বংশস্থ ছন্দে, ১১১-১২ কুসুমবিচিত্র ছন্দে এবং ১১৩ পৃথ্বী ছন্দে।

অষ্টম সর্গের[৪৩] প্রারম্ভে পবন নন্দনের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তিনি "মনের মত বিদ্যুৎবেগে উড়িয়া চলিলেন (১)।" তাঁহার দেহ উড্ডীয়মান পর্বতের মত গতিশীল হইল (৩)। ডাকিনী নাম্নী এক রাক্ষসী হনুমানকে একগ্রাসে গিলিয়া ফেলিল এবং হনুমান রাক্ষসীর উদরে গিয়া উপনীত হইলেন (৫)। হনুমান রাক্ষসীর পেট চিরিয়া বহির্গত হইলেন এবং পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন (৬)। রাক্ষসীর মৃতদেহ সমুদ্রে পতিত হইলে সামুদ্রিক জীবজন্তুর মহোৎসবের আয়োজন হইল (৭)। অতঃপর সমুদ্রের মধ্যভাগে মেনকা পর্বত তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল (৮)। মেনকা পর্বত ছিলেন পবন দেবতার সখা; সুতরাং তিনি হনুমানকে বিশ্রাম গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন (৯)। হনুমানও সেইস্থলে যাত্রাভঙ্গ করিয়া উদরপূর্ণ করিয়া ভোজন করিলেন (১০-১৪)। তিনি অতঃপর পর্বতকে রামের দৌত্যের কথা এবং রাক্ষস বধের সংকল্পের কথা নিবেদন করিলেন (১৫-১৭)। হনুমান অতঃপর বিকটাক্ষিণী নামক রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলেন (১৮)। তিনি রাক্ষসীর দেহে প্রবেশ করিয়া বিপুলায়ত আকার ধারণ করিলে রাক্ষসী মৃত্যুমুখে পতিত হইল (২০)। হনুমান আরো অনেক রাক্ষস, সৈন্য প্রভৃতি দেখিতে পাইলেন, কিন্তু পাছে তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া ফেলে এই আশঙ্কায় তিনি নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিলেন (২৬)। তাহারা সকলেই রাবণ সম্বন্ধে স্তুতিবাদ করিতেছিল (২৭)। তৎকালে স্থলপ, বজ্রকায়, তিদেম প্রভৃতি মন্ত্রতন্ত্র প্রচলিত ছিল ; যোগ এবং শাস্ত্রও লঙ্কায় বিদ্যমান ছিল (২৯-৩১)। কবি অতঃপর রাক্ষসগণের পানোন্মত্ততার বিবরণ পরিবেশন করিয়াছেন (৩২-৩৪)। হনুমান লঙ্কায় অবতরণ করিলেন এবং সেখানে অপ্সরা, রাক্ষস কন্যা, পুষ্পকরথ প্রভৃতি দর্শনলাভ করিয়া চমৎকৃত হইলেন (৬০)। তিনি সীতার অনুসন্ধান কবিতে লঙ্কার পুর্বাংশে অশোকবনে উপনীত হইলেন (৮৬)। বস্তুতঃ সীতা সেই স্থলেই ছিলেন (৯১)। রাবণও সেই সময় সীতার প্রেমযাচ্ঞা করিয়া অশোকবনে উপনীত হইলেন (১১২-১৪); রাবণ সীতাকে তস্করের মত অপহরণ করিয়া লইয়া আসায় সীতা রাবণকে তিরস্কার করিলেন (১২৮)। সীতা বলিলেন যে রাম পুরুষোত্তম এবং মনুষ্যদেবতা (১৩১-৩৭)। রাবণ নিরাশ হইয়া নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন (১৩৮)। কবি অতঃপর সীতার সহিত ত্রিজটার কথোপকথনের বিবরণ পরিবেশন করিয়াছেন। ত্রিজটা ছিলেন বিভীষণের ধর্মশীলা কন্যা (১৪০)। হনুমান সীতার পাতিব্রত্য লক্ষ্য করিয়া নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন (১৭৮)। সীতা হনুমানকে ছদ্মবেশী রাবণ বলিয়া সন্দেহ করিতে থাকিলে হনুমান তাঁহার পুর্ব ইতিহাস এবং পিতৃপুরুষগণের পরিচয় দিলেন (১৭৯)। সীতার সন্দেহ তখনো সম্পূর্ণরূপে নিরশন না হওয়ায়, হনুমান মাল্যবান পর্বতস্থ রামের বিবরণী, ঋষ্যমুক, বীরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব প্রভৃতির কথা বর্ণনা করিলেন (১৮৯-১৯২)। অতঃপর লঙ্কায় তাঁহার অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করিয়া (১৯৩-১৯৪), হনুমান রামের অঙ্গুরী সীতাকে প্রদর্শন করিলেন (১৯৬)। সীতা এখন সম্পূর্ণরূপে আশ্বস্ত

হইয়া হনুমানকে তাঁহার চূড়ামণি প্রদান করিলেন (২০৪)। এইরূপে তাঁহার কার্যসিদ্ধি হইলে বীরপুঙ্গব হনুমান অশোক বনের সৌন্দর্য বিনষ্ট করিতে কৃতসংকল্প হইলেন (২১২)। বস্তুতঃ তাঁহার তাণ্ডবলীলায় পলাশফুলসমূহ অগ্নিবৃষ্টির মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এইস্থলে ১৩১ শ্লোকে ভট্টিকাব্যের ৮ম সর্গ শেষ হইল ; বাল্মীকির তখনো ৫ম কাণ্ডের জের চলিতেছে।

যোগীশ্বর অষ্টম সর্গের ১-৭, ২১৪ শ্লোক বিরচিত করিয়াছেন দ্রুত বিলম্বিত ছন্দে, ৮-১৭ প্রহর্ষিণী ছন্দে, ১৮-৫৮ প্রমিতাক্ষরাতে, ৫৯-৯১ শালিনীতে, ৯২-১০০, ১৭৮-৯১ পুনর্মদ ছন্দে, ১৭১-৬ তুরগগতিতে, ১৭৭ মালিনী ছন্দে, ১৯২-২১৩ বক্তৃছন্দে এবং ২১৫ অশ্বললিত ছন্দে।

নবম সর্গে[৪৪] পূর্ববর্তী কাহিনীর জের টানা হইয়াছে। হনুমানের দৌরাত্ম্য অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিলে, প্রহরী রাবণের নিকট (১-২) সমস্ত সংবাদ নিবেদন করিল (৩-৮)। দশমুখ পবন-তনয়কে নিধন করিবার জন্য রাক্ষসবাহিনীকে আদেশ দিলেন (৯ ; পবন-তনয় ইতিমধ্যেই রাক্ষসবাহিনীর পশ্চাতে এক তোরণের উপর বসিয়াছিলেন (১৩)। রাক্ষসবাহিনী লক্ষ্যহীনভাবে শর নিক্ষেপ করিতে থাকিলে (১৪-১৫) হনুমান এক উচ্চ এবং পুষ্ট চন্দনবৃক্ষকে গদারূপে ব্যবহার করিয়া শত্রুসৈন্য বিপর্যস্ত করিয়া তুলিলেন (১৬-২০)। অনেকে ইহাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং এই বিপর্যয়ের কাহিনী রাবণের নিকট বলা হইল (২১-৩২)। রাবণ আরো শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী হনুমানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন (৩৩)। হনুমান তখন বিশালাকার এক তালবৃক্ষ দিয়া রাক্ষস বাহিনীকে পর্যুদস্ত করিয়া তুলিলেন (৩৯)। এই সংগ্রামে রাবণপুত্র অক্ষের মৃত্যু হইল (৪৫-৫১)। অতঃপর সমুদ্রে স্নান সমাপন করিয়া হনুমান রাবণের প্রমোদ উদ্যানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং উহা বিধ্বস্ত করিলেন (৫২-৫৭)। ইহার পর তিনি উদ্যানের বাহিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাদ হনুমানের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলেন (৫৮-৬৩)। কবি তাঁহাদের যুদ্ধের কাহিনী চমকপ্রদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন (৬৪-৭৩)। ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া রাবণের সমক্ষে উপস্থিত করিলেন (৮১-৮৪)। রাবণ তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে (৯১), বিভীষণ ইহাতে বাধাপ্রদান করেন।

এই স্থলে ভট্টিকাব্যের নবম সর্গ শেষ হয় নাই, বাল্মীকির তখনো ৫ম কাণ্ডের জের চলিতেছে।

যোগীশ্বর এই সর্গের ১-২৬ শ্লোক রচনা করিয়াছেন কুসুমবিচিত্র ছন্দে, ২৭-৯ তোটকে ৪২-৫০ চিত্রবশ্মিতে, ৫১-৫, ৫৮-৮৪ ভুজঙ্গ প্রয়াতে, ৫৬-৭ দণ্ডকছন্দে, ৮৫-৮ সুবদনাতে এবং ৯২-৯৩ হলমুখী ছন্দে। ৩০-৪১, ৮৯-৯১ শ্লোকের ছন্দ অজ্ঞাত।

পরবর্তী সর্গের[৪৫] প্রারম্ভে রাবণ বিভীষণের উক্তির প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন যে হনুমান অনেক ক্ষতিসাধন করিয়াছে (১-৯)। হনুমান রাম এবং সুগ্রীবের মৈত্রীর কথা বর্ণনা করিয়া রামের বিজয়লাভ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন (১০-২৫)। রাবণ ক্রোধাগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিলেন (২৬) ; যোজনবাহু, তাড়কা, মারীচ প্রভৃতির মৃত্যু এই ক্রোধাগ্নিতে ইন্ধন জোগাইল (৩০-৪১)। হনুমান বলিলেন যে তিনি রামের দূত হইয়া সীতার অনুসন্ধানে

আসিয়াছেন এবং তিনি রাবণের উক্তিগুলি খণ্ডন করিলেন (৪৫-৬৭)। রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া (৬৯) তাঁহার অনুচরগণকে হনুমানের লাঙ্গুলে অগ্নিসংযোগ করিবার জন্য নির্দেশ দিলেন (৭০) এবং অগ্নিসংযোগ করা হইল (৭১-৭২)। এই স্থলে ভট্টিকাব্যের নবম সর্গ শেষ হইল, বাল্মীকির তখনো পঞ্চম কাণ্ডের জের চলিতেছে। আলোচ্য সর্গের ১-৯ ছন্দের নাম অজ্ঞাত। ইহার ১০-৪১ শ্লোক রচিত হইয়াছে চম্পকমালিকা ছন্দে, ৪২-৬৫ ভুজগশিশুসৃত ছন্দে, ৬৬-৭০ কামদত্তাতে, ৭১-২ নারাচ ছন্দে।

এই কাহিনীর জের একাদশ সর্গের[৪৬] প্রারম্ভেও পরিবেশন করা হইয়াছে। হনুমান মেরুপর্বতের মত বিশাল আকার ধারণ করিলেন, নাগপাশের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল এবং তিনি কালাগ্নির মত শূন্যে লম্ফপ্রদান করিলেন (৫-৬) এবং তাঁহার বায়ুবেগে সমুদ্রবারি বিপুলোচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইতে লাগিল (৭)। অবশেষে তিনি জাম্ববান, অঙ্গদ, নীল এবং অন্যান্য বানরগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া (৯) তাঁহার সার্থক দৌত্যের কাহিনী বর্ণনা করিলেন (১৩)। হনুমান অতঃপর মাল্যবান পর্বতে রাম এবং লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া (১৬) সীতা কর্তৃক প্রদত্ত চূড়ামণি ও লিপিকা প্রদান করিলেন (২২-৩২)। অতঃপর সকলে দক্ষিণে মহেন্দ্র পর্বতের অভিমুখে যাত্রা করিলেন (৫০)[৪৭] এবং এই স্থল হইতে তাঁহারা রাবণের লঙ্কা পরিদর্শন করিলেন। কবি মহেন্দ্র পর্বতের বর্ণনা দিয়া (৫১-৬০) দিবাভাগে এবং চন্দ্রালোকে বানরগণের সমুদ্রাবগাহনের বর্ণনা দিয়াছেন (৬১-৮৭)। রাম সীতার বিরহ ব্যাথায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন (৮৮-৯৪)।

এই স্থলে ভট্টিকাব্যের দশম সর্গ শেষ হইল, কিন্তু বাল্মীকির তখনো ষষ্ঠকাণ্ডের জের চলিতেছে। এই সর্গের ১-২ শ্লোক রচিত হইয়াছে দণ্ডকছন্দে, ৩-১৩ স্রগ্ধরাতে, ১৪-২১, ৩৭-৪৩ ঔপছন্দসিকে, ২২-৩৬ শার্দূলবিক্রীড়িতে ৪০-৬০ বংশস্থছন্দে, ৬১-৮৭ তামরসে, ৮৮-৯৪ প্রহর্ষিণীতে এবং ৯৫-৬ মত্তাছন্দে।

দ্বাদশ সর্গে[৪৮] লঙ্কার প্রভাতের ছবি চিত্রিত হইয়াছে। রাত্রির অবসানে চন্দ্র এবং নক্ষত্রগুলি অন্তর্হিত হইল (১-২), বিপর্যস্ত বেশবাস লইয়া নারীগণ জাগ্রত হইলেন। অবসন্নপ্রায় রাত্রির কাম-কলাপের বিবরণী উলঙ্গ নির্লজ্জতার সহিত ৪৮, ১২-২০, ২৪-৩০, ৩৫-৩৬ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সর্গ প্রধানতঃ রতি বিষয়ক এবং উহা ভট্টিকাব্যের একাদশ সর্গের ১-৩৭ শ্লোকের সহিত তুলনীয়[৪৯]। এই বর্ণনা স্থলে স্থলে উৎকটরূপে আদিরসাত্মক হইলেও ইহার কোন কোন স্থলের বর্ণনা কবি প্রতিভার পরিচায়ক। ইহার তৃতীয় শ্লোকে আমরা পড়িতেছি :

"লঙ্কায় রমণীগণ জাগ্রত হইলেন ; তাহাদের কেশপাশ বিস্রস্ত, প্রেমলীলায়···অলসমন্থর, চন্দ্রদেব ভীতত্রস্ত লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিলেন। নারীগণের সৌন্দর্যসুষমা তাহার সৌন্দর্যকে অতিক্রম করিয়া গেল।"

অথবা একবিংশ শ্লোকের বর্ণনা :

"নূতন দিনের অষ্টম যাম আসিয়া গেল ; দিব্যকান্তি উষার ঔজ্জ্বল্য সূর্যোদয়ের মহিমময় পর্বত উদয়গিরিতে প্রখরভাবে জ্বলিয়া উঠিল ; ইহা প্রেমময় প্রণয়ীর অনুরাগের সমতুল্য।"

ডঃ বাল্‌কে বলিয়াছেন[৫০] যে যবদ্বীপীয় রামায়ণের দ্বাদশ সর্গের অনুরূপ বর্ণনা বিমল সূরির পৌমচরিয়ম্ (৫৬ সর্গ)-এ বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত প্রবর সেনের প্রাকৃতকাব্য রাবণবধ বা সেতুবন্ধ, কুমারদাস রচিত জানকীহরণ, অভিনন্দ রচিত রামচরিতেও এই প্রকার আদি-রসাত্মক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়[৫১]। তবে ভট্টিকাব্যেই অনুরূপ বর্ণনা বিদ্যমান থাকায় ইহা অনুমান করাই স্বাভাবিক যে যবদ্বীপীয় গ্রন্থকার অধিকাংশ স্থলে যেমন ভট্টিকাব্য অনুসরণ করিয়াছেন এই স্থলেও ঠিক তাহাই করিয়াছেন।

যাহাই হউক রতি বিষয়ক বর্ণনার পর লেখক ৪৬-৬৩ শ্লোকে লঙ্কার রাজসভার বিবরণ পরিবেশন করিয়াছেন।

এই স্থলে ৪৭ শ্লোকের বিষয়বস্তুতে আসিয়া ভট্টিকাব্যেরও একাদশ সর্গ শেষ হইয়াছে।

অতঃপর রাবণ রাজসভায় প্রবেশ করিলে পতিহ্ এবং সেনাপতিগণ যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন (৬৪-৬৫)। কবি এই সর্গের প্রথম কুড়িটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন জলধর-মালা ছন্দে, ২১-৪১ স্বাগতা ছন্দে, ৪২-৫ মত্তময়ূর ছন্দে, ৪৬-৬৩ মালিনীতে এবং ৬৪-৫ নারাচ ছন্দে।

ইহার পর ত্রয়োদশ সর্গ[৫২] আরম্ভ হইল। ইহার প্রথম শ্লোক হইতে ১৮ শ্লোক পর্যন্ত রুচির ছন্দে বিরচিত। অবশিষ্ট অংশে বংশস্থ ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সর্গের সূচনায় দেখিতেছি বিভীষণ শঙ্করের উপাসনা করিতেছেন (১-২)। তিনি প্রত্যহ তাঁহার মাতার নিকট গমন করিতেন (৩-৪)। মাতা তাঁহাকে রাবণকে ভর্ৎসনা করিবার জন্য আদেশ জানাইলে (৫-১৩), বিভীষণ রাবণের নিকট গমন করিলেন বটে (১৫), কিন্তু তিনি তাহাকে দেখিয়া ভীত হইলেন (১৬-১৭) এবং তাহাকে প্রণাম জ্ঞাপন করিলেন (১৮)। রাবণ বর্তমান বিপদে পতিহ্‌গণের উপদেশ চাহিলে (১৯-২৬) তাঁহারা রাবণের নিকট আনুগত্য জ্ঞাপন করিলেন (২৭-৮)। ইহার পর প্রহস্ত রাবণের বীরত্বের গুণগান করিলেন (৩১-৩) এবং রাম লক্ষ্মণ ও বানরগণের সামান্যতা সম্বন্ধে বলিলেন (৩৪)। তিনি বলিলেন যে যুদ্ধ করা কর্তব্য (৩৫-৮)। বিভীষণ এইবার নীতি এবং অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতার পর সীতাদেবীকে রামকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন (৩৯-৯৭)।

যবদ্বীপীয় রামায়ণের ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ সর্গে ভট্টিকাব্যের দ্বাদশ সর্গের বিষয়বস্তু আলোচিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ সর্গের শ্লোকসংখ্যা মাত্রই ৯৭টি এবং চতুর্দশ সর্গের শ্লোক সংখ্যা ৭০টি। সুতরাং ভট্টিকাব্যের দ্বাদশ সর্গকে ভাঙ্গিয়া যবদ্বীপীয় গ্রন্থকার দুইটি সর্গ কেন করিলেন তাহা সুস্পষ্ট বোঝা যাইতেছে না, কারণ তিনি অন্য সর্গেই (২৪ সর্গ) আবার ২৬০টি শ্লোক পর্যন্ত ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং সংখ্যাধিক্যতা ইহার কারণ নহে। প্রশ্ন হইতে পারে এই সর্গ বিভাগ কি যোগীশ্বর কৃত, না, কোন অর্বাচীন নকলনবীশের কাজ[৫৩]?

চতুর্দশ সর্গের[৫৪] আরম্ভ হইল রাবণের মাতামহ সুমালীর উপদেশ লইয়া। তিনি বিভীষণের জ্ঞানগর্ভ কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন যে রাম নরদেবতা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে ইন্দ্রারি বৃত্র কিরূপে জলের ফেণায় নিহত হইলেন (১-৭)[৫৫] এবং কিরূপে হিরণ্য-

কশিপু অস্বাভাবিকরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (৮-১৩)। সেই হেতু সুমালী রাবণকে রামের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে বলিলেন, কারণ রাম সামান্য শত্রু নহেন (১৪-১৯)। এই সময়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল; কুম্ভকর্ণ তাঁহার মাতামহের উপদেশ শূন্যগর্ভ বলিয়া বর্ণনা করিয়া রাবণকে সঙ্কল্পে সুস্থির হইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন (২০-৩২)। কুম্ভকর্ণ পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন এবং বিভীষণ পুনরায় রাবণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না (৩৫-৩৭)। আকাশে নানাপ্রকার অলৌকিক দৃশ্য দেখা যাইতে লাগিল (৩৯) এবং পিশাচগণ নৃত্য করিতে লাগিল (৪০)। বিভীষণ পুনরায় উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলে (৪৩-৪৫), রাবণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন (৪৮)। রাবণ তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া তিরস্কার করিলেন (৪৯-৬৭)। বিভীষণ রাবণের নিকট হইতে বিদায় লইলেন (৭০)।

যোগীশ্বরের চতুর্দশ সর্গের ১-১৯ শ্লোক রচনা করিয়াছেন বসন্ততিলক ছন্দে, ২০-৬৩ তুরগগতিতে, ৬৪-৯ শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে এবং ৭০ বংশস্থ ছন্দে রচনা করিয়াছেন।

পরবর্তী সর্গের[৩৬] প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে বিভীষণ শূন্যমার্গে মহেন্দ্র-পর্বতের দিকে অগ্রসর হইতেছেন (১)। বানরগণ তাঁহাকে দশমুখ মনে করিলে (২) পবন-তনয় তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন কিন্তু তাঁহারা তখন পরস্পরকে চিনিতে পারিলেন (৩)। হনুমান বিভীষণকে রামের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন (৬-৭)। কবি এই স্থলে বিভীষণ এবং রামের গুণবর্ণনায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন (৮-১২)। অতঃপর সমুদ্র অতিক্রম করিবার সমস্যা উপস্থিত হইলে (১৩-১৫) রাম সমুদ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরাট ধনু পরিগ্রহণ করিলেন (১৬)। সমগ্র ধরণী কম্পিত হইল (১৭-১৮)। তাঁহার নিক্ষিপ্ত অগ্নিবাণের ঔজ্জ্বল্য এবং উত্তাপে মৎস্য, কুম্ভীর এবং অন্যান্য সামুদ্রিক জীবজন্তু চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং সহস্রে সহস্রে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল (১৯-২৯)। অগ্নিবাণ পাতালে প্রবেশ করিয়া নাগগণকে দহন করিতে লাগিল (৩০)। এমন কি নাগবাসুকিও শরের এই প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করিতে পারিলেন না (৩১)। শত সূর্যের মত উজ্জ্বল অস্ত্র দেখিয়া বরুণদেব তাঁহার মণিমুক্তাখচিত রাজ সিংহাসনে কম্পিত হইতে লাগিলেন (৩৩-৩৫)। তিনি সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া শত সহস্র বানরকে বিপুল চিৎকার করিতে দেখিলেন (৩৫)। ভীত বরুণদেব রাঘবকে সেম্ব (=প্রণাম) করিয়া তাঁহাকে পৃথিবীর স্রষ্টা এবং শাসনকর্তারূপে স্তব করিতে লাগিলেন (৩৭-৪৪)। রাম শান্ত হইয়া তাঁহার অস্ত্র সম্বরণ করিলেন (৪৫) এবং সমুদ্রের মৃত জীবজন্তুর প্রাণ প্রদান করিলেন (৪৬)। বরুণের উপদেশানুযায়ী বানরগণ সমুদ্রের উপর দিয়া সেতুবন্ধ রচনা করিতে উদ্যোগী হইল (৪৭)। তাহারা বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড আনিতে লাগিল (৫০)। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবজন্তুর কথা দূরে থাকুক, সিংহ এবং হস্তীগুলিও চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল (৫২-৫৬)। শূন্যে সঞ্চরমান বানরগণ যখন প্রত্যেকে এক এক যোজন দীর্ঘ প্রস্তরখণ্ড লইয়া যাইতেছিল তখন তাহাদিগকে রাহুর মত দেখাইতেছিল; দেবগণও অস্থির হইয়া পড়িলেন (৬০-৬১)। এই সমস্ত শিলাখণ্ড রামের সম্মুখে সংস্থাপিত করা হইল (৬২-৬৯)।

এই স্থলে যোগীশ্বরের পঞ্চদশ সর্গের অবসান হইলেও ভট্টিকাব্যের ত্রয়োদশ সর্গের জের

তখনো চলিতেছে। যোগীশ্বর এই সর্গের ১-১২ শ্লোক রচনা করিয়াছেন প্রহরণকলিকা ছন্দে, ১৩-৩১ পুনর্মদ ছন্দে, ৩২-৪৪ সুবদনাতে, ৪৫-৬ ষাতোর্মিমালা ছন্দে, ৪৭ দ্রুত বিলম্বিতে, ৪৮-৫১ বেগবতী ছন্দে, ৫২-৬৩ অশ্বললিত ছন্দে, ৬৪-৮ শিখরিণীতে এবং ৬৯ মন্দাক্রান্তা ছন্দে।

ষোড়শ সর্গের[৫৭] প্রারম্ভে বিশ্বকর্মার পুত্র নলের কথা বলা হইয়াছে; তিনি ছিলেন বানরদের মধ্যে স্থাপত্যবিদ্যা বিশারদ। বিরাটকায় একটি পাহাড় বিপুল শব্দ সহকারে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল; উহার উপর সেতু নির্মিত হইল (২)। সেতুটি প্রশস্ত এবং অবন্ধুর হইল (৩-৪)। দশমুখ ইহা জানিতে পারিয়া আশঙ্কিত হইলেন (৫)। রাম এবং লক্ষ্মণ আনন্দিত হইলেন; সুগ্রীব এবং অন্যান্য বানরগণ নলের কৃতিত্বের প্রশংসা করিলেন (৬)। ইহার পর বানর সৈন্যের অভিযান আরম্ভ হইল এবং তাঁহারা লঙ্কার উত্তরপার্শ্বে অবস্থিত সুন্দর সুবেল পর্বত দেখিতে পাইলেন; ইহা যেন ইন্দ্রের প্রমোদসভা তুল্য ছিল (৭-৮)। গন্ধর্ব এবং কিন্নরগণ সেস্থলে আনন্দ উপভোগ করিতেছিল (১০)। ইহার পর পর্বত এবং সমুদ্রের সৌন্দর্য বর্ণনা করা হইয়াছে (১১-১৩)। সুবেল পর্বতের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য কবি অনবদ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন (১৪-৪০)। বানরগণ পর্বতে উপস্থিত হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন (৪১-৪৭)। এই রামায়ণের পঞ্চদশ এবং ষোড়শ সর্গে ভট্টিকাব্যের ত্রয়োদশ সর্গের বিষয়বস্তু আলোচিত হইয়াছে।

ডঃ যুইনবল এই সর্গের ২৪-৪০ আদিরসাত্মক শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। এই সর্গের ১-১৪ শ্লোক রচিত হইয়াছে পৃথ্বীতে, ১৫-২৩ বসন্ততিলক ছন্দে, ২৪-২৯ রুচির ছন্দে, ৩০-৬ ভ্রমর বিলসিত, ৩৭-৪০ বংশপত্রপতিত, ৪১-৭ প্রভাছন্দে। কবি অতঃপর সপ্তদশ সর্গের বিবরণ পরিবেশন করিয়াছেন[৫৮]। এই সর্গের প্রথমেই সীতার জন্য প্রণয়ব্যাকুল দশাননের কথা বলা হইয়াছে (১-২)। তিনি রাম এবং লক্ষ্মণের দুইটি নকল মস্তক নির্মাণ করাইলেন (৪) এবং সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে তাঁহার আত্মীয়গণ আর জীবিত নাই; সুতরাং সীতার পক্ষে দশাননের প্রস্তাব গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ (৭-২০)। সীতা তাঁহার দুর্ভাগ্যের অভিশাপে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে তিনি প্রয়োজন হইলে অবেচি-নরক পর্যন্ত তাঁহাদের অনুসরণ করিবেন (৩৬)। তিনি রামের মস্তকের নিকট স্বীয় শির নত করিয়া উচ্ছ্বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন (৩৭-৪৫)। কবি ৪৫ সংখ্যক শ্লোকে বলিয়াছেন যে রাম মানবাগম[৫৯] অনুসরণ করিতেন। সীতা লক্ষ্মণের জন্যও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন (৪৬)। দশবদন তাঁহার উদ্দেশ্য চরিতার্থ না হওয়ায় হতাশ হইয়া পড়িলেন (৫৬-৫৯)। সীতা ত্রিজটাকে বলিলেন যে তিনি অগ্নিতে স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দিবেন (৬১-৬৭), কিন্তু ত্রিজটা অনুকূল চিহ্ন দেখিতে পাইলেন, কারণ তাঁহার বামচক্ষু নাচিতে লাগিল (৭৫)। সুতরাং ত্রিজটা তাঁহার পিতার সহিত সুবেল পর্বতে সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষিণী হইলেন (৭৬)। তিনি সেই স্থল হইতে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সীতাকে মৃত্যু হইতে বিরত থাকিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন (৭৭)। ত্রিজটা তাঁহার পিতা, রাম এবং লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন (৭৮) এবং তাঁহার পিতার নিকট সীতা এবং রাবণের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন

(৭৯-৮০)। তাঁহার পিতা সঠিক বিবরণ সীতাকে জানাইবার জন্য নির্দেশ দিলেন (৮১-৮২)। ত্রিজটা সুবেল পর্বত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সীতাকে সান্ত্বনাদান করিলেন (৮৩-৯০)। ত্রিজটার উপদেশানুযায়ী সীতা অতঃপর অগ্নির স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং উহাতে আহুতি প্রদান করিলেন (৯২-৯৯)। অতঃপর কবি বিরহব্যাকুলা সীতার বর্ণনা করিয়াছেন (১০৫-১০)। সীতা অবশেষে পালঙ্ক হইতে নামিলেন ; চারিদিকে আনন্দ উৎসব আরম্ভ হইল (১১১-১৮)। সীতার সহচরীদল পুষ্পচয়ণ করিয়া মাল্যরচনা করিতে লাগিলেন (১১৯-২৭)। কবি এই প্রসঙ্গে অশোকবনের অনুপম সৌন্দর্য অনবদ্য ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। প্রভাত হইলে সীতাদেবী ধর্মাচরণ এবং প্রার্থনায় মনঃসংযোগ করিলেন (১৩৪-৮)। ১৩৭ সংখ্যক শ্লোকে কবি বলিয়াছেন যে রামায়ণ এবং মহাভারত গ্রামে লোকগাথা রূপে গীত হইত। এই সর্গের ১-৬ শ্লোক রচিত হইয়াছে বসন্ততিলকে, ৭-২০ পুনর্মদে, ২১-৩৬ উপছন্দসিক ছন্দে, ৩৭-৪৯, ৬১-৭৪ স্বাগতা ছন্দে, ৫০-৬০ পুষ্পিতাগ্রা ছন্দে, ৭৫-৭, ৮৯-৯৯ তুরগগতিতে, ৭৮-৮৮ ভদ্রললিত ছন্দে, ১০০-১৮ প্রবরললিতে, ১১৯-২৭ চন্দ্রাতে, ১২৮-৩৩ কুসুমবিচিত্র ছন্দে এবং ১৩৪-৮ মালিনী ছন্দে।

অষ্টাদশ সর্গটি[৬০] এক হিসাবে মহাভারতের উদ্যোগপর্বের মত : ইহা রামায়ণের যুদ্ধের পটভূমিকা রচনা করিয়াছে। রাবণ শুকসারণ নামক একটি রাক্ষসকে বানরের ছদ্মবেশে শত্রু সৈন্যের শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় লইতে পাঠাইলেন (২)। তাঁহার ছদ্মবেশ প্রকট হওয়ায় তাঁহাকে বন্দী করা হইল (৬)। রাম তাঁহাকে বন্দী করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় (৭) বিভীষণ বলিলেন যে সে ছদ্মবেশী রাক্ষস (৮)। অবশেষে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া সে লঙ্কায় পলায়ন করিল (১১)। শুকসারণ বলিল যে সুবেল-পর্বত মর্কট-বাহিনীতে ছাইয়া গিয়াছে (১৩); এই প্রসঙ্গে সে শত্রুবাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীরগণের পরিচয় জ্ঞাপন করিল (১৬-১৮)। অতঃপর সে রাবণকে রামের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে অনুরোধ করিলে (২৩) রাবণ ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ধারণ করিলেন (২৭)। ইহার পর যুবরাজ অঙ্গদ লঙ্কাপুরে গমন করিয়া (৩৫) দশাননের সহিত সাক্ষাৎ করিল (৩৮)। সীতাকে প্রত্যর্পণ না করিলে ইহার যে বিষম পরিণাম হইবে তাহা রাবণকে জানাইলে (৪০), রাবণ ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল (৪৪) অঙ্গদ তাঁহার দৌত্যের বিবরণী রামের সমীপে নিবেদন করিলেন। অষ্টাদশ সর্গের ১-১৬ শ্লোক রচিত হইয়াছে ঔপছন্দসিকছন্দে, ১৭-২১ অপরবক্ত্র ছন্দে, ২২-৩২ বংশস্থ ছন্দে, ৩৩-৪৪ পৃথ্বীতে এবং ৪৫-৫২ শিখরিণী ছন্দে।

যুদ্ধারম্ভ হইতে রাবণের মৃত্যুকাল পর্যন্ত কাহিনী যবদ্বীপীয় রামায়ণের ১৯ হইতে ২৩ সর্গে বিবৃত হইয়াছে অর্থাৎ ২৬টি সর্গের মধ্যে ৫টিই এই যুদ্ধের বর্ণনায় নিয়োজিত হইয়াছে। ভট্টিকাব্যে ইহা বর্ণিত হইয়াছে চতুর্দশ হইতে সপ্তদশ সর্গে অর্থাৎ ২২ সর্গের মধ্যে ৪টি সর্গই এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছে[৬১]।

উনবিংশ সর্গের[৬২] প্রারম্ভেই যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল। ভোজনোৎসবের পর বানর এবং রাক্ষসবাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল (১-৪)। পরবর্তী কয়েকটি চরণে রাবণের

ছয়জন মন্ত্রী এবং বিশজন প্রধান কর্মচারীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে (৫-১১)। রাক্ষস সৈন্যগণ পত্নীগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল (১২-৩২)। রাক্ষসবাহিনীর মধ্যে প্রহস্ত, ঘটোদর, মহাপার্শ্ব, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি বীরগণের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে (৩৩-৩৪)। বীরূপাক্ষ রাক্ষসবাহিনীর নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন ; রাক্ষসগণ বিকট কোলাহল করিতে লাগিল ; অশুভ চিহ্নসকল চারিদিকে পরিস্ফুট হইতে লাগিল (৩৫-৮)। ইহার পর মর্কটবাহিনীর শ্রেষ্ঠ ৩৫ জন নেতার নামোল্লেখ করা হইয়াছে। বানরসৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল এবং চতুর্দিকে শুভলক্ষণ দেখিতে পাইল (৩৯-৪৬)। বানরেরা লঙ্কা বন্যাপ্রবাহে ভাসাইয়া দিল (৪৭-৫৯)। রাক্ষসগণ মকরানন এবং বজ্রপঞ্জর ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধের সম্মুখীন হইল (৩৯-৬৮)। প্রাথমিক সংঘর্ষে বানরসৈন্য পরাস্ত হইতে থাকিলে সুগ্রীব উপায়ান্তর না দেখিয়া নল, নীল এবং হনুমানকে আহ্বান করিলেন (৬৯-৮৭)। এই তিন বীরপুঙ্গব বানরসৈন্যগণকে উৎসাহ প্রদান করিলে তাহারা পুনরায় সাহস সঞ্চয় করিয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িল (৮৮-১০৩)। রাক্ষসগণ ভীষণভাবে আক্রান্ত হইয়া নিজেদের রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল (১০৪-১১২) ; এমন কি বর্মাবৃত হস্তীগুলিও বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে সাহসী বানর এবং রাক্ষসগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল (১২৪-৯)। কবি এই স্থলে যুদ্ধক্ষেত্রকে যমলোকের হ্রদের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

যবদ্বীপীয় রামায়ণের সপ্তদশ সর্গ এবং অষ্টাদশ হইতে উনবিংশ সর্গের ১১ শ্লোক পর্যন্ত আলোচিত বিষয়বস্তু ভট্টিকাব্যের উপর অতিরিক্ত সংযোজনা। উনবিংশ সর্গের ১-৪ শ্লোক প্রহরণকলিকা ছন্দে, ৫-১১ উপজাতিতে, ১২-৩২ স্রগ্ধরাতে, ৩৩-৪ রঙ্গনীতে, ৩৫-৮, ১০৪-১২ শিখরিণীতে, ৩৯-৬৮ পৃথ্বীতল ছন্দে, ৬৯-৮৭ শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে ৮৮-১০৩ কুসুম বিচিত্র, ১১৩-২৩ জলোদ্ধতগতি, ১২৪-৯ অশ্বললিত এবং ১৩০-১ রজনী ছন্দে বিরচিত হইয়াছে।

বিংশ সর্গের প্রথমেই[৬৩] কবি বর্ণনা করিয়াছেন কিরূপে যোদ্ধবর্গ এবং জন্তুর শোণিত মিশ্রণে যুদ্ধক্ষেত্রে বৈতরণী সৃষ্টি হইল (১-২)। পিশাচ এবং অন্যান্য ভূতপ্রেত রক্তপানের আশায় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল (৩)। হ্রদ শুষ্ক হইয়া গেল এবং পরিশ্রান্ত সৈন্যগণ বিশ্রাম করিতে চলিয়া গেল (৪-৬)। অতঃপর বানরবীর সম্পাতি রাক্ষস নায়ক প্রজঙ্ঘকে পরাজিত করিলেন। ইত্যবসরে নল স্ফুতদাক্ষি ও প্রতপনাক্ষিকে, হনুমান জম্বুমালিকে, বিভীষণ মিত্রঘ্নকে এবং সুগ্রীব প্রঘসকে নিহত করিলেন (৭-২৬)। এই বিজয়লাভে ঋষি এবং গন্ধর্বগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন (২৭)। ঋষিগণের প্রশংসায় মর্কটবাহিনী উৎসাহিত হইল (২৮)। অতঃপর বানরবীর মৈন্দ বজ্রমুষ্টিকে, নীল অনিকুম্ভকে, বানর লক্ষ্মণ বিরূপাক্ষকে এবং দ্রবিধ রাক্ষসবীর অশনিপ্রভকে পরাজিত করিলেন (২৯-৩৪)। এমন কি বিখ্যাত রাক্ষস যোদ্ধা ইন্দ্রজিৎও অঙ্গদ কর্তৃক তাড়িত হইলেন (৩৫-৮)। রাক্ষস সৈন্যের সৌভাগ্যরবি ক্রমশঃ অস্তাচলগামী হইতে লাগিল (৩৯-৪৬)। সূর্যাস্তকালে রাক্ষসগণ বিতাড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল (৪৭-৪৯) অতঃপর ইন্দ্রজিৎ সর্পাস্ত্রপাশ লইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলে বানরগণ ভীত হইয়া পড়িল (৫০-৫৪)। রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি সর্পাস্ত্রপাশে বন্দী হইলে (৫৫-৬১)

বানরগণ তাঁহাদের ভূতলশায়ী দেহকে ঘিরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন (৬৪-৬৬)। ইন্দ্রজিৎ এই ঘটনার বিবরণ রাবণের নিকট পরিবেশন করিলে (৭৪), রাবণ ভাবিলেন যে রাম লক্ষ্মণ নিহত হইয়াছেন এবং তিনি ইন্দ্রজিৎকে অনেক প্রশংসা করিলেন (৭৬-৭)। লঙ্কায় আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল (৮০)।

যোগীশ্বর এই সর্গের ১-৩ শ্লোক রচনা করিয়াছেন অজ্ঞাত শ্লোকে, ৪-৬ মানবকা, ৭-১৪ শালিনীতে, ১৫-৯ প্রমিতাক্ষরছন্দে, ২০-৪, ২৭-২৯ স্রগ্ধরাতে, ২৫-৬ শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে, ২৮ বসন্ততিলকে, ৩০-২ তোটকে, ৩৩-৪ বংশস্থ ছন্দে, ৩৫-৬ পৃথ্বীতে, ৩৯-৪৬ অপরবক্ত্র, ৪৭-৯ রজনী, ৫০-৯ ভুজঙ্গ প্রয়াত, ৬০-২ বংশপত্রপতিত, ৬৩-৭৫ প্রবীরললিত, ৭৬-৭ লক্ষ্মীবতী, ৭৮-৭৯ অজ্ঞাত, ৮০ দোধক ছন্দে।

একবিংশ সর্গের প্রারম্ভে[৬৪] সীতার যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। সীতাকে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া গেলে তিনি নাগপাশে আবদ্ধ রামকে দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন (১-১৩)। কবি সীতার ক্রন্দন ও তাঁহার দুর্ভাগ্যের কাহিনীর আরো বিবরণ পরিবেশন করিয়াছেন (১৪-৩৫)। ত্রিজটাও অশোকবনে কাঁদিতে লাগিলেন (৩৬-৪০)। সীতা অতঃপর অগ্নিতে স্বীয় দেহ বিসর্জনের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলে (৪১-৪৭) ত্রিজটা বিভীষণের সহিত পরামর্শ করিলেন (৪৮-৭১); ইত্যবসরে রাম জাগ্রত হইলেন (৭২-৪)। বিভীষণ তাঁহাকে সীতার কথা জ্ঞাপন করিলে রাম সকলের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন (৭৫-৯৮) এবং মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া তিনি লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান প্রভৃতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এদিকে রাত্রিও অবসান হইল (৯৯-১২৯)। পরদিন প্রভাতে ঋষিগণ রামের স্তুতি করিতে লাগিলেন (১৩০-৫২)। এই সময় নাগপাশ মুক্ত হইল এবং বানরগণও মুক্তিলাভ করিলেন। বাহ্যতঃ ইহা রামের (=বিষ্ণুর) জন্যই হইয়াছে। কোন কোন ভারতীয় সংস্করণে বলা হইয়াছে যে গরুড়পক্ষীর আগমনের জন্য নাগগণ পলায়ন করায় নাগপাশ মুক্ত হইয়া গেল। এই আকস্মিক মুক্তিতে বানরদের মধ্যে উৎসাহের কলরব উত্থিত হইলে তাহা রাবণকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল (১৬০-৮)। রাক্ষসবীর ধূম্রাক্ষ চতুর্দিকে অশুভ চিহ্ন দেখিতে লাগিলেন (১৬৯-৭১)। তবুও তিনি সিংঘাস্য-নামক রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইলেন (১৭২-৮১), কিন্তু তিনি হনুমান কর্তৃক পরাজিত হইলেন (১৮২-৯০)। অতঃপর রাবণ রাক্ষসবীর আকম্পনকে প্রেরণ করিলে তিনিও হনুমান কর্তৃক পরাজিত হইলেন (১৯১-২০৪); পরবর্তী রাক্ষসবীর প্রহস্তও নীল কর্তৃক নিহত হইলেন (২০৫-৪৭)। রাক্ষসগণ ইহাতে ভীত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল (২৪৮)। এই সর্গের ১-১৩ শ্লোক বিরচিত হইয়াছে ঔপছন্দসিক ছন্দে, ১৪-৩৫ উপজাতিতে, ৩৬-৫৫ বংশস্থ ছন্দে, ৫৬-৬৯ পুষ্পিতাগ্রাতে, ৭০-৭৫ রথোদ্ধতগতি, ৮৬-৯৮ স্বাগতা, ৯৯-১০৮ তুরগগতি, ১০৯-২৯ ভ্রমর বিলসিত, ১৩০-৪৪, ১৫৩-৯ প্রবরললিত, ১৪৫-৬ শার্দুলবিক্রীড়িত, ১৪৭-৫২, ২২২-৪৭ বসন্ততিলকে, ১৬০-৮ মালিনী ছন্দে, ১৬৯-৭১ বিদ্যুন্মালা ছন্দে, ১৭২-৮১ মত্তময়ূর, ১৮২-৯০ প্রহর্ষিণীছন্দে, ১৯১-২০৪ স্রগ্ধরাতে, ২০৫-২১ সুবদনাতে, ২৪৮ ইন্দ্রবজ্র ছন্দে।

দ্বাবিংশ সর্গের[৬৫] প্রারম্ভে কুম্ভকর্ণকে নিদ্রাভঙ্গ করাইবার নিষ্ফল প্রয়াসের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। অবশেষে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি রাবণের নিকট গমন করিলেন এবং রাবণ বিপদের কাহিনী বর্ণনা করিলেন (১-১২)। কুম্ভকর্ণ রাবণকে তাঁহার অসৎ চরিত্রের জন্য তিরস্কার করিলে রাবণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ; কুম্ভকর্ণ তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন (১৩-৪৯)। যুদ্ধের অগ্নি আবার প্রজ্বলিত হইল। অঙ্গদ তখন বানর সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিলে তাহারা নবোদ্যমে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল (৫০-৫৭), কিন্তু পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইল (৫৮-৬৬)। রাম তখন সুগ্রীবকে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন এবং হনুমান তাঁহাকে সহায়তা করিতে লাগিলেন। কুম্ভকর্ণ একটি পাহাড় সুগ্রীবের মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিলে সুগ্রীব মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন (৬৭-৮৬)। হনুমান কুম্ভকর্ণের পশ্চদ্ধাবন করিলেন ; সুগ্রীবও জ্ঞান লাভ করিয়া কুম্ভকর্ণের নাসিকা দন্তদ্বারা ছেদন করিলেন। কুম্ভকর্ণ নিরুৎসাহ হইলেও যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইলেন না (৮৭-৮৯)।

এই সর্গের ১-১২ শ্লোক রচিত হইয়াছে রজনীছন্দে, ১৩-৪০ মদয়ন্তীতে, ৪১-৯, ৮৭-৮ শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে, ৫০-৩ দণ্ডক, ৫৪ বংশপত্রপতিত, ৫৫-৭, ৮৯ স্রগ্ধরা, ৫৮-৬৬ মৃগাংশ, ৬৭-৭৩ উপজাতিতে, ৭৪-৮৬ প্রহর্ষিণীতে।

ত্রয়োবিংশ সর্গের[৬৬] প্রারম্ভেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে বিভীষণ কুম্ভকর্ণকে নিহত করিবার জন্য রাম এবং লক্ষ্মণকে উৎসাহিত করিতেছেন। রামের শরাঘাতে কুম্ভকর্ণের দেহ মুণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও মুণ্ডটি যুদ্ধ করিতে লাগিল। মুণ্ডটির মুখবিবরও শরে পূর্ণ হইয়া গেল (১-৭)। নিহত কুম্ভকর্ণের দেহের পতনে অনেক বানর সৈন্য নিষ্পিষ্ট হইল (৮-৯)। ইহার পর ত্রিশির, ত্রিকায়, নরান্তক, দেবান্তক এবং অতিকায় নামক রাবণের পুত্রাদি নিহত হইলেন (১০-১৯)। রাবণ নিশ্চিত পরাজয় হইতে বাঁচিবার জন্য ইন্দ্রজিৎকে প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ অস্ত্রপ্রয়োগে বানরগণকে সম্মোহিত করিয়া নিদ্রামগ্ন করিলেন (২০-২৬)। বিভীষণ দীপসঞ্জত মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া হনুমানকে হিমালয় হইতে অমৃত ঔষধ আনিবার জন্য প্রেরণ করিলেন (২৭-৩১)। হনুমান সমগ্র পর্বত উপড়াইয়া লইয়া আসিল (৩২-৩৩) এবং বানরগণ সঞ্জীবিত হইল। লঙ্কায় অগ্নিসংযোগ করা হইল (৩৪-৫) এবং অনেক রাক্ষসবীর নিহত হইলেন (৩৬-৪৭)। রাবণ ইহাতে মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর ইন্দ্রজিৎ তাঁহার সাত পত্নী (ভগ্নী) সহ যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী পরস্পর সম্মুখীন হইল। লক্ষ্মণ বরুণাস্ত্র ক্ষেপন করিলে ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলেন (৪৮-৬৬)। তাঁহার সাত পত্নীও প্রাণত্যাগ করিলেন (৬৭)। রাবণ অতঃপর শিবমন্দিরে উপাসনা করিয়া শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইলেন (৭৪-৮২)। সুগ্রীব রাক্ষস বিরূপাক্ষ এবং ধূম্রাক্ষকে নিহত করিলেন এবং অঙ্গদ মহোদরকে নিহত করিলেন (৮৩-৮৪)। রাবণের ধ্বংস সুনিশ্চিতরূপে প্রকট হইল (৮৫)।

এই সর্গের ১-৭ শ্লোক রচিত হইয়াছে বংশপত্রপতিত ছন্দে, ৮-৯ বিকশিত কুসুমে, ১০-৪৭ ভদ্রললিত, ৪৮-৭৩ সুবংশপত্র, ৭৪-৮২ বিলাসিনী ছন্দে, ৮৩ স্রগ্ধরা, ৮৪ শার্দূলবিক্রীড়িত এবং ৮৫ ইন্দ্রায়ুধ ছন্দে।

চতুর্বিংশ[৬৭] সর্গের প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব রাবণের সম্মুখীন হইয়াছেন (১-৪)। রাবণের সারথি, রথ এবং অশ্ব বিধ্বস্ত হইল (৫-৭)। এই সংঘর্ষে লক্ষ্মণ আহত হইলে বিভীষণ তাঁহাকে নিরাময় করিলেন। ইন্দ্র তখন গুহ্যবিজয় এবং ব্রহ্মাস্ত্র নামক অস্ত্র এবং রথ ও সারথি মাতলিকে রামের নিকট প্রেরণ করিলেন। রাম এবং লক্ষ্মণ তখন রথে আরোহণ করিলেন (৮-১৩)। রাম-রাবণের যুদ্ধ তীব্রতায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল; রাম রাবণের দশমুণ্ড কাটিয়া ফেলিলেন (১৪-২৭)। ইহাতে বানরগণ উল্লসিত হইয়া উঠিল, প্রকৃতি সন্তুষ্ট হইল, ধরা শান্তিলাভ করিল (২৮-২৯)। ঋষি এবং সিদ্ধগণও উৎফুল্ল হইলেন (৩০)। বিভীষণ রাবণের জন্য ক্রন্দন করিতে থাকিলে (৩১-৪২) রাম বিভীষণকে নীতিমূলক উপদেশ দিলেন (৪৩-৮৬)। রাবণের মৃতদেহ স্নান করাইয়া সৎকার করা হইল। বিভীষণ লঙ্কার রাজা হইলেন (৮৭-৯১)। যুদ্ধাবসানে লঙ্কার সংস্কারকায সাধিত হইল; বানরগণের পুনর্জীবন লাভ হইল অথবা তাহারা স্বর্গে গমন করিল (৯২-৯৪)। নবনির্মিত লঙ্কায় যেন স্বর্গ নামিয়া আসিল। এমন কি রাক্ষসগণও অপকর্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল (৯৫-১২৬)। অতঃপর হনুমান সীতার নিকট গমন করিলেন (১২৭-৩০)। সীতা রাক্ষসীগণের জীবন রক্ষার জন্য অনুনয় করিলেন এবং তিনি রামের নিকট গমনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন (১৩১-৪)। রামের আদেশানুযায়ী (১৩৫-৬) সীতা নিজেকে শুদ্ধ করিয়া লইলেও (১৩৭-৮) রাম নীরব রহিলেন (১৩৯)। সীতা ক্ষোভে সর্বহারার প্রতিমূর্তি ধারণ করিলেন (১৪০-৩)। বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান এবং অন্যান্য সাক্ষীগণ সম্পূর্ণরূপে হতাশ হইলেন (১৪৪-৫)। রাম সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি ভ্রষ্টা; তুমি মিথিলায় অথবা বিভীষণ, লক্ষ্মণ বা ভরতের সমীপে গমন কর (১৪৬-৫৩)। সীতা তখন পৃথিবী, জল, স্বর্গের অধিবাসী, বায়ু এবং আকাশকে সাক্ষী রাখিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন (১৫৪-৬৪)। ইহার জন্য সীতা ত্রিজটাকে শাস্ত্রজ্ঞ বিভীষণের নিকট প্রেরণ করিলেন (১৬৫-৬৮)। ত্রিজটা বলিলেন যে সীতা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ; সীতা লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা করিলেন (১৬৯-৮৭)। লক্ষ্মণ চিতা প্রস্তুত করিলে সীতা জ্বলনকে সাক্ষী ও বিচারক মান্য করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন (১৮৮-৯১)। অগ্নি তখন স্বর্ণকমলে পরিণত হইল। অগ্নিদেব রামকে জ্ঞাপন করিলেন যে সীতা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র (১৯২-৮)। শিবও রামকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে রাম বিষ্ণুর অবতার। অতঃপর রাম সীতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন (১৯৯-২০২)। রাম অতঃপর পথের নির্দেশ দিয়া হনুমানকে অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন (২০৩-১৭)। রাম অতঃপর সুগ্রীব এবং বিভীষণের সহিত পরামর্শ করিলেন। রাত্রি হইল; পরদিন যাত্রার ব্যবস্থা হইল (২২৮-৩৯)। বিশিষ্ট বানরগণ পুষ্পক রথে আরোহণ করিল (২৪০-৫৯)। রাম সীতার নিকট মহেন্দ্র এবং মলয় পর্বতের সৌন্দর্য বর্ণনা করিলেন (২৬০)।

যোগীশ্বর এই সর্গের ১-৪, ৮-১৩, ৯২-৪, ১৯৯-২০২ শ্লোক রচনা করিয়াছেন শার্দূল বিক্রীড়িত ছন্দে, ৫-৭, ৩০, ১৮৮-৯১ প্রহর্ষিণীতে, ১৪-২৭ মধুলিন্দ ছন্দে, ২৮-৯ প্রহরণ কলিকা ছন্দে, ৩১-৪২ পৃথ্বীতে, ৪৩-৮০ শারিণীতে ৮১-৬, ১৭৪-৮৭ বংশস্থ, ৮৭-৯১ পুষ্পিতাগ্রা ছন্দে,

৯৫-১২৬ সুবদনাতে, ১২৭-৬৮ উদ্গতবিষম, ১৬৯-৭৩ পুনর্মদ, ১৯২-৮ রজনীতে, ২০৩-২৭ বৈতালীয় ছন্দে, ২২৮-৩৯ ঔপছন্দসিক, ২৪০-৫৯ স্বাগতা ছন্দে এবং ২৬০ মালিনীতে।

পঞ্চবিংশ সর্গের[৬৮] প্রারম্ভে রাম সীতাকে বিন্ধ্য পর্বতের উচ্চাশা এবং অগস্তি (=অগস্ত্য) কিরূপে ইন্দ্রকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহার কাহিনী বিবৃত করিলেন (১-৩)। রাম অতঃপর মাল্যবান, ঋষ্যমূক, দণ্ডক, পম্পাহ্রদ এবং সুন্দর সুন্দর অরণ্যানীর কাহিনী সীতাকে শোনাইলেন (৪-৭)। তিনি শরভঙ্গের আশ্রমের কথা (৮-৯), চিত্রকূট পর্বত এবং ঋষি ভরদ্বাজের বিবরণ (১০-১১), ঋষি সম্প্রদায়ের আশ্রম (১২-১৭) ও বিভিন্ন পশুপক্ষীর কথাও (১৮-৩৪) সীতা দেবীকে বলিলেন। কেবল তাহাই নহে ; রামচন্দ্র যমুনা, গঙ্গা, তমসা, সরযূ প্রভৃতি নদী এবং অযোধ্যার কথাও সীতাকে শুনাইলেন (৩৫-৯)। তিনি মুনিগণ এবং লতাগুল্মের কথা বলিলেন (৪০-২)। ইহার পর তিনি লতাগুল্মের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিলেন (৪৩-৪৯)। অতঃপর তরুণীগণ এবং পক্ষিগণের সরযূ নদীতে জলক্রীড়ার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে (৫০-৬১)। অতঃপর পক্ষী এবং লতাগুল্মের গুণাগুণ (৬২-৭৭) ও তাহাদের বিশেষত্বের (৮২-১০৫) বিবরণ পরিবেশন করা হইয়াছে।

য়ুইনবল এই সর্গের অধিকাংশ শ্লোকই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। এই অভিমত অবশ্য সকলে গ্রহণ করেন নাই। এই সর্গটিও ছন্দের বৈচিত্র্যে লালিত্যময়। ইহার ১-৩, ৯০ শ্লোক রচিত হইয়াছে মত্তময়ুর ছন্দে ; ৪ তুরগগতিতে ; ৫, ৮৩, ৯৮ সুবদনাতে ; ৬, ৫০-৬১, ৮৪-৮৫ দ্রুতবিলম্বিত ; ৭ প্রহর্ষিনীতে ; ৮-৩৪, ৭১-২, ৮৬-৯, ১০৬-৭ প্রমিতাক্ষরাতে ; ৩৫-৯ শার্দূলবিক্রীড়িত ; ৪০-২, ৪৯ দোধক ; ৪৩, ৭৮-৮১ কুসুমবিচিত্রায় ; ৪৪-৮ পুষ্পিতাগ্রা ছন্দে ; ৬২-৪, ৭৫-৭ মালিনীতে ; ৬৫ ভ্রমরবিলসিত ; ৬৬-৭ রুক্ষ ; ৬৮-৯ রুক্মবতী ; ৭০ সুন্দরলেখা ; ৭৩, ৯৯ বংশস্থ ; ৭৪, ৯৪-৭ রথোদ্ধত ; ৮২ পৃথ্বীতে ; ৯১, ১০৪-৫ স্বাগতা ; ৯২-৩ ঔপছন্দসিক ; ১০০-৩, ১০৯-১৭ অপরবক্ত্র ; ১০৮ রজনীতে।

ইহার পর আমরা পৌছিলাম শেষ সর্গে[৬৯]। প্রথমেই প্রাচীন অযোধ্যার বিবরণ পরিবেশন করা হইয়াছে ; সেখানে সর্বদাই পূজাপার্বণের ভীড় লাগিয়া থাকিত (১)। স্বর্গীয় বিমান অবলোকন করিয়া সকলে অভিভূত হইয়া পড়িল (২-৩)। ভরত, হনুমান এবং মাতা কৌশল্যা আগমন করিলে রাম কৌশল্যার পাদবন্দনা করিলেন। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল (৯-২১)। জনসাধারণ এবং বানরগণ উৎসবে মত্ত হইল (২২-২৩)। রাজকীয় ভোজসভার আয়োজন হইল (২৪-৫)। রাম সীতার আনন্দের পরিবেশে ভোজনোৎসব এক সপ্তাহ ধরিয়া চলিয়া চান্দ্রমাসের ১০ম তারিখে শেষ হইল (২৬-৩৬)। ইহার পর ত্রিজটা, বিভীষণ এবং হনুমান স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন (৪৫-৪৭)। অতঃপর ত্রিলোকের অধিপতি পরমেশ্বরের বন্দনা করিয়া, সৌভাগ্যদায়ক রামায়ণের স্তুতি করিয়া, কবি যোগীশ্বরের প্রশংসা করিয়া এবং সকলের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া এই কাব্যের উপসংহার রচনা করা হইল (৪৯-৫২)।

শেষ সর্গেও কবি ছন্দের যথেষ্ট মুন্সীয়ানা দেখাইয়াছেন। ইহার প্রথম শ্লোক রচিত হইয়াছে সুবদনাতে, ২-৩, ৩৮ শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে, ৪-৫ কুসুমবিচিত্র ছন্দে, ৬ পুষ্পিতাগ্রাতে,

৭-৮, ৩৭ মালিনীতে, ৯-২১ দ্রুতবিলম্বিত, ২২-২৫ দণ্ডক, ২৬-৩৫ বসন্ততিলক, ৩৬ বংশপত্র-পতিত, ৩৯-৪০ দোধক, ৪১-২ প্রহর্ষিণীতে, ৪৩-৪ তুরগগতিতে, ৪৫-৭ স্বাগতাতে, ৪৮ ঔপচ্ছন্দসিক ছন্দে, ৪৯ অশ্বললিতে এবং ৫০-১ বোহিঙ্গরৎ ছন্দে। ৫২ শ্লোকের ছন্দ অবজ্ঞাত।

এই কাব্যে ১০টি অজ্ঞাত কুলশীল ছন্দের পরিচয় পাইতেছি। আশা করি একদিন ইহার অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইবে।

ভট্টিকাব্য এবং যোগীশ্বরের রামায়ণ যুদ্ধকাণ্ডের অবসানেই পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। যোগীশ্বরের রামায়ণ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে ইহা সীতারামের মিলনে পর্যবসিত হইয়াছে, কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত বাল্মীকি রামায়ণে আমরা দেখিতে পাই যে সীতা পাতাল প্রবেশ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। যোগীশ্বরের রামায়ণ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে ইহার সহিত সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনীর গভীর পার্থক্য নাই। ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে বালকাণ্ডের সুদীর্ঘ ঘটনাবলী অথবা বশিষ্ঠ বালক রামকে প্রাচীনকালের যে-সমস্ত কাহিনী শুনাইয়াছেন তাহা যোগীশ্বরের রামায়ণে অনুপস্থিত কিন্তু ইহার কারণও সুস্পষ্ট; কারণ যোগীশ্বর-বাল্মীকির রামায়ণ ব্যবহার না করিয়া ভট্টিকাব্যকেই তাঁহার রচনা ও তথ্যের উৎস হিসাবে মোটামুটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। যবদ্বীপের তৎকালীন রাজনীতি, ধর্ম এবং সমাজের ক্ষীণ চিহ্নও যোগীশ্বরের রামায়ণে রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু রচনাশৈলী এবং ভাবের দিক দিয়া সমগ্র গ্রন্থটিই যেন ভারতীয় বলিয়া মনে হয়। কবি বর্ণনায় সুনিপুণ এবং স্থানে স্থানে উপমার ঐশ্বর্য অনুপম। গ্রন্থের অনেক অংশ pun-এ পরিপুর্ণ এবং গ্রন্থের আকারের কথা (২৭৭১ শ্লোক) স্মরণ রাখিলে মনে হইবে যে এই কাব্যে বৃথা বর্ণনায় এত স্থান নষ্ট করা সমীচীন হয় নাই। তবুও গ্রন্থটি সমগ্রভাবে বিচার করিলে ইহার অবিস্মরণীয় অবদানের কথা আমরা বিস্মৃত হইতে পারিব না।

রামায়ণকাকাবিনের আলোচনা সমাপ্ত করিবার পুর্বে আমাদিগকে আরো দুইখানি গ্রন্থের আলোচনা করিতে হইবে। ইহার একখানি হইল উত্তরকাণ্ড এবং অপরখানি হইল সেরৎরাম। সংস্কৃত রামায়ণে উত্তর কাণ্ডের পৃথক কোন সত্তা নাই; যবদ্বীপে ইহার স্বাধীন অস্তিত্ব রহিয়াছে। ইহাকে ভারতীয় রামায়ণের স্বচ্ছন্দ প্রাচীন যবদ্বীপীয় গদ্যানুবাদ বলা যাইতে পারে। ইহাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু সংস্কৃত শ্লোক আছে, কিন্তু সেগুলি এরূপ বিকৃতরূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে যে মুল গ্রন্থের সাহায্য ভিন্ন তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ডঃ ভান দের তুক বলিয়াছেন যে এই সমস্ত শ্লোক অনেকটা তেলেগু সংস্করণের সহিত সামঞ্জস্যপুর্ণ হইলেও গোরেশিওর সংস্করণের পাঠ হইতে কিছুটা বিভিন্ন[৭০]। এই গ্রন্থের একটি বলিদ্বীপীয় সংস্করণও আছে, কিন্তু ইহা প্রাচীন যবদ্বীপীয় অনুবাদাপেক্ষা হ্রস্বতর এবং ইহাতে কিছু কিছু মৌলিক তথ্যও সন্নিবেশিত হইয়াছে। উত্তরকাণ্ড হইতে কিছু কিছু বিবরণ হরিশ্রয় এবং অর্জুনবিবাহ নামক গ্রন্থেও পরিগৃহীত হইয়াছে; সুতরাং আমরা যথাসময়ে ইহার আলোচনা আবার করিব। এই গ্রন্থের শেষাংশ অর্থাৎ রাম প্রস্থানিকম্ এবং স্বর্গারোহনম্ আমাদিগকে মহাভারতের শেষের দিকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই গ্রন্থের ৫০৩১ সংখ্যক পুঁথির অন্তিমে লেখা আছে :

"ইতি রামায়ণ উত্তরকাণ্ড প্রকৃতম্ পরিসমাপ্ত।"

মশ দি পুর নামক লেখক তেম্বঙ্‌ মচপৎ ছন্দে সেরৎ রাম লিখিয়াছেন ; ইহাকে প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণের আধুনিক সংস্করণ বলা যাইতে পারে। ইহার সহিত যোগীশ্বরের রামায়ণের প্রায় আক্ষরিক সামঞ্জস্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে স্থলে স্থলে পার্থক্যও আছে কিন্তু এই পার্থক্য কখনো গভীর হয় নাই।

পা দ টী কা

১. H. P. Sastri, *Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss*, vol. V, Purāṇas, Rāmāyaṇa.

২. *Ind. Ant.*, 1872, pp. 120, 172, 239.

৩. Fausböll, the *Jātaka*, IV, pp. 123-130, No. 461.

৪. *La legende de Rāma dans in Avadāna Chinois*, in Album-Kern, p. 279 ff.

৫. দ্রষ্টব্য : *Indian Studies in honor of Charles Rockwell Lanman*, Harvard University Press, 1929, pp. 193-212.

৬. ঐ, পৃঃ ১৯৪।

৭. *I.S.C.C*, p. 30.

৮. *BEFEO* XXVIII, p. 149.

৯. Kats, *Het Ramayana of Javaansche tempel-reliefs*, p. 17.

১০. দ্রষ্টব্য : Poerbatjaraka in *TBG* 1932 dl. 72, *"Het Oudjavaansche Ramayana"* ; Hooykaas in *VKI* dl. XVI "The Old-Javanese Ramayana Kakawin" এবং The Old-Javanese Rāmāyaṇa : an exemplary Kakawin as to form and content in *VKNA* (afd. Lett.), 1958.

১১. The Old-Jav. Rām. Kākawin, pp. 199-201.

১২. ১।৭।

১৩. *Op. cit.*, pp. 20-21.

১৪. Ed. Sudarshana Devi, *Wṛhaspati Tattwa*, p. 48.

১৫. Pigeaud, *Java in the 14th Century*, vol. III, p. 135.

১৬. *VBG* XXII, no. II, p. 12.

১৭. *VG* IX, pp. 70-71.

১৮. *Tjandi Singasari*, p. 14.

১৯. *BKI* 82 (1926), pp. 181-82 ; also cf. Stellingen in Poerbatjaraka's *Agastya in den Archipel*, 1926, no. V.

২০. *TBG*, 72 (1932) p. 150.

২১. *Djawa* 7 (1927) pp. 268-9.

২২. *TBG* 72 (1932) pp. 151-214.

২৩. *Djawa* 12 (1932) pp. 244-7.

২৪. ইহার দিকে ডঃ পিগো আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

২৫. *Rāmāyana Oudjavaansch Heldendicht*, introduction (1900).

২৬. H. B. Sarkar, *Indian influences on the Literature of Java and Bali*, 1934, pp. 425, Published by the Greater India Society, Calcutta.

২৭. ভট্টিকাব্য ২।১৯ = যবদ্বীপীয় রামায়ণ ২।১৯।

২৮. *JGIS* III, pp. 113-7.

২৯. *VKI* 16 (1955) : The Old-Javanese Ramayana Kakawin

৩০. Quoted by Hooykaas in *Ibid* p. 16.

৩১. *Ibid* pp. 31-34.

৩২. Cf. Hooykaas, *op. cit.*, p. 34, conclusion no. 6.

৩৩. Vide Kern, *VG* X, pp. 80 ff.

৩৪. এই সংখ্যাগুলি শ্লোকসংখ্যা নির্দেশ করিতেছে।

৩৫. Kern, *op. cit.*, পৃঃ ৮৫ হইতে।

৩৫ক. ঐ, পৃঃ ৯৩ হইতে।

৩৬. ঐ, পৃঃ ১০৩ হইতে।

৩৭. ঐ, পৃঃ ১১০ হইতে।

৩৮. তুলনীয় : "সূর্যোদয়ে ভবতি যা সূর্যাস্তসময়ে চ পুণ্ডরীকস্য
বদনেন সুবদনায়াস্তে সমবস্থে ক্ষণাদ্রুঢে" কালিদাস, মালবিকাগ্নিমিত্রম্, ৪র্থ অঙ্ক, ১০৪॥

৩৯. কার্ণ, পূর্বে লিখিত গ্রন্থ।

৪০. এইস্থলে ১০৮ শ্লোকে ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ শেষ হইল ; বাল্মীকির তখনো ৩য় কাণ্ডের জের চলিতেছে।

৪১. *BKI*, 1922, dl. 78, p. 373 ff.

৪২. এইস্থলে বাল্মীকি রামায়ণের তৃতীয় কাণ্ড শেষ হইল।

৪৩. *BKI*, 1923, dl. 79, pp. 569 ff.

৪৪. *BKI*, 1924, dl. 80, p. 11 ff.

৪৫. *Ibid*, 1925, dl. 81, p. 1 ff.

৪৬. *Ibid*, p. 121 ff.

৪৭. এই সর্গের ৪৬ শ্লোকের স্থলে (= ভট্টিকাব্য ১০।৪১) বাল্মীকি রামায়ণের ষষ্ঠ কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে।

৪৮. *BKI* 82 (1926) pp. 95 ff.

৪৯. *BKI* 113 (1957) pp. 274 ff.

৫০. Quoted by Hooykaas in *VKI*, 113 (1957) p. 286.

৫১. *Ibid*.

৫২. *BKI* 82 (1926) pp. 95 ff.

৫৩. *VKI* 16 (1955) pp. 24-25.

৫৪. *BKI* 83 (1927) pp. 481 ff.

৫৫. তুলনীয়: স্কন্দপুরাণ, মাহেশ্বর খণ্ড (কেদার খণ্ড), অধ্যায় ১৭। গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন কিরূপে ইন্দ্রারি নমুচি সমুদ্রের ফেনায় নিহত হইলেন।

৫৬. *BKI* 83 (1927) pp. 481 ff.

৫৭. *Ibid*, 1927, dl. 83.

৫৮. *Ibid*, 1928, dl. 84, pp. 610 ff.

৫৯. অর্থাৎ মনুসংহিতা।

৬০. *Ibid* 1929, dl. 85.

৬১. ডঃ হূইকাশ দেখাইয়াছেন যে ভট্টিকাব্যে এই শ্লোকসংখ্যা দাঁড়াইবে ৩৯০/১৬২৫ = ২৪% ; যবদ্বীপের রামায়ণে ৬৪৫/২৭৭৪ = ২৩%। দ্রষ্টব্য Hooykaas, *op. cit.*, p. 23.

৬২. *Ibid* 1930, dl. 86.

৬৩. *Ibid* 1931, dl. 87.

৬৪. *BKI* 90 (1933) pp. 301-28.

৬৫. *BKI* 92 (1935) p. 123 ff.

৬৬. *Ibid.*

৬৭. *BKI* 94 (1936) p. 409 ff.

৬৮. *Ibid.*

৬৯. *Ibid.*

৭০. *KBNWdb*, vol. I, p. 187.

দ্বা দ শ অ ধ্যা য়

ইতিহাস বা মহাকাব্য (দ্বিতীয় পর্যায়)

অর্বাচীন রামায়ণ কাহিনী

এই অধ্যায়ে আমরা কতকগুলি অর্বাচীন রামায়ণ কাহিনীর আলোচনা করিব ; রচনার বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া উহাদিগকে আমরা একই পর্যায়ভুক্ত করিতে পারি। এই শ্রেণীর রামায়ণ কাহিনীর মধ্যে রামায়ণ শশক[১] রাম ক্লিঙ্[২], সেরৎকণ্ড[৩], মালয় হিকায়ৎ সেরি রাম[৪], রাম কিনুঙ্ বলি[৫] এবং রাম তম্বক[৬] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত রামায়ণ সংস্করণগুলি যেমন পরস্পরের সহিত নৈকট্য সম্বন্ধে আবদ্ধ বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত অর্বাচীন রামায়ণগুলির মধ্যেও সেইরূপ যোগসূত্র রহিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে এই সমস্ত অর্বাচীন রামায়ণ কাহিনীর সবগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে ; সুতরাং ইহাদের মধ্যে যেগুলি প্রধান সেইগুলি আমাদের মুখ্য আলোচনার বিষয় হইবে। তবে মধ্যে মধ্যে অপ্রধান সংস্করণগুলিও আমরা এই প্রসঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিবেচনা করিব। মালয় হিকায়ৎ সেরিরাম নামক গ্রন্থটির ডচ্ এবং ইংরেজী সংস্করণ আছে ; ইহা সম্ভবতঃ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর রচনা। সেরৎকণ্ড নামক গ্রন্থটির বিস্তৃত আলোচনা স্টুটেরহাইমের "রাম লিজেণ্ডেন আণ্ড রাম-রিলিফ্স্ ইন ইণ্ডোনেসিয়েন" নামক গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থগুলির সহিত যোগীশ্বরের কাকাবিনের যথেষ্ট মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। ডঃ গণ্ডা অনুমান করিয়াছেন[৭] যে রাম-গাথার মালয় সংস্করণ-গুলি মহাকাব্যের পরবর্তী যুগে মৌখিক কিম্বদন্তী রূপে ১২০০-১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মালয় দ্বীপপুঞ্জে আসিল এবং এখানে ইহার নানারূপ পরিবর্তন সাধিত হইল। এই কিম্বদন্তী-প্রবাহ কিছুটা আসিল পশ্চিম এবং কিছুটা পূর্ব ভারত হইতে। এখানে আমরা এই কাহিনীটি লইয়া আলোচনা করিব। গ্রন্থের সূচনায় মক্কার নবি আদম এবং তাঁহার পুত্র অবিল এবং কবিলের কথা বলা হইয়াছে। মনিকময় নামধারী শয়তান ইদজিলের কাহিনীও বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার নবি আদমের সাক্ষাৎ বংশধরগণ সম্বন্ধেও কিছু তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন।

সেরৎকণ্ড লিঙ্গ রিঙ্গিৎ পূর্ব নামক আখ্যায়িকাতেও[৮] ইসলামের প্রভাব বিদ্যমান ; ইহার আরম্ভ হইয়াছে আদম এবং ইভের কলহকে কেন্দ্র করিয়া। ষ্টুটেরহাইমের সংস্করণেও হিন্দু দেবদেবী এবং ইসলামের প্রধানগণের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, যেমন নবি নুহ্ (নোয়া), দেবি উম (উমা), সঙ্গ হ্যঙ্গ বয়ু (বায়ু) প্রভৃতি। লেখক অতঃপর এক যুগান্তকারী মহাপ্লাবনের

বর্ণনা করিয়াছেন ; শয়তান ইদজিল মুহ্-এর নৌকায় পলায়ন করিয়া মহাপ্লাবনের সর্বগ্রাসী বিপর্যয় হইতে রক্ষা পাইলেন। অতঃপর বিষ্ণু এবং বাসুকীর জন্মকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই সমস্ত কাহিনীর নেপথ্যে বা পটভূমিকায় ঐস্লামিক প্রধানগণ বিদ্যমান।

রাম এবং রাবণের কাহিনী দ্বাবিংশ সর্গে বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু রামের জন্মকাহিনী ৪৬ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। অন্তর্বর্তী সর্গে এই দুইজন রাজা এবং তাহাদের বংশ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং রাবণের ইতিহাস—যাহা বাল্মীকির শেষকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে—উপযুক্ত স্থলেই বর্ণিত হইয়াছে*। গল্পে বিবৃত হইয়াছে যে দৈত্যরাজ কুবচ ইন্দ্র ব্রমের (ব্রহ্মার) নিকট হইতে গিলিঙ্গ বেসিকে প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পুত্র ছিল কয়েকটি যথা—নিতি কুবচ, দৈচ সুমঙ্গলি (সুমালী) এবং জম্বু মঙ্গলি। তাহার চিত্রাবতি-নাম্নী এক কন্যাও ছিল। গিলিঙ্গ বেসির রাজ্যের নাম এখন ইন্দ্রপুরী দেওয়া হইল। নিতিকুবচকে এখন ক্রবস্ পুর্বের রাজা করা হইল।

দেবগণ আশঙ্কা করিলেন যে কুবচ ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছেন। সুতরাং দৈত্যরাজের ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহারা স্রিএষ্ট (স্রিগতির পুত্র), অদিসেরৎ (চিত্রগদের পুত্র) এবং ব্রমরজের (নেরদের=নারদের প্রপৌত্র) সহিত সংঘবদ্ধ হইলেন। ইহাদের মধ্যে অদিসেরৎকে ক্রবস্কণ্ডের রাজ্য এবং ব্রমরজকে ইন্দ্রপুরী দেওয়া হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইল। স্রিতুষ্ট এই সর্তে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন যে তাঁহার বংশধরগণ যবদ্বীপের প্রথম রাজবংশ স্থাপিত করিবেন। অতঃপর কুবচ ইন্দ্রকে নিহত করা হইলে তাঁহার মৃতদেহ অন্তর্হিত হইল। তখন ব্রমরজ ইন্দ্রপুরীর রাজা হইয়া দৈত্যরাজের কন্যা চিত্রবতিকে বিবাহ করিলেন। উহাদের এক পুত্র হইল ; তাহার নাম হইল চিত্রবহ। ব্রমরজের দ্বিতীয়া পত্নী সন্ত্রবতির গর্ভে কয়েকটি সন্তান হইল, যথা সকিসর, ঙ্গমদিত এবং শ্রিমন্দল।

পুর্ব সর্তানুযায়ী অদিসেরৎ ক্রবস্কণ্ডের রাজা হইলেন।

ইহার পর বিস্নু (বিষ্ণু) এবং প্রতিবি-র (পৃথিবী) প্রেমলীলার কাহিণী বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সর্পরাজ নগ প্রতল ইহার বিবরণ সর্বত্র রটনা করিলেন।

অতঃপর অদিসেরৎ অঞ্জক্রবতি (ইহা অদিসেরতের পুর্ণনাম) সর্পদন নামক মর্কটকে এবং বটুলবিজন নামক দৈত্যকে দেশ শাসকরূপে নিয়োগ করিলেন। এই সময় কলমুক এবং ত্রিএষ্ট অদিসেরতের ভগ্নি চিত্রবুলনকে বিবাহ করিতে উদ্যোগী হইলেন। অদিসেরৎ তাহাদিগকে একটি বাক্স দিয়া বলিলেন যে ইহার মধ্যে তাঁহার ভগ্নীকে পাওয়া যাইবে। তাহারা অতঃপর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। কিন্তু বাক্সটি মুক্ত করা মাত্র উহা হইতে এক গভীর কুয়াশা সমুত্থিত হইল। উহার সঙ্গে একটি শৃঙ্খলও বাহির হইয়া আসিয়া উভয়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল। এইরূপ অবস্থায় এই দুইজন রাজা অদিসেরতের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কলমুখ তখন অদিসেরতের নিকট নতজানু হইয়া বলিলেন যে তিনি রাজার ভগ্নীকে আর বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নহেন এবং চিত্রবুলন ইচ্ছা করিলে ত্রিএষ্টকে বিবাহ করিতে পারেন।

অদিসেরতের দুইজন পুত্র ছিল ; উহাদের নাম ছিল দিমন্ত্রজ এবং ক্রবধ্বজ। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুস্তদরি ত্রবতিপুরের রাজা ছিলেন। তাঁহার আর একটা নাম ছিল গুটক।

তাঁহার দুইপুত্র ছিল এবং তাঁহাদের নাম ছিল শ্রি গুতম এবং রেসি কল। এখন চিত্রবহ নিতি-কুবচের কন্যা নি ইন্দ্রত্মকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করিলেন। তিনি দৈত্যগণকে পরাজিত করিয়া এবং সকিসরকে সাময়িক শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া চিত্রবহ রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রস্তাবিত বিবাহকার্য এখন নিষ্পন্ন হইল এবং ইহা স্থির হইল যে বলিকস্ প্রত্যাবর্তন করিলে রাজ্য তাহাকে দেওয়া হইবে। ইহার পর পূর্বকণ্ডের সুমঙ্গলির কন্যা সুকেশির সহিত রাজার বিবাহ হইল। চিত্রবহের প্রথমা পত্নী নি ইন্দ্রাত্মির গর্ভে একটি পুত্র হইল; তাঁহার নাম হইল দসমুক; দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে দুইটি যমজ সন্তান হইল। তাঁহাদের নাম হইল অম্বকর্ণ (কুম্ভকর্ণ) এবং সর্পকনক (শূর্পনখা)। অতঃপর রিবিসনের (বিভীষণ) জন্ম হইল। হিকায়ৎ সেরিরম অনুযায়ী তাঁহাদের ভগ্নীর নাম ছিল সুর পন্দকি[১০]; ইহা সংস্কৃত নামটির প্রাকৃতরূপ বলিয়া মনে হয়।

দসমুকের উদ্ধত ব্যবহারের জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে নির্বাসন করিলে তিনি ঙলেঙ্ক (লঙ্কা) নামক দ্বীপে পদার্পণ করিলেন। ইহা মালয় সংস্করণেও বর্ণিত হইয়াছে। এই দ্বীপে আসিয়া তিনি পুর্বলিঙ্গজলুমকে (নবি আদম)[১১] দেখিতে পাইলেন; পুর্বলিঙ্গজলুম বলিলেন যে দসমুক যদি ধর্মপথে চলেন এবং মুনিঋষিগণের কোন অপকার না করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে চারি ভুবন এবং দৈত্যদানবের অধীশ্বর করিয়া দিবেন। অতঃপর তাঁহার নাম হইল রহ্‌বন অজি; তিনি খুব সুন্দর একটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করিয়া বগ্রসিঙ্গকে পতিহ্ নিযুক্ত করিলেন। ইতিমধ্যে বিসবর্ন (রহ্‌বনের ভ্রাতা) চিত্রবহের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। রাবণ তখন তাঁহার পিতাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন। তিনি তখন ইন্দ্রপুরিতে উপস্থিত হইলেন এবং বিসবর্ন সর্গে পলায়ন করিলেন। রাবণ তখন তাঁহার রাজ-প্রাসাদ অধিকার করিলেন। তিনি অতঃপর বিসবর্নের পুত্র বিল্‌মনরম্‌জকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া সকিসরকে রাজধানীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন।

ইত্যবসরে অন্যদিক হইতে প্রতিহিংসার আয়োজন চলিতেছিল। যখন বলিকস্ ক্রবস্ পুর্বে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন তিনি চিত্রবহের কার্যকলাপ শুনিতে পাইয়া ইহার প্রতি-বিধান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, কিন্তু সকিসর এই বিপদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে মনস্থ করিলেন। তখন সকলে ঙলেঙ্ক আসিয়া উপনীত হইলেন এবং বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নূতন মৈত্রীর বন্ধন গড়িয়া তুলিলেন। বগ্রসিঙ্গ সর্পকনককে, অম্বকর্ন বলিকসের এক কন্যাকে, বিবিসন শ্রিমলহিনকে এবং চিত্রবহের পুত্র চতুর্জন সকিসরের এক কন্যাকে বিবাহ করিলেন।

স্বর্গ আক্রমণ করিলে দেবগণ সেখান হইতে কোন প্রকারে পলায়ন করিলেন। রহবন অতঃপর অদিসেরৎকে শাস্তিপ্রদান করিতে সমুদ্যত হইলেন। কারণ অদিসেরৎ তাঁহার দূতগণের সহিত অপমানজনক ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। তিনি তখন বশ্যতা স্বীকার করিবার জন্য অদিসেরতের নিকট দুইজন দূত প্রেরণ করিলেন। অদিসেরৎ ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে রহবন বানরসৈন্যের নিকট পরাভূত হইবেন। শ্বেত বানর সঙ্গ পর্দন বের্গব নামধারী এক মহাপুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার ধ্বংসসাধন করিবেন[১২]।

অতঃপর রাজা অদিসেরৎ তপস্যা করিবার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। রহ্‌বন তখন অদিসেরতের স্ত্রীকে তাঁহার স্বামীর ছদ্মবেশে অপহরণ করিতে প্রয়াসী হইলেন। রাজার দুই সেনাপতি বটলবিজন এবং পর্দন রহ্‌বনকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিলেও শেষ পর্যন্ত উভয় সেনাপতিই নিহত হইলেন। পর্দন হনুমান-অবতারে ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। ইত্যবসরে অদিসেরৎ-পত্নী স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে রহ্‌বন তাঁহাকে পুনরায় দমন করিতে গিয়া অদিসেরতের নিকট পরাজিত হন।

কালক্রমে অদিসেরৎ অঞ্জক্রবতির পুত্র দিমহ্রুজ ক্রবস্কণ্ডের রাজা হইয়া অদিসেরৎ মহরজ নাম পরিগ্রহণ করিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র রুবত্মজ একটি সহর প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মন্দ্রপুরের[১৩] অরণ্যানী নির্মূল করিতে লাগিলেন[১৪]। মালয় সেরৎকণ্ডেও আমরা দুই ভ্রাতার বিবরণ দেখিতে পাইতেছি। হিকায়ৎ সেরি রামে আমরা দেখিতে পাই যে রাজা দশরত অনুরূপ অবস্থায় অর্থাৎ নূতন একটি সহর স্থাপন করিবার জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করিতেছেন। যবদ্বীপীয় এবং মালয় সংস্করণ অনুযায়ী কেবলমাত্র এক ঝাঁড় বাঁশ অবশিষ্ট রহিল। মালয় সংস্করণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে এই বাঁশ ঝাড় কাটা মাত্রই আবার জন্মিতে লাগিল। সুতরাং রাজা স্বয়ং সেস্থলে গমন করিয়া সেই বাঁশঝাড় ধ্বংস করিলেন এবং সেখান হইতে এক পরম-রূপসী সুন্দরী আবির্ভূত হইলেন। যবদ্বীপীয় সেরৎকণ্ডে আমরা পড়ি যে রাজা ঐ বংশকুঞ্জের সন্নিকটে রাত্রির স্নিগ্ধ সমীরণ উপভোগ করিতেন। একদা রাত্রিকালে তিনি ঐ বাঁশঝাড় মধ্যে এক উজ্জ্বলপ্রভ দেহকে প্রবিষ্ট হইতে দেখিলেন। তিনি ঐস্থলে এক ফাঁদ পাতিয়া একজন বিদ্যাধরীকে বন্দিনী করিলেন; তিনি ছিলেন হ্যঙ্গ বিষ্ণুমূর্তির পৌত্রী শ্রীমতী বল্যদরু। হিকায়ৎ সেরিরামে তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছে মন্দুদরি; বলিয়দরি ছিল তাঁহার অপর মহিষীর নাম। যবদ্বীপীয় সংস্করণে আমরা পড়ি যে বল্যদরুকে অদিসেরৎ মহরজ বিবাহ করেন। অন্য এক সময়ে তিনি বাঁশঝাড়ে একজনকে ক্রন্দন করিতে শুনিতে পান। বল্যদরু তাঁহাকে বলিলেন যে ঐ ক্রন্দসী নারী অপর একজন বিদ্যাধরী। তাঁহার নাম রেত্ন অজু বন্দোনদরি এবং তিনি হ্যঙ্ রুবের কন্যা এবং বসুকির পৌত্রী। অদিসেরৎ মহরজ তাঁহাকেও নিজের রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন এবং অবশেষে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। বিষ্ণুপতি তাঁহার কন্যা বল্যদরুর বিবাহ উপলক্ষ্যে আসিয়া অদিসেরৎ মহরজকে মন্দ্রপুরির দশরত নামে আখ্যাত করিলেন।

লেখক অতঃপর রহ্‌বনের বিবরণ পরিবেশন করিয়াছেন। রহ্‌বন এখানে দ্বিতীয় ডন্ জুয়ানের মত চিত্রিত হইয়াছেন। রহ্‌বন দীর্ঘজীবন লাভের জন্য সচেষ্ট হইয়া হ্যঙ্ গুরুর নিকট সমুপস্থিত হইলে হ্যঙ্ গুরু তাঁহাকে বিষ্ণুর নিকট প্রেরণ করিলেন। দেবগণ রহ্‌বনের দীর্ঘ জীবন লাভের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হইয়া আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। বিষ্ণু দেবগণকে সাহায্য করিতে চাহিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে মনস্থ করিলেন। ইত্যবসরে রহ্‌বন বিষ্ণুর নিকট তাঁহার প্রার্থনা লইয়া সমুপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার আঁখি বিষ্ণুপত্নী শ্রি মেন্দণ্ডের অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতি নিবদ্ধ হইল। বিষ্ণু ইহাতে আপত্তি করিলে, রহ্‌বন তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন। অতঃপর বিষ্ণু এবং

শ্রি মেন্দঙ্ পলায়ন করিয়া অন্যত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। রহ্বন কিন্তু শ্রি-র পশ্চাদ্ধাবন করা পরিত্যাগ করিলেন না। পথিমধ্যে তিনি একজন বিদদরির সাক্ষাৎলাভ করিলেন; বিদদরিটি ছিলেন হ্যঙ্ ইন্দ্রের কন্যা। তাঁহার রূপমাধুরী রহ্বনের কামলিপ্সা উদ্রেক করিল। ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য আক্রমণের আশঙ্কায় তাঁহার কন্যাকে রহ্বনের নিকট সমর্পণ করিলেন। কিছুকাল পরে রহ্বন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ঙলেঙ্ক-তে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইতিমধ্যে শ্রি মেন্দঙ্ নবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রহ্বন তাঁহাকে ঙবু-লঙ্গিৎ হইতে আনিবার জন্য মরিচ এবং গুমুককে আদেশ প্রদান করিলেন। ঙবু লঙ্গিতে উপনীত হইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে রাজা লেস্মস্তকের কন্যা নিতান্ত শিশু; সুতরাং শিশুটি যৌবনপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহারা অপেক্ষা করিতে সিদ্ধান্ত করিলেন। লেস্মস্তক তাঁহাদের একজনকে পত্রসহ ঙলেঙ্কতে প্রেরণ কবিলেন। সেরৎকণ্ডের লেখক অতঃপর দ্রবতিপুরের বর্ণনা পরিবেশন করিয়াছেন। সেখানকার রাজা ছিলেন হ্যঙ্ গুটক। তিনি গুতমকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন, কিন্তু গুতমের রাজৈশ্বর্যের প্রতি কোন লোভ ছিল না। সুতরাং তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া গুটক রেসি কলকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিলেন, কিন্তু তাহাতে এই সর্ত রহিল যে গুতম যদি কখনো প্রত্যাবর্তন করেন তাহা হইলে রেসি কল রাজ্যের ভার তাঁহার হস্তেই প্রত্যর্পন করিবেন। কার্যতঃ গুতম গজেন্দ্র নামধারী এক ব্যক্তির গৃহে গিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন এবং তাঁহার কন্যাকে[১৫] বিবাহ করিলেন। অতঃপর উভয়ে দ্রবতিপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া রেসি কলের হস্ত হইতে রাজ্যভার পরিগ্রহণ করিলেন। রাজ্যচ্যুত রেসি কল একটি নূতন র‍্যাজ্য গঠন করিলেন তাহার নাম হইল মন্তিলদির্জ।

আমরা পুর্বেই দেখিয়াছি যে বিস্নু মনুষ্য-অবতারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তখন তাঁহার নাম হইল পর্তবিজয় এবং তিনি রঙ্কঙ্ কেঞ্চন নামক স্থানের অধিপতি হইলেন। তাঁহার পুত্র অর্জুনবিজয় ঙবু লঙ্গিতের রাজকন্যা দেবি সেচবতিকে স্বপ্নে দেখিয়া প্রণয়মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একটি ভবনে যখন তিনি কঠোর তপশ্চর্যায় ব্রতী ছিলেন, তখন দশজন নরপতি তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলেন, কারণ তাহারা ঐ প্রাসাদে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেন। এই বিবাদ যুদ্ধে পর্যবসিত হইলে অর্জুনবিজয় দশবাহু পরিগ্রহণ করিলেন। রাজগণ তখন পরাজিত হইলেন। সেরৎকণ্ড নিঙ্গ রিঙ্গিৎ পুর্ব[১৬] নামক কাহিনী অনুযায়ী পরাজিত রাজগণের কন্যাগণকে তিনি বিবাহ করিলেন। ষ্টুটেরহাইমের সংস্করণে লেখা আছে যে তিনি ঐ রাজপ্রাসাদকে মাওসপতি নামে[১৭] অভিহিত করেন। অতঃপর তিনি লেসমস্তকের কন্যা এবং ঙবু লঙ্গিতের রাজকন্যাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। আমরা পুর্বেই দেখিয়াছি যে লেসমস্তক ইতিপুর্বেই রহ্বনের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন; রহ্বন সেই পত্র পাঠ করিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি মরিচের অধীনে এক বিপুল সৈন্যবাহিনী সংগৃহীত করিলেন।

ইতিমধ্যে দেবি সেচবতিও মাওসপতির সুন্দর রাজপুত্রকে স্বপ্নে দেখিয়া প্রেমমুগ্ধ

হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন অর্জুনবিজয়। অর্জুনবিজয় আসিয়া সেচবতির পাণিপ্রার্থনা করিলে রাজকন্যা এই সর্তে স্বীকৃত হইলেন যে রাজপুত্র তাঁহাকে একশতটি মর্মরমূর্তি হইতে খুঁজিয়া বাহির করিবেন। রাজপুত্র এই পরীক্ষায় জয়ী হইলেন। তখন একটি স্বয়ম্বরের আয়োজন করা হইল এবং ইহাতে দসবোজ (দশভুজ) সস্রবোজ (সহস্রভুজ) হইয়া সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিলেন। অতঃপর তিনি এবং রাজকন্যা পক্ষী স্রুবেন্দের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শূন্যপথে মাওসপতি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শূন্যপথে চলিতে চলিতে পক্ষীর পুরীষ ঙলেঙ্কের দরবার কক্ষে নিপতিত হইল। রহ্‌বন নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষস গুটককে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে পাঠাইলেন। গুটকও শূন্যে উড়িতে পারিত। ইত্যবসরে মরিচ দেখিতে পাইলেন যে রহ্‌বন যাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন, সেই কন্যাকে লইয়া অর্জুন-বিজয় শূন্যপথে চলিয়া যাইতেছেন। রাক্ষস রাজসৈন্য পাঠাইবার নির্দেশ দিয়া স্বয়ং শূন্যপথে মওসপতি অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রহ্‌বন সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। যখন অর্জুনবিজয় গভীর সমাধিমগ্ন ছিলেন তখন রহ্‌বন সেচবতিকে অপহরণ করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করিলেন। ইহাতে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইলে অর্জুনবিজয়ের একজন পত্নী স্বামীর তপস্যা ভঙ্গ করিলেন। রহ্‌বন এবং অর্জুনবিজয়ের দ্বৈত সংগ্রাম সাতদিন সাতরাত্রি ব্যাপিয়া চলিল। অবশেষে রহ্‌বন ভবিষ্যতে সদ্ব্যবহার করিবার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইয়া সেইস্থল পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াই তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন। তাঁহাকে আবার শাস্তিপ্রদান করা হইল। লোকে দেখিতে পাইল যে সস্রবহু হইলেন ভগবানের অবতার। রহ্‌বনের সমস্ত সৈন্যবাহিনী অতঃপর ঙলেঙ্কতে প্রত্যাবর্তন করিল।

জসদর্ম এবং সস্রবোজের কাহিনীর পরে সেরৎকণ্ডের লেখক রেসি গুতমের আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছেন। রেসি গুতম এবং তাঁহার পত্নী দেবি রোস্তের তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। তাঁহাদের নাম ছিল দেবি অঞ্জনি, সুবলি এবং সুগ্রিব। লেখক বলিয়াছেন যে যথার্থভাবে বলিতে গেলে শেষোক্ত দুইজন তাঁহাদের সন্তান ছিলেন না। দেবি রোস্তহ্‌ এবং আদিত্য-দেবের প্রণয়সঙ্গমের ফলে ইহারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। অঞ্জনি তাঁহার মাতাকে অনুযোগ দিয়া চুপুমনিক নামক যাদুমন্ত্রের পুস্তক আদায় করিয়া লইল। দেবি রোস্তহ্‌ যে বাক্স হইতে টাকা পয়সা দিতেন তাঁহার দিকেও তাঁহার লোভদৃষ্টি নিপতিত হইল। ইহা হইতে বিবাদ সৃষ্টি হইলে সমস্ত ঘটনাটি পিতার কর্ণগোচর হইল। তখন গুতম সেই বাক্সটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে যে-ব্যক্তি ঐ বাক্সটি সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারিবেন তিনিই ঐ বাক্সের মালিক হইবেন। অঞ্জনির প্রতিভূ এবং অঞ্জনির ভ্রাতা কেহই ঐ বাক্স উদ্ধার করিতে পারিলেন না। তাঁহারা সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইলে শ্বেত বানরে পরিণত হইলেন। প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা অঞ্জনির মুখমণ্ডল সেই জল দিয়া ধৌত করিয়া দিলে অঞ্জনির মুখও বানরের মত হইয়া গেল। এক অভিশাপের ফলে তাঁহার মাতাও পাষাণে পরিণত হইলেন; গুতমও একটি মসৃন পাষাণের উপর বসিয়া কঠোর তপশ্চর্যায় ব্রতী

হইলেন। অঞ্জনিও সমুদ্রের মধ্যে একটি সুচীর অগ্রভাগে বসিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। সুবলি একটি বৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং অঞ্জনির প্রতিভূ সুমন্দ ঐ বৃক্ষের নিম্নে উপবেশন করিলেন।

আখ্যায়িকা এইবার আর একটি মোড় নিল। এই স্থলে কি বুজুতের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কি বুজুতের বটু গুমুঙ্গ নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। বটু গুমুঙ্গের দৈত্যের মত আকৃতি না হওয়ায় পিতার মনঃকষ্টের সীমা ছিল না। তাঁহার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণ তাঁহাকে গেতহ্ বঞ্জরণ নামক এক দৈত্যাকৃতি পুত্র দিলেন। গেতহ্ বঞ্জরণ বটরতন্ত্রের কন্যা দেবি তরবতিকে অপহরণ করিলে, তরবতি কোনক্রমে পলায়ন করেন। অতঃপর রহ্বন এবং গেতহ্ বঞ্জরণের মধ্যে দ্বৈত সংগ্রামের কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। ইত্যবসরে দেবদূত নেরদ গেতহ্ বঞ্জরণের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় সমর্থ এইরূপ একজন বীরের সন্ধান করিতেছিলেন। তিনি বৃক্ষশাখায় সুবলিকে দারুন তপশ্চর্যায় ব্রতী দেখিতে পাইলেন। এই শক্তি পরীক্ষায় বিজয়ী হইলে সুবলি দেবী তরবতিকে প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া নেরদ আশ্বাস দিলেন; তিনি সুবলিকে দীর্ঘায়ু লাভ করিবার জন্য পঞ্চসোন নামক একটি যাদুমন্ত্রও দান করিলেন। সমুদ্র হইতে আসিয়া সুবলি গেতহ্ বঞ্জরণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। যাদুমন্ত্রের জন্যে গেতহ্ বঞ্জরণ পারিয়া উঠিলেন না এবং তিনি অবশেষে নিহত হইলেন। এই কাহিনীটি রুর্দা ভান আয়েসিঙ্গা কর্তৃক সম্পাদিত হিকায়ৎ সেরিরম-সংস্করণেও বিবৃত হইয়াছে[১৮]। এইরূপে সুবলি তরবতিকে বিবাহ করিলেন এবং যোগপ্রভাবে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিলেন। ইহার নাম হইল রঙ্গস্তিন। সুমন্দ তাঁহার পতিহ্ হইলেন; তিনি অবশেষে জেম্বন নামে সমধিক খ্যাত হইলেন। সুগ্রিব পতিহ্ জেরো[১৯]-রূপে মনোনীত হইলেন। এখন রেসি কল দ্রবতিপুর্বের অধীশ্বর হইলেন এবং গুতম স্বর্গে গমন করিলেন।

দেবি তরবতি একদা তাঁহার প্রমোদ উদ্যানে গর্ভাবস্থায় কালাতিপাত করিতেছিলেন; সেই সময় রহ্বন তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া মুগ্ধ হন। রহ্বন তাঁহাকে অপহরণ করিতে আসিলে সুবলি তাঁহাকে পরাজিত করেন। অবশেষে উভয়পক্ষে মৈত্রী সংস্থাপিত হইল এবং রহ্বন সুবলির কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে পরিগৃহীত হইলেন। রহ্বন ঙলেঙ্কতে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি দশরতের স্ত্রী বন্দোন্দরির সৌন্দর্যের খ্যাতি শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি শূন্যপথে মন্দ্রপুর গমন করিয়া বন্দোন্দরিকে দাবী করিয়া বসিলেন। বন্দোন্দরি কিন্তু রহ্বনকে ফাঁকি দিবার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি তাঁহার দেহের ক্লেদ হইতে অপর একটি প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিলেন; তাঁহার নাম দেওয়া হইল বন্দোন্দরীক্লালার। আসল বন্দোন্দরির নাম হইল দেবি রগো। রহ্বণ অতঃপর তাঁহার সহিত ঙলেঙ্ক প্রত্যাবর্তন করিলেন; দশরত বন্দোন্দরির সহিত সহবাস করিতে লাগিলেন এবং বেগবন(=ভগবান) চন্দ্রদেবের সহায়তায় একটি পুত্র লাভের জন্য গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ডাঃ ষ্টুটেরহাইম বলিয়াছেন[২০] যে কোন কোন গ্রন্থে দশরতের স্ত্রীকে উপঢৌকন দিবার পুর্বেই এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মালয় হিকায়ৎ সেরিরমের সহিত এই কাহিনীর আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য রহিয়াছে।

বিষ্ণু এবং শ্রি মন্দ্রপুরে অবতাররূপে জন্ম পরিগ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইলেন এবং বসুকিও সহচরীরূপে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। এই সময়ে রহ্‌বন সেইস্থলে উপস্থিত হইলে সকলে পলায়ন করিলেন। বিষ্ণু দশরতের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া রক্ষা পাইলেন এবং শ্রি বিবিৎসমুকের কন্যায় পরিণত হইলেন। রহ্‌বন তৎসত্ত্বেও শ্রি-র পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকিলে, শ্রি নিজেকে ডিম্বে পরিণত করিলেন, কিন্তু রহ্‌বন উহা গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া নকল বন্দোন্দরির সহবাস করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যদি তাঁহার স্ত্রী পুত্রসন্তান প্রসব করে তাহা হইলে তিনি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবেন এবং কন্যাসন্তান হইলে তাঁহাকে স্ত্রীরূপে পরিগ্রহণ করিবেন[২১]।

মন্দ্রপুরে বল্যদরুর এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল; সন্তানটি বিষ্ণুর অবতার এবং বের্গব নামে পরিচিত হইল। রগো-রও একটি পুত্র হইল; তাহার নাম হইল মূর্দক এবং তিনি ছিলেন বসুকির অবতার। দশরতেরও কয়েকটি সন্তান হইল; ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দুইজনের নাম হইল ব্রগন্ত এবং তুবিগঞ্জ। অতঃপর বল্যদরুর বের্দোন নামে এক সন্তান হইল; রগোর চিত্রদোন নামক এক সন্তান হইল। বিষ্ণুর যে সমস্ত দিব্য-অস্ত্র রহ্‌বনের সহিত যুদ্ধের সময় জন্তুরূপে পরিণত হইয়াছিল সেইগুলি আবার অস্ত্ররূপে পরিণত হইল। বালকগণের প্রথম উল্লেখযোগ্য সংগ্রাম হইল মাওসপতির জসদর্মের সহিত যুদ্ধ।

রহ্‌বনের স্ত্রী দেবি কেন্দ্রনের গর্ভে ইন্দ্রজিৎ নামক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। নকল বন্দোন্দরিরও এক কন্যা হইল; তিনি শ্রি-র মর্ত্য অবতার। রহ্‌বন যদি এই কন্যাকে বিবাহ করেন এই আশঙ্কায় তাঁহার মাতা তাঁহাকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলেন। চিবিসন (=বিভীষণ) যাদুমন্ত্রের সাহায্যে মেঘনদ নামক পুত্রলাভ করিলেন[২২]। রহ্‌বন বুঝিতে পারিলেন যে এই বালক একদা তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন; সুতরাং তিনি তাঁহাকে কঠিন পাষাণে নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল না। ভাসমান সন্তানের কাহিনীটি হিকায়ৎ সেরি রম নামক গ্রন্থেও বিবৃত হইয়াছে।

মন্‌তিলির রেসি কল উপরোক্ত ভাসমান বাক্সটিকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহাকে কন্যারূপে পরিগ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম দিলেন সিন্ত। সিন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, স্বর্গ হইতে একটি ধনুক নিপতিত হইল। তিনি স্থির করিলেন যে যে-ব্যক্তি ঐ ধনুকে টঙ্কার দিতে এবং নয়টি তালবৃক্ষ ভেদ করিতে পারিবেন তাঁহাকেই তিনি তাঁহার কন্যা প্রদান করিবেন। দেশবিদেশ হইতে বহু রাজন্য আগমন করিলেন, কিন্তু কেহই এই দুরূহ কার্য সম্পন্ন করিতে পারিলেন না। অবশেষে বের্গব আসিয়া ধনুর্বিদ্যার প্রতিযোগিতায় ঈপ্সীত ফললাভ করিলেন। রহ্‌বন ছয়টি তালবৃক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। রামায়ণের এই কাহিনীটির বিকৃত স্বরূপ এখানে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে; রম কিতুঙ্‌ বলি-তে[২৩] এই কাহিনীটি আরো বিকৃত করা হইয়াছে, কারণ ইহাতে মহাভারতের কয়েকজন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাই। স্পষ্টতঃই মনে হয় যে লেখক কাহিনীটিকে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের সহিত গণ্ডগোল করিয়া ফেলিয়াছেন। কারণ, এখানে যে কেবলমাত্র রাম এবং তাহার ভ্রাতৃগণ উপস্থিত আছেন

তাহা নহে ; দুর্যোধন, ভীম, অর্জুন প্রভৃতি মহানায়কগণও এখানে সমুপস্থিত। রম নিতিসের কাহিনীটিতে আরো স্বাতন্ত্র্যের ভাব পরিস্ফুট[২৪]।

বিবাহ-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গেলে, নব বিবাহিতা বধূ এবং ভ্রাতা মুর্দকের সহিত গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজধানীতে যাওয়ার পথে মুর্দক রেসি চন্দ্রদেবের সহিত তপস্যায় ব্রতী হলেন।

গ্রন্থকার অতঃপর বর্ণনা করিয়াছেন কিরূপে বের্গব এবং সিন্ত বানরে রূপান্তরিত হইলেন। মালয় সংস্করণে বর্ণিত হইয়াছে যে রাম এবং সীতা একদিন একটি নির্মল সরোবরে স্নান করিতে যাইয়া বানরে রূপান্তরিত হইলেন। তখন তিনি লক্ষ্মণের পরামর্শ অনুযায়ী অপরিষ্কার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইলেন। সীতা পূর্বেই গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। তিনি বানরপুত্রকে সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার গর্ভ দেবি অঞ্জনির দেহে সংস্থাপিত করিলেন। অতঃপর হনুমান জন্মগ্রহণ করিলেন। রম কিতুঙ্ বলি[২৫], রম ক্লিঙ্ প্রভৃতি গ্রন্থানুযায়ী হনুমান রাম এবং অঞ্জনির পুত্র।

ইহার পর যবদ্বীপীয় সেরৎকণ্ডে দেখিতে পাইতেছি যে নাম পরিবর্তনের পালা আরম্ভ হইয়াছে। এখানে বের্গবকে দেখিতে পাইতেছি শ্রি রম মূর্তিতে, এবং মুর্দককে পাইতেছি লেস্‌মন মূর্তিতে। রাজা দশরত তাহাদিগকে গৃহে আনিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন কিন্তু তাঁহারা বনবাসে থাকিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অতঃপর লেসমন এবং সর্পকনকের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। লেসমন তাঁহার নাসিকা কর্তন করিলে সর্পকনক লজ্জায় আর কাহাকেও তাঁহার মুখ দেখাইলেন না। রহ্‌বন তাঁহার বীভৎস মুখ দেখিয়া মরিচ এবং বিলমু্কবহুকে সিত-র নিকট প্রেরণ করিলেন, কারণ শ্রি যে সিতরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা রহ্‌বন স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারিলেন। তাহার পর কিদঙ্ কেন্‌চন বা স্বর্ণমৃগের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। জেন্টয়ু বা জটায়ুর কাহিনীটি মূলতঃ সংস্কৃত এবং কবি-সংস্করণকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছে।

কাহিনীটির পরবর্তী দৃশ্যের আরম্ভ হইয়াছে কিষ্কেণ্ড-তে ; সেখানে মহেসসুর এবং জতসুর ভীষণ সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল। অবশেষে জতসুর তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া বতর সক্রের কন্যা তরবতিকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। তরবতির পিতার নিকট এই প্রস্তাব গ্রহণীয় বলিয়া মনে হইল না ; সুতরাং তিনি ঐ দৈত্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রগস্তিনের বীর সুবলির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন যে সুবলি যদি যুদ্ধে বিজয়ী হন তাহা হইলে তিনি তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন। এই সর্ত স্বীকার করিয়া সুবলি কিষ্কেণ্ডের একটি গর্তে বাস করিতে লাগিলেন এবং উভয় দৈত্যকে নিহত করিলেন। এদিকে সুগ্রিব সক্রের কন্যাকে দখল করিয়া রগস্তিনের অধিপতি হইয়া বসিলেন। সুবলি কিছুকাল পরে তাঁহার পত্নীকে আবার হস্তগত করিলেন এবং তরবতি সন্তান সম্ভবা হইলেন।

এদিকে রম ক্ষুৎপিপাশায় কাতর হইয়া একটি বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিলেন। বৃক্ষোপরি সুগ্রিব উপবিষ্ট ছিলেন ; তাঁহার অশ্রুধারা প্রবলবেগে রমের বক্ষোপরি পতিত হইতে

লাগিল। রম উঠিয়া সুগ্রিবের সহিত পরিচয় করিলে সুগ্রিব বলিলেন যে রহ্‌বন সুবলির নিকট তাঁহার কর প্রদান করিতে আসিবেন। সুগ্রিব অতঃপর রমের সহিত সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন এবং উভয়ে সুবলিকে নিহত করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। কিষ্কেণ্ডের পথে রম সুগ্রিবকে তাঁহার কণ্ঠে নারিকেল বৃক্ষের পাতার মালা পরিধান করিতে বলিলেন। অতঃপর সুগ্রিব সুবলিকে নিহত করিলেন। তখন অঙ্গদ রগস্তিনের রাজা হইলেন এবং সুগ্রিব দেবি তরবতিকে বিবাহ করিলেন।

রম এবং লেসমন অতঃপর সুবেল নামক পর্বতে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইলেন। গ্রন্থকার ইহার পর রম এবং অনোমনের একটি ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছেন। কথিত হইয়াছে যে অনোমন রমের ভোজনপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছিলেন। যাহা হউক লঙ্কার অভিযান বর্ণনা প্রসঙ্গে সেরৎকণ্ড এবং রামায়ণ শশক উভয় গ্রন্থেই লেখক মহাভারতের কয়েকজন বীরপুরুষকে আমদানী করিয়াছেন। এই স্থল হইতে যুদ্ধের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত এই সংস্করণগুলির মৌলিক পার্থক্য খুব বেশী দৃষ্টিগোচর হয় না। রহ্‌বনের মৃত্যু সম্বন্ধে সেরৎকণ্ডে এক অদ্ভুদ কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। উক্ত হইয়াছে যে রাক্ষসরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার অর্ধমৃত বিশাল দেহ একটি বিরাট পর্বতের নীচে সমাধিস্থ করা হইল। সংস্কৃত কাহিনীতে এই বিবরণটি অন্যপ্রকারে দেওয়া হইয়াছে, কারণ সেস্থলে রাবণের মৃত্যুই বর্ণনা করা হইয়াছে। অতঃপর সেরৎকণ্ডে সিন্ত-র অগ্নিপরীক্ষার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে; এই পরীক্ষাতে সিন্তদেবী কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। এই স্থলে বন্দোন্দরি ক্লালারকে উপস্থাপিত করা হইয়াছে; তিনি দীর্ঘকাল পরে তাঁহার হারানো সন্তানকে দেখিয়া আনন্দে অভিভূত হইলেন। রাবণ প্রায়শঃই সমাধিস্থল হইতে গণ্ডগোল সৃষ্টি করিতেছিলেন এবং রম উহার প্রতিবিধান করিতে উদ্যোগী হইলেন। বস্তুতঃ রহ্‌বনের মস্তকটি পর্বতের নিম্ন হইতে বাহিরে আসিলে অনোমন উহা পুনরায় সমাধিস্থ করিলেন। রম অতঃপর শাসনকার্যে শৃঙ্খলাবিধানে উদ্যোগী হইলেন। তিনি চিবিসনের পুত্র দতিবিক্রমকে ঙলেঙ্কের সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন; সকিসরের পুত্র ক্রবেনি ইন্দ্রপুরের শাসনভার গ্রহণ করিলেন; বলিকের পুত্র বলেঙ্কর ক্রবস্‌পুর্বের শাসনকর্তা হইলেন। হিকায়ৎ সেরি রম এবং সেরৎকণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে যে রম অতঃপর একটি নূতন সহরের গোড়াপত্তন করিলেন। ষ্টুটেরহাইমের বিবরণে এই সহরের নাম দুর্জয়পুর দেওয়া হইয়াছে। এই সময় একটি ঘটনা ঘটিল। দেবী গোটকৃজু সিন্তর পাখাতে (fan) রহ্‌বনের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করিয়া উহা সিন্তদেবীর শয্যাপ্রান্তে রাখিয়া দিলেন। রম সিন্তকে অবিশ্বাসিনী অনুমান করিয়া তাঁহাকে মন্তিলিদির্ঘতে প্রেরণ করিলেন। রামায়ণ শশকে আমরা পড়িতেছি যে সিন্তদেবী রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতিনীরূপে প্রতিভাত হইলে তাঁহাকে হত্যা করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়; সংস্কৃত সংস্করণের মত তাঁহাকে বনবাসে নির্বাসিত করা হয় নাই। সেই নির্দেশানুযায়ী লক্ষ্মণ তাঁহাকে শ্রেঙ্গদিকরে ভগবান লম্বের আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং সেইস্থল হইতে সিন্তর হৃদপিণ্ড না পাঠাইয়া একটি কুকুরের হৃদপিণ্ড পাঠান হইল। সেরৎকণ্ডে বলা হইয়াছে যে বনবাসে থাকিবার

সময় সিন্তদেবী বুটলবকে প্রসব করিলেন। রেসি কল শিশুটিকে নানা বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিলেন। কালক্রমে বালকটি চিবিসনের অধীনস্থ দুইজন রাক্ষসের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রভু এবং লেসমনের নিকট প্রতিবাদ জানাইলে তাঁহারা সিন্ত দেবীর নিকট অনুসন্ধান করিতে গমন করিলেন। বালকটি তখন তাঁহাদিগকে বন্দী করিলে রেসি কল তাঁহাদিগকে মুক্তি দিলেন। লেসমন সিন্তদেবীকে লইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে চাহিলে তিনি বলিলেন যে তাঁহার স্বামী না আসিলে তিনি আর ফিরিবেন না। লেখক অতঃপর রম ও সিন্তদেবীর মিলনকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পর বুটলবের সহিত ইন্দ্রজিতের কন্যা এবং মেম্বঙ্গের দেবী কেন্দ্রনের পৌত্রী শ্রীমতী এন্দ্রকুমলের বিবাহের কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। রামায়ণ শশক অনুযায়ী সীতার দুই পুত্র ছিল ; উহাদের একজনের নাম বোটলব, অপরজনের নাম বেটলব। সংস্কৃত সংস্করণে তাহাদের নাম হইল কুশ এবং লব। সেরৎকণ্ডে কথিত হইয়াছে যে বুটলব রমের উত্তরাধিকারী হইলেন। অতঃপর লেসমন এবং ত্বিবিসন (=চিবিসন) চেণ্ডন সেকর পর্বতে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইলেন ; অনোমন রহ্‌বনের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য কুণ্ডলিসদের পাদদেশে রহিয়া গেলেন। গ্রন্থকার অতঃপর সিন্ত, রম এবং তাঁহাদের অনুচরবর্গের অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে লেসমন, ত্বিবিসন, সুগ্রিব, অঙ্গদ, অনিল, স্রবনিল, স্রব এবং বিসমুকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য[২৬]।

রামায়ণের বিভিন্ন সংস্করণের যে বিবরণী উপরে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে উহার আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে আলোচ্য গ্রন্থগুলির সহিত সংস্কৃত রামায়ণ এবং কবি-সংস্করণের স্থলে স্থলে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইলেও উহাদের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ অত্যধিক। এই বিভিন্ন সংস্করণগুলি কোন মৌলিক রামায়ণ হইতে তাহাদের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা এই বৈশাদৃশ্যগুলি পর্যালোচনা করিলেই বুঝিবার সুবিধা হইবে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। হিকায়ৎ সেরি রম এবং সেরৎকণ্ডে বলা হইয়াছে যে সীতাদেবী রাবণ এবং মন্দোদরীর কন্যা। শ্যামদেশের রামকিয়েন গ্রন্থে এবং গুণভদ্রাচার্য কর্তৃক অষ্টম শতাব্দীতে বিরচিত জৈনদের উত্তরপুরাণ নামক গ্রন্থেও একই কথা লেখা হইয়াছে। কোন কোন বৌদ্ধ কাহিনীতেও সীতাকে রাবণের কন্যারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অদ্ভুত-রামায়ণে কথিত হইয়াছে যে মন্দোদরী ঋষিগণের রক্তপান করিলে সীতাদেবী গর্ভস্থ হন। প্রশ্ন করা যাইতে পারে, এই বিবরণটি বাল্মিকী এবং যোগীশ্বরের রামায়ণ হইতে এত বিভিন্ন কেন এবং কেনই বা ইহার সহিত অব্রাহ্মণ্য সংস্করণগুলির যোগ এতটা নিবিড় ? ইহা কি দ্বীপময় ভারতের অব্রাহ্মণ্য কিম্বদন্তীর একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র, না, ইহা দ্বীপময় ভারত হইতেই ভারতবর্ষে গিয়াছে ? শেষোক্ত সম্ভাবনাটি নিতান্ত কম হইলেও ইহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সে যাহাই হউক না কেন, এই বিবরণটির ঐতিহ্য অতীব প্রাচীন এবং অর্বাচীন যবদ্বীপীয় সংস্করণ অপেক্ষা ইহা অন্ততঃ এক সহস্র বৎসর প্রাচীনতর হইবে। এতদ্ব্যতীত আরো কয়েকটি বিষয় আছে যাহা পর্যালোচনা করিলে স্বতঃই মনে হইবে যে

যবদ্বীপীয় রামায়ণগুলির মূল উৎস খৃষ্টাব্দের প্রথম যুগেই খুঁজিতে হইবে। যবদ্বীপের রামায়ণ পদ্মপুরাণের কাহিনীর মতই রাম-সীতার মিলনে পর্যবসিত হইয়াছে। অধিকন্তু, যবদ্বীপীয় উত্তর-কাণ্ডটি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ, সংস্কৃত বালকাণ্ডটি যবদ্বীপীয় সংস্করণে প্রায় অনুপস্থিত। এই সমস্ত বিষয় একত্র চিন্তা করিলে ইহা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে যবদ্বীপীয় রামায়ণের মূল উৎস এমন এক গ্রন্থ ছিল যাহাতে উত্তরকাণ্ড এবং বালকাণ্ড ছিল না এবং উহা রামসীতার মিলনানুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। এইরূপ একটি গ্রন্থ খৃষ্টপূর্ব ১০০ হইতে ৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে[২৭]। কিন্তু একথা স্বীকার করিতে হইবে যে যদিও রাম এবং সীতার মিলন কাহিনীটি প্রাচীন এবং নূতন যবদ্বীপীয় সংস্করণগুলিতে রহিয়া গিয়াছে, তথাপি আমরা এমন কতকগুলি ঘটনার সাক্ষাৎ পাই যাহা নিতান্তই অভারতীয়। এই অভারতীয় উপাদানগুলি ভারতীয় এবং দেশী উপাদানের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া এক নূতন রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি কিরূপে সংস্কৃত মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকাগণ ঐশ্লামিক বীরপুঙ্গবগণের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছেন। এই মিশ্রণের পটভূমিকা হৃদয়ঙ্গম করা অসাধ্য নহে। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের অভ্যুদয়ে ইন্দো-জাভানীজ ইতিহাসের প্রাচীন যুগের অবসান হইল। ইহার ফলে দ্বীপময় ভারতে ও তৎসন্নিকটবর্তী অঞ্চলের আধ্যাত্মিক ও মানসিক জগতে এক বিপুল আলোড়ন ও পরিবর্তন অনুভূত হইল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ ভারতীয় নায়ক-নায়িকা-গণের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া গেল বা তাহাদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করিতে লাগিল। অনেক অবিশ্বাস্য কাহিনীও পরবর্তী যুগের তথাকথিত রামায়ণের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইল। এই সমস্ত বিভিন্ন ঘটনা ও কারণের সন্নিবেশে দক্ষিণপূর্ব এসিয়ার অনেক রামায়ণ এইপ্রকার অদ্ভুত আকৃতি পরিগ্রহণ করিয়াছে। ইহাও একেবারে অস্বীকার করা যায় না যে চম্পা এবং কম্বোজের রামায়ণ-সংস্করণগুলিও হয়তো দ্বীপময় ভারতের রামায়ণ কাহিনী বিবর্তনে কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

পা দ টী কা

১. Juynboll, *Supplement*, dl. II, pp. 65 ff.

২. *Ibid*, pp. 67 ff.

৩. *Ibid*, pp. 52 ff.

৪. A. Ziesenis, *Die Ramasage bei Malaien*, Hamburg (1828); Rassers, *De Pandji Roman*, 1922, pp. 257-60; Shellabear, *JRAS (Mal. Br)*, 1917, pp. 87 ff.; Roorda van Eysinga, *Geschiedenis van Sri Rama*, 1843; Stutterheim *Rama legenden und Rama reliefs in Indonesien*, 1925, pp. 28 ff.

৫. Juynboll, *Suppl.*, *Cat. Sund. Bal. Sas. Hss*, 1912, pp. 131 ff.

৬. Juynboll, *Supplement* II p. 68.

৭. *Sanskrit in Indonesia*, p. 27.

৮. Juynboll, *Supplement* II, p. 53.

৯. রাবণের কাহিনী বাল্মীকি রামায়ণের শেষকাণ্ডে গ্রথিত হইবার এই কারণ হইতে পারে যে রামায়ণের প্রাচীনতম সংস্করণে রাবণের কোন স্থান ছিল না। যখন এই কাহিনীটি পূর্ণতর পরিধি লাভ করিল তখন রাবণের কাহিনীটিকেও উহার মধ্যে সংস্থাপিত করিবার প্রয়োজন দেখা দিল। সুতরাং ইহা সেই স্থলেই অনুপ্রবিষ্ট করা হইয়াছে যে-স্থল কিম্বদন্তী অনুযায়ী প্রাচীনতম অংশের অন্তর্ভুক্ত নহে।

১০. Rassers, *De Pandji Roman*, p. 258 ; Juynboll, *Cat. Mal. Sund. Hss*, 1899, p. 41.

১১. Stutterheim, *op. cit.*

১২. *Ibid*, p. 254. ডঃ ষ্টুটেরহাইম বলিয়াছেন যে বের্গব বানরের অবতার নহেন ; এই ভুল লেখার ত্রুটির জন্য হওয়া সম্ভবপর। সঙ্গ পর্দন হনুমান রূপে আবির্ভূত হইবেন।

১৩. রামায়ণ শশকে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে বিষ্ণপুর।

১৪. এই স্থল হইতে রামায়ণ-কাহিনী আরম্ভ হইল। Cf. Skeat, *Malay Magic* (1900) pp. 16 ff.

১৫. তাঁহার নাম দেবি রেস্তহ্।

১৬. Juynboll, *Supplement* II, p. 53.

১৭. Stutterheim, *op. cit.*, p. 254. সংস্কৃতে (রামায়ণ, ৭, ৩১) ইহার নাম হইল মাহিষ্মতী।

১৮. ইহা এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে আয়েসিঙ্গা এবং সেল্লাবেয়ারের হিকায়ৎ সেরি রাম সংস্করণ এক নহে। উভয় সংস্করণেই কতকগুলি নূতন কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তবে সেল্লাবেয়ারের সংস্করণ অপেক্ষাকৃত পূর্ণতর।

১৯. ইহা প্রাচীন জুরু (Juru) শব্দের আধুনিক রূপ। জুরু শব্দের অর্থ প্রধান ; সুতরাং 'পতিহ্ জুরু'-র অর্থ হইল প্রধান কর্মচারী (সেনাপতি বা মন্ত্রী)।

২০. *Op. cit.*, p. 255.

২১. ফ্রেজারের *Totemism and Exogamy*, vol. II নামক গ্রন্থে মালয় দ্বীপপুঞ্জের এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

২২. সংস্কৃত রামায়ণে মেঘনাদ এবং ইন্দ্রজিৎ একই ব্যক্তি।

২৩. Juynboll, *Suppl.*, *Cat. Sund. Bal. Sas. Hss.*, 1912, p. 131.

২৪. Juynboll, *Supplement* II, p. 75.

২৫. Juynboll, *Suppl.*, *Cat. Sund. Bal. Sas. Hss*, 1912, p. 131.

২৬. অন্যান্য রাম কাহিনীর জন্য দ্রষ্টব্য : *Catalogue of Manuscripts in European languages belonging to the library of the India office*, vol. I, pt. I, 1916, pp. 27, 34.

২৭. এই সময়ের চীনা সংস্করণেও উত্তরকাণ্ডের অস্তিত্বের কথা প্রমাণ নাই।

ত্র য়ো দ শ অ ধ্যা য়

ইতিহাস বা মহাকাব্য (তৃতীয় পর্যায়)

প্রস্তরে উৎকীর্ণ রামায়ণ মহাকাব্য

দ্বীপময় ভারতের কবিকুল রামায়ণ মহাকাব্যের কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া বিপুলায়তন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। দক্ষিণপুর্ব এশিয়ার ভাস্কর এবং শিল্পীরাও মন্দিরগাত্রে সেই কাহিনীকে শাশ্বত রূপ দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিভার স্বাক্ষর চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে প্রাম্বানান, পনতরণ, বাপুয়ন এবং আঙ্কোরভাট মন্দিরগুলির প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ রাম-চিত্রাবলীর অপুর্ব শিল্পায়নে। আর্টের সমালোচনা করা বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে তবে সংস্কৃত রামায়ণে যে কাহিনী বিবৃত হইয়াছে তাহা দক্ষিণপুর্ব এশিয়ার ভাস্কর্য এবং দেবায়তনে কোন রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে তাহা অনুধাবন করাই আমাদের বর্তমানের উদ্দেশ্য। এই আলোচনার প্রাথমিক পর্ব হিসাবে আমাদিগকে এই অপুর্ব মন্দিরগুলির নির্মাণকাল এবং তাহার পটভূমিকা জানিতে হইবে, নতুবা আলোচনা সার্থক হইবে না।

আমরা পুর্বেই বলিয়াছি যে প্রাম্বানান মন্দিরগুলি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল। পুর্ব যবদ্বীপের পনতরণ মন্দির উহার কয়েক শতাব্দী পরে নির্মিত হইয়াছিল। ডঃ ব্র্যাণ্ডেস বলিয়াছেন[১] যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডে যে সমস্ত তারিখ উৎকীর্ণ হইয়াছে তাহা ১১৯৭ হইতে ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। একটি মহাকায় রাক্ষসের গাত্রে ১২৬৯ শকাব্দ উৎকীর্ণ রহিয়াছে; প্রধান মন্দিরগাত্রেও ১২৪১, ১২৪২ এবং ১২৪৫ শকাব্দ উৎকীর্ণ রহিয়াছে। খৃষ্টীয় সম্বৎসর অনুযায়ী ইহাদের তারিখ হইবে ১৩১৯ হইতে ১৩২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। সুতরাং সাধারণভাবে বলা চলে যে পনতরণ মন্দিরের নির্মাণকার্য ১৩১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছিল[২]। প্রিয় কেভ লিপি[৩] অনুযায়ী বাপুয়ন মন্দির মহারাজ পঞ্চম জয়বর্মনের রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল। তিনি ৯৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রাম্বানান, পনতরণ এবং বাপুয়ন মন্দির কোন সময়ে নির্মিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভবপর। ইহা এক হিসাবে সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে; কারণ বিশ্ববিখ্যাত আঙ্কোরভাট মন্দিরের নির্মাণকাল সম্বন্ধে শিলাসাক্ষ্য সমূহ নীরব। প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত আয় মনিয়ে প্রমুখ অনেকেই মনে করেন যে উক্ত মন্দির দ্বিতীয় সূর্যবর্মনের (১১১২—আনুমানিক ১১৫০ খৃঃ অঃ) সময় নির্মিত হইয়াছিল।

ফিনো বলিয়াছেন যে সম্পূর্ণ মন্দির সম্ভবতঃ ১১১২ হইতে ১১৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল। আলোচ্য গ্রন্থে এই তারিখই গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রাম্বানানের মন্দিরগাত্রে বিংশ সংখ্যক রামায়ণ-চিত্রাবলী (scene) পরিবেশিত হইয়াছে। উহাতে রামায়ণের আদিপর্ব হইতে শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁহার অনুচরগণের লঙ্কাতীরে আগমনকাল পর্যন্ত ঘটনাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে[৪]। অনেকে অনুমান করেন যে পরবর্তী কাহিনী সমূহও সন্নিকটবর্তী ব্রহ্মা মন্দিরে অঙ্কিত হইয়াছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই সমস্ত চিত্রাবলীর ভগ্নাবশেষ ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। প্রাম্বানান মন্দিরের রামায়ণ চিত্রাবলী যেখানে শেষ হইয়াছে; পনতরণ মন্দিরের কাহিনী তাহার একটু পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে। ইহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বালকাণ্ডের কাহিনীগুলি প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত রামায়ণ কাকাবিনে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; প্রাম্বানান মন্দিরগাত্রেও উহার স্বাক্ষর প্রায় অনুপস্থিত। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সন্নিকটবর্তী বিষ্ণু মন্দিরের ভাস্কর্যেও বালকাণ্ডের কাহিনীগুলি অঙ্কিত হয় নাই।

প্রাম্বানানের রামায়ণ কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণুর চিত্র লইয়া; সন্নিকটে দেবতাগণ রহিয়াছেন এবং গরুড়-পক্ষী বিষ্ণুকে একটি নীলপদ্ম প্রদান করিতেছে। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে, চিত্রের দক্ষিণপার্শ্বে উপবিষ্ট দেবমূর্তিগুলি ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাগণের। তাঁহারাও বিষ্ণুকে শ্রীরামচন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। ডঃ ফোগেল মনে করেন যে উল্লিখিত কাহিনীর সহিত মহাকবি কালিদাস-বিরচিত রঘুবংশের বর্ণনার সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহার পরে আমরা দেখিতে পাই মহামুনি বিশ্বামিত্রকে; তিনি মহারাজ দশরথের সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী। প্রমোদউদ্যানে দশরথকে দেখা যাইতেছে প্রধানা মহিষী, চারিটি পুত্র এবং একটি কন্যার সহিত। ডঃ ষ্টুটেরহাইম বলিয়াছেন যে আমরা দশরথের এক কন্যার উল্লেখ পাই হিকায়ৎ রচনাবলীতে; চন্দ্রাবতীর বাংলা রামায়ণেও কুকুয়া নাম্নী এক কন্যার দর্শন পাই। এই গ্রন্থগুলি বহু পরবর্তীকালের রচনা। নবম শতাব্দীর পূর্বে রচিত কোন ভারতীয় গ্রন্থে দশরথের কোন কন্যার উল্লেখ আছে বলিয়া জানি না। দশরথ জাতকে সীতাকে অবশ্য দশরথের কন্যারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; বর্তমান ক্ষেত্রে উহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কারণ সীতা দশরথের কন্যা হইলে প্রাম্বানানের চিত্রাবলীতে ধনুক প্রতিযোগিতার কোন প্রয়োজন থাকিত না। যাহা হউক দশরথ মহর্ষিকে অভ্যর্থনা করিলেন। পরবর্তী দৃশ্যে আমরা তাড়কারাক্ষসীর নিধন চিত্রটি দেখিতে পাই। অতঃপর সকলে বিশ্বামিত্রের কুটিরে উপনীত হইলেন; রামচন্দ্র সেখানে রাক্ষসনিধনে ব্যাপৃত হইলে মুনিগণ তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিলেন। রাক্ষসগণের মধ্যে মারীচ সমুদ্র পর্যন্ত তাড়িত হইল এবং অপর একটি রাক্ষস নিহত হইল। পরবর্তী দৃশ্যে আমরা বিশ্বামিত্র, লক্ষ্মণ, রামচন্দ্র এবং মহারাজ জনককে দেখিতে পাই। ঋষি বিশ্বামিত্রের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র ধনুক আকর্ষনপূর্বক সীতাদেবীকে লাভ করিলেন। বিবাহের পর রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং সীতা গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং পথিমধ্যে পরশুরামের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল।

পরশুরাম ধনুক আকর্ষণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান করিলেন। পরবর্তী দৃশ্যে আমরা দেখিতে পাই যে পরশুরাম পরাজিত হইয়াছেন। ফ্নম্ পেনের খ্মের-যাদুঘরে কাম্বোডীয় রামায়ণের কয়েকটি দৃশ্য অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিতে পাই ; উহার মধ্যে জনক কর্তৃক সীতার আবিষ্কার, রাম কর্তৃক হরধনুভঙ্গ এবং বিবাহের পর পরশুরামের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে। আঙ্কোরভাটের প্রাচীরগাত্রে আমরা দেখিতে পাই যে চিত্রটির কেন্দ্রস্থলে একজন যুবক ধনুর্বাণ হস্তে লক্ষ্যভেদ করিতেছেন। খ্মের শিল্পীদের এই চিত্রায়নে একটি ঘূর্ণায়মান চক্রের পশ্চাতে একটি পক্ষী দেখিতে পাইতেছি। ধনুর্বাণহস্তে যে যুবকটি দণ্ডায়মান, তাঁহার সম্মুখে সুসজ্জিতা একজন নারীকেও দেখা যাইতেছে। নিকটে একজন ব্রাহ্মণও সমুপস্থিত ; তাঁহার জটাজাল পশ্চাতে সংবদ্ধ রহিয়াছে। এই দৃশ্যটি স্বভাবতঃই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু অনেকেই ইহাকে মহারাজ জনকের সভায় ধনুর্বাণ প্রতিযোগিতার দৃশ্য বলিয়া মনে করেন।

প্রাম্বানানের শিল্পীরা অতঃপর প্রাক্-বনবাস কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। মহারাজ দশরথ রামচন্দ্রকে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু রাজমহিষী কৈকেয়ী উহাতে বাধা দিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের বনবাস দাবী করিয়া বসিলেন। তিনি চাহিলেন যে রাজমুকুট ভরতের করতলগত হউক। পরবর্তী দৃশ্যে ভরতকে আমরা সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাইতেছি ; চারিদিক আনন্দোৎসবে মুখর। ইহার পরবর্তী দৃশ্যে আমরা ম্রিয়মান দশরথ ও কৌশল্যাকে দেখি। অতঃপর রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বনবাসে চলিলেন। ইত্যবসরে দশরথের মৃত্যু হইল এবং তাঁহার দেহের সৎকার করিবার আয়োজন চলিতে লাগিল। কৌশল্যা এবং ভরত ব্রাহ্মণদিগকে জিনিষপত্র দান করিতে লাগিলেন। পরবর্তী চিত্রে দেখিতে পাইতেছি যে ভরত বনবাসী রামচন্দ্রকে রাজা হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। এই দৃশ্যটি বনে সংস্থাপিত করা হইয়াছে। রামচন্দ্র রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতে অস্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু তিনি ভরতকে তাঁহার পাদুকা দিয়া দিলেন। উহাই শূন্য সিংহাসনে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করিবে। পরবর্তী চিত্রে আমরা দেখিতে পাই যে জনকনন্দিনীসহ বনযাত্রীরা অরণ্যের ভিতর দিয়া চলিতেছেন। এই সময় বিরাট কর্তৃক সীতা নিগৃহীতা হইলে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে অনেক কষ্টে উদ্ধার করিলেন। এই দৃশ্যটি আঙ্কোরভাটেও রূপায়িত হইয়াছে। সেখানে শিল্পী একটি বনের দৃশ্য অঙ্কন করিয়াছেন ; উহার অভ্যন্তরে একজন রাক্ষস বামবাহুতে করিয়া একজন নারীকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। রাক্ষসটি ধনুর্বাণধারী দুইজন পুরুষের সহিত সংগ্রাম করিতেছে। পুরুষদ্বয় স্বভাবতঃই রামলক্ষ্মণ ভিন্ন আর কেহই নহেন, কিন্তু উহার পরিকল্পনায় সংস্কৃত মহাকাব্যকে নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করা হয় নাই। ইহার পরে প্রাম্বানানের শিল্পীরা আর কয়েকটি দৃশ্য অঙ্কিত করিয়াছেন যাহা আমরা আঙ্কোরভাটে দেখিতে পাই না। কারণ পরবর্তী দৃশ্যটি রাম, সীতা এবং বায়সের বিখ্যাত কাহিনী। সীতা বৃক্ষশাখে মৃগমাংস শুকাইতে দিয়াছেন ; তিনি পক্ষীটিকে তাড়াইতে গেলে উহা সীতাকে আক্রমণ করিল। জনকনন্দিনী তখন শ্রীরামচন্দ্রের শরণ লইলেন। শ্রীরামচন্দ্র

ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপন করিলে উহা পক্ষীটিকে সর্বত্র অনুসরণ করিতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া বায়সপক্ষীটি অবশেষে শ্রীরামচন্দ্রের বশ্যতা স্বীকার করিল, কিন্তু নিক্ষিপ্ত অস্ত্র ব্যর্থ হইতে পারে না বলিয়া সে রামচন্দ্রকে তাহার একটি চক্ষু উন্মূলীত করিতে দিল। চিত্রে পক্ষীটির মস্তক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার পরবর্তী দৃশ্য সূর্পনখাকে লইয়া। শ্রীমতী সূর্পনখা সুন্দরী নারীবেশ পরিগ্রহণ করিয়া রামচন্দ্রকে বিমোহিত করিতে চেষ্টা করিতেছে, রামচন্দ্র তাহাকে লক্ষ্মণের নিকটে প্রেরণ করিলে লক্ষ্মণও তাহাকে গ্রহণ করিলেন না। ইহার পরবর্তী দৃশ্য সেই বিখ্যাত স্বর্ণমৃগের কাহিনী; ইহা প্রাম্বানান এবং আঙ্কোরভাট উভয়স্থলেই আছে। প্রাম্বানান মন্দিরের চিত্রে দেখিতেছি যে শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণমৃগকে অনুসরণ করিতেছেন, আর এদিকে দেবর লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে রক্ষা করিতেছেন। শ্রীরাম সেই মায়ামৃগকে বাণবিদ্ধ করিলে, রাক্ষস মারীচ মায়ামৃগের দেহ হইতে নির্গত হইয়া রামচন্দ্রের কণ্ঠধ্বনি অনুকরণে চীৎকার করিয়া উঠিল। সীতাদেবী সেই আর্তধ্বনি শ্রবণ করিলেন। ইহার পরবর্তী চিত্রে আমরা দেখিতেছি যে রাক্ষস রাবণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে জনকনন্দিনীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। প্রাচীন যবদ্বীপীয় শিল্পী অতঃপর রাবণ এবং জটায়ুর সংগ্রাম মন্দিরগাত্রে অঙ্কন করিয়াছেন; জটায়ু এই সংগ্রামে পরাজিত হইলেন। রাবণ সীতাদেবীকে পুনরায় লইয়া যাইবার পুর্বেই সীতাদেবী জটায়ুকে একটি স্বর্ণাঙ্গুরী প্রদান করিলেন; মুমূর্ষু জটায়ু উহা রামচন্দ্রকে দিলেন। ইহার পরবর্তী দৃশ্য রাম, লক্ষ্মণ এবং কবন্ধের কাহিনী; উহা প্রাম্বানান এবং আঙ্কোরভাট উভয়স্থলেই বিদ্যমান। প্রাম্বানানের শিল্পী কবন্ধকে অদ্ভুতরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন; কারণ তাহার স্কন্ধের উপর একটি মস্তক থাকিলেও শিল্পী দ্বিতীয় আর একটি মস্তক উদরের উপর সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আঙ্কোরভাটের শিল্পী এইদিক দিয়া অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ততার সহিত মূলানুসরণ করিয়াছেন। প্রাম্বানানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এই বিকটাকার রাক্ষসমূর্তি হইতে একটি দিব্যদেহ বহির্গত হইয়া মুক্তিলাভ করিতেছে। অতঃপর রামলক্ষ্মণ অরণ্যের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে একটি কুম্ভীরকে দেখিতে পাইলেন; উহা ছিল শাপগ্রস্থা অপ্সরী।

প্রাম্বানানের চিত্রাবলীর পরবর্তী দৃশ্যে আমরা রাম, লক্ষ্মণ এবং হনুমানকে একত্র দেখিতে পাই, পরে তাঁহারা অন্যত্র চলিয়া যান। প্রাম্বানান মন্দিরগাত্রে একটি অদ্ভুদ দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে যাহা দক্ষিণপুর্ব এসিয়ার অন্য কোন মন্দিরে বিদ্যমান নাই। এখানে আমরা দেখিতে পাই যে শ্রীমান লক্ষ্মণ একটি বাঁশের জলাধার পুর্ণ করিতেছেন। রামচন্দ্র এই জল পান করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে উহা তিক্ত; অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা গেল যে উহা সুগ্রীবের অশ্রু। রামচন্দ্র তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতিদান করিলেন। আঙ্কোরভাটে এই আখ্যায়িকাটির শেষাংশ পর্বতাঞ্চলের পটভূমিকায় রচিত হইয়াছে। মধ্যস্থলে রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ সমাসীন; সুগ্রীব মুকুট মস্তকে তাঁহাদের সহিত আলোচনায় রত। বক্ষে হস্ত রাখিয়া সুগ্রীব বিশ্বস্ততার শপথ গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া অনুমিত হইতেছে। প্রাম্বানানে একটি অতিরিক্ত দৃশ্যেরও অবতারণা করা হইয়াছে যাহা বাপুয়ন বা আঙ্কোরভাটে নাই। শ্রীরামচন্দ্র সপ্ততালবৃক্ষ ভেদ করিয়া নিজের শৌর্য সম্বন্ধে সুগ্রীবের সন্দেহ নিরসন করিতেছেন।

সুগ্রীব এবং বালির দ্বৈত সংগ্রাম এই তিনটি মন্দিরগাত্রেই রূপায়িত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রাম্বানান দৃশ্যাবলীতে একটি অতিরিক্ত ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে যাহা আঙ্কোরভাট বা বাপুয়নে নাই। প্রাম্বানান মন্দিরে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে রামচন্দ্র প্রথমে সুগ্রীবকে সাহায্য করেন নাই, কারণ তিনি সুগ্রীব এবং বালির মধ্যে আকৃতিগত কোন পার্থক্য দেখিতে পান নাই। সুতরাং সুগ্রীব পরাজিত হইলেন। রামচন্দ্রের পরামর্শ অনুযায়ী সুগ্রীব এইবার কণ্ঠে পত্রমাল্য ধারণ করিয়া নূতন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন; এইবার রামচন্দ্রের শরাঘাতে বালি নিহত হইলেন। বালির মৃত্যু বাপুয়নের চিত্রে অনুমান করিয়া লইতে হয়; আঙ্কোর-ভাটের ক্ষুদ্র একটি দৃশ্যে ইহা স্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। খ্মের শিল্পীদের চিত্রে সুগ্রীবের কণ্ঠে পত্রমাল্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এইবার সুগ্রীব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পত্নীলাভ করিলেন; বানরদিগকে আনন্দোৎসবে মত্ত দেখা যাইতেছে। অতঃপর রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব যুদ্ধ করিবার জন্য পরামর্শ-সভায় মিলিত হইলেন। সুগ্রীবের পাশ্চাদ্দিকে মর্কট-বাহিনীর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন; সুগ্রীব বলিলেন যে তাঁহারা সীতার অনুসন্ধানে বহির্গত হইবেন। বানরগণের পত্নীগণকে প্রাম্বানানে মানবীরূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে; মন্দিরগাত্রের শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্য বানরদের প্রাসাদে কৌতুকপ্রদ চিত্রও অঙ্কিত করা হইয়াছে। বাপুয়ন এবং আঙ্কোরভাটের মন্দিরগাত্রে এই অতিরিক্ত দৃশ্যগুলি অঙ্কিত হয় নাই।

প্রাম্বানান, বাপুয়ন এবং আঙ্কোরভাটের শিল্পীগণ অতঃপর অশোকবনের দৃশ্য অঙ্কন করিয়াছেন। প্রাম্বানানের মন্দিরগাত্রে দেখিতে পাইতেছি যে একজন চেরী অরণ্যাশ্রয়ী হনুমানের দিকে সীতা এবং ত্রিজটার দৃষ্টি আকর্ষন করিতেছেন। ইহার পরই হনুমানকে জনক-নন্দিনীর সহিত আলোচনায় রত দেখা যাইতেছে। সীতা এবং হনুমানের দৃশ্যটি আঙ্কোর-ভাটেও অঙ্কিত হইয়াছে। এই দৃশ্যে রাক্ষসী ব্যতীত অপর যে মানবী মূর্তিটি দেখা যাইতেছে তাহা বিভীষণ-পত্নী সরমার বলিয়া অনুমিত হয়। বাপুয়নের মন্দির-গাত্রেও চেরীগণ পরিবৃতা সীতাকে অশোকবনে দেখা যাইতেছে। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে হনুমান রহিয়াছেন, হস্তে তাঁহার চূড়ামণি। চূড়ামণিটি আঙ্কোরভাটের শিল্পীও অঙ্কন করিতে বিস্মৃত হন নাই।

প্রাম্বানানে সীতা-হনুমান সাক্ষাৎকারের পরবর্তী দৃশ্য হইল হনুমানের বন্ধনদশা। রাক্ষসেরা হনুমানকে বন্দী করিয়া তাহার লাঙ্গুলে ছিন্নবস্ত্র জড়াইয়া দিতেছে। উহা তৈলসিক্ত করিয়া অগ্নিসংযোগ করা মাত্র হনুমান লম্ফপ্রদান পূর্বক "জ্বলন্ত মশালের" মতো গৃহাদির উপর দিয়া চলিলেন। অতঃপর লঙ্কাদহন কার্য সমাধা করিয়া মর্কট-কুলশিরোমণি হনুমান তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবকে বর্ণনা করিলেন। রামচন্দ্র সমুদ্রাধিপতি বরুণদেবের প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন, কারণ তিনি রামচন্দ্রকে সমুদ্রের পরপারে লঙ্কায় যাইবার কোন পন্থা নির্দেশ করিতে পারিলেন না। তখন সন্ত্রস্ত হইয়া বরুণদেব তাঁহাকে লঙ্কায় যাইবার জন্য সেতু নির্মাণ করিতে বলিলেন। যদিও সমুদ্রের প্রাণীগণ এই কার্যে বাধাপ্রদান করিল, তথাপি সেতু নির্মিত হইল। লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং বানরবাহিনী লঙ্কায় উপনীত হইলেন। আঙ্কোরভাটের চিত্রে আমরা দেখিতে পাই যে রামচন্দ্র এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দ রাবণের অনুজ দলত্যাগী

বিভীষণকে সম্বর্ধনা জানাইতেছেন। এই দৃশ্যটি ব্যতীত অপরাপর প্রধান ঘটনাবলী, যেমন হনুমানের অশোকবনে আত্মগোপন, সীতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার, হনুমানের লাঙ্গুলের অগ্নিতে লঙ্কাদহন, রামচন্দ্রের নিকট তাঁহার অভিজ্ঞতার বর্ণনা; সেতুবন্ধন ইত্যাদি দৃশ্য পনতরণের মন্দিরগাত্রে অধিকতর বিশদভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। মনে হয় সে হনুমান-কর্তৃক লঙ্কাদহন, প্রমোদউদ্যানের উৎসাদন এবং রাক্ষসগণের সহিত হনুমানের যুদ্ধ পনতরণের শিল্পীগণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

এইবার রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ড আরম্ভ হইল। ইহার ঘটনাবলী বাপুয়ন, আঙ্কোরভাট এবং পনতরণের মন্দিরগাত্রে নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে বাপুয়নের একটি দৃশ্যে রাম-রাবণের যুদ্ধ রূপায়িত হইয়াছে। রাবণ রথে আরোহন করিয়া রামচন্দ্রের দিকে তীর নিক্ষেপ করিতেছেন। রামচন্দ্র তাঁহার এক পদ হনুমানের স্কন্ধে এবং অপর পদ তাঁহার লাঙ্গুলে রাখিয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত। হনুমানও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া রাবণের রথের অশ্বটিকে আহত করিতেছেন, আশ্চর্যের বিষয় যে ঐ অশ্বটির মস্তক মনুষ্যের মত। পণ্ডিতপ্রবর ফিনো মনে করেন যে রাম-রাবণের এই দ্বৈত সংগ্রামটি রামায়ণের ঊনষষ্টিতম সর্গের প্রতিধ্বনি (৫, ১২২)। রাবণের সহিত হনুমান এবং নীলের সংগ্রামও অঙ্কিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, সুগ্রীব এবং বজ্রদংষ্ট্রার যুদ্ধ, রথারূঢ় রামচন্দ্রের (যাহা সংস্কৃত মহাকাব্যে নাই) একজন রাক্ষস সেনাপতির সহিত যুদ্ধ, সুগ্রীব এবং কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ এবং রাম ও মকরাক্ষের যুদ্ধ বিশদভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। তরবারী, বর্শা, বৃক্ষের শাখা, বর্ম এবং অসংখ্য যোদ্ধার বাহুল্যে চিত্রগুলি ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। আঙ্কোরভাটের দৃশ্যগুলিও এই দোষ মুক্ত নহে। একজন ফরাসী পণ্ডিত বলিয়াছেন যে সংস্কৃত রামায়ণের সহিত সংশ্লিষ্ট দৃশ্যটির তুলনা করিলে অনায়াসেই চিত্র হইতে পুলস্ত্যপুত্র মহোদর এবং অঙ্গদের সংগ্রামকে চিনিয়া লওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত, নীল ও প্রহস্ত, হনুমান ও নিকুম্ভ এবং সুগ্রীব ও কুম্ভকর্ণের সংগ্রামের দৃশ্যগুলিও অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার কোন কোন ঘটনাবলী বাপুয়নের মন্দিরে অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। যুদ্ধকাণ্ডের চিত্রাবলী খ্মেরের শিল্পীরা একঘেঁয়ে করিয়া তুলিয়াছেন; পনতরণের অনুরূপ চিত্রগুলি অপেক্ষাকৃত সুন্দর।

বাপুয়নের শিল্পীরা নাগপাশে আবদ্ধ রামলক্ষ্মণের মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। চিত্রে দেখা যাইতেছে যে গরুড় পক্ষীর আবির্ভাবে সর্পকুল অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। রাম রাবণের যুদ্ধ বাপুয়ন এবং আঙ্কোরভাটের মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত হইয়াছে। বানরসেনাপতি নীলের বিস্ময়কর চঞ্চলগতি এবং তৎপরতা আঙ্কোরভাটে সুন্দররূপে রূপায়িত হইয়াছে। আঙ্কোরভাটের একটি দৃশ্যকে সীতার অগ্নিপরীক্ষা বলিয়া অনেকে অনুমান করেন; দুঃখের বিষয় উহার একটা অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান বলিয়া মনে করিলেও ইহা সীতার অগ্নিপরীক্ষা বলিয়াই অনুমিত হয়। এমন কি, একজন ফরাসী পণ্ডিত দাবী করিয়াছেন যে তিনি চিত্রটিতে বিভীষণ, সুগ্রীব এবং হনুমানের মূর্তি সনাক্ত করিতে পারিয়াছেন। সে যাহাই হউক, অগ্নির লেলিহান জিহ্বাকে ভুল করিবার সম্ভাবনা কম।

পণ্ডিতপ্রবর ফিনো এই দৃশ্যটি বাপুয়ন মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেও ইহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। অতঃপর কুবেরের পুষ্পকরথ বিজয়ীদলকে অযোধ্যায় লইয়া চলিল। রথটী হংসবাহিত এবং দৃশ্যটির অলংকরণ প্রশংসনীয়। এই দৃশ্যটি বাপুয়ন এবং আঙ্কোরভাট উভয় স্থলেই সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

প্রাম্বানান মন্দিরের সন্নিকটে যে-সমস্ত খণ্ডিত প্যানেল পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান হইল : লঙ্কায় বানরবাহিনীর অভিযান, বানরদলের সহিত কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ এবং চিতার উপর শায়িত রাবণের দেহ। অনেকগুলি চিত্রাংশের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয় নাই।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে এই সমস্ত দৃশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য খুব বেশী নহে। বাল্মিকী-রামায়ণের কোন কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা ক্ষেত্রবিশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং স্থলবিশেষে নূতন ঘটনাবলীর অবতারণা করা হইয়াছে। ইহা উল্লেখযোগ্য বিষয় যে বাপুয়ন এবং আঙ্কোরভাটের চিত্রাবলী বাল্মিকী রামায়ণের প্রায় শেষ পর্যন্ত অবরোহণ করিয়াছে, কিন্তু প্রাম্বানান এবং পনতরণের চিত্রাবলী তাহার বহুপূর্বেই সমাপ্ত হইয়াছে। একটি বিষয়ে এই চিত্রাবলীর মধ্যে সঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে : কেহই সংস্কৃত রামায়ণের উত্তরকাণ্ড হইতে কোন দৃশ্য পরিবেশন করেন নাই। বস্তুতঃপক্ষে যবদ্বীপীয় শিল্পীরা রামায়ণের প্রথমের অংশটি যতটা বিশদভাবে রূপায়ন করিয়াছেন, খ্মেরশিল্পীরা ঠিক ততটা নিষ্ঠা সহকারেই শেষের অংশটি অঙ্কন করিয়াছেন। মনে হয় যে কম্বোডিয়ার শিল্পীরা রামায়ণের এমন একটি সংস্করণ ব্যবহার করিয়াছিলেন যাহা বাল্মিকী রামায়ণের সহিত অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রাম্বানানের চিত্রাবলীতে কয়েকটি দৃশ্য আছে যাহার ব্যাখ্যা মালয়দেশীয় রামায়ণ হইতেই পাওয়া যাইতে পারে। এইদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, পনতরণের চিত্রগুলি কবি যোগীশ্বর বিরচিত প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণ-কাকাবিনের সহিত আত্মিক যোগসূত্রে গ্রথিত। এই কাকাবিনটি আবার অংশতঃ ভট্টিকাব্যের অনুবাদ এবং অংশতঃ উহার যবদ্বীপীয় সামঞ্জস্যীকরণ। সুতরাং দক্ষিণপূর্ব এসিয়ার রামায়ণ চিত্রাবলী পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে সম্ভবতঃ আসা যায় যে দ্বীপময় ভারত, চম্পা এবং কাম্বোডিয়াতে বিভিন্ন গোত্রীয় রামায়ণ প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত রামায়ণের উদ্ভবস্থল কোথায়, কিরূপে ইহারা পরস্পরের সহিত সংমিশ্রিত হইল এবং পরে আবার সম্পর্কহীন হইয়া গেল, যাওয়ার পথে ইহারা কতটুকুই বা গ্রহণ করিল আর কতটুকুই বা পশ্চাতে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল তাহা দীর্ঘকাল পরে আজ আর জানিবার উপায় নাই।

পা দ টী কা

১. *Beschrijving van Tjandi Singasari* etc. De volken tooneelen van Panataran etc., 1909, pp. 14-15 ; see also Krom, *Inleiding* II, pp. 245-84, pl. 80 ; Van Goor, *Notices sur*

les ruines de Panataran, Etudes Asiat., EFEO, II p. 375 ; R. C. Majumdar, *Suvarṇadvīpa* II, pp. 273 ff, pl. XXXI.

২. Stutterheim, *op. cit.*, pp. 180-81.

৩. *I.S.C C.*, p. 106.

৪. ফটোর জন্য দ্রষ্টব্য : Kats, *Het Ramayana op Javaansche tempel reliefs*, pls. 1-42. Some are given in R. C. Majumdar, *op. cit.*, plates XX-XXI.

চতুর্দশ অধ্যায়

ইতিহাস বা মহাকাব্য (চতুর্থ পর্যায়)

রামায়ণাশ্রয়ী যবদ্বীপীয় কাব্যগ্রন্থ

প্রাচীন যবদ্বীপের কিছু কিছু কাব্যগ্রন্থ এবং বহু ওয়েয়াঙ্-গল্প রামায়ণের বিভিন্ন আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে অথবা উহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় রামায়ণের বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে কোনটি যে সুমনসান্তক, অর্জুনবিবাহ, হরিশ্রয় প্রভৃতি কাকাবিনের মূল উৎস তাহা আজ বলা দুঃসাধ্য। সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক দিক হইতে বিচার করিলে সুমনসান্তক-কাব্যটি একটি চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ ; কারণ ইহা যে কেবল-মাত্র সংস্কৃত ছন্দে বিরচিত হইয়াছে তাহা নহে, ইহার বিষয়বস্তুও ভারতীয় সাহিত্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। 'সুমনসান্তক' নামটিও সংস্কৃত ; সুমনসা (পুষ্পদ্বারা) অন্তক (নিহত) অর্থাৎ পুষ্পদ্বারা নিহত। এই কাব্যগ্রন্থে অজ এবং ইন্দুমতীর প্রেমকাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে ; তাঁহারাই এই কাব্যগ্রন্থের নায়ক-নায়িকা। নায়িকা দশরথের মাতা এবং শ্রীরামচন্দ্রের পিতামহী এবং তাঁহার প্রেমকাহিনী সংস্কৃত সাহিত্যে একটি স্থায়ী মর্যাদার আসন লাভ করিয়াছে। এই কাব্যগ্রন্থটি প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত। ইহার সহিত কালিদাসের রঘুবংশম্ কাব্যের অংশবিশেষের প্রভূত মিল রহিয়াছে। ডঃ যুইনবোল সেইজন্য বলিয়াছিলেন[১] যে এই কাকাবিনটি কালিদাসের কাব্যকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। এই কাব্যের গল্পাংশ অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থেও পাওয়া যায় ; সুতরাং এই কাব্যটির মূল উৎস কোথায় তাহা অনুসন্ধানের যোগ্য। প্রথম প্রশ্ন হইল : কালিদাসের কোন গ্রন্থ কি যবদ্বীপে প্রচলিত ছিল ? বস্তুতঃ দ্বীপময় ভারতে যে-সমস্ত গ্রন্থ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এই সম্বন্ধে কোন বিশ্বাস-যোগ্য সাক্ষ্য বিদ্যমান নাই। কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ যবদ্বীপে প্রচলিত ছিল বলিয়া বর্তমানে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাইতেছি না, যদিও শকুন্তলার কাহিনীটি প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত মহাভারতের আদিপর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ডঃ যুইনবোল অনুমান করেন যে লেখকের সংস্কৃতজ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ রহিয়াছে, কারণ তিনি 'সুমনস'-শব্দকে পুষ্পার্থে গ্রহণ করেন নাই, করিয়াছেন পুষ্পের নামার্থে, তবে বৃহত্তর ভারতের লেখমালায় এবং ভাস্কর্যে যে ইঙ্গিত পাইতেছি তাহাতে অনুমান করা চলে সেখানে কালিদাসের রঘুবংশে যে আখ্যায়িকা বিবৃত হইয়াছে তাহার অনুরূপ কাহিনী সেইস্থলেও

বিদ্যমান ছিল। পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে, ডঃ ফোগেলের মতানুযায়ী প্রাম্বানান-চিত্রাবলীর প্রথম দৃশ্যটি কালিদাসের রঘুবংশের অংশবিশেষের অনুরূপ। এতদ্ব্যতীত, দিলীপ এবং নন্দিনী গাভীর যে কাহিনীটি কালিদাস অনুপম ভাষায় পরিবেশন করিয়াছেন তাহা কাম্বোডিয়ার একটি অনুশাসনে উল্লিখিত হইয়াছে[২]। কালিদাস স্বয়ং দ্বীপময় ভারত সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি রঘুবংশম্ কাব্যে (৬, ৫৭) বলিতেছেন :

"অনেন সার্ধম বিহারাম্বুরাশেস্তীরেক্ষু তালীবনমর্মরেষু দ্বীপান্তরানীতলবঙ্গপুষ্পৈরপাকৃত স্বেদলবা মরুদ্ভিঃ"

সুমনসান্তক কাকাবিনের সহিত রঘুবংশম এবং পদ্মপুরাণের উল্লিখিত আখ্যায়িকাভাগের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে সুমনসান্তকের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়াছে। রঘুবংশ এবং পদ্মপুরাণে[৩] দেখিতে পাইতেছি যে হরিণী এবং তৃণবিন্দুর কাহিনীটি উক্ত গ্রন্থগুলির শেষাংশে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাকাবিনে ঐ কাহিনীটি সমগ্র আখ্যায়িকাটির মুখবন্ধ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এদিকে আবার পরবর্তীকালের সুমনসান্তক কিদুঙ্-গ্রন্থে উক্ত কাহিনীটি শেষাংশে বিবৃত হইয়াছে[৪]। সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে গন্ধর্ব রাজপুত্রের পিতার নাম প্রিয়দর্শন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; সুমনসান্তকে তাহার নাম দেখিতেছি চিত্ররথ। এতদ্ব্যতীত যে ঋষির নাম সংস্কৃত গ্রন্থ দুইটিতে মতঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি সুমনসান্তক কাব্যে পতঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছেন। প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় 'ম' এবং 'প' উপসর্গের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই; সেইজন্য যবদ্বীপীয় প্রাচীন লেখকগণ সাহিত্য এবং লেখমালায় প্রারম্ভিক 'প' এবং 'ম' অক্ষরটিকে নির্বিচারে ব্যবহার করিয়াছেন। নামের এই বিভিন্নতা এই কারণের জন্য হইতে পারে অথবা হয়তো সুমনসান্তকের কবি অন্য গ্রন্থ হইতে তাঁহার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থগুলির পার্থক্য এইখানেই শেষ হইল না। গন্ধর্ব রাজপুত্রটি যে মন্ত্রপূত অস্ত্রটি অজকে প্রদান করিলেন তাহাকে পদ্মপুরাণে প্রস্বাপন বলা হইয়াছে, রঘুবংশে বলা হইয়াছে 'সম্মোহন' এবং সুমনসান্তকে বলা হইয়াছে 'বিমোহন'। এই পটভূমিকায় সুমনসান্তকের মূল উপাদান কোন স্থল হইতে গৃহীত হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। তবে ইহা অনুমিত হয় যে এই আখ্যায়িকাটি বিভিন্নরূপে ভারতবর্ষ এবং দ্বীপময় ভারতে প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ রঘুবংশের যোড়শ সর্গের টীকায় বিখ্যাত টীকাকার হেমাদ্রি বলিয়াছেন যে রঘুবংশের নবম হইতে পঞ্চদশ সর্গের মূল উপাদান ছিল সংস্কৃত রামায়ণ এবং পরবর্তী অংশসমূহ অন্যান্য কিম্বদন্তী হইতে গৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং যবদ্বীপের কাব্যগ্রন্থটির রচনায় কোন উৎস বা কিম্বদন্তী ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা বলা আজ দুঃসাধ্য।

এই কাকাবিনটির রচয়িতা ছিলেন ম্পু মোনগুণ। তাঁহার নামটি উক্ত কাব্যগ্রন্থের এক-বিংশতি সর্গের তৃতীয় শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। সুমনসান্তকের একটি সর্গে[৫] কবি শ্রী বর্ষজয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রশ্ন হইল : তিনি কি রাজা ছিলেন? রাজা হইয়া থাকিলে, তিনি কোথাকার রাজা ছিলেন? আমরা যবদ্বীপীয় কৃষ্ণায়ণ কাব্যের ত্রিষষ্টিতম সর্গে বর্ষজয় নামক একজন রাজার উল্লেখ

পাইতেছি। যবদ্বীপীয় লেখমালায় বর্ষজয়-নামক কোন রাজার উল্লেখ নাই, কিন্তু ১১০৪ খৃষ্টাব্দের একটি লিপিতে শ্রী জয়বর্ষ দিগজয় শাস্ত্রপ্রভু নামক একজন নরপতির সাক্ষাৎ পাইতেছি[৬]। সম্ভবতঃ তিনি কোদিরি-র রাজা ছিলেন। নামটির এইরূপ পরিবর্তনের জন্য জয়বর্ষ এবং বর্ষজয়ের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করা অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু এই অভিন্নত্ব অন্য সূত্রেও সমর্থিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। কারণ বাবাটেকনে যবদ্বীপের প্রাচীন বিখ্যাত গ্রন্থগুলির যে তারিখ দেওয়া আছে উহাতে সুমনসান্তকের রচনার তারিখ দেওয়া হইয়াছে ১০৯৮ খৃষ্টাব্দ। এই সমস্ত বিভিন্ন সাক্ষ্য হইতে তিনটি বিষয় পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে, যথা (১) গ্রন্থকার একজন বর্ষজয়ের কথা বলিতেছেন (২) একজন জয়বর্ষ ১১০৪ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন এবং (৩) বাবাটেকনের-তালিকা অনুযায়ী এই কাব্যটির রচনাকালে ১০৯৮ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং অন্যরূপ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি যে আলোচ্য গ্রন্থটি মহারাজ জয়বর্ষের রাজত্বকালে আনুমানিক ১১০৪ খৃষ্টাব্দের সন্নিকটবর্তী সময়ে রচিত হইয়াছিল।

সুমনসান্তক-কাব্যটি ১৮৪ সর্গে বিভক্ত। উহা প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত হইলেও গ্রন্থটির অনুপম সংস্কৃত ছন্দ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আখ্যায়িকাটি এইরূপ[৭] :

দেবরাজ ইন্দ্র অপ্সরী হরিণীকে মর্ত্যে পাঠাইলেন ব্রাহ্মণ তৃণবিন্দুকে[৮] প্রলুব্ধ করিবার জন্য। তৃণবিন্দু তখন কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। তিনি সমগ্র ব্যাপারটি ধ্যানযোগে উপলব্ধি করিয়া হরিণীকে অভিশাপ দিলেন যে সে বিদর্ভরাজ ক্রথকৈশিকের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিবে। তবে একটি সন্তানলাভের পর হরিণীর পুষ্পাঘাতে মৃত্যু হইবে এবং সে নশ্বর দেহ হইতে মুক্তিলাভ করিবে[৯]। এই হরিণীই রাজকুমারী ইন্দুমতীরূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিল[১০]। রাজকুমারীর অপরূপ রূপলাবণ্যের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃতিলাভ করিল। ক্রথকেশিকের মৃত্যু হইলে মহারাজ ভোজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং তিনি ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরের আয়োজন করিলেন[১১]। সুমনসান্তক-কাব্যের একবিংশ স্বর্গ রঘুবংশের পঞ্চম সর্গের অজস্বয়ম্বরাভিগমন অংশের সহিত তুলনীয়।

স্বয়ম্বরের সংবাদ শুনিয়া অজ বিদর্ভের পথে যাত্রা করিলেন। যাত্রাপথে অজ লীলাচ্ছলে একটি হস্তীকে বধ করিলে দেখা গেল যে উহা গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের পুত্র প্রিয়ম্বদ। গন্ধর্ব রাজপুত্র বলিলেন যে ঋষি পতঙ্গের অভিশাপে তাঁহার এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। অজ তাঁহাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ গন্ধর্ব রাজপুত্র অজকে কয়েকটি মন্ত্র এবং বিমোহন-নামক অস্ত্র দান করিলেন। এই দিব্য অস্ত্র লাভ করিয়া অজ স্বয়ম্বরে অংশগ্রহণ করিলেন। অজ ব্যতীত দেশ-বিদেশের অনেক রাজাই ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর-সভায় আগমন করিয়াছিলেন; ইহাদের মধ্যে মগধ, অঙ্গ, অবন্তী, অনূপ এবং সুষেনের রাজা ছিলেন। ইন্দুমতী অজের কণ্ঠে মাল্যপ্রদান করিলেন। সুমনসান্তক-কাব্যের ১০৯তম সর্গে ইহা বর্ণিত হইয়াছে; কালিদাস ইহা বর্ণনা করিয়াছেন রঘুবংশম-কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে। স্বয়ম্বর-অনুষ্ঠান শেষে অজ যখন নববধূসহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন হতাশ প্রেমিকদল তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। গন্ধর্ব রাজপুত্র প্রদত্ত বিমোহনাস্ত্র দ্বারা তিনি শত্রুদিগকে পরাজিত করিলেন। ১০৯তম হইতে ১৬১তম সর্গ পর্যন্ত সুমনসান্তক এবং রঘুবংশের কাহিনীর মধ্যে মূলতঃ সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

মহারাজ রঘুর মৃত্যুর পর অজ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং সেই অনুষ্ঠানের আড়ম্বর কবিজনসুলভ বাহুল্য সহকারে যবদ্বীপীয় কাব্যের ১৬১তম সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর দশরথের জন্ম হইলে পূর্বজন্মে মহর্ষি তৃনবিন্দু যে অভিশাপ দিয়াছিলেন তাহা পরিপুরিত হইবার সময় হইয়া আসিল। নবজাতকের জন্মের আট বৎসর পরে[১২] অজ এবং ইন্দুমতী একদা প্রমোদ উদ্যানে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহার সঙ্গীতযন্ত্র লইয়া শূন্যপথে একস্থলে যাইতেছিলেন ; যন্ত্রের একপ্রান্তে একটি পুষ্পমাল্য বিলম্বিত ছিল। দেবর্ষি নারদ মাল্যটি ইন্দুমতীর বক্ষে নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষনাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল[১৩]। ইহা রঘুবংশের অষ্টম সর্গে (শ্লোক ৩৩-৩৬) এবং সুমনসান্তকের—১৬৮তম সর্গে (৬-৭ম পদ) বর্ণিত হইয়াছে। কালিদাসের কাব্যে ইন্দুমতীর মৃত্যুর জন্য পবনদেবও কতকাংশে দোষী। যখন দশরথ বয়োপ্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনে আরোহন করিলেন[১৪] তখন অজ গঙ্গাযমুনার সঙ্গমতীর্থস্থলে গমন করিযা দেহরক্ষা করিলেন[১৫]। অতঃপর অজ দিব্যদেহ ধারণ করিয়া ইন্দুমতী বা হরিণীর সহিত নন্দনের প্রমোদ উদ্যানে মিলিত হইলেন[১৬]। সুমনসান্তক কাকাবিন সমাপ্ত হইয়াছে অশুদ্ধ সংস্কৃতে বিরচিত দেবপ্রণাম এবং আশীর্বচনের ভিতর দিয়া! "ওম্ গণপতয়ৈ নমঃ, ওম্ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওম্ সর্বদেবেভ্যা নমঃ স্বহ, ওম্ দির্ঘায়ুর অস্তু তৎ অস্তু সুভম্ ওম্ বিজয়স্তি।"

প্রাচীন যবদ্বীপে রামায়ণাশ্রয়ী আরো একটি বিখ্যাত কাকাবিন ছিল। উহার নাম হরিশ্রয়। ডঃ ফ্রিডরিথ্ অনেকদিন পুর্বে বলিয়াছিলেন যে ইহা প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত উত্তরকাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। এই কাব্যের (কোড ৩৮-৮৮) বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। প্রথমে বলা হইয়াছে কিরূপে লেঙ্ক (=লঙ্কা) এর রাজা মাল্যবান এবং তাহার ভ্রাতৃদ্বয় মলি এবং সুমালি দেবগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন। দেবগণ বৃহস্পতির সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলে তিনি তাঁহাদিগকে শিবের নিকট যাইতে বলিলেন। ষষ্ঠ সর্গে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে দেবগণ শিবের সন্নিধানে উপনীত হইলে শিব তাহাদিগকে বিষ্ণুর নিকট প্রেরণ করিলেন। বিষ্ণু সাগ্রহে দেবগণকে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন ; এইরূপে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই সমস্ত রাক্ষসগণের অনেকের নামই রামায়ণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। একাদশ সর্গের চতুর্থ পাদে বজ্রমুষ্টি এবং বিরূপাক্ষের নাম দেখিতে পাইতেছি ; উহা রামায়ণ-কাকাবিনের উনবিংশ (৮-৯) এবং বিংশ সর্গেও (২৯-৩৪) দেখিতে পাইতেছি। ধূম্রাক্ষ, প্রঘস, আকম্পন প্রভৃতি রাক্ষসের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণু অবশেষে মলি[১৭] এবং মাল্যবানকে[১৮] নিহত করিলেন ; সুমালি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া লেঙ্কতে পলায়ন করিলেন এবং সেখান হইতে অবশেষে পাতালপুরীতে গমন করিলেন[১৯]। যে-সমস্ত দেবতারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিলেন তাঁহারা বিষ্ণুর অমৃতসিঞ্চনে পুনর্জীবন লাভ করিলেন। যুদ্ধাবসানে বিষ্ণু স্বধামে প্রস্থান করিলেন[২০]।

এই কাকাবিনের আরো কয়েকটি সংস্করণ আছে ; তাহাদের মধ্যে বিষয়বস্তুর বিশেষ পার্থক্য নাই। এই কাব্যের ৪২৩৫ সংখ্যক পুঁথিতে ৫৪টি সর্গ আছে। ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পুর্বে রচিত হইবার কথা নহে।

ডঃ ফ্রিডরিখের মতানুযায়ী আরো একটি কাকাবিন উত্তরকাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া বিরচিত হইয়াছিল। উহার নাম অর্জুনবিজয়। ইহাতে বলা হইয়াছে কিরূপে অর্জুন সহস্রবাহু লঙ্কার রাজা রাবণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাকে নিহত করিতে পারেন নাই। কারণ নিয়তির বিধান অনুযায়ী রাবণ রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্রের দ্বারা নিহত হইবেন। এই কাহিনীটি বিষ্ণুপুরাণেও (চতুর্থ খণ্ড, একাদশ অধ্যায়) বর্ণিত হইয়াছে। রাবণ, কুম্ভকর্ণ এবং সুর্পণখার জন্মবৃত্তান্ত এই কাকাবিনের প্রথম সর্গে বিবৃত হইয়াছে; তাহারা রামায়ণ মহাকাব্যের বিশিষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম।

অর্জুনবিজয় কাব্যে আমরা বৌদ্ধপ্রভাব দেখিতে পাই। এই গ্রন্থের কবি ম্পু তন্তুলার দ্বীপময় ভারতের সম্রাট হয়ম ভুরুকের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। ডঃ ক্রোম বলিয়াছেন[১১] যে অর্জুনবিজয় কাকাবিনটি নাগরকৃতাগমের পরে রচিত হইয়াছিল। নাগরকৃতাগম-নামক ঐতিহাসিক কাব্যের রচনাকাল ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দ। এই অনুমানের সঙ্গত কারণ আছে। অর্জুন-বিজয় কাব্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে কবির পৃষ্ঠপোষকের নাম হইতেছে রণমঙ্গল। রণমঙ্গল রাজার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র এবং রাজার সর্বকনিষ্ঠা ভগিনীর জামাতা। নাগরকৃতাগম রচনাকালে এই রাজকুমারীর বিবাহ হয় নাই। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে এই কাব্যের রচনাকাল ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে হইবে, সুতরাং বাবাটেকানের তালিকায় এই কাব্যের রচনাকাল ১০৩১ শকাব্দ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকিলেও উহা একান্তই অবিশ্বাস্য।

পা দ টী কা

১. *BKI*, 6th series, VI, pp. 391 ff.

২. *I.S.C.C.*, p. 398.

৩. পাতালখণ্ড।

৪. Juynboll, *Suppl. Cat. Jav. Mad. Hss* I, p. 228.

৫. ১৮৩ সর্গ।

৬. *OJO* LXVI ; Krom, *Geschiedenis*, pp. 284-85 ; *TBG* LVII, pp. 515-16.

৭. *BKI*, *op. cit.*, pp. 391 ff. ; Juynboll, *op. cit.*, pp. 144-146 ; Van der Tuuk *KBNWdb* III p. 324.

৮. এই ঋষি দ্বীপময় ভারতে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মূর্তি ভাস্কর্যেও রূপায়িত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য : Brandes, Beschrijving van Tjandi Singasari, etc., II, plates 79 and 80.

৯. তুলনীয় কালিদাস, বিক্রমোর্বশী ; সোমদেব, কথাসরিৎসাগর, টনির অনুবাদ (ইংরেজী) ১ম খণ্ড (১৮৮০) পৃঃ ৩৭।

১০. দশম সর্গ।

১১. ষোড়শ সর্গ।

১২. ১০ ও ১৬৮ সর্গ।

১৩. রঘুবংশম্, অষ্টম সর্গ, শ্লোক ৩৩-৩৬। তুলনীয় সুমনসান্তক, সর্গ ১৬৮, শ্লোক ৬-৭।

১৪. ১৭৫ সর্গ।

১৫. ১৭৬ সর্গ।

১৬. ১৮৪ সর্গ।

১৭. ১৮।৭।

১৮. ১৯।৭।

১৯. ১৯।৯।

২০. ২০।৪।

২১. *TBG*, 57, p. 520.

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইতিহাস বা মহাকাব্য (পঞ্চম পর্যায়)

মহাভারত

(১)

প্রাচীন যবদ্বীপীয় মহাভারত বৃহৎ হইলেও উহা সংস্কৃত মহাভারতের মত বিপুলায়তন নহে। ইন্দ্রবিজয়, ভীমস্বর্গ, অর্জুনবিবাহ, পার্থযজ্ঞ, ঘটোৎকচাশ্রয়, হরিবিজয়, ভারতযুদ্ধ, কৃষ্ণায়ণ প্রভৃতি কাকাবিন ভারতীয় মহাভারতের অনুপ্রেরণায় রচিত হইয়াছে। যবদ্বীপীয় সাহিত্যের উপর ইহার প্রভাব এত সুদূরপ্রসারী-হইয়াছিল যে খুব কম গ্রন্থই মহাভারতের আখ্যায়িকাগুলির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখ না করিয়া পারিয়াছে। ইহা যবদ্বীপীয় কবিগণকে তাহাদের কাব্যরচনার উপাদান দিয়াছে। একহিসাবে বলা যায় যে সংস্কৃত রামায়ণ এবং মহাভারত যবদ্বীপীয় প্রাচীন সাহিত্যের গোড়াপত্তন করিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে।

প্রাচীন যবদ্বীপীয় মহাভারতের কয়েকটি সংস্করণ ভান এক, ভান দের তুক, ডঃ কার্ণ প্রভৃতি মণীষিগণ জাভা, বলি এবং লম্বকের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য না থাকায় আমরা ইহাদিগকে একই সংস্করণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। প্রাচীন যবদ্বীপীয় মহাভারতের কয়েকটি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইবার পর ডচ্ পণ্ডিতগণ ইহা লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ডঃ ফ্রিডরিখ্ তাঁহার "ভুরলুপিস ভেরস্লাগ ভান হেট আইল্যাণ্ড বলি"-নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। ঐ বৎসর হইতে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। শেষোক্ত বৎসরে অধ্যাপক কার্ণ 'ওভের দে আউড জাভান্‌সে ভেরটালিং ভান হেট্ মহাভারত' নামক নিবন্ধে যবদ্বীপীয় মহাভারতের পোষ্যচরিত অংশটুকু অনুবাদ করিলেন এবং ঐ প্রসঙ্গে প্রাচীন যবদ্বীপীয় মহাভারতের প্রকৃতি, রচনাকাল এবং গঠনশৈলী সম্বন্ধে তথ্যবহুল গবেষণার সূত্রপাত করিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ডঃ যুইনবোল 'ড্রেই বুকেন ভান হেট আউড জাভান্‌সে মহাভারত ইন কবি-টেকস্ট এন্ নেডেরল্যাণ্ডস্ ভেরটালিঙ্, ভেরগেলেকেন মেৎ দেন স্যান্‌স্ক্রিট টেক্সট' নামক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। এই গ্রন্থে তিনি যবদ্বীপীয় মহাভারতের পঞ্চদশ, ষোড়শ এবং সপ্তদশ পর্বের ডচ্ অনুবাদ প্রকাশ করিলেন এবং উক্ত পাঠগুলির ব্যাকরণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রশ্ন বিশদভাবে আলোচনা করিলেন। একহিসাবে এই গ্রন্থখানি যবদ্বীপীয় এবং সংস্কৃত মহাভারতের তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তি স্থাপন করিল।

মহাভারত অষ্টাদশপর্বে বিভক্ত এবং বলিদ্বীপে এই মহাকাব্যখানি অষ্টাদশপর্ব নামে পরিচিত। এমন কি, প্রাচীন যবদ্বীপীয় কোন কোন গ্রন্থের বিকৃত তালিকাতেও পর্বের সংখ্যা অষ্টাদশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ৪৩৬৭ সংখ্যক পুঁথিতে রক্ষিত নামগুলি এইরূপ : শ্রম, সস্তিক, বুজঙ্গ, উদ্যোগ, স্বর্গরোহনপর্ব, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সল্য, কর্ণপর্ব, প্রস্তনিং, অস্বতম, স্ত্রি, মোকসল, গদ, বিরাটপর্ব, আদিপর্ব এবং গদবিরপর্ব। প্রাচীন যবদ্বীপীয় কোরবাশ্রম গ্রন্থে একটি ভিন্ন তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, প্রাচীন যবদ্বীপীয় আদিপর্বের বসন্ততিলক-ছন্দে বিরচিত মুখবন্ধে মহাভারতের অষ্টাদশপর্বের নাম দেওয়া হইয়াছে, যথা : আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, গদা, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অশ্বমেধিক, আশ্রম-বাসিক, মৌসল, মহাপ্রস্থানিক এবং স্বর্গারোহনিক। যবদ্বীপের আদিপর্বে আরো দুইটি তালিকা আছে বটে, কিন্তু সেখানে সপ্তদশ পর্বের নাম বলা হইয়াছে। বসন্ততিলক ছন্দে যে অষ্টাদশ পর্বের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা গ্রন্থখানির বিভিন্নস্থলে 'অষ্টাদশপর্ব'-শব্দের উল্লেখে সমর্থিত হয়। সুতরাং ইহাই মহাভারতের আদিম পর্ব-বিন্যাস বলিয়া ধরা যাইতে পারে। প্রথম তালিকা দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে অনুশাসন পর্বের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, অন্ততঃ ইহা শান্তিপর্বের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষের পর্বগুলির সঠিক সংখ্যা সম্বন্ধে অবিশ্বাস্য বিভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে, কারণ দক্ষিণ ভারতের সংস্করণে ২৪টি পর্ব-সংখ্যা দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং সমুদ্রপারবর্তী বিদেশী গ্রন্থে বসন্ততিলকছন্দে রচিত পর্বসমূহের যে তালিকা পাইতেছি তাহাকেই মৌলিক পর্ববিন্যাশ বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে পর্বের সংখ্যা সম্বন্ধে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

যবদ্বীপে সম্পূর্ণ সংস্কৃত মহাভারত কোনদিন প্রচলিত ছিল কিনা বলা দুঃসাধ্য; বর্তমানে কেবলমাত্র আদি, সভা, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম এবং পঞ্চদশ, ষোড়শ এবং সপ্তদশ পর্বের সংক্ষিপ্ত যবদ্বীপীয় গদ্য অনুবাদ বিদ্যমান। অন্য কোন পর্ব প্রচলিত হইয়া থাকিলে বর্তমানে উহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

মহাভারতের এই পর্বগুলির কোন কোনটিতে শ্রী ধর্মবংশ তেগুঃ অনন্তবিক্রমোত্তুঙ্গদেব-নামধারী একজন রাজার উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি দশম শতাব্দীর শেষ দশকে এবং একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। তাঁহার আদেশানুযায়ী আদি, বিরাট এবং ভীষ্মপর্ব প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় অনুদিত হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন যবদ্বীপীয় বিরাটপর্বে আমরা পড়িতেছি যে এই গ্রন্থটি ৯৯৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

"যস্মাচ্ছ্রুমোতি গুণ শালিকাদেয়া
সার্ধান বর্ষশত রোহিণাস্সিতে।
য ধের্য বর্ষা মিতকরাস্ তু সা
শ্রী ধর্মবংশ দগুঃ অনন্তবিক্রমঃ।"

ডঃ হাজো বলিয়াছিলেন যে প্রাচীন যবদ্বীপীয় আদিপর্ব দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত

হইয়াছিল। তাঁহার মতানুযায়ী যবদ্বীপের এই সংস্করণটি এবং ক্ষেমেন্দ্রের ভারতমঞ্জরী একই মৌলিক উৎস হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে এবং উক্ত মূল গ্রন্থখানি উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে দশম শতাব্দীর পূর্বে বিদ্যমান ছিল[১]। ডঃ উল্‌ফ্[২] হ্যাজোর এই অভিমত খণ্ডন করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন যে ক্ষেমেন্দ্রের ভারতমঞ্জরী এবং যবদ্বীপীয় আদিপর্ব ও বিরাটপর্বের মধ্যে যেমন সামঞ্জস্য রহিয়াছে তেমনি উহাদের মধ্যে গভীর পার্থক্যও বিদ্যমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ ক্ষেমেন্দ্রের ভারতমঞ্জরী এবং অন্যান্য ভারতীয় সংস্করণের মধ্যে যেমন কোন কোন বিষয়ে মিল রহিয়াছে তেমনি অন্যান্য ভারতীয় সংস্করণ এবং যবদ্বীপীয় আদি ও বিরাটপর্বের মধ্যেও মিল রহিয়াছে। সুতরাং ক্ষেমেন্দ্রের ভারতমঞ্জরী এবং যবদ্বীপের আদি ও বিরাটপর্বের মূল উৎস একই বলা সম্ভবপর নহে।

যবদ্বীপে মহাভারতের যে পর্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুবাদ নহে; উহা কোথাও বা সংস্কৃত মহাভারতের সংক্ষিপ্ত paraphrase, কোথাও বা সঠিক বা প্রায় সঠিক অনুবাদ, কোথাও আবার কমবেশী সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। যবদ্বীপীয় গ্রন্থকারগণ ভারতীয় সংস্করণকে যথাসম্ভব অনুসরণ করিলেও কাহিনীভাগ পরিবেশন করিবার সময় উহা যথাসম্ভব নিজের ভাষাতেই বলিতে উন্মুখ ছিলেন। সুতরাং পাঠকগণকে মাঝে মাঝে ভুলিয়া যাইতে হয় যে যবদ্বীপীয় গ্রন্থখানির মূল পুস্তক অন্য দেশে অন্য ভাষায় রচিত হইয়াছিল[৩]। যবদ্বীপীয় পর্বগুলিতে বলিবার যে রীতি অনুসৃত হইয়াছে তাহা অনেকটা ঘটনাকেন্দ্রিক। লেখক গ্রন্থের মধ্যে ভারতীয় মূল হইতে যে সংস্কৃত বা অন্যবিধ উদ্ধৃতি উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা অংশতঃ যবদ্বীপীয় সংস্করণের গৌরব এবং মূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য, অংশত পাঠককে মূলগ্রন্থের সংস্পর্শে আনিবার জন্য। হয়তো গ্রন্থে ঐ অংশের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দান করিবার জন্যও সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়া থাকিবে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থখানি যে ধর্মের পটভূমিকায় রচিত হইয়াছিল তাহাই পাঠকগণের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরাও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এবং ইহা সংস্কৃত উদ্ধৃতির দ্বারাই সুচারুরূপে করা সম্ভবপর ছিল। ডঃ গণ্ডা[৪] যবদ্বীপীয় পর্বগুলির আরো একটি বিশেষত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এইগুলির পৌরাণিক এবং didactic অংশে (যেমন, জম্বুখণ্ডবিনির্মান এবং ভীষ্ম পর্বের ভগবদ্গীতা-অংশে) গ্রন্থের অপরাপর অংশ অপেক্ষা অধিকতর সংস্কৃত শ্লোক আছে এবং রচনাশৈলীর দিক দিয়া পর্বের ঐ অংশগুলিও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের সহিত অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের কাহিনী বর্ণনার স্থলগুলি আবার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে উহা উক্ত গ্রন্থের didactic এবং dogmatic section-এর রচনাশৈলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, বরঞ্চ উহার এই বিষয়ে মহাভারতের পর্ব-লেখক বা লেখকদের বলিবার রীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। ডঃ গোরিসের পরিকল্পনা (scheme) অনুযায়ী চতুর্যুর্গবিধিশাস্ত্র-গ্রন্থটিও অনেকটা এই মহাভারত পর্বগুলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। গ্রন্থের যে অংশে আমরা সংস্কৃত শ্লোকের বাহুল্য লক্ষ্য করিয়া থাকি তাহা হয়তো অনেকটা ধর্মের খাতিরে হইয়া থাকিবে, কারণ ঐ অংশে কোন পরিবর্তন হয়তো অধর্মীয় ব্যাপার হইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ ইহাও অসম্ভব নহে যে যবদ্বীপের গদ্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে

এইরূপ সংস্কৃত-বহুল অংশ প্রাচীনতম অনুবাদ সাহিত্যের স্বাক্ষর বহন করিতেছে এবং হয়তো প্রাচীন যবদ্বীপীয় আদিপর্ব ইহারই অন্যতম নিদর্শন। ডঃ গণ্ডা এই বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন যে এই সমস্ত গ্রন্থের রচনাশৈলীর মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাহা একমাত্র সাহিত্যের ক্রমবিকাশের (chronological order) জন্য কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। কালক্রমে যবদ্বীপীয় গদ্য-লেখকগণ সংস্কৃত শ্লোক এবং পাদ যথাসম্ভব পরিবর্জন করিতে লাগিলেন ; কাকাবিন বা কাব্য-লেখকগণ ইহা বহু পূর্ব হইতেই করিয়া আসিতেছিলেন[৫]।

মহাভারতের বিভিন্ন পর্বের মধ্যে আদিপর্ব এবং বিরাটপর্ব হইতেই ওয়েয়াঙ্‌ পুর্ব গল্পের লেখকেরা তাহাদের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। উদ্যোগপর্ব এবং ভীষ্মপর্বের উপাদান অবলম্বন করিয়া আবার ভারতযুদ্ধ নামক কাব্যের প্রথমাংশ রচিত হইয়াছে।

প্রাচীন যবদ্বীপীয় আদিপর্বের তেনগহন ছন্দে বিরচিত একটি মধ্যযুগীয় সংস্করণ আছে এবং মচপৎ ছন্দে বিরচিত বলিদ্বীপীয় সংস্করণ আছে। আদিপর্বের কোন কোন পুঁথিতে সমাপ্তিস্থলে লেখা আছে 'নমো বুদ্ধায়', অপর একটি পুঁথির শেষে লেখা আছে "ওম্‌ নমো বাগিশ্বরয়ে মহাবগিশ্বয়ে, ওম্‌ গেমুঙ্‌ গণপতয়ে নমঃ, ওম্‌ শ্রী গুরুপদুকেভ্যোঃ নমঃ"। সম্ভবতঃ যে সমস্ত নকলনবীশ জীর্ণ লণ্টারপত্র হইতে পুঁথি নকল করিয়া নূতন পুঁথিতে লিখিতেন এই সমস্ত বিকৃত সংস্কৃত শ্লোক তাহাদেরই ধর্মের স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

এই সাধারণ মুখবন্ধের পর এইবার আমরা যবদ্বীপীয় আদিপর্বের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ পরিবেশন করিব। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে এই পর্বটি গদ্যে রচিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার প্রারম্ভেই তিনটি সংস্কৃত শ্লোক আছে। লেভী মহোদয় বলিয়াছেন[৬] যে উহার দ্বিতীয় শ্লোকটি ভট্ট নারায়ণের বেণীসংহার হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। স্বভাবতঃই ইহা হইতে কেহ কেহ যবদ্বীপের সাংস্কৃতিক জীবনে বাঙালীর অবদান খুঁজিয়া পাইয়াছেন। বাংলায় প্রবাদ আছে যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্ট নারায়ণ কনৌজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ছিলেন এবং তিনি আদিশূর কর্তৃক বঙ্গদেশে সংস্থাপিত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান নাই[৭]।

এই পর্বের ৩১২৭ নম্বর পুঁথিটির আরম্ভে লেখা হইয়াছে : "তত্র বংশম্‌ অহম্‌ পুর্বম্‌ শ্রোতুম্‌ ইচ্ছন্তি (=ইচ্ছামি) ভার্গব।" এইরূপে পৌলমের কাহিনী আরম্ভ হইল ; ইহার বিষয়বস্তু সংস্কৃত পৌলমপর্বে বিবৃত হইয়াছে। কাহিনীতে বলা হইয়াছে যে যখন তাঁহার স্বামী ভৃগু অন্যত্র ছিলেন তখন তাঁহাকে একজন রাক্ষস আক্রমণ করে। সেই বিপদের সময় গর্ভ হইতে পতিত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার পুত্র চ্যবন রক্ষা করেন। এই রাক্ষসটির রক্ষক অগ্নিদেবতা ভৃগু কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া সর্বভক্ষ হইলেন। ইহার পর প্রমথনার (সংস্কৃত : প্রমদ্বরা) প্রণয়ী রুরুর কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রমথনা সর্প কর্তৃক দষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে রুরু তাঁহাকে নিজ জীবনের অর্ধাংশ দান করিয়া তাঁহাকে পুনর্জীবন দান করিলেন। ডঃ যুইনবল মনে করেন যে রুরুর কাহিনীর পরে খানিকটা অংশ বাদ পড়িয়া গিয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার

পর লেখা আছে যে রুরু রাগান্বিত হইয়া সর্পকুল ধ্বংসকার্যে নিজেকে নিয়োজিত করিলেন ; সর্পকুল ইহাতে নিরতিশয় ভীত হইয়া পড়িল। ইহার পর যবদ্বীপীয় গ্রন্থটি জরৎকারুর কাহিনী লইয়া আবার আরম্ভ হইল। সংস্কৃত সংস্করণে এই কাহিনীটি দুইবার (শ্লোকসংখ্যা ১০২৫-১০৬৮ ; ১৮১৩-১৯৩২) বর্ণিত হইয়াছে। ডঃ যুইনবল বলিয়াছেন যে প্রাচীন যবদ্বীপীয় অনুবাদে সংস্কৃত কাহিনীর শেষাংশ অনুসরণ করা হইয়াছে। তাঁহার সিদ্ধান্তের কারণ এই যে ২৭-ক সংখ্যক পৃষ্ঠায় একটি বিকৃত সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা "কো ভবন্তঃ বলমন্তে বীরণস্তম্ভম্ আশ্রিতাঃ" ; ইহা কলিকাতা সংস্কারণের ১৮১৮ নং শ্লোকের অনুরূপ। যবদ্বীপীয় গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে জরৎকারু অবিবাহিত জীবনযাপন করিতেন ; সুতরাং তাঁহার পুর্বপুরুষের প্রেতাত্মারা তাঁহাকে বিবাহ করিয়া পুত্র উৎপাদনের জন্য বারংবার অনুযোগ করিতেন। কারণ ইহা ভিন্ন তাঁহাদের মুক্তিলাভ সম্ভবপর নহে।

অতঃপর জরৎকারু নাগরাজ বাসুকীর ভগ্নীকে বিবাহ করিলেন ; তাঁহার নামও জরৎকারু। অতঃপর জরৎকারু তাঁহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইহাদের পুত্রের নাম হইল আস্তীক ; ইহার কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়াই সংস্কৃত আদিপর্বের অন্তঃস্থ আস্তীকপর্ব রচিত হইয়াছে। যবদ্বীপের পুঁথির ৩২-ক পৃষ্ঠায় কদ্রু এবং বিনতার ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। কদ্রু ছিলেন নাগমাতা, আর বিনতা ছিলেন অরুণ এবং গরুড়ের মাতা। অরুণ তাঁহার মাতাকে অভিশম্পাত প্রদান করিলেন ; কারণ, তিনি ধৈর্য্যহারা হইয়া অসময়ে ডিম্ব খুলিয়া ফেলার জন্য অরুণ বিকৃত আকৃতি লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেন। সুতরাং বিনতা নাগমাতা কদ্রুর দাসী হইলেন। পুঁথির ৩৪-ক পৃষ্ঠায় ক্ষীর সমুদ্রমন্থনের কাহিনী বিবৃত করা হইয়াছে ; ইহা হইতে অমৃত উঠিল। দেবগণ অমৃত পান করিয়া অমর হইলেন। রাহু নামক একটি দানবও এই অমৃতলাভের প্রয়াসী হইলেন, কিন্তু বিষ্ণু তাহার শিরচ্ছেদ করিলে রাহু চন্দ্র-সূর্যের ভক্ষণকারী হইল। পুঁথির ৩৭নং পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে বিনতা পণে হারিয়া কিরূপে কদ্রুর দাসী হইলেন। নাগগণ তাহাদের মাতার নির্দেশ পালন করিয়া না চলায় কদ্রু তাঁহাদিগকে অভিশম্পাত করিলেন : "সর্পসত্রে বর্তমানে পাবকো ব প্রদর্শতি"। ডঃ যুইনবল বলিয়াছেন যে ইহা মহাভারতের ১১৯৬ নম্বর শ্লোকের অনুরূপ। পুঁথির ৩৮নং পৃষ্ঠায় গরুড়-পক্ষীর কাহিনী আরম্ভ হইল। প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে তাঁহার মাতার দাসীত্ব নিবন্ধন গরুড়পক্ষী নাগদিগকে রক্ষা করিবেন, কিন্তু পরে স্থির হয় যে গরুড়পক্ষী যদি অমৃত আনয়ন করিতে সমর্থ হন তাহা হইলে তাঁহার মাতার দাসীত্বের অবসান হইবে। গরুড়পক্ষী অমৃত-রক্ষী দেবগণকে পরাজিত করিয়া অমৃত আনয়ন করিলেন। বিষ্ণু গরুড়পক্ষীর পরাক্রম দর্শন করিয়া প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার বাহন করিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি বলিলেন যে নাগগণ গরুড়পক্ষীর ভোজ্যদ্রব্য হইবে। আস্তীকপর্বের এই অংশের নাম সংস্কৃত মহাভারতে দেওয়া হইয়াছে সৌপর্ণপর্বন্। শেষ-নাগ কিরূপে সমগ্র ধরণীর ভার বহন করিতে আদিষ্ট হইলেন তাহা পুঁথির ৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। উহার ৫৭-ক পৃষ্ঠায় সর্পসত্র বা সর্পযজ্ঞের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই সর্পসত্রের পুরোধা ছিলেন জনমেজয়। তাঁহার পিতা পরীক্ষিৎ নাগ

তক্ষক কর্তৃক দষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তিনি এই সর্পযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন। সন্ত্রস্ত নাগগণ দেবরাজের ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাহাদিগের রক্ষার উপায় করিতে পারিলেন না। অবশেষে আস্তীক তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। তিনি প্রথমে জনমেজয়ের নিকট একটি বর প্রার্থনা করিলেন; জনমেজয় উহা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলে আস্তীক সর্পযজ্ঞ বন্ধ করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাজা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ সর্পযজ্ঞ বন্ধ করিয়া দিলেন। পুঁথির ৬১ পৃষ্ঠায় একটি নূতন কাহিনী বিবৃত হইয়াছে; উহা সংস্কৃতে আদিবংশাবতরণপর্বন্ নামে পরিচিত। ইহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে কিরূপে উপরিচরের বীর্য যমুনাজলে পতিত হইল এবং উহা গ্রাস করিয়া কিরূপে একটি মৎস্য দুইটি সন্তানের জননী হইলেন। এই সন্তানগণের মধ্যে একজন ছিলেন সত্যবতী; ইনি শরীরের গন্ধের জন্য দুর্গন্ধিনী নামে অধিকতর পরিচিতা হইলেন। ঋষি পরাশর তাহাকে বিবাহ করিলেন; ঋষির কৃপায় দুর্গন্ধ দূরীভূত হইল এবং তিনি সযোজনগন্ধিনী নামে খ্যাতিলাভ করিলেন। তাঁহাদের পুত্র ছিলেন মহাভারতকার ব্যাস; তিনি আবার যবদ্বীপের ওয়েয়াঙ্-কাহিনী অবিয়স-এর নায়কও ছিলেন। সংস্কৃত মহাভারতের সম্ভবপর্বনের কাহিনীটি পুঁথির ৬৫-নং পৃষ্ঠায় আরম্ভ হইল। ইহাতে বলা হইয়াছে যে পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিলে দেবগণ ও দৈত্যগণ মর্ত্যে অবতরণ করিয়া মহাভারতের বীরবৃন্দের মধ্যে জন্ম পরিগ্রহণ করিলেন। এইরূপে বৃহস্পতি হইলেন দ্রোণ; অনন্তভোগ—অশ্বত্থামা; দ্বাপর—শকুনি; মরুৎগণ—দ্রুপদ, কৃতবর্মন ইত্যাদি; ধর্ম—যুধিষ্ঠির; বায়ু—ভীম; সোম—অভিমন্যু; অগ্নি—ধৃষ্টদ্যুম্ন; বাসুকি—বলদেব; শ্রী—দ্রৌপদী ইত্যাদি। যবদ্বীপের আদিপর্বের ঐ পুঁথির ৬৬ পৃষ্ঠায় দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ডঃ য়ুইনবল[৮] বলিয়াছেন যে এই কাহিনীটির সহিত কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলমের কোন কোন বিষয়ে মিল রহিয়াছে। দুর্বাসা এবং অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়কের কাহিনীটি যবদ্বীপের আদিপর্বে নাই; যবদ্বীপের আদিপর্বে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কাহিনীটি কালিদাস অপেক্ষা অধিকতর সরলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পুঁথির ৭৪-ক পৃষ্ঠায় যযাতির কাহিনী বিবৃত হইয়াছে; ইহাতে বলা হইয়াছে কিরূপে দেবগণ কচকে ব্রাহ্মণ শুক্রের নিকট বিজ্ঞান শিখিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। সংস্কৃত এবং যবদ্বীপীয় সংস্করণে বলা হইয়াছে যে তিনি তিনবার দৈত্যগণ কর্তৃক নিহত হইলেন, কিন্তু কন্যা দেবযানী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শুক্র প্রত্যেক বারই তাঁহার পুনর্জীবন দান করিলেন। দেবযানী কচকে নিবিড়ভাবে ভালবাসিত। কচ দেবযানীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করায় দেবযানী কচকে অভিশম্পাত প্রদান করে, কচও দেবযানীকে অভিশম্পাত করিল। অতঃপর আমরা দেখি যে দেবযানী দৈত্যরাজ বৃসপর্বনের কন্যা শর্মিষ্ঠার সহিত বিবাদ করিলে দেবযানীকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। দেবযানীকে অবশেষে যযাতি উদ্ধার করেন। শুক্র কন্যার এই অপমানে রাগান্বিত হইয়া বৃসপর্বনের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইলে বৃসপর্বন বাধ্য হইয়া শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসী করিয়া দেন। অবশেষে শুক্রের কন্যার যযাতির সহিত বিবাহ হইল এবং তাঁহাদের যদু এবং তুর্বশু নামে দুই পুত্র হইল। দেবযানীর ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ সত্ত্বেও যযাতি এবং শর্মিষ্ঠার মিলনে তিনটি পুত্র হইল; তাহাদের নাম দ্রুহ্যু, অনু এবং পুরু। যযাতি

এইরূপে পুর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় শুক্র রাগান্বিত হইয়া যযাতিকে শাপ প্রদান করিয়া তাঁহাকে অকাল বৃদ্ধরূপে পরিণত করিলেন। যযাতি এই জরা তাঁহার পুত্রগণকে প্রদান করিতে চাহিলেন, কিন্তু চারিজন পুত্র উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। ফলে তাহারাও যযাতি কর্তৃক অভিশপ্ত হইল। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে যদু হইতে যাদবগণ, তুর্বশু হইতে যবনগণ, দ্রুহ্যু হইতে ভোজগণ এবং অনু হইতে ম্লেচ্ছগণ জন্মগ্রহণ করিল। পুরু পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন; তিনিই কৌরব এবং পাণ্ডবগণের পুর্বপুরুষ। যযাতি অতঃপর স্বর্গে গমন করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার উদ্ধত স্বভাবের জন্য আবার মর্ত্যে প্রেরিত হইলেন। পৃথিবীতে সৎ জীবনযাপন করিয়া যযাতি পুনরায় স্বর্গে গমন করিলেন। অতঃপর শান্তনু এবং পাণ্ডবগণের কাহিনী খাণ্ডববন দাহন পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বীপময় ভারতে মহাভারতের সভাপর্ব সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে[৮ক]; ইহার কৃতিত্ব গেডঙ্ কির্ত্যের (পুর্বের নাম কির্ত্য লাইফ্রিংক ভান দের তুক, সিঙ্গরজ) প্রাপ্য। ইহাতে কয়েকটি সর্গ আছে এবং উহা বিভিন্ন আধুনিক ছন্দে বিরচিত, যেমন ছয়টি সর্গ সিনোম ছন্দে (২৪০ চরণ), পাঁচটি পঙ্কুর ছন্দে (১৯১ চরণ), পাঁচটি দুর্ম ছন্দে (৩৭৮ চরণ) এবং একটি দণ্ডঙ্গ গুলো (১১টি চরণ) ছন্দে বিরচিত হইয়াছে। ইহা হইতে এই অনুমানই স্বাভাবিক যে ইহার এক মূল গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল যাহা লিখিত হইয়াছিল প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায়। আধুনিক বলিদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত এই সভাপর্ব আমার আলোচ্য বিষয় নহে; ইহার বিষয়বস্তু বিশেষ ভাবে আলোচিতও হয় নাই। তবে ডঃ হুইকাশ বলিয়াছেন যে আলোচ্য সভাপর্ব পরিকল্পনা সংস্কৃতানুসারী, যদিও বর্ণনাস্থলে সংযোজনা আছে।

পুর্বেই আমরা বলিয়াছি যে বিরাট পর্ব[৯] গ্রন্থটি ৯৯৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ধর্মবংশ তেগু অনন্তবিক্রমের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থটি যবদ্বীপে খুব জনপ্রিয় ছিল বলিয়া অনুমিত হয়, কারণ অনেক ল্যাকোন এবং ওয়েয়াঙ কাহিনী এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। জগল অবিলব এবং ওবোঙ্-ওবোঙ্গন বলে সি গলগল-এর অংশবিশেষ নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। অবিলব নামটি বল্লভ নামের বিকৃত রূপ। স্মরণ থাকিতে পারে যে মধ্যম পাণ্ডব ভীম এই ছদ্মনামটি বিরাটনগরে অবস্থানকালে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে কয়েকটি বিশুদ্ধ এবং অনেক অশুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক আছে এবং তাহাদের সংখ্যা ৬২টির কম হইবে না। যদি এক পাদ বিশিষ্ট সংস্কৃত শ্লোকগুলিও এই হিসাবের মধ্যে ধরা যায় তাহা হইলে সংস্কৃত শ্লোকের সমগ্র সংখ্যা আরো অনেক বেশী হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে অনেক সংস্কৃত পদও অসম্পূর্ণ অবস্থায় উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রাচীন যবদ্বীপীয় বিরাটপর্ব হইতে নিম্নে দুই একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে; উহা হইতে দশম শতাব্দীর শেষাংশে এই শ্লোকগুলি কি পরিমাণে বিকৃত হইয়াছিল তাহার একটা পরিমাপ করা যাইবে। গ্রন্থের আরম্ভ হইল "অবিঘ্নম্ অস্তু" বলিয়া; ইহার পরই নিম্নলিখিত বিকৃত শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে শ্রোত্রিয়গণের মধ্যে বিশিষ্ট ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রশংসা করা হইয়াছে :

"শাক্রেয়ো যস্ তপস্য অন্ধকরিপুবরম্ অপ্ত্বা
সলাসন (?) ইতো বৈ,
পুংসা যুক্তোপলেভে বিশলপস্থলনির্ (?) য।
পুনঃ কন্যকাথ
আপদ্ধর্মপ্রতীকারজননকুশলো যস্
তয়োর্ আত্মপুত্রঃ
কৃষ্ণদ্বৈপায়নাখ্যস্ স জয়তি ভগবান্
শ্রোত্রিয়ানাম্ বিশিষ্ট।"[১০]

এই গ্রন্থের ৪৬৮১-নং পুঁথিতে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি আছে; উহা সংস্কৃত মহাভারতের কলিকাতা সংস্করণেও বিধৃত হইয়াছে :

"কথম্ বিরাটনগরে মম পূর্বপিতামহাঃ
অজ্ঞাতবাসম্ উষিতা দুর্যোধনভয়ার্দিতাঃ[১১]।

এই সমস্ত পর্বের একটি বিশেষত্ব হইল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সংস্কৃত শ্লোকের বাহুল্য।

যবদ্বীপের ভীষ্মপর্বটিও ধর্মবংশের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। ভীষ্মপর্বের প্রথমাংশেই সংস্কৃত শ্লোকে আমরা পড়িতেছি[১২] :

যশ্ শ্রীধরো যবপতিঃ খলু লোকপালস্
তস্য মনোহরি পদএয়ম্ এতি সংরাট
শ্রী ধর্মবংশ দেগুহ্ আদিম অনন্তমধ্যাম্
সংজ্ঞাং নৃপঃ প্রণিদধাতি স বিক্রমান্তাম্।

ইহার পর যবদ্বীপীয় ব্যাখ্যাতেও পড়িতেছি : সির ত মকনাম শ্রী ধর্মবংশ দেগুহ্ অনন্তবিক্রম, সফল মঙ্গল্য নিঙ্গ মঙ্কিকেৎ প্রাকৃত নিঙ্গ্ ভীষ্মপর্ব"[১২]। এই ভীষ্মপর্বের কে গ্রন্থকার ছিলেন বলা মুস্কিল। এই গ্রন্থের একখানি পুঁথির অন্তে সংস্কৃত শ্লোকে আমরা পড়িতেছি :

"অবিলাশাভিধানেন প্রাকৃতাং ভীষ্মপূর্বণঃ
বিহিতাং লোকবোর্দযাম্ পরার্থাত্বং হি সাৎসতঃ।"

ইহা হইতে ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে যবদ্বীপীয় ভীষ্মপর্ব অবিলাস কর্তৃক রচিত হইয়াছিল, কিন্তু ভীষ্মপর্বের সম্পাদক ডঃ গণ্ডা এই অংশ মূলগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। ইহা অসম্ভব নহে যে অবিলাশ-শব্দটি যবদ্বীপীয় অবিয়স অর্থাৎ ব্যাসের বিকৃত রূপ।

ভীষ্মপর্বের জগৎসৃষ্টি বিষয়ক এবং জম্বুখণ্ডবিনির্মানপর্ব গভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়া ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে উহা মহাভারতের কলিকাতা, বোম্বাই বা অন্য কোন প্রকাশিত ভারতীয় সংস্করণ বা দক্ষিণ ভারতীয় পুঁথির সহিত এক কিংবা প্রায় এক নহে। উপরোক্ত সংস্করণগুলির নিজেদের মধ্যে যতটা পার্থক্য বিদ্যমান, ইহার সহিত উহাদের পার্থক্য তাহা অপেক্ষা গভীরতর। সুতরাং এই অংশের মূল উৎস খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই[১৩]। প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত ভগবদ্গীতা সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে

যবদ্বীপীয় গীতা কোন কোন স্থলে কাশ্মিরী সংস্করণের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু তিনি অল-বিরূণীর ভারতবর্ষ সংক্রান্ত গ্রন্থের মধ্যে গীতার যে শ্লোক উদ্ধৃত পাইয়াছেন তাহার সহিত যবদ্বীপীয় গীতার তুলনা করিয়া নিরাশ হইয়াছেন[১৪]।

ভীষ্মপর্বের আরম্ভ হইল 'অবিঘ্নম্ অস্তু" বলিয়া। যুদ্ধোদ্যমের বিবরণ দিয়া ভগবান বৈশম্পায়ন মহারাজ জনমেজয়কে কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন। তিনি বলিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত কুরু পাণ্ডব বীরগণ দুর্জয় শংখধ্বনি করিলেন। ইহার কিছু পরেই গীতার বিবরণ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এই অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

প্রাচীন যবদ্বীপীয় গীতা সংস্কৃত গীতার সুন্দর অনুবাদ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে, তবে গ্রন্থকার সংস্কৃতে গীতার সেই অংশই অনুবাদ করিয়াছেন যাহা তিনি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছেন[১৫]। তিনি সংস্কৃত গীতা লইয়া আরম্ভ করিলেও তিনি যাহা রচনা করিয়াছেন তাহা উহার যবদ্বীপীয় সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি সেই সমস্ত শ্লোক ও শ্লোকগুচ্ছ পরিত্যাগ করিয়াছেন যাহাতে নূতন কোন তথ্য নাই বা যাহা পৌনঃপুনঃ অবতারণার দোষদুষ্ট। অন্যান্য অধ্যায় বা অধ্যায়াংশও পরিগৃহীত হয় নাই। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাদ পড়িয়াছে সেই অংশটুকু যেখানে লোকদের বেদানুযায়ী ক্রিয়াকর্মের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তৃতীয় অধ্যায়ের প্রায় সবটুকুই বাদ পড়িয়াছে। আর বাদ পড়িয়াছে চতুর্থ অধ্যায়ের পৌরাণিক নিয়মাবলী, পঞ্চম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের যোগ সম্বন্ধীয় বিড়ম্বিত আলোচনা (digression), সপ্তম অধ্যায়ের সেই সমস্ত লোকদের বিবরণ যাহারা অন্যান্য দেবতার ভক্ত, অষ্টম অধ্যায়ের পুনর্জন্ম হইতে মুক্তিসংক্রান্ত প্রশ্ন, নবম অধ্যায়ের সেই নীতি বিশ্লেষণ যেখানে বলা হইয়াছে যে সমস্ত জিনিষই ভগবানে সমাহিত তবুও তাঁহার মধ্যে নাই, ভগবান পৃথিবীর ধাতা, এবং পৃথিবীর বিনাশের সময় সমস্ত স্থাবর জঙ্গম তাঁহার প্রকৃতিতে বিলীন হয় ইত্যাদি। দশম অধ্যায়ে ভগবতের সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয় বাদ পড়িয়াছে ; আর বাদ পড়িয়াছে একাদশ অধ্যায়ের ৩০ শ্লোক, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায় প্রায় সম্পূর্ণ অংশ, চতুর্দশ অধ্যায়ের ১-৩ এবং অন্যান্য শ্লোক, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ অধ্যায় সম্পূর্ণভাবে এবং অষ্টাদশ অধ্যায় প্রায় সবটা[১৬]।

ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে যবদ্বীপীয় লেখক ইচ্ছা করিয়াই এই অংশগুলি পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনেক স্থলে তাঁহার উদ্ধৃতি এবং "অনুবাদ" বর্তমান প্রচলিত ভগবদ্গীতা হইতে অনেকাংশে পৃথক। ইহা আশ্চয বলিয়া মনে হয় যে যেখানে বিভিন্নতা দেখা গিয়াছে সেখানে উহা কোন কোন ক্ষেত্রে কাশ্মিরী সংস্করণের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে যবদ্বীপীয় সংস্করণে মূল সংস্কৃত হইতে যে পার্থক্য দেখা যাইতেছে তাহার দায়িত্ব সর্বক্ষেত্রে যবদ্বীপীয় গ্রন্থকার বা নকলনবীশের স্কন্ধে চাপাইয়া না দিয়া বরং উহা যবদ্বীপীয় লেখক কর্তৃক অনুসৃত সংস্কৃত সংস্করণের উপরে চাপাইয়া দেওয়াই সঙ্গত[১৭]। অন্যবিধ কারণ থাকাও অসম্ভব নহে। অল্‌বীরূণীর "ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থে প্রায় ত্রিশটি গীতার শ্লোক পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহার কোনটিই বর্তমানে প্রচলিত গীতার সহিত

সম্পূর্ণরূপে এক নহে। সুতরাং ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে বর্তমানে যে গীতা প্রচলিত আছে অল্‌বীরূণী তাহা হইতে উদ্ধৃত করেন নাই। ডঃ গণ্ডা অল্‌বীরূণীর উদ্ধৃতির সঙ্গে যবদ্বীপীয় গীতার তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য অতি সামান্যই।

এইবার আমি যবদ্বীপীয় ভগবদ্‌গীতার সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করিতেছি[১৮]।

যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনের প্রভাত; সৈন্যবাহিনী রণসজ্জায় সজ্জিত। দুর্যোধনের মস্তকে শ্বেতছত্র; কিছুদূরে শকুনি অবস্থিত, তাঁহার চতুষ্পার্শে গান্ধারের পার্বত্যসৈন্য। ভীষ্মের শুভ্রবেশ, শুভ্রবর্ম ও কার্মুক, শুভ্র তাঁহার ছত্র; দূর হইতে তাঁহাকে গঙ্গার ফেনার মত দেখাইতেছিল।

ভীষ্ম সৈন্য সমাবেশ করিলেন। কৌরবদের শত সহস্র হস্তী ছিল; প্রত্যেকটি হস্তীর সঙ্গে ছিল একশত রথী, প্রত্যেকটি রথের সঙ্গে ছিল একশত অশ্বারোহী, প্রত্যেক অশ্বারোহীর সঙ্গে ছিল দশজন কার্মুকধারী এবং প্রত্যেক কার্মুকধারীর সঙ্গে ছিল বর্ম পরিহিত একশত সৈন্য। এইরূপে ভীষ্মের সেনাপতিত্বে কৌরবগণ ব্যূহ রচনা করিলেন।

যুধিষ্ঠির এই রণব্যূহ দেখিয়া অর্জুনকে বলিলেন যে ভীষ্ম কর্তৃক শাস্ত্রানুযায়ী রচিত এই ব্যূহ দুর্ভেদ্য, আমরা কিরূপে আত্মরক্ষা করিব?

অর্জুন বলিলেন যে তিনি পূজ্যপাদ নারদের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন। সুরাসুর যুদ্ধের সময় ভগবান ব্রহ্মাও উপদেশ দিয়াছিলেন যে বিজয়াভিলাষীগণ শক্তি দ্বারা যুদ্ধ জয় করে না; করে সত্য, করুণা, ধর্ম এবং চেষ্টা দ্বারা, কারণ "যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ।" ব্রহ্মা এবং নারদ এই রূপই বলিয়াছেন।

অতঃপর পাণ্ডবগণের রণব্যূহ প্রস্তুত হইল। ব্যূহের কেন্দ্রে রহিলেন অর্জুন ও শিখণ্ডী; সৈন্যদলের একপার্শ্বে রহিলেন ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দক্ষিণ পার্শ্বে রহিলেন যুযুধান এবং সাত্যকি। ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ লইয়া যুধিষ্ঠির স্বর্ণরথে দণ্ডায়মান হইলেন।

যুধিষ্ঠির অগ্রসর হইয়া কৌরবসৈন্যের পুরোভাগে গেলে ভীষ্ম সিংহগর্জনে শংখ বাজাইলেন। যুধিষ্ঠিরও বিজয় নামক শংখ বাজাইলেন; বৃকোদর পোণ্ড্র নামক শংখ, নকুল এবং সহদেব সুঘোষ ও মণিপুষ্প নামক শংখ বাজাইলেন। অর্জুন এবং কৃষ্ণ বাজাইলেন পাঞ্চজন্য এবং দেবদত্ত নামক শংখ। কাশীরাজ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, ঘটোৎকচ, অভিমন্যু, পঞ্চকুমার এবং রাজা দ্রুপদ প্রমুখ সকলেই শংখধ্বনি করিলেন। কৌরব সৈন্যের হৃদয় ইহাতে যেন ছুরিকাবিদ্ধবৎ হইল। ধনঞ্জয়ের অভিপ্রায়ানুযায়ী কৃষ্ণ তখন উভয় সৈন্যদলের মধ্যে রথ স্থাপন করিলেন, কিন্তু প্রতিযোগীদের দেখিয়া তাহার হৃদয় করুণায় এবং দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সুতরাং তিনি কৃষ্ণকে বলিলেন:

"দৃষ্ট্বেমম্ স্বজনম্ কৃষ্ণ! যুযুৎসুম্ সমবস্থিতম্।
সীদন্তি মম গ্রাত্রানি মুখঞ্চ প(রি)শুষ্যতি[১৯]॥"

ইহারা সকলেই একই পরিবারভুক্ত, পিতা, পিতামহ, পিতৃব্য, গুরু, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর, বন্ধুবান্ধবরূপে। সুতরাং অর্জুন বলিলেন:

"ন (চ) শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ! ন চ রাজ্যং সুখানি চ[২০] ॥"

ইহাদিগকে হত্যা করিয়া পাতক হইবে; কুলক্ষয় জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? বরঞ্চ আমি নিরস্ত্র হইয়া এবং প্রতিরোধ না করিয়া সশস্ত্র কৌরবগণ দ্বারা নিহত হইব, তাহা হইলে পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে না। আমি গাণ্ডীবধনু এবং শর পরিত্যাগ করিব। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন :

"মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বা তিষ্ঠ পরন্তপ[২১] ॥"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে এই দুর্বলতা ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত নয়; এই দুর্বলতা পরিহার না করিলে স্বর্গ এবং ধর্ম (merit) ভ্রষ্ট হইবে।

তখন অর্জুন বলিলেন যে আপনি আমাকে ঠিকই উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু আমি বেদনায় অভিভূত হইয়া হতবুদ্ধি এবং কর্তব্য ভুলিয়া যাইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ তখন বলিলেন :

"অশোচ্যঃ হ্যনুশোচ ত্বং প্রজ্ঞাবাদশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূন্ বা নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ[২২] ॥"

যাহাদের জন্য শোক করিবার কারণ নাই তুমি তাহাদের জন্যই শোক করিতেছ; অথচ তুমি পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা বলিতেছ। পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কাহারো জন্যই শোক প্রকাশ করেন না। তিনি আরো বলিলেন :

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি[২৩] ॥"

এই দেহে যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা দেখা দেয়, সেইরূপ দেহান্ত প্রাপ্তিতে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ মুহ্যমান হন না। বস্তুতঃ

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্তনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ[২৪] ॥"

যাহা অনিত্য তাহার সত্তা নাই, যাহা নিত্য তাহার বিনাশ নাই; তত্ত্বদর্শীরা অনিত্য ও নিত্য এতদুভয়ের সীমা দর্শন করিয়াছেন। ইহাই সত্য। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই অপরিমেয় আত্মার জড়দেহ বিনাশশীল; সুতরাং হে ভারত, তুমি যুদ্ধ কর[২৫], কারণ মৃত্যু এবং জীবনের সীমারেখা কোথায় তাহা তুমি জান। তুমি আরও জান :

"য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ নাভিজানীতাং নায়ং হন্তি ন হন্যতে[২৬] ॥"

অর্থাৎ যিনি মনে করেন যে এই আত্মা কাহাকেও হনন করেন কিংবা যিনি ভাবেন এই আত্মা অপর কাহারও কর্তৃক হত হন তাঁহারা উভয়েই ইহার বিষয় কিছুই জানে না; ইনি কাহাকেও হনন করেন না, কাহার কর্তৃক হতও হন না। ইহার পর গীতার সেই বিখ্যাত "বাসাংসি

জীর্ণানি যথা বিহায়...” শ্লোকটি যবদ্বীপীয় গীতায় দেখিতে পাইব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু উহা নাই, তবে উহাতে আবার পড়িতেছি :

“নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ[২৭] ॥”

এই আত্মাকে শস্ত্র ছেদ করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জলে ইহাকে ক্লিন্ন করা যায় না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে অসমর্থ। সুতরাং অর্জুনের কর্তব্য হইল যুদ্ধ করা। বস্তুতঃ

“স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে[২৮] ॥”

সুতরাং অর্জুন এই ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে তাহার সমস্ত ধর্ম ও কীর্তি বিলুপ্ত হইবে[২৯]। এই আশ্বাসবাণী দিয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিলেন :

“হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় ! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥”

তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে স্বর্গে যাইবে, জয়লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে ; সুতরাং হে কৌন্তেয় ! তুমি কৃতনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধ কর, কারণ জয় পরাজয় উভয়ই সমান[৩০]। মন যখন কর্তব্যে অটল থাকে, তখনই ইহা কর্মের শৃংখল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। তোমার বিচার্য বিষয় হইল কর্ম, কর্মের ফল নহে ; তোমার উদ্দেশ্য কর্মফল হওয়া উচিৎ নহে। তুমি নিজের কর্মে আসক্ত হইও না[৩১]। তুমি সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিকে সমজ্ঞান করিবে, ইহাই যোগ[৩২]। বস্তুতঃ যখন তোমার মন শ্রুতি দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া সমাধি-নিশ্চল হইবে, তাহাই হইবে যোগ[৩৩] ; তখন তোমার কর্ণ কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিবে না[৩৪], তোমার মন থাকিবে দৃঢ় সংবদ্ধ।

ইহার পর অর্জুন মহাপুরুষের লক্ষণ কি তাহা জানিতে চাহিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন :

হে পার্থ ! যখন মানুষ তাহার মনোগত বাসনাসমূহ পরিত্যাগ করেন এবং নিজের আত্মায় নিজেই পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহাকেই স্থিতপ্রাজ্ঞ বলিবে[৩৫]।

তিনি আরো বলিলেন :

“দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥”

দুঃখে যিনি নিরুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখে যিনি বিগতস্পৃহ, যিনি রাগ ভয় ক্রোধে বীতরাগ, তিনিই স্থিতধী মুনি নামে আখ্যাত হইবার যোগ্য। নিরাহার দেহধারীর বিষয়ানুভব বৃত্তির নিবৃত্তি হইতে পারে, তবে তাহার ভোগবাসনা যায় না, কিন্তু পরমাত্মাদর্শনে সেই ভোগবাসনা বিলুপ্ত হয়[৩৬]। ইহার পর আমরা যবদ্বীপীয় গ্রন্থে পড়িতেছি যে দেহীগণ জিহ্বা এবং কামেন্দ্রিয়-সঞ্জাত ; সুতরাং মহাপুরুষগণ এই দুইটি জিনিষকে শত্রুজ্ঞান করিবেন[৩৬]। পুরুষগণ বিষয়বস্তু

সম্বন্ধে ধ্যান বা চিন্তা করিলে তাহাদের সেই সম্বন্ধে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে জন্মে কামভাব, কামভাব হইতে ক্রোধ, ইহা হইতে সম্মোহ, সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম এবং স্মৃতি-বিভ্রম হইতে বুদ্ধিভ্রংশ এবং বুদ্ধিভ্রংশ হইতে বিনাশ হইয়া থাকে[৩৭]। যখন সর্বভূতের পক্ষে নিশা তখন সংযমী জাগ্রত থাকেন ; আর যখন সর্বভূত জাগ্রত থাকেন উহাই মুনিগণের পক্ষে নিশা[৩৮]।

ইহার পর অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ যাজ্ঞা করিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যাহা উত্তর দিলেন তাহার কতকাংশ বর্তমানে প্রচলিত ভগবদ্গীতায় পাওয়া যায় না। এই অংশে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক আছে বলিয়া গার্বে অনুমান করিয়াছেন[৩৯]। ইহার পরই আমরা পড়িতেছি গীতার ৩/১৩ শ্লোক :

"যজ্ঞশেষাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ক্ষমন্তে তে ত্বঘং পাপা যে চরন্ত্যাত্মকারণাৎ[৪০] ॥

অর্থাৎ যে সাধুগণ যজ্ঞের অবশিষ্ট ভক্ষণ করিয়া থাকেন তাহারা সর্ববিধ কলুষ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু যে দুর্বৃত্তগণ উহা উপভোগ করিবার জন্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন তাহাদের পাপ সঞ্জাত হয়। ইহার পর কিছুটা অংশ সংস্কৃত গীতায় নাই। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে অন্যের ধর্ম সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করা অপেক্ষা নিজের ধর্ম অসম্পূর্ণভাবে প্রতিপালন করাও শ্রেয়ঃ। ইহার পর অর্জুনের আর একটি প্রশ্নের পর শ্রীকৃষ্ণ গীতার সেই বিখ্যাত বচনটি আবৃত্তি করিলেন :

"যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় দুরাত্মনাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে[৪১] ॥"

ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "হে অর্জুন! যিনি আমার এই জন্ম এবং দিব্য কার্যাবলী সত্যই পরিজ্ঞাত আছেন তিনি দেহত্যাগের পর আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না—তিনি আমার নিকটেই আসেন[৪২]।" আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণের মধ্যে গুণ এবং কর্ম সৃষ্টি করি এবং বিতরণ করি ; কিন্তু কর্ম আমাকে কলুষিত করে না[৪৩]। শ্রীকৃষ্ণ আরো বলিলেন যে যিনি কর্মের মধ্যে কর্মের অভাব এবং কর্মের অভাবের মধ্যে কর্ম দেখিতে পান তিনিই বুদ্ধিমান ; তিনি সকল কর্মের উৎসাহী পরিজ্ঞাতা[৪৪]। ইহার একটু পরেই শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন যে যিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি দ্বন্দ্বের অতীত, মাৎসর্য-বিহীন, সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমজ্ঞানসম্পন্ন, তিনি কার্য করিলেও কার্য দ্বারা সংবদ্ধ থাকেন না[৪৫]। কোন কোন স্থিরব্রত যোগী আবার দ্রব্য, তপ, যোগ, স্বাধ্যায়জ্ঞান এবং জ্ঞান-আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন ; এইসবগুলির মধ্যে জ্ঞানের আহুতি প্রদান করাই সর্বশ্রেষ্ঠ। জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে উহা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং বুদ্ধি দ্বারা অর্জন করিতে হইবে। সংস্কৃতে বুদ্ধিস্থলে আছে "সেবয়া" বা সেবা দ্বারা।

ইহার পর অর্জুন কর্মসন্ন্যাস এবং যোগসন্ন্যাস কাহাকে বলে তাহা জানিতে চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহার উত্তরে বলিলেন :

"সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥"

অর্থাৎ সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ উভয়ই মুক্তিলাভের উপায়, কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে কর্মসন্ন্যাস হইতে কর্মযোগ শ্রেয়ঃ[৪৬]।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে যোগযুক্ত মুনি শীঘ্রই ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন[৪৭]। ইহার পরবর্তী অংশ গীতা ৫/৮-৯ এর অনুরূপ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে এইরূপ লোক পাপ দ্বারা কলুষিত হন না ; পদ্মপত্রের উপর যেমন জল থাকে না, ইনিও সেইরূপ[৪৮]। সুতরাং বিবেকশালী মনের দ্বারা আত্মাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে কখনও অবনত হইতে দিবে না, কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই নিজের শত্রু[৪৯]। পরবর্তী অংশে যবদ্বীপীয় ভাষায় ইহার ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার পর যোগীর কর্তব্য সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :

"যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতম্।
একাকী যতিচিত্তাত্মা নিরাশিরপরিগ্রহঃ।"

সংস্কৃতে গ্রন্থগুলিতে দ্বিতীয় পাদে "যতি"-স্থলে "যত" আছে[৫০]। অর্থাৎ যোগী সর্বদা নিজেকে একা রাখিয়া সঙ্গীহীন অবস্থায় চিত্ত এবং দেহকে সংযত করিয়া বিষয়-বিতৃষ্ণ এবং পরিগ্রহশূন্য হইয়া চিত্তকে একাগ্র করিবেন। তিনি কায়, শির এবং গ্রীবা ঋজুভাবে স্থির রাখিয়া এবং নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ও দিগ্বিদিকে না চাহিয়া অবস্থান করিবেন[৫১]। সেইরূপ অবস্থায় তাঁহাকে নির্বাত অঞ্চলে অবস্থিত দীপের সহিত তুলনা করা যায়[৫২]। শ্রীকৃষ্ণ আরো বলিলেন :

"আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোজনঃ।
সুখং বা যদি দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ[৫৩] ॥

অর্থাৎ হে অর্জুন! সুখই হউক বা দুঃখই হউক, যিনি সর্বত্র সর্বজীবে আত্মতুল্য সমভাবে দেখিয়া থাকেন তিনিই পরম যোগী। ইহার যবদ্বীপীয় ব্যাখ্যা পর শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন :

"যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি[৫৪] ॥"

যিনি আমাকে সর্বত্র দেখিয়া থাকেন এবং যিনি আমার মধ্যে সর্ব জিনিষ দেখিয়া থাকেন, আমি তাঁহার নিকট কখনো অগোচর হই না এবং তিনিও আমার নিকট অগোচর হন না। যবদ্বীপীয় গ্রন্থকার এইস্থলে সংস্কৃত শ্লোকগুলির পারম্পর্য রক্ষা করেন নাই ; পূর্বের শ্লোক পরে আসিয়া গিয়াছে। লেখক বলিয়াছেন যে পূর্বোল্লিখিত যোগসাধনের উপায় হইল সর্বদা উহার অভ্যাস করা। অর্জুন এইবার জ্ঞানযোগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন :

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা[৫৫] ॥"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে তাহার প্রকৃতি ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি অষ্ট প্রকারে বিভক্ত। ইহার একটু পরেই তিনিই আবার বলিতেছেন যে "আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির এবং সংহারের একমাত্র কারণ। হে ধনঞ্জয়, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কিছু নাই।" ইহার পরই আমরা সংস্কৃত শ্লোকে পড়িতেছি :

"রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাসঃ[৫৬] শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ যে পৌরুষং নৃষু॥"

সংস্কৃত শ্লোকটি খণ্ড খণ্ড করিয়া যবদ্বীপীয় ব্যাখ্যা সহ পরিবেশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "হে কৌন্তেয়! আমি জলের স্বাদ, শশী এবং সূর্যের মধ্যে প্রভা, সকল বেদের মধ্যে প্রণবধ্বনি, আকাশে আমি শব্দ এবং মানুষের মধ্যে পৌরুষ। আমি পৃথিবীর পুণ্য গন্ধ, বিভাবসুর আমি তেজ, সর্বভূতের আমি জীবন, তপস্বীগণের আমি তপঃ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি আমি এবং তেজস্বী-গণের তেজ।" ইহার একটু পরেই শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন :

"চতুর্বিধা ভজন্তে মাং নরাঃ[৫৭] সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ[৫৮]॥"

অর্থাৎ হে ভরতকুলভূষণ অর্জুন! আর্তজন, জ্ঞানলাভার্থী, অর্থকামী এবং জ্ঞানী এই চতুর্বিধ সুকৃতিপরায়ণ ব্যক্তি আমার ভজনা করিয়া থাকেন। লেখক অতঃপর যবদ্বীপীয় ভাষায় গীতাকে অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন যে ইহাদের মধ্যে যিনি ভগবৎপরায়ণ এবং জ্ঞানী তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ[৫৯]।" তিনি মনে করেন যে "বাসুদেবঃ সর্বমিতি" অর্থাৎ এই সকলই বাসুদেব। তাই যাঁহারা আমাকে অর্থাৎ ভগবানকে আশ্রয় করিয়া জরা এবং মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাহেন তাঁহারা সেই ব্রহ্মকে, সমুদয় রহস্য এবং সমুদয় কর্মকেই জানিতে পারেন। শুধু তাহাই নহে; যিনি অন্তিমকালে আমাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন এবং মহাপ্রয়াণ করেন তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[৬০]। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন। ইহার একটু পরেই তিনি আবার বলিতেছেন :

"অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমোষধিঃ।
মন্ত্রোঽমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্[৬১]।"

অর্থাৎ আমি শ্রুতিবিহিত যজ্ঞ, আমি স্মৃতিবিহিত যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ওষধি, আমিই মন্ত্র, আমিই ঘৃত, আমিই অগ্নি, আমিই আহুতি। তিনি আরো বলিতেছেন যে আমিই ঋক, সাম, যজুঃ, আমিই অমৃত, আমিই মৃত্যু, আমিই সৎ এবং অসৎ[৬২]। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ হইল :

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যচ্চ পশ্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্[৬৩]॥"

হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম প্রদান কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু দর্শন কর তাহা সবই আমাকে অর্পণ কর। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ নিজের দেবত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অর্ধেক সংস্কৃত এবং অর্ধেক যবদ্বীপীয় ভাষার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন

যে তিনি অংশুমানের মধ্যে রবি, নক্ষত্রগণের মধ্যে শশী, দেবতাদেব মধ্যে বাসব[৬৪], রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ এবং রক্ষগণের মধ্যে বিত্তেশ[৬৫]। পর্বতশিখরগুলির মধ্যে আমি মেরু[৬৬], মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, বৃক্ষের মধ্যে আমি অশথ[৬৭]। দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ, সিদ্ধগণের মধ্যে কপিলমুনি, অশ্বগণের মধ্যে আমি উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তী মধ্যে ঐরাবণ, নরের মধ্যে নরাধিপ, আয়ুধগণের মধ্যে বজ্র, সর্প মধ্যে বাসুকি, জলচরগণের মধ্যে বরুণ, শাসকগণের মধ্যে যম, দৈত্য মধ্যে প্রহ্লাদ, পশুগণের মধ্যে সিংহ, পক্ষিগণের মধ্যে বৈনতেয়[৬৮], ধনুর্ধারিগণের মধ্যে রাম, অক্ষরগণের মধ্যে অ, মাসের মধ্যে মার্গশিরস্, ঋতুর মধ্যে আমি কুসুমাকর বা বসন্তকাল, বৃষ্ণিগণের মধ্যে আমি বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাস, কবিগণের মধ্যে আমি উশনা কবি[৬৯], ওষধিগণের মধ্যে যবশ্ব[৭০]।

অতঃপর ধনঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বররূপ দর্শন করিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন :

"পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশো বা সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ[৭১] ॥"

হে পার্থ! আমার শত সহস্র প্রকার রূপ দর্শন কর ; উহা নানাবিধ, অলৌকিক, নানাবর্ণ এবং আকৃতিবিশিষ্ট। যবদ্বীপীয় লেখক ইহার বিস্তৃততর যবদ্বীপীয় ব্যাখায় বলিয়াছেন যে আমার দেহে যুগপৎ দ্বাদশাদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীদ্বয়, দেবগণ প্রভৃতিকে দর্শন কর[৭২]। শ্রীকৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে বিশ্বরূপ দর্শন করিবার জন্য দিব্যচক্ষু দান করিলেন। ধনঞ্জয় তখন দেখিলেন :

"অনেক বক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্[৭৩] ॥"

অনেক মুখ নয়নবিশিষ্ট, নানাবিধ অদ্ভুত দর্শন, বহুবিধ দিব্যালঙ্কারে ভূষিত, অলৌকিক উদ্যত আয়ুধসংযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে ধনঞ্জয় তখন প্রত্যক্ষ করিলেন। এইবার যবদ্বীপীয় লেখক যবদ্বীপীয় ভাষায় এই শ্লোকের সংশ্লিষ্ট পরবর্তী অংশ ব্যাখ্যা করিলেন। ইহা গীতার ১১/১১ শ্লোকের সহিত তুলনীয়। ধনঞ্জয় সবিস্ময়ে দেখিলেন যে ভীষ্ম প্রমুখ সমগ্র কৌরবকুল শ্রীকৃষ্ণের দংষ্ট্রামধ্যে চূর্ণীকৃত অবস্থায় রহিয়াছেন[৭৪]।

"যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথামী নরনাথ লোকবীরাঃ,
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো দ্রবন্তি[৭৫] ॥"

নদীর বিপুল অম্বুবেগ যেমন সমুদ্রাভিমুখী হইয়া (সমুদ্রেই) বিলীন হয়, সেইরূপ ঐ নরলোক-বীরগণ জাজ্জ্বল্যমান হইয়া তোমার মুখেই প্রবেশ করিতেছে। মনে হয় যেন জলন্ত পাবকের মধ্যে পতঙ্গ প্রবেশ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ কালরূপে সকলই ধ্বংশ করিয়া থাকেন এই কথা প্রকাশ করিলে ভীতকম্পিত অর্জুন তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য স্তব করিতে লাগিলেন।

"নমো নমস্তে তু সহস্রকৃত্বঃ,
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে,
নমোঽস্তু তে সর্বত এব কালে[৭৬] ॥"

স্তবতুষ্ট হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন সৌম্য বিষ্ণুরূপ পরিগ্রহণ করিলেন[৭৭]। তিনি অর্জুনকে বলিলেন যে তাঁহার এই রূপ যাহা অর্জুন দর্শন করিয়াছেন তাহা দেবগণ দ্বারাও পরিদৃষ্ট হয় নাই; কেহ তপস্যা, দান বা যজ্ঞ করিয়াও ইহা দর্শন করেন নাই[৭৮]। বস্তুতঃ যিনি তাঁহারই নিমিত্ত কর্ম করেন, যিনি তাঁহার শরণাপন্ন হন ও একান্ত ভক্ত, যিনি বিষয়ে আসক্তিশূন্য ও সর্বপ্রাণীতে দ্রোহবর্জিত, তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন[৭৯]। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে চিত্ত সমাহিত করিতে উপদেশ দিলেন[৮০]। তিনি বলিলেন যে দিব্য আত্মা দেহে বাস করে; সুতরাং ইহা অপবিত্র করিতে নাই। সূর্য যেমন সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রী (আত্মা) সমস্ত ক্ষেত্রকে উজ্জ্বল করিয়া রাখেন[৮১]। বস্তুতঃ যাঁহারা দেহ এবং আত্মার পার্থক্য জানেন তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন[৮২]। ইহার পর লেখক দেহের সহিত সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুনের সংশ্রব বর্ণনা করিয়া ইহাদের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার পর আমরা পড়িতেছি শ্রীকৃষ্ণের সেই বিখ্যাত উক্তি :

"সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্য প্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্য নিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥
মানাবমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে[৮৩] ॥"

অর্থাৎ সুখ দুঃখে যাহারা সমজ্ঞান, যিনি আত্মনিষ্ঠ, লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চন যাহার নিকট সমান, প্রিয় বা অপ্রিয়কে যিনি তুল্যজ্ঞান করেন, আত্মনিন্দা বা প্রশস্তি যাহার নিকট সমতুল্য, মান-অপমান যাহার নিকট সমান, যিনি শত্রু ও মিত্রকে সমজ্ঞান করেন এবং যিনি সর্ববিধ কর্মোদ্যম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হন। সুতরাং যাঁহারা গুণাতীত হইয়া আমাকেই ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে সেবা করেন তাঁহারাই ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন। ইহার পর যবদ্বীপীয় লেখক সংস্কৃত গীতার ১৫, ১৬, ১৭ অধ্যায় একেবারে ডিঙ্গাইয়া গিয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিয়া যবদ্বীপীয় সংস্করণ সমাপ্ত করিয়াছেন :

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং কারণং[৮৪] ব্রজ।
অহং ত্বা(ং) সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"

হে অর্জুন ! তুমি সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমারই একমাত্র শরণাপন্ন হও; শোক করিও না; আমি তোমাকে সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত করিব।

ভারতযুদ্ধ

(২)

এইবার আমরা ভারতযুদ্ধ নামক মহাকাব্যখানির আলোচনা করিব। ডঃ ফ্রিডরিখ্ ভারতযুদ্ধকে যবদ্বীপীয় অধিবাসিগণের ইলিয়াড্ এবং উহার গ্রন্থকার ম্পু সেদহ্‌কে দ্বীপময় ভারতের হোমার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন[১]। কবি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন[২] : "নোবন্ দোন পুসেদ মকির্তিয় স সকল রসঙ্গ্ কুদ সুদ্দ চন্দ্রম—" অর্থাৎ ১০৭৯ (শকাব্দ)[৩] পু-সেদএর রচনার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল। রচনার এই তারিখ অন্যান্য লেখকগণও সমর্থন করিয়াছেন। পুর্বোল্লিখিত বাবাটেকান-তালিকায় এই তারিখই ঠিক এই চন্দ্রসঙ্কল দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। ডঃ য়ুইনবল বলিয়াছেন যে কাব্যটি সাবলীল এবং সুন্দর রীতিতে রচিত হইয়াছে এবং ইহার ক্লাসিক্যাল রচনাবিন্যাস গ্রীসের মহাকাব্যগুলির কথা স্মরণ করাইয়া দেন। ডঃ হ্যাজো[৪] ম্পু সেদহ্-কে "অকবি এবং রচনার শিল্পে স্কুলমাস্টার তুল্য" বলিয়া উন্নাসিক ভাব প্রদর্শন করিলেও কাব্যগ্রন্থখানি স্থানে স্থানে কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। কবির ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তাঁহার দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি ছিল না।

কবি লক্ষ্য করিয়াছেন কিরূপে "চম্পকপুষ্পগুলি পরিপুর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া ঝরিয়া পড়িবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে", কিরূপে "বিশীর্ণ অঞ্জুঙ্-পুষ্পগুলি উর্ণনাভের জালে ধরা পড়িয়াছিল," কিরূপে "অপস্রিয়মান বারিরাশি নদীতীরে শামুকের মৃত খোলসগুলি সংরক্ষণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।" "স্রোতস্বিনীর প্রবাহে পর্বতের উপর যে চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে" তাহাও তাঁহার অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে। কবির উপমা এবং বর্ণনা শক্তিও নিঃসন্দেহে উচ্চস্তরের, কিন্তু একথা স্বীকার করিতে হইবে যে মাঘ, বাণভট্ট প্রভৃতি সংস্কৃত লেখকের রচনাশৈলীর মধ্যে যে অপ্রাকৃততা (artificiality) লক্ষ্য করিয়া থাকি তাহা ম্পু সেদহ্-এর লেখায় অনুপস্থিত ছিল না। সকল দিক বিচার করিয়া আমরা তাঁহাকে একজন নিপুণ কবি হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি যাঁহার কল্পনাশক্তি একান্ত নিম্নস্তরের ছিল না এবং যাঁহার পর্যবেক্ষণ শক্তিও ছিল প্রচুর।

এই কাব্যের প্রথম সম্পাদক গুনিঙ্গ ইহার শতকরা ১২ ভাগ এবং পুর্বচরক ইহার ২০ ভাগেরও বেশী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন[৫]। কার্ণ বলিয়াছেন[৬] যে ভারতযুদ্ধের মধ্যে প্রেমলীলা সংক্রান্ত সমস্ত বর্ণনা এবং প্রেমিকের বিদায়বেলার শোকপ্রকাশ প্রভৃতি ঘটনা একান্তই প্রক্ষিপ্ত এবং ভারতযুদ্ধের সম্পাদক গুনিঙ্গ কার্ণের এই উক্তিটি তাঁহার গ্রন্থের মুখবন্ধে সাদরে স্থান দিয়াছেন। পুর্বচরকও এই মতাবলম্বী বলিয়া মনে হয়[৭]। এই অভিমত অবশ্য সকলে গ্রহণ করেন নাই। আদিরসমিশ্রিত হইলেই কাব্যের সেই অংশ প্রক্ষিপ্ত হইবে এই মতবাদে আমরা বিশ্বাসী নহি। যাঁহারা কালিদাস, ভট্টি, জয়দেবের অপুর্ব কাব্যসুধা পান করিয়াছেন অথবা খজুরাহো, ভুবনেশ্বর, কোনার্কের ভাস্কর্যের শিল্পসৃষ্টির সুষমা অবলোকন করিয়াছেন তাঁহারা একথা স্বীকার করিবেন বলিয়া মনে হয় না। বাস্তবিক পক্ষে শ্লীলতা এবং

অশ্লীলতার মাপকাঠি মধ্যযুগে বিভিন্ন হওয়ার জন্য উহা আমরা বর্তমান যুগের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিচার করিতে পারি না।

কবি ছিলেন কদিড়ি-রাজ শ্রীপাতুক ভটার জয়ভয়ের শিক্ষক এবং তাঁহার রাজত্বকালেই এই কাব্যগ্রন্থটি রচিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে কবি একদা রাজানুগ্রহপ্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইলে এই কাব্যের শেষাংশ স্পু পনুলুহ্ নামক একজন খ্যাতিমান বৌদ্ধ লেখক সমাপ্ত করেন। প্রাচীন যবদ্বীপীয় গ্রন্থ হরিবংশ দ্বারা এই বিবরণটি আংশিকভাবে সমর্থিত হয়। এখানে ভারতযুদ্ধের কাহিনীটি বর্ণনা করা যাউক।

গ্রন্থের প্রারম্ভেই একটি প্রস্তাবনা আছে। উহাতে ভটার গিরিনাথ এবং জয়ভয়ের কথোপকথনের একটি বিবরণ এবং স্পু সেদহ্ কর্তৃক গ্রন্থ রচনার কাল বিবৃত হইয়াছে। অষ্টম শ্লোকে বলা হইয়াছে কিরূপে পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দুর্যোধনের নিকট পাঠাইয়া রাজ্য-ভাগ দাবী করিলেন। ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে প্রাচীন যবদ্বীপীয় উদ্যোগপর্বে, যুধিষ্ঠির অভিস্থল, বৃকস্থল, বারণবত, মাকন্দী এবং অবসান নামক নগরগুলি দাবী করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ বিরাটনগর পরিত্যাগ করিয়া কুরু-রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন; তাঁহার অনুসরণ করিলেন সাত্যকি। কবি এই প্রসঙ্গে যাত্রাপথের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্য কবিসুলভ ভাষায় বর্ণনা করিলেন। কবি লক্ষ্য করিয়াছেন কিরূপে তঞ্জুঙ্-লতার "পুষ্পদলগুলি অনমুন্মীলিত ছত্রের মত দোদুল্যমান রহিয়াছে৮" "ইক্ষুখণ্ডের সংযোগস্থলগুলিও৯" তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি এড়ায় নাই। কবি এইরূপে উচ্চ কল্পনা-ব্যঞ্জনার সহিত অতি সাধারণ জিনিষের অসার্থক প্রয়োগ করিয়াছেন। রাজধানী হস্তিনার উপকণ্ঠে কৃষ্ণের সহিত কাণ্ব, জনক এবং নারদ মিলিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সারথি হইয়া তিন পণ্ডিতের সহিত বাজধানীর দিকে গমন করিলেন। কৃষ্ণ আসিতেছেন শুনিয়া ভীষ্ম এবং ধৃতরাষ্ট্র সম্মানিত অতিথির সম্বর্ধনার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন, কিন্তু শকুনি, কর্ণ এবং দুর্যোধন ইহাতে ক্ষীণ আপত্তি জানাইলেন। কবি অতঃপর জনসাধারণের সম্বর্ধনার কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। যবদ্বীপের অলঙ্কারশাস্ত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা পুর্বেই এই সম্বর্ধনার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছি। কিয়ৎকাল দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যান্য বয়োবৃদ্ধগণের সহিত আলাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডু-মহিষীর চরণস্পর্শ করিলেন। কুন্তীদেবীর হৃদয় তাঁহাকে দেখিয়া "প্রস্ফুটোন্মুখ ফুলদলের মত বিকশিত হইল"। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিদুর-সমীপে গমন করিলেন। ৩৭-৩৯নং শ্লোকে কৌরবদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আলোচিত হইয়াছে; এই আলোচনায় কৃপ, কর্ণ, শকুনি এবং অন্যান্য কয়েকজনের 'যুদ্ধং দেহি'-ভাব দেখিয়া দুর্যোধন অত্যন্ত প্রীত হইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা আসন্ন হইল; দ্বিপ্রহর রাত্রিতে ব্রাহ্মণগণ যাম ঘোষণা করিলেন (৫৪নং শ্লোক)। পরদিন প্রভাত-কালে শ্রীকৃষ্ণ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবগণের দাবী পেশ করিলেন এবং স্থিরপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেন (৬৭-৭৩নং শ্লোক)। দুষ্টমতি কৌরবেরা ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষতিসাধন করিবার প্রচেষ্টা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ ইহা জ্ঞাত হইয়া বিষ্ণুমূর্তি পরিগ্রহণ করিলেন; তাঁহার চারি হস্ত, তিনটি মস্তক এবং তিনটি নয়ন বিভীষিকা ছড়াইল।

প্রকৃতিও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল (৭৭-৮০নং শ্লোক)। কৌরবগণ তখন অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। যখন দ্রোণ, ভীষ্ম এবং নারদ শ্রীকৃষ্ণকে ভীম এবং দ্রৌপদীর প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রুদ্রমূর্তি সম্বরণ করিয়া পুর্বরূপ পরিগ্রহণ করিলেন। সভাভঙ্গ হইলে, শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কুরু-রাজধানী হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। রথ এত দ্রুতবেগে চলিল যে "সময় পরিমাপ করা গেল না"; শ্রীকৃষ্ণ অল্প সময়ের মধ্যেই বিরাটনগরে উপনীত হইয়া কৌরবগণের মনোভাব সমবেত পাণ্ডবগণের নিকট বিবৃত করিলেন। অতঃপর যুদ্ধের বৈঠক বসিল এবং পরদিন প্রভাতে পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া বিরাটনগর হইতে বহির্গত হইলেন। কবি অতঃপর দুই বিরুদ্ধ সৈন্যবাহিনীর বর্ণনা করিয়াছেন। কবি উড্ডীয়মান পতাকাগুলিকে "বারি বর্ষনে উন্মুখ কৃষ্ণ মেঘ"-এর মত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে-সমস্ত বীরপুরুষ এই যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন তাহাদের বর্ণনায় কয়েকটি শ্লোক রচিত হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ যে আলাপন করিয়াছেন তাহার মূল সুর ভগবদ্গীতার প্রথমদিকে ধ্বনিত হইয়াছে। ভাবগুলি একই, বর্ণনাগুলির মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য নাই[১০]। অতঃপর গ্রন্থকার যুদ্ধের উত্থান-পতনের ভিতর দিয়া উৎসুক পাঠকগণকে লইয়া চলিলেন। মহাবীর ভীষ্মের পতন ১৬২-১৬৪নং শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। কবি বর্ণনা করিয়াছেন কিরূপে ভীষ্মের শোণিতধারা উর্ধপানে উঠিয়া পুষ্পরাশিতে রূপান্তরিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। অতঃপর ভগদত্ত, অভিমন্যু, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, কর্ণ, ঘটোৎকচ প্রভৃতির যুদ্ধ এবং মৃত্যু বর্ণনা করা হইয়াছে। শল্যের মৃত্যু এবং যুদ্ধের অবসান কাহিনী গভীর বিষাদের সুরে রচিত হইয়াছে। সত্যবতীর শোকোচ্ছ্বাসও সুনিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন কিরূপে বিদ্যুৎচমকের ভিতর দিয়া সত্যবতী স্বামী সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং "বিরাট উদভ্রান্তির" মধ্য দিয়া সেই "মৃত্যুনীল শবদেহ ধারণ করিলেন।" আত্মহত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সত্যবতী স্বামীর 'প্রিয় দেহের' দিকে শেষবার পরিপুর্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন এবং স্বামীর পুনর্জীবন কামনা করিয়া তাহার ক্ষতস্থলে "নিরাময় করিবার প্রলেপ" লাগাইয়া দিলেন। সত্যবতী অতীব যত্নসহকারে তাঁহার কারুকার্য-বিশিষ্ট পরিচ্ছদের প্রান্তভাগ দিয়া স্বামীর বক্ষস্থলনিঃসৃত রক্তধারা মুছাইয়া দিলেন এবং সিরি-রস দিয়া তাঁহার "মৃত্যুনীল"-ওষ্ঠাধর রাঙাইয়া দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কেন শল্যের ওষ্ঠ এখন অর্থহীন নীরবতায় স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে, কেন তাহার মুখ দিয়া এখন একটিও সান্ত্বনার বাণী নিঃসৃত হইতেছে না। সত্যবতী পৃথিবীর আত্মীয়স্বজন এবং সহচরীর নিকট হইতে শেষবিদায় গ্রহণ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন স্বামীর সহিত স্বর্গে মিলিত হইবার জন্য। তাঁহার একমাত্র আশঙ্কা ছিল যে স্বর্গের বিদ্যাধরীগণ হয়তো তাঁহার প্রিয় স্বামীর প্রেম পূর্বেই দখল করিয়া বসিবে; সুতরাং তিনি আত্মহত্যা করিবার পুর্বে এই প্রার্থনাই জানাইলেন যে: "যদিও বিদদরিগণ (বিদ্যাধরীগণ) তোমার আদেশ পালন করিবে, তবুও তুমি আমাকে সবার উপরে আসন দিয়ো[১১]।" এই উচ্ছ্বাস নারীত্বের মধুর স্বাক্ষর বহন করিতেছে। সত্যবতীর সহচরীও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাঁহার অনুবর্তী হইলেন।

অতঃপর ভীম এবং দুর্যোধনের যুদ্ধের দৃশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময় অর্জুন দুর্যোধনের বাম উরুভঙ্গ করার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে ভীম তাহাই করিলেন। এইরূপে দুর্যোধনের মৃত্যু হইল। ইহার প্রতিশোধ হিসাবে অশ্বত্থামা দ্বিপ্রহর রজনীতে রক্তবন্যা বহাইয়া দিলেন। কবি এই বলিয়া তাঁহার কাব্য সমাপ্ত করিলেন যে ভটার জয়ভয় হস্তিনার অধিপতি ধর্মবংশ বা যুধিষ্ঠির ব্যতীত আর কেহই নহেন।

ইহা অসম্ভব নয় যে ভারতযুদ্ধে যে বিষয়বস্তুটির বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাই আদিম সংস্কৃত মহাভারতেরও বিষয়বস্তু ছিল। ভারতযুদ্ধের স্থলে স্থলে যে স্বদেশী রঙের স্পর্শ লাগিয়াছে, তাহা অবশ্য যবদ্বীপের নিজস্ব রূপায়ন ; ইহা বাদ দিলে অবশিষ্ট যে অংশ বর্তমান থাকে তাহাই মহাভারতের মৌলিক কাহিনী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ইহার সঙ্গে একটি মুখবন্ধ বা আদিপর্ব (বর্তমান আদিপর্ব নহে) এবং স্বর্গারোহণ পর্ব থাকিলেই সমগ্র মহাভারতটি একটি যুক্তিসঙ্গত শোভন আকার পরিগ্রহণ করিতে পারিত। বহু শতাব্দীর বহু আবর্জনা—যাহার সহিত সংস্কৃত মহাভারতের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই—এই বিপুলায়তন ভারতীয় মহাকাব্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সাংস্কৃতিক দিক দিয়া এই অঙ্গগৌরব আমাদের মানসিক শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে কিনা সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

প্রথম যস দি পুর এবং দ্বিতীয় যস দি পুর এই ভারতযুদ্ধ কাকাবিনকে তেম্বঙ্ মচপৎ ছন্দে আধুনিক যবদ্বীপীয় ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। প্রথমজন ছিলেন তৃতীয় পকু বুভনের (১৭৪৯-৮৮ খৃঃ অঃ) সভাপণ্ডিত[১২]। তবে ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে আধুনিক যবদ্বীপীয় সংস্করণটি প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় রচিত ভারতযুদ্ধ কাকাবিন হইতে কতকটা বিভিন্ন।

(৩) মহাভারতের শেষের পর্ব

মহাভারতের শেষের পর্বগুলির মধ্যে গদা, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি এবং অশ্বমেধিকপর্ব পাওয়া যায় নাই। যে-কয়টি পর্ব পাওয়া গিয়াছে তাহাদের নাম হইল আশ্রম, মৌসল, প্রস্থানিক এবং স্বর্গারোহণ পর্ব। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটি পর্ব ডঃ যুইনবল[১৩] কর্তৃক সম্পাদিত এবং অনুদিত হইয়াছে। আমরা প্রথমে আশ্রমবসনপর্ব[১৪] আলোচনা করিব ; সংস্কৃত মহাভারতের পঞ্চদশপর্বটি যবদ্বীপে এই নামেই পরিচিত। ইহাতে অন্ততঃ ৫৩টি সংস্কৃত শ্লোক আছে এবং যদি অর্ধ শ্লোকগুলিও হিসাবের মধ্যে লওয়া যায় তাহা হইলে সংস্কৃত শ্লোকের সংখ্যা অনেক বেশী হইবে। এই পর্বের প্রথমেই দেখিতেছি যে রাজা জনমেজয় বৈশম্পায়নের নিকট জানিতে চাহিলেন যে, পুত্র, কৌরবগণ এবং অন্যান্য সকলে কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে যুধিষ্ঠির কি করিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের যুদ্ধোত্তরকালের কার্যাবলী জানিতে চাহিলেন। ভগবান বৈশম্পায়ন বলিলেন যে ধৃতরাষ্ট্র ভারতযুদ্ধের পরিণাম দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কালক্রমে পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের বিদ্বেষের বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইতে চাহিলেন। পাণ্ডবগণও বৃদ্ধকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দিলেন। একমাত্র ভীম শত্রুগণের

পিতাকে সৌজন্য প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন। রাণী গান্ধারীও কালক্রমে অতীতের তিক্ততা ভুলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পৃথিবীর প্রতি আর কোন আকর্ষণ না থাকায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই উদ্দেশ্যে অরণ্যে গমন করিতে প্রস্তুত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র একটি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিতে মনস্থ করিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট দান করিবার জন্য স্বর্ণ, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি চাহিলেন। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান শেষ হইলে গান্ধারী, কুন্তী এবং সঞ্জয় প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রকে অনুসরণ করিলেন। কুন্তীকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে উদ্যত দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন যুধিষ্ঠির কুন্তীকে বলিলেন, "মাতা, আমাকে ক্ষমা করিও : বধূজনব্রতা নারী ন দূরম্ গন্তুম্ অর্হতি।" কুন্তীও উত্তর দিলেন: "শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ পাদান্ শুশ্রূষন্তী বনেঽস্বহম্।" কুন্তী আর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় পাণ্ডবগণ এবং অন্যান্য অনুগামীগণ ক্রন্দন করিতে করিতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র অনেক দেশ অতিক্রম করিয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রের নিকটস্থ হইলেন এবং সেখানে বিখ্যাত ঋষি শতযূপের সহিত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিন তিনি আরো দূরে অগ্রসর হইলেন এবং ভগবান ব্যাস কর্তৃক দীক্ষিত হইলেন। বিদুর, সঞ্জয়, গান্ধারী এবং কুন্তী কঠিন তপশ্চর্যায় ব্রতী হইলেন। ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির তাঁহাদের জন্য খুব উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন ; তিনি অন্যান্য ভ্রাতা ও রাজপরিবারের অন্যান্য লোকজন লইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। লেখক অতঃপর ঋষিগণের কঠোর তপস্যার কথা বর্ণনা করিয়াছেন ; তাঁহারা খাদ্য, পানীয়, নিদ্রা, এমন কি পিপাসার বারি পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছেন। যুধিষ্ঠির বিদুরের সন্ধানে বহির্গত হইলেন, কিন্তু বিদুর যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিবার একটু পরেই দেহত্যাগ করিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে দাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই একটি দৈববাণী উচ্চারিত হইল : "ভো ভো রাজন্! ন দগ্ধব্যম্ বিদুরস্য শরীরকম্[১৫]।" মহাযুদ্ধের পর ষোড়শ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে ; তখন ভগবান ব্যাস বনবাসী রাজপরিবারকে সান্ত্বনা দিতে আসিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে গঙ্গাতীরে যাইতে বলিলেন। ধৃতরাষ্ট্র অতঃপর পাণ্ডবগণ, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং একশত কৌরবের বিধবা স্ত্রীগণকে লইয়া সেই পবিত্র নদীতীরে উপনীত হইলেন। সেইস্থলে তিনি তপস্বী এবং দীনদরিদ্রগণকে দানধ্যান করিলেন এবং গঙ্গার পবিত্রজলে অবগাহন করিলেন। গান্ধারী এবং ধৃতরাষ্ট্র অতঃপর দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া ভারত-যুদ্ধের বীরগণকে অবলোকন করিলেন। ব্যাস তখন তাঁহাদের পূর্বজন্মের কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিলেন। অতঃপর পাণ্ডবগণ সহযাত্রিণী মহিলাগণ সহ রাজপুরীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। দুই বৎসর পরে, দেবদূত নারদ পাণ্ডবগণের রাজধানীতে আগমন করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তী কিরূপে দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইলেন তাহা বর্ণনা করিলেন। নারদ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত গান্ধারীর সহ-দাহন প্রশংসা করিলেন এবং রাজপরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান-পূর্বক তিনি চলিয়া গেলেন। গ্রন্থের শেষে লেখক বলিয়াছেন যে কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের পর হইতে তখন ৩৬ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে।

অতঃপর মৌসলপর্ব আরম্ভ হইল[১৬]। রাজা জনমেজয় বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন

যে ব্রাহ্মণগণ কেন বৃষ্ণি এবং অন্ধকগণকে অভিশম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন এবং কিরূপে তাহারা সকলে ধ্বংসমুখে পতিত হইলেন। এই বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়াই প্রাচীন যবদ্বীপীয় মৌসলপর্বটি রচিত হইয়াছে। বৈশম্পায়ন বলিলেন যে ভগবান বিশ্বামিত্র, কণ্ব এবং নারদ একদা দ্বারাবতী গেলে যাদবগণ তাঁহাদিগকে উপহাস করেন এবং এই ব্যাপারে সারণ ও সাম্ব অগ্রণী হইয়াছিলেন। এমন কি, সাম্ব মহিলার ছদ্মবেশে আগত ঋষিগণের সমীপে পুত্রবর প্রার্থনা করিলেন। অন্তর্যামি ঋষিগণ ধ্যানযোগে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া অভিশাপ দিলেন যে কৃষ্ণপুত্র সাম্ব একটি মুষল প্রসব করিবে এবং ইহাই যাদবগণের ধ্বংসের কারণ হইবে। কেবলমাত্র কৃষ্ণ এবং বলদেব এই অন্তর্ঘাতী যুদ্ধ হইতে রক্ষা পাইবেন, তবে কৃষ্ণ জরাদ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিহত হইবেন এবং বলরাম সমুদ্রে অন্তর্হিত হইবেন। কালক্রমে সাম্ব অগ্নির মত দীপ্তকান্তি একটি মুষল প্রসব করিলেন। ইহা রাজা উগ্রসেনকে প্রদান করিলে তিনি উহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। এই মুষল তখন নলখাগড় এবং ঘাসে পরিণত হইয়া সমুদ্রতীর পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। উগ্রসেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণি এবং অন্ধকগণকে ধর্মের পথে স্থির থাকিতে নির্দেশ দিলেও তাহারা এই উপদেশ গ্রহণ করিল না। অতঃপর কলি মানবের ছদ্মবেশে যাদবগণের সমীপে উপনীত হইলেন এবং বৃষ্ণিগণ ও অন্ধকগণ কিরূপে অধঃপতনের পথে চলিয়াছে তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিলেন। গ্রন্থকার অতঃপর আসন্ন বিপর্যয়ের ইঙ্গিত নানারূপে দেখিতে পাইলেন। কুরু-যুদ্ধের সময় গান্ধারী যে কৃষ্ণকে অভিশম্পাত করিয়াছিলেন ইহা সেই সময় হইতে ৩৬ বৎসর পরের কথা। তখন গ্রহণ হইল এবং যাদবকুলের স্ত্রীগণ ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়া শঙ্কাতুর হইয়া উঠিলেন। ইহার পরই পানোৎসবের উন্মত্ততায় যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল তাহাতে যাদবকুল ধ্বংস হইল। দ্বন্দ্বের মুহূর্তে তাঁহারা সমুদ্রতীরস্থ নলখাগড় এবং ঘাস উৎপাটন করিলেন এবং উহা মুষলে রূপান্তরিত হইতে লাগিল। উহা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়া পিতা পুত্রগণকে হত্যা করিতে লাগিলেন, পুত্রগণ তাহাদের পিতৃ ও জ্ঞাতিকুলকে নির্বংশ করিতে লাগিলেন, শত্রু-মিত্রের কোন ভেদাভেদ রহিল না। শ্রীকৃষ্ণ হতবাক্ হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সাম্ব, পপ্যুম্ন (=প্রদ্যুম্ন), চারুদেষ্ণা এবং অনিরুদ্ধের মৃতদেহ ভূপতিত রহিয়াছে। তিনি বলদেব, বভ্রু এবং দারুকিকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলেন এবং অর্জুনকে আনয়ন করিবার জন্য দারুকিকে প্রেরণ করিলেন। দারুকির প্রস্থানের পর বভ্রু স্ত্রীলোকদিগকে স্থানান্তরিত করিবার সময় একজন শিকারী কর্তৃক নিহত হইলেন। কৃষ্ণ তখন বসুদেবের নিকট গমন করিয়া যাদবগণের ধ্বংসের কাহিনী বিবৃত করিলেন। অতঃপর তিনি প্রভাসতীর্থে গমন করিলেন। সেইস্থান হইতে তিনি বনে গমন করিলে, সেই বনভূমে সমাধিমগ্ন অবস্থায় তিনি ব্যাধ জরা কর্তৃক আকস্মিকভাবে নিহত হইলেন। কৃষ্ণ তখন বিষ্ণুর দিব্যদেহ ধারণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। সেখানে তিনি মহাদেবপ্রমুখ সকল দেবতাদের দ্বারা বন্দিত হইলেন।

ইত্যবসরে অর্জুন ব্যস্ত হইয়া শীঘ্র দ্বারাবতী আগমন করিলেন এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইলেন। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন; ক্রমে

ক্রমে তাঁহার জ্ঞানসঞ্চার হইল। বসুদেব পরদিবস প্রভাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। চতুর্দিকে অবিশ্রান্ত বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল। অর্জুন তখন ভারাক্রান্তহৃদয়ে বসুদেব এবং অন্যান্য যাদবগণের শবদেহ দাহন করিলেন। ইহার পরই ভীষণ জলপ্লাবনে দ্বারাবতী নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। অর্জুন এই বিধ্বংসী প্লাবনের মুখে শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণসহ পঞ্জাবের দিকে পলায়ন করিলেন, কিন্তু যাত্রাপথেও বিপদের অন্ত ছিল না। একদল দস্যু তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল এবং মহিলাগণকে অসম্মান করিয়া তাঁহাদের সমস্ত অলঙ্কার অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। দস্যুদল চলিয়া গেলে তিনি ইন্দ্রপ্রস্ত অসিলেন। গ্রন্থকার অতঃপর বলিয়াছেন যে পাণ্ডবগণ বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা করিলেন এবং তাঁহাকে চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম রক্ষা করিবার দায়িত্ব ভার অর্পণ করিলেন। কৃষ্ণের মহিষীগণের মধ্যে রুক্মিনী, জাম্ববতী এবং সত্যভামা অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন; আর সকলে আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। অর্জুন ব্যাসদেবের কুটীরে যাইয়া পাণ্ডবগণ কেন এইরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাসদেব পুরাতন কাহিনী পুনরায় বর্ণনা করিলেন এবং অর্জুনকে বনে তপস্যা করিবার উপদেশ দিলেন। যুধিষ্ঠির দ্বারাবতীর ঘটনাবলী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং অন্যান্য ভ্রাতাগণের সঙ্গে ক্রন্দন করিতে লাগিলে। মুসলপর্বের সমাপ্তিবাক্য হইল "ইথি মোকসলপর্ব যথাপুরাণ।"

ডঃ যুইনবল বলিয়াছেন[১৭] যে মৌসলপর্বে বলদেবের মৃত্যুকাহিনী অনেকটা পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। সংস্কৃত সংস্করণে এই কাহিনীটি শ্রীকৃষ্ণ বনে যাওয়ার পর বর্ণিত হইয়াছে। আরো অধিকতর আশ্চর্যজনক হইল চারিজন পাণ্ডবের নরকে আগমন; এই কাহিনীটি প্রাচীন যবদ্বীপীয় প্রস্থানিকপর্বে বর্ণিত হইয়া থাকিলেও ইহা সংস্কৃত মহাকাব্যে নাই। প্রস্থানিকপর্বের পর স্বর্গারোহনপর্ব লিখিত হইয়াছে[১৮]; শেষোক্ত গ্রন্থটির প্রারম্ভিক স্বস্তিবাচন হইল "ওম্ অবিঘ্নম্ অস্তু।" এই পর্বটি অন্যান্য কোন কোন পর্ব হইতে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন, কিন্তু ইহাতে সংস্কৃত শ্লোক নিতান্ত কম। স্বর্গারোহনপর্বে বলা হইয়াছে যে যুধিষ্ঠির স্বর্গে আসিলেন এবং সে-স্থানে দুর্যোধন এবং অন্যান্য কৌরবগণকে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন; তাঁহারা দেবতাদের সঙ্গে উপবেশন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির চারিজন পাণ্ডবের অনুসন্ধান করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে কর্ণ কৌরবগণের মধ্যে নাই কেন। নারদ বলিলেন যে মর্ত্যে একদা কি ঘটিয়াছিল তাহা এখানে আসিয়া ভুলিতে হইবে। ইহার প্রথম অধ্যায়ের শেষে লেখা আছে "ইতি যুধি(ষ্ঠি)র নারদ সম্বু(=সম্ভা)ষণ কথাপর্বনি প্রথমোঽধ্যা(য়)।" সংস্কৃত মহাকাব্যটিতে এই অধ্যায়ের বিশেষ কোন নাম নাই। ডঃ যুইনবল বলিয়াছেন[১৯] যে যবদ্বীপের অন্যান্য পর্বগুলিতে এই পর্বের মত অধ্যায়বিন্যাস নাই। তিনি আরো বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থে জনমেজয় এবং বৈশম্পায়নের কথোপকথন সংস্কৃত সংস্করণটি হইতেও বেশী।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার ভ্রাতা এবং বন্ধুগণ কোথায়। তাঁহারা নরকে আছেন শুনিয়া তিনি অতীব আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তিনি বলিলেন যে কৌরবগণের সহিত স্বর্গে বাস করা অপেক্ষা তিনি নরকে পাণ্ডবগণের সহিত বাস করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন। নরকে যাওয়ার পথ বিপদসঙ্কুল বলিয়া দেবগণ কৃপাপরবশ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে একজন পথপ্রদর্শক দিলেন। তিনি

যাইতে যাইতে নানাপ্রকার কীট এবং অদ্ভুত প্রাণিগণকে ইতস্ততঃ সঙ্কুচিত হইয়া বিচরণ করিতে দেখিলেন; কাহারো কাহারো খণ্ডিত হস্তপদ হইতে বীভৎস গন্ধ উত্থিত হইতেছিল। যুধিষ্ঠিরকে গভীর এবং উত্তপ্ত জলের একটি স্রোতস্বিনী অতিক্রম করিতে হইবে এবং ইহার পর নরকে প্রবেশ করা সম্ভবপর হইতে পারে। গ্রন্থকার নরকের একটি জাজ্জ্বল্যমান বর্ণনা দিয়াছেন। যুধিষ্ঠির এই বীভৎস দৃশ্য হইতে বিদায় নিতে চাহিলেন, তখন একটি দৈববাণী শ্রুত হইল: "অনুগ্রহেঙ্গ ধর্মপুত্র তিষ্ঠ তাবকমতকম্" অর্থাৎ "অনুগ্রহাৎ ধর্মপুত্র তিষ্ঠ তাবন্মুহূর্তকম্।" এই পর্বের ইহাই একমাত্র সংস্কৃত শ্লোক এবং তাহাও বিকৃত।

যুধিষ্ঠির এই কণ্ঠস্বর শুনিতে পান নাই, কিন্তু তিনি আশ্চর্য হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে পাণ্ডবগণ এবং তাহাদের বন্ধুগণ যুধিষ্ঠিরকে থাকিয়া যাইতে আহ্বান জানাইয়াছেন। অতঃপর তিনি দেবদূতকে (পুঁথিতে আছে দেবস্থত) স্বর্গে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। এইখানে দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ হইল। অতঃপর জনমেজয় এবং বৈশম্পায়ন কথোপকথন করিলেন; এই আলাপনের সময় বৈশম্পায়ন মহাভারত পাঠের অদ্ভুত মাহাত্ম্যের কথা বর্ণনা করিলেন। এই মাহাত্ম্য বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে এই মহাকাব্যটি বেদের সমপাংক্তেয় ছিল এবং ইহা ব্রাহ্মণ, শৈব[২০] এবং সৌগতদের পঠনীয় ছিল। ডঃ য়ুইনবল বলিয়াছেন যে এই শেষোক্ত বিধানটি সংস্কৃত সংস্করণে বর্ণিত হয় নাই। অতঃপর মহাভারতের বিভিন্ন পর্বের একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে; ইহা প্রাচীন যবদ্বীপীয় আদিপর্বের তালিকা হইতে পৃথক। এই তালিকাটিতে অনুশাসনপর্বের নাম আছে। বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে অন্যান্য শিক্ষনীয় বিষয়ের সহিত মনুসংহিতার বিধিগুলির শিক্ষা দিলেন।

বৈশম্পায়ন অতঃপর বলিলেন যে যুধিষ্ঠির গঙ্গানদীতে স্নান করিয়া নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি অতঃপর পাণ্ডবগণকে স্বর্গে পরিদর্শন করিলেন। এইস্থলে গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল; ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে "যুধিষ্ঠিরধর্মসম্ভাসঙ্গ(°ষণ)কথা। সংস্কৃত সংস্করণে ইহার নাম হইল যুধিষ্ঠির-তনুত্যাগ। ধর্ম অতঃপর তাঁহাকে কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীষ্ম এবং দ্রৌপদীর নিকট লইয়া গেলেন। তিনি ইন্দ্রের নিকট হইতে শুনিলেন যে বৃষ্ণি এবং অন্ধকগণও স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এইস্থলে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

জনমেজয় অতঃপর কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধে নিহত বিশিষ্ট বীরগণ সম্বন্ধে আরো সংবাদ জানিতে চাহিলেন। বৈশম্পায়ন তখন বলিলেন যে এই সকল বৃত্তান্ত মহামুনি ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেবের অধিকতর জানা আছে। শুকদেব তদনুযায়ী ভারতযুদ্ধের বীরগণের কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে এইসমস্ত বীর পূর্বে যেমন ছিলেন সেইরূপ দেবতা ও দানবে পরিণত হইয়াছেন। এইরূপে ভীম অষ্টবসু হইয়াছেন, পাণ্ডু হইয়াছেন ইন্দ্র, দ্রুপদ বরুণ হইয়াছেন, বসুদেব হইয়াছেন কাশ্যপ এবং অভিমন্যু সঙ্ হ্যয়ং বুলন হইয়াছেন। দুর্যোধনের সহচরগণও রাক্ষস হইয়াছেন। ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণ স্বর্গে আগমন করিলেন। যবদ্বীপের ওয়েয়াঙ-নাটিকার আধুনিক জনপ্রিয় নায়ক ঘটোৎকচও যক্ষরূপে পরিণত হইলেন।

কাহিনীটি আবার যুধিষ্ঠিরকে লইয়া আরম্ভ হইল। ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন যে চারি

পাণ্ডব আরো কিছুকাল নরকে বাস করিবেন; কারণ তাঁহারা ভারতযুদ্ধে দ্রোণের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন। ডঃ যুইনবল[২১] বলিয়াছেন যে গ্রন্থের এই অংশটুকু সংস্কৃত সংস্করণ অপেক্ষা অধিকতর তথ্যবহুল। ভীষ্ম এবং শল্যকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক যেরূপে হত্যা করা হইয়াছিল তাহা বিস্তৃততররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইন্দ্র অতঃপর যুধিষ্ঠিরকে গঙ্গায় পুনরায় স্নান করিতে বলিলেন; তিনি বলিলেন যে ইহাতে তাঁহার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষালন হইয়া যাইবে। এই পর্বের শেষাংশে ভারতযুদ্ধের আরো কয়েকটি কাহিনী বর্ণনা করিয়া গ্রন্থটির উপর যবনিকা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। জনমেজয় সুদীর্ঘ কাহিনী বিবৃত করার জন্য বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

যবদ্বীপীয় মহাভারতের শেষ চারিটি পর্বের রচনাকাল সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। এই সম্বন্ধে বহিরাগত কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নাই; ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণকেও চরম সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। তবে কোরবাশ্রম, কুঞ্জরকর্ণ এবং আশ্রমবসনপর্ব পশ্চিম যবদ্বীপে চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিবার কিছু কিছু কারণ রহিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আশ্চযবোধক চিহ্নগুলি সমসাময়িক সুন্দ-সাহিত্যের বিশেষত্ব; এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে আশ্রমবসনপর্বে 'জগ্ ঘ্রিস উপপের'-এর উল্লেখ অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হয়[২২]। মহাভারতের এই চারিটি পর্বকে চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া গ্রহণ করিলে সম্ভবতঃ খুব অন্যায় হইবে না।

ভারতবর্ষে হরিবংশকে মহাভারতের পরিশিষ্ট বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে; সুতরাং এই গ্রন্থখানির আলোচনা এই প্রসঙ্গেই হওয়া সঙ্গত। এই কাকাবিনের কাহিনীটি নিম্নে বর্ণিত হইতেছে[২৩]।

এই কাব্যে বলা হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর প্রতি প্রণয়াসক্ত ছিলেন। ইহাতে কৃষ্ণ এবং জরাসন্ধের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। জরাসন্ধ এই ব্যাপারে শিশুপালের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। কাব্যের কাহিনীটিকে কোথাও কোথাও মৌলিক রূপ দেওয়া হইয়াছে, যেমন পাণ্ডবগণ কর্তৃক জরাসন্ধকে সাহায্য করিবার কথা। এই ব্যাপারে পাণ্ডবগণকে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধপক্ষ হিসাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই যুদ্ধে তিনজন পাণ্ডব নিহত হইলে অর্জুন যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করিতে অগ্রসর হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দেবরূপ পরিগ্রহণ করিলেন।

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে এই গ্রন্থের লেখক ম্পু পনুলুহ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও তিনি হিন্দুশাস্ত্রের কাহিনী অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থটি মহারাজ জয়ভয়ের জারত্বকালে রচিত হইয়াছিল, কারণ দ্বিতীয় শ্লোকের শেষ পাদেই বলা হইয়াছে :

"শ্রী ধর্মেশ্বর দিগজয়াঞ্জয়যযাপঞ্জাতি বিষ্ণ্বাত্মক।" উপরোক্ত শ্লোকের জয়জয় শব্দটিকে ডঃ ভান দের তুক[২৪] ইতিপূর্বেই জয়ভয় শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে কবি ভারতযুদ্ধ কাব্যটির রচনার সহিতও সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

সংস্কৃত হরিবংশের কাহিনী বৃহত্তর ভারতের কবি এবং শিল্পীদিগকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। আঙ্কোরভাটের মন্দিরগাত্রে আমরা একটি দৃশ্যে দেখিতে পাইতেছি

যে প্রদ্যুম্ন মহারাজ বাণের অন্তঃপুরে রাজকন্যার সাহচর্য উপভোগ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের শোনিতপুর যাত্রা এবং নগরের অগ্নিপ্রাচীর সম্মুখে গরুড়ের আগমন অদ্ভুত দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে[২৫]। একটি কাহিনীতে বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় দুইটি অর্জুনবৃক্ষের ভিতর দিয়া রজ্জু টানিয়া লইবার সময় দুইটি বৃক্ষকেই সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিলেন। এই দৃশ্যটি আঙ্কোরভাট[২৬] এবং প্রাম্বানানের বিষ্ণুমন্দির[২৭] উভয়স্থলেই অঙ্কিত হইয়াছে। এই প্রকারের আরো অনেক কাহিনী বৃহত্তর ভারতের মন্দিরাদিতে অঙ্কিত হইয়া এই গ্রন্থখানির বিপুল জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

পা দ টী কা

১. *TBG*, 44, pp. 289 ff.

২. Wulff, *Den Oldjavanska Wirātaparwa og dens Sanskrit-original*, 1916, pp. 21 ff.

৩. এই সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য গণ্ডা, *Sanskrit in Indonesia*, pp. 113 ff.

৪. *Ibid*, p. 114.

৫. *Ibid*, p. 114.

৬. *Sanskrit Texts from Bali*, p. XXXIII.

৭. তুলনীয় নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ৭৪৫।

৮. *Ibid*, p. 8.

৮ক. ইহার জন্য দ্রষ্টব্য *JMBRAS*, 38 (1965) pp. 125 ff.

৯. লেইডেন-বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাকার্তা-মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে এই গ্রন্থের অনেক পুঁথি রক্ষিত আছে, যেমন ৪৬৮২, ৪৬৮১, ৪৬৮৩, ৫০২৭, ৫১০৩, ৮৫৫, ৯৫৯-খ, ৯৮৬, ৩১১১ প্রভৃতি। যুইনবোল, বিরাটপর্বের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১০. Juynboll, *Wirātaparwa*, p. 7; পাঠান্তরের জন্য দ্রষ্টব্য Levi, *Sanskrit Texts from Bali*, p. 111.

১১. Juynboll, *Supplement* II, p. 151; *Wirātaparwa*, p. 8.

১২. *Bhīsmaparva*, ed. J. Gonda, Bib. Jav., no. 7, p. 8.

১৩. *Sanskrit in Indonesia*, p. 28.

১৪. *TBG*, 1935, p. 48 ff.

১৫. অনুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য Gonda in *TBG*, 75 (1935) p. 52 ff.

১৬. *Ibid*, p. 47.

১৭. *Ibid*, p. 48.

১৮. প্রাচীন যবদ্বীপীয় মূলের জন্য দ্রষ্টব্য: Gonda, Bibl. Jav. no. 7, pp. 38-65.

১৯. গীতা ১।২৮; মহাভারত ৬।৮৫৯।

২০. গীতা ১।৩১; মহাভারত ৬।৮৬২।

২১. গীতা ২।৩; মহাভারত ৬।৮৮১।

২২. গীতা ২।১১ ; মহাভারত ৬।৮৮৯ ।

২৩. গীতা ২।১৩ ; মহাভারত ৬।৯৯১ ।

২৪. গীতা ২।১৬ ; মহাভারত ৬।৯৯৪ ।

২৫. তুলনীয় গীতা ২।১৮ ; মহাভারত ৬।৯৯৬ ।

২৬. গীতা ২।২৩ ; মহাভারত ৬।৯০১ ।

২৭. গীতা ২।৩১ ; মহাভারত ৬।৯০৯ ।

২৮. গীতা ২।৩৩-৩৪ ।

২৯. গীতা ২।৩৮ ।

৩০. গীতা ২।৪৭ ; মহাভারত ৬।৯২৫ ।

৩১. গীতা ২।৪৮ ; মহাভারত ৬।৯২৬ ।

৩২. গীতা ২।৫৩ ; মহাভারত ৬।৯৩১ ।

৩৩. গীতা ২।৫২ ।

৩৪. ঐ ২।৫৫ ; মহাভারত ৬।৯৩৩ ।

৩৫. গীতা ২।৫৯ ।

৩৬. এই অংশটুকু সংস্কৃত গীতায় নাই ।

৩৭. গীতা ২।৬২-৬৩ ।

৩৮. গীতা ২।৬৯ ; মহাভারত ৬।৯৪৭ ।

৩৯. দ্রষ্টব্য *TBG* 75 (1935) p. 62 f.n. 6.

৪০. প্রচলিত সংস্কৃত সংস্করণে সাধারণতঃ এই পাদে আমরা পাই :

"ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ।"

৪১. গীতা ৪।৭-৮ , তুলনীয় মহাভারত ৬।১০০০-১ ।

৪২. গীতা ৪।৯ ; মহাভারত ৬।১০০২ ।

৪৩. তুলনীয় গীতা, ৪।১৩-১৪ ; মহাভারত ৬।১০০৭ "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ" এবং "ন কর্মানি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা ।"

৪৪. গীতা ৪।১৮ ; মহাভারত ৬।১০১১ ।

৪৫. গীতা ৪।২২ ; মহাভারত ৬।১০১৫ ।

৪৬. গীতা ৫।২ ; মহাভারত ৬।১০৩৭ ।

৪৭. গীতা ৫।৬খ ।

৪৮. গীতা ৫।১০ ; তুলনীয় মহাভারত ৬।১০৪৫ ।

৪৯. গীতা ৫।৫ ।

৫০. গীতা ৬।১০ ; মহাভারত ৬।১০৭৪ ।

৫১. গীতা ৬।১৩ ; তুলনীয় মহাভারত ৬।১০৭৭ ।

৫২. গীতা ৬।১৯ক ।

৫৩. গীতা ৬।৩২ ; তুলনীয় মহাভারত ৬।১০৯৬ ।

৫৪. গীতা ৬।৩০ ; মহাভারত ৬।১০৯৪ ।

৫৫. গীতা ৬।৬খ ও ৭ক ; তুলনীয় মহাভারত ৬।১১১৭-১৮ ।

৫৬. সংস্কৃত গীতায় এখানে আছে : প্রভাস্মি ।

৫৭. সংস্কৃত গীতায় এখানে : জনাঃ।

৫৮. গীতা ৭।১৬ ; তুলনীয় মহাভারত ৬।১১২৭।

৫৯. গীতা ৭।২৯ ; মহাভারত ৬।১১৪০।

৬০. গীতা ৮।৫ ; তুলনীয় ৮।১৩খ ও মহাভারত ৬।১১৪৬, ১১৫৪।

৬১. গীতা ৯।১৬।

৬২. গীতা ৯।১৭খ, ১৯খ।

৬৩. গীতা ৯।২৭ ; মহাভারত ৬।১১৯৭।

৬৪. যবদ্বীপীয় ব্যাখ্যায় : ইন্দ্র।

৬৫. যবদ্বীপীয় ব্যাখ্যায় : বৈশ্রবণ।

৬৬. যবদ্বীপীয় ব্যাখ্যায় : মহামেরু।

৬৭. গণ্ডা অশ্বত্থকে fig tree দিয়া অনুবাদ করিয়াছেন এবং যবদ্বীপীয় প্রতিশব্দটিকে tree of wisd .. দিয়া অনুবাদ করিয়াছেন।

৬৮. যবদ্বীপীয় ব্যাখ্যায় 'গরুড়'।

৬৯. সংস্কৃতে আছে : কবীনামুশনাঃ কবি। গণ্ডা অনুবাদ করিয়াছেন : among the sages, the sage U'anah.

৭০. প্রচলিত সংস্কৃত সংস্করণে যবশ্বের কথা নাই। এইটুকু ব্যতীত পূর্বোল্লিখিত অংশ সংস্কৃত গীতার ১০।২১ক ও মহাভারত ৬।১২২৫ হইতে গীতার ১০।৩৭ ও মহাভারত ৬।১২৪১ মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

৭১. গীতা ১১।৫ ; মহাভারত ৬।১২৫১।

৭২. তুলনীয় গীতা ১১।৬।

৭৩. গীতা ১১।১০ ; মহাভারত ৬।১২৫৬।

৭৪. গীতা ১১।২৬-২৭।

৭৫. প্রচলিত সংস্কৃত গীতার এই পাদ একটু স্বতন্ত্র।

৭৬. গীতা ১১।৩৯খ ও ৪০ক। তুলনীয় মহাভারত ৬।১২৮৫খ ও ১২৮৬ক।

৭৭. গীতা ১১।৫০।

৭৮. গীতা ১১।৫৩ ; মহাভারত ৬।১২৯৯।

৭৯. গীতা ১১।৫৫।

৮০. গীতা ১৮।৮-৯।

৮১. গীতা ১৩।৩৩ ; মহাভারত ৬।১৩৫৪।

৮২. গীতা ১৩।১৪ ; এই অংশটি অনেকটা বিভিন্ন।

৮৩. গীতা ১৪।২৪-২৫ ; মহাভারত ৬।১৩৭৯-৮০।

৮৪. প্রচলিত গীতায় এখানে আছে : শরণং।

২ এবং ৩

১. *Voorloopig verslag van het eiland Bali* (*VBG* XXII, p. 6.)

২. *Bhāratayuddha*, 6th strophe.

৩. ইহা চন্দ্রসঙ্কলে বর্ণিত হইয়াছে, যথা : রসঙ্গ (৯), কুদ (৭), সুন্দ (০) এবং চন্দ্রম (১)। অঙ্কস্য বামা গতি এই নিয়মানুসারে ইহা দাঁড়ায় ১০৭৯ শকাব্দ।

৪. *TBG*, 1901, p. 291.

৫. Ed. Dr. J. G. H. Gunning, published from the Hague, 1903 ; also *Djawa* 14 (1934).

৬. দ্রষ্টব্য : *Bhāratayuddha*, canto XV in *BKI* 3. VII. কার্ণ এই সর্গের ১০টি শ্লোক আদিরসাশ্রিত বলিয়া উহা প্রক্ষিপ্ত অনুমান করিয়াছেন এবং ঐ অংশের অনুবাদ প্রদান করেন নাই।

৭. Bibliotheca Javanica, no. 3, pp. VII-VIII note.

৮. ১৪ নং শ্লোক।

৯. ১৬ নং শ্লোক।

১০. ভারতযুদ্ধ, শ্লোক সংখ্যা ১২২-২৩ এবং ভগবদ্গীতা ১/২৬-২৮ এবং ২।৩ তুলনীয়।

১১. ভারতীয় সাহিত্যের এবং রূপকথার বিদ্যাধরী মালয়, চাম, বলিদ্বীপীয়, মাকাসার, বুগিনীজ প্রভৃতি ভাষায় স্থায়ী আসন পরিগ্রহণ করিয়াছে। হাল্মাহেরা দ্বীপের উপকথাতেও তাহার স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে। দ্রষ্টব্য : Gonda, *op. cit.*, p. 134.

১২. *Encyclo. Nederl. Ind.*, vol. II, 2nd ed., p. 590.

১৩. Juynboll, *Drie boeken van het Oud-javaansche Mahabharata in Kawi-tekst en Nederlandsche vertaling, vergeleken met den Sanskrit-tekst*, 1893.

১৪. *Ibid*, p. 90-125.

১৫. Corrected by Juynboll.

১৬. Juynboll, *op. cit.*, pp. 125-37.

১৭. *Ibid*, p. 26.

১৮. *Ibid*, pp. 137-47.

১৯. *Ibid*, p. 27.

২০. ব্রাহ্মণ এবং শৈবদের মধ্যে এখানে যে পার্থক্য করা হইয়াছে তাহা লক্ষ্যণীয়।

২১. Juynboll, *op. cit.*, p. 30.

২২. *BKI*, 72, pp. 401 ff.

২৩. Ed. A. Teeuw in *VKI* IX (2 vols.), The Hague, 1950.

২৪. *KBNWdb*, IV p. 408 ; *TBG* 57 p. 517.

২৫. *BCAI*, 1911-12, pp. 177-181 ; *Harivaṃśa*, chap. 175 ff and *Viṣṇupurāna*, 5, 33 etc.

২৬. *BCAI*, *op. cit.*, pp. 192-93, pl. 15.

২৭. Krom, *Inleiding* I, 2nd edn., p. 479.

ষোড়শ অধ্যায়

ইতিহাস বা মহাকাব্য (ষষ্ঠ পর্যায়)

মহাভারতাশ্রয়ী কাহিনী

মহাভারতে গল্পের উপাদান রামায়ন অপেক্ষা অনেক বেশী হওয়ায় জাভা এবং বলিদ্বীপের লেখকেরা মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করিয়া অনেক কাকাবিন এবং ওয়েয়াঙ্-গল্প রচনা করিয়াছেন। এই সমস্ত রচনায় কমবেশী দ্বীপময় ভারতের প্রভাব বিগুমান। কখনো কখনো যবদ্বীপের গ্রন্থকারেরা সংস্কৃত মহাকাব্যের প্রধান নায়কনায়িকাগণকে লইয়া তাঁহাদের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু সেই গ্রন্থের কাহিনী সংস্কৃত সাহিত্যের মহাসমুদ্র মন্থন করিলেও পাওয়া যাইবে না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে যবদ্বীপীয় গ্রন্থকারগণের প্রেরণার উৎস কোথায় ছিল তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। তবে দ্বীপময় ভারতের কতকগুলি গ্রন্থ যে সংস্কৃত মহাকাব্য সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। এই অধ্যায়ে এই দুই শ্রেণীর গ্রন্থ সম্বন্ধেই আমরা আলোচনা করিব।

প্রথমেই জনপ্রিয় কাকাবিন হরিবিজয় গ্রন্থটি লইয়া আলোচনার সূত্রপাত করা যাউক। ইহার কাহিনীভাগ আদিপর্বের সমুদ্রমন্থনের বিবরণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি এই কাহিনীটি কিরূপে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার অধিকাংশ স্থানে বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং কিরূপে ইহা কাম্বোডিয়ার আর্টে অমর হইয়া রহিয়াছে। মনে হয় যে এই কাহিনীটি দ্বীপময় ভারতের জনসাধারণকে বিপুলভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। হরিবিজয় কাব্যে এই কাহিনীটি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যগ্রন্থটি প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় রচিত এবং গ্রন্থখানির নাম আটান্ন সংখ্যক সর্গে উল্লিখিত হইয়াছে[১]।

প্রমথ সর্গে দেবতা ও দৈত্যগণ কিরূপে মন্দর পর্বতের নিকট সমবেত হইলেন তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে। অনন্তভোগ পর্বতটিকে আকর্ষণ করিয়া ক্ষীরসমুদ্রে লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া এখানে বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত আদিপর্বেও তাহাই লিখিত হইয়াছে। যে কচ্ছপটির নাম সংস্কৃত আদিপর্বে (শ্লোক সংখ্যা ১১২২) অকূপার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এখানে তাহার নাম হইয়াছে অকুপ। চতুর্থ সর্গের দ্বিতীয় চরণে কবি সমুদ্রগর্ভ হইতে উচ্চৈশ্রব (সংস্কৃত : উচ্চৈঃশ্রবস্) নামক অশ্বের আবির্ভাব বর্ণনা করিলেন। লক্ষ্মী বা শ্রী-র জন্মকাহিনীও এই সর্গের চতুর্থ চরণে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার বৃত্তান্ত সংস্কৃত আদি পর্বের ১১৪৬ সংখ্যক শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। খ্মের ভাস্করগণ ক্ষীরসমুদ্র মন্থনোদ্ভূতা লক্ষ্মীর মূর্তি রচনা

করিয়াছেন। কবি পরবর্তী সর্গে দেব-বৈদ্য ধন্বন্তরির জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহা সংস্কৃত আদিপর্বের ১১৪ নং শ্লোকের অনুরূপ। কবি বলিয়াছেন, "সিঙ্গিঃসারি নি শৃপ্তি নিঙ্গ জলধি পর্বত তুমুলুয়্ অদণ্য ধন্বন্তরি[২]।"

কাব্যের কাহিনীভাগ অষ্টবিংশ সর্গ হইতে অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এইস্থলে আমরা রাক্ষস-রাজ রত্মজের সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু তাহার নাম প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণে নাই। এই অসুরটি অমৃতভাণ্ড করায়ত্ত করিলে বিষ্ণু লক্ষ্মীর ছদ্মবেশে উহা স্বাধিকারে আনিলেন। পরবর্তী সর্গগুলিতে কবি দেব-দানবের যুদ্ধের বৈচিত্র্যময় বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। উনসত্তর সর্গের চতুর্দশ চরণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে দেবরাজ ইন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। বিষ্ণু অবশেষে অসুর-রাজ বলিকে নিহত করিলেন (৬৯/৩১)। কাব্যের পঞ্চান্ন সর্গে রাহুর ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে; ইহা প্রাচীন যবদ্বীপীয় আদিপর্বেও বিবৃত হইয়াছে। সংস্কৃত আদিপর্বে রাহুর পিতার নাম বিপ্রচিত্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই কাব্যগ্রন্থে এবং প্রাচীন যবদ্বীপীয় আদিপর্বে তাহার নাম বিকৃত হইয়া বিপ্রচিন্তি রূপে লিখিত হইয়াছে[৩]।

রত্মবিজয় নামক প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত কাকাবিনটিও যবদ্বীপের একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইহাতেও সংস্কৃত নামগুলির বানানে কতকটা স্বাধীনতা অবলম্বন করা হইয়াছে, যেমন কাব্যের নায়িকা তিলোত্তমার নামটি এখানে লোত্তমরূপে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। এই কাব্যের বিষয়বস্তুটি যবদ্বীপের আদিপর্ব হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে[৪]; ইহা সংস্কৃত আদিপর্বেও বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গল্পটি স্বর্গের নর্তকী লোত্তমকে (তিলোত্তমাকে) কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। লোত্তমের সৌন্দর্য সুন্দ এবং উপসুন্দকে বিভ্রান্ত করিলে তাহারা একজন অপরকে পরাজিত করিয়া লোত্তমকে করায়ত্ত করিবার জন্য উন্মত্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। এই সুন্দ উপসুন্দের কাহিনী বহু কবি ও লেখকের মনোরঞ্জন করিয়াছে। সোমদেব তিলোত্তমা সম্বন্ধে কথাসরিৎসাগরে লিখিতেছেন[৫], এবং ব্রহ্মাও তাহাদিগকে (অর্থাৎ সুন্দ উপসুন্দকে) বিনষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইয়া বিশ্বকর্মাকে একজন স্বর্গের রূপসী সৃষ্টি করিতে আদেশ দিলেন; তিলোত্তমা যখন শিবকে ভক্ত উপাসিকারূপে প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন তখন শিব তাহার সৌন্দর্য চতুর্দিক হইতে একসঙ্গে দেখিবার জন্য একেবারে চতুর্মুখ হইয়া গেলেন।" এইরূপে স্বর্গের নর্তকীর অধিকার লইয়া যে সংগ্রাম আরম্ভ হইল তাহাতে উভয় অসুর ক্ষতবিক্ষত হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র পূর্বে সুন্দ উপসুন্দের কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া ভাবিয়াছিলেন যে উহারা বুঝি তাঁহার স্বর্গরাজ্য অধিকার করিবে। সুন্দ-উপসুন্দের মৃত্যুতে তাঁহার সেই আশঙ্কার নিরসন হইল। গ্রন্থখানির নাম দ্বাবিংশতি সর্গের পঞ্চম চরণে উল্লেখ করা হইয়াছে।

মহাভারতের কয়েকজন মহানায়ক ঘটোৎকচাশ্রয়-নামক কাকাবিনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কাব্যগ্রন্থটির নাম একপঞ্চাশতম সর্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। মনে হয় যে নাগরকৃতাগমের মত এই কাকাবিনটির দ্বিতীয় আর একটি নাম ছিল। কারণ, পঞ্চাশতম সর্গের প্রথম চরণেই লেখা হইয়াছে :

"শম্পু কেকেতন ইঙ্গ্ কথাতিত ঘটোৎকচশরণ ঙ্গরন্য তনপরচন।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় নামটি ছিল ঘটোৎকচশরণ। বস্তুতঃপক্ষে ঘটোৎকচাশ্রয় এবং ঘটোৎকচশরণ নাম দুইটি একই অর্থবহ।

এই গ্রন্থটির গুরুত্ব দুই প্রকার। প্রথমতঃ ইহা সুন্দর প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ ইহাকে অবলম্বন করিয়া অনেক মালয় এবং যবদ্বীপীয় ওয়েয়াঙ্ কাহিনী বিরচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, যে পনকবন-গণকে[৬] আমরা ওয়েয়াঙ্-সাহিত্যে সচরাচর দেখিয়া থাকি, তাহাদের আবির্ভাব সম্ভবতঃ এই ঘটোৎকচাশ্রয়[৭] কাব্যগ্রন্থেই প্রথম স্বীকৃত হইয়াছে। গল্পে কথিত হইয়াছে যে অভিমন্যু এবং লক্ষ্মণকুমার ক্ষিতিসুন্দরী নামক এক রূপলাবণ্যবতী নারীকে লাভ করিবার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের বীর ঘটোৎকচ তাঁহার পিতৃব্য পুত্রকে সাহায্য করিতে আসিয়া যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত করিয়া দিলেন[৮]।

এই কাব্যটির রচনাকাল নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। পঞ্চাশতম সর্গের প্রথম চরণেই গ্রন্থকারের নাম স্পু পনুলুহ্ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। লেখকের নামটি দেখিয়া এই প্রশ্ন মনে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক যে ঘটোৎকচাশ্রয় এবং হরিবংশের গ্রন্থকার কি অভিন্ন? যদি তাহাই হয়, তবে প্রথম সর্গের তৃতীয় শ্লোকের নিম্নলিখিত পদটির ব্যাখ্যা কি—

"শ্রী ভূপাল জয়াকৃত প্রভু বিশেষ তুহুতুহু ভটার কেশব[৯]।"

উপরোক্ত পদটি হইতে প্রতীয়মান হইবে যে কবি রাজা জয়াকৃতের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। এদিকে হরিবংশের লেখক পনুলুহ্ তাঁহার সমসাময়িক রাজার নাম দিয়াছেন জয়জয়। এই দুই পনুলুহ্ই যদি এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে ইহা প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন যে এই জয়াকৃত (যাহার রাজত্বকালে ঘটোৎকচাশ্রয় রচিত হইয়াছিল) জয়জয়ের খুব সন্নিকটবর্তী কালে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ তিনি জয়জয়ের পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী নরপতি ছিলেন। জয়-জয়ের রাজত্বকালের পূর্বে জয়াকৃত নামক কোন রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য নীরব। তাঁহার পরবর্তী রাজার নাম হইল শ্রী সর্বেশ্বর জনার্ধনাবতার বিজয়াগ্রজ সমসিংহনাদানিবয-বীর্য পরাক্রম দিগ্জয়োত্তুঙ্গদেব। ১১৬০ খৃষ্টাব্দের একটি কদিড়ি-অনুশাসনে তাঁহার নামোল্লেখ আছে[১০]। এতদ্ব্যতীত একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে জয়জয়ের পুত্রের নাম ছিল জয়কৎবঙ্গ[১১], কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। একখানি নামবিহীন গ্রন্থ[১২] হইতে আমরা জয়নগর কৎবঙ্গ্ ইঙ্গ্ জগৎ নামক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উল্লেখ পাই। তিনি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া অনুমিত হইলেও তাঁহাকে জয়কৎবঙ্গের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। সুতরাং জয়জয়ের রাজত্বকালের অব্যবহিত পরে জয়াকৃত নামক কোন রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইতিহাস এখনো নির্বাক।

ইহার দীর্ঘকাল পরে আমরা কৃতজয় নামধারী একাধিক রাজার উল্লেখ পাইতেছি[১৩]। ১ম কৃতজয়ের একখানি অনুশাসনের তারিখ ১১৯০খৃঃ অঃ; দ্বিতীয় কৃতজয়ের আবির্ভাবকাল ১২২২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে। কৃতজয় এবং জয়াকৃত যদি অভিন্ন ব্যক্তি হন, তাহা হইলে পনুলুহের শেষোক্ত গ্রন্থের রচনাকাল ১১৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ধরিতে হইবে। পনুলুহ্

যদি জয়ভয়ের রাজত্বকালে ভারতযুদ্ধের শেষাংশ এবং সমগ্র হরিবংশের রচনাকার্য সমাপ্ত করিয়া থাকেন এবং ঐ রচনাকার্যের সময় যদি ১১৫৭ খৃষ্টাব্দের সন্নিকটবর্তী সময়ে হইয়া থাকে তাহা হইলে পনুলুহ্-এর পক্ষে ৩৩ বৎসর পরে ঘটোৎকচাশ্রয় কাকাবিন রচনা করা অসম্ভব নহে। ভারতযুদ্ধ রচনার সময় কবির ৩০ বৎসর হইয়া থাকিলে ৬৩ বৎসরের সময় (১১৯০-১১৫৭ = ৩০ + ৩৩ বৎসর) ঘটোৎকচাশ্রয় রচনা করা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইবে না। দ্বিতীয় কৃতজয় দীর্ঘকাল পরে রাজত্ব করিয়াছিলেন ; সুতরাং ১১৫৭ খৃষ্টাব্দের একজন বিখ্যাত কবি ১২২২ খৃষ্টাব্দে অথবা উহার অব্যবহিত পুর্বে আরো একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ইহা সহসা বিশ্বাস করা সুকঠিন। সুতরাং অন্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি যে এই তিনখানি গ্রন্থের পনুলুহ একই ব্যক্তি এবং তিনি এই গ্রন্থগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচনা করিয়াছিলেন।

আর একখানি বিখ্যাত কাকাবিনের নাম অর্জুনবিবাহ[১৪]। ইহা ৩৬টি সর্গে বিভক্ত। প্রথম সর্গে দৈত্যরাজ নিবাতকবচের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে ; তাহার ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবগণ সর্বদা সশঙ্ক থাকিতেন। নিবাতকবচের দুর্গ ছিল মেরু-পর্বতের দক্ষিণস্থ পাদভূমে ; উহার নাম ছিল মণিমাস্তক[১৫]। দেবতা, যক্ষ, অসুর এবং ঋষিগণ কেহই তাহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই[১৬]। তিনি এই বর-ই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন।

বিপদগ্রস্থ দেবগণের দৃষ্টি তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর অর্জুনের উপর নিপতিত হইল। অর্জুন তখন ইন্দ্রকিল পর্বতে কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন। অর্জুনের শক্তিসামর্থ্য এবং সংযম পরীক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্র এক কৌশল অবলম্বন করিলেন ; তিনি তিলোত্তমা এবং সুপ্রভা-প্রমুখ একদল স্বর্গের নর্তকীকে পাঠাইলেন অর্জুনকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য। দেবরাজকে সেম্ব (= প্রণাম) করিয়া সাতজন স্বর্গের নর্তকী শূন্যপথে উড়িয়া গিয়া প্রভাতবেলায় ইন্দ্রকিল পর্বতে পৌছিল। কবি এইস্থলে চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন।

কাব্যের দ্বিতীয় সর্গেও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা অব্যাহত রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে কবি স্বর্গের নর্তকীগণের প্রসাধন সজ্জার বিবরণও দিয়াছেন ; তাহারা অঙ্গসজ্জা করিয়া অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। পরবর্তী সর্গে অর্জুন এবং তাঁহার কঠোর তপস্যার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। চতুর্থ সর্গে কবি বর্ণনা করিয়াছেন স্বর্গের নর্তকীগণ কিরূপে অর্জুনকে তিন রাত্রি ধরিয়া ক্রমাগত প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইল ; অতঃপর তাহারা স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিল। দেবগণ অপ্সরীগণের নিকট অর্জুনের কঠোর তপস্যার কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন ; কারণ তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে এই রূপ সঙ্কল্পে অটল বীরকে দিয়াই নিবাতকবচের সংহারকার্য সুসম্পন্ন হইবে। ইহার পর দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং অর্জুনের দার্শনিক জ্ঞানের পরিমাপ করিবার জন্য মর্ত্যলোকে প্রস্থান করিলেন। পঞ্চম সর্গে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে তিনি একজন বৃদ্ধ তপস্বীর ছদ্মবেশে অর্জুনের সমক্ষে উপনীত হইলেন। এই দুইজন তপস্বীর কথোপকথনের বৃত্তান্ত পরবর্তী সর্গে নিবদ্ধ হইয়াছে। এই সর্গের

ষষ্ঠ শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই যে ইন্দ্র ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। তপস্বী রাজকুমার তখন তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। সপ্তম সর্গে দৈত্যগণের স্বর্গপুরী আক্রমণের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে; দেবগণ সাময়িকভাবে তাহাদিগকে সাম এবং দান দ্বারা শান্ত করিলেন বটে, কিন্তু দৈত্যগণ পরিশেষে এই যুদ্ধ বিরতিকে দেবগণের চতুরতা বলিয়া মনে করিল; তাহারা ভাবিল যে দেবরাজ কালহরণ করিবার জন্য এই রূপ করিয়াছেন। সুতরাং দেবগণের সঠিক উদ্দেশ্য কি তাহা জানিবার জন্য দৈত্যগণ ত্রিলোকের সর্বত্র চর প্রেরণ করিল। একজন বধির চর সংবাদ পরিবেশন করিল যে পার্থ ইন্দ্রকিল পর্বতে তপস্যা করিতেছেন এবং দেবগণ তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন। নিবাতকবচ অতঃপর সি-মুখকে পাঠাইলেন পার্থকে হত্যা করিবার জন্য; দৈত্যটিও একটি বরাহের বেশে পর্বতের পার্শ্বদেশ ধ্বংস করিতে লাগিল। তপস্যায় বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় অর্জুন ধনুক লইয়া তীর নিক্ষেপ করিলেন; ইহাতে দৈত্যটি নিহত হইল। পার্থের যোগ শেষ পর্যায়ে উপনীত হইলে, নীলকণ্ঠ কিরাত বা ব্যাধের ছদ্মবেশে তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। অষ্টম সর্গে আমরা দেখিতে পাই যে উভয়ে দ্বন্দ্ব আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন; এই দ্বন্দ্বের কারণ এই যে ব্যাধ একটি শর নিক্ষেপ এবং অর্জুনের গুরুর উদ্দেশ্যে অপমানসূচক বাক্য ব্যবহার করিয়াছিল। ব্যাধ তাহার বাক্য প্রত্যাহার করিলে এবং অর্জুনকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিলে অর্জুন তাঁহাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া জানাইলেন। ব্যাধ কোনটা করিতেই স্বীকৃত হইলেন না; সুতরাং উভয়ের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এই দ্বৈত-সংগ্রামের কাহিনী পরবর্তী সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। এই সর্গের শেষাংশে কবি কিরাতকে পদ্মাসনমণিতে আসীন অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে উপস্থাপিত করিয়াছেন। অর্জুনের প্রার্থনা একাদশ সর্গের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। দ্বাদশ সর্গের প্রথম শ্লোকে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে শিব তাঁহাকে অমিত শক্তিশালী পশুপতি অস্ত্র প্রদান করিতেছেন। তিনি অর্জুনকে রণবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিয়া সেইস্থল পরিত্যাগ করিলেন। পার্থও গৃহপ্রত্যাবর্তনে উন্মুখ হইলেন, কিন্তু এমন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে একটি আমন্ত্রণ-লিপি আসিল। তদনুযায়ী ঐরাবন এবং বজ্রন-নামক দুইজন অপ্সরা সমভিব্যাহারে অর্জুন স্বর্গে গমন করিলেন। কবি চতুর্দশ সর্গে বর্ণনা করিয়াছেন যে কপকমাসে বর্ষাগমে বৃক্ষ এবং আইভী লতাগুলি যেমন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, দেবগণও অর্জুন-সন্দর্শনে সেইপ্রকার পুলকিত হইয়া উঠিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতির সহিত রাজনীতি আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। অর্জুন ইন্দ্রকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। ষোড়শ শ্লোকে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ইন্দ্র অর্জুনকে নিবাতকবচের ক্ষমতার রহস্যটি নিরূপণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সুপ্রভা সমভিব্যাহারে মণিমান্তকে উপনীত হইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা অনেক দেশ[১৭] অতিক্রম করিয়া চলিলেন; কবি এই সমস্ত দেশের প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা অবশেষে মণিমান্তকে উপনীত হইলেন। ষোড়শ সর্গে দানবগণের স্বর্গ আক্রমণের উদ্যোগ বর্ণনা করা হইয়াছে। কবি এইস্থলে সুপ্রভা এবং অর্জুনের কথোপকথন বর্ণনা করিয়াছেন; তাঁহারা পরস্পরের প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়াছেন। পরবর্তী

সর্গে আমরা দেখিতে পাই যে সুপ্রভা অসুররাজের নিকট তাঁহার আগমনবার্তা ঘোষণা করিলেন। সুপ্রভাকে দেবরাজের নিকট হইতে পাইবার জন্য তিনি পূর্বে যে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা অষ্টাদশ সর্গে বর্ণনা করা হইয়াছে। দৈত্যরাজের সহিত প্রেমাভিনয় করিতে করিতে সুপ্রভা জানিতে পারিলেন যে দৈত্যরাজের অলৌকিক শক্তির উৎস তাহার জিহ্বাগ্রে। এই সংবাদটুকু জ্ঞাত হইয়া সুপ্রভা মণিমাস্তক হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এই বিবরণটি কাব্যের ঊনবিংশ সর্গে বর্ণনা করা হইয়াছে। পরবর্তী সর্গে দৈত্যরাজের রাজধানীতে এক বিপুল কর্মব্যস্ততা এবং আলোড়নের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে; দৈত্যরাজ স্বর্গ ধ্বংস করিবার জন্য তাঁহার সৈন্যবাহিনী শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন। একবিংশ সর্গে কবি ক্রুধাক্ষ, দুষ্কৃত, বিরক্ত এবং করালবক্ত্রের সমরায়োজনের কাহিনী বর্ণনা করিলেন; ইহারা সকলেই হিরণ্যকশিপু এবং কালকেয়ের বংশসম্ভূত এবং তাঁহার বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন। এই সর্গের পঞ্চম শ্লোকে কামন্দককে রাজনীতি বিশারদ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এদিকে স্বর্গেও আসন্ন সংগ্রামের জন্য আয়োজন চলিতেছিল। দেব পক্ষে বিখ্যাত যোদ্ধার মধ্যে আমরা ইন্দ্র, চিত্রাঙ্গদ, চিত্রসেন, জয়ন্ত, অর্জুন প্রভৃতির নাম দেখিতে পাই (দ্বাবিংশ সর্গ)। পরবর্তী সর্গে দেবাসুরের ভয়াবহ সংগ্রামকাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। দুই পক্ষই "পর্বতরাজের" পৃষ্ঠে দুই নদীর অন্তর্বর্তী সমতল ভূখণ্ডে যুদ্ধের জন্য সমবেত হইলেন। পঞ্চবিংশ এবং ষড়বিংশ সর্গে এই যুদ্ধের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কবি লিখিয়াছেন যে অর্জুনের প্রতি একটি অস্ত্র নিক্ষেপ করা হইলে তিনি উহা ধরিয়া মূর্চ্ছাহত হওয়ার ভান করিয়া রথে পড়িয়া গেলেন। দৈত্যরাজ তখন তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য আসিলে অর্জুন তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুখে একটি শর নিক্ষেপ করিলেন এবং উহাতেই নিবাতকবচের মৃত্যু হইল (সপ্তবিংশ সর্গ)। কবি পরবর্তী সর্গে দেবগণের আনন্দোৎসবের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। অর্জুন অতঃপর নন্দনবনে চলিয়া গেলেন এবং সাতদিনের জন্য স্বর্গের অধিপতি হইলেন[১৮]। সাতটি হীরকনির্মিত পাত্রে একশত তীর্থের পবিত্রবারি লইয়া তাঁহার অভিষেকক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। পরবর্তী পাঁচটি সর্গে পার্থের সহিত মেনকা, সুপ্রভা, তিলোত্তমা এবং অন্যান্য অপ্সরীগণের যথেচ্ছ লীলাবিহারের কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। কবি শেষের সর্গে অর্জুনের স্বর্গ হইতে বিদায় দৃশ্যটি অঙ্কন করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশানুযায়ী মাতলি পার্থকে স্বর্গীয় বিমানে করিয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট বদরি আশ্রমে লইয়া গেলেন। ভ্রাতৃগণের সহিত পুনর্মিলন হইল। এই কাব্যের মূল বিষয়বস্তুটি প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত অগস্ত্যপর্বেও উল্লিখিত হইয়াছে[১৯]।

ডঃ ব্র্যাণ্ডেস বলিয়াছেন[২০] যে এই গ্রন্থে কিয়ৎপরিমানে বৌদ্ধ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহা অবশ্য অবিমিশ্র বৌদ্ধ প্রভাব নহে, বরঞ্চ আমরা বলিব যে ইহা বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিকধর্মের সংমিশ্রণ। তৃতীয় সর্গে কবি অর্জুনের গভীর তপস্যা ও ধ্যানের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। অর্জুন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পদ্মাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার দুইটি হস্ত বক্ষে সংস্থাপিত এবং তাঁহার চক্ষু দুইটি নাসাগ্রের প্রতি নিবদ্ধ। কবি বলিয়াছেন[২১] যে তিনি "শূন্যে" লীন হইয়া গিয়াছেন, তিনি শূন্যতা শ্রবণ করিতেছেন এবং তিনি "শূন্যতা"-র মতই পবিত্র।

বস্তুতঃ ইন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন[২২], তুমি যদি "শূন্য" ভালবাস তাহা হইলে তুমি "শূন্য" লাভ করিবে। এই ভাবধারা বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্মের তকমা-আঁটা নয়, কারণ এইরূপ ধারণা যে কেবলমাত্র বজ্রযানে আছে তাহা নহে ; পরন্তু ইহা ব্রাহ্মণ্যধর্মের তান্ত্রিক সাধনার মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্র[২৩] এবং শিবের[২৪] অহিংসা-সংক্রান্ত ভাষণও একমাত্র বৌদ্ধধর্মের বিশিষ্ট লক্ষণ নহে। অবশ্য আমরা একথা বলিতে পারি যে দশশীল এবং নির্বাণের দার্শনিক তত্ত্বগুলি বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু এই বৌদ্ধশাস্ত্রীয় নির্বাণ যদি আবার শিব পূজার মাধ্যমে লাভ করিতে হয় তখন বলিতে হইবে যে সমস্ত ধ্যান-ধারণাই বিকৃত হইয়াছে[২৫]।

ডঃ পূর্বচরক[২৬] পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছেন অর্জুনবিবাহের প্রধান ঘটনাবলী মহাভারত হইতে গৃহীত হইয়াছে, যেমন অর্জুনের তপস্যা এবং কিরাত বেশধারী শিবের সহিত তাঁহার সংগ্রাম। অর্জুনকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য অপ্সরীগণের নিয়োগ মহাভারতের অন্য অংশ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এইরূপ বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণেই অর্জুনবিবাহ কাকাবিন রচিত হইয়াছে। ঘটনাবিন্যাসে কবি সর্বদা মূল গ্রন্থকে অনুসরণ করেন নাই। ডঃ পূর্বচরক মনে করেন যে এই স্বাতন্ত্র্য কবির মৌলিকতার স্বাক্ষর বহন করিতেছে ; ইহা তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানের অভাবের পরিচায়ক নহে[২৭]। ডঃ পূর্বচরক আরো মনে করেন যে এই কাব্যের আদিরসাশ্রিত অংশসহ শতকরা প্রায় ২০ ভাগই প্রক্ষিপ্ত। এই মত অবশ্য সকলে গ্রহণ করেন নাই, তবে ইহাতে পরবর্তী যুগের কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশ বিদ্যমান থাকা অসম্ভব নহে। ইহার বলিদ্বীপীয় সংস্করণে নামগুলির বানানে কিছুটা স্বাধীনতা অবলম্বন করা হইয়াছে। গ্রন্থখানির কয়েকটি কিডুঙ এবং নূতন যবদ্বীপীয় সংস্করণও আছে[২৮]।

গ্রন্থের অন্তিম সর্গের শেষ শ্লোকে কবি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "অর্জুনবিবাহ নামক কাহিনীর বিবরণ শেষ হইল। ম্পু কণ্ব এইবারই প্রথম একটি কাব্য রচনা করিয়া উহা জনসমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন ; কিন্তু তাঁহার মন সুস্থির নহে। কারণ, তাঁহাকে মহারাজের সহিত যুদ্ধে অনুগমন করিতে হইতেছে। তিনি মহারাজ ঐরলঙ্গের নিকট শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন ; মহারাজ তাঁহার রাজ্য দ্বিগুণিত করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থখানি সৌজন্যসহকারে গ্রহণ করিয়াছেন।"

এই কাব্যগ্রন্থখানি একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাজ ঐরলঙ্গের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। যবদ্বীপীয় কাব্যগুলির মধ্যে ইহাই প্রথম গ্রন্থ যাহার রচনাকাল অনেকটা সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্ধারিত করা যায়। চণ্ডি জাগো[২৯] মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে অর্জুনবিবাহ কাকাবিন হইতে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই মন্দিরটি আনুমানিক ১২৬৮ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল[৩০]। এই মন্দিরগাত্রের অর্জুনবিবাহ চিত্রাবলী যে কাকাবিন হইতেই গৃহীত হইয়াছিল তাহার স্বপক্ষে গ্যালেস্তিন যথেষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন কি পূর্বচরকের অনুবাদে কাকাবিনের যে সমস্ত অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল তাহাও মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত হইয়া সম্ভবতঃ পূর্বচরকের মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিতেছে। অর্জুনবিবাহের কাহিনী মধ্যযুগের যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত বঙ্গ্বঙ্গ্ অস্তুতিতেও[৩১] বর্ণিত হইয়াছে। ইহা মচপত্-ছন্দে লিখিত হইয়াছে।

কোন কোন দিক দিয়া ইহা কুন্তীযজ্ঞ নামক গ্রন্থের সহিত তুলনীয়। প্রথমোক্ত গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে কুন্তী, ধর্মবংশ, ভীম, নকুল এবং সহদেব অর্জুনের দীর্ঘকালব্যাপী অনুপস্থিতি হেতু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। সুতরাং তাঁহার অনুসন্ধান করিবার জন্য ভীম ইন্দ্রকিল পর্বতে গমন করিলেন। ভীম অর্জুনসহ প্রত্যাবর্তন না করায় কুন্তী পুত্রগণসহ অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন। এই সঙ্কটকালে নারদমুনি শুভ সংবাদ লইয়া আসিলেন যে অর্জুন স্বর্গের অপ্সরী সুপ্রভার সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। অর্জুন অবশেষে মর্ত্যে অবতরণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার একটি অসমাপ্ত কর্তব্য ছিল। নিবাতকবচের মৃত্যুতে করঙ্ গুমস্তঙ্গের রাক্ষস পূর্বক ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল ; সুতরাং তাহার সহিত হিসাবনিকাশ শেষ করিবার ছিল। এই রাক্ষসটিকে বধ করিয়া অর্জুন বঙ্গ্বঙ্ অস্তুতি নাম পরিগ্রহণ করিয়া বনসব নামক স্থলে চলিয়া গেলেন। এইস্থলের রাজকন্যা শ্রীগতিকে বিবাহ করিবার জন্য দৈত্যরাজ মধুসুদন (=মধুসূদন) নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। অতঃপর মধুসুদনকে পরাজিত করিয়া বঙ্গ্বঙ্গ অস্তুতি রাজকন্যা শ্রীগতিকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে যুদ্ধজয়ী বীর কিছুকাল পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন এবং তাঁহার মৃতদেহ নাগরাজ অনন্তভোগের প্রমোদ উদ্যানে নিপতিত হইল। নাগরাজ তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার তিন কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। অতঃপর কৃষ্ণ অর্জুনকে পাতালপুরী হইতে আনিবার জন্য তাঁহার চক্রকে প্রেরণ করিলেন। মধুসুদনের মৃত্যুর পর পাণ্ডবগণ তাঁহাদের মৃত পিতার উদ্দেশ্যে বলি দিবার জন্য একটি শুভ্রবর্ণ কিদণ্ডের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। যাত্রাপথে তাঁহারা কালভুবন-নামক একটি রাক্ষসের সাক্ষাৎ পাইলেন ; ভীম তাঁহাকে নিহত করিলে তিনি বিষ্ণু মূর্তিতে আবির্ভূত হইলেন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে শুভ্র কিদণ্ডটি জগৎকারণের নিকটে রহিয়াছে। জগৎকারণ উহা দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় তাঁহার এবং অর্জুনের মধ্যে সংগ্রাম উপস্থিত হইল এবং ইহাতে উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই সময় বিদ্যাধরীগণ উপস্থিত হইয়া মৃত বীরগণকে পুনর্জীবন দান করিলেন। তখন দেখা গেল যে জগৎকারণ অর্জুন এবং সুপ্রভার পুত্র এবং অর্জুনের সহকারীগণ তিন নাগকন্যার সন্তানাদি ভিন্ন আর কেহই নহেন। কাব্যটি এই সুন্দর মিলনোৎসবের মধ্যে সমাপ্তি লাভ করিল।

এইস্থলে কাহিনীটি যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা সংস্কৃত সাহিত্যে অজ্ঞাত। যদিও কোন কোন নাম বা কোন কোন ক্ষুদ্র ঘটনার প্রতিচ্ছায়া ভারতীয় সাহিত্যে পাওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু কাহিনীটির অঙ্গবিন্যাস এবং রূপসজ্জার জন্য কবি দায়ী। এই কাব্যে অর্জুন সর্বত্র নায়ক রূপে দেখা দিয়াছেন এবং স্বর্গের কোন কোন বিখ্যাত দেবতাকে তাঁহার পুত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

চণ্ডি জাগোর মন্দিরগাত্রে পার্থযজ্ঞের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ডঃ ভান ষ্টেইন ক্যালেন-ফেল্স[৩২] এই কাকাবিনটির সাহায্যে মন্দিরের বিভিন্ন চিত্রাবলী সনাক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই কাব্যগ্রন্থে ৪৪টি সর্গ আছে[৩৩] এবং প্রথম সর্গটি মহাদেবের প্রশস্তি দিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। কবি কামদেবেরও বন্দনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় সর্গে কবি পাঠককে

কাকাবিনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেছেন ; উহা যেন একটি নীতির প্রতিপাদ্য বিষয়। সেই নীতিটি হইল লোকে দ্যুতাসক্ত হইয়া কিরূপে অসুখী হয়। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হইয়াছে যে যুধিষ্ঠিরের সবই ছিল, কিন্তু কৌরবগণ শঠতাপূর্ণ দ্যুতক্রীড়ার আশ্রয় নিলে যুধিষ্ঠির তাঁহাদের নিকট তাঁহার রাজ্য হারাইলেন। কুন্তী দ্যুতক্রীড়ার ফলদর্শনে মর্মান্তিক দুঃখিত হইলেন। শকুনি দ্রৌপদীর শেষ বস্ত্রটিও জোর করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং বহু লোকের সমক্ষে তাঁহার কেশাকর্ষণ করিলেন। দ্রৌপদী সেই সময় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তাঁহার অবিন্যস্ত কেশরাশি দুর্যোধনের রক্তে সিক্ত না হওয়া পর্যন্ত বেণীবদ্ধ হইবে না। ভীমও নিতান্ত অপমানিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি সংগ্রামে দুযোধনের উরুভঙ্গ করিবেন। এই রূপে কুরু এবং পাণ্ডবগণ পরস্পর পরমাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও আর কোন দিন শান্তি এবং সৌহার্দের সহিত বাস করিতে পারেন নাই। কাহিনীটিতে বলা হইয়াছে যে যুধিষ্ঠির বনবাসে দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরবর্তী তিনটি সর্গে (৩-৫) বলা হইয়াছে পাণ্ডবগণ কিরূপে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ষষ্ঠ সর্গে কবি অর্জুনের কঠোর তপস্যার আয়োজন-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। তখন মধ্যরাত্র ; ইহা পূর্বেই স্থির হইয়াছিল যে তৃতীয় পাণ্ডব পরের দিন প্রভাতবেলায় চলিয়া যাইবেন। এমন সময় বিদুর আসিলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই ঋষি দোম্য (= ধৌম্য) তাঁহার আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাদের নিকট তাঁহার দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিলে ঋষি এই বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন (সপ্তম সর্গ) যে পাণ্ডবগণ ধার্মিক হওয়ায় তাঁহারা অবশ্যই শত্রুগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহার দীর্ঘ ভাষণ পরবর্তী সর্গেও বিবৃত হইয়াছে ; ইহাতে ঋষি অর্জুনকে কঠোর তপস্যা করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। যুধিষ্ঠির পূতচরিত্র ঋষিকে তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন এবং অর্জুনকে ইন্দ্রকিল পর্বতে ঋষি দ্বৈপায়নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। পরদিন প্রভাত বেলায় অর্জুন মাতার আশীর্বাদ লাভ করিয়া দ্রৌপদীর নিকট বিদায় লইলেন (নবম সর্গ)। অর্জুনের বিদায়কালে সকলে ক্রন্দন করিতে লাগিল। অর্জুন তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তপস্যা করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন (দশম সর্গ)। কবি অতঃপর চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং যে-সমস্ত পুরনারী পশ্চাতে রহিয়া গেলেন তাহার কথা বর্ণনা করিলেন। দ্বাদশ সর্গ সম্পূর্ণ ই মাঠ ও প্রান্তর, পর্বত, নদনদী, বৃক্ষ, লতাগুল্ম প্রভৃতির বর্ণনায় মুখর হইয়াছে ; অর্জুন এই সমস্ত অতিক্রম করিয়া চলিলেন। বিষয়টি পরবর্তী সর্গেও বর্ণিত হইয়াছে। কবি এই স্থলে বলিয়াছেন যে কুটিরগুলি রামায়ণ কাহিনীর বিভিন্ন দৃশ্য-সজ্জায় সু-অলংকৃত এবং নারীগণও ঐ "কুটীরের পুষ্পদল"-স্বরূপা। এই সমস্ত নারীর অবস্থিতিতে পূর্বে ক্র্যাতনের (= রাজপ্রাসাদের) শোভা যেন উছলিয়া উঠিত। চতুর্দশ সর্গে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এই কুটীরবাসিনী মহিলাগণ অর্জুনকে তাঁহার গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করিতেছেন এবং অর্জুনও যথাযোগ্য সৌজন্য সহকারে সেই সমস্ত প্রশ্নাদির উত্তর প্রদান করিতেছেন। তিনি জানিতে পারিলেন যে ঐ স্থলের নাম বনবতী এবং উক্ত স্থানে যে তপস্বী বাস করেন তাঁহার নাম মহাযনি[৩৪]। একজন পুরনারী অর্জুনকে দেখা

মাত্রই প্রেমে পড়িলেন এবং তিনি গৃহস্তম্ভের পশ্চাতে লুক্কায়িত হইলেন। নবীন তপস্বী অর্জুন একদল তরুণীর সমভিব্যাহারে মহাযনির নিকটে সমুপস্থিত হইলেন এবং মহাযনি তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন। অর্জুন ফলমূল এবং সিরিহ্ গ্রহণান্তে তাঁহার উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করিলেন। পরবর্তী দুইটি সর্গে (পঞ্চদশ-ষোড়শ) এই দুই তপস্বীর কথোপকথনের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

কবি সপ্তদশ সর্গে একটুখানি রোমান্টিক ভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন ; পূর্ববর্তী স্বর্গে যে মহিলাটি গৃহস্তম্ভের পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়াছিলেন তাঁহার নাম ছিল গুল-বুলুহ্ ; তিনি রাত্রির অন্ধকারে অভিসারিকার মত বিনিদ্র অর্জুনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। অর্জুন তখন তাঁহার অতীত ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। অর্জুন প্রলোভন দমন করিলেন (অষ্টাদশ সর্গ)। তখন বোরুদ্যমানা গুল-বুলুহ্ তৃতীয় পাণ্ডবকে সেম্ব (প্রণাম) করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন (ঊনবিংশ সর্গ)। অর্জুন বনবর্তী-তপস্বীর নিকট বিদায় লইয়া আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অনেক গৃহপালিত পশু এবং একটি সমুদ্র দেখিলেন ; সমুদ্রের তীরে বৃক্ষ-লতাগুল্মের অজস্র সমাবেশ (বিংশ সর্গ)। জলপ্রপাত এবং নদীর বর্ণনা পরবর্তী সর্গেও বিবৃত হইয়াছে। কবি বর্ণনা করিয়াছেন কিরূপে হিমশিলাখণ্ড জ্যা-চ্যুত তীরের মত ছুটিয়া চলিয়াছে এবং অজস্রধারায় বৃষ্টি পতিত হইতেছে। অর্জুন শিরোপরি একটি সেন্তে-পত্র ছাতার মত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল এবং সমস্ত গগনমণ্ডল কৃষ্ণমেঘে সমাচ্ছন্ন হইল। এই দৃশ্যটি দ্বাবিংশ সর্গেও বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর অর্জুন একটি বরিঙ্গিন বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই শৈত্যে এবং অন্ধকারে গন্ধকবাহী প্রস্তর-খণ্ড পরস্পরকে তীব্রবেগে আঘাত করিয়া অগ্নির চমক সৃষ্টি করিতে লাগিল। অবশেষে এই দুযোগের অবসান হইল এবং আলোকে চারিদিক ঝলমল করিয়া উঠিল। বৃষ্টিস্নাত ধরণীর অপূর্ব সৌন্দয বর্ণনায় কবি আবার মুখর হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর ত্রয়োবিংশ সর্গ আরম্ভ হইল। সন্ধ্যার "আধো আলো আধো ছায়া" পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইল। ক্রমে চন্দ্রের রূপালি আলোতে অন্ধকার পাহাড়গুলির প্রত্যন্তরেখা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। পশ্চাতে বৃক্ষ এবং নির্মল গগনের পটভূমিকায় ঐগুলিকে পর্দার উপর প্রতিফলিত ওয়েয়াঙ্ মূর্তি বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। কবি অতঃপর জ্যোৎস্না-স্নাত অরণ্যানীর সৌন্দর্য বর্ণনায় মুখর হইলেন। পরবর্তী সর্গেও এই অরণ্যানী এবং নিশাচর জীবজন্তুর বর্ণনার জের চলিয়াছে। কবি এখানে একটি বিশালকায় বায়ুসঞ্চালিত বণ্ডু-বৃক্ষকে নৃত্যশীল দৈত্যের সহিত তুলনা করিয়াছেন। পঞ্চবিংশ সর্গে ক্রাতন-এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীর সহিত অর্জুনের কথোপকথনের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। শ্রী বলিলেন যে তিনি কৌরবদের পাপের জন্য রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়াছেন ; তবে তিনি অর্জুনকে আশ্বাস দিলেন যে তাঁহার তপস্যা সার্থক হইলে তিনি আবার ক্রাতনে প্রত্যাবর্তন করিবেন। শ্রী অর্জুনকে কিরাতের নিকট হইতে অস্ত্ররাজ লইবার জন্য পরামর্শ দিলেন। তাঁহার পরামর্শ পরবর্তী সর্গেও বিধৃত হইয়াছে ; তিনি অর্জুনকে বলিলেন যে দুর্যোধন তাঁহার পশ্চাতে চর নিয়োগ করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

কবি অষ্টবিংশ সর্গের প্রারম্ভেই সমুদ্রের বর্ণনা দিলেন। অর্জুন দূর হইতে কাম এবং রতিকে সন্দর্শন করিয়া একটি বিপুলকায় বৃক্ষের পশ্চাতে আত্মগোপন করিলেন। পরবর্তী সর্গে দিব্যলোকের অধিবাসী এই দুইজনের প্রণয়কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ত্রিংশ সর্গে পুনরায় সমুদ্রের বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্জুন ভাবিলেন যে তিনি যদি কামদেবের সহিত সাক্ষাৎ না করেন তাহা হইলে তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবে না। সুতরাং তিনি কামদেবের নিকট তপস্যা করিবার সঙ্কল্পের কথা ব্যক্ত করিলেন। কামদেব অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে অর্জুন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করিবেন কিনা; অর্জুন ইহার উত্তরে বলিলেন যে তাঁহার প্রথম কর্তব্য হইল তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ পালন করা এবং হিমালয়স্থ মহাদেবের বরলাভ করা; তিনি এইরূপেই পাণ্ডবগণের বিগত-সৌভাগ্যের পুনরুত্থান ঘটাইতে চাহেন। পরবর্তী সর্গে আমরা দেখিতে পাই যে অর্জুনের উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয় তাহার প্রতি কামদেব তাঁহার শুভেচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন; তিনি অর্জুনকে শ্রী দ্বৈপায়নের নিকট হইতে শিবাগম-শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্যও উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন যে ঋষির আশ্রম পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ইন্দ্রকিল পর্বতের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত। অতঃপর কামদেব অর্জুনকে নলমল দৈত্য সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। নলমল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে এই দৈত্য দুর্গাদেবীর জিহ্বা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে (দ্বাত্রিংশ ও ত্রয়োত্রিংশ সর্গ)। এই দৈত্যের আকৃতি সম্বন্ধে ত্রয়োত্রিংশ সর্গে বলা হইয়াছে যে তাহার তিনটি মস্তক আছে; দক্ষিণ মস্তকটি গরুড়ের মত, বামপার্শ্বস্থ মস্তকটি হস্তীর মত এবং মধ্যের মস্তকটি ক্রুদ্ধ সিংহের অনুরূপ। কাম এবং রতির অন্তর্ধানের পর, অর্জুন পুড়ক পুষ্পের পত্রে অপ্সরাগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্গীত লিখিত দেখিলেন। অতঃপর নলমল একদল পিশাচসৈন্য লইয়া অর্জুনকে আক্রমন করিলেন। তাহাদের যুদ্ধের বিবরণ পরবর্তী তিনটি সর্গে বিবৃত হইয়াছে (৩৪-৩৬)। অর্জুন অতঃপর সমাধিমগ্ন হইলে দৈত্যবীর পাণ্ডবগণের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া সেইস্থল পরিত্যাগ করিল (৩৬ সর্গ)। পরবর্তী সর্গে একটি বনভূমের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। অর্জুন একটি নদী দেখিয়া সেখানে স্নান করিলেন; অতঃপর তিনি বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া মাতা, ভ্রাতা এবং অন্যান্য সকলের জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অষ্টত্রিংশ সর্গে কবি ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত অর্জুনের অসহায় অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। অর্জুন অতঃপর কিছু ফলমূল আহরণ করিয়া ভক্ষণ করিলেন এবং পুনরায় যাত্রারম্ভ করিলেন। উনচত্বারিংশ সর্গে অর্জুন এবং শ্রী দ্বৈপায়নের সাক্ষাৎকার বর্ণনা করা হইয়াছে। ইঙ্গিতামৃতপদের অধিবাসী এই পূতচরিত্র ঋষি অর্জুনকে দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। অর্জুন অতীত কাহিনী এবং বিদুর ও দোম্যের উপদেশের কথা ঋষির নিকট ব্যক্ত করিলেন। ঋষি অর্জুনকে যে উপদেশ দিলেন তাহা চত্বারিংশ হইতে ত্রিচত্বারিংশ সর্গে বিবৃত হইয়াছে। তিনি বলিলেন যে কৌরবগণের দুষ্ট দানবকুল হইতে উৎপত্তি হইয়াছে এবং যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিতে হইবে। ঋষি দ্বিচত্বারিংশ সর্গে বলিয়াছেন যে নৈতত্ত্ববাদের মাধ্যমে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারা যায়। তিনি অর্জুনকে ইন্দ্রকিল পর্বতে গমন করিয়া প্রতিমাসে ব্রত

পরিবর্তন করতঃ মহাদেবকে উপাসনা করিয়া সন্তুষ্ট করিতে উপদেশ দিলেন (৪৩ সর্গ)। অন্তিম সর্গে অর্জুনের পর্বতে পৌছিয়া দীর্ঘ এক বৎসরকাল তপস্যা করার কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। অতঃপর মহাদেব কিরাতের ছদ্মবেশে উপস্থিত হইলেন এবং অর্জুনকে দিব্যঅস্ত্র প্রদান করিয়া স্ববেশে অন্তর্হিত হইলেন।

কাব্যখানিতে তান্ত্রিক শৈবধর্মের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থখানি মুখ্যতঃ সংস্কৃত মহাভারতকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থে এমন কতকগুলি কাহিনী বিবৃত হইয়াছে যাহার মূল-উৎস দ্বীপময় ভারতের লোকসাহিত্য বা কবিকল্পনা। যে বালিকাটি মহাঘনির আশ্রমে অর্জুনের প্রেমে পড়িয়া গিয়াছিলেন তাহাকে সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। সংস্কৃত মহাভারতে আমরা অর্জুনকে যে উচ্চগ্রামে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই তাহার তুলনায় পার্থযজ্ঞের অর্জুন অনেকটা নিষ্প্রভ। এইরূপ বিশেষত্ব যবদ্বীপীয় কবির মৌলিকতার নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা গেলেও আমরা বলিব যে পূর্ববর্ণিত কাব্যটির মত এই গ্রন্থখানিও মহাভারতের অনুপ্রেরণায় রচিত হইয়াছে। কবির প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা আমাদিগকে অনেক সময় ভবভূতির রচনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয় বটে, কিন্তু এইরূপ দৃশ্য বর্ণনা যে অনাবশ্যকভাবে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ম্পু বিত্যাত্মকও একটি পার্থযজ্ঞ নামক কাব্যের রচয়িতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। উইন্টার[৩৫] ঐ নামের একখানি কাকাবিনের উল্লেখ করিয়াছেন; তাহাতে অর্জুন এবং সুম্বদ্রের (সুভদ্রার) পরিণয়বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে ইহা কেদিরির রাজা জয়ভয়ে রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। আমরা উপরে যে গ্রন্থখানির বর্ণনা করিলাম তাহা সম্ভবত মধ্যযুগের পররতন নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। এই কাব্যখানির বিষয়বস্তু চণ্ডি জাগো মন্দিরগাত্রেও অঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং এই কাব্যের রচনাকাল আনুমানিক ১২৫০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই তারিখ ভুল হইলেও তাহা পঞ্চাশ বৎসরের বেশী হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

এখন আমরা ইন্দ্রবিজয় নামক[৩৬] একখানি কাব্যের বিষয় বর্ণনা করিব। ইহার বিষয়বস্তু মহাভারতের উদ্যোগপর্ব হইতে গৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতেও এই কাহিনীটির নাম ইন্দ্রবিজয় এবং উহা ২২৮ হইতে ৫৬৫ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। কাব্যখানির প্রারম্ভেই একদল সুরবধূ বা অপ্সরার বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। ইন্দ্র ত্বষ্টরতনয় ত্রিশিরাঃ নামক তপস্বীর তপোভঙ্গ করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তিনবার বিফল মনোরথ হইয়া বিশ্বকর্মাকে ইহার প্রতিবিধান করিতে বলিলেন। প্রাচীন যবদ্বীপীয় মহাভারতে বিশ্বকর্মার নামের স্থলে তক্ষের নাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ত্রিশিরাকে হত্যা করিলে তাঁহার পিতা বৃত্রকে সৃষ্টি করিলেন এবং ইন্দ্রকে নিহত করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ দিলেন। ইন্দ্র বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বৃত্রকে অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করা হইল। এই পাপের জন্য ইন্দ্রকে স্বর্গের সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে হইল। এইরূপে স্বর্গের সিংহাসন শূন্য হইলে নহুষকে স্বর্গরাজ্য শাসন করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইল। নহুষের লোভ

স্বর্গের রাজদণ্ড লাভ করিয়াই নিবৃত্তি লাভ করিল না। নহুষ ইন্দ্রের রাণী শচীকে করায়ত্ত করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। সন্ত্রস্তা রাণী বৃহস্পতির শরণাপন্ন হইলে বৃহস্পতি তাঁহাকে স্বর্গের নূতন শাসকের নিকট সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। রাত্রি-নাম্নী একজন সহচরী শচীকে ইন্দ্রের নিদ্রা যাইবার কক্ষে লইয়া গেলেন। ইন্দ্র বলিলেন যে যদি নহুষ ঋষিগণকে তাঁহার বাহন করেন তাহা হইলে এই সমস্ত পুতচরিত্র ঋষিগণের অসন্তুষ্টিতে তাঁহার পতন হইবে। বাস্তবিক তাহাই হইল। অগস্ত্যের অভিশাপে নহুষ স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইলেন এবং ইন্দ্র পুনরায় স্বর্গাধিপতি হইলেন।

কিডুঙ্ ভীমস্বর্গ[৩৭] প্রাচীন যবদ্বীপীয় মহাভারতের আদি এবং প্রস্থানিক পর্বের কোন কোন কাহিনীর সংমিশ্রণে রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থটি বলিদ্বীপে খুব জনপ্রিয় এবং ইহার মালয় ভাষায় রচিত গদ্য সংস্করণ আছে[৩৮]। ডঃ যুইনবল বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থের ৪১৩২ সংখ্যক পুঁথি যবদ্বীপীয় এবং বলিদ্বীপীয় ভাষার সংমিশ্রণে রচিত হইয়াছে। এই কাব্যগ্রন্থের প্রারম্ভে লেখা আছে "বগবন কিদম মঙ্‌কে মুবঃ অমেঙ্গ-অমেঙ্গন্ মরিঙ্ বনান্তর, সির ঙেলোর্, তনড়োয় কৎমু পুনঙ্ কেনস ইস্ত্রি লিসত্ব অয়ু রূপনে--"

উপরোক্ত কিদম শব্দটি সংস্কৃত কিন্দম শব্দের বিকৃতি। কিন্দম একদা হরিণের বেশে রতিক্রিয়া করিবার সময় পাণ্ডুর শরাঘাতে নিহত হন। মৃত্যুকালে ঋষি কিন্দম পাণ্ডুকে নরকে যাইবার অভিসম্পাত প্রদান করেন। এই পাণ্ডু-কিন্দম কাহিনীটি মহাভারতের সংস্কৃত[৩৯] এবং প্রাচীন যবদ্বীপীয় সংস্করণে[৪০] বর্ণিত হইয়াছে। ডঃ যুইনবল বলিয়াছেন[৪১] যে এস্থলে পাণ্ডুর মৃত্যু যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহা আদিপর্বের অনুরূপ বর্ণনার সহিত মূলতঃ মিলিয়া যায়। সুতরাং আদিপর্বের এই অংশটি সংশ্লিষ্ট কাব্যাংশের উৎস ছিল মনে করা অস্বাভাবিক নহে।

পাণ্ডুর বিধবা স্ত্রী কুন্তী দেবী তাহার স্বামীকে কবহ্ বা নরক হইতে উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য পঞ্চ পুত্রকে আদেশ করিলেন। ভীম তাঁহার মাতা এবং ভ্রাতৃগণকে বহন করিয়া লইয়া চলিলেন; সঙ্গে চলিল দেলেম, তুবলেন এবং সঙ্গুত্ নামধারী বয়স্যগণ। এই বয়স্যগণ যবদ্বীপীয় সেমর এবং তাহার দুই পুত্রের সমপর্যায়ভুক্ত। ভীম যাত্রাপথে চিকরবল[৪২], গোর বিক্রম, উৎপত, জোগোরমনিক, সুরন্থ, দোর কালগণ এবং নরকের কুকুর অসু-গাপলোঙের সহিত সংগ্রাম করিলেন। অবশেষে ভীম নরক হইতে পাণ্ডুর আত্মাকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন।

দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে যঙ্ প্রমেষ্টির কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তিনি পাণ্ডবগণকে স্বর্গে আসিতে আমন্ত্রণ করিলেন। অতঃপর দেবগণ তাহাদিগকে নিহত করিলেন। অর্জুনকে নিহত করিলেন বিষ্ণু, নকুল এবং সহদেবকে নিহত করিলেন মহশ্নো (মহাশ্বিনৌ পড়িতে হইবে)। ডঃ যুইনবল[৪৩] অনুমান করেন যে ভীমস্বর্গের এই অংশটুকু প্রস্থানিকপর্ব—বিশেষতঃ উহার বিকৃত অংশটুকু হইতে গৃহীত হইয়াছে। অন্যদিকে আবার ভীমস্বর্গের প্রথম সর্গের কিছু অংশ প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় লিখিত প্রস্থানিক পর্বের কোন কোন হস্তলিখিত পুঁথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে[৪৪]। তৃতীয় সর্গে বলা হইয়াছে ধর্মবংশ (=যুধিষ্ঠির) কিরূপে নরকে গমন করিলেন

এবং কিরূপে তিনি তাঁহার ছোট ভ্রাতা ভীম কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হইলেন। শেষ সর্গে ভীমের সহিত বুতপতিহ্ (=ভূতপতি) বন্দযুতের সংগ্রাম বর্ণনা করা হইয়াছে, কারণ বন্দযুত ভীমের পনকবন তুবলেনকে গ্রাস করিয়াছিলেন। ভান দের তুক বলেন যে এই কাব্যগ্রন্থের সমস্ত চরিত্রই ওয়েয়াঙ্-রূপে রূপায়িত হইয়াছে।

আত্মাকে যে পরলোক হইতে পুনরাহ্বান করা যাইতে পারে তাহার ইঙ্গিত ইন্দো-জাভানীজ সাহিত্যের কোন কোন স্থলে পাওয়া যাইতে পারে। আমরা পূর্বেই কুঞ্জরকর্ণের কাহিনী এবং উহার নৈতিক মূল্যায়ন আলোচনা করিয়াছি। বলিদ্বীপীয় মেগন্তক-গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে কিরূপে মৃত রাজকুমারী হম্বর সরির আত্মা সুপ্রভা এবং তিলোত্তমা নামক দুইজন অপ্সরা কর্তৃক স্বর্গ হইতে পুনরায় আনীত হইয়াছিল[৪৫]। প্রাচীন বেবিলনিয়ার গিলগমেশের মহাকাব্যের মত আমাদের দেশেও এইরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে, যেমন সাবিত্রী ও সত্যবানের কাহিনী, বেহুলা ও লক্ষীন্দরের কাহিনী ইত্যাদি। আত্মার এইরূপ পরিক্রমনের ধারণা ভারতে সৃষ্টি হইয়াছে অথবা ইহা অষ্ট্রো-এসিয়াটিক কিংবা অপর কোন সভ্যতার দান তাহা নিঃসংশয়ে বলা কষ্টসাধ্য।

কোরবাশ্রম[৪৬] গ্রন্থখানি গদ্যে রচিত; ইহা মহাভারতের শেষাংশ অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে ভগবান ব্যাসের উচ্চমহিমা কীর্তিত হইয়াছে; ব্যাসদেব স্বরসতি পুরণ (=সরস্বতী পুরাণ) বিবৃত করিলেন। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে দৃতরষ্ট্র (=ধৃতরাষ্ট্র) একশত কৌরবের মৃত্যুতে অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছিলেন। সুতরাং ব্যাসদেব সুমন্ত, পেলব, জেমিলি এবং বেবসম্পয়ন প্রমুখ শিষ্যগণ সহ রণক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। সেইস্থলে তাহাদের ভগবান নারদের সহিত সাক্ষাৎলাভ ঘটিল; ভগবান বৃহস্পতি কৌরবগণকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য নারদকে পাঠাইয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনকারী দল ভিষ্ম, দ্রোণ, শল্য, দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি, জয়দ্রথ, ভগদত এবং দুশসনের মৃতদেহ দর্শন করিলেন। তাঁহাদিগকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য তির্থ-কমণ্ডলু তাহাদের দেহে ছিটাইয়া দেওয়া হইল। যে-সমস্ত দেবতা হইতে তাঁহাদের উৎপত্তি, তাঁহারা এই বীরগণের পুনর্জীবন গ্রহণকালে উপস্থিত হইলেন। তীর্থ অমৃতের স্পর্শে সমগ্র সৈন্যবাহিনীও পুনর্জীবন লাভ করিল। এই সময় একটি দৈববাণী শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম পাণ্ডবগণের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার মানসে কৌরবগণকে তপস্যায় ব্রতী হইতে বলিলেন। এই নির্দেশানুযায়ী তাহারা ইন্দ্রগিরিতে উপনীত হইল। সেইস্থলে ভগবান বিশ্বকর্ম ভটার চতুর্ভুজের দরবার-কক্ষ নির্মানের জন্য কাষ্ঠছেদনে ব্যাপৃত ছিলেন। ইত্যবসরে ভগবান ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিবার জন্য পাণ্ডবগণকে আদেশ দিলেন এবং তিনি স্বয়ং তপস্যা করিবার জন্য চারিজন শিষ্য সমভিব্যাহারে চলিয়া গেলেন। ভিম আপত্তি করিলেও পাণ্ডবগণ ধৃতরষ্ট্র এবং গন্দরীকে বিপুলভাবে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। ধৃতরষ্ট্র তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ধর্মবংশ বা যুধিষ্টিরের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিলেন। ধর্মবংশ বলিলেন যে তাঁহার এই জ্ঞান প্রমেশ্বর (=পরমেশ্বর) বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহাদেব, ধর্মরজ প্রভৃতির নিকট হইতে অর্জিত হইয়াছে। ধৃতরষ্ট্র বলিলেন যে তিনি ত্রিপুরুষ এবং ত্রি-সংখ্যার দার্শনিকতত্ব অবগত

হইতে চান এবং পৃথিবীর রহস্যের সমাধান জ্ঞাত হইতে চান। অতঃপর তিনি বন্যার কারণ এবং দেব ও মানব কর্তৃক বন্দিত মহামেরুর উৎপত্তির ইতিহাস জানিতে চাহিলেন। ধর্মবংশ বলিলেন যে মহামেরু মণিক অষ্টগিন ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইহার উৎসস্থলে অমৃত আছে এবং ইহা কুর্মরজের[৭৭] পৃষ্ঠে অবস্থিত। ইহা নন্তবোগও (অনন্তভোগ) রক্ষা করিতেছেন; নন্তবোগের দেহ স্বর্ণাবৃত এবং উপরের অংশ মণিমাণিক্যে সমুজ্জ্বল। ধর্মবংশ অতঃপর বিবৃত করিলেন কিরূপে এই মহামেরু বা সম্পোর যবদ্বীপে আনীত হইয়াছিল। গ্রন্থকার অতঃপর বর্ণনা করিলেন কিরূপে অর্জুন ঋষবহু (অর্জুনসহস্রবাহু?) এবং ভগবান ভৃগুর হত্যাকাণ্ড হইতেই পৃথিবীতে হত্যার সৃষ্টি হইল। ধৃতরষ্ট্র অতঃপর তপস্যার নিয়মাবলী জানিতে চাহিলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যোগ এবং বিভিন্ন আসন সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। তিনি অষ্টগ, দান এবং যজ্ঞ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিলেন এবং বলিলেন যে যজ্ঞ বিভিন্ন প্রকারের আছে, যথা দেবযজ্ঞ, ঋষি°, ভুত°, মনুষ°, পিতৃ°, অশ্ববেদ° (=অশ্বমেধ) এবং ইশ্বজিৎ যজ্ঞ। ধৃতরষ্ট্র অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন যে ব্রহ্মার মস্তক কেহ কেহ চারিটি এবং কেহ কেহ পাঁচটি বলিয়া কেন বর্ণনা করিয়াছেন। ধর্মবংশ বলিলেন যে ব্রহ্মার পূর্বে পাঁচটি মস্তক ছিল এবং উহা শীর্ণতর হইতে হইতে চারিটিতে রূপান্তরিত হয়। ধৃতরষ্ট্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে যদিও ব্রহ্মার বাস্তবিক-পক্ষে পাঁচটি মস্তক আছে তবু তাঁহাকে চতুর্মুখ বলা হয় কেন। হুম (=উমা) কিরূপে একটি রাখাল-বালকের আলিঙ্গনে দুর্গ (=দুর্গা)-রূপে পরিণত হইলেন তাহাই গ্রন্থকার অতঃপর বর্ণনা করিয়াছেন।

এইরূপে শিক্ষালাভ সমাপ্ত হইলে ধৃতরষ্ট্র এবং দেবী গন্দরী শতশৃঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রুপ তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। অতঃপর তাঁহারা ভগবান রামপরশু এবং তাঁহার শিষ্য কত্রবনের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। মেনকগিরি হইতে সংগৃহীত খাদ্যাদিতে তাঁহাদের পরিতৃপ্ত করা হইল। ধৃতরষ্ট্র রামপরশুকে বলিলেন যে তাঁহারা পাণ্ডুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন। ধৃতরষ্ট্র অতঃপর অলঙ্কারপত্র ঋষিগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া বল্কল পরিধান করিলেন এবং শতশৃঙ্গের ব্যাঘ্র-গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ইত্যবসরে দেবব্রত এবং কোরবগণ মহেন্দ্রগিরিতে উপনীত হইলেন। রামপরশু তাঁহা-দিগকে আতিথ্যসৎকার করিলেন এবং তাঁহারা রামপরশুর নিকট তপস্যা করিবার শ্রেষ্ঠস্থল ও ধর্মসম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। এদিকে ভিস্ম, দ্রোণ এবং শল্য তাঁহাদের অলঙ্কারাদি বিতরণ করিয়া বল্কল পরিধান করিলেন এবং গণ্ডমদনে (=গন্ধমাদন) চলিয়া গেলেন। ভারত-যুদ্ধের অন্যান্য বীরগণের মধ্যে দ্রিযোদন (দুর্যোধন), শকুনি, কর্ণ, দুর্শসন (দুঃশাসন) এবং ভগদতো (°দত্ত) রামপরশুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিলেন। রামপরশু বলিলেন যে ইন্দ্র কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বিষ্ণু কয়েকজন দানবকে দমন করিলেন; বিষ্ণু দৈত্যবীর মলি এবং হেমলিকে চক্রদ্বারা নিহত করিলেন, কিন্তু সুমলি ভরুণের (=বরুণ) নিকট পলায়ন করিলেন। গ্রন্থকার অতঃপর বলিলেন যে বিষ্ণু এবং শ্রীর সৌন্দর্যের প্রতিফলনে দেবগণও কান্তিময় হইয়া উঠেন। ভটার গুরু শ্রীর সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া কাল-রূপ পরিগ্রহণ করিলেন। অতঃপর

শ্রী মর্ত্যে পলায়ন করিয়া বণিকগণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুর্যোধন তাহার পর তপস্যা করিবার শ্রেষ্ঠ স্থল কোথায় সেই সম্বন্ধে পরামর্শ যাজ্ঞা করিলেন, কারণ ভটার ব্রহ্ম তাহাকে পাণ্ডবগণের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। কর্ণও হোঙ্কর (ওঙ্কার) সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে চাহিলেন। উত্তরে রামপরশু পঞ্চ, সপ্ত এবং অন্তকহঙ্কর মন্ত্রের কথা বিবৃত করিলেন। মানুষ কেন পশুকে সম্মান প্রদর্শন করে, দ্বীপগুলির সংখ্যা এবং সমুদ্রের গভীরত্ব কত—এইরূপ কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ণ, দুর্যোধন, ভগদত, শকুনি এবং দুর্শন তপস্যা করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। অবশেষে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলে দুর্যোধন পাণ্ডবগণকে নিহত করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন যে তাঁহাদিগকে নিহত করা যাইবে না, কিন্তু তাঁহারা চণ্ডালগণ কর্তৃক অপমানিত হইবেন। দুশসন শিবের নিকট হইতেও একই উত্তর পাইলেন; শিব এখানে ত্রিনেত্র এবং চতুর্ভুজধারীরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। বিভিন্ন লোক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে অদিত্য (যিনি পরে আসিয়াছিলেন) বলিলেন যে উহাদের নাম জনলোক, নরকলোক, দব্যলোক, ভুংলোক, সম্বর্গলোক, বিষ্ণুলোক এবং শূন্যলোক। পাতালের বিভিন্ন জগত সম্বন্ধে আদিত্য বলিলেন যে উহাদের নাম রষতল, মহিতল এবং শূতল। গ্রন্থখানি যেন ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ এবং আদিপর্বের মত অকস্মাৎ পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

উপরে গ্রন্থখানির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল, তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইবে যে গ্রন্থখানির মূল ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা নাই; ইহা বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে গ্রথিত হইয়া এক বিচিত্ররূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। ইহার রচনায় ভারতীয় মহাকাব্য এবং প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যের cosmogonical section বা জগৎ সৃষ্টি কাহিনীর অবদান আছে। আদিপুরাণ এবং তন্তুপঙ্গেলরণ হইতে তীর্থ কমণ্ডলু এবং অমৃতের আখ্যায়িকা সংযোজিত হইয়াছে। কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের নায়কগণ নূতন রূপে চিত্রিত হইয়াছেন। শ্রীর সৌন্দর্যের খ্যাতি কেবলমাত্র যে সেরৎকাণ্ডের রহ্‌বনকে (রাবণ) মোহিত করিয়াছিল তাহা নহে, উহা মনিকমায়ার কোন কোন নায়ককেও বিমুগ্ধ করিয়াছিল। হরিশ্রয়ের আখ্যায়িকাটিও এখানে বিবৃত হইয়াছে, যদিও কোন কোন নাম বিকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মার মস্তকের সংখ্যা সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলি এই গ্রন্থে এবং তন্তুপঙ্গেলরণ গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে কয়েকজন নূতন দেবতারও সন্দর্শন লাভ ঘটে। ইহাতে মহাভারতের পর্বগুলির একটি তালিকা আছে, কিন্তু ইহা বিভ্রান্তিজনক; কারণ এই তালিকায় কেবলমাত্র যে অগস্ত্যপর্বের নাম আছে তাহা নহে, উত্তরখণ্ডেরও নাম আছে। কয়েকটি ক্রম-রূপ এবং আশ্চর্যবোধক চিহ্ন কোরবাশ্রম এবং কুঞ্জরকুঞ্জে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থগুলি চতুর্দশ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন, কিন্তু এই অভিমতের বিপদ সম্বন্ধেও অবহিত থাকা প্রয়োজন; কারণ তন্তুপঙ্গেলরণের সহিত কোরবাশ্রমের ভাষার দিক দিয়া অনেকটা মিল থাকিলেও কুঞ্জরকর্ণের সহিত ভাষা ও রচনারীতির মিল অনেকটা কম। সোয়েলেনগ্রেবেল বলিয়াছেন যে মধ্য যবদ্বীপীয় গ্রন্থ নবরুচিও রচনারীতি এবং বিষয়বস্তুর দিক দিয়া কোরবাশ্রমের সহিত অনেকটা সম্পর্কিত, কিন্তু ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া উহা কোরবাশ্রম হইতে অনেকটা পৃথক, যদিও এই

বিষয়ে নবরুচির সহিত তন্তুপঙ্গেলরণ এবং কুঞ্জরকর্ণের কিছুটা মিল পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এই গ্রন্থের তারিখ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা না গেলেও ইহাকে নিঃসন্দেহে প্রাচীন যবদ্বীপীয় গ্রন্থ বলিয়া আখ্যাত করা যায়[৪৭ক]।

গ্রন্থের মধ্যে কোথাও কোথাও শ্লোক পাইতেছি। লেখক এইস্থলে শব্দের শেষে অম্ (বিকৃত এম্ বা এঙ্গ্) ব্যবহার করিয়া সংস্কৃত শ্লোকের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। ইহা বিশেষভাবে ঘটিয়াছে যখন দেবতা বা পবিত্রস্থানকে উপলক্ষ্য করিয়া মন্ত্র বা প্রশস্তি উচ্চারণ করা হইয়াছে। শ্লোক মধ্যে প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার প্রাদুর্ভাব; চ, এবঞ্চ, চম্ প্রভৃতির বাহুল্য; সংস্কৃত ক্রিয়া শব্দের অসদ্ভাব; শ্লোকের সহিত তথাকথিত অনুবাদের শিথিল সম্পর্ক দেখিয়া মনে হয় যে এইপ্রকার মিশ্র-শ্লোকাবলী দ্বীপময় ভারতের অবদান[৪৮]। গ্রন্থের শেষে লেখা আছে: ইতি কোরবশ্রামা পরিসমাপ্ত ইত্যাদি। এই গ্রন্থখানির একখানি কিদুঙ্-সংস্করণও আছে[৪৯]।

প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত আর একখানি কাব্যের নাম কৃষ্ণান্তক। ইহা মহাভারতের শেষের দিকের পর্বগুলিকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। ডঃ ভান দের তুক[৫০] বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থখানি মহাভারতের শেষ চারি পর্ব অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। ডঃ যুইনবল[৫১] এই মন্তব্যে আপত্তি করিয়াছেন, কারণ কৃষ্ণান্তক কাব্যে স্বর্গারোহণ পর্ব ব্যবহৃত হয় নাই। এই কাব্যের প্রথম চারি সর্গ[৫২] আশ্রমবাসপর্ব অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে; পরবর্তী বিংশ-সংখ্যক সর্গের প্রধান উৎসস্থল হইল মোসলপর্ব। পঞ্চবিংশ সর্গ হইতে চতুস্ত্রিংশ সর্গ পর্যন্ত প্রস্থানিক পর্ব ব্যবহার করা হইয়াছে। চতুস্ত্রিংশ সর্গের দশম শ্লোকে কবি তাঁহার কাব্যের উৎসভূমি উল্লেখ করিয়াছেন; এইস্থলে গ্রন্থের নামটিও উল্লিখিত হইয়াছে। এই কাব্যের একটি গদ্য সংস্করণও আছে। কাব্যখানিতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা মহাভারতের প্রাচীন যবদ্বীপীয় গদ্য সংস্করণের অনুরূপ বর্ণনা হইতে অধিকতর ব্যাপক।

মধ্য যুগের যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত একখানি গ্রন্থ আছে যাহা আমরা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে পারি। গ্রন্থখানির নাম নবরুচি; ইহা বিমসুচি বা দেবরুচি নামেও পরিচিত[৫৩]। এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করা যায়[৫৪]:

"দোচ্ ব্রেকোদর পুরুইত রিঙ্গ ডঙ্গেঙ্গঙ্গ্ দ্রুণ কিনোন অঙ্গুপয় তোয়নিঙ্গ্ কঙ্গ্ শুচিককে মরিঙ্গ্ সরিরনিপুন" অর্থাৎ বৃকোদর বা ভীম হইলেন দ্রোণের ছাত্র; দ্রোণ তাঁহার দেহ পবিত্রীকরণের জন্য ভীমকে (পুণ্য) বারি আনিতে পাঠাইলেন।

গল্পটি এইরূপ: দ্রোণ ভীমকে চোন্দ্রমুক (চন্দ্রমুখ?) পবত হইতে "অমৃতাঞ্জীবনী" আনিতে বলিলেন। সেখানে তিনি দৈত্যগণের সহিত সংগ্রাম করিলেন এবং অবশেষে দুইজন বুতকে (=ভূত) নিহত করিলেন; ভূতদ্বয়ের নাম হইল সঙ্গ্ রুক্ম এবং সঙ্গ্ রুক্মল। অতঃপর ভীম পর্বত উল্টাইয়া পবিত্র বারি আবিষ্কার করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি পবিত্র বারি সেইস্থলে পাইলেন না। ইন্দ্রবজ্রুর কণ্ঠধ্বনি তাঁহাকে জানাইয়া দিল যে তিনি ভুলপথে চলিয়াছেন; সুতরাং ভীম যেন আবার হস্তিনা (হস্তিনা) যাইয়া সেই পবিত্র বারি কোথায়

পাওয়া যাইবে তাহার সঠিক নির্দেশ গ্রহণ করেন। তিনি সেই উপদেশানুযায়ী দ্রোণের নিকট ফিরিয়া গেলে দ্রোণ তাঁহাকে বলিলেন যে ঐ পবিত্র বারি সমুদ্রের গভীর তলদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানেও ভীম সেই পবিত্র বারি পাইলেন না। ১৮০৪ সংখ্যক পুঁথিতে এই পবিত্র বারির নাম দেওয়া হইয়াছে তির্ত প্রবিতয় বা তোয় মর্জ। ভীম সমুদ্রতলে পবিত্র বারির পরিবর্তে দেখিলেন অসংখ্য দানবাকৃতি জীব এবং বিরাট বিরাট সর্প। এদিকে ভীমের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে পাণ্ডবগণ চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু কৌরবগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। সমুদ্রের গভীর তলদেশে লক্ষ্যহীনভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে ভীম একজন দার্শনিকের সাক্ষাৎ পাইলেন ; তাঁহার নামই দেবরুচি। য়ুইনবলের ক্যাটালগের ৪৩৪২ সংখ্যক পুঁথিতে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে নবরুচি। দেবরুচি জ্ঞাপন করিলেন যে তিনি ভটার গুরু বা শিবের অতীব প্রিয়পাত্র। তিনি ভীমকে আরো বলিলেন যে ভীম যে পবিত্র বারির অনুসন্ধান করিতেছেন তাহা গুবগর্বে পাওয়া যাইতে পারে। ডঃ ভান দের তুক[৫৫] বলিয়াছেন যে ভীম এই কঠিন কার্যোদ্ধার করিতে যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন কিন্তু ভগবান নবরুচি বা বিমস্থচি তাঁহাকে পুনর্জীবন দান করিলেন।

এই কাব্যের ৪২৫৮ সংখ্যক পুঁথির অন্তে কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোকাংশে গণেশ এবং সরস্বতীর বন্দনা করা হইয়াছে।

এইবার আমরা সঙ্ সত্যবান[৫৬] নামক একখানি প্রাচীন যবদ্বীপীয় গ্রন্থের আলোচনা করিব। এই গ্রন্থে মহাভারতের বিখ্যাত সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীটি পরিবেশিত হইয়াছে। এই কাহিনী অনুযায়ী ভগবান সত্যবান মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিয়া স্থবিস্ত্রিকে (সাবিত্রী) বিবাহ করিলেন। স্থবিস্ত্রি ছিলেন যযাতি এবং দেবযানির কন্যা। গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে সত্যবান একদা মৃতের ভান করিলে স্থবিস্ত্রি আত্মহত্যা করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পুনর্জীবন দান করা হইল। অতঃপর সত্যবান একটি আশ্রমে গমন করিলেন, স্থবিস্ত্রিও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। পথে চলিবার সময় সত্যবান মহাসর্প এবং ব্যাঘ্রের মূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে সন্ত্রস্তা করিয়া তুলিলেন এবং ঝড়ঝঞ্জার সৃষ্টি করিলেন। অবশেষে স্থবিস্ত্রি আশ্রমে পৌছিয়া তাহার স্বামীর সাক্ষাৎ পাইলেন। ডঃ য়ুইনবল যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিবেশন করিয়াছেন তাহাতে মনে হইবে যে সংস্কৃত কাহিনীটির সহিত ইহার সংযোগ একান্তই ক্ষীণ এবং সম্ভবতঃ ইহাতে ওয়েয়াঙ্ প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

এই গ্রন্থখানির আলোচনান্তেই আমরা মহাভারতাশ্রয়ী গ্রন্থালোচনার উপর যবনিকা টানিয়া দিব। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত মহাভারত যবদ্বীপীয় লেখকগণের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তথ্য এবং কাহিনীর ঐশ্বর্যে মহাভারত সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ ; সুতরাং ইহা যে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় বিপুল গণ-সম্বর্ধনা লাভ করিয়াছে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। বস্তুতঃ মহাভারত, রামায়ণ, ভারতযুদ্ধ এবং ভোমকাব্য এত জনপ্রিয় হইয়াছিল যে এই সকল গ্রন্থের কোন কোন চরিত্রকে প্রস্তুতি নিঙ্ কাকাবিন[৫৭] এবং ওয়েওয়াজান[৫৮] নামক গ্রন্থে allegorically উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর পর হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত দ্বীপময় ভারতের সাহিত্য সাধনায় এইরূপ প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস পরিদৃষ্ট হয় নাই। মধ্য যুগের সাহিত্যের কৃত্রিমতা গভীরতর হইতে থাকে এবং প্রাচীন যুগের রচনাবলীকে অনুবাদ করিয়াই মধ্যযুগীয় সাহিত্য অনেকটা সার্থকতা লাভের প্রয়াস করিতে থাকে। যদিও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যশ দি পুরদের সময় সাহিত্যিক প্রাণচাঞ্চল্য কিছুটা পরিলক্ষিত হয়, তবুও উহা ব্যাপকতা, গভীরতা এবং চরিতার্থতার দিক দিয়া প্রাচীন যুগের সাহিত্যের সমমর্যাদা লাভ করিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে যবদ্বীপ সাহিত্যের পাঁচ শতাব্দী (আনুমানিক ৯০০-১৪০০ খৃষ্টাব্দ) যেন একটি যুগের সৃষ্টি করিয়াছে; দ্বীপময় ভারতের ইতিহাসে ইহার সহিত পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী যুগের লক্ষ্যণীয় বিভিন্নতা রহিয়া গিয়াছে। ইন্দো-যবদ্বীপীয় সাহিত্যের এই ক্লাসিক্যাল যুগকে রোমের ইতিহাসের অগাষ্টান যুগ এবং গ্রীসের ইতিহাসের পোরিক্লিয়ান যুগের সহিত সচ্ছন্দে তুলনা করা যায়। এই দুইটির মধ্যে আবার অগাষ্টান যুগের সহিতই ইহার যেন বেশী সমধর্মিতা বিদ্যমান; কারণ এই যুগের রোমান সাহিত্য যেমন গ্রীক চিন্তা এবং দর্শনের গভীর স্বাক্ষর বহন করিয়াছিল, সেইরূপ জাভা ও বলিদ্বীপের প্রাচীন সাহিত্যও অনেকাংশে ভারতীয় সাহিত্যের প্রতিচ্ছবি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

পা দ টী কা

১. Juynboll, *Supplement* I, pp. 152-54 ; Van der Tuuk, *KBNWdb* I, p. 90 ; *NBG*, 31, pp. 114-116.

২. *BKI*, 6th series VII, p. 105.

৩. Juynboll, *Supplement* I, p. 154.

৪. *Ibid*, pp. 160-61 ; Van der Tuuk, *KBNWdb*, I pp. 737-38.

৫. Tr. Tawney, vol. I, p. 108

৬. ইহারা অনুচর বা ভৃত্য শ্রেণীর লোক।

৭. Brandes, *Tjandi Djago* I, p. 42, f.n.

৮. Juynboll, *op. cit.*, pp. 149-50 ; *BKI*, 6th series VII (1900), pp. 102 ff. ; *TBG* 31, pp. 10-14 and Juynboll, *Cat. Mal. en Sund. Hss* (1899), pp. 50-51.

৯. *TBG* 57 p. 517.

১০. Krom, *Geschiedenis* p. 293.

১১. Van der Tuuk, *KBNWdb* II, p. 179 , Krom, *op. cit.*, p. 292.

১২. Juynboll, *Supplement* I, p. 180.

১৩. Krom, *op. cit.*, p. 296.

১৪. Friederich, *Voorloopig verslag*, etc., p. 18 ; *VBG* 23 (1850) ; *JA* 1858, pp. 274,

394 ; Raffles, *History of Java* I (1830) pp. 429 ff. ; Juynboll, *Supplement* I pp. 113 ff. ; Vreede, *Cat. Jav. Mad. Hss* (1892) p. 391 ; Brandes, *Beschr. der Jav. Bal. en Sas. Hss. Tuuk* I pp. 113 ff. , Karn, *Kawi-Studien* 1871 ; *BKI* 82 (1926) pp. 181-305.

১৫. ১৬।৬।

১৬. ১।১ ; ১৯।১০।

১৭. পঞ্চদশ সর্গ।

১৮. কবি বলিয়াছেন যে স্বর্গের সাত দিন মর্ত্যের সাত মাসের সমতুল্য।

১৯. Pigeaud, *De Tantu Panggělaran*, p. 321. The *Agastyaparva* has since been published by Gonda.

২০. *Tjandi Djago*, p. 98.

২১. ৩।৭।

২২. ৬।২।

২৩. ৫।৬।

২৪. ৮।১।

২৫. বের্গ এই শিবস্তোত্রগুলি সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য *BKI*, 90 pp. 173 ff.

২৬. *BKI* 82 (1926) p. 183.

২৭. *Ibid.*

২৮. আধুনিক যবদ্বীপীয় সংস্করণের জন্য দ্রষ্টব্য : J. F. C. Gericke's *Wiwoho of Mintorogo* in *VBG* XX ; W. Palmer van den Broek *Wiwoho Djarwo* (1868) ; Juynboll, *Supplement* II pp. 9-10.

২৯. ইহার অপর নাম চণ্ডী তুম্পঙ্ বা জজগু।

৩০. Krom, *Inleiding* II (1923) p. 55.

৩১. Juynboll, *Supplement* I pp. 265 ff.

৩২. *TBG* 58 (1919) pp. 361-79.

৩৩. *Ibid*, pp. 380-87 ; Juynboll, *Supplement* I p. 140.

৩৪. নামটিতে বৌদ্ধপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

৩৫. Vreede, *Cat. Jav. Mad. Hss.* I (1892) p. 227.

৩৬. Juynboll, *Supplement* I p. 137 ; Juynboll, *Drie Boeken* etc., pp. 19-20 ; Actes du 6e Congres des Oriental Section aryenne, pp. 81-121.

৩৭. Juynboll, *Supplement* I, pp. 267 ff. ; *JRAS*, new series, 13, pp. 51 ff. ; *Album-Kern*, pp. 73 ff.

৩৮. Juynboll, *Cat. Mal. Sund. Hss* (1899) pp. 56-58. Cod. 3377.

৩৯. মহাভারত, আদি, ১১৮,৪৫৮৫।

৪০. Juynboll, *Adiparwa*, p. 116.

৪১. *Album-Kern*, p. 73.

৪২. ভান দের তুক মনে করেন যে ইহা কিঙ্করবল-এর সমার্থক। ইহারা যমের অনুচর। দ্রষ্টব্য : *JRAS*, new series, 13, pp. 51 ff.

৪৩. Juynboll, *Supplement* I, p. 268 ; *Album-Kern*, p. 74.

৪৪. *Album-Kern*, p. 74.

৪৫. *VBG*, 38, pp. 392 ff.

৪৬. Pigeaud, *De Tantu Panggĕlaran*, 1924, pp. 330-37 ; Juynboll, *Supplement* II, p. 175, Cod. 4255 ; *BKI* 72 p. 401 ff. Ed. J. L. Swellengrebel, 1936.

৪৭. কূর্মরাজ। এখানে বিষ্ণুর কূর্ম-অবতারের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৪৭ক. Swellengrebel, *op. cit.*, *Inleiding*, p. 17.

৪৮. Vide Swellengrebel, *op. cit.*, pp. 14 ff.

৪৯. Juynboll, *Supplement* I, p. 235 ; Brandes, *Beschrijving Jav. Bal. Sas. Hss* II pp. 71-73.

৫০. *KBNWdb* II p. 90 ; *JRAS*, new series, 13, p. 49.

৫১. Juynboll, *op. cit.*, p. 155.

৫২. *BKI*, 6th series VI (1899) pp. 214-27.

৫৩. Juynboll, *Supplement* II, p. 292 ; Vreede, *Cat. Jav. Mad. Hss*, 1892 pp. 248-49 ; Johns, *The enlightenment of Bhīma* in *R. C. Majumdar Felicitation Volume.*

৫৪. Cod. 1804 (Vreede).

৫৫. *JRAS*, N. S., 13, pp. 53 ff.

৫৬. Juynboll, *Supplement* I, p. 270.

৫৭. Juynboll, *Supplement* II p. 286.

৫৮. *Ibid*, p. 265.

সপ্তদশ অধ্যায়

মহাকাব্য-সাহিত্য এবং ছায়ানাটকের কাহিনী

ওয়েয়াঙ্ শব্দটির অর্থ 'ছায়া'; এই শব্দটির মূল হইল 'য়াঙ্'; ইহার সহিত 'ওয়ে' উপসর্গটি যুক্ত হইয়াছে। বর্তমান যবদ্বীপীয় ভাষায় 'ওয়ে' উপসর্গটি নিষ্ক্রিয়; সুতরাং ডঃ হেজো অনুমান করিয়াছেন যে এই শব্দটি খুব প্রাচীন এবং ইহার উদ্ভব এমন সময়ে হইয়াছিল যখন উপরোক্ত উপসর্গটির কিঞ্চিৎ অর্থব্যঞ্জনা ও গৌরব ছিল[১]। এই শব্দটি সংস্কৃত ছায়ানাটকের সমভাবদ্যোতক, যদিও সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে ইহার কোন গৌরবজনক আসন নাই। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এই শ্রেণীর অন্ততঃ সাতখানি পুস্তক থাকিলেও ইহার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থটি হইল সুভটের দূতাঙ্গদ[২]; ইহার প্রস্তাবনা অনুযায়ী বোঝা যায় যে এই গ্রন্থখানি অনহিলবাড়ের চালুক্যরাজ ত্রিভুবনপাল দেবের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল (১২৪২-৪৩ খৃঃ অঃ)। পণ্ডিত প্রবর পিস্কেল[৩] ছায়ানাটকের সঠিক ব্যাখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন। মনে হয় যে সংস্কৃত ছায়া-নাটক ও যবদ্বীপীয় ওয়েয়াঙ্-পুর্ব সমগোত্রীয়; তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে প্রাচীন দ্বীপময় ভারতে আমরা বর্তমানে 'নাটক' বলিতে যাহা বুঝি তাহার অনুরূপ কিছু ছিল না, অন্ততঃ বর্তমান সাক্ষ্য প্রমাণদৃষ্টে তাহা মনে হয় না। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা জাভা এবং বলিদ্বীপের ওয়েয়াঙ্ সাহিত্যে সংস্কৃত মহাকাব্যের প্রভাব আলোচনা করিব।

যবদ্বীপীয় নাটকগুলিকে সাতটি শ্রেণীতে বিন্যাস করা যাইতে পারে: (১) ওয়েয়াঙ পুর্ব; ইহাতে চর্ম-নির্মিত পুতুলগুলির ছায়া একটি পর্দার উপর প্রতিবিম্বিত হয়; এই পর্দাকে কেলির বলা হয়। (২) ওয়েয়াঙ্-গেড়োগ্; ইহা repertoire-এর জন্য অন্যান্য শ্রেণী হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। (৩) ওয়েয়াঙ্ কেলিতিক্ বা করুচিল্; ইহাতে চ্যাপ্টা কাঠের পুতুল ব্যবহৃত হয়। (৪) ওয়েয়াঙ্ গোলেক; ইহাতে বসন পরিহিত গোল পুতুল দেখান হয়। (৫) তোপেঙ্; ইহা মুখোস পরিহিত ব্যক্তিরা দেখাইয়া থাকে। (৬) ওয়েয়াঙ্ বোঙ্; ইহাতে নটগণ মুখোস-পরা নয় এবং তাহারা নিজেরাই কথা বলিয়া থাকে। (৭) ওয়েয়াঙ্ বেবের; ইহাতে বিভিন্ন দৃশ্য চিত্রিত করিয়া পর পর প্রদর্শন করা হইয়া থাকে।

ওয়েয়াঙ্ পুর্ব লইয়া প্রথমে আলোচনা করা যাক; কারণ ইহাই সম্ভবতঃ পুর্বোল্লিখিত সাতটি শ্রেণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। পুর্ব শব্দটি সম্ভবতঃ মহাভারতের পর্ব শব্দটি হইতে গৃহীত হইয়াছে। মহাভারতের কাহিনীগুলির বিপুল ঐশ্বর্যের নিকট ওয়েয়াঙ্ সাহিত্য এমনভাবে

ঋণী যে ইহা সত্য হইলে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। ইহাতে কিম্ভূতকিমাকার দানবীয় মূর্তির প্রতিচ্ছায়া পর্দার উপর প্রতিফলিত হয়[৪] ; এই পর্দাগুলির সাধারণতঃ লালবর্ণের বর্ডার দেওয়া থাকে এবং উহা একটি কাঠের ফ্রেমে সন্নিবদ্ধ করা হয়। কাঠের এই ফ্রেমকে বলা হয় পঙ্গুঙ্। পর্দার পিছনে একটি পিত্তল নির্মিত দোদুল্যমান দীপাধার (brass-lamp) থাকে ; ইহার নাম ব্লেন্‌চোঙ্। ইহার নিম্নে ড়লঙ্ বসিয়া থাকেন ; তাঁহার কাজ সংস্কৃত নাটকের সূত্রধার অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। ড়লঙের নিকটে একটি লম্বা চতুষ্কোণ বাক্স থাকে, উহার নাম কোটক। কোটকে ওয়েয়াঙ্-নাট্যের সমস্ত উপকরণ থাকে, যেমন অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব ইত্যাদি। যখন ড়লঙ্ যুদ্ধধ্বনির অনুকরণে চীৎকার করেন, তখন তিনি তাঁহার বক্ষে দোদুল্যমান দুই-তিনটি ধাতুনির্মিত চাকৃতির (কেপ্রক, কেপ্যক, কেচ্‌রেক) উপর আঘাত করিয়া থাকেন। তিনি বামহস্তে একটি কাঠের হাতুরী বা শিঙা (তবুহ্ কেপ্রক্ বা চেম্পল) লইয়া পশ্চাতে উপবিষ্ট গায়ককে নির্দেশ দান করিয়া থাকেন। যখন পর্দায় ছায়াগুলি প্রতিফলিত হয়, তখন ড়লঙ্ ঐ ছায়াগুলি বা পুতুলগুলির মুখের কথা নিজে বলিয়া থাকেন। যেমন রাবণের ছায়া পর্দায় প্রতি-বিম্বিত হইলে ড়লঙ্ রাবণের মুখের কথাগুলি আবৃত্তি করিয়া থাকেন। প্রয়োজন মত ব্যাখ্যা ও স্লুক আবৃত্তিও করিয়া থাকেন। বাহ্যতঃ শেষোক্ত স্লুক-শব্দটি সংস্কৃত শ্লোকের বিকৃত রূপ বলিয়া মনে হয়। ডঃ ষ্টুটেরহেইম[৫] মনে করেন যে প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণ এই সমস্ত তথাকথিত স্লুকের উৎসস্থল। জনসাধারণের প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি হ্রাস পাইলে এই ধরণের স্লুক অনেক সময়ে অনুপযুক্তস্থলে বিভিন্ন নায়ক নায়িকার মুখে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন দৃশ্যে দৈত্যদানব উপস্থিত হইলে সময়োপযোগিতার প্রশ্ন বিচার না করিয়া নির্বিচারে রামায়ণ হইতে স্লুক উদ্ধৃত করা হইত[৬]। এইরূপ ক্ষেত্রে ড়লঙ্ নাটকের চরিত্রানুযায়ী তাঁহার কণ্ঠস্বর বিভিন্ন পর্দায় তুলিতেন[৭]। বর্তমান ব্যবস্থাপনায় পুরুষেরা ড়লঙের পার্শ্বে বসিয়া থাকেন ; সুতরাং তাঁহারা পুতুল এবং তাহার ছায়া উভয়ই দেখিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরা পর্দার বিপরীত পার্শ্বে বসিয়া থাকেন ; সুতরাং তাঁহারা ছায়া ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না। বর্তমানে বলিদ্বীপ, লম্বক এবং পশ্চিম যবদ্বীপে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকেরা পর্দার সম্মুখে একত্র বসিয়া থাকেন[৮]।

ওয়েয়াঙ্ সাহিত্যের প্রাচীনত্ব কতদিনের তাহা অনুসন্ধানযোগ্য। ৭৬২ শকাব্দের (৮৪০ খৃষ্টাব্দ) একটি অনুশাসনলিপিতে জুরু বঞ্জোল, লরীঙ্গিত এবং অবঞ্জোল প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু ছায়ামঞ্চের সহিত ইহাদের সংযোগ সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয় নাই। ডঃ কার্ণের মতানুযায়ী ৭৮২ শকাব্দের (৮৬০ খৃষ্টাব্দ) একটি অনুশাসনে উল্লিখিত জুরু বরত শব্দটি ওয়েয়াঙের নট-নটি বা ড়লঙ্‌কে বুঝাইতেছে। অধ্যাপক ভ্রিদে বলিয়াছেন যে যবদ্বীপের ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের প্রথমাংশে ওয়েয়াঙ্-নাট্যের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। ওয়েয়াঙের সংশয়াতীতভাবে উল্লেখ আমরা প্রথম পাই অর্জুনবিবাহ-কাকাবিনে। স্মরণ থাকিতে পারে যে ইহা একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা ঐরলঙ্গের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। এই কাব্যগ্রন্থে পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে :

"হনানোস্তোন রিঙ্গিত্ মনঙ্গিস্ আসকেল মূড়া হিড়েপন"[৯]

অর্থাৎ ইহা সেই ব্যক্তির মত, যিনি ওয়েয়াঙ্ দেখেন এবং একটু পরেই কাঁদিতে আরম্ভ করেন। এতদ্ব্যতীত যোগীশ্বরের রামায়ণ (২৪/১১২), সুমনসান্তক (২৭), বৃত্তসঞ্চয় (৯৩ শ্লোক), ভারতযুদ্ধ (৬৬৪ শ্লোক) এবং তন্তুপঙ্গেলরণ (৩৪) গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অংশগুলি ছায়া-নাট্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদিগকে অবহিত করিয়া দেয়। প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণের ৭/১২ অংশটিও ওয়েয়াঙের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। ১০৫৮ খৃষ্টাব্দের বলিদ্বীপীয় একটি তাম্রশাসনে অরিঙ্গিত্ বা ওয়েয়াঙের উল্লেখ আছে।

উপরোল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যবদ্বীপে ছায়ানাট্যের প্রচলন ছিল। বস্তুতঃ ইহা পরবর্তী শতাব্দীতে এত জনপ্রিয় হইল যে কবিগণ ছায়ানাট্য হইতে উপমা সঞ্চয়ন করিতে লাগিলেন। ম্পু তানাকুঙ্ বৃত্তসঞ্চয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন[১০] : 'পর্বতগুলি হইতে এই ধারণাই জন্মিল যেন উহাদের বৃক্ষগুলি পুতুল। সুন্দর স্বচ্ছ কুয়াশা যেন পর্দা ; যে শূন্যগর্ভ বাঁশের অভ্যন্তর দিয়া বায়ু প্রবাহিত হইত উহা যেন মৃদুভাবে শব্দায়মান তুডুঙ্গন ; পক্ষীর শ্রুতিমধুর কাকলি হরিণের কোমল প্রতিধ্বনির সহিত সুরসঙ্গতে মিলিত হইয়া যেন সারোন বাজিতেছিল ; সুন্দর ময়ূরের কণ্ঠস্বরে যেন মন্দ্রক-গীতি বাজিয়া উঠিয়াছিল'।

প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণে একটি উল্লেখের সূত্র ধরিয়া ডঃ হ্যাজো ওয়েয়াঙের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রামায়ণের তারিখ এবং রামায়ণের যে চরণে এই উল্লেখটি আছে তাহা প্রক্ষিপ্ত কিনা সেই সম্বন্ধে সংশয় বিদ্যমান থাকায় এই সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা সম্ভবপর নহে। তবে চতুর্দশ শতাব্দীতে ওয়েয়াঙ্ যে সুপ্রচলিত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ এই শব্দটি অন্যান্য গ্রন্থেও পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই যুগের শিল্পরীতিতে আবার যে ওয়েয়াঙ্ ষ্টাইলের প্রতিফলন দেখি তাহার সহিত ওয়েয়াঙ্ থিয়েটারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

সম্ভবতঃ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহা বর্তমানের মত এত আড়ম্বরপূর্ণ ছিল না এবং ধর্ম ও কুসংস্কারের পরিমণ্ডলে অনেকে ইহাকে ভয়ের চোখেই দেখিতেন। মনে হয় যে এই ওয়েয়াঙ্ নাট্য সপ্তদশ শতাব্দী হইতে মধ্য যবদ্বীপের রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। তবে তন্তুপঙ্গেলরণের রচনাকালেই ছায়া-নাট্যগুলি এত প্রাচীন হইয়া গিয়াছিল যে লোকে ঐগুলির উৎপত্তির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিত যে উহা দেবগণের আবির্ভাবের সহিত সংযুক্ত[১১]।

পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে ছায়ানাট্যগুলি একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বিদ্যমান ছিল এবং দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ওয়েয়াঙ্-নাট্যে অর্কেষ্ট্রা ব্যবহৃত হইত। ডঃ হ্যাজো মনে করেন যে এই সময়ের বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে তুডুঙ্গ, সারোন্, কমনক প্রভৃতি ছিল। ওয়েয়াঙ্ পুর্ব নাট্যে গায়কেরা গামেলন সলেন্দ্রো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করিত এবং ওয়েয়াঙ্ গেড়োগ নাট্যে ব্যবহার করিত গামেলন পেলোগ-যন্ত্র। কোন কোন পণ্ডিত

অনুমান করেন যে যবদ্বীপীয় সঙ্গীত জগতের সলেন্দ্রো-স্কেলটি বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছে, কিন্তু এই মত সকলে গ্রহণ করেন নাই[১২]।

ডঃ হ্যাজো[১৩] বলিয়াছেন যে এই ছায়ানাট্যগুলি যবদ্বীপে সাহিত্য সৃষ্টির সূচনার বহুপূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল; মনে হয় যে উহা অধিক পূর্বে না হইলেও অন্ততঃ ৮০০ শকাব্দে সম্ভবতঃ অজ্ঞাত ছিল না। ডঃ ব্র্যাণ্ডেস অনুমান করিয়াছিলেন যে ওয়েয়াঙ্ নাট্যগুলি সম্ভবতঃ ৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিল। তাঁহাদের অনুমানের প্রধান কারণ এই যে ছায়ানাট্য-গুলিতে যে-সমস্ত টেক্‌নিক্যাল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা খুব প্রাচীন এবং এই শ্রেণীর নাট্যের উদ্ভবকাল অনুমানিক অষ্টম শতাব্দীতে হইয়াছে অনুমান না করিলে এই টেকনিক্যাল্ শব্দগুলির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁহারা ওয়েয়াঙ্-নাট্যের আদিম প্রকৃতি এবং সেমর ও তাহার দুই পুত্রের সমস্যার কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াই এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে[১৪] ড়লঙ্ আদিতে ছিলেন একজন পুরোহিত; তিনি প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে পূজাদি করিতেন এবং পর্দায় প্রতিবিম্বিত পুতুলের ছায়া এই প্রেতাত্মারই প্রতিচ্ছবি। বস্তুতঃ ছায়ানাট্য আরম্ভ হইবার পূর্বে ড়লঙ্ প্রেতাত্মাদের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া থাকেন; ইহাকে টেকনিক্যাল পরিভাষায় সজেন্ বলা হয়। নাট্যের প্রারম্ভে ধূপ জাতীয় গন্ধদ্রব্য প্রজ্বলনও অনুষ্ঠানের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। ইহাও স্মরণ রাখা দরকার যে এই সমস্ত নাট্য রাত্রিতে প্রদর্শিত হইয়া থাকে; যদি রাত্রি অন্ধকারময় হয় তাহা হইলে আরো ভাল হয়, কারণ ঐ সময়ে প্রেতাত্মা খেয়ালখুশীভাবে পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে[১৫]। এই সমস্ত নাট্যের মাধ্যমে জীবিত এবং মৃতের মধ্যে যেন একটি যোগসূত্র সংস্থাপিত হয়। কালক্রমে লোকের চিন্তাধারা এবং আর্টের মানদণ্ড উন্নততর হইলে এই সমস্ত সঞ্চরণশীল প্রেতাত্মার ছায়া কিম্ভূতকিমাকার ওয়েয়াঙ্-মূর্তিতে রূপান্তরিত হইল। সুতরাং ওয়েয়াঙ্-মূর্তির বিকট আকার তখন সঞ্চরণশীল প্রেতাত্মার ভয়ঙ্কর মূর্তি ও অপার্থিব আচরণের সহিত সামঞ্জস্য-পূর্ণ হইল। এমন কি বর্তমান কালেও উহাদের সহিত মানুষের কোন সাদৃশ্য বিদ্যমান নাই। দ্বীপময় ভারতের অধিবাসীরা বিশ্বাস করে যে এই সমস্ত প্রেতাত্মা ইচ্ছা করিলে মানুষের বহু উপকার সাধন করিতে পারে; সুতরাং অনেকে ব্যাধি নিরাময়ের উদ্দেশ্যে কখনো কখনো এই রূপ নাট্য সংযোজনা করিয়া থাকেন। তবে এইরূপ ব্যবস্থার কথা প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যে উল্লিখিত হয় নাই।

ডঃ হ্যাজো বলিয়াছেন[১৬] যে ছায়ানাট্যগুলি পূর্বে গৃহপতি স্বয়ং প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতেন, কিন্তু কালক্রমে এই কাযের ভার একশ্রেণী লোকের উপর ন্যস্ত হইল; ইহারাই ড়লঙ্ নামে পরিচিত হইলেন। ড়লঙ্‌গণ কিরূপে ওয়েয়াঙ্-নাট্য পরিবেশন করিবেন তাহার বিস্তৃত বিধানাবলী বিদ্যমান। বর্তমান যবদ্বীপীয় ভাষায় উহার নাম পকেম ড়লঙ্গ (Pakem ḍalang)। ডঃ হ্যাজো বলিয়াছেন যে যদি আমরা মৃতের উপাসনা হইতে ছায়ানাট্যের উদ্ভব কল্পনা না করি তাহা হইলে পূর্বে যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা অনেকটা অর্থহীন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। মৃতের এই উপাসনা হইতে নাট্যের পরিমণ্ডলে পৌছিতে অন্ততঃ পক্ষে

দুইশত বৎসর লাগিয়াছিল অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং অর্জুনবিবাহ কাব্য একাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে রচিত হইয়া থাকিলে, ছায়ানাট্যের উদ্ভব আনুমানিক ৮০০ খৃষ্টাব্দের সন্নিকটবর্তী সময়ে হওয়াই সম্ভব।

ডঃ হোসেন জয়দিনিঙ্গ্ রাট্[১৭] বলিয়াছেন যে ওয়েয়াঙ্ পূর্ব এমন সময়ে বিকাশ লাভ করিয়াছিল যখন শৈব ধর্মমত যবদ্বীপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। স্বভাবতঃ এই সময় ৭৩২ খৃষ্টাব্দের পরে হইবে। অনুমান করা হইয়াছে যে ভারতীয় মহাকাব্যের নায়কগণের অনুচর রূপে পরিণত হওয়ার পূর্বে সেমর এবং তাহার দুইপুত্র পেত্রুক এবং নলগরেঙ্গ্ যবদ্বীপীয় রঙ্গ-মঞ্চের অধিনায়ক ছিলেন। ভারতীয় নটনটির আবির্ভাবে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বয়স্যে রূপান্তরিত হইয়া গেলেন। যদি এইরূপ অবস্থার কল্পনা করিতে হয় তাহা হইলে আমাদিগকে ভারতীয় এবং যবদ্বীপীয় আর্ট-টেক্‌নিক্ বা কলাশিল্পের মধ্যে দ্বন্দ্ব অথবা সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা কল্পনা করিয়া লইতে হইবে; ভারতীয় মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকাগণও যে ইতিমধ্যেই যবদ্বীপে জনপ্রিয় হইয়া গিয়াছিলেন তাহাও কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। রামায়ণ যবদ্বীপে নবম শতাব্দীতে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং সেমর এবং তাহার পুত্রদ্বয় এই সময়ের পূর্বেই যবদ্বীপের রঙ্গমঞ্চের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। প্রেতাত্মার উপাসনায় তাহাদের স্থান কোথায় তাহা বর্তমানে ব্যাখ্যা করা সুসাধ্য নহে। ছায়ানাট্যগুলি যদি প্রেতাত্মার পূজা হইতেই উদ্ভব লাভ করিয়া থাকে তাহা হইলে সেমর এবং তাহার দুই পুত্র উক্ত পূজায় বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, নতুবা তাহারা সহজেই যবদ্বীপীয় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস হইতে নির্বাসিত হইতেন। এই প্রসঙ্গে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে তাঁহারা প্রেতাত্মার পূজার পরিমণ্ডলে প্রাচীন যবদ্বীপীয় পূর্বপুরুষ। ইহা অসম্ভব নহে, কারণ দেবতা কিরূপে বয়স্যে রূপান্তরিত হইতে পারেন তাহা নারদের দৃষ্টান্তেই সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

হাজোর সমস্ত যুক্তি পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা অসম্ভব। ভারতীয় নাটকেও ভাঁড়ের বা বয়স্যের স্থান আছে। সুতরাং ভারতবর্ষের মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকাগণকে লইয়া যখন ওয়েয়াঙ্-নাট্য সৃষ্টি হইল, তখন ভারতীয় আদর্শটি সম্মুখে রাখিয়া উহাতে নিশ্চয়ই সেমর প্রমুখ স্বদেশী ভাঁড়কে অন্তর্নিবিষ্ট করিবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। বস্তুতঃ বুরয়ুৎ, অমরুতুক কিংবা তাঁহাদের পরিবার বিভিন্ন দুর্বিপাকে পতিত হন বিপুল হাস্যরস সৃষ্টি করিবার জন্যই। সুতরাং ইহাদিগকে প্রাক্-হিন্দুযুগের যবদ্বীপীয় নাট্যমঞ্চের অধিনায়ক করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে হয় না। জলমণ্ডপিকা বা রূপোপজীবন যখন দেবদেবী এবং রামায়ণ-মহাভারতের মহানায়কগণকে লইয়া যবদ্বীপে উপনীত হইল এবং ওয়েয়াঙ্ নামে পরিচিত হইল, তখন নিশ্চয়ই নাটক মঞ্চস্থ করিবার পূর্বে পূর্ব-পুরুষগণের প্রেতাত্মার পূজা করিয়া এই কার্যটি আরম্ভ করা হইত। প্রেতাত্মার পূজা নিঃসন্দেহে প্রাক্ হিন্দু যুগ হইতে প্রচলিত ছিল; সুতরাং রামায়ণ মহাভারতের পবিত্র দৃশ্যাদি দেখাইবার পূর্বে এই সমস্ত পূর্ব-পুরুষের আশীর্বাদ যাজ্ঞা করা আদৌ অস্বাভাবিক ছিল না। যিনি প্রেত-পূজার পুরোহিত ছিলেন তিনিই ডলঙ্গ হইয়া ওয়েয়াঙ্ নাট্যের পুরোধা হইলেন।

যবদ্বীপের রক্ষণশীল পরিবারের লোকজন ওয়েয়াঙ্‌ নাট্যকে অসাধারণ ঘটনা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ; ইহা নির্ধারিত নিয়মকানুন এবং ঐতিহ্য অনুযায়ী পরিদর্শিত হইয়া থাকে। ওয়েয়াঙ্‌-নাট্য প্রদর্শনের সময় পূর্ব-পুরুষগণের পূজা এবং তাহাদের আবির্ভাব পারিবারিক শান্তির বিধান করিয়া থাকে। প্রথম গর্ভের সময়, জন্ম, মৃত্যু, গৃহ নির্মান, জন্মদিন উপলক্ষ্যে অনেক সময় এই ওয়েয়াঙ্‌ নাট্য অনুষ্ঠিত হয় এবং অপার্থিব বীর পুঙ্গবদের মঞ্চে আবির্ভাব দ্বারা ব্যষ্টি এবং সমষ্টির জীবন যেন গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। সাধারণতঃ ওয়েয়াঙ্‌ নাট্য পারিবারিক কল্যাণ কামনায় এবং অকল্যাণ দূর করিবার জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন হইল : কোন দেশ হইতে এই ছায়ানাট্য যবদ্বীপে পরিগৃহীত হইয়াছে ? ইহা কি যবদ্বীপের নিজস্ব সৃষ্টি অথবা ইহা বিদেশের অবদান ? ছায়ানাট্য বা ঐ প্রকৃতির নাট্য ভারতবর্ষ, চীন, কাম্বোডিয়া, শ্যামদেশ (থাইল্যাণ্ড), মালয় উপদ্বীপ, জাভা, বলি, এমন কি সুদূরবর্তী তুর্কী দেশেও প্রচলিত ছিল[১৮]। যদি ইহা যবদ্বীপসম্ভূত না হয়, তাহা হইলে ইহার উদ্ভব সেই দেশেই খুঁজিতে হইবে যাহার সহিত যবদ্বীপের একাদশ শতাব্দীর পূর্বে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। একমাত্র তুরস্ক ছাড়া আর সমস্ত দেশই এই কৃতিত্বের দাবী করিতে পারে। প্রথমতঃ চীনের দাবীর যৌক্তিকতা বিচার করা যাউক।

অধ্যাপক শ্লেগেলের মত অনুসারে[১৯] ছায়ানাট্য চীনদেশে হ্যান বংশের (১৪০-৮৬ খৃঃ পূঃ) সম্রাট বু-র রাজত্বকালে প্রচলিত ছিল। এই সম্বন্ধে বর্তমানে আমাদের জ্ঞান যেরূপ সীমিত তাহাতে এই উভয় দেশের ছায়ানাট্যকে একসূত্রে গ্রথিত করিবার কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আমাদের হাতে নাই। উভয় দেশের ছায়ানাট্য সংক্রান্ত টেক্‌নিক্যাল শব্দগুলিও মূলতঃ বিভিন্ন। চীনদেশে ছায়ানাট্যগুলিকে পো-টি-হি বলা হয়, কিন্তু উহা চীনদেশে জনপ্রিয় নহে। যখন ফা-হিয়ান ৪১৪ খৃষ্টাব্দে জাভা-সুমাত্রায় গেলেন যখন তিনি সেখানে কোন চীনের অধিবাসীকে দেখিতে পান নাই। বস্তুতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পুর্বে, বিশেষতঃ কুবলাইখানের পুর্বে যবদ্বীপে চীনের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হয় নাই[২০]। সুতরাং ইহা মনে করা অসঙ্গত নয় যে যবদ্বীপীয় ওয়েয়াঙ্‌-নাট্যের মূল উৎসভূমি চীনে ছিল না। যবদ্বীপ ওয়েয়াঙ্‌-নাট্য শ্যামদেশ (থাইল্যাণ্ড) বা কাম্বোডিয়া হইতেও গ্রহণ করে নাই, বরঞ্চ শ্যামদেশ ও কাম্বোডিয়ায় নাট্য-টেকনিকে যবদ্বীপীয় প্রভাবের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ল্যাকোন শব্দটি নিঃসন্দেহে যবদ্বীপীয়, কিন্তু ইহা শ্যামদেশের ভাষায় অনুপ্রবেশ করিয়াছে। অনুরূপভাবে যবদ্বীপীয় ওয়েয়াঙ্‌-নাট্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক পঞ্জি শ্যামদেশীয় রঙ্গমঞ্চে ইনাও নামে খ্যাত হইয়াছেন। ব্র্যাণ্ডেসের মতানুসারে[২১] পঞ্জি-সংক্রান্ত আখ্যায়িকাগুলি যবদ্বীপ হইতেই শ্যামদেশ এবং কাম্বোডিয়ায় গিয়াছে ; কারণ, শ্যামদেশ ও কাম্বোডিয়ায় পঞ্জি-সংক্রান্ত রোমান্টিক কাহিনীতে যে সমস্ত ভৌগলিক ও অন্যবিধ তথ্য পরিবেশিত হইতেছে[২২] তাহার ব্যাখ্যা যবদ্বীপ হইতেই পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোরিপন, দহ, চিন্দর বা চিন্দরবতি ইত্যাদি নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুতরাং দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার ছায়ানাট্যগুলি যবদ্বীপ হইতেই গিয়াছে।

এইবার ভারতের দাবীর যৌক্তিকতা বিচার করা যাউক। মহাভারতের[২৩] 'রূপোপজীবনম্' শব্দের টীকা করিতে যাইয়া নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—"রূপোপজীবনম্ জলমণ্ডাপিকেতি দক্ষিণাত্যেষু প্রসিদ্ধম্, যত্র সূক্ষ্মবস্ত্রম্ ব্যবধায় চর্মময়ৈরাকরৈ রাজামাত্যাদীনাম্ চর্যা প্রদর্শ্যতে।" এই স্থলে বিস্তৃত বিবরণ না থাকিলেও ইহাকে যবদ্বীপীয় ওয়েয়াঙ্-নাট্যের অনুরূপ (প্রটোটাইপ) বলিয়াই মনে হয়। কারণ, এস্থলেও আমরা পর্দা এবং চর্মনির্মিত পুত্তলিকা উভয়ই পাইতেছি। মহাভারতের এই সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে মনে হইবে যে বটিক শিল্পের মতই ছায়ানাট্যও দাক্ষিণাত্য হইতেই যবদ্বীপে প্রবর্তিত হইয়াছে। বটিক শিল্প যে দক্ষিণ ভারত হইতেই গিয়াছে সে বিষয়ে পণ্ডিতগণ প্রায় একমত, কিন্তু ছায়ানাট্য সম্বন্ধে তাঁহাদের বিরুদ্ধভাব যেন আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। অধ্যাপক সিল্‌ভা লেভী যবদ্বীপের আদিপর্বের সংস্কৃত শ্লোক আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন যে উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভিক দ্বিতীয় শ্লোকটি ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যবদ্বীপীয় ছায়ানাট্যের (ওয়েয়াঙ্) উদ্ভবের দিক হইতে বিচার করিলে এই ব্যাপারটির বিশেষ গুরুত্ব আছে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে ভট্টনারায়ণ বাঙ্গালী বলিয়া প্রবাদ থাকিলেও এই কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। দ্বিতীয়তঃ সমসাময়িক বঙ্গদেশ এবং যবদ্বীপের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকিলেই যে ছায়ানাট্য বঙ্গদেশ হইতে যবদ্বীপে প্রসারিত হইবে এমন কোন কথা নাই। বস্তুতঃ ছায়ানাট্য বঙ্গদেশে এই যুগে আদৌ বিদ্যমান ছিল কিনা তাহা সন্দেহস্থল। সুতরাং বর্তমান তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যে ওয়েয়াঙ্-নাট্য দক্ষিণ ভারত হইতেই যবদ্বীপে প্রসারিত হইয়াছিল।

নাট্য-শব্দটি বুঝাইতে যবদ্বীপে 'ল্যাকোন' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যবদ্বীপীয় 'ল্যাকোন' শব্দটির ব্যুৎপত্তি হইল 'লকু' শব্দ হইতে। ল্যাকোন রচনায় কতকগুলি মৌলিক নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় এবং উহা উগের পেড়লঙ্গন বা ড়লঙ্গদের নির্দেশের জন্য মৌলিক নিয়মাবলীতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে[২৪]। উহার প্রত্যেকটি বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন টেকনিক্যাল নাম আছে। যেমন—সুলুক (আবৃত্তি), পোচপন (আলাপন), পেননতঙ্ (প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান), প্রেনেসন (প্রেমের ভাষা), বগোঁলন (পরিহাস) প্রভৃতি। বগোঁলন শব্দটি অনুশাসন-লিপিতেও পাওয়া গিয়াছে। এই একটি ক্ষেত্র যেখানে সেমর এবং তাহার দুই পুত্র ভাঁড়ামি এবং চটুল পরিহাস-রস বিতরণে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে। বলিদ্বীপ ওয়েয়াঙ্-নাট্য জাভা হইতে পরিগ্রহণ করিয়াছে ; সেখানে এই তিনজন ভাঁড় বা বয়স্যের স্থান অধিকার করিয়াছে বুঙ্গুৎ স্বহ্, ম্রেদহ্, সেঙ্গুৎ, গেড়ে বহগ্, তুয়লেন, তোগোক, ব্রেত অবঙ্গ দিসিন সেত্র, পেঙ্গকন-ঙোঁমন, ববহুদন বা ববঙ্গুদন, গগক, অম্পুহন, তুরস প্রভৃতি। বলিদ্বীপে বুরয়ৎ এবং তাহার পরিবারের দুর্ভাগ্য লইয়া একটি কবিতা রচিত হইয়াছে। যবদ্বীপীয় ওয়েয়াঙ সাহিত্যের বিবর্তনে ছয়টি বিভিন্ন উপাদান কার্যকরী হইয়াছে, যথা :

(১) পূর্বপুরুষ বা প্রেতাত্মার পূজা।

(২) মূল মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকার নাট্যরূপ প্রদান।

(৩) মালয়-পলিনেসীয় কাহিনীর সহিত ভারতীয় আখ্যায়িকার সংমিশ্রণ ও গণ্ডগোল।

(৪) যবদ্বীপের প্রাচীন ভাষা এবং ভারতীয় মহাকাব্য সাহিত্যের সহিত পরিচয় ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতে আসিতে অবশেষে উহার অবলুপ্তি ঘটে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌লামের প্রভাবও একটি বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

(৫) মৌখিক (ওয়েয়াঙ্) এবং লিখিত (লজঙ্) কিম্বদন্তীর পারস্পরিক প্রভাব বিস্তার[২৫]।

(৬) গণচেতনা ও সময়ের প্রভাব।

যবদ্বীপের এই ওয়েয়াঙ্ সাহিত্যকে বিষয় বস্তুর দিক দিয়া বিশ্লেষণ করিলে ইহার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ পরিদৃষ্ট হয়। যথা: (১) ভারতীয় মহাকাব্য সাহিত্য-চক্র। (২) দমর বুলন সাহিত্য-চক্র। (৩) পঞ্জি সাহিত্য-চক্র। (৪) আমীর হামজা সাহিত্য-চক্র।

ষ্টুটেরহাইম মনে করেন যে পূর্ব যবদ্বীপীয় দমরবুলন রোমান্টিক সাহিত্যচক্র সড়েঙ্গ যুদ্ধের ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সাহিত্যচক্র এবং আমীর হামজা সাহিত্য চক্রের সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক অতীব ক্ষীণ। সুতরাং আমরা বর্তমান আলোচনায় ওয়েয়াঙ্ সাহিত্যের সহিত ভারতীয় মহাকাব্য সাহিত্যচক্রের কি সম্বন্ধ তাহাই আলোচনা করিব। এই আদর্শের দিক দিয়া বিশ্লেষণ করিলে, ওয়েয়াঙ্ সাহিত্যকে চারিটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়[২৬]। যথা:

(১) প্রাচীন ইতিবৃত্ত এবং পৌরাণিক উপকথা (মিথোলজি): দৈত্য দানবের কাহিনী। ইহার অধিকাংশেরই উৎস হইল মহাভারতের আদি পর্ব।

(২) রাম কাহিনী: ইহার মূল উৎস হইল রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনী। তবে ইহা মুখ্যতঃ মালয় হিকায়ৎ-এর অনুরূপ গ্রন্থ সেরৎকণ্ড ও রাম কেলিঙকে অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছে।

(৩) অর্জুন সহস্রবাহু কাহিনী-চক্র: ইহার আখ্যায়িকাভাগ রামায়ণের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে।

(৪) পাণ্ডব কাহিনীচক্র: এই চক্রের কাহিনীগুলির উৎসভূমি হইল মহাভারত। রামায়ণের কোন কোন চরিত্র পাণ্ডব কাহিনী-চক্রের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া স্থলে স্থলে এক নূতন পটভূমিকার সৃষ্টি করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ঘটোৎকচ দয়ুপ কলিজন দেবি প্রেগিব নামক একটি পাণ্ডব-ল্যাকোনে হনুমানকে বৃকোদরের ভ্রাতা হিসাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

ওয়েয়াঙ-পুর্ব নাটিকাগুলি যবদ্বীপের প্রাচীনতম ইতিহাসের কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাতে কেবলমাত্র যে প্রাচীন যবদ্বীপীয় বা খাঁটি মালয়-পলিনেসীয় পৌরাণিক কাহিনী সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীও ল্যাকোনে রূপায়িত হইয়াছে। বটু গুনুঙ্[২৭] এবং জমুরদিপ[২৮] নামক ল্যাকোন দুইটিকে প্রথমোক্ত শ্রেণীতে স্থান নির্দেশ করিতে পারি। শেষোল্লিখিত ল্যাকোনটি মাণিকমায়া হইতে গৃহীত

হইয়াছে ; মেঙ্গুকুহন নামক ল্যাকোনটির উৎসভূমিও ঐ একই। মুর্বকল বা পুর্ব্বকল নামক ল্যাকোনটিকেও সম্ভবতঃ এই একই শ্রেণীতে স্থান নির্দেশ করিতে হইবে, কারণ এই নাটিকা প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষতি নিরোধ করা এবং শোক প্রশমন করা[২৯]। কোন কোন ক্ষেত্রে তন্ত্র-পঙ্গেলরণ নামক গ্রন্থটির প্রভাবও পরিদৃষ্ট হয়। অপর দিকে আমরা দেখিতে পাই যে মিস্তরগ নামক ল্যাকোনটি মহাভারতাশ্রয়ী ; ইহাতে অর্জুনের সহিত সুবদ্রের (সুভদ্রার) পরিণয়-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। উইণ্টার কর্তৃক উল্লিখিত পার্থযজ্ঞেরও ইহাই আলোচ্য বস্তু।

লহিরে ঘটোৎকচ নামক ল্যাকোনটিও কতকটা ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট। এই নাটিকায় ঘটোৎকচের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব হইতে অজস্র ল্যাকোনের উদ্ভব হইয়াছে। অধ্যাপক কার্ণ বলিয়াছেন[৩০] যে ল্যাকোন ওবোঙ্গ-ওবোঙ্গন বলে সি গলগল আদিপর্বের জতুগৃহ পর্ব হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে ; ডঃ যুইনবল[৩১] মনে করেন যে এই ল্যাকোনের শেষাংশ বিরাট পর্বের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ডঃ হ্যাজো বলিয়াছেন যে পলসর (পরাশর)-নামক ল্যাকোনটি আদিপর্বের অনুরূপ অংশ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। মহাভারতের হিড়িম্ব বধ পর্বের (আদি) এবং হরিবংশের একটি আখ্যায়িকাকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া অরিম্ব নামক একটি ল্যাকোন রচিত হইয়াছে[৩২]। রুর্দা[৩৩] পাণ্ডু নামক ল্যাকোনটির একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভান দের ভ্লিয়েৎ[৩৪] ইহার একটি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই ল্যাকোনটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করিতেছি ; ইহা হইতে যবদ্বীপীয় ওয়েয়াঙ্‌ কাহিনীগুলির সাধারণ বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইবে। এই ল্যাকোন-টির নায়ক-নায়িকা এবং অন্যান্য পাত্রপাত্রীদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কুন্তি বোজ	মন্দুর রাজ।
বসুদেব, অর্থ-প্রবু, উগ্রসেন	ঐ পুত্রগণ।
কুন্তি নলব্রত	ঐ কন্যা ; পাণ্ডুর সহিত পরিণয়াবদ্ধ।
পতহ্‌	তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী ; যমবিদুরের সহিত বিবাহিতা।
মন্দ্র পতি	মন্দরক রাজ।
নরসোম	ঐ পুত্র, সত্যবতীর সহিত পরিণয়াবদ্ধ।
মদ্রিন্‌	উহাদের কন্যা।
অবিয়স্‌	হস্তিন রাজ।
অম্বিলিকি	তাঁহার মহিষী।
দেষ্টরত, পাণ্ডু, যম বিদুর	উহাদের পুত্রগণ।
রাদেন অঙ্গেনদর	গেন্দরিসের রাজকুমার।

দেবি অঙ্গেনদরি	তাঁহার ভগ্নী ; দেষ্টরতের সহিত বিবাহিতা।
গঙ্গস্পতি	সত্যবতীর পিতা, মন্দ্রপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
নরদ	দেবদূত।
তোগোগ্	নরসোমের পনকবন।
সেমর	পাণ্ডুর ভৃত্য।
পেত্রুক } উহার পুত্রদ্বয়	পাণ্ডুর ভৃত্য।
নলগরেঙ্গ্ } উহার পুত্রদ্বয়	পাণ্ডুর ভৃত্য।

আখ্যায়িকাটি মহাভারতের পাণ্ডব কাহিনীচক্রের অন্তর্ভুক্ত। গল্পের আখ্যানভাগ তিনটি ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইয়াছে। উঁহারা হইলেন পলসর (পরাশর), অবিয়স (ব্যাস) এবং পাণ্ডু—পিতামহ, পুত্র এবং পৌত্রগণ। ইঁহাদের কার্যাবলীর পরিমণ্ডলেই এই ল্যাকোন কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই তিনটি চরিত্রের মধ্যে পাণ্ডুকে মূল ভূমিকায় দেখা যায় এবং তাঁহার শৌর্য সমগ্র কাহিনীকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছে। আলোচনার সুবিধার জন্য কাহিনীটিকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

গল্পের প্রথম অংশে দেবি কুন্তি (=দেবী কুন্তী)-র বিবরণ দেওয়া হইয়াছে; তিনি ছিলেন মন্দুর-রাজ কুন্তি বোজের কন্যা; অবহ্ মুক এবং অগ্নি মুক নামক দুইজন দৈত্য তাঁহাকে অপহরণ করিলে সূর্যদেব তাঁহাকে দৈত্যগণের হাত হইতে রক্ষা করিলেন। অতঃপর রাজকুমারীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া সূর্যদেব তাঁহার সহিত লীলাপ্রণয় সম্ভোগ করিলেন। দৈত্যগণ তখন পর্যন্ত দেবি কুন্তিকে বলপূর্বক গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করায় সূর্যদেব তাহাদিগকে সংগ্রামে আহ্বান করিলেন। এই যুদ্ধে সূর্যদেব বিজয়ী হইয়া দেবি কুন্তির আশঙ্কা মোচন করিলেন। সুতরাং গল্পের প্রথম অংশে আমরা মধ্যযুগীয় রোমান্টিক সাহিত্যের বীজ সংগুপ্ত দেখিতে পাইতেছি। যথা: রূপলাবণ্যবতী রাজকন্যা, তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া সংগ্রাম, যোদ্ধার সমাবেশ ইত্যাদি। দৈত্যগণ সাময়িকভাবে সংগ্রামক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইল বটে, কিন্তু তাহারা পুনরায় দেবি কুন্তির স্বয়ম্বর সভায় যাইয়া উপনীত হইল। গল্পের দ্বিতীয় অংশের প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাইতেছি কুন্তি বোজের অনুজ গঙ্গস্পতিকে ; তাঁহার আকৃতি ছিল দৈত্যের মত। তিনি তাঁহার সুন্দরী কন্যা সত্যবতীর সহিত এক নির্জন আশ্রমে বাস করিতেন। সত্যবতী স্বপ্নে একজন দীর্ঘকায় যোদ্ধমূর্তি দেখিয়া তাঁহার প্রণয় মুগ্ধ হইলেন। গঙ্গস্পতি তখন সেই অজ্ঞাত যোদ্ধাকে আবিষ্কার করিতে গিয়া নরসোম সহ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন। নরসোম বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হওয়ার জন্য তাঁহার পিতা মন্দরক রাজ কর্তৃক নির্বাসিত হইয়াছিলেন। নরসোম শ্রীমতী সত্যবতীর অপরূপ লাবণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তিনি দৈত্যাকারবিশিষ্ট কোন ব্যক্তির কন্যাকে পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন গঙ্গস্পতি নিজকে নিধন করিবার জন্য নরসোমকে অনুরোধ করিলেন। এইরূপে গঙ্গস্পতি মৃত্যুবরণ করিয়া সত্যবতীর বিবাহের পথ নিষ্কণ্টক করিলেন। সত্যবতী এবং নরসোম অতঃপর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ইহার পর মন্দরক-রাজ নরসোমকে রাজসভায় আহ্বান করিলেন, কিন্তু পূর্বোল্লিখিত নরহত্যার জন্য

তিনি পুনরায় নির্বাসিত হইলেন। অতঃপর নরসোম কুন্তির স্বয়ম্বরে উপস্থিত হইবার জন্য মন্দুরাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার ভগ্নীও তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন।

তৃতীয় দৃশ্যের পটভূমিকায় অস্তিন (হস্তিনা)-রাজ্য। সেই স্থলের রাজা ছিলেন অবিয়স; তাঁহার তিন পুত্র ছিল, যথা: দেষ্টরত, পণ্ডু এবং যম বিত্নর। এই তিন পুত্রের মধ্যে প্রথম রাজপুত্র ছিলেন অন্ধ এবং শেষোক্ত জন ছিলেন খঞ্জ। পিতা অবিয়স ইহাদের বিবাহের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন, কিন্তু পাণ্ডু ভিন্ন আর কাহারো উপযুক্ত রাজকন্যা লাভ করা সম্ভবপর ছিল না মনে করিয়া অবিয়স পাণ্ডুকেই মন্দুর নগরে স্বয়ম্বর সভায় প্রেরণ করিলেন। তিনি নিজেও বিমানে আরোহণ করিয়া সেই স্থলে যাত্রা করিলেন। মন্দুর-নগরে উপনীত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন যে স্বয়ম্বর ইতিমধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে এবং নরসোম কতকগুলি মন্ত্রের সাহায্যে অবহ্‌মুক এবং অরিমুক নামক দৈত্য দুইজনকে পরাজিত করিয়াছেন। অবিয়স কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মন্দুর-রাজ পাণ্ডু এবং নরসোমের মধ্যে শক্তি পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। নরসোম কতকগুলি মন্ত্র ব্যবহার করিলেন, কিন্তু পাণ্ডু মৃত সঞ্জীবনী অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধে বিজয়ী হইলেন। বিজয়ী বীর পাণ্ডু নবসোমের ভগ্নীকেও লাভ করিলেন। তিনি কুন্তি সহ রাজধানী অস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন; এই কুন্তিই পাণ্ডবগণের জননী হইলেন। কুন্তির ভগ্নী পতহ্‌ অতঃপর অন্যান্য অন্তঃপুরিকাগণের সঙ্গে অস্তিনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই ল্যাকোন-কাহিনীটির শেষাংশে পাণ্ডু এবং বিখ্যাত যোদ্ধা অঙ্গেন্দরের সাক্ষাৎকারের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। অঙ্গেন্দর ছিলেন গেন্দরি দেশের রাজপুত্র; তিনি তাঁহার ভগ্নী অঙ্গেন্দরির সহিত যাইতেছিলেন। পাণ্ডু এবং অঙ্গেন্দরের মধ্যে দ্বৈত সংগ্রামে পাণ্ডু বিজয়ী হওয়ায় গেন্দরি দেশের রাজপুত্র তাঁহার ভগ্নীকে পাণ্ডুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। এইরূপে পাণ্ডু চারিজন রাজকন্যা, যথা কুন্তি, পতহ্‌, মদ্রিন (নরসোমের ভগ্নী) এবং অঙ্গেন্দরি-সহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পাণ্ডু তাঁহার অন্ধ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এই চারিজন রাজকুমারীর মধ্য হইতে একজনকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি অঙ্গেন্দরিকে গ্রহণ করিলেন। যম বিত্নর পতহ্‌কে গ্রহণ করিলেন এবং অবশিষ্ট তুই রাজকন্যা পাণ্ডুর মহিষী হইলেন। এই ল্যাকোনে বলা হইয়াছে যে দেষ্টরত এবং গেন্দরি দেশের রাজকন্যা অঙ্গেন্দরির ১৫০ জন পুত্র হইয়াছিল।

রামায়ণ কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াও কিছু কিছু ল্যাকোন রচিত হইয়াছিল। ডঃ য়ুইনবল[৩৫] ইহার আলোচনা করিয়া বিস্তৃততর গবেষণার পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। তিনি রাম সবেগ্‌বোস্তেন ইঙ্‌ মস্তিল দিরেজের সহিত অনুরূপ যবদ্বীপীয় এবং মালয় আখ্যায়িকার তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে এই ল্যাকোনের উৎস হইল রাম-কেলিঙ্‌ নামক গ্রন্থ। এই ল্যাকোনের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে রামের বিবাহের পরে। লেগুতমের কাহিনীতে সুগ্রীব এবং বালির পূর্বের ইতিহাস বর্ণনা করা হইয়াছে; লেম্বু স্বর ইঙ্‌ নেগর গুব কিষ্কেও কাহিনীতে বলিবর্দের ঘটনাটি বর্ণিত হইয়াছে। রাম তম্বক, হনুমান দূত, রাম গনক্রুং এবং ক্রবোক নামক ল্যাকোনগুলিও রাম আখ্যায়িকা-চক্রের পর্যায়ে পরে। অন্যান্য ল্যাকোনগুলির মধ্যে লম্বিরে

দসমুক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে ; উহাতে দসমুক (= দশমুখ) বা রাবণের জন্ম এবং পূর্বেতিহাস বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার প্রায় আনুষঙ্গিক একটি ল্যাকোন আছে ; তাহার নাম লহিরে ইন্দ্রজিৎ। ইহাতে বলা হইয়াছে কিরূপে দসমুক বলপূর্বক ইন্দ্রের নিকট হইতে একজন বিদদরিকে (= বিদ্যাধরী) হরণ করিলেন এবং কিরূপে তাহাদের ইন্দ্রজিৎ নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। দসমুক তপতুরু নামক অপর একটি ল্যাকোনে বর্ণিত হইয়াছে কিরূপে একজন নকল মন্দুদরিকে দসমুকের নিকট সমর্পণ করা হইয়াছিল। এই স্থলে তাঁহার নাম দেবি রগো বলিয়া কথিত হইয়াছে। লোকপলের কাহিনীতে দসমুক কর্তৃক বিস্রবনের পরাজয়ের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। সস্র বাহুর (= সহস্র বাহু) সহিত দসমুকের সংগ্রাম কাহিনীও একটি ল্যাকোনে বিধৃত হইয়াছে। ববঙ্ সুমন্ত্রি নামক ল্যাকোনে দসমুকের সাহিত সস্রবহুর ভ্রাতৃগণের সংগ্রামের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে[৩৬]। অর্জুন সহস্রবাহু কাহিনী-চক্রের অন্তর্ভুক্ত আরো কিছু সংখ্যক ল্যাকোন আছে।

পূর্বের বর্ণনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে এই সমস্ত ল্যাকোন অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে রচিত হইয়াছিল এবং উহাদের প্রেরণার উৎস ছিল রামায়ণের পরবর্তী সংস্করণ-গুলি, যেমন : সেরৎকণ্ড, রামকেলিঙ্ ইত্যাদি। অনেক ল্যাকোনই আজকাল ভোজোৎসবে মঞ্চস্থ করা হয় ; যেমন : তিঙ্কেব-ভোজ এবং পুপক-পুসর ভোজ[৩৭]। এই শ্রেণীর ল্যাকোনকে বলা হয় সেরৎববচন (= শ্রীবচন) বা বওসন। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ল্যাকোনকে বলা হয় সেরৎকণ্ড রিঙ্গিৎ। অধ্যাপক ভ্রিদে এই শ্রেণীর বন্দুঙ্-নামক একটি ল্যাকোনের বিবরণ দিয়াছেন[৩৮]।

উপরোক্ত আলোচনা দিয়াই আমরা ভারতীয় মহাকাব্য-চক্রের অন্তর্ভুক্ত ওয়েয়াঙ্-কাহিনীগুলির বিবরণী সমাপ্ত করিলাম। যবদ্বীপীয় ওয়েয়াঙ্-সাহিত্য পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যের নায়ক-নায়িকাগণ যেন এই সমস্ত কাহিনীর অলিতে-গলিতে বিচরণ করিতেছেন ; কিন্তু তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অভিযান কাহিনী ভারতীয় গ্রন্থাদি হইতে পৃথক। উপরে সে সমস্ত ল্যাকোনের বিবরণ পরিবেশন করা হইয়াছে তাহা হইতে সম্ভবতঃ এই কথাটাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সঠিকভাবে বিচার করিলে পঞ্জি, দমর বুলন এবং আমির হামজা কাহিনীচক্রগুলি এই আলোচনার অঙ্গীভূত করা সঙ্গত নহে, কারণ তাহাদের মূল প্রেরণার উৎস অন্যত্র নির্ধারিত হইয়াছে। তবুও আলোচনা সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে যবদ্বীপীয় ওয়েয়াঙ্-নাট্যের অপরাপর অঙ্গ সম্বন্ধেও যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব ; তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ভারতীয় মহাকাব্য-চক্রের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ নিতান্তই গৌণ বা ক্ষীণ।

ওয়েয়াঙ্-পূর্বের পরে অপর একটি বিভিন্ন শ্রেণীর নাট্য বিকাশলাভ করিয়াছিল। ইহার নাম গেড়োগ। সেরুরিয়ার বলিয়াছেন যে ইহা মজপহিত রাজ্যের গৌরবময় যুগের অবদান। শব্দটির অর্থ পরিষ্কার নহে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে 'গেড়োগ' শব্দের অর্থ 'অশ্ব', কারণ এই নাট্যের নায়ক পঞ্জি যে সমস্ত উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার অর্থ 'অশ্ব' যেমন কুদ

বনেঙ্গপতি, উন্দকন বসেঙ্গসরি, ইনু জরণ ইত্যাদি। বলাবাহুল্য, এই যুক্তি বিশেষ বিচারসহ নহে। কেহ কেহ অবশ্য অন্য ব্যাখ্যাও প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু উহা আরো গ্রহণযোগ্য নহে; ওয়েয়াঙ্-পুর্ব এবং ওয়েয়াঙ্ গেড়োগ-নাট্যে চর্ম নির্মিত পুত্তলিকা ব্যবহৃত হয়; এই পুত্তলিকা-গুলির ছায়া পর্দার উপর প্রক্ষিপ্ত হয়। শেষোক্ত নাট্যের নায়ক হইলেন পঞ্জি, তিনি জঙ্গলের রাজকুমার এবং শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রতীক। দেবি অঙ্গ্রেনি, চন্দ্রকিরণ (সেকরতজি) এবং অন্যান্য রাজকুমারীদের লইয়া তাঁহার প্রেমাভিসারের কাহিনী, বিভিন্ন রাজা বিশেষতঃ সমুদ্রান্তবর্তী রাজাদের সহিত তাঁহার সংগ্রাম এই ওয়েয়াঙ্ গেড়োগের উপজীব্য বিষয়। এই স্থলেও সেমর এবং তাঁহার পুত্রদ্বয়কে বয়স্যরূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ওয়েয়াঙ্ গেড়োগে পুত্তলিকাগুলির অঙ্গসজ্জা ওয়েয়াঙ্-পুর্ব হইতে ভিন্নতর[৩৯]। এই স্থলে ক্রিস (=ছুরিকা)-ও সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দুই শ্রেণীর নাট্যের মধ্যে যে মৌলিক বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় তাহা হইল এই যে ওয়েয়াঙ্-পুর্ব-নাট্যের বিষয়বস্তু মুখ্যতঃ ভারতীয় মহাকাব্য হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু ওয়েয়াঙ্ গেড়োগের উৎসভূমি হইতেছে পঞ্জী-রোমান্সগুলি।

ওয়েয়াঙ্ কেলিটিক বা কেরুচিল আদৌ ছায়ানাট্য নহে, ইহাকে 'পুত্তলিকা নাট্য' বলাই সমীচিন। উপরোক্ত শব্দ দুইটির ব্যুৎপত্তি 'টিক' এবং 'চিল' হইতে; উহাদের অর্থ হইল অল্প বা নগণ্য। নামকরণটি এক হিসাবে সার্থক, কারণ পর্দার উপর প্রতিবিম্বিত কিম্ভূতকিমাকার ছায়ার স্থলে দর্শকেরা এখানে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুত্তলিকাই দেখিতে পাইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ওয়েয়াঙ্-পুর্ব এবং ওয়েয়াঙ্ গেড়োগের নাট্য-নাম উহার বিষয়বস্তু হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে; কিন্তু ওয়েয়াঙ্ কেলিটিক বা কেরুচিলের নাম হইয়াছে উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুত্তলিকা হইতে। প্রথম পর্বে পর্দার মধ্যভাগে চতুষ্কোণ ছিদ্র করিয়া পুত্তলিকাগুলি দেখান হইত; পরবর্তীকালে ঐ পর্দার (কেলির দদকন) ব্যবহার একেবারে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

কেহ কেহ মনে করেন যে এই নাট্য মজপহিত-যুগে উদ্ভূত হইয়াছিল। ইহা লক্ষ্যণীয় যে ওয়েয়াঙ্ কেলিটিকের কোন ধর্মীয় পটভূমিকা নাই; ইহা কেবলমাত্র রাত্রে নহে, কখনো কখনো দিনেও প্রদর্শিত হয়। ইহা পঞ্জি কবিতা মলৎ-এ উল্লিখিত হইয়াছে; এই কবিতাটি ১৫০০ খৃষ্টাব্দের পরে রচিত হয় নাই বলিয়া মনে করিবার হেতু আছে[৪০]। ওয়েয়াঙ্ কেলিটিক-নাট্য দমর বুলন-চক্রের কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। দমর বুলন ছিলেন মজপহিত রাজের অশ্বরক্ষকের বংশসম্ভূত এবং তিনি ছিলেন পঞ্জির দ্বিতীয় প্রতিমূর্তি বিশেষ। এই সাহিত্য চক্রে সব্দপলোন এবং নয় গেঙ্গোঙ্গ্ নামক দমর বুলনের ভৃত্যদ্বয় সেমর এবং তাহার পুত্রদ্বয়ের স্থান অধিকার করিয়াছে[৪১]। এই নাট্য মঞ্চস্থ করার সময় গামেলান লরস্ মিরিঙ্গ্ সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

এই একই সঙ্গীত ওয়েয়াঙ্ গোলেক-নাট্যেও পরিবেশিত হয়। এই নাট্যে গোলাকার এবং পুরু কাষ্ঠ পুত্তলিকা ব্যবহৃত হয়। এই পুত্তলিকাগুলির নিম্নাঙ্গ বস্ত্রসজ্জায় আবৃত থাকিলেও উর্ধাঙ্গ অনাবৃত থাকে। অনুমিত হইয়াছে যে এই নাট্য দক্ষিণ ফুকিয়েনের চীনাদের পো-টী-হি নাট্যের অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছে[৪২]। ইহা পশ্চিম যবদ্বীপে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে এবং

ইহা বিষয়বস্তু নির্বাচনে ভারতীয় মহাকাব্য ও দমর বুলন সাহিত্য-চক্রের কাহিনী সমভাবে ব্যবহার করিয়াছে[৪৩]।

ওয়েয়াঙ্ তোপেঙ্গ্-নাট্যে পুত্তলিকার স্থল অধিকার করিয়াছে মুখোসধারী ব্যক্তিগণ। ইহাতে নৃত্য, গীত এবং বাদ্য আছে। মনে হয় যে এই নাট্য ছায়ানাট্যের সমসাময়িক। কারণ ইহা যে কেবলমাত্র মধ্য জাভানিজ পঞ্জি-রোমান্স মালাৎ নামক কবিতায় (২/১৫) সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা নহে; ইহার প্রাচীনত্বের অভিজ্ঞান আদিপর্ব, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের গদ্য সংস্করণ, ৯৮০ শকাব্দের অনুশাসনলিপি এবং নাগরকৃতাগম নামক ঐতিহাসিক কাব্যেও (৬৬/৫) রহিয়া গিয়াছে[৪৪]। যদিও সেরুরিয়ার ভারতবর্ষকে ইহার উদ্ভবস্থল বলিয়া মনে করেন[৪৫], তথাপি ইহার পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ বিদ্যমান নাই। বস্তুতঃ দেখা গিয়াছে যে সংস্পর্শ-বিহীন বিভিন্ন প্রাচীন গোষ্ঠীর মধ্যে এইরূপ নাট্যের প্রচলন ছিল; সুতরাং এক গোষ্ঠী আর একটি গোষ্ঠী হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছে এইরূপ মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তবে ভারতবর্ষ এবং প্রাচীন যবদ্বীপের সাংস্কৃতিক সংযোগের কথা স্মরণ রাখিলে এইরূপ ঘটা একেবারে বিচিত্র বলিয়া মনে হইবে না। বিশেষতঃ এই নাট্যে গামেলান, সলেন্দ্রো নামক যন্ত্র সঙ্গীত পরিবেশন করাই নিয়ম এবং উহা ভারতবর্ষ হইতে উদ্ভূত বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এই নাট্যের সহিত গামেলান সলেন্দ্রো-যন্ত্রসঙ্গীত অঙ্গাঙ্গী ভাবে সংযুক্ত থাকায় কেহ কেহ ইহার উদ্ভবস্থলও ভারতবর্ষ বলিয়া মনে করিতে উৎসাহ বোধ করিবেন। সে যাহাই হউক, কালক্রমে যখন মুখোসধারী ব্যক্তির সংখ্যা ২৭ হইল, তখন মঞ্চে জক সেমবুঙ্গের কাহিনী রূপায়িত করা হইল[৪৬]। জকব্লুবো নামক দ্বিতীয় কাহিনীটি[৪৭] মতরাম রাজ্যের গোড়াপত্তনের সময় সংযোজিত হইয়াছিল; তখন মুখোসধারীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চল্লিশে পৌঁছিয়াছিল। জক পেঞ্জরিঙ্গ এবং কুদনর বংস নামক আরো দুইটি কাহিনী যথাক্রমে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে এবং ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে সংযোজিত হইয়াছিল[৪৮]। ইহার নায়ক হইলেন পঞ্জি।

ওয়েয়াঙ্-বোঙ্গ্ প্রায় আধুনিক কালের নাটকের মত। ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে ১ম মঙ্কুনেগরের পৃষ্ঠপোষকতায় বিকাশ লাভ করে। পুত্তলিকার স্থলে মানুষের আবির্ভাব অনেকটা শঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা যবদ্বীপে কখনো জনপ্রিয় হয় নাই, যদিও ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা স্থানীয় রাজন্যবর্গের আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিল। ইহার বিষয়বস্তু মুখ্যতঃ ওয়েয়াঙ্-পর্ব হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে[৪৯]। উপরে যে সমস্ত ওয়েয়াঙ্ নাট্যের আলোচনা করা হইল তাহা হইতে ওয়েয়াঙ্-বেবের সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেরুরিয়ার এবং আরো কোন কোন পণ্ডিতের মতানুসারে ইহাই ওয়েয়াঙের আদি রূপ। এই নাট্য সম্বন্ধে যিঙ্-যেই-সেঙ্গ-লনে (১৪১৬ খৃঃ) লিখিত হইয়াছে "একদল লোক আছে যাহারা কাগজে মানুষ, পক্ষী, জন্তু, কীট প্রভৃতি চিত্রিত করিয়া থাকে; এই কাগজ পটের মত এবং উহাকে দুইটি তিন ফুট উচ্চ কাঠের রোলারের (roller) মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়; এই রোলার দুইটির একদিকের প্রান্ত পটের একদিকের প্রান্তের সমান্তরাল। অন্য প্রান্তের রোলার দুইটি আবার পট ছাড়াইয়া বাহির হইয়াছে। যে লোকটি পট দেখায় সে মাটিতে বসিয়া পটটি নিজের সম্মুখে রাখে এবং

একটু একটু করিয়া উহা উন্মুক্ত করিতে থাকে ; উহা দর্শকদের দিকে ঘুরাইয়া সে দেশী ভাষায় উচ্চকণ্ঠে উহার প্রত্যেক অংশের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। দর্শকেরা তাহার চতুষ্পার্শ্বে বসিয়া থাকে এবং সে যাহা বলে তাহা শুনে এবং তাহার বর্ণনানুযায়ী হাসে অথবা কাঁদে[৫০]।" ইহাতে যন্ত্রসঙ্গীত নাই। ইহা দেখাইবার পূর্বে ড়লঙ্ সুগন্ধি দ্রব্য পোড়ান, প্রার্থনা করেন এবং একটি বাক্সের গায়ে চেম্পল আঘাত করেন। ইহাতে সম্ভবতঃ আমির হাম্‌জা সাহিত্যচক্র ব্যতীত অন্য সমস্ত সাহিত্যচক্র হইতেই ঘটনাবলী প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ওয়েয়াঙ্-বেবেরের অনুরূপ ছিল প্রাচীন ভারতীয় পটপ্রদর্শক, কিন্তু পতঞ্জলির মহাভাষ্য (১৪০ খৃঃ পূঃ), বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস (প্রথম অঙ্ক) এবং বাণের হর্ষচরিত হইতে প্রতীয়মান হইবে যে এই দুইটি জিনিষ এক নহে। টেক্‌নিক্যাল শব্দগুলির নামকরণের প্রশ্ন বাদ দিলেও[৫১] যবদ্বীপে পট-প্রদর্শনের পূর্বে কতকগুলি বাধ্যতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল ; ভারতীয় সাহিত্যে ইহার উল্লেখ নাই। অবশ্য উল্লেখ না থাকায় কিছুই প্রমাণিত হয় না ; হয়তো গ্রন্থকারেরা উহা উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা আদৌ উপলব্ধি করে নাই। সুতরাং ইহা অসম্ভব নয় যে এই পট-প্রদর্শনী প্রাচীন ভারতের অবদান, কিন্তু আমাদের বর্তমানের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে এই সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর নয়। এই পটপ্রদর্শনী আধুনিক যবদ্বীপে প্রায় নাই বলিলেই চলে।

ওয়েয়াঙ্-নাট্য যবদ্বীপ হইতে বলিদ্বীপে প্রচারিত হইল। ডঃ ভান দের-তুক[৫২] বলেন, "যে কোন গদ্য রচনা কবিতায় রূপান্তরিত হইলেই বলিদ্বীপের অধিবাসীরা উহাকে পর্ব নামে অভিহিত করিয়া থাকে। তাহাদের ওয়েয়াঙ্-নাট্যকে ওয়েয়াঙ্ পর্ব (অথবা বলিদ্বীপীয় উচ্চারণ অনুযায়ী : প্রব) বলা হয়···বলিদ্বীপীয় ওয়েয়াঙ্ পৌত্তলিক-পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত এবং ইহার নায়কগণ অর্জুনবিবাহ, রামায়ণ, ভারতযুদ্ধ, ভোমকাব্য হইতে গৃহীত ; এক কথায় যে সমস্ত কাব্যে ভারতীয় নায়কগণ আছেন তাহারাই ইহার প্রধান নট।" বলিদ্বীপীয় ড়লঙ্ তাহার বিষয়বস্তু সাক্ষাৎভাবে কাব্যগুলি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, পকেম্ বা গদ্যে লিখিত সংক্ষিপ্তসার হইতে নহে। মুখোসধারীদের নাট্যও বলিদ্বীপে প্রচলিত আছে, তবে উহার উপাদান মধ্যযুগের যবদ্বীপীয় কাব্য রঙ্গলব হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে, যবদ্বীপের মত পঞ্জি-কাহিনী হইতে নহে[৫৩]। কোন কোন পণ্ডিতের মতে সুমাত্রা, মালাক্কা এবং রিউভের ছায়া-নাট্য যবদ্বীপ হইতে প্রচলিত হইয়াছে। এই স্থলে ড়লঙ্গের নাম হইয়াছে পবঙ্গ। অনুমিত হইয়াছে যে উক্ত পবঙ্গ-শব্দটি পহ্বঙ্-শব্দের বিকৃত মাত্র এবং উহা যবদ্বীপীয় শব্দটির অনুরূপ। এই সমস্ত নাট্যের বিষয়বস্তু মালয় সেরিরাম এবং অন্যান্য রচনা, যেমন কেন্ তম্বুহন, বিদসরি প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

ল্যাকোনগুলি ও মূল সংস্কৃত কাহিনীতে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ডঃ রাসের্স এই ব্যাপারটির এক অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে ল্যাকোনগুলি সমাজের আদিম দ্বৈত-ব্যবস্থার (endogamy and exogamy : সহগোত্র এবং অ-সহগোত্র) পরিচায়ক। এই দ্বৈত সমাজ ব্যবস্থা যখন ল্যাকোনে রূপায়িত হইল তখন ভারতীয় মহাকাব্য-গুলির নায়ক নায়িকাগণের নাম ইহাতে অনুপ্রবেশ করিল এবং ইহার ফলেই ল্যাকোনগুলির

আখ্যায়িকাভাগ ভারতীয় মহাকাব্য হইতে অনেকটা স্বতন্ত্ররূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। বস্তুতঃ উপরোক্ত দ্বৈত-ব্যবস্থা সম্বলিত সমাজ ব্যবস্থার উপর যেন ভারতীয় পরিচ্ছদ সংযোজিত হইয়াছে। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখিতে গেলে ওয়েয়াঙ্-নাটকগুলি দ্বিধাবিভক্ত সমাজের রূপচ্ছায়া এবং উপকথা। সমাজ যদি দ্বিধাবিভক্ত হয় তাহা হইলে তাহাদের পুর্ব পুরুষের প্রেতাত্মাগণও দ্বিধাবিভক্ত হইবে ; ইহাদের পার্থিব রূপায়ণই হইল ওয়েয়াঙ্ কাহিনী।

ডঃ হিড্ডিঙ্ এই সম্বন্ধে অনেকটা ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলিয়াছেন যে ওয়েয়াঙ্ কাহিনীর মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে উচ্ছ্বাসপ্রবণ মানুষের সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ ; এই সম্বন্ধ সৃষ্টি, স্থিতি এবং লোকের ভাগ্যকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইয়াছে। ইহার মধ্যেই নিহিত আছে জীবন এবং মৃত্যুর রাজ্য এবং ইহা হইতেই জীবন বারম্বার সঞ্জীবিত হইতেছে। তিনি তাই ওয়েয়াঙের ম্যাজিক-উচ্ছ্বাসময় অভিব্যক্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন ; ইহাতে যেন মানুষ জীবনের উৎসের সহিত একত্ব অনুভব করিবার প্রয়াসে ফিরিতেছে।

যদি আমরা রাসের্স এবং হিড্ডিঙের এই জটিল তত্ত্ব ঠিকমত বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে উপরোক্ত সারমর্মই তাহাদের বক্তব্য বিষয়। যবদ্বীপীয় নাট্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস এত অস্পষ্ট ও সমস্যাসঙ্কুল যে ইহাকে কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণার দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না ; মনে হয় যে রাসের্স, পিগো, হিড্ডিঙ্ প্রমুখ পণ্ডিতগণ যবদ্বীপের ইতিহাসে দ্বৈত ব্যবস্থা এবং ম্যাজিকের অবদান সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি করিয়াছেন ; কারণ প্রকৃতি এবং সমাজে এত বিভিন্ন প্রকারের দ্বৈত ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং তাহার সংখ্যা এত বেশী যে ইহার কোন একটিকে আমরা নির্দিষ্ট রূপে ওয়েয়াঙ্ কাহিনী বা পঞ্জি-রোমান্সের সৃষ্টির জন্য দায়ী করিতে পারি না। পঞ্জি-রোমান্টিক কাহিনী আলোচনা করিবার সময় এই বিষয়গুলি আমরা আর একবার পর্যালোচনা করিয়া দেখিব।

এইবার আমরা যবদ্বীপের আরো একটি লোকরঞ্জন শাখার কথা উল্লেখ করিব। উহা হইল কিদুঙ্-সাহিত্যের গীতি বিভাগ। আমরা এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থলে ইহার কথা সময়ে সময়ে উল্লেখ করিয়াছি। নাগরকৃতাগমের ৯০/৬ হইতে ৯১/৮ সর্গ পড়িলে মজপহিত যুগের উৎসব উপলক্ষ্যে গীতি নাট্যের ভূমিকা উপলব্ধি করিব। উক্ত স্থলে বর্ণিত হইয়াছে যে গীতদ[৫৪] নামক কিদুঙ্-সঙ্গীতের পরিবেশকগণ পালাক্রমে পরে পরে গাহিত। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া না গেলেও মনে হয় যে ইহা আমাদের বাঙ্লা দেশের কবি গানের মত ; মালয় দেশের পন্তুন এবং যবদ্বীপের পরিকনের সহিতও ইহার সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়। মনে হয় যে মজপহিত যুগে কবি গানের মতই ইহাতে দলগত প্রতিযোগিতার ভাব বিদ্যমান ছিল[৫৫]। সঙ্গীত সহযোগে পরিবেশিত এই সমস্ত কিদুঙের বিষয়বস্তু ছিল রাজগণের কীর্তিকাহিনী, পুরাণ কথা, কিম্বদন্তী প্রভৃতি। গীতদ ব্যতিত আরো ছিলেন জুরু-ই-অঙ্গিন। জুরু-ই-অঙ্গিন এবং নবনৃত্যের রিঙ্গিৎ দ্বারা খুব সম্ভব নর্তকী বুঝাইত[৫৬] ; তিনি বুয়ুৎ বা বৃদ্ধ সহকর্মীর সহযোগিতায় আসরে নামিতেন। জুরু-ই-অঙ্গিনের নৃত্যের কথা এবং রাজপরিবারের লোক দ্বারা রকেৎ-নৃত্যে নাট্য পরিবেশনের কাহিনী নাগরকৃতাগমের উপরোক্ত স্থলে বিবৃত

হইয়াছে। উক্ত স্থলে বলা হইয়াছে যে জুরু-ই-অঙ্গিন সঙ্গীত ও নৃত্য করিতে করিতে উৎসব প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন; তাহার চরণতলে উপহার দ্রব্য বর্ষিত হইতে লাগিল[৫৭]। তিনি পানোৎসবে যোগদান করিলেন; নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কিদুঙ্ সঙ্গীত চলিল; জুরু-ই-অঙ্গিনের সহিত মন্ত্রী, উপপত্তি প্রভৃতি সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করিলেন; এমন কি স্বয়ং রাজাও। শোরি, গীতদ এবং তেকেশগণও সঙ্গীত পরিবেশন করিতেন। এই প্রকার সঙ্গীত সম্ভবতঃ প্রধানতঃ ছিল প্রেম বিষয়ক। বিতানের কেন্দ্রস্থলে রাজবাড়ির এই চৈত্রোৎসবে নবনত্য-অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহার মূল সুর ছিল নীতিদ্যোতক। গ্রন্থে উল্লেখ না থাকিলেও এই উপলক্ষ্যে যে বাদ্য-যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হইত তাহা অবধারিত। এই নবনত্যের বিবরণ অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং এখানে ইহার কথা আর বেশী বলিলাম না। উপরে যে গীতিকাব্য বা গীতিময় নৃত্য-নাট্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা কোনদিন লিখিত পুঁথিরূপে রক্ষা করা হইয়াছিল কিনা সন্দেহ স্থল। করুণ রস এবং বয়স্যজনোচিত ভাঁড়ামির পরিবেশ সৃষ্টি করাই যেন যবদ্বীপীয় গীতি-নাট্যের বিশেষত্ব ছিল। ডঃ পিগো অনুমান করিয়াছেন যে চৈত্রোৎসবের রকেৎ অভিনয়ের মধ্যে ধর্ম ও উপকথার নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে।

প্রাচীন যবদ্বীপে সঙ্গীত ও কামরসের জারকে পরিবেশিত হইত প্রহসন। এই প্রহসনের সহিত আধুনিক ওয়েয়াঙের বনোলন দৃশ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান এবং উহার নাম ছিল পিরুস। ডঃ পিগো মনে করেন যে পূর্ব যবদ্বীপের আধুনিক জনপ্রিয় লুড্রুগ-প্রহসন সম্ভবতঃ প্রাচীন পিরুস-নাট্যের উত্তরাধিকারী কিংবা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট। পররতনে বলা হইয়াছে যে রাজা হয়ম ভুরুক স্বয়ং কখনো কখনো বনোল্-নাট্যে অংশ গ্রহণ করিতেন।

যবদ্বীপ এবং বলিদ্বীপের ওয়েয়াঙ্-সাহিত্যের আলোচনা আমরা এই স্থলে সমাপ্ত করিলাম। ক্লাসিকাল যুগের পরিমণ্ডল এই সমস্ত ছায়ানাট্যে অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু একথাও সত্য যে ভারতীয় মহাকাব্যের অনেক আখ্যায়িকাভাগ এখানে বিভিন্ন-রূপে রূপায়িত হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয় কাহিনীগুলি যে আদর্শ-জগতে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল তাহা অনেকাংশে বিনষ্ট হইয়াছে। তবে সভ্যতা-সংস্কৃতি, দূরত্ব এবং পরিবেশের কথা চিন্তা করিলে যেটুকু অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে তাহার কথা ভাবিয়াই বিস্মিত হইতে হয়। সময় এবং গণরুচির কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য। সুতরাং ভারতীয় মহাকাব্যের নায়কগণ দ্বীপময় ভারতের রঙ্গমঞ্চে যে বেশে এবং যে পরিমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছেন তাহাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। এই ছায়ানাট্যগুলি যবদ্বীপে একদা খুব জনপ্রিয় ছিল; এখনো ইহার জনপ্রিয়তা খুব হ্রাস পায় নাই। এই সমস্ত ওয়েয়াঙ্ মূর্তিগুলির অদ্ভুত ষ্টাইল বা ঢঙের স্থায়ী স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে পনতরণ মন্দিরগাত্রের রামায়ণ চিত্রাবলীতে। এই রীতিকে আমরা ওয়েয়াঙ্-ষ্টাইল বলিতে পারি। কারণ, আধুনিক যবদ্বীপীয় ওয়েয়াঙ্-নাট্যের পুতুল-গুলির আকৃতি ও অঙ্গসজ্জায় যে রীতি বা ষ্টাইল বিদ্যমান তাহা চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর শিল্পে প্রতিফলিত হইয়াছে। আধুনিক বলিদ্বীপের কার্পাস বস্ত্রেও এই ওয়েয়াঙ্-ষ্টাইলের চিত্রাজি অঙ্কিত হইয়া থাকে। ডঃ পিগো বলিয়াছেন যে ওয়েয়াঙ্-ষ্টাইল মজপহিত যুগের সভ্যতাকে

সপ্তদশ এবং পরবর্তী শতাব্দীর বলিদ্বীপ এবং মধ্য যবদ্বীপের সভ্যতার সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে।

পা দ টী কা

১. G. A. J. Hazeau, *Bijdrage tot de kennis van het Javaansche tooneel*, 1897, pp. 20-21.

২. *JAOS*, XXXII, pp. 58-63.

৩. Pischel, *Das altindische Schattenspiel* in *Sitzungsber. Koning. Preuss. Akad. d. Wiss.*, 1906 pp. 482-502.

৪. এই ধরণের মূর্তির প্রতিচ্ছবির জন্য দ্রষ্টব্য : J. Kats, *Het Javaansche tooneel* ; also *Handelingen van het eerste congres voor de Taal, Land en volkenkunde van Java*, 1919, Abrecht & Co., Weltevreden, 1921.

৫. *Rāma-legenden und Rāma-reliefs in Indonesien*, p. 66.

৬. H. H. Juynboll, *Het Javaansche tooneel*, pp. 29-30.

৭. Serrurier, *De Wajang Poerwa, eene ethno. studie*, 1896, pp. 95-96, 106-12 ; Hazeau, *op. cit.*, pp. 7-9.

৮. *Encyclo. Nederl. Oost-Indie* IV, 2nd ed., pp. 395-96.

৯. *BKI*, 82 (1926) p. 200 ; *Arjunavivāha*, 5/9.

১০. Kern, *VG* IX pp. 12, 174.

১১. Pigeaud, *De Tantu Panggĕlaran*, 1924, p. 170.

১২. J. Kunst and C. J. A. Kunst van Wely, *De toon-kunst van Bali*, 1925, pp. 170-75 ; *BKI*, 89 (1932) pp. 110-16.

১৩. *Op. cit.*, ১৬-১৮।

১৪. Hazeau, *op. cit.*, pp. 23-24, 39-57.

১৫. ওয়েয়াঙ্ কদাচিৎ দিনের বেলায় প্রদর্শিত হয়।

১৬. *Op. cit.*, p. 45.

১৭. *Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten*, p. 374, instelling no. 28.

১৮. তুলনীয় তুর্কী 'গারাগোজ'।

১৯. Quoted by Hazeau, *op. cit.*, p. 27.

২০. Groeneveldt, *Notes on the Malay Archipelago and Malacca*, pp. 20 ff.

২১. *TBG*, 32, p. 425.

২২. Cf. Moura, *Le Royaume du Cambodge* II, pp. 444-458 ; cf. also F. W. K. Muller, Nāṅg, *Siamesische Schattenspiel-figuren*, Supplement to Internationale Archiv for Ethnographie, VII.

২৩. XII, CCXCV, 5,

২৪. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : *Encyclo. Neder. Oost-Indie*, IV, second ed., pp. 396 ff.

২৫. *TBG*, XXXII, pp. 368 ff. ; ed. Brandes, *Pararaton* in *VBG* XLIX, 1897, pp. 209-11 ; Hosein Djajadiningrat, *op. cit.*, p. 301 ; Hazeau, *Oud en Nieuwe uit de Javaansche Letterkunde*, 1921, pp. 5-6.

২৬. J. Kats, *Het Javaansche tooneel*, p. 55.

২৭. No. 1, Cod. 1979. Leg. Warn.

২৮. No. 146, Cod. 1979 Leg. Warn.

২৯. *Encyclo. Neder. Oost-Indie* IV, p. 397.

৩০. *VG* X, 169.

৩১. *BKI*, 1895, p. 95.

৩২. *BKI*, 6th series VI, pp. 333-388.

৩৩. *Palasara, Pandu en Raden Panji* pp. 111-201.

৩৪. *BKI*, 4th series III, 1879, pp. 273-329.

৩৫. *BKI*, 54, pp. 501-65.

৩৬. এই সমস্ত ল্যাকোনগুলির কোন কোনটির জন্য দ্রষ্টব্য : Stutterheim, *Rāma-legenden und Rāma-reliefs in Indonesien.*

৩৭. *Encyclo. Neder. Oost-Indie* IV, 2nd ed., p. 397.

৩৮. *Cat. Jav. Mad. Hss* 1892, pp. 20 ff.

৩৯. *Encyclo. Neder. Oost-Indie* IV, p. 398.

৪০. ঐ।

৪১. *TBG*, 38 pp. 457-86.

৪২. *Encyclo. Neder. Oost-Indie* IV p. 400.

৪৩. Juynboll, *Catalogus van 's Rijks ethnogr. museum*, XIII (1918) pp. 177-203.

৪৪. *Encyclo., op. cit.*, p. 401.

৪৫. *TBG* 1873, II p. 5.

৪৬. *Internationales archiv fur Ethnographie*, XIV, pp. 50-53.

৪৭. *Ibid*, pp. 63-65.

৪৮. *Ibid*, pp. 67 ff.

৪৯. *Encyclo., op. cit.*, p. 402.

৫০. Groeneveldt, *op. cit.*, p. 53.

৫১. যবদ্বীপীয় ওয়েয়াঙ্ বেবেরের যমপটক এবং মংখ শব্দ দুইটির ইতিহাস অনুসন্ধানযোগ্য।

৫২. *JRAS*, n. s., XIII, p. 49.

৫৩. *Encyclo, op. cit.*, p. 403.

৫৪. বাণের হর্ষচরিতের একটি টীকায় গীতদ শব্দের ব্যবহার হইয়াছে এবং অধ্যাপক কার্ণ এইদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এখানে গীতদ এবং ভাষাকবি শব্দ দুইটি সমবোধার্থকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাদের উভয়েরই অর্থ হইল সঙ্গীত-রচয়িতা।

৫৫. Cf. Pigeaud, *Java in the 14th Century*, IV, pp. 314-5.

৫৬. *Ibid*, p. 316.

৫৭. *Ibid*.

অষ্টাদশ অধ্যায়

জাভা এবং বলিদ্বীপের অন্যান্য গ্রন্থ

এই অধ্যায়ে আমরা অপর কতকগুলি গ্রন্থের আলোচনা করিব যাহা ভারতীয় মহাকাব্য চক্রের বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে অথবা যাহার বিষয়বস্তু প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থের উৎস সন্ধান করা সহজসাধ্য নহে; সুতরাং আলোচনার সৌকর্যার্থ উহাদিগকে একটি গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনাই সুবিধাজনক। আমরা স্মরদহন নামক কাব্যটি[১] দিয়াই এই আলোচনার সূত্রপাত করিব; কারণ ইহার কাব্য-গৌরবের কথা বাদ দিলেও প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যের ক্রমবিকাশ নির্ধারণে ইহার গুরুত্ব অসাধারণ। অনেকে আরো বিশ্বাস করেন যে এই গ্রন্থ পঞ্জি-রোমান্সের সার্থক স্মৃতিবহ এবং প্রাচীন যবদ্বীপীয় একজন রাজার চরিত্রের উপর বিচিত্র আলোকসম্পাত করিয়াছে। এই আখ্যায়িকার বিষয়বস্তু নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

প্রথম সর্গের প্রারম্ভেই প্রেমের দেবতা কামদেবের প্রশস্তি উচ্চারিত হইয়াছে; ইহা একই সঙ্গে তৎকালীন রাজা কামেশ্বরের প্রশস্তিও বটে (১-৬)[২]। এই কাব্যের রচয়িতা ম্পু ধর্মজের নাম সপ্তম শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। স্মরদহন কাব্যের মূল আখ্যায়িকাভাগ পরবর্তী শ্লোক হইতেই আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে পুরাকালে শিব মেরুপর্বতে যাইয়া দর্শন-বৃক্ষতলে যোগাসনে বসিয়াছিলেন (৮-১০)। স্বর্গের শক্রাদি দেবগণ, সিদ্ধ, ঋষি, গন্ধর্ব এবং অপ্সরগণ দৈত্যরাজ নীলরুদ্রকের দৌরাত্মে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। দৈত্য-রাজের রাজধানী ছিল হিমালয়ের দক্ষিণ পদমূলে সেনাপুর-নামক স্থানে (১১-১৪)। দেবগুরু বৃহস্পতির উপদেশানুযায়ী দেবগণ কামদেবের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; কামদেব পার্বতীর প্রতি শিবের প্রেমভাব উদ্দীপিত করিবেন ইহাই ছিল তাঁহার প্রতি দেবগণের অনুজ্ঞা। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে ইঁহাদের মিলন হইতে গজাননের জন্ম হইলে গজানন এই দৈত্যের বিনাশ সাধন করিতে পারিবেন (১৫-১৬)। কবি অতঃপর বেদ, কুটারমানব, চাণক্য এবং কামন্দক শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ বৃহস্পতির প্রশংসা করিয়াছেন (১৭)। এই পরিকল্পনানুযায়ী দেবগণ কামদেবের বাসভবনে গমন করিলেন; উহা যেন পুষ্পসম্ভারের প্রাসাদ ছিল। এই সর্গের শেষ পর্যন্ত ইহার বর্ণনা চলিয়াছে (১৮-২৩)।

দ্বিতীয় সর্গের সূচনায় দেবগণের আগমন এবং কামদেব কর্তৃক তাঁহাদের অভ্যর্থনার

বিবরণ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে (১)। ইন্দ্র এবং বৃহস্পতি নীলরুদ্রক নিধনের প্রয়োজন বিবৃত করিলেন। কামদেব শিবের ক্রোধ স্মরণ করিয়া ভীত হইলে দেবগণ বলিলেন যে শিবের স্বভাবকোমল হৃদয় সত্ত্বেও যদি কামদেব ভস্মীভূত হন তাহা হইলে দেবগণ তাঁহাকে অমৃত সিঞ্চনে পুনরায় সঞ্জীবিত করিবেন (২-৬)। এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া কামদেব অশোকবৃক্ষতলে রচিত চন্দ্রাতপতলে তাঁহার পত্নী রতির নিকট গমন করিলেন। দেবগণ ইত্যবসরে কামদেবের প্রাসাদ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন (৭-১৯)।

পরবর্তী দুইটি সর্গে কাম এবং রতির বিচ্ছেদের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। রতিদেবী দেবগণের প্রয়োজন সত্ত্বেও কামদেবকে যাইতে না দিতে বদ্ধপরিকর ; তাঁহার আশঙ্কা ছিল যে তাঁহার প্রিয়তম স্বামী আর তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিবেন না। পঞ্চম সর্গে দেবগণ এবং ঋষিগণের সমভিব্যাহারে কামদেবের যাত্রার কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। পরবর্তী সর্গে আমরা তাঁহাদিগকে মেরুপর্বতে সমুপস্থিত দেখিতে পাইতেছি (১)। তাঁহাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বজ্র ও ঝঞ্ঝায় দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত হইয়া উঠিল (৩-৪)। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে শিবের দ্বার-রক্ষক নন্দীশ্বর এবং মহাকাল দণ্ডায়মান ; তাঁহাদের উপর আদেশ ছিল যে কাহাকেও তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিতে দিবেন না। কামদেব তাঁহার আগমনের কারণ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং শিবকে দর্শন বৃক্ষতলে দেখিলেন।

সপ্তম সর্গে কামদেব কর্তৃক শিবের তপস্যাভঙ্গের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কামদেব তাঁহার সমস্ত পুষ্পশর উজার করিয়া শিবকে আঘাত করিলেন, কিন্তু উহা শিবদেহে অলঙ্কার হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার দেহ দ্বিগুন শোভায় পরিমণ্ডিত হইল (১-৭)। নিরুপায় হইয়া তিনি অবশেষে তাঁহার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বিষয়-অস্ত্র ক্ষেপন করিলেন ; উহা তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিল (১১-১২)। পরবর্তী সর্গেও এই কাহিনীটির জের টানিয়া লওয়া হইয়াছে। অস্ত্রাঘাতের মোহে শিব তৎক্ষণাৎ পর্বত-দুহিতা উমার কথা স্মরণ করিলেন (১)। তিনি ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে কামদেব উদ্যত ধনুশর লইয়া তাঁহাকে দ্বিতীয়বার আঘাত করিবার জন্য সমুদ্যত (৩)। তিনি রুদ্র মূর্তিতে দেখা দিলেন ; তাঁহার মস্তক হইল পাঁচটি এবং বাহু হইল সহস্র (৮-১০)। বিপদ দেখিয়া কামদেব দেবগণকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন (১১-১২)। শিব তাঁহার তৃতীয় নেত্রের অগ্নি কামদেবের প্রতি সন্নিবদ্ধ করিলে কামদেব ক্রমে ক্রমে ভস্মীভূত হইয়া গেলেন (১৩-১৫)। কামদেবের আত্মা স্বর্গে চলিয়া গেল (২৩)।

নবম সর্গের প্রারম্ভ বেদনায় উচ্ছল। নিজের জীবন রক্ষা করিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র পলায়নোন্মুখ হইলে বৃহস্পতি তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। বৃহস্পতি ইন্দ্রকে অন্যান্য দেবগণ সহ শিবের নিকট সমুপস্থিত হইতে পরামর্শ দিলেন (৭-১৭)। দেবগণ কর্তৃক শিবের স্তুতি-পাঠে পরবর্তী দুইটি সর্গ উৎসৃষ্ট হইয়াছে। শিব তাঁহাদের আগমনের কারণ জানিতে চাহিলে বৃহস্পতি কামদেবের জন্য ক্ষমাভিক্ষা চাহিলেন (১২/১-৪) এবং কোন্ পরিস্থিতিতে তাঁহারা

এই পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন (৫-১০)। শিব বলিলেন যে কামদেব আর স্বদেহে বিচরণ করিতে পারিবেন না; তাঁহার দেহ সূক্ষ্মতম কণায় রূপান্তরিত হইবে (১১-১৩)।

দেবরাজ ইন্দ্র তখন কামদেবের দেহ পরিদর্শন করিলেন, উহা তখনো সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয় নাই (১৩/৩)। মুমূর্ষু কামদেব ইন্দ্রকে তাঁহাদের বন্ধুত্ব অক্ষয় রাখিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন এবং তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে অনুরোধ করিলেন। অতঃপর সপ্তর্ষি এবং ইন্দ্র নিজেদের গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন (৯-১১)। পরবর্তী তিনটি সর্গ (১৪-১৬) সুরুচিপূর্ণ নহে।

সপ্তদশ সর্গে একটি মাত্র শ্লোক আছে; উহা রতির বিলাপে মুখর। পরবর্তী সর্গের প্রারম্ভে (১-৬) প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা করা হইয়াছে। একজন দেবদূত রতিদেবীর নিকট কামদেবের মৃত্যুসংবাদ বহন করিয়া আনিলেন। রতি মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন এবং শোকাচ্ছন্ন হইয়া তিনবার ভূতলে গড়াগড়ি দিলেন (৭-১১)। অবশেষে তিনি করুণকণ্ঠে বৃহস্পতিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন যে দেবগণই তাঁহার স্বামীর অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী (১৯/১-৯)। বৃহস্পতি অতঃপর কামদেবের ভস্মীভূত হওয়ার সময় পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করিলেন এবং রতিদেবীকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন যে জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং ইহা বাত্যা-তাড়িত মেঘের মতই চঞ্চল (১০-১৭)।

বিংশ সর্গে আমরা দেখিতেছি রতি দেবগণের নিকট হইতে বিদায় লইলেন এবং মৃত্যুকে বরণ করিয়া স্বামীর সান্নিধ্যে যাইতে মনস্থ করিলেন। দেবগণ এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন (১-৮)। প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া রতিদেবী নন্দা এবং সুনন্দা সমভিব্যাহারে মহামেরুর পশ্চিম প্রান্তবর্তী ইলাবৃত অঞ্চল অতিক্রম করিলেন (৯-১৩)। পরবর্তী সর্গে রতি যেদিন মহামেরু অঞ্চলে পদার্পণ করিলেন সেই দিনকার প্রভাতকালের বর্ণনা পরিবেশন করা হইয়াছে। কামদেব যেখানে ভস্মীভূত হইয়াছেন সেই স্থান অবলোকন করিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন (১-১৩)। তাঁহার ব্যথার উচ্ছ্বাস দ্বাবিংশ সর্গ পরি-প্লাবিত করিয়া তুলিয়াছে (১-১৭)। অগ্নির স্ফুলিঙ্গ তখনো সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হয় নাই; রতিদেবী কামদেবের দেহাবশেষ অবলোকন করিলে উহা রতির প্রতি তাঁহার অবিনশ্বর প্রেমের কথাই ঘোষণা করিল। কামদেবের দেহাবশেষ রতিকে মৃত্যুবরণ করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ করিল (১৮-২১)। ত্রয়োবিংশ শ্লোকের প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে শিব এই প্রণয়সম্ভাষ সদয়-নয়নে অবলোকন করিতেছিলেন। তিনি অগ্নিকে আবার প্রজ্বালিত করিয়া তুলিলেন এবং রতি তাঁহার সহচরীগণসহ উহাতে আত্মবিসর্জন করিলেন (১-৮)[৩]। এইরূপে দুইটি বিরহবিধুর আত্মা মিলিত হইল, কিন্তু তাঁহাদের কোন অবয়ব না থাকায় তাঁহারা শিব এবং উমার দেহকে অবলম্বন করিয়া অন্তরের চরিতার্থতা খুঁজিয়া পাইলেন। কবি অতঃপর এই দুইজনের প্রেমলীলা বর্ণনা করিয়াছেন (২৪-২৭ সর্গ)। উমা অন্তঃসত্ত্বা হইলেন।

পরবর্তী সর্গে দেবগণের একটি চক্রান্তের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে; তাঁহারা অজাত শিশুর মস্তক অসুন্দর করিবার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সমস্ত দেবগণই ইন্দ্রের ঐরাবণ হস্তীর সহিত শিবের নিকট গমন করিলেন। যখন উমা ঐরূপ চলন্ত পর্বতের মত একটি বিরাটকায় হস্তীকে আসিতে দেখিলেন তখন তিনি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন (৫-৮)। দেবগণ উমার অভিশম্পাতের ভয়ে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিলেন। শিবপত্নী উমা অতঃপর একটি গজানন পুত্রের জননী হইলেন। তাঁহার নাম হইল গণ। এইরূপ পুত্রের জন্ম হওয়ায় উমা বিষণ্ণ হইলে শিব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন (৯-১৫)। উনত্রিংশ সর্গের প্রথমাংশে সেনাপুরের দৈত্যরাজের আশঙ্কার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তিনি দুইজন চর পাঠাইয়া সংবাদ লইলেন সত্যই শিবের কোন পুত্রসন্তান জন্মলাভ করিয়াছে কিনা। এই সংবাদ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া দৈত্যরাজ তাঁহার সৈন্যবাহিনী রণসাজে সজ্জিত করিলেন (১-৮)। দৈত্যগণের আক্রমণ কাহিনী ৩০-৩১ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। চতুষ্পার্শ্বে সমস্ত বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া দেবগণ গণের শরণাপন্ন হইলেন। গণ বয়সে শিশু হইলেও আকারে অমিতবীর যোদ্ধারূপে পরিণত হইলেন (৩১ সর্গ)। যুদ্ধের উত্থানপতনের কাহিনী ষড়ত্রিংশ সর্গ পর্যন্ত বর্ণনা করা হইয়াছে; শেষোক্ত সর্গে দৈত্যরাজের মৃত্যুকাহিনী বিবৃত করা হইয়াছে। যুদ্ধ বিজয়ের পর দেবগণ স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং বিজয়োৎসবে মত্ত হইলেন। এই উৎসবের একটি ক্ষুদ্র উল্লেখ করিয়াই কবি পুনরায় কাম এবং রতির প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন (৩৮-৩৯ সর্গ)।

এই সময়ে শিব এবং উমা মেরুপর্বতের শিখরে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন; তাঁহারা কামদেবের উজ্জ্বল দেহাবশেষ দেখিলেন। উমাদেবী ঐ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে শিব সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। উমা তখন বুঝিতে পারিলেন যে কামদেবই তাঁহাদের প্রণয়বন্ধনের মূলসূত্র। তিনি তখন স্বামীকে অনুরোধ করিলেন কামদেবকে পূর্বদেহে প্রতিষ্ঠিত করিতে। শিব বলিলেন যে সে সময় অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, কারণ কামদেব ইতিমধ্যেই নমুষ্টিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন (১-৭)। রতিদেবীও মালব দেশের অন্তঃপাতী উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমা(দিত্যে)র কন্যা রাজকুমারী রত্নাবতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার দেহভস্মাবশেষ এখনো তালধ্বজ আশ্রমে রক্ষিত আছে (৮)। কামদেবের দ্বিতীয় জন্ম পরিগ্রহণ হয় রাজা শতনিষ্ঠনরূপে; তিনি পাণ্ডব-কুলচূড়ামণি এবং উদয়ন নামে বিখ্যাত (৯)। রতিদেবীও নিজেকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন: এক অংশ হইল চন্দ্রসেন-কন্যা বাসবদা, অপর অংশ হইল সিংহলরাজ আর্যসুত বিক্রমবাহুর কন্যা রত্নাবলী[৪]। রত্নাবলীকে সমুদ্রে পাওয়ার জন্য তাঁহার অপর নাম হইল সাগরিকা বা সাগর-দুহিতা (১০-১১)। দুই রাজকন্যারই উদয়নের সহিত পরিণয় হইল। ত্রয়োদশ শ্লোকে কবি কাব্যের পটভূমি পরিবর্তন করিয়া উহাকে জাভার মধ্যদেশের দক্ষিণে ("দক্ষিণপথে জাভা মধ্যদেশ") সংস্থাপিত করিলেন; এই উপলক্ষে কবি কাশ্মীরের "বিখ্যাত কুমারের পুস্তকের" কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১৪)। অতঃপর কামদেব যবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিলে রতিও সেখানে আবির্ভূতা হইলেন। বস্তুতঃ জঙ্গল নামক অঞ্চলে তিনি "নারীগণের মধ্যে পুষ্প" তুল্য ছিলেন (১৫); তিনি ছিলেন চন্দ্রকিরণের মত এবং জনসাধারণ তাঁহাকে রাণী কিরণ (অর্থাৎ চন্দ্ররশ্মি) বলিয়া সম্ভাষণ করিত।

উনচল্লিশতম সর্গে কবি রাজা কামেশ্বরকে কামদেবের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকে কবি দহনরাজ্যকে পৃথিবীর বিস্ময়বস্তু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ("দহনরাজ্যাপুর্ব দেনিঙ্গ জগৎ")। নগরের প্রান্ত দিয়া যে নদী প্রবাহিত হইত কবি তাহাকে বলিয়াছেন যে উহা "নিহত শক্রগণের রমণীদের অশ্রুধারা হইতে উৎসারিত।" চতুর্থ শ্লোকে রাণী কিরণকে বজ্রদ্রবের কন্যারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে রাজ-দম্পতীর আনন্দ ও প্রেমলীলার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কাব্যের চল্লিশতম বা অন্তিমসর্গে কবি তাঁহার কাব্য এবং নিজের সম্বন্ধে কিছু বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই কাব্যটি বলি-দ্বীপেও খুব জনপ্রিয় ছিল[৫]। ডঃ পুর্বচরক মনে করেন যে এই কাব্যের আদিরসাশ্রিত এবং অন্যান্য অংশসহ প্রায় শতকরা ২০ অংশ প্রক্ষিপ্ত, কিন্তু এই অভিমত সকলে গ্রহণ করেন নাই[৬]।

এই কাব্যগ্রন্থের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বর্ণনা করিবার পুর্বে কবি কোন উৎস হইতে তাঁহার কাব্যের উপাদান আহরণ করিয়াছেন তাহা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। পমঙ্কুঙ্গহ্ কিদুঙে বলা হইয়াছে যে কবি ধর্মজ তাঁহার কাব্যের উপাদান সমূহ চন্দপুরাণ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন; এই চন্দপুরাণকে অনেকে স্কন্দপুরাণের বিকৃত রূপ বলিয়া মনে করিয়াছেন[৭]। যদিও এই কাব্যের মুল কাহিনী কুমারসম্ভব এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় তবুও স্কন্দপুরাণের উল্লেখ কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু উভয় গ্রন্থের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যায় যে উহাতে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। স্কন্দপুরাণে এই আখ্যায়িকাটি দুইস্থলে বর্ণিত হইয়াছে[৮]। বিষ্ণুখণ্ড এবং মাহেশ্বরখণ্ড উভয় স্থলেই দৈত্যের নাম তারকাসুর, নীলরুদ্রক নহে। গ্রন্থকার এখানে কুমারের জন্মকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, গণেশের নহে। এই স্থলে কামের যে বিভিন্ন পুনর্জন্ম কাহিনী বিবৃত হইয়াছে তাহা স্মরদহনের অনুরূপ নহে। এতদ্ব্যতীত, স্কন্দপুরাণের রতিদেবী দৈববাণীর জন্য স্বামীর সঙ্গে সহমরণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন[৯]। বস্তুতঃ তিনি তপস্যা করিবার কালে শম্বর-নামক দৈত্য কর্তৃক অপহৃতা হইয়াছিলেন[১০]। যে শর শিবকে আঘাত করিয়াছিল তাহার নাম এখানে দেওয়া হইয়াছে মোহনাখ্য; উহার নাম বিষয় নহে[১১]। এই আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে কিদুঙ্ গ্রন্থটি স্মরদহনের উৎস সম্বন্ধে যে-তথ্য পরিবেশন করিয়াছে তাহার কোন বাস্তব ভিত্তি নাই।

এই কাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমি বিচার করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি যে এই কাব্য সম্ভবতঃ রাজা প্রথম কামেশ্বরের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। এই কাব্যের একটি শ্লোকে লেখা আছে "শ্রীশানধর্ম মকপুণ্য হরিপনিরাসিহ্[১২]।" কবি যদি ইহা দ্বারা বুঝাইতে চাহেন যে কামেশ্বর রাজা ঈশানধর্মের বংশোদ্ভূত, তাহা হইলে এখানে সত্য কথাই বলা হইয়াছে; কিন্তু কবি যদি ঈশানধর্মকে রাজা কামেশ্বরের পিতারূপে উপস্থাপিত করিয়া থাকেন তাহা হইলে বলিতে হইবে যে এই ঈশানধর্ম এবং সিণ্ডোক এক ব্যক্তি নহেন। সুতরাং ইহা স্বীকার করা কর্তব্য যে স্মরদহনের রচনাকাল নির্ধারণে এই শ্লোকটি বিশেষ সাহায্য করিতেছে না। ডঃ পুর্বচরক আরো প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে এই কামেশ্বর এবং তাঁহার রাণী কিরণ

রতু পঞ্জী রোমান্টিক সাহিত্যের নায়ক-নায়িকা রূপে রূপান্তরিত হইয়াছেন। তিনি নিম্নোল্লিখিত কারণগুলি প্রদর্শন করিয়াছেন :

(১) প্রথম সর্গের ষষ্ঠ শ্লোকে লেখা আছে, "যন্ রিঙ্গ্ প্রঙ্গ্ কিত সিজ্য বীর তরুণার্জা-পঞ্জি শূরেঙ্গ্ রণ্" অর্থাৎ রণে তুমি তরুণ জাগ্রত বীরসিংহ অপঞ্জি শূরেঙ্গ্ রণ।

পঞ্জি রোমান্টিক-সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই যে চন্দ্রকিরণের স্বামী হইতেছেন রাদেন পঞ্জি এবং যখন আমরা জানি যে রতু কিরণ হইলেন রাজা প্রথম কামেশ্বরের রাণী এবং এই কামেশ্বরই পঞ্জি বা অপঞ্জি নামেও খ্যাত, তখন ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে যে রাজা প্রথম কামেশ্বরই যবদ্বীপীয় রোমান্টিক সাহিত্য জগতের রাদেন পঞ্জি।

(২) পঞ্জি একজন যবদ্বীপীয় ডন্ জুয়ান ; কামেশ্বরের নামটিও সেই অর্থের স্বাক্ষরবহ।

(৩) ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে রাজা প্রথম কামেশ্বরের অনুশাসনগুলিতে চন্দ্র-লাঞ্ছন ব্যবহার করা হইয়াছে।

এখন এই যুক্তিগুলি কতটা বিচারসহ তাহা আলোচনা করা যাউক। আমাদের মনে হয় যে প্রথম যুক্তিটি নিরলম্বভাবে ডঃ পূর্বচরকের অনুমান বা সিদ্ধান্ত সমর্থন করে না। যদি উদ্ধৃত বাক্যাংশটি তুলনা করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা হইলে উহা দ্বারা উভয়ের একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। ডঃ পূর্বচরকের এই যুক্তিটি অন্য সূত্রে আবার কিঞ্চিৎ সমর্থিত হয়। একটি মালয় কাহিনীতেও[১২ক] রাজা কামেশ্বরের আখ্যা অর্থাৎ অপঞ্জি শূরেঙ্গ্ রণ নায়ক ইনোর আখ্যা হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে ; ইনোকে (অর্থাৎ পঞ্জিকে) সেখানে বলা হইয়াছে "সুরেঙ্গ্ রণ পঞ্জি কুসুম ইন্দ্র।" এই বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলিতে এক সূত্রে সংযোজিত করিলে তথ্যের বা যুক্তির গুরুত্ব নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পঞ্জি সাহিত্যেও এই সনাক্ত করণের পক্ষে কিঞ্চিৎ বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ, উহাতে রাদেন পঞ্জি হইলেন জঙ্গল (কোরিপন)-এর যুবরাজ এবং তাঁহার প্রিয়তমা চন্দ্রকিরণ হইলেন দহরাজ্যের রাজকুমারী। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে স্মরদহন-কাব্যে অন্যরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ডঃ পূর্বচরক ট্র্যাডিসন্ বা কিম্বদন্তীর উপর অবিশ্বাস করিয়া এই অসামঞ্জস্যের ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই : যে কিম্বদন্তী বা ট্র্যাডিসনে আমরা পঞ্জিকে জঙ্গলের রাজপুত্ররূপে এবং চন্দ্রকিরণকে দহের রাজকন্যারূপে সর্বদা দেখিতে পাইতেছি, সেখানে আমরা কিম্বদন্তীর উপর কেন অবিশ্বাস করিব ? সুতরাং স্মর-দহন এবং পঞ্জি রোমান্টিক সাহিত্যের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে তাহা এই ভঙ্গুর যুক্তির বলে অতিক্রম করা যাইবে না।

এখন পূর্বচরকের দ্বিতীয় যুক্তিটি আলোচনা করা যাউক। ইহা অতীব সত্য যে পঞ্জি একজন ডন্ জুয়ান—সর্বদা রমণী সঙ্গপ্রিয়। কেবলমাত্র আখ্যার সাদৃশ্যবশতঃ পঞ্জিকে কামেশ্বর বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। এতদ্ব্যতীত, প্রথম এবং দ্বিতীয় কামেশ্বরের পঞ্জিসুলভ প্রেমাভিযান কাহিনী ইতিহাসে অজ্ঞাত ; পঞ্জিকে এই অভিযান-জগৎ হইতে অপসারিত করিলে পঞ্জি নিতান্তই নিষ্প্রভরূপে প্রতীয়মান হইবে। ডঃ রাসের্স[১৩] মন্তব্য করিয়াছেন যে এই কাব্য অনুসারে কামেশ্বরের রাণী জনসাধারণের মধ্যে কেবলমাত্র কিরণ নামেই

পরিচিতা ছিলেন। সুতরাং ইহা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে যে কিরণ তাঁহার স্বাভাবিক বা পোষাকী নাম ছিল না। চন্দ্রলাঞ্ছনা দ্বারা রাজা কামেশ্বরের সহিত পঞ্জির অভিন্নতা সংস্থাপিত হইবার পক্ষে সাহায্য হইতে পারে; কারণ পঞ্জির "চন্দ্র-প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না[১৪]।" কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই আশ্চর্য প্রতীয়মান হইবে যে যে-সমস্ত অনুশাসনের উল্লেখ করা হইয়াছে সেখানে প্রথম বা দ্বিতীয় কামেশ্বর কাহাকেও কামদেবের অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই। বস্তুতঃ ১১০৭ শকাব্দের একটি লিপিতে রাজা কামেশ্বরকে ত্রিবিক্রম বা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং ডঃ পূর্বচরকের অনুসন্ধিৎসাকে প্রশংসা করিলেও তাহার সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করিবার পক্ষে বাধা এখনো রহিয়া গিয়াছে। ইহা অসম্ভব নহে যে রাজা ১ম কামেশ্বরই পঞ্জি রোমান্টিক সাহিত্যের নায়ক, কিন্তু বর্তমান তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হওয়া সম্ভবপর নহে।

স্মরদহন কাব্যে আরো কতকগুলি নাম আছে যাহার ব্যাখ্যা ভারতীয় ইতিহাস এবং সাহিত্য হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। ডঃ পূর্বচরক[১৫] পূর্বেই বলিয়াছেন যে উদয়ন দ্বারা কবি সম্ভবতঃ বৎস-রাজ উদয়নকে বুঝাইয়াছেন; তিনি একদা উজ্জয়িনী-রাজ চণ্ডসেন[১৬] কর্তৃক বন্দী হইয়াছিলেন। যৌগন্ধরায়ন তাঁহাকে অবশেষে মুক্ত করিয়াছিলেন। রাজা উদয়নের অভিযান কাহিনী ভাস বিরচিত[১৭] স্বপ্নবাসবদত্তা নামক নাটকে এবং সোমদেবের কথাসরিৎসাগর গ্রন্থে সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে; তিনি রত্নাবলী নামক নাটকেরও নায়ক। আলোচ্য কাব্যে রাজা উদয়নকে হস্তিনার রাজারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। আমরা কথাসরিৎসাগরেও পড়িতেছি, "এই বৎস-রাজ পাণ্ডব কুলোদ্ভূত এবং সমগ্র ধরণীই বংশপরম্পরায় তাঁহার অধীনস্থ; হস্তী-নামধেয় অর্থাৎ হস্তিনানগরীও[১৮]।" এখানে চণ্ডমহাসেনের নাম চন্দ্রসেন নামে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং বাসবদত্তার নাম বাসবদা হইয়াছে। বাসবদত্তা অবশ্য রাজা উদয়নের পত্নী এবং তাঁহাদের রোমান্টিক পলায়ন কাহিনী বহু কবির উপজীব্য হইয়াছে। কালিদাস "উদয়নকথা-কোবিদ্গ্রামবৃদ্ধান্" বা উদয়ন-কাহিনীতে পারদর্শী গ্রামবৃদ্ধদের কথা একদা স্মরণ করিয়াছিলেন[১৯]। রত্নাবলীও সিংহল রাজকন্যা এবং তিনি রাজা উদয়নের দ্বিতীয়া রাণী। জাহাজ ডুবির পর তিনি সাগরিকা নামে বিখ্যাত হইলেন। স্মরদহন এবং সংস্কৃত রত্নাবলীর[২০] মিলিত প্রমাণে দেখা যায় যে তাহার পিতার নাম ছিল বিক্রমবাহু। এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে কদিড়ি-রাজ বিক্রমকে উজ্জয়িনীর যে রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহার সমাধি শৌধ ছিল তালধ্বজ[২১] নামক ধর্মস্থানে।

মনে হয় যে এই গ্রন্থটি রচনার পর হইতেই যবদ্বীপে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল; কারণ কামেশ্বরদ্বয় যে শক শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছেন সেই শক শতাব্দীর সর্বধর্ম অনুশাসন-লিপিতে[২২] সঙ্ পামগেৎ ইঙ্ কণ্ডমুহির নাম হইল ডঙ্ আচার্য স্মরদহন। একটি অসমাপ্ত কাকাবিনেও[২৩] উদয়নের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে পাণ্ডব বংশের শতসেন্যের দুই পুত্র ছিল, যথা উদয়ন ও যুগন্দরায়ণ। অবন্তী রাজকন্যা অঙ্গরবতীকে উদয়ণ হরণ করিলেন এবং ইহাই এই গল্পের প্লট।

এই কাব্যের দশম এবং একাদশ সর্গ হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে রামায়ণ রচয়িতা কবি যোগীশ্বরের মত কবি ধর্মজও শৈব আচার অনুষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে উভয়েই শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। এই কাব্যের কাহিনী বৃহত্তর ভারতেও বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিল। ইহা যে কেবলমাত্র চম্পার[২৪] অনুশাসনলিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু ইহা কাম্বোডিয়ার অঙ্কোরভাট এবং বেয়োনের মন্দির-গাত্রেও অঙ্কিত হইয়াছে[২৫]। শেযোক্ত দুই স্থলের দৃশ্যাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য বিদ্যমান। রিলিফের নিম্নাংশে কামদেব ইক্ষুদণ্ডতীর শিবের প্রতি নিক্ষেপ করিতেছেন; শিব রুদ্রাক্ষমালা ও জটাজুটধারীরূপে প্যানেলের উর্ধাংশে সমাসীন রহিয়াছেন। শিবের নিকটে উমাও রহিয়াছেন; একজন ভৃত্যও ত্রিশূল হস্তে দণ্ডায়মান। পরবর্তী দৃশ্যে রতিক্রোড়ে কামদেবের ভস্মীভূত দেহাবশেষ অঙ্কিত হইয়াছে। অনুমিত হয় যে স্মরদহনের লেখক ম্পু ধর্মজ এবং খ্মের শিল্পীবৃন্দ যে কাহিনী রচনা করিয়াছেন তাহার উৎসস্থল এক নহে।

প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত লুব্ধক নামক কাব্যগ্রন্থটিও বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য[২৬]। এই কাব্যের নায়ক হইলেন লুব্ধক; তিনি ব্যাধ এবং তাঁহার বৃত্তি হইল পশু-শিকার। সংস্কৃতে লুব্ধক শব্দের অর্থই হইল ব্যাধ; সুতরাং লুব্ধক শব্দটিকে একজন লোকের নাম হিসাবে ব্যবহার করায় মনে হইতেছে যে কবির সংস্কৃতজ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল[২৭]। কাহিনীটি এইরূপ: একদা গাঢ় অন্ধকার নিশীথে ব্যাধ লুব্ধক অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া একটি বিল্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া নিশিযাপন করিতেছিলেন। বৃক্ষতলে একটি পবিত্র শিবলিঙ্গ ছিল। ব্যাধের দেহভারে এবং শঙ্কাজনিত কম্পনে বৃক্ষ হইতে কয়েকটি বিল্বপত্র পবিত্র শিবলিঙ্গের উপর নিপতিত হইল। এই ঘটনাটি ঘটিল লুব্ধকের অজ্ঞাতসারেই, কিন্তু ইহার ফলেই তাঁহার স্বর্গ গমনের পথ প্রশস্ত হইল। ব্যাধের মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মা লইয়া যম এবং শিবের অনুচরগণের মধ্যে মহাদ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল; ইহা কাব্যের ২০ হইতে ২৯ সর্গে বিবৃত হইয়াছে। অবশেষে শিবানুচরগণ লুব্ধকের আত্মা লইয়া প্রস্থান করিল। এই কাব্যের লেখক ম্পু তানাকুঙের নাম অষ্টত্রিংশ সর্গে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই কাব্যের উৎস অনুসন্ধান করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। ইহা আশা করা অসম্ভব যে ব্যাধের নাম লুব্ধক হিসাবে সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। বস্তুতঃ শিবপুরাণে[২৮], ব্যাধের নাম দেওয়া হইয়াছে রুরুদ্রহ। কাশীরামদাসের বাঙ্‌লা মহাভারতে তাহার নাম হইল সুস্বর[২৯]। প্রথমোক্ত গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে ব্যাধ যখন একটি মৃগ হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছিল তখন কয়েকটি বৃন্তচ্যুত বিল্বপত্র শিবলিঙ্গের উপর নিপতিত হইয়াছিল; উহা ব্যাধের ভয়জনিত দেহ-আক্ষেপের ফলে নহে। এই কাহিনীটি আরো কয়েকখানি পৌরাণিক গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু উহাদের বিবরণীতে অনেকটা স্বাতন্ত্র্যভাব বিদ্যমান।

এই গ্রন্থখানির রচনাকালের সহিত নানান সমস্যা বিজড়িত। গ্রন্থখানির প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে "সঙ্‌ হ্যঙ্‌ নিঙ্‌ হ্যয়ঙ্‌ অমূর্তি নিষ্কল" এবং উহা কামদেবকে স্মরণ করিয়া বলা

হইয়াছে মনে করা অসঙ্গত নহে[৩০]। কেহ কেহ হয়তো বলিতে পারেন যে এখানে রাজা কামেশ্বরের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই অনুমানের পক্ষে দুইটি যুক্তি আছে। বলিদ্বীপের কিম্বদন্তী অনুসারে ম্পু তানাকুঙ্‌ নামধারী এক ব্যক্তি ছিলেন স্মরদহন কাব্যের লেখক ম্পু ধর্মজের ভ্রাতা। পূর্বেই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে স্মরদহন কাব্যটি সম্ভবতঃ প্রথম কামেশ্বরের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। লুব্ধক এবং বৃত্তসঞ্চয় গ্রন্থের লেখক যদি অভিন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহার আবির্ভাবকাল দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে সন্নিবেশিত করিতে হইবে, কারণ ধর্মজের কাব্যগ্রন্থ ঐ সময়েই রচিত হইয়াছিল। বাবাটেকান উল্লেখানুযায়ী লুব্ধক ১১২৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং দুইটি স্বতন্ত্র প্রমাণ এবং বলিদ্বীপীয় কিম্বদন্তী অনুসারে এই গ্রন্থখানিকে প্রথম কামেশ্বরের সমসাময়িক কালে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বিচার করিলে মনে হইবে যে এই গ্রন্থ ১২২২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হইতে পারে না। এই আভ্যন্তরীণ প্রমাণগুলি প্রক্ষিপ্ত না হইলে, এই তানাকুঙ্‌কে বৃত্তসঞ্চয়ের লেখক হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া গণ্য করিতে হয়। কিন্তু এই অনুমান কতটা বিচারসহ তাহা শুধু ভবিষ্যত গবেষণাই নির্ধারিত করিতে পারে।

এক্ষণে যে কাহিনীটি আলোচনা করিব তাহার নাম সুতসোম; ইহা পুরুষাদশান্ত নামেও পরিচিত[৩১]। দৈত্য পুরুষাদ ভারতবর্ষের সমস্ত রাজাকে বন্দী করিয়াছিলেন; এমন কি রতু দর্মও তাঁহার দ্বারা পরাজিত হইয়াছিলেন। অবশেষে সুতসোম এবং তাঁহার আত্মীয় প্রভু মকেতু তাঁহাকে পরাস্ত করেন। সুতসোম বোধিসত্ত্বের অবতার এবং তাঁহার অভিযান কাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এই কাহিনীটি একদা পূর্ব এসিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষ ব্যতীত তিব্বত, চীন, জাপান, জাভা এবং দ্বীপময় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এই কাহিনীটির প্রসার ঘটিয়াছিল। নরখাদক রাজা সৌদামের যে বিবরণ এখানে পরিবেশিত হইয়াছে তাহা মহাযান ধর্মমতের প্রচারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই করা হইয়াছে; তবে ইহা সত্য যে গ্রন্থে প্রচারিত নীতিগুলির মধ্যে শৈবমতের সংস্পর্শও বিদ্যমান। পুঁথির ১২০-ক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে "বুদ্ধদেব দেবতাদের রাজা শিব হইতে বিভিন্ন নহেন।" অন্যত্র পড়ি "জিনের প্রকৃতি এবং শিবের প্রকৃতি অভিন্ন; তাঁহারা বিভিন্ন, তবুও তাঁহারা একই[৩২]।" এই সমস্ত রচনাংশে বৌদ্ধ এবং শৈবধর্মের সংমিশ্রণের সুর ধ্বনিত হইতেছে। এই প্রকার মিলন হইতেই শিব-বুদ্ধ পূজার উদ্ভব হইয়াছে[৩৩]। ইহাই শেষ নহে, পরন্তু হিন্দুগণের ত্রিমূর্তি এবং বৌদ্ধগণের ধ্যানীবুদ্ধত্বের মধ্যে একটি রাখিবন্ধন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সেইজন্য অক্ষোভ্য হইয়াছেন ঈশ্বর (= শিব), রত্নসম্ভব হইয়াছেন ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, অমিতাভ হইয়াছেন মহামর (= মহাদেব) এবং অমোঘসিদ্ধি হইয়াছেন বিষ্ণু। ডঃ ক্রোম[৩৪] ইহার একটি বিশেষত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন; এই সমীকরণের ব্যবস্থায় শিবকে দুইবার উপস্থাপিত করা হইয়াছে। না করিয়াও উপায়ান্তর ছিল না, কারণ চারিজন বৌদ্ধ দেবতাকে হিন্দুগণের ত্রিমূর্তির সহিত সমন্বয় ঘটাইতে গেলে একজন হিন্দু দেবতাকে দুইবার সন্নিবেশিত করিতেই হইবে। যখন নরখাদক সৌদাস ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিলেন, তখন সুতসোম

তাঁহাকে বজ্রপাণির উপাসনা করিতে বলিলেন ; বজ্রপাণি হইলেন "বায়ুর অধীশ্বর"। গ্রন্থকার "জপ-যোগ-সিদ্ধির" উল্লেখও করিয়াছেন, তবে উহা বৌদ্ধ বা হিন্দু তান্ত্রিক সাধনার অঙ্গ হিসাবেও উল্লিখিত হইতে পারে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যের সুতসোম গ্রন্থটিতে চতুর্দশ শতাব্দীর মহাযান এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

ডঃ বাটানবে লিখিয়াছেন[৩৫] "এই কাহিনীটির সূচনা বৈদিক যুগে হইয়াছে ; ইহার চিহ্ন শুধু যে টীকাটিপ্পনীতে রহিয়া গিয়াছে তাহা নহে, ইহার স্বাক্ষর ঋগ্বেদেও সুস্পষ্ট। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই কাহিনীটি পরবর্তী পৌরাণিক যুগে পৌঁছিয়াছে ; ইহাতে বিভিন্ন যুগীয় সাহিত্যের গতিপ্রবণতা এবং প্রকৃতির স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে। ইহা ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ…… এবং জৈনধর্মের যৌথ সম্পত্তি ছিল।" আখ্যায়িকাটি কেবলমাত্র রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণু-পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে রক্ষিত হয় নাই, পরন্তু উহা ভারতবর্ষ, চীন এবং তিব্বতের অন্যূন এক-বিংশতি বৌদ্ধগ্রন্থে অনুপ্রবেশ করিয়াছে[৩৬]। ডঃ বাটানবে এবং অধ্যাপক কার্ণ[৩৭] এই কাহিনীর সূচনা এবং বিবর্তনের ইতিহাস অসামান্য কৃতিত্বের সহিত আলোচনা করিয়াছেন ; সুতরাং এই বিষয়টি আর আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। এইটুকু স্মরণ রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে "কল্মাষপাদ-কাহিনীর শেষ পর্যায়ে বৌদ্ধগণ মহাভারত কর্তৃক যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন[৩৮]।"

ডঃ কার্ণ[৩৯] মনে করেন যে সুতসোমের কাহিনীটি আদিম অবস্থায় একটি প্রকৃতি সম্বন্ধীয় উপকথা ছিল ; উহা কালক্রমে নীতিমূলক কাহিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। তিনি আরো মনে করেন যে এই কাহিনীটি সূর্যগ্রহণকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে নাই, উঠিয়াছে চন্দ্রগ্রহণকে কেন্দ্র করিয়া। তাঁহার এই অনুমানের অবশ্য একটা ভিত্তি ছিল। তিনি বলেন যে কল্মাষপাদ সুতসোমকে ধরিয়া রাখিয়াছেন এবং কিয়ৎকাল পরেই আবার তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন—এই ঘটনাটিই গল্পটির মুখ্য আকর্ষণ। কল্মাষ এবং তমস্ সমার্থদ্যোতক ; উহাদের অর্থ হইল 'অন্ধকার' ; 'পাদ' শব্দটির অর্থ চরণ বা রশ্মি হইতে পারে। অনুরূপভাবে সুতসোম শব্দের অর্থ নিস্যন্দিতসোম বা জাত-চন্দ্র রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অনেক গ্রন্থে কল্মাষপাদ নামের আদৌ ব্যাখ্যা করা হয় নাই। ডঃ কার্ণ বলেন যে যখন লোকে এই উপকথাটির তাৎপর্য আর অনুধাবন করিতে পারিল না তখন একজন ব্যাখ্যাকর্তা ঐ নামটি গ্রহণ করিয়া উহার অর্থ করিল "লাঞ্ছনযুক্ত চরণ" এবং ইহার সমর্থনে একটি ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার সৃষ্টি করিল, যাহা আমরা রামায়ণ এবং বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই। উপকথাটির চিহ্ন কিন্তু বিলুপ্ত হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে জাতকমালায় শিশুটিকে চন্দ্রের মত সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। জয়দ্দিসজাতক (নং ৫১৩) এবং মহাভারতে এই উপকথার চিহ্ন যেন আরো সুস্পষ্ট। প্রথমোক্ত গ্রন্থে কম্পিল্লরাজ নরখাদকের হস্ত হইতে মুক্ত হইলে তাঁহাকে রাহুমুক্ত চন্দ্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সমস্ত সাক্ষ্যের বলে অধ্যাপক কার্ণ অনুমান করিয়াছেন যে সুতসোম আখ্যায়িকাটি প্রকৃতি সম্বন্ধীয় একটি উপকথা হইতে সঞ্জাত হইয়াছে।

এই অনুমানের ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল বলিয়া মনে হয়। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী লেখকেরা এই কাহিনীটিকে প্রথম বর্ণের প্রাধান্য বিস্তারের অস্ত্রস্বরূপে ব্যবহার করিয়াছেন; বৌদ্ধ এবং জৈন লেখকেরা ইহাকে নিজেদের মতবাদ প্রচারে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু এই উপকথার আদিমস্তরে ইহার একটি ঐতিহাসিক বা অর্দ্ধৈতিহাসিক পটভূমি বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে করিবার হেতু আছে। ইহাও অসম্ভব নহে যে ঋগ্বেদোক্ত সোম নিপীড়নের কাহিনীর[৪০] সহিত ইহার সংযোগ বিদ্যমান ছিল। সুতসোম কাহিনীর অনেক নামের ব্যাখ্যা বৈদিক চিন্তাজগতের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত, বিভিন্ন গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হইতে যে-তথ্য পাওয়া যায় তাহা ডঃ কার্ণের থিয়োরীর অনুকূল নহে। ভারতীয় কিম্বদন্তী বা উপকথা সাহিত্যে রাহু নিঃসন্দেহে দৈত্যরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার দুইটি ডানা নাই। অনেক গ্রন্থে এইরূপ দৈত্যই সুতসোমকে ধরিয়াছিল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে[৪১]। ডঃ বাটানবে বলিয়াছেন[৪২] যে দৈত্যের এই বিশিষ্ট আকৃতি কদাচিৎ প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত আরো একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। সংস্কৃত সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই জানেন যে বিপদমুক্ত লোকগণকে লেখকেরা সাধারণতঃ রাহুমুক্ত চন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সুতরাং ডঃ কার্ণের রাহু-উপকথার থিয়োরীটির ভিত্তিমূল নিতান্ত দুর্বল এবং কাহিনীটির বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর। কল্মাষপাদ লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে এই সম্বন্ধে বিতর্কের পথ অধিকতর প্রশস্ত। ইহা লক্ষণীয় বিষয় যে সুতসোম কাহিনীটির প্রাচীনতম সংস্করণে কল্মাষপাদের নাম আদৌ উল্লেখ করা হয় নাই এবং তাহার স্থলে অন্য লোকের নাম দেখিতে পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন সংযুক্তাবদানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাহ্যতঃ মনে হয় যে পরবর্তী যুগে অভিশাপের ঘটনাটি বা সৌদাসের নরখাদকের স্বভাবটি ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্য লইয়াই তাহার নামটি এই কাহিনীতে অনুপ্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নিরুক্ত এবং সর্বানুক্রমনীতে এই নাম সুদাসের অনুচরগণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইয়াছে। প্রাচীনতর চীনা অবদানগুলি এবং পালি জাতকে এই নাম সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য। ডঃ বাটানবে অনুমান করেন যে এই গ্রন্থগুলি এমন সময়ে সম্পাদন করা হইয়াছিল যখন সৌদাসের নাম কল্মাষপাদের ব্যক্তিগত নাম রূপে প্রচলিত হয় নাই[৪৩]। সুতরাং শেষোক্ত নামটি পরবর্তী যুগের সৃষ্টি এবং ইহার ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা দ্বারা উপরোক্ত থিয়োরী সচল রাখা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ, আমরা ডঃ কার্ণের দুইটি ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যার সহিত আরো একটি যোগ করিতে পারি। কল্মাষ-পাদের নামের অর্থ কল্মাষজনপদের সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকেও স্বচ্ছন্দে বুঝাইতে পারে। যেস্থলে এইরূপ বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভবপর, সেস্থলে এই কাহিনীটি যে প্রকৃতি-উপকথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা দৃঢ়তার সহিত বলা অসম্ভব। ডঃ কার্ণ উপমা এবং ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যার উপর অত্যধিক নির্ভর করিয়াছেন; আমরা সবিনয়ে বলিব যে ইহা একান্তভাবে নির্ভরযোগ্য নহে।

ডঃ ফ্রিডরিখ্[৪৪] অনেক দিন পূর্বে বলিয়াছিলেন যে এই উপকথাটি কেতকপর্বকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং বলিয়াছেন যে তাহার কাকাবিনটির গল্পভাগ

একটি 'বৌধকাব্য' হইতে আহৃত হইয়াছে। সুতসোমের আখ্যায়িকা পূর্ব এসিয়ার বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; সুতরাং কবি-নির্দিষ্ট গ্রন্থখানিকে সনাক্তকরণ সহজসাধ্য নহে। ইহা বিনাদ্বিধায় স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে প্রাচীন যবদ্বীপীয় সংস্করণটির উৎসস্থল এই গ্রন্থের কোন তিব্বতী, চীন বা জাপানী সংস্করণ হইতে পারে না; কারণ যবদ্বীপীয় কাব্য-খানিতে যে সমস্ত নাম বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে ঐ সমস্ত স্থানের প্রভাব অনুপস্থিত। এই গ্রন্থখানির লেখক ছিলেন ম্পু তন্তুলার; সম্ভবতঃ তিনি অর্জুনবিজয় গ্রন্থেরও লেখক ছিলেন। উভয় গ্রন্থেই রণমঙ্গলের নাম (পররতনে তাহাকে ভ্রে পণ্ডন সলস্ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে) উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার পিতার নাম ছিল সোটোর এবং তিনি কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া মনে হয়[৪৫]। সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই গ্রন্থদ্বয় হয়ম্ ভুরুকের (অপর নাম ভটার প্রভু, রাজসনগর এবং সঙ্গ্ হ্যঙ্গ্ বেকাসিঙ্ সুখ) রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। এই কাব্যগ্রন্থটি বলিদ্বীপেও জনপ্রিয় ছিল। ইহার ৪৫২৬ সংখ্যক পুঁথি বলিদ্বীপীয় লিপিতে লেখা হইয়াছে এবং প্রতি ছত্রের নিম্নে বলিদ্বীপীয় ভাষায় অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ৪৫২৭ সংখ্যক অসম্পূর্ণ পুঁথিতে সুতসোম কাব্যের কয়েকটি সর্গ বলিদ্বীপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

যবদ্বীপের আর একখানি বিখ্যাত কাকাবিন কৃষ্ণায়ণ। এই গ্রন্থখানি বর্ষজয়ের রাজত্ব-কালে রচিত হইয়াছিল; পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বর্ষজয় এবং যবদ্বীপের খ্যাতনামা রাজা জয়বর্ষ অভিন্ন। ১১০৪ খৃষ্টাব্দের একটি অনুশাসন জয়বর্ষের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এদিকে আবার প্রথম কামেশ্বরের একটি অনুশাসন সম্ভবতঃ ১১১৬ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়া থাকিবে। যদি শেষোক্ত তারিখটির পাঠ সঠিক হইয়া থাকে তাহা হইলে বাবাটেকন ধৃত তারিখ অর্থাৎ ১১১৯ খৃষ্টাব্দ নির্ভুল বলিয়া মনে হয় না। এই কাব্যের ৬৩-তম সর্গে আমরা পড়িতেছি যে এই কাব্যের কবি ম্পু ত্রিগুণের সহিত রাজা বর্ষজয়ের সম্বন্ধ সভাকবি কণ্ব ও রাজা ঐরলঙ্গের সম্পর্কের অনুরূপ ছিল[৪৬]।

কৃষ্ণ এবং রুক্মিণীর প্রণয়-কাহিনী অবলম্বন করিয়াই এই কাকাবিন রচিত হইয়াছে[৪৭]। রুক্মিণী ছিলেন কুণ্ডিন-দেশের রাজকন্যা; তিনি ভীষ্মক এবং পৃথুকীর্তির কন্যা। মাতাপিতা তাঁহাকে চেদিরাজ জরাসন্ধের সহিত বিবাহ দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ[৪৮] এবং খিল হরিবংশে[৪৯] বিশেষতঃ শেষোক্ত গ্রন্থে এই কাহিনীর সবিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে জরাসন্ধ রুক্মিণীকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন নিজে বিবাহ করিবার জন্য নহে, শিশুপালের পরিণয়ের জন্য। রাজকন্যা কিন্তু প্রগাঢ়ভাবে কৃষ্ণকে ভালবাসিতেন; সুতরাং কৃষ্ণ আসন্ন বিবাহের পূর্বেই রুক্মিণীকে অপহরণ করিলেন। রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্ম এবং চেদিরাজ কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন, কিন্তু উভয়েই পরাজিত হইলেন। রুক্মিণী ভ্রাতার জন্য অনুনয় প্রকাশ না করিলে হয়তো রুক্ম নিহত হইতেন। পূর্ব-রাগের পালা শেষে উভয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। এই কাব্যে কৃষ্ণের প্রথম দশজন পত্নীর নাম দেওয়া হইয়াছে; লক্ষ্যণীয় যে যবদ্বীপীয় এবং ভারতীয় কিম্বদন্তী অনুযায়ী এই পত্নী-জনতার সংখ্যা ১৬০০০। গ্রন্থের শেষে কবি দ্বারবতীর অপূর্ব সৌন্দর্যের বর্ণনা করিয়াছেন;

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কামভাবোদ্দীপক দৃশ্যেরও অবতারণা করা হইয়াছে। ইহা অবশ্য সমস্ত কাকাবিন গ্রন্থেই অল্পবিস্তর বিদ্যমান।

কৃষ্ণায়ণ কাব্যের চারিটি দৃশ্য চণ্ডি জাগো মন্দিরে অঙ্কিত হইয়াছে[৫০]। পনতরণ মন্দিরেও কেবল যে রামায়ণ চিত্রাবলী রূপায়িত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু উপরোক্ত কাব্যের কয়েকটি দৃশ্য ঐ মন্দিরের দ্বিতীয় তলাতেও অঙ্কিত হইয়াছে[৫১]।

প্রাচীন যবদ্বীপের আর একখানি কাব্যগ্রন্থের নাম কালযবনান্তক। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ম্পু কণ্ব এই কাব্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পরিচিত ছিলেন বলিযা মনে হয়, কারণ তিনি অর্জুনবিবাহ কাব্যে লিখিয়াছেন :

"যুদ্ধক্ষেত্রে দৈত্যরাজ হারাণ জীবন,
অগ্নি অস্ত্রাঘাতে
সঙ্গে তার যত ছিল সেনা, যত ছিল রথ,
ধ্বংস হল বিষম সংঘাতে !
মুচকুন্দ ঋষিমুখে শুনি যেন অভিশাপ ধ্বনি
কালযবন যেন অতর্কিতে ভস্মীভূত হইল তখনি[৫২]।

ডঃ ব্র্যাণ্ডেস বলিয়াছেন[৫৩] যে এই কাহিনীটি হরিবংশ কাকাবিনের প্রথমাংশের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই গ্রন্থের ৫০৯৫ সংখ্যক পুঁথি ৩৪টি সর্গে বিভক্ত এবং নিম্নে ইহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে[৫৪]।

গল্পের প্রারম্ভেই বিষ্ণু এবং সর্পরাজ (উরগেন্দ্র)-এর কথা বলা হইয়াছে। তাঁহারা কৃষ্ণ এবং বলদেবরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রভাসতীর্থের অনিষ্টকারী দৈত্যগণের যথোপযুক্ত শাস্তিবিধান করা। প্রসঙ্গতঃ কবি কৃষ্ণ এবং কংসের মধ্যে যুদ্ধের বিবরণ দিয়াছেন ; এই যুদ্ধে কংস নিহত হইলেন। কাব্যের দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ সর্গ পর্যন্ত দ্বারবতী এবং মধুরের (=মথুরা)-র ঐশ্বর্যের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সপ্তম সর্গে দৈত্য কালযবনের কঠোর তপশ্চর্যার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে ; কালযবন কংসের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য গোকর্ণে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইয়াছিলেন। ভৈরবী তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে অজেয় হইবার বর প্রদান করিলেন। এই বর প্রসাদে উদ্দীপ্ত হইয়া কালযবন অমিততেজে দ্বারবতী আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণের কাহিনী অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ সর্গ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ ভৈরবীর বরপ্রদানের বিবরণ জ্ঞাত ছিলেন ; সুতরাং তিনি দৈত্যের নিধনের জন্য ষড়যন্ত্রের সহায়তা লইলেন। কালযবন শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করিলে তিনি ঋষি মুচকুণ্ডের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ঋষিবর তপোভঙ্গ হওয়ার নিদারুন ক্রোধে তাঁহার নয়নাগ্নিতে দৈত্যকে ভস্মীভূত করিলেন। এইরূপে কৃষ্ণ ও বলদেবের উদ্দেশ্য সন্তোষজনক রূপে সিদ্ধ হইল। কাব্যের শেষাংশে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে যখন অন্ধক এবং বৃষ্ণিগণ রৈবত পর্বতে আনন্দোল্লাসে মত্ত ছিল তখন অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। বলদেব প্রথমে এই বিবাহে আপত্তি করিলেও পরে তিনি এই বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলেন। বিবাহ

উৎসব উপলক্ষ্যে তোপেঙ-নাট্য অভিনীত হইয়াছিল ; উহাকে এখানে রকেৎ বলা হইয়াছে। কাব্যের সমাপ্তিতে আমরা নিম্নলিখিত বাক্যটি পাইতেছি :

"ইতি কাকাবিন কালযবনান্তক কৃষ্ণবিজয় সমাপ্ত"।

উপরোক্ত কাব্যের কাহিনী কোরবাশ্রম[৫৫] নামক গ্রন্থেও সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত হইয়াছে। এইস্থলে কালযবনকে ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কালযবন দ্বারবতীর অধিবাসিগণকে ভক্ষণ করিয়া উক্ত স্থল বিধ্বস্ত করিয়া তুলিতেছিল। মুচকুন্দের কাহিনীও এখানে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার নাম-বিকৃত হইয়া মৃত্যুকুন্দে পরিণত হইয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে এই কাহিনীটি বিষ্ণুপুরাণ[৫৬], হরিবংশ[৫৭] প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। ডঃ য়ুইনবল[৫৮] মনে করিতেন যে আলোচ্য গ্রন্থটি যবদ্বীপে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিল, কারণ এই কাহিনীটি চণ্ডি তুম্পঙ্ এবং পনতরনে রিলিফে অঙ্কিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত সংশয়াতীতরূপে গ্রহণ করা যায় না ; কারণ গণমানসে কিম্বদন্তী বা ঐতিহ্যেরও একটি স্থান আছে। সুতরাং শিল্পীরা কাকাবিনকে অবলম্বন না করিয়া অন্য কোন উৎস হইতেও তাঁহাদের বিষয়বস্তুর উপাদান আহরণ করিতে পারিতেন।

যবদ্বীপের অপর একখানি কাকাবিনের নাম রামবিজয়[৫৯]। ইহা প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত এবং ইহাতে ৬৩টি সর্গ আছে। কাব্যে ব্যর্থপ্রেমিক অঙ্গরপর্ণের (নাম লেখা হইয়াছে অঙ্গপর্ণ) কাহিনী বিধৃত হইয়াছে ; তিনি ভালবাসিতেন শ্রীমতী ইন্দ্র রেনুক-কে। এই নারীই ছিল তাঁহার কল্পনার প্রেয়সী। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রীমতীর বিবাহ হইল জমদগ্নির সহিত এবং কালক্রমে তাহাদের পরশুরাম নামে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল[৬০]। ক্রোধান্ধ অঙ্গরপর্ণ অর্জুন সহস্রবাহুর সহায়তায় জমদগ্নির উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার সংকল্প করিল। পরশুরাম ইন্দ্রের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। যুদ্ধে প্রথমোক্ত দল বিধ্বস্ত হইলেন[৬১]। অর্জুন সহস্রবাহুর সাহায্যার্থে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক নাম আছে, যথা মেথিল (মিথিলা), সিন্দপতি (সিন্ধুপতি), অঙ্গরাজ, কাশীন্দ্র, কশ্মির (কাশ্মীর), কম্বোজ, কলিঙ্গনাথ, দর্শণনাথ, চেদিরাজ, বল্হিকাধিপ (বল্হিকাধীপ) ইত্যাদি।

ক্ষীরসমুদ্র মন্থনের কাহিনীর আভাষ পাই ষষ্ঠ, দ্বাত্রিংশ এবং ত্রয়োত্রিংশ সর্গে ; ইহাতে মহাভারতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়[৬২]। সম্ভবতঃ এই কাকাবিনটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল।

পৃতুবিজয় (পৃথুবিজয় ?) নামক একটি কাব্য অষ্টগুণ নামক একজন কবি রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই নামটি ত্রিগুণ এবং মোনগুণ নাম দুইটির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই গ্রন্থে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বিষয়বস্তু আলোচিত হইয়াছে। ডঃ ক্রোম[৬৩] অনুমান করেন যে এই গ্রন্থটি কেদিরি আমলে রচিত হইয়াছিল। নরকবিজয় নামক একখানি গ্রন্থে ভোমকাব্যের প্রথম দিকের কাহিনী অনেকাংশে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি রাজা কামেশ্বরের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু এই রাজা প্রথম কিংবা দ্বিতীয় কামেশ্বর হইবেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন[৬৪]।

এইবার আমরা ভোমকাব্যের আলোচনা করিব। এই গ্রন্থখানি প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্য এবং নাট্যমঞ্চে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ডঃ য়ুইনবল বলিয়াছেন যে ভোম-কাব্যের কৃষ্ণ এবং নারদের কথোপকথনটি ১৪৬২ শকাব্দে (১৫৪০ খৃঃ) রচিত চালন আরঙ্ নামক গ্রন্থের ঐরলঙ্গ এবং ভরঢ়ের মুখে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। গ্রন্থখানির নাম ভোম বা ভৌম অর্থাৎ নরকাসুরের নাম হইতেই গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার পিতা ছিলেন বিষ্ণু এবং মাতা ছিলেন পৃথ্বী বা পৃথিবী। মাতার নাম-গৌরবে তিনিও মহীসুত, ক্ষিতিসুত, মহীজ, ক্ষিতিজ প্রভৃতি নামে খ্যাত হইলেন। তাঁহার দৈত্যসদৃশ বিরাট দেহ ভয়ের সঞ্চার করিত এবং রাজন্যবর্গও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র শঙ্কাতুর হইয়া অবশেষে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু তাঁহার দৈত্যপ্রতিম পুত্রকে কৃষ্ণ অবতারে নিধন করিতে স্বীকৃত হইলেন। ভোমকে কেহ নিহত করিতে পারিতেন না ; কারণ, যতক্ষণ ভোম ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকিতেন ততক্ষণ মাতা পৃথিবী তাঁহার দেহে শক্তি সঞ্চার করিতেন। অবশেষে কৃষ্ণ ভোমকে পৃথিবী হইতে শূন্যে উত্তোলন করিয়া নিহত করিলেন। দেবগণ নিঃশঙ্ক হইলেন।

এই কাব্যখানির রচয়িতা ছিলেন স্পু ত্রদহ্ ; তিনি ধর্মে ছিলেন বৌদ্ধ। ইহা স্মরণ রাখা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে তাঁহার রচনার বিষয়বস্তু ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য হইতে পরিগৃহীত হইয়াছিল ; বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে নহে। র‍্যাফল্স বলিয়াছেন[৬৫] যে বুম কলতনক বা এম্বতলি নামে এই গ্রন্থের একটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন যবদ্বীপীয় সংস্করণ আছে। এই গ্রন্থের একটি মালয় সংস্করণও আছে ; উহার নাম হিকায়ৎ সঙ্গ্ সম্ব। মালয় সংস্করণটির সহিত প্রাচীন যবদ্বীপীয় সংস্করণের কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রস্ততি নিঙ্ কাকাবিনের সাক্ষ্য যদি গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে বিশ্বাস করিতে হইবে যে বোমান্তক নামক একখানি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন স্পু রিসেরঙ্গন। তিনি এবং স্পু ত্রদহ্ অভিন্ন ব্যক্তি না হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ভৌম বা নরকাসুর সম্বন্ধে দ্বিতীয় একখানি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। ডঃ য়ুইনবল এই গ্রন্থ দুইটি অভিন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে কোন যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই। উইন্টারও বোমন্তর এবং বোমন্তক নামক দুইটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন ; উহার প্রথমটিতে বোমের (ভৌমের) জন্ম এবং দ্বিতীয়টিতে তাঁহার মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার মতানুযায়ী প্রথমোক্ত গ্রন্থটির লেখক হইলেন স্পু কলঙ্গোন এবং দ্বিতীয়টির গ্রন্থকার হইলেন স্পু বোদগুণ। এই কাব্যের অনেকগুলি বলিদ্বীপীয় অনুবাদ আছে ; ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ভোমকাব্য বলিদ্বীপেও খুব জনপ্রিয় ছিল।

এই কাব্যের বিষয়বস্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে ; তবে ইহা সত্য যে তথ্যাদি সর্বক্ষেত্রে একপ্রকার নহে। ডঃ কার্ণ বলিয়াছিলেন যে ভোমকাব্য প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণের পরে রচিত হইয়াছিল। তাঁহার মতানুসারে শেষোক্ত গ্রন্থটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু এই মত এখন আর কেহ গ্রহণ করেন না। আধুনিক পণ্ডিতগণের মতানুসারে প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণ দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত হইয়াছিল।

কার্ণ ভোমকাব্যের রচনাকাল চতুর্দশ শতাব্দী বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন। ভান দের তুক আবার বলেন যে এই কাব্যখানি কামেশ্বরের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল, কারণ ভোমকাব্যের প্রথম চরণই হইল : মূর্তি সঙ্ হঙ্ মনোভূ। তবে এই চরণটি যে রাজা কামেশ্বরকে বুঝাইতেছে এমন কথা নিঃশংসয়ে বলা যায় না।

এইবার আমরা যবদ্বীপের দুইটি মধ্যযুগীয় কাব্যের আলোচনা করিব। উহার একটির নাম সুদমল, অপরটি শ্রীতঞ্জুঙ্। প্রথমোক্ত কাব্যটিকে শ্রীতঞ্জুঙের ভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সুদমল সম্বন্ধে ডঃ ভান দের তুক্ বলিয়াছেন "শিব একজন রাখাল বালকের সহিত উমার ব্যভিচারের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন ; উমা তখন রাক্ষস-মূর্তি পরিগ্রহণ করেন এবং তাঁহার নাম হয় দুর্গা। দুর্গা তখন গন্দময়ুর শ্মশানে বাস করিতে বাধ্য হন। সহদেব শ্রীদুর্গাকে শিবের অভিশাপ হইতে মুক্ত করেন এবং তখন হইতে সহদেবের নাম হয় সুদমল। সুদমল নামটি সংস্কৃত শুদ্ধ (পবিত্রীকৃত) এবং মল (দেবতার অভিশাপে অস্থায়ী রাক্ষসদেহ) শব্দদ্বয়ের বিকৃতি মাত্র।" দুর্গার উপদেশানুযায়ী সুদমল-সহদেব তম্বপেত্রের সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহার অন্ধত্ব মোচন করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন। চিত্রসেন এবং চিত্রাঙ্গদ নামক দুইজন বিদ্যাধরও উমার সহিত রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; তাঁহারা পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রামে নিহত হইয়া দিব্যদেহ প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীতঞ্জুঙে কথিত হইয়াছে যে এই সহদেবের একজন সুন্দরী কন্যা ছিল ; তাঁহার নাম ছিল শ্রীতঞ্জুঙ্। তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল নকুলপুত্র সিদপক্ষের সহিত। সিদপক্ষ এই ধারণার বশবর্তী হইয়া শ্রীতঞ্জুঙকে হত্যা করিলেন যে তাঁহার অনুপস্থিতেতে শ্রীতঞ্জুঙ্ রাজাজ্ঞায় স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে সেই সুযোগে তিনি ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছিলেন। নিহত সুন্দরীর রক্তধারা হইতে সুগন্ধ নির্গত হইলে সিদপক্ষ বুঝিতে পারিলেন যে রাজা শ্রীমতীর অসম্মান করিয়াছেন। তখন সিদপক্ষ পাণ্ডবগণের সহায়তায় দুশ্চরিত্র নরপতি সিন্দুরজকে (সিন্দুরাজা ?) নিহত করিলেন।

এই পর্যায়ের আরো গ্রন্থ যবদ্বীপীয় সাহিত্য অপ্রতুল নহে। এই ধরণের গ্রন্থের নায়ক-নায়িকাগণের অনেক নামই ভারতীয় মহাকাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে কিন্তু ইহাদের পটভূমিকা ও বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র। যেমন, অর্জুন প্রলব্ধ[৬৬] নামক গ্রন্থে অর্জুন এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন ; কৃষ্ণ, হলধর এবং শিবের নামও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, কিন্তু এই কাহিনীর আলোচ্য বিষয় সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যাইবে না। দর্মজতি[৬৭] গ্রন্থও একই পর্যায়ভুক্ত। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই যে দুর্যোধন একদা ভীম, সুভদ্রা, কৃষ্ণ, অর্জুন, সুপ্রভা এবং অন্যান্য কয়েকজনকে বিষ দ্বারা হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই কাব্যে সুভদ্রাকে কৃষ্ণের কন্যারূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। সঙ্ সত্যবন (°বান)[৬৮] নামক মধ্যযুগের যবদ্বীপীয় কাব্যগ্রন্থটি মচপৎ ছন্দে বিরচিত হইয়াছে। এখানে সত্যবনের পত্নীর নাম দেওয়া হইয়াছে সুবিস্ত্রি (সাবিত্রী) ; তিনি যযাতি এবং দেবযানীর কন্যারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। কাহিনীর নায়ক-নায়িকার নাম হইতে স্বতঃই মনে হইবে যে ইহা বিখ্যাত সাবিত্রী-সত্যবানের আখ্যায়ি-

কার যবদ্বীপীয় সংস্করণ। দুইটি কাহিনীর মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায় যে ইহাদের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য রহিয়াছে। পণ্ডব লিম এবং রম নিতিস নামক গ্রন্থদ্বয়ে দুই মহাকাব্যের নায়কগণ নির্বিচারে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছেন; স্থানে স্থানে যবদ্বীপের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে[৬৯]। চলোন অরঙ্গ[৭০] নামক গ্রন্থে কেবলমাত্র যে যাদুবিদ্যা এবং ভারতীয় দেবদেবীগণ পরিদৃশ্যমান তাহা নহে, ইহাতে সুপ্রতীক এবং বিভাবসুর বিখ্যাত গজকচ্ছপের কাহিনীটিও বিবৃত হইয়াছে। কস্যপের (কশ্যপ) আদেশানুযায়ী গরুড়পক্ষী উহাদিগকে নিহত করে। এই আখ্যায়িকাটি নিঃসন্দেহে মহাভারতের আদিপর্ব হইতে গৃহীত হইয়াছে।

বস্তুতঃ দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় বহু গ্রন্থেই অল্পবিস্তর ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। যবদ্বীপের তথাকথিত মুসলিম সাহিত্যেও এই প্রভাবের চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এই প্রভাব এত গভীর যে আমাদিগকে সময় সময় চিন্তা করিতে হয় যে এই প্রভাবকে আমরা হিন্দুসাহিত্যের উপর মুসলিম প্রভাব হিসাবে বর্ণনা করিব, না, মুসলিম সাহিত্যের উপর হিন্দু প্রভাব রূপে বর্ণনা করিব। এইরূপ ক্ষেত্রে লেখকের গ্রন্থারম্ভের স্বস্তিবাচন এবং মূল আখ্যায়িকাভাগ বিচার করিয়া আমাদিগকে একটি সিদ্ধান্তে আসিতে হয়। যবদ্বীপের মুসলিম সাহিত্যের আলোচনা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু নহে; সুতরাং সেই সম্বন্ধে এস্থলে আর বেশী আলোচনা করিব না।

পা দ টী কা

১. Friederich, *Voorloopig verslag* etc., p. 19; Juynboll, *Supplement* I, pp. 137 ff.; *Ibid* II, p. 492; Vreede, *Cat. Jav. Mad. Hss.*, p. 390; *TBG*, 58, pp. 461 ff. *Smaradahana* edited by R. ng. Dr. Poerbatjaraka, Bibliotheca Javanica, no. 3, Rassers, *De Pandji Roman*, pp. 136 ff.

২. এই সংখ্যাগুলি শ্লোক-নির্দেশক।

৩. এইরূপ ঘটনা যবদ্বীপের অনেক গ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছে। সতিয় এবং বেল নামক অনুরূপ অনুষ্ঠান দ্বীপময় ভারতে প্রচলিত ছিল। দ্রষ্টব্য: *Asiatic Researches*, vol. 13, p. 135; Crawford, *History of the Indian Archipelago*, II, pp. 244 ff.; *Essays relating to Indo-China*, Second series, vol. II, pp. 146-51.

৪. অনুরূপ কাহিনী তন্তু পঙ্গেলরণ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। পিগোর সংস্করণ, পৃঃ ১৪১।

৫. Berg, *De Middeljavaansche Historische Traditie*, 1927, p. 172.

৬. দৃষ্টান্ত স্বরূপ হুইকাশ, *VKI* 16 (1955): *The Old-Javanese Ramayana Kakawin*, p. 10.

৭. Berg, *op. cit.*, p. 173 f.n.; *Smaradahana*, (ed. Poerbatjaraka), Introduction p. 9; Van der Tuuk, *KBNWdb* II, pp. 334-5.

৮. স্কন্দপুরাণ, বিষ্ণুখণ্ডে বৈশাখমাসমাহাত্ম্যম্, অধ্যায় ৮-৯; মাহেশ্বরখণ্ডে কেদারখণ্ডম্, অধ্যায় ২০-২২।

৯. ঐ বিষ্ণুখণ্ডম্, অধ্যায় ৯, শ্লোক ১-৬।

১০. ঐ মাহেশ্বরখণ্ডম্, অধ্যায় ২১, শ্লোক ১১২ হইতে ; দ্রষ্টব্য : বিষ্ণুপুরাণ ৫।২৭ ; খিল হরিবংশ অধ্যায় ১৬৬।

১১. চম্পার কোন কোন অনুশাসনলিপিতে শব্দটির নাম দেওয়া হইয়াছে সংমোহন। দ্রষ্টব্য: R. C. Majumdar, *Champā*, p. 174.

১২. স্মরদহন, ৩৮।১৫।

১২ক. Cf. Rassers, *De Pandji Roman*, p. 140.

১৩. *De Pandji Roman*, p. 302.

১৪. *Ibid* p. 200.

১৫. *TBG*, 58 pp. 485 ff.

১৬. ইহা চণ্ডমহাসেন হইবে।

১৭. ডঃ পুর্বচরক এই স্থলে একটি ভুল করিয়াছেন, কারণ সুবন্ধুর বাসবদত্তা গ্রন্থে কন্দর্পকেতুর অভিযান কাহিনীই বর্ণিত হইয়াছে, রাজা উদয়নের কাহিনী নহে।

১৮. কথাসরিৎসাগর। Translated by Tawney, p. 109. Cf. *Ibid*, pp. 268, 269, 270 etc.

১৯. মেঘদূতম্, পূর্বমেঘঃ ৩১।

২০. চতুর্থ অঙ্ক।

২১. এই নামটি নাগরকৃতাগম কাব্যেও আছে (২২/২), কিন্তু এই উভয় নাম এক স্থলকেই বুঝাইতেছে কিনা তাহা বলা দুঃসাধ্য। দ্রষ্টব্য : Moens in *TBG* 84 (1950) p. 125 এবং Bosch in *BKI* 1948 p. 546.

২২. Text in Pigeaud, *op. cit.*, I, pp. 99.

২৩. Juynboll, *Supplement* II, pp. 496-97.

২৪. R. C. Majumdar, *Champā*, pp. 174-75.

২৫. *BCAI*, 1911-12, p. 197, pl. 26b. 232.

২৬. Juynboll, *Supplement* I, p. 157 ; Van der Tuuk, *KBNWdb* III, p. 807 ; Brandes, *Beschrijving der Jav. Bal. en Sas. Hss.* ; Van der Tuuk, *op. cit.*, II, pp. 126-29.

২৭. এই ধরণের দৃষ্টান্তের জন্য দ্রষ্টব্য : Gonda, *Sanskrit in Indonesia* pp. 141-42.

২৮. জ্ঞানসংহিতা, অধ্যায় ১৪।

২৯. দীনেশ চন্দ্র সেন, মহাভারত, শান্তিপর্ব, পৃঃ ৯০৯, ৫ম সংস্করণ।

৩০. *TBG*, 57, p. 518.

৩১. Juynboll, *Supplement* I, pp. 140 ff. ; Friederich, *voorloopig verslag*, etc., p 20.

৩২. দ্রষ্টব্য : Krom, *Borobudur* II, p. 299. Cf. also Kern, *VG* IV pp. 149-77.

৩৩. H. B. Sarkar, *Evolution of Siva-Buddha cult in Java* in *JIH*, XLV (1967) pp. 637 ff.

৩৪. *Op. cit.*, p. 300.

৩৫. *JPTS* 1909 p. 238.

৩৬. *Ibid*, p. 240.

৩৭. তুলনীয় *VG* III, pp. 123 ff.

৩৮. *JPTS*, 1909, p. 290.

৩৯. *Op. cit.*, pp. 123, 146, 147.

৪০. ৪।২৬।২৭।

৪১. তুলনীয় মহাপ্রজ্ঞাপারমিতাশাস্ত্র, সংযুক্তাবদান, সিংহসৌদাসমাংসভক্ষনিবৃত্তি, দমমূকাবদান।

৪২. *JPTS*, 1909 p. 290.

৪৩. *Ibid.*

৪৪. *Voorloopig verslag* etc., p. 20.

৪৫. Krom, *Geschiedenis*, pp. 381, 420 ; Brandes-Krom, *Pararaton*, p. 160 ; *TBG*, vol. 57, p. 520.

৪৬. *TBG*, 57, pp. 515 ff. ; Krom, *op. cit.*, p. 285.

৪৭. Juynboll, *Supplement* I, p. 156.

৪৮. পঞ্চম খণ্ড, ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

৪৯. খিল হরিবংশ (বিষ্ণুপর্ব), ১১৬-১৭ অধ্যায়।

৫০. Brandes, *Tjandi Djago*, p. 77.

৫১. Krom, *Inleiding* II, pp. 250-69 ; *TBG*, 64, pp. 196-206 ; *NBG*, 39, p. 135.

৫২. ২৮।১।

৫৩. *Op. cit.*, p. 78.

৫৪. Juynboll, *Supplement* I, pp. 154-55.

৫৫. Pigeaud, Tantu Panggĕlaran, 1924, p. 337; গ্রন্থখানি সোয়েলেন-গ্রেবেল সম্পূর্ণভাবে সম্পাদনা করিয়াছেন।

৫৬. পঞ্চম খণ্ড, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

৫৭. খিল হরিবংশ, ১১৪তম অধ্যায়।

৫৮ Juynboll, *Supplement* I, p. 155.

৫৯. *Ibid*, pp. 159-60 ; Van der Tuuk, *KBNWdb* I, pp. 500, 782.

৬০. তুলনীয় বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ খণ্ড, ৭ম অধ্যায়।

৬১. তুলনীয় ঐ, একাদশ অধ্যায়।

৬২. তুলনীয় Juynboll, *op. cit.*, p. 160.

৬৩. *Geschiedenis*, p. 296.

৬৪. ঐ।

৬৫. *History of Java* I, p. 388.

৬৬. Juynboll, *op. cit.*, pp. 221-22.

৬৭. ঐ।

৬৮. ঐ, পৃঃ ২৭০।

৬৯. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৩-৭৫।

৭০. ঐ, পৃঃ ২২৯-৩০০ ; *BKI*, 82 (1926), pp. 110-80.

উ ন বিং শ অ ধ্যা য়

যবদ্বীপ এবং বলিদ্বীপের উপাখ্যান এবং রোমান্টিক সাহিত্য

জাভা এবং বলিদ্বীপের অধিবাসীদের উপকথা বা উপাখ্যান এবং রোমান্টিক সাহিত্যের প্রতি প্রীতি তাহাদের কল্পনাপ্রবণ চিত্তের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। সুতরাং এই সাহিত্যের আলোচনা যে কেবলমাত্র দ্বীপময় ভারতের অধিবাসীদিগকে বুঝিবার পক্ষে সহায়ক তাহা নহে, যাহারা সমাজ বিজ্ঞান ও উপকথা-সাহিত্য লইয়া চর্চা করেন তাহাদের পক্ষেও ইহার আলোচনা শিক্ষাপ্রদ। ইহা খুবই সম্ভব যে জনসাধারণের রুচি অনুযায়ী এই সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে; হয়তো জনসাধারণের রুচি-বিবর্তনেও এই সাহিত্যের কিঞ্চিৎ অবদান আছে। কিন্তু এই সাহিত্যের আলোচনায় একটা বিপদের দিকও আছে যাহার সম্বন্ধে প্রারম্ভেই অবহিত হওয়া প্রয়োজন; কারণ, একই ধরণের ভাবধারা এবং গল্প দক্ষিণ-পুর্ব এসিয়ার কোন কোন স্থলে বিদ্যমান ছিল। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ইহাদের পারস্পরিক প্রভাব বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের প্রেরণার মূল উৎসভূমির সন্ধান করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায় অসম্ভব। ডঃ ফ্রানজ বোয়াস্ এই শ্রেণীর উপকথা বা গল্পের একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে বিভিন্ন দেশের উপকথার মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলে উহা "একই ধরণের সাংস্কৃতিক বিকাশের" জন্য সম্ভবপর হইয়াছে। এই থিয়োরীতে বলা হইয়াছে: "মানব জাতির বিভিন্ন শাখা অতি প্রাচীন যুগেই সংস্কৃতি শূন্য অবস্থা হইতে বিবর্তনের পথে পা বাড়াইয়া দেয়, কিন্তু মানুষের মনের স্বরূপটি একই প্রকারের হওয়ায় বাহিরের এবং ভিতরের ঘাত-প্রতিঘাত তাহাদের মনোবৃত্তিতে একই প্রকার ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। সেই জন্যই মানব জাতি সর্বত্র প্রায় একই পথ অনুসরণ করিয়াছে, একই প্রকার আবিষ্কার করিয়াছে, একই ধরণের সামাজিক নিয়মকানুন এবং সংস্কার সৃষ্টি করিয়াছে[১]—" এই মন্তব্যটির একটি বিষদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যে-ক্ষেত্রে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির সম্পর্ক ছিল না, সে-ক্ষেত্রে এই থিয়োরীটি একান্তভাবেই প্রযোজ্য, কিন্তু যে স্থলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ বিদ্যমান ছিল সে স্থলে এই সমস্ত উপকথা বা রোমান্সের উৎসস্থল নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য। বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের যে কেবলমাত্র একই ধরণের গল্প বা উপকথার আলোচনা করিতে হইবে তাহা নহে, পরন্তু আমরা দেখিতে পাইব

যে একই গল্প বা উপকথা ভারতে এবং বহির্ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল। যে সংযোগ-সূত্র ভারত-মালয়-পলিনেশীয় জগতের উপকথা ও রোমান্টিক সাহিত্যকে একত্রে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে তাহা পাঁচটি, যথা :

(ক) স্নান-ঘাটের প্রেম কাহিনী।

(খ) 'নয়ন তিরপিত' হইবার পুর্বেই স্বপ্নে নায়ক নায়িকার পুর্বরাগ।

(গ) অভিশম্পাতের ঘটনা।

(ঘ) বুদ্ধিমান তোতা পাখী, চতুর শৃগাল প্রভৃতির পরামর্শ অনুযায়ী নায়ক-নায়িকার কর্তব্য নির্ধারণ। ইহার স্বাক্ষর ভারত-মালয়-পলিনেশীয় বহু কাহিনীতে বিদ্যমান রহিয়াছে। মালয় আখ্যায়িকাগুলিতে ময়ূরেরও একটি বিশেষ স্থান আছে।

(ঙ) রাক্ষস, ভূতপ্রেত এবং যাদু-বিদ্যা পটিয়সী বৃদ্ধাগণও এই পরিমণ্ডলে স্ব স্ব স্থানে আবির্ভূত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভারত-মালয়-পলিনেশীয় গল্পজগতে ইহাদের বাহুল্য আশ্চর্য রকমে বেশী। অনেক ভারতীয় গল্পে, বিশেষতঃ বাংলাদেশের গল্পে বলা হইয়াছে যে রাক্ষসগণের জীবন-কাঠি ম্যাজিক বাক্স, বৃক্ষ বা কোন প্রাণীর শরীরের মধ্যে সংস্থাপিত করা হইয়াছে। যাঁহারা রেভারেণ্ড লালবিহারী দে কর্তৃক সম্পাদিত "ফোক্ টেল্স্ অফ্ বেঙ্গল" নামক গল্পগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা এই প্রসঙ্গে ডালিম কুমার, রাক্ষসগণ, সাত জননীর স্তন্যপালিত বালকের কাহিনী স্বভাবতঃই স্মরণ করিবেন। অর্জুনবিবাহেও আমরা পড়িতেছি, যে দৈত্যরাজকে জিহ্বায় শরাঘাত না করা পর্যন্ত তাহাকে নিহত করা যাইবে না। পশ্চিম তোরজ উপাখ্যানের বীরপুঙ্গব রপি কদও অলৌকিক উপায়ে তাহার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। কথাসরিৎসাগরের কোন আখ্যায়িকায় একজন দৈত্য বলিতেছে[২] "আমার বাম বাহুতে একটি অরক্ষিত স্থান আছে" এবং ইহার সংগুপ্তি হইতেই তাহার ক্ষমতা অপ্রতিহত হইয়াছিল। রোমান্টিক সাহিত্যে পরী, গন্ধর্ব ও অপ্সর অপ্সরাগণ অধিক গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

এই লক্ষণগুলি ভারতবর্ষ এবং দ্বীপময় ভারতের সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। আমরা সংস্কৃত মহাভারতে[৩] দেখিতে পাইতেছি যে রূপবতী তরুণী সুকন্যাকে স্নান সমাপনান্তে গৃহে ফিরিবার সময় দেখিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাহার প্রেমমুগ্ধ হন, সোমদেবের কথাসরিৎ-সাগর হইতে এইরূপ অজস্র দৃষ্টান্ত পরিবেশন করা যায়। এই স্থানে মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা যাইতেছে। কীর্তিসেনের কাহিনীটি এই স্থলে উল্লেখ করা যায়[৪]। শ্রীমতী শ্রুতার্থ যখন স্নান করিতে যাইতেছিলেন তখন কীর্তিসেন তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রেমমুগ্ধ হন এবং তাহাকে গন্ধর্বমতে বিবাহ করেন। যক্ষ সাতও গঙ্গায় স্নানরতা এক ঋষিকন্যাকে দেখিয়া মোহিত হন এবং উভয়ে বিবাহিত হন[৫]। সোমদেব বর্ণনা করিয়াছেন কিরূপে বিদ্যাধর বিজয়-দত্ত এবং অশোকদত্ত ঋষিকন্যাদিগকে গঙ্গায় স্নান করিতে দেখিয়া তাঁহাদের রূপমুগ্ধ হন এবং এই প্রেমের প্রতিদান হয়। বাংলা মহাভারতে[৬] চন্দ্রহাস এবং বিষয়ার কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে[৭] এই গল্পটি বাংলা সংস্করণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে স্নান ঘাটে চন্দ্রহাসকে সুসুপ্ত দেখিয়া বিষয়া তাঁহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হন

এবং পরে উভয়ের বিবাহ হয়। স্নানঘাটসঞ্জাত প্রণয়-কাহিনী বাংলাদেশের বৈষ্ণব-সাহিত্যেও অমর হইয়া রহিয়াছে। একজন বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন :

"সই, কি হেরিলাম যমুনার কূলে
ব্রজকুল নন্দন
হরিল আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়া তরুমূলে।"

পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণের যমুনাতটের প্রেমবিলাশ কাহিনী সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। এইরূপ প্রণয়ের প্রতিদান কিন্তু সর্বত্র মিলে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ কথাসরিৎসাগরের[৮] একটি কাহিনীর উল্লেখ করা যায়। সেখানে চারিটি গণের কাহিনী লিখিত হইয়াছে; তাহারা একজন স্নানরতা ঋষিকন্যাকে দেখিয়া প্রণয়মুগ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের এই প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল।

এই লক্ষণগুলি জাভা এবং বলিদ্বীপের সাহিত্যেও সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। মধ্যযুগের যবদ্বীপীয় দুর্ম নামক কাব্য গ্রন্থটিতে[৯] ইহার স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে। ইহার ৪২২৫ সংখ্যক পুঁথিতে কিছু সংখ্যক বলিদ্বীপের শব্দ অনুপ্রবেশ করিয়াছে। ডঃ যুইনবল বলিয়াছেন[১০] যে এই কাব্যটি এক মালয়-পলিনেশীয় উপকথা লইয়া আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে কিরূপে স্নানরতা বিদ্যাধরী শ্রীমতী কেন্ সুলসিহের বেশভূষণ রাজপাল হরণ করিয়াছিলেন। রাজপাল পরে বিদ্যাধরীর নিকট তাঁহার প্রণয় নিবেদন করিয়াছিলেন। ইহা আমাদিগকে পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বিদ্যাধরী রাজপালের প্রণয় সম্ভাষকে স্বাগত জানাইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাহাদের দুর্ম-নামক সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে কেন্ সুলসিহও অন্যান্য বিদ্যাধরীগণের মত স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। আমরা পূর্বে সুমনসান্তক-নামক কাব্যগ্রন্থখানির আলোচনা করিয়াছি; তাহাতেও অনুরূপ ঘটনা বিদ্যমান। এই শ্রেণীর একটি বিখ্যাত কাহিনী হইল পুরুরবা ও উর্বশীর প্রণয়োপখ্যান[১১]। ইহাতেও সন্তান জন্মগ্রহণের পর উর্বশী স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। ইহার কারণ কথাসরিৎসাগরে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে। সেখানে মদনবেগ বলিতেছেন, "কলিঙ্গসেনা, আমরা স্বর্গের অধিবাসী; আমাদের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে যদি কোন মানবসন্তান আমাদের গর্ভে আসে তাহা হইলে আমরা উহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া যাইব। মেনকা কি শকুন্তলাকে কণ্বের আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই[১২]?" যাহা হউক দুর্ম পিতা রাজপালের সহিত তপস্যা করিতে গমন করিলেন এবং পিতা তাহাকে বিভিন্ন প্রকার নৈতিক উপদেশ প্রদান করিলেন। ডঃ যুইনবল বলিয়াছেন এই কথোপকথন বলিদ্বীপীয় ভাষায় করা হইয়াছে[১৩]। অতঃপর দুর্ম যখন বলোক্লিঙ্গের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে গমন করিতেছিলেন, তখন রাক্ষসী দুর্গদেনি (দুর্গন্ধিনী?) তাহার দুই ভ্রাতাকে লইয়া দুর্মকে অপহরণ করে। অবশেষে তিনি তাহাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া তাহাদিগকে নিহত করেন। তাঁহার এই অসম সাহসিকতায় পুরস্কার স্বরূপ তিনি রাদেন্ সিঙ্গ রঙ্গর নামে বিখ্যাত হইলেন।

যদিও এই কাব্যের প্রথমাংশ মালয়-পলিনেশীয় উপকথা পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত (য়ুইনবল), তবুও এই শ্রেণীর কাহিনীকে ভারত-মালয়-পলিনেশীয় আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। কারণ এই বিস্তৃত অঞ্চলের রোমান্টিক সাহিত্য এই চিহ্নগুলির স্বাক্ষরবহ। রাদেন্ সপুত্র বা রত্নমনিক[১৪] নামক কাব্যটিতেও এই চিহ্ন সুপরিস্ফুট। এই গ্রন্থখানির কেবলমাত্র যে বলিদ্বীপীয় সংস্করণ আছে তাহা নহে, ইহার পূর্ব যবদ্বীপীয় এবং মাতুরিজ সংস্করণও আছে। বলিদ্বীপীয় সংস্করণটি অধ্যাপক ভ্রিদে কর্তৃক বিবৃত মাদুরিজ রাদিন সপোত্র (পুঁথি ৩১৫৩) হইতে বহুলাংশে পৃথক। ডঃ য়ুইনবল তাঁহার সাপ্লিমেণ্টের ১ম ভল্যুমে যে ৪২৬২ (২) নং সংখ্যক পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন ইহা তাহা হইতেও অনেকটা বিভিন্ন। আমরা এস্থলে বলিদ্বীপীয় সংস্করণটি আলোচনা করিব। এই কাব্যটি মচপৎ ছন্দে বিরচিত হইয়াছে।

কাব্যের নায়কের নাম রাদেন্ সপুত্র। ব্যাঘ্রের সহিত সংগ্রাম তাঁহার বীরত্বের প্রথম ভূমিকা। একদা তিনি ভূতপ্রেত অধ্যুষিত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে গেলে ঐ সমস্ত অশরীরী প্রাণী তাহার এই অনধিকার প্রবেশে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। তিনি তখন মুক্ত তরবারী হস্তে শূন্য মণ্ডলের এই সমস্ত অশরীর প্রাণীদের সঙ্গে সংগ্রাম আরম্ভ করেন। অতঃপর তিনি ঐ স্থানে নিদ্রাভিভূত হইলে অপরূপ রূপলাবণ্যবতী দেবি রত্নমনিককে তিনি স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন। দেবি রত্নমনিকও রাদেন্ সপুত্রকে স্বপ্নে দেখিলেন। অবশেষে একদিন রাদেন্ সপুত্র রত্নমনিককে স্নান করিবার সময় দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

অজর পিকতন[১৫] নামক কাব্যটি পঞ্জি রোমান্টিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এই কাব্য-গ্রন্থটিতেও এই সমস্ত লক্ষণ সুপরিস্ফুট। কাব্যের নায়কের নাম অজর পিকতন; তিনি রাণী পণ্ডন সলসের পুত্র। একদা শিকার করিতে গিয়া তিনি দলভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় লক্ষ্যহীনভাবে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তিনি বিদ্যাধরী সুপ্রভাকে স্নানরতা অবস্থায় দেখিতে পান এবং তিনিও রাজপালের মত বিদ্যাধরীর সিসিম্পিঙ্ বস্ত্র অপহরণ করেন। অজর পিকতন অবশেষে বিদ্যাধরীর সিসিম্পিঙ্ তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন এবং বিদ্যাধরীও অজর পিকতনের একটি অঙ্গুরীয়ক নিয়া অদৃশ্য হইয়া যান। অজর পিকতন বিদ্যাধরীর উদ্দেশ্যে বহুদেশ পরিভ্রমণ কারলেন, বহু নারীর সহিত উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, কিন্তু সুপ্রভার ভুবনমোহিনী মূর্তি তাঁহাকে তখনো বিভ্রান্ত করিতে লাগিল। অবশেষে জণ্টয়ু (জটায়ু) পক্ষী তাঁহাকে বলিল যে সুপ্রভা সুরালয় বা স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন। যদিও এই গ্রন্থের ৪০১০ (১) নং পুঁথি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, তবুও কাহিনীর পরিণাম যে মিলনমাঙ্গল্যে মধুর হইয়া উঠিয়াছিল তাহা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নহে।

আমরা পঞ্জি মর্গস্মর নামক আর একটি কাব্যের আলোচনা করিয়াই স্নানঘাট সঞ্জাত প্রণয় কাহিনীর আলোচনা সমাপ্ত করিব। কাব্যটির নায়িকা সিঙ্গ শেকরের রাজকন্যা চন্দ্রসরি। তিনি একদা মজলুঙ্গরপতি পঞ্জি মর্গস্মরকে স্নান করিতে দেখিয়া প্রণয়মুগ্ধ হন। মর্গস্মরও তাঁহার প্রণয় নিবেদনকে আগ্রহ সহকারে বরণ করিয়া লন। অতঃপর নানারূপ বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়া উভয়ের মিলন সাধিত হয় এবং তাহাদের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে (সর্গ ৯-১১)।

এই ধরণের অজস্র লিখিত এবং অলিখিত রোমান্টিক কাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় প্রচলিত আছে, কিন্তু সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে উন্নাসিক মনোবৃত্তির ফলে এই সমস্ত রোমান্টিক কাহিনী লৌকিক জীবনের নেপথ্যে ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যাইতেছে।

এক্ষনে স্বপ্নজাত পূর্বরাগের লক্ষণটি আলোচনা করা যাউক। ভারত-মালয়-পলিনেশীয় গল্প ও উপকথার পরিমণ্ডলে এই লক্ষণটি যেন স্নানঘাট সঞ্জাত প্রণয়কাহিনী অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে; এমন কি, ইহা আধুনিক ইন্দোনেশীয় উপকথার জগতেও প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে উহার হিন্দু-অঙ্গে মুসলিম ছদ্মবেশ। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যেও ইহার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে সুবন্ধু রচিত বাসবদত্তাতে। উহাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে রাজা চিন্তামণির পুত্র যুবরাজ কন্দর্পকেতু একজন অষ্টাদশী তরুণীকে স্বপ্নে দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। পঞ্জির মত তিনিও স্বপ্নদৃষ্টা নারীর সন্ধানে বহির্গত হইলেন এবং বিন্ধ্যপর্বতে এক বিনিদ্র রজনী যাপন করিবার সময় তিনি ময়না পক্ষীর আলাপন হইতে বুঝিতে পারিলেন যে বাসবদত্তা পাটলিপুত্রের রাজা শৃঙ্গারশেখরের একমাত্র কন্যা। রাজকন্যাও দ্বীপময় ভারতের রত্নমনিক এবং অন্যান্য নায়িকাগণের মত এক পরম রূপবান বীরপুরুষকে স্বপ্নে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। বাসবদত্তাকে সাহায্য করিবার জন্য গঙ্গস্পতি না থাকিলেও সখী তমালিকা ছিল; তাঁহার সাহায্যে দুই প্রেমিক-প্রেমিকা পাটলিপুত্রে সম্মিলিত হইলেন। স্বপ্ন বাসবদত্তাতেও আমরা একটি অনুরূপ কাহিনী দেখিতে পাইতেছি। ইহার নায়ক বৎসরাজ, স্বপ্নে রূপলাবণ্যবতী বাসবদত্তাকে দেখিয়া প্রণয়মুগ্ধ হন। সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে এই শ্রেণীর অজস্র কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এইস্থলে প্রতিনিধি-স্থানীয় একটি কাহিনীকে সোমদেবের ভাষায় বর্ণনা করা যাইতেছে[১৭]: "তখন তিনি (উষা) স্বপ্নে দিব্য রাজকুমারের মত একজন যুবককে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহাকে গন্ধর্বমতে বিবাহ করিলেন এবং স্বপ্নে মিলনানন্দ উপভোগ করিয়া তিনি নিশান্তে জাগ্রত হইলেন। যখন তিনি স্বপ্নদৃষ্ট স্বামীকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু তাঁহার অবস্থিতির চিহ্ন বিদ্যমান দেখিলেন, তখন তিনি গৌরীর পুস্তকের কথা স্মরণ করিলেন; তাঁহার মন অস্বস্তি, আশঙ্কা এবং বিস্ময়ে পুর্ণ হইয়া গেল…তিনি সমস্ত কথা সখী চিত্রলেখাকে বিবৃত করিলেন। চিত্রলেখা উষাকে সমস্ত পৃথিবী, দেবতা, অসুর এবং মনুষ্য সমাজের মধ্য হইতে তাঁহার প্রণয়ীকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে বলিলেন।" এই কাহিনীটি বিষ্ণুপুরাণেও বিবৃত হইয়াছে[১৮]। এই স্বপ্নসঞ্জাত পূর্বরাগের প্রতিধ্বনি পাইতেছি বিদ্ধশালভঞ্জিকার প্রথম অঙ্কে এবং কর্পূরমঞ্জরীর তৃতীয় অঙ্কে। এই উভয় গ্রন্থের লেখক হইলেন রাজশেখর। এই শ্রেণীর রোমান্টিক কাহিনী দাক্ষিণাত্যে, পঞ্জাবে, বঙ্গদেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যত্রও বিদ্যমান। ইহার কিছু কিছু নিদর্শন ফ্রেরে সঙ্কলিত Old Deccan Days, টেম্পল সঙ্কলিত Legends of the Punjab, ক্রুক সঙ্কলিত Folk Tales of Hindusthan এবং দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার কর্তৃক সঙ্কলিত ঠাকুরমার ঝুলি ও ঠাকুরদাদার ঝোলা নামক গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। বাংলা রূপকথায় বলা হইয়াছে:

"কুচবরণ রাজকন্যা মেঘবরণ চুল,
স্বপ্নে দেখিলাম আমি কোন দেশের ফুল।"

বাংলা রূপকথার নায়ক-নায়িকাগণ অনেক সময় পঞ্জি এবং অমহি ররসের মত স্বপ্নদৃষ্ট প্রণয়ী প্রণয়িনীকে আবিষ্কার করিবার জন্য সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছেন, অনেক সময় প্রণয়ান্ধ নায়ক-নায়িকা আরব্যোপন্যাসের প্রণয়ীযুগলের মত দুষ্ট পরীগণের দ্বারা নিশায় মিলিত হইয়াছেন; আবার তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিবাহে অনেকের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; এই দুঃসহ অবস্থায় কেহ যদি সন্ন্যাসী নাও হন, তবু তাঁহারা অনেক সময় কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। তখন বন্ধু-বান্ধবগণের মাধ্যমে বা প্রণয়িনীর সংবাদে নিরাময় হইয়াছেন[১৯]। কখন কখন আমরা দেখিতে পাই যে কোন কোন রাজকন্যার রূপলাবণ্যের বর্ণনাতে মুগ্ধ হইয়াই বাংলা উপকথার নায়কেরা সাতসমুদ্র তেরনদী পাড়ি দিয়াছেন। যখন হিরামন পক্ষী[২০] রাজার ছয় রাণীকে বলিল "তোমাদের একজনের সৌন্দর্যও সাতসমুদ্র তেরনদীর পরপারের রাজকন্যাটির ছোট্ট পদতলের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না," তখন রাজা এই অপার্থিব চরণের অধিকারিণীকে পাইবার উদগ্র কামনায় তাঁহার অশ্ব সজ্জিত করিলেন এবং উহা "বিদ্যুৎবেগে শূন্যে উঠিল। অনেক দেশ, রাজ্য এবং সাম্রাজ্য অতিক্রম করিয়া উহা অবশেষে একদিন সন্ধ্যায় সাতসমুদ্র তেরনদীর পরপারে সুন্দর এক রাজপ্রাসাদের তোরণ দ্বারে অবতরণ করিল।" কবির কল্পনায় কোন বল্‌গা ছিল না; উহা পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতই উদ্দাম বেগে ছুটিয়া চলিত।

দ্বীপময় ভারতের উপকথা এবং রোমান্টিক সাহিত্যেও এই স্বপ্নসঞ্জাত পুর্বরাগ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। একটি কাহিনীতে পড়িতেছি যে রুমের রাজকন্যা "স্বপ্নে পঞ্জির সহিত সহবাস করিলেন, কিন্তু স্বপ্নভঙ্গে ভগ্নমনোরথ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন[২১]।" বিয়োগান্ত করুণ কাহিনীর এরূপ মর্মান্তিক পরিণাম অন্যত্র দুর্লভ। পঞ্জি জয় লেঙ্কর[২২] নামক কাহিনীতে আবার একজন বম্বঙ্‌ সুতির্তের বিবরণ পাইতেছি; তিনি পঞ্জির প্রিয়তমা সেকর তজি বা চন্দ্রকিরণের প্রেমে মুগ্ধ হন। সেকরতজি মমেনঙ্গের (কেদিরি) রাজকন্যা ছিলেন। অঙ্গলিঙ্‌ দর্ম নামক রোমান্টিক গল্পেও[২৩] আমরা দেখিতে পাইতেছি যে দেবি পন্দন সরি ও দেবি মনিক আরা তাঁহাদের প্রণয়ীকে স্বপ্নে দেখিলেন। দৈত্যগণও স্বপ্নসঞ্জাত পুর্বরাগের সম্মোহনীশক্তির দ্বারা অভিভূত হইয়াছে। কারণ, লম্পহন স্রিকণ্ডি গুগুরু মনহ[২৪] নামক গল্পে আমরা পড়েতেছি যে, পরঙ্গ জোঙ্গ লৌত্তনের দৈত্যরাজ ম্রজ দিত্য কলমুর্ক স্রিকণ্ডিকে স্বপ্নে দেখিয়া প্রণয়মুগ্ধ হইয়াছিলেন। জক প্রতক এবং চীনা রাজকন্যা চুবিরির রোমান্টিক কাহিনীটিতেও ইহার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে[২৫]। সুন্দ অঞ্চলের একটি গদ্য গ্রন্থেও ইহার চিহ্ন আমরা দেখিতে পাই; গ্রন্থখানির নাম চরিত পন্থুঙ্‌ মন্ত্রি[২৬]। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে গুমুঙ্গ সুজিঙ্গের অধিপতি প্রবু বেঙ্‌কের পকুবন তাঁহার স্বপ্নদৃষ্টা প্রেয়সী গুমুঙ্গ বুবুতের রাজকন্যা রত্ন পকুবনকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার জন্য তাঁহার মন্ত্রীকে প্রেরণ করিলেন। স্বপ্নসঞ্জাত এই পুর্বরাগের চিহ্নটি যবদ্বীপের মধ্যযুগীয় তথাকথিত মুসলিম সাহিত্যেও অনুপ্রবেশ

করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মচপৎ ছন্দে বিরচিত কম্পর নামক কাব্যগ্রন্থটির[২৭] কথা উল্লেখ করা যায়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে ব্রগেদাব (বাগদাদ)-এর রাজকন্যা রেত্ন জিনলি স্বপ্নে একজন পরম রূপবান পুরুষকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন ; পুরুষটির নাম ছিল অম্ব্য কতম্সি। কতম্সি রাজকন্যাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। অন্ব্য ইউসুফ্[২৮] নামক গল্পটিও একই প্রকারের। ইহাতে বলা হইয়াছে যে তেমস সুলতানের সুন্দরী রাজকন্যা কুসুম সিতি জলেক তাহার ভবিষ্যৎ স্বামীকে স্বপ্নে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই স্বপ্নজ প্রেম মাদুরার সাহিত্যের স্থানে স্থানে বিকশিত হইয়াছে। সুক্ম জতি[২৯] নামক কাব্যটিতে আমরা দেখিতে পাই যে দেবি রুহেরৎ স্বপ্নে একজন রূপবান বীরপুরুষকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন ; এই পুরুষটি ছিলেন জস্মনের অধিবাসী সুক্ম জতি। উভয়ে কালক্রমে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের মনের বাসনা চরিতার্থ করিলেন। উপরোক্ত বিবরণ হইতে ইহা সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে স্বপ্নসঞ্জাত পূর্বরাগের স্বাক্ষর ভারত-মালয়-পলিনেশীয় সাহিত্যে সুস্পষ্টভাবে রহিয়া গিয়াছে। এই রোমান্টিক সাহিত্য সৃষ্টিতে আলেখ্যেরও একটি অবদান আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা পড়িয়াছি যে অগ্নিমিত্র মালবিকার আলেখ্য দেখিয়া প্রেমমুগ্ধ হন[৩০]। নারীগণও ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না। সোমদেব কথাসরিৎসাগরে বলিয়াছেন যে মুক্তির রাজকন্যা রূপলতা পৃথিবীধরের চিত্র দেখিয়া বিমোহিত হন[৩১], কিন্তু আমাদের মনে হয় যে এই বিশেষত্বটি দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার প্রাচীন রোমান্টিক সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে নাই। পঞ্জি রোমান্সগুলিতে আমরা আবার অন্য প্রকারের লক্ষণ দেখিতে পাই ; ইহাতে দেখিতে পাই যে নায়িকা প্রাসাদ হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন[৩২] এবং তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার জন্যই অনিবার্যরূপে বীরপুরুষগণ উপস্থিত হইয়াছেন। প্রাচীন ভারতের এবং মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাহিত্যে এই লক্ষণটি বিরল নহে। এসিয়া এবং ইউরোপের সহিত ব্যবসা, ক্রুসেড্ বা ধর্মযুদ্ধ উপলক্ষে ঘনিষ্টতর সংযোগ ঘটা সত্ত্বেও ইহা মনে হয় না যে এই লক্ষণটি দুই মহাদেশের রোমান্সগুলিকে এক মিলনসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। মানুষের চিন্তার সাদৃশ্য এবং এই শ্রেণীর সাহিত্যে এই ধরণের লক্ষণের অবশ্যম্ভাবিতার কথা স্মরণ করিলে এই সাদৃশ্যে আশ্চর্য হইবার কিছু থাকে না। অভিশম্পাত বিতরণে প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্য এবং পৌরাণিক সাহিত্যের ঔদার্য জগদ্বিখ্যাত। প্রাচীন যুগের দুইজন মহাঋষি, যথা দুর্বাসা এবং বিশ্বামিত্র এই বিষয়ে এক ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহা কেহ ম্লান করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী লেখক এবং সঙ্কলয়িতারা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য ইহার যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা হইতে স্বভাবতঃই কয়েকটি সুন্দর কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে যাহা প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থে বিকীর্ণ রহিয়াছে। আমরা ইতি-পূর্বেই এই চিহ্নের স্বাক্ষরবহ কয়েকখানি প্রাচীন যবদ্বীপীয় গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি। সম্ভবতঃ প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যের মাধ্যমে এই লক্ষণগুলি দ্বীপময় ভারতের বিভিন্ন রোমান্টিক সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। মানুষ, পশু, দৈত্য প্রভৃতির দেহ ধারণ করার পিছনে হয়তো ম্যাজিক এবং কুসংস্কারের প্রভাব রহিয়া গিয়াছে ; সুতরাং এই চিহ্নগুলি ভারতবর্ষ এবং দ্বীপময়

ভারতের সাহিত্যে বিদ্যমান থাকিলেও এইগুলিকে আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাহিত্যের মিলনসূত্র বলিয়া অভিহিত করিতে পারি না। অন্যান্য লক্ষণগুলির আলোচনা আমরা যথাস্থানে করিব।

জাভা এবং বলির গল্প-সাহিত্যে পঞ্জি রোমান্সের স্থান অতি উচ্চে এবং ইহার জনপ্রিয়তা অনন্যসাধারণ। এই সাহিত্যের প্রধান ভূমিকায় আছেন পঞ্জি এবং তাঁহার জীবনের বিভিন্ন পর্যায় এই সাহিত্যে রূপায়িত হইয়াছে। পঞ্জির নায়িকার প্রতি প্রেম, প্রিয়ার অন্তর্ধান কাহিনী, তাঁহার পুরুষে রূপান্তর ইত্যাদি এই রোমান্সের উপজীব্য বিষয়। তেনগহন-ছন্দে বিরচিত মধ্য-জাভানীজ ভাষায় রচিত বিভিন্ন পঞ্জি কাব্যগুলির মধ্যে মালৎ সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল। পরবর্তী যুগের যবদ্বীপীয় এবং মালয় পঞ্জিকাব্যের উৎস হইল মালৎ। ডঃ ভান দের তুক্ বলিয়াছেন "মালৎ বসেঙ্গ্ এবং বঙ্গবোঙ্গ্ বিদেহ এবং এই গ্রন্থগুলিতে যে নায়ক-নায়িকারা আছেন তাঁহারা মালয় কাহিনীর সহিত অধিকতর সংশ্লিষ্ট; এই বিষয় লইয়া রচিত আধুনিক যবদ্বীপীয় কাব্যের সহিত তাহাদের সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত কম[৩৩]।" এই গ্রন্থগুলির প্রকৃতি একই প্রকারের; সুতরাং পঞ্জি রোমান্সের আলোচনা করিতে আমরা বসেঙ্গকেই প্রথমে গ্রহণ করিব। ইহা তেনগহন-ছন্দে বিরচিত হইয়াছে[৩৪]।

গল্পে উল্লেখিত হইয়াছে যে কলিঙ্গের (বা কোরিপন) রাজপুত্রের নাম ছিল বিরনমতমি; তিনি কেদিরর রাজকুমারী অমহিররসের প্রেমে পড়িয়া যান। রাজকন্যা ছিলেন অসামান্যা রূপসী; সুতরাং মগধের রাজাও অমহিররসের পাণিপ্রার্থী ছিলেন। মগধরাজ বুঝিতে পারিলেন যে বিরনমতমিই তাঁহার প্রণয়ের কণ্টকস্বরূপ; সুতরাং তিনি একদা সুপ্ত কলিঙ্গ রাজকুমারকে অপহরণ করিয়া মগধে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রাজকুমার ছিলেন অবধ্য; সুতরাং তাঁহাকে সলিলসমাধি দিলেও তিনি জীবিত অবস্থায় দশদিন জলে রহিলেন। অবশেষে তরঙ্গপ্রবাহে তিনি তটভূমে নিক্ষিপ্ত হইলে কেদিরির রাজকন্যা তাঁহাকে আবিষ্কার করিলেন। অতঃপর রাজপুত্র হুগুকন বসেঙ্গসরি নাম পরিগ্রহণ করিয়া কেদিরিতে "তাঁহার প্রিয়ার নিকটবর্তী স্থলেই বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজকন্যা বুঝিতে পারিলেন না যে তিনিই কোরিপনের রাজকুমার"। এই কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে বলা হইয়াছে যে মগধ, পুত্রসেন এবং পবোন-অবোনের রাজগণ কেদিরির রাজকন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করিবার জন্য দহ বা কেদিরির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এই সমস্ত রাজা তাঁহার পূর্বশত্রু ছিলেন; সুতরাং বসেঙ্গ ইহাদিগকে নিহত করিয়া তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পাইলেন। ইহার পর কবি প্রণয়ী যুগলের মিলন ঘটাইয়াছেন, কিন্তু ভগবান উভয়ের বিবাহে বাদ সাধিলেন। তৃতীয় সর্গে আমরা পড়ি যে বীরভূমির রাজা সহসা দহ আক্রমন করিলেন; সুতরাং বিবাহের পক্ষে বাধা উপস্থিত হইল এবং অমহিররসও অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বসেঙ্গ যুদ্ধের সময় দহে উপস্থিত ছিলেন না; সুতরাং তিনি তাঁহার প্রিয়তমার আকস্মিক অন্তর্ধানের খবর শুনিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরবর্তী সর্গে বর্ণিত হইয়াছে যে অমহিররস অবশেষে এক মুনির নিকটে আশ্রয়লাভ করিলেন। এই আশ্রমেই গেগ্লঙ্গের রাজার সহিত তাঁহার পরিচয় হইল এবং রাজা এই অভাগিনী রাজকন্যাকে রক্ষা

করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। রাজকন্যা অবস্থা পরিবর্তনের জন্য অমহিলর নাম পরিগ্রহণ করিলেন। বসেঙ্গ ইতিমধ্যে দহের রাজকন্যাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য চতুর্দিকে অনুসন্ধান করিতেছিলেন এবং পঞ্জি তমসহ্ ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া বহু রাজন্যকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পরাজিত রাজগণের কন্যাদেরও বিবাহ করিয়াছিলেন। গেগলঙ্গের রাজা পঞ্জির অসীম শৌর্যবীর্য দেখিয়া তাঁহার সহিত অমহিলরের বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন (৫ম এবং ৬ষ্ঠ সর্গ)। একদা অমহিলর দহের রাজপ্রাসাদে যে প্রিয় গানগুলি গাহিতেন তাহাই গাহিতেছিলেন; পঞ্জি তমসহ্ উহার চিরপরিচিত সুর শুনিয়া মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন। ইহার পর পঞ্জি গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া পড়িলে অমহিলর আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু এই বিয়োগান্ত নাটক মিলনে পরিসমাপ্তি লাভ করিল। কারণ এই সময় দহের রাজা আসিয়া আবিষ্কার করিলেন যে বসেঙ্গ এবং পঞ্জি তমসহ্ অভিন্ন এবং অমহিলর ও তাঁহার অপহৃতা কন্যা ব্যতীত আর কেহই নহেন। এই মিলন ঘটনাচক্রে মধুরতর হইয়া উঠিল। কারণ দেখা গেল যে ছদ্মনামের অন্তরালে যে বসেঙ্গ রহিয়াছেন তিনিই কোরিপন বা কলিঙ্গের নিরুদ্দিষ্ট রাজপুত্র বিরনমতমি। সপ্তম সর্গে উভয়ের বিবাহ এবং একটি পুত্রসন্তানের জন্মের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

বঙ্গবোঙ্গ বিদেহ[৩৫] গল্পটিও পঞ্জি সাহিত্য-পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত এবং ইহাও বসেঙ্গ হইতে কম জনপ্রিয় নহে। একদা দহের রাজকুমারী বরাস্ত্রসরি নির্বাসিতা হইলে মকরধ্বজ তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। দেশে বিদেশে ঘুরিবার সময় তিনি সিঙ্গসরির রাজকন্যা কেশবতীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিলেন কিন্তু তিনি এক মুহূর্তের জন্যও দহের সুন্দরী রাজকন্যার কথা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। এদিকে বরাস্ত্রসরিও কেম্বঙ্ কুনিঙ্গ-এর বনে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই দেশের রাজপুত্র সিঙ্গমাত্রের দৃষ্টিপথে পতিত হন। তিনি রাজকন্যাকে আবার দহে ফিরাইয়া লইয়া যান এবং যদিও রাজকন্যা মকরধ্বজের প্রেমমুগ্ধা ছিলেন তবুও তিনি তাঁহাকে বিবাহ করেন। মকরধ্বজ এই সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বঙ্গবোঙ্গ বিদেহ পঞ্জি বিরেশ্বর নাম পরিগ্রহণ করিয়া দহে চলিয়া যান। সেখানে তিনি ড়লঙ্গ হইয়া কতকগুলি ছায়া নাটক প্রদর্শন করেন; ইহার মধ্যে প্রধান ছিল ঘটোৎকচাশ্রয়। এই ছায়ানাটকগুলি মঞ্চস্থ হইলে সেখানে রাজকন্যা আসিলেন এবং তিনি ড়লঙ্গের সৌন্দর্য এবং কর্মকুশলতা দেখিয়া বিমোহিত হন। তাঁহারা আবার পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। শেষের দুই সর্গে (দ্বিতীয় ও তৃতীয়) বলা হইয়াছে কিরূপে দহের রাজা অতঃপর লসেম এবং অন্যান্য স্থলের রাজাদের কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং কিরূপে বঙ্গবোঙ্গ বিদেহ তাঁহার সাহায্যার্থে আসিয়া যুদ্ধে চারিজন রাজাকে নিহত করেন। অবশেষে তিনি বরাস্ত্রসরিকে কোরিপন লইয়া গেলেন এবং সেখানে উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তখন হতাশ প্রেমিক সিঙ্গমাত্র লসেমের রাজকন্যাকে বিবাহ করিলেন। বস্তুতঃ পঞ্জি সাহিত্যে একনিষ্ঠ প্রেমের নিদর্শন দুর্লভ; বর্তমান কাব্যটিও ইহার ব্যতিক্রম নহে।

স্মরবেদন কাব্যটি অষ্টাদশ সর্গে বিভক্ত। এই কাব্যটির সূচনা বাংলা রূপকথার বানর রাজপুত্রের কাহিনীটি স্মরণ করাইয়া দেয়; রাজপুত্রটি প্রতিরাত্রে তাঁহার বানর-বেশটি

পরিত্যাগ করিত। এই বানরটির স্ত্রী ছিলেন একজন রাজকন্যা। তিনি একরাত্রে এই অভূতপূর্ব ঘটনা অবলোকন করিয়া প্রথম সুযোগেই সেই কুৎসিৎ বানর-বেশটি আগুনে পুড়াইয়া ফেলিলেন। পরদিন প্রভাতে জনসাধারণ সবিস্ময়ে দেখিল যে বানরটি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দর রাজকুমার। গল্পটির অবশিষ্ট অংশ স্মরবেদন হইতে বিভিন্ন হইলেও এই গল্পটি বঙ্গদেশে খুব জনপ্রিয়[৩৬]। এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ করা যাইতে পারে যে এই গল্পের সারাংশ সুন্দনিজ সিজুঙ্গ বনর, লুটুঙ্গ কসরুঙ্গ কাহিনী এবং তুতুর মঞের শশক সংস্করণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গল্পটির উৎস অষ্ট্রিক না হইয়া থাকিলে, উহা হয়তো বাঙ্গলা হইতে দেশান্তরে গিয়াছে।

এক্ষণে স্মরবেদনের কাহিনীটি বর্ণনা করা হইতেছে। এই কাব্যের প্রথম সর্গে বলা হইয়াছে যে জঙ্গলের (কোরিপন) রাজবংশে এক শ্বেত বানর-পুত্র[৩৭] জন্মলাভ করে। অতঃপর তাঁহাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হয়। প্রায় একই সময়ে দহের রাজকন্যা সুক্ষ্মসরিও অন্তর্হিতা হন। একদা তিনি উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দূরে একটি উজ্জ্বল পদার্থ দেখিতে পান এবং উহা অনুসরণ করিতে থাকিলে উহা ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতে থাকে। রাজকন্যা উহাকে পশ্চাদনুসরণ করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া যান। তিনি কোথায় গিয়াছেন তাহা কেহই বলিতে পারিল না। তখন বিভিন্ন স্থলের বীরপুরুষ তাঁহাকে আবিষ্কার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ইহার মধ্যে ছিলেন গেগলঙ্গের রাজপুত্র চিত্রদন। জগরগের রাজকুমার চিত্রদর্মও রাজকন্যাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। প্রায় একই সময়ে মমেনঙ্ এবং পবোন-অবোনের রাজপুত্র চিত্রযুদ্ধ এবং চিত্রবেদ তাঁহাদের দেশ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে যে জঙ্গলের বানর-রাজপুত্র পগুন-সলসের রাজসভায় উপনীত হইলেন এবং রাজাও তাঁহাকে তাঁহার জামাতা করিতে চাহিলেন। স্নানের সময় তাঁহার বানরবেশ পরিত্যক্ত হইলে তিনি পূর্ণ রাজকুমারের বেশে দেখা দিলেন এবং তিনি রাজার দুই কন্যা অমৃতময় এবং কৃতময়কে বিবাহ করিলেন। তৃতীয় হইতে অষ্টম সর্গে বলা হইয়াছে কিরূপে জঙ্গলের রাজপুত্র বিরাত্মক নাম পরিগ্রহণ করিয়া বিভিন্ন দেশের রাজাকে সংগ্রামে পরাজিত বা নিহত করেন। বিরাত্মক এই সকল রাজার কন্যাগণকে বিবাহ করিলেন। অতঃপর তিনি আবার নাম পরিবর্তন করিলেন; তাঁহার নূতন নাম হইল স্মরবেদন। স্মরবেদন গেগ্‌লঙ্গের রাজকুমারী মৃতনিঙ্‌রাৎকে বিবাহ করিলেন (নবম সর্গ)। অন্যান্য বীরপুরুষগণের যুদ্ধ এবং বিবাহের কাহিনী দশম হইতে ত্রয়োদশ সর্গে বিবৃত হইয়াছে এবং বিবাহ-ভোজের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ সর্গে। পরবর্তী সর্গে বলা হইয়াছে যে জঙ্গলের (কোরিপন) রাজা গেগ্‌লঙ্গে সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে তিনি পুত্র-লাভার্থে তপস্যা করিবেন। প্রেরিত দূত শুনিতে পাইল যে বিরাত্মকই জঙ্গলের রাজকুমার; সুতরাং রাজার পুত্র-লাভার্থে তপস্যার কোন প্রয়োজন নাই। ইত্যবসরে বিরাত্মক গেগ্‌লঙ্গ হইতে অন্তসরিকে অপহরণ করিয়া পলায়ন করিলেন (সপ্তদশ সর্গ); ইহাতে ঐ রাজ্যের রাজা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রুদ্রকর এবং সুদনমৃত নামক দুইজন লোককে প্রণরগ পাঠাইলেন। তাহাদের উপর আদেশ ছিল যে তাহারা বিরাত্মককে হত্যা করিয়া রাজকন্যাকে ফিরাইয়া লইয়া আসিবে। এই সঙ্কট

মুহূর্তে কোরিপনের রাজা আগমন করিলেন ; তাঁহার চেষ্টায় বিরাত্মক এবং অস্তসরির বিবাহ হইল। ইহার বৃত্তান্ত অষ্টাদশ সর্গে বিবৃত হইয়াছে।

মন্ত্রি বদক[৩৮], মেন্তুর বিলিস[৩৯] এবং মিস গগঙ্গ[৪০] নামক গ্রন্থগুলিও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, প্রথম গ্রন্থখানি অতি আধুনিককালের এবং ইহাতে অনেক বলিদ্বীপীয় শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। পঞ্জি রোমান্টিক সাহিত্য সম্বন্ধে ডঃ পুর্বচরক এবং ডঃ রাসের্স লক্ষণীয় গবেষণা করিয়াছেন। এই সাহিত্যসম্ভার দীর্ঘকালের রচনায় সমৃদ্ধ হইয়াছে এবং বাহিরের অনেক বিষয় ইহাতে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। নায়ক নায়িকা বিভিন্ন নাম এবং ছদ্মনাম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। যেমন রবি-সরঙ্গ, চন্দ্রকিরণ, চন্দ্রসরি, নবঙ্গ বুলন। ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে পঞ্জি রোমান্সগুলির আদিম উৎস হইল সৌর এবং চান্দ্র-উপকথা। ইহা অসম্ভব নহে যে এই কাহিনীটি আদিম যুগে একটি নির্ভেজাল চান্দ্র-উপকথা ছিল ; ইহা কালক্রমে একটি বহিরাগত সৌর-উপকথার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া পড়ে[৪১]। শেষোক্ত উপকথা এই কাহিনীর মধ্যে একটি প্রবল আদিরসের ভাব সঞ্চালিত করিয়া তোলে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই সে চন্দ্রকিরণের প্রিয়তম পঞ্জি ঠিক সূর্যের মত। প্রাচীন উপকথা অনুযায়ী এই সূর্য সপ্তাশ্ববাহিত হইয়া সর্বদা বিলীয়মান চন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন। এই কাহিনীর একটি বিশেষত্ব এই যে এই রোমান্সের নায়ক-নায়িকা উভয়েই চতুর্দশীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; তখন নৈশাকাশে পূর্ণশশী বিদ্যমান। যখন ইন্দ্র কামজয় এবং তাঁহার ভগিনী নিল কেঞ্চন জন্ম-গ্রহণ করিলেন তখন বজ্রধ্বনি হইল, সুবাতাস প্রবাহিত হইল, আকাশে রামধনু দেখা দিল, পুষ্পদল সুগন্ধ বিতরণ করিতে লাগিল, চন্দ্রগ্রহণ হইল এবং প্রভাতবেলায় চন্দ্র এবং সূর্যের মত পরম সুন্দর দুইটি শিশু জন্মগ্রহণ করিল[৪২]। পঞ্জি রোমান্সের বিভিন্ন স্থলে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরের মন্তব্যগুলি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে আমাদিগকে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে এই সমস্ত কাহিনীর প্রকৃত ইন্দোনেশীয় রূপ কালক্রমে বিদেশীর সংস্পর্শে আসিয়া অনেকটা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। অনেক সময় আমরা দেখিতেছি যে গোলকুণ্ডা, তাঞ্জোর, গুজরাট, বঙ্গদেশ প্রভৃতি দেশের[৪৩] নরপতি এই সমস্ত কাহিনীতে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন ; কোথাও কোথাও আবার স্বয়ম্বর কাহিনী সাড়ম্বরে বর্ণিত হইয়াছে। চেকেল বনেঙ্গপতি নামক আখ্যায়িকাটিতে কেবলমাত্র যে চন্দ্রকিরণের স্বয়ম্বর বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা নহে, নায়িকা আবার এখানে স্বর্ণ-মৃগও দাবী করিয়া বসিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে ইহা সুস্পষ্টরূপে রামায়ণের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। অরেগু জণ্টয়ু এবং কেলন বির নোনোমন নাম দুইটিও জটায়ু এবং হনুমানের স্মৃতিবহ। কখনো কখনো আমরা আবার এমন কাহিনীরও সাক্ষাৎ পাই যাহার মূল উৎস সংস্কৃত নহে, পরন্তু উহার পরবর্তী সংস্করণ। ইহা দক্ষিণ ভারত হইতে যাত্রা করিয়া মালয় উপদ্বীপ প্রদক্ষিণ করতঃ অনেকটা পরিবর্তিত রূপে যবদ্বীপে অনুপ্রবেশ করিয়াছে[৪৪]। মহাভারতের প্রভাবও অনেক স্থলে সুস্পষ্ট। পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে কেলিঙ্গ রাজকে, যিনি তাঁহার পুত্রকে চন্দ্রকিরণের সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন—পাণ্ডববংশসম্ভূত বলিয়া

বর্ণনা করা হইয়াছে[৪৫]। অনেক গ্রন্থে অস্তিন (হস্তিনা), পমদে (অর্জুন) প্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে; অনেক স্থলে কোরিপন এবং দহের রাজপুত্র ও রাজকুমারীগণকে অর্জুন এবং জম্বুবতী (জাম্ববতী?)[৪৬] ও সম্ব (শাম্ব) এবং সুবদ্রের (সুভদ্রা) অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সমস্ত আখ্যায়িকার বিভিন্ন স্থলে কাম, রতি, ইন্দ্র, নারদ প্রভৃতি দেবদেবীর উল্লেখ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে এই সমস্ত রোমান্স পরোক্ষভাবে যবদ্বীপের ইতিহাসের সহিতও সংশ্লিষ্ট। প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্য এবং ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয় হইলে সম্ভবতঃ পঞ্জি রোমান্সের অনেক অস্পষ্ট অধ্যায়ের উপর আলোকসম্পাত হইবে। এই সমস্ত কাহিনীতে যে চারি-পাঁচটি রাজ্যের নাম উল্লিখিত আছে তাহা বিভিন্ন সংস্করণে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে নাই। ইহা নিশ্চয়ই বিস্ময়কর বলিয়া প্রতিভাত হইবে যে কোরিপন, দহ, গেগ্‌লঙ্গ এবং সিংঘসরিকে এক দিকে যেমন মজপহিতের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, অন্যদিকে আবার উহাদিগকে মেড়ঙ্গ কমুলনের সমকালীন বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে[৪৭]। রাসের্স বলিয়াছেন যে এই রাজ্যগুলিকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিলেও উহারা প্রায় সমার্থবোধক। এক হিসাবে এই কথা সত্য; কারণ, প্রাচীন যবদ্বীপের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে কেদিরি (দহ) রাজ্যটি কালক্রমে সিংঘসারিতে রূপান্তরিত হইল এবং সিংঘসারির কর্তৃত্ব গ্রহণ করিল মজপহিত। এই রাজ্যগুলি পূর্ব যবদ্বীপে অবস্থিত ছিল এবং অনেক সময় ইহার পরিধি আরো অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নয় যে পঞ্জি রোমান্সগুলি এই বিভিন্ন রাজ্যগুলির বিবর্তনকালেই রচিত হইয়াছে; সুতরাং এই রাজ্যগুলির উল্লেখ পঞ্জি কাহিনীগুলির বিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কালক্রমে এই রাজ্যগুলির স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া আসিলে ভৌগলিক নামেও অরাজকতার সৃষ্টি হইল।

ডঃ রাসের্স পঞ্জি রোমান্সগুলি সম্বন্ধে একটি নূতন মতবাদের প্রবক্তা। তিনি বলিয়াছেন যে পঞ্জি রোমান্সগুলির আদিম চিত্র এমন এক সমাজে পাওয়া যাইবে যাহা ভিন্ন গোত্রে বিবাহ এবং গোত্র-প্রতিভূ বা টোটেমে (totem) বিশ্বাসী ছিল এবং এইরূপ সমাজের অস্তিত্ব প্রাচীন যবদ্বীপে "এক সময় অবশ্যই ছিল।" তিনি আরো বলিয়াছেন যে যবদ্বীপীয় নাট্যও টোটেম্‌-আচার হইতে বিবর্তিত হইয়াছে[৪৮]। সুতরাং তিনি পঞ্জি রোমান্সের আলোকেই আদিম জাভার ভিন্ন গোত্রে বিবাহকারী প্রাচীন গোষ্ঠিগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বিষয়ে আমরা ডঃ রাসের্সের সহিত এক মতাবলম্বী হইতে পারিলাম না। ডঃ রাসের্স গোত্র-প্রতিভূ (টোটেম্‌ ও সাব্‌ টোটেম্‌) বাটিক-প্যাটার্নে, ক্রিসের আকৃতিতে এবং পামোর-অলঙ্করণে দেখিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে; তিনি যবদ্বীপীয় ক্রিস্‌ এবং অষ্ট্রেলীয় চুরিঙ্গের মধ্যে সাদৃশ্য অবলোকন করিয়াছেন[৪৯]। ডঃ ফ্রেজার বলিয়াছেন যে "টোটেম্‌ হইল এক শ্রেণীর পার্থিব জিনিষ যাহা অসভ্যেরা সশ্রদ্ধ কুসংস্কারের সহিত দেখিয়া থাকে; তাহারা বিশ্বাস করে যে ঐ জিনিষ এবং গোত্রের প্রত্যেকটী মানুষের মধ্যে একটা বিশেষ সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে[৫০]।" কিন্তু ডঃ রাসের্স গোত্রের সহিত পার্থিব জিনিষের মৌলিক একত্ব টোটেমিসমের প্রধান লক্ষণ

বলিয়া মনে করেন[৫১]। ডঃ রাসের্সের এই অভিমত সমালোচনা করিতে যাইয়া একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াছেন[৫২] যে ডঃ রাসের্সের টোটেম সংক্রান্ত সংজ্ঞা নিউ গিনি এবং দ্বীপময় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের আদিম সমাজ ব্যবস্থা হইতে সমর্থিত হয় না[৫৩]। বস্তুতঃ এই আদিম সমাজের কি স্বরূপ ছিল, সেখানে টোটেমিস্‌ম বিদ্যমান ছিল কিনা, থাকিলেও কোন সময়ে ছিল এবং তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ কি এই সমস্ত প্রশ্নের সুষ্ঠু উত্তর এখনো পাওয়া যায় নাই। এই টোটেমিস্‌মের জন্য যদি অপর মহাদেশ হইতে দৃষ্টান্ত আহরণ করিতে হয় তাহা হইলে বিষয়টির সঠিক মূল্যায়নে একান্ত অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ প্রাচীনতম যবদ্বীপে এই ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকিলেও ইহা এতটা গুরুত্বপুর্ণ ছিল বলিয়া মনে হয় না। যে জটিল পঞ্জি-রোমান্সের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি তাঁহার থিয়োরী সৃষ্টি করিয়াছেন সেই পঞ্জি-সাহিত্য ভারতবর্ষ ও যবদ্বীপের গভীর সাংস্কৃতিক সহযোগিতার যুগে উদ্ভূত হইয়াছিল ; ইহার শোভন অলংকরণ ঘটিয়াছিল আরো পরবর্তী যুগে। সুতরাং ইহা অনেকের নিকটই আশ্চর্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে যে অতি প্রাচীন যুগের টোটেমিষ্টিক চিন্তাধারা কিরূপে পরবর্তী যুগের সাহিত্যে এতটা প্রভাব বিস্তার করিল যাহার ফলে সমগ্র পঞ্জি-সাহিত্যই একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহণ করিল। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক নূতন লেখকই কেন পঞ্জি রোমান্স রচনা করিবার সময় আদিমযুগের টোটেমিস্‌মের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার গ্রন্থ উহার ছকে ঢালিয়া রচনা বা সঙ্কলন করিবেন তাহাও এক বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে হইবে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এই পঞ্জি কে এবং পঞ্জি সাহিত্যটি আসলে কি ? পঞ্জি বা অপঞ্জি শব্দের মূল হইল 'জি' ; উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল শক্তিমুল্য। হজি বা অজি শব্দের মধ্যেও এই 'মূল্য' অর্থটি বিদ্যমান। এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দ্বারা রোমান্সের পঞ্জির আংশিক মূল্যায়ন সম্ভবপর হইলেও পঞ্জি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ইহাদ্বারা হওয়া সম্ভবপর নহে। পঞ্জির কসির-কসির বা প্রিয় নাম হইল 'অজরন' ; ইহার অর্থ হইল 'কুদ' বা অশ্ব। ইহা একান্ত অসম্ভব নহে যে অশ্ব ছিল পঞ্জির প্রতীক-চিহ্ন। নাগরকৃতাগমের রাজকীয় সফরের বর্ণনায় আমরা দেখি যে প্রত্যেক দলের একটি স্বতন্ত্র প্রতীক বা লাঞ্ছন ছিল ; ইংলণ্ডেও মধ্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ম হেন্‌রির রাজত্বকাল পর্যন্ত দুর্ধর্ষ ব্যারণগণ এই প্রকার লাঞ্ছন তাঁহাদের পতাকায় ব্যবহার করিতেন। কালক্রমে হয়তো পঞ্জির অশ্ব-প্রতীক তাঁহার সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে জড়িত হইয়া থাকিতে পারে[৫৪]। যাহাই হউক, বিভিন্ন অনুশাসনলিপিতেও আমরা পঞ্জি বা অপঞ্জি উপাধিধারী লোকের সাক্ষাৎ পাইতেছি। নাগরকৃতাগমে আমরা দেখিতেছি যে পঞ্জি বা অপঞ্জি উপাধিধারী ব্যক্তিগণ ধর্মমহামাত্র পদে অধিষ্ঠিত আছেন ; ইহাদের উপাধি ও কার্যের সহিত রোমান্সের পঞ্জির চরিত্রগত সামঞ্জস্য নাই। সুতরাং পঞ্জি সমস্যার সমাধানের পথ আজিও দুর্গম রহিয়া গিয়াছে। ডঃ রাসের্সের দ্বৈত-সমাজ ব্যবস্থার কথা স্বীকার না করিয়াও ইহা সম্ভবতঃ চিন্তা করা সম্ভবপর যে পঞ্জি হইলেন অশ্বারোহী সূর্য[৫৫] যিনি সর্বদা তাঁহার প্রিয়তমা চন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া চলিয়াছেন। অবশ্য এই অনুমানও প্রমাণ করা সুকঠিন সন্দেহ নাই।

পঞ্জি কাহিনীগুলি বহু শতাব্দী ধরিয়া জাভা, বলি, সুমাত্রা, লম্বক, বোর্নিও, সিলিবিস, কাম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড (শ্যামদেশ) এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন স্থলে বিদ্যমান আছে এবং ইহা যুগ যুগ ধরিয়া দক্ষিণপূর্ব এসিয়া এবং দ্বীপময় ভারতে বিপুল আনন্দের খোরাক জোগাইয়াছে। সেই দিক দিয়া ইহার অবদান অনন্যসাধারণ।

পা দ টী কা

১. Gonda, *De Letterkunde van de Indische Archipel*, p. 19.

২. টনি ধৃত অনুবাদ, ১৮৮০, ১ম ভল্যুম, পৃঃ ৭০ হইতে, ঐ, পৃষ্ঠা ৩৮৫। রলষ্টনের *Russian Folk Tales*-এর ৭১ পৃষ্ঠায় অনুরূপ গল্প আছে বলিয়া টনি উল্লেখ করিয়াছেন।

৩. বনপর্ব, ১২২-১২৫। তুলনীয় দেবী ভাগবত, ৭।৪।

৪. টনি কৃত অনুবাদ, ঐ, পৃঃ ৩২।

৫. ঐ, পৃঃ ৩৭।

৬. কাশীরাম দাস, মহাভারত, সুবোধচন্দ্র মজুমদারের সংস্করণ, পৃঃ ১০১১।

৭. *Folk Literature of Bengal*, p. 21.

৮. টনি কৃত অনুবাদ, পৃঃ ৫০৬ হইতে।

৯. Juynboll, *Supplement* I, p. 273.

১০. *BKI*, 71, p. 575.

১১. বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়; কালিদাস, বিক্রমোর্বশী, তৃতীয় অঙ্ক। এই উপকথাটি ভারতীয় সাহিত্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এইগুলি চয়ন করিয়াছেন Geldner, তাঁহার *Vedische Studien* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে, পৃঃ ২৪৩-৯৫। অনুরূপ একটি আখ্যায়িকা বিবৃত হইয়াছে কথাসরিৎসাগরে (টনি-কৃত অনুবাদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৯-৫১)।

১২. টনি কৃত অনুবাদ, ঐ, পৃঃ ৩০৪।

১৩. উপরোল্লিখিত গ্রন্থ।

১৪. Juynboll, *Supplement* I, p. 70; ঐ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১১; Juynboll, *Suppl. Cat. Sund. Bal. Sas. Hss* (1912) pp. 130-31; Van der Tuuk *KBNWdb* III, p. 296; Cf. Vreede, *Cat. van Jav. Mad. Hss*, 1892, p. 417; *BKI*, 71, p. 576.

১৫. *Supplement* I, pp. 212-13.

১৬. তুলনীয় Gonda, *De Letterkunde van de Indische Archipel*, p. 17.

১৭. টনি ধৃত অনুবাদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৬-৭৭।

১৮. পঞ্চম খণ্ড, ৩২ অধ্যায়।

১৯. তুলনীয় Story of Prince Sobur। ইহা লাল বিহারী দে সম্পাদিত Folk Tales of Bengal নামক রূপকথায় বর্ণিত হইয়াছে। এই ধরণের কাহিনী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সঙ্কলনেও দেখিতে পাওয়া যায়।

২০. লাল বিহারী দে, *Folk Tales of Bengal*, pp. 209 ff.

২১. Blagden, *Cat. Mss. European lang. Library.* India Office, vol. I, pt. I (1916) p. 31.

২২. Vreede, *Cat. Jav. Mad. Hss* (1892) pp. 159-60.

২৩. ঐ, পৃঃ ১৫৬।

২৪. ঐ, পৃঃ ২৩৩।

২৫. ঐ, পৃঃ ১৯৬।

২৬. Juynboll, *Suppl. Cat. Sund. Bal. Sas. Hss* 1912, p. 54.

২৭. Juynboll, *Supplement* II, p. 34.

২৮. Vreede, *op. cit.*, pp. 26-31.

২৯. Juynboll, *Supplement* I, p. 35.

৩০. কালিদাস, মালবিকাগ্নিমিত্র, প্রথম অঙ্ক।

৩১. টনি কৃত অনুবাদ (১৮৮০), প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৫।

৩২. তুলনীয় Rassers, *De Pandji Roman*, pp. 36, 37, 44, 99, 109, 112 etc. ; Juynboll, *Supplement* II, p. 262 ; Vreede, *op. cit.*, pp. 161, 167, 170 etc.

৩৩. *JRAS*, N. S , 13, p. 52.

৩৪. Juynboll, *Supplement* I, pp. 208 ff.

৩৫. *Ibid*, pp. 205 ff.

৩৬. এই প্রকার গল্পের জন্য দ্রষ্টব্য : C. H. Bompas, *Folk-lore of the Santal Parganas* (1909) pp. 254-56 ; also *Journal and Proceedings of the Asiatic Soc. of Bengal*, n. s., XXI, pp. 380-82। অনুরূপভাবে আমরা দেখিতে পাই যে বঞ্জক চত্র বানরবেশ ধারণ করিয়া পসির লুহুরের রাজকন্যার সঙ্গে পরিচিত হইলেন এবং তাঁহার হাত ছাড়া অন্য কাহারো হাত হইতে খাদ্য গ্রহণ করিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। সেই রাজকন্যার নিকট বঞ্জক চত্র স্বীয় পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন। দ্রষ্টব্য : Vreede, *op. cit.*, p. 185.

৩৭. চৈনিক ইতিবৃত্তে লেখা আছে : "অদ্ভুত প্রাণীগুলি হইল শ্বেত হরিণ এবং শ্বেত বানর।" দ্রষ্টব্য Groeneveldt, *Notes on the Malay Archipelago and Malacca*, p. 49. দ্বীপময় ভারতে হনুমান শ্বেত বানর রূপে অভিনন্দন লাভ করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য Juynboll, *Suppl. Cat. Sund. Bal. Sas. Hss*, pp. 48-49.

৩৮. Juynboll, *Supplement* I, p. 195.

৩৯. ঐ, পৃঃ ১৯৭।

৪০. ঐ, পৃঃ ১৯৮।

৪১. তুলনীয় Rassers, *De Pandji Roman*, pp. 187 ff.

৪২. ঐ, পৃঃ ১৬৬-৬৭।

৪৩. ঐ, পৃঃ ১১৯।

৪৪. *BKI* 54 (1902) p. 546.

৪৫. Rassers, *op. cit.*, p. 108.

৪৬. সংস্কৃত মহাভারতে (১২।১৪) তিনি কৃষ্ণের মহিষী এবং শাম্বের মাতা।

৪৭. Rassers, *op. cit.*, pp. 130 ff.

৪৮. ঐ, পৃঃ ৩২৩।

৪৯. ঐ, পৃঃ ৩৪১, ৩৬৪, ৩৬৫ ইত্যাদি।

৫০. *Totemism and Exogamy*, vol. I (1910) p. 1.

৫১. *Op. cit.*, p. 325.

৫২. *Encyclo. Ned. Oost-Indie*, V. *Supplement*, p. 397.

৫৩. তুলনীয় Fraser, *Totemism and Exogamy*, vol. II (1910) p. 25. মেলানেসিয়া, সামোয়া, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থলের টোটেমিস্‌মের জন্য দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃঃ ৯৬-২১৭।

৫৪. তুলনীয় Pigeaud, *Java in the 14th Century* IV, p. 403.

৫৫. হিন্দু পুরাণানুযায়ী তিনি সপ্তাশ্ববাহিত।

বিংশ অধ্যায়

তন্ত্রী কামন্দক এবং পশুদের গল্প

(ক) তন্ত্রী কামন্দক

তন্ত্রী কামন্দক পূর্ববর্ণিত কাহিনীগুলি হইতে স্বতন্ত্র পর্যায়ের ; কারণ ইহার একটি নৈতিক পটভূমিকা আছে। প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত সংস্কৃত আখ্যায়িকা-পুস্তক পঞ্চতন্ত্র এবং হিতোপদেশের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক হার্টেলের হিসাবানুযায়ী[১] পঞ্চতন্ত্রের বিভিন্ন ভাষায় রচিত অন্ততঃ দুইশত সংস্করণ আছে এবং ইহার তিন-চতুর্থাংশের ভাষাই অভারতীয়। বাস্তবিক, ভাষা, সংস্কার এবং ধর্মের প্রতিবন্ধকতা ইহার জয়যাত্রার পথ অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। ইহার বহির্ভারত যাত্রা অন্ততঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরম্ভ হইয়াছিল ; সেই সময় ইহা বিখ্যাত সাসানীয় রাজা খুস্রু অনুসিরবানের (৫৩১-৫৭৯ খৃঃ অঃ) রাজত্বকালে পহলবীতে অনূদিত হয়। ভারতীয় পণ্ডিত বুজুর জমেহরের সহযোগিতায় ভিষকরত্ন বুরজুয়েই ইহার অনুবাদকার্য সমাধা করেন[২]। বুদ আনুমানিক ৫৭০ খৃষ্টাব্দে এই পহলবী সংস্করণের একটি প্রাচীন সিরীয় অনুবাদ সুসম্পন্ন করেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে খলিফা অল্-মন্সুরের আদেশানুযায়ী আবদুল্লা ইব্ন অল্-মোকাফা এই পহলবী সংস্করণের একটি আরবী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার নাম দেওয়া হয় কলিল এবং দিম্ন ; ইহার একটি মালয় সংস্করণ বিদ্যমান আছে। পরবর্তী শতাব্দীতে, সুলতান মহম্মদ ঘাজীর আদেশানুযায়ী ইহার নূতন আর একটি আরবী সংস্করণ রচিত হয়। সুদূর প্রাচ্যেও ইহার শ্যামদেশীয় এবং লাওসীয় সংস্করণ বিদ্যমান আছে ; সেখানে তন্ত্রীর নাম হইয়াছে তন্ত্রই, তন্তই, তন্তইয় (এবং কন্‌ত্রে)[৩]। দ্বীপময় ভারতে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীও অন্ততঃ বারটি বিভিন্ন সংস্করণে বিবৃত হইয়াছে ; এইগুলির মধ্যে তিনটি এক ধরণের প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় রচিত, কয়েকটি বলিদ্বীপীয় ভাষায়, দুইটি আধুনিক যবদ্বীপীয় ভাষায় এবং দুইটি মাদুরীয় ভাষায় সঙ্কলিত হইয়াছে[৪]। শেষোক্ত নয়টি সংস্করণ অত্যাধুনিক ; সুতরাং বর্তমান গ্রন্থের আলোচনায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অপ্রয়োজনীয়। আমরা এখানে তন্ত্রি-গোষ্ঠীর তিনটি সংস্করণ আলোচনা করিব ; উহাদের নাম তন্ত্রি-কামন্দক, তন্ত্রি কেদিরি (খ) এবং তন্ত্রি দেমুঙ্ (এ)।

দেমুঙ্-ছন্দে বিরচিত সংস্করণটি যবদ্বীপে খুব জনপ্রিয়। এই গ্রন্থের ৪৫৪১-সংখ্যক পুঁথি বলিদ্বীপীয় হস্তাক্ষরে লিখিত হইয়াছে এবং ইহাতে কয়েকটি বৌদ্ধ কাহিনীও বিবৃত

হইয়াছে[৫]। ইহা পাঁচটি সর্গে বিভক্ত এবং ইহার ৩৯৯টি চরণে ১৭টি গল্প বর্ণিত হইয়াছে। তন্ত্রি-কেদিরি (খ)-র মূল উৎস সম্ভবতঃ বিভিন্ন[৬] এবং ইহাতেও বলিদ্বীপীয় প্রভাব বিদ্যমান। ইহা অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয় এবং ইহা উপরোল্লিখিত অন্যান্য সংস্করণ হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহাতে এমন কয়েকটি গল্প আছে যাহা দেমুঙ্-সংস্করণে নাই। ডঃ ভান দের তুক[৭] এই দুই সংস্করণেরই প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন "শেষোক্ত গ্রন্থখানিতে (তন্ত্রি কেদিরি) পর্তুগীজ শব্দও (মিনু বা একপ্রকার মদ্য বাহ্যতঃ বিন্‌হো শব্দের বিকৃত রূপ বলিয়া মনে হয়) আছে। এই সংস্করণের মাত্র কয়েকটি গল্প হিতোপদেশে এবং পঞ্চতন্ত্রে পাওয়া যায়, যেমন হরিণ, ইঁদুর, কাক এবং পারাবত-রাজার কাহিনী। কিন্তু এখানে পারাবত-রাজার নাম হইয়াছে কগুগুণ, কাকের নাম হুগত, হরিণের নাম তুঙ্গপ, ইঁদুরের নাম হিরণ্যাক্ত, কচ্ছপের কোন বিশেষ নাম নাই। ব্যাধের নাম হইয়াছে হষ্টক্রম।" তন্ত্রি কোদরি (খ) এবং তন্ত্রি দেমুঙ্ (এ) সম্বন্ধে তিনি আরো বলিয়াছেন: "কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ পশুদিগের কাহিনীতে অকৃতজ্ঞ স্বর্ণকারের নাম (খ)-তে দেওয়া হইয়াছে বেহুক, (ক) এবং কামন্দকে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে স্বুবর্ণঙ্কর[৮]।" তন্ত্রি কেদিরি (খ)-তে চারিটি সর্গ আছে এবং উহাতে ৫১৫টি চরণ আছে; সুতরাং ইহা দেমুঙ্-সংস্করণ হইতে আকারে বৃহত্তর। বস্তুতঃ প্রথমোক্ত গ্রন্থে শেষোক্ত গ্রন্থ অপেক্ষা ১১টি আখ্যায়িকা বেশী আছে[৯]। তৃতীয় সংস্করণটি গদ্যে রচিত এবং ইহার নাম তন্ত্রি কামন্দক; ইহার ভাষা অন্যান্য দুইটি সংস্করণ অপেক্ষা প্রাচীনতর। ইহার কতকগুলি গল্পের শেষে অথবা মাঝে মাঝে সংস্কৃত চরণ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; উহা পঞ্চতন্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই সংস্করণটি বিশেষ-ভাবে আলোচনা করিব; কারণ ইহা একদিকে যেমন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সুসংরক্ষিত, তেমনি ইহাতে হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে এবং উপরোক্ত সংস্কৃত গ্রন্থগুলির মতই ইহাও গদ্যে রচিত। এই গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সংস্কৃত শ্লোকের সংখ্যা হইবে প্রায় ৮৩টি।

ডঃ হুইকাস পূর্বেই বলিয়াছেন যে তন্ত্রি কামন্দকের নৈতিক শ্লোকগুলি পালি ভাষায় রচিত হয় নাই। ইহাতে কিছু সংস্কৃত শ্লোকের চরণ আছে; ডঃ হুইকাস ইহার কতকগুলি মূল উৎসের সন্ধান পাইয়াছেন; বাকীগুলির মধ্যে কয়েকটি ডঃ ভেঙ্কটসুব্বিয়া খুঁজিয়া পাইয়াছেন[১০]। কিন্তু যবদ্বীপীয় সংস্করণের সংস্কৃত চরণগুলি অনেকটা বিকৃতরূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। এই সংস্কৃত শ্লোকগুলির মধ্যে কোন কোনটি বা অনুরূপ শ্লোক শ্লোকান্তর নামক প্রাচীন যবদ্বীপীয় গ্রন্থেও পরিদৃষ্ট হয়[১১]। গ্রন্থে তন্ত্রবাক্য, তন্ত্রকথা এবং তন্ত্রচরিত প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে। গল্পের নায়িকা তন্ত্রি; তাঁহার নাম তন্ত্রি, "কারণ তিনি তন্ত্র জানিতেন।" ডঃ হুইকাস[১২] মন্তব্য করিয়াছেন যে নামটিকে সংস্কৃতে রূপান্তরিত করিলে উহা তন্ত্রিনী হইবে। এই নামটি কোথা হইতে কিরূপে পরিগৃহীত হইল তাহা বর্তমানে বলা সম্ভবপর নহে[১৩]। কামন্দকের নামও একটি সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। অনুমান করা হইয়াছে যে এই নামটি সম্ভবতঃ পরে আমদানী করা হইয়াছে, কারণ গ্রন্থের ইতিতে লেখা হইয়াছে "ইতি চণ্ডপিঙ্গল সমাপ্ত,

তন্ত্রি-চরিত, তন্ত্রবাক্য" এবং এখানে কামন্দকের বিন্দুমাত্র নামোল্লেখও নাই। কামন্দক প্রাচীন ভারতে রাজনীতি সম্বন্ধে গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নাম যবদ্বীপ এবং ভারতবর্ষ উভয় স্থলেই সুপরিচিত ছিল। ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ ব্রহ্মদেশের একটি অনুশাসনে ২৩০ খানি গ্রন্থের তালিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে; উহার ২০২নং গ্রন্থখানি কামন্দকী। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থখানি এবং কামন্দকী নীতিসার অভিন্ন। ডঃ বোডে লিখিয়াছেন যে সংস্কৃত হিতোপদেশের জ্ঞানগর্ভ কাহিনীগুলি বৌদ্ধগণের নিকটও জনপ্রিয় ছিল। কামন্দক নামের বহুল প্রচলন এবং অথবা নীতিশাস্ত্রের সহিত তাঁহার সংশ্রবের জন্য সম্ভবতঃ এই নামটি তন্ত্রির সহিত যুক্ত হইয়া থাকিবে।

কোন কোন তন্ত্রি সংস্করণে একজন বসুভাগের নাম পাওয়া যায়। তিনি অনেক গল্পের শেষে নীতিবাক্যের প্রবক্তা হইয়াছেন। একটি কানাড়া সংস্করণেও আমরা দুর্গসিংহ বসুভাগের সাক্ষাৎ পাইতেছি। ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে যবদ্বীপীয় সংস্করণটির সহিত পঞ্চতন্ত্রের দক্ষিণ ভারতীয় কোন সংস্করণের সংযোগ ছিল। লাওসীয় পঞ্চতন্ত্রে পালি ভাষার শ্লোক থাকায় ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে তন্ত্রি কামন্দকের উৎস-ভূমি লাওস নহে; সেখানে পালিভাষা ও বৌদ্ধধর্ম তখন বিদ্যমান ছিল। বসুভাগের গ্রন্থ না পাওয়া পর্যন্ত এই সমস্যায় যে আর কোন নূতন আলোকপাত হইবে তাহা মনে হয় না। তবে তন্ত্রি কামন্দকের মুখবন্ধে কিছু নূতন তথ্য বিবৃত আছে যাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। উহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে প্রাচীন ভারতবর্ষে পঞ্চতন্ত্রের আরও একটি সংস্করণ বিদ্যমান ছিল যাহা বিষ্ণুশর্মার সংস্করণ হইতে অনেকটা বিভিন্ন। তন্ত্রি কামন্দকের এই মুখবন্ধে সমুদ্রগুপ্তের নামোল্লেখ থাকায় মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে তন্ত্রি কামন্দক যে গ্রন্থখানির উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছিল তাহা ৪০০ খৃষ্টাব্দের পরে রচিত হইয়াছিল। তন্ত্রি কামন্দক সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে রচিত হইয়াছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইহা এত সুপরিচিত হইয়াছিল যে নাগরকৃতাগম নামক ঐতিহাসিক কাব্যের (রচনাকাল ১৩৬৫ খৃঃ) কোথাও কোথাও পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশ-তন্ত্রি আখ্যায়িকার কোন কোনটির প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের সূচনা পাঠ করিলে সহস্র ও এক রজনীর কাহিনী মনে পড়িবে। এই দুই গ্রন্থের রচনার কাঠামোও প্রায় একই প্রকার। কারণ এই দুই গ্রন্থেই একটি গল্পের গর্ভে আর একটি নূতন গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে এবং উভয় গ্রন্থেই এমন একটি রাজার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে যাহার প্রতি নিশাতেই একটি করিয়া কুমারী কন্যাকে লালসাতৃপ্তির জন্য লাগিত। সহরাজাদ এবং দুন্যাজাদের মত তন্ত্রিও গল্পের ঠাসবুনুনিতে রাজাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন এবং তাঁহার মৃত্যুদিনও তাই বারম্বার বিলম্বিত হইত। তন্ত্রি কামন্দকের কাহিনীতে রাজা শাহরিয়রের স্থান পরিগ্রহণ করিয়াছেন ঐশ্বর্যপাল; তাঁহার অপর নাম প্রবু সি দর পত্র এবং তিনি সমুদ্রগুপ্তের বংশধর বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। রাজার ঐশ্বর্যপাল নামটি এবং তন্ত্রির নামটি উভয়ই গভীর অর্থব্যঞ্জক; তন্ত্রির অর্থ গল্পের তন্তু বলা যাইতে পারে। এই রাজার রাজধানী

ছিল শ্রীলরতগুপ্তের[১৩ক] অন্তর্গত জম্বুদ্বীপস্থ পাটলিপুত্র নগরে। এই অঞ্চল ছিল হিমালয়ের দক্ষিণে এবং ইহার মধ্য দিয়া গঙ্গা ও যমুনা প্রবহমানা ছিল। এই দুই নদীর অন্তবর্তী স্থলে ছিল পাটলিপুত্র রাজ্য[১৪]। এই রাজার মন্ত্রীর নাম ছিল নীতি বন্ধেশ্বর্য এবং তাঁহার প্রধান কর্তব্য ছিল রাজার জন্য কুমারী নারী সংগ্রহ করা। এই মন্ত্রীর কন্যাই ছিলেন তন্ত্রি। তন্ত্রি কামন্দকের এই অংশের সহিত সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের কোন সামঞ্জস্য নাই, কারণ পঞ্চতন্ত্রের সূচনায় আমরা যে মহাত্মার দর্শন লাভ করি তিনি হইলেন বিষ্ণুশর্মা এবং তাঁহার মূর্খ ছাত্রগণ। ইহা কি সম্ভবপর যে পঞ্চতন্ত্রের আদিম সংস্করণে কুমারী নারী সংক্রান্ত এইরূপ একটি মুখবন্ধ ছিল যাহা বিষ্ণুশর্মা বা বসুভাগ সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালের পরে কোন সময়ে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? তাঁহাদের শিক্ষাদানই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; সুতরাং ঐশ্বর্যপালের কাহিনী বালকদের উপযোগী না হওয়ায় উহা সম্ভবতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে অবশ্য কণয়-মঞ্জরী জৈন উপকথা[১৫] প্রচলিত আছে। উহাকে তন্ত্রির জৈন মুখবন্ধ বলিলেও হয়। সহস্র এবং এক রজনীর সূচনাটি সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ হইতে এই গ্রন্থে পরিগৃহীত হইয়াছিল[১৫ক] এবং প্রথমোক্ত গ্রন্থটির আরবী সংস্করণ ইজিপ্টে এয়োদশ শতাব্দীতেই বিদ্যমান ছিল[১৬]। লেন-মহোদয়ের মতানুসারে[১৭] "কয়েকটি রাত্রির আখ্যায়িকা ৮১০ বৎসর পুর্বেই বিদ্যমান ছিল।"

তন্ত্রি কামন্দকে ছয়টি সর্গ আছে। সূচনার অংশটুকুর নাম বিবাহ সর্গ[১৮]। দ্বিতীয় সর্গের নাম নন্দকপ্রকরণ; ইহা বৃষ নন্দকের নামানুযায়ী হইয়াছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ সর্গের সীমারেখা অতি ক্ষীণ। চতুর্থ সর্গের নাম সম্বন্ধশৃগালসংসর্গ, গন্ডদ্রুমচরিত, অতৎ-উচরণ। পঞ্চম সর্গের নাম নন্দকপ্রকরণ, সম্বন্ধ-শেরগলাসন। ষষ্ঠ বা শেষ সর্গের অন্তে লেখা আছে "ইতি সম্বদ্ধচরিত, হংশ-কূর্ম-সংসর্গ, উদাকরণ, সেষ্টি সংসর্গ।" এই কাহিনীর জের টানা হইয়াছে ৪৫৩৪ সংখ্যক পুঁথিতে; ইহার অন্তে লেখা আছে ইতি চণ্ডপিঙ্গল সমাপ্ত, তন্ত্রি চরিত, তন্ত্রবাক্য।"

তন্ত্রি প্রথম যে গল্পটি বলিয়াছিলেন তাহা নন্দক নামক বৃষের কাহিনী। একদা নন্দকের পৃষ্ঠে ব্রাহ্মণ ধর্মস্বামী এরূপ গুরুভার চাপাইয়া দিয়াছিলেন যে বেচারী নন্দক মালবদেশের উজ্জয়িনীতে পলাইয়া গেল। এই কাহিনীটি বলিতে বলিতে রাত্রি এত গভীর হইয়া গেল যে উহা তখন অসমাপ্ত রাখিতে হইল[১৯]। পরদিন প্রভাত বেলায় রাজা নীতি বন্দেশ্বর্যকে বলিলেন যে তিনি তন্ত্রিচরিতের সম্পূর্ণ ৩৯০টি গল্পই শুনিতে উদ্‌গ্রীব। পরদিন রাত্রে তন্ত্রি আবার পুরাতন গল্পের সূত্র ধরিয়া চলিলেন; তিনি চণ্ডপিঙ্গল এবং বৃষ নন্দকের বন্ধুত্বের কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। চণ্ডপিঙ্গল বৃষ নন্দকের বজ্রসদৃশ নির্ঘোষ শুনিয়া সন্ত্রস্ত হইয়াছিল; তখন তাহার পতিহ্[২০] সম্বদ্ধ নামক একটি শৃগাল শিবাকুলের এক কাহিনী পরিবেশন করিল। সে বলিল যে শৃগালেরা একদা ঢাকের বিপুল ধ্বনি শ্রবণ করিয়া উহা কোথা হইতে উত্থিত হয় তাহা জানিবার জন্য ঢাকটি বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল, কিন্তু স্বভাবতঃই উহার অভ্যন্তরে কোন কিছুই খুঁজিয়া পাইল না[২১]। সুতরাং সিংহও তাহার অকারণ শঙ্কার জন্য লজ্জিত হইয়া বৃষের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করিল[২২]। তন্ত্রি অতঃপর বর্ণনা করিলেন কিরূপে

চক্রান্তকারী শৃগালটি উভয়ের মধ্যে শত্রুতার পটভূমিকা রচনা করিল এবং ভীষণ যুদ্ধের পর উভয়ে উভয়কে নিহত করিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে তন্ত্রি কামন্দক, পঞ্চতন্ত্র এবং কলিল ও দিম্নের গল্পের কাঠামোটি একই প্রকারের। ইহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পঞ্চতন্ত্রে বৃষ এবং সিংহের নাম যথাক্রমে সঞ্জীবক এবং পিঙ্গলক। বাহ্যতঃ মনে হয় যে নন্দকের নামটি অন্য কোন সূত্র হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে, তবে সিংহের নামটি ধ্বনিব্যঞ্জনার দিক দিয়া বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই। প্রথমোক্ত নামটি হিতোপদেশে আছে[২৩]। সুতরাং এই স্থলে পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের উপাদানের সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। শৃগাল দুইটির নাম করটক এবং দমনক; উহা মালয় এবং আরবী সংস্করণে কলিল এবং দিম্ন নামে রূপান্তরিত হইয়াছে। তন্ত্রি কামন্দকে তাহাদের স্থান পরিগ্রহণ করিয়াছে সম্বদ্ধ নামক শৃগাল। পঞ্চতন্ত্রের গল্পের কাঠামোটি (সুতরাং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্করণেরও) সম্ভবতঃ চণ্ডী জাগোর মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ হইয়াছে। ডঃ ব্রাণ্ডেসের মতানুযায়ী[২৪] মন্দিরের প্রথম তলে (terrace) একটি সিংহের আলেখ্য পরিদৃশ্যমান; তাহার বিপরীত পার্শ্বে আছে দুইটি শৃগাল। এই দৃশ্যের দক্ষিণ পার্শ্বে আমরা একটি সিংহ ও বৃষের প্রচণ্ড সংগ্রাম দেখিতে পাইতেছি; উহাদের প্রত্যেকের পশ্চাতে একটি করিয়া শৃগাল উপবিষ্ট। এই প্যানেলের অবশিষ্ট অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে পরবর্তী অংশে শৃগালদ্বয় বৃষ ও সিংহের মাংসে উদরপূর্তি করিতেছে। তন্ত্রি কামন্দকে দুইটি শৃগালের স্থলে মাত্র একটি শৃগালকে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ডঃ ব্র্যাণ্ডেসের মত যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে তন্ত্রি কামন্দক এবং চণ্ডী জাগোর শিল্পীর গল্পের উৎস ছিল বিভিন্ন; তন্ত্রি কামন্দকের কাহিনী আলোচনা করিতে করিতে এই বিষয়টি অধিকতর পরিস্ফুট হইবে।

ইহার পর যে কাহিনীটি বিবৃত হইয়াছে তাহা হইল কৌশাম্বীনগরের রাজা গজক্রম এবং দুইটি ময়ূরের আখ্যায়িকা। এই গল্পটি উপরোক্ত গল্পেরই আঙ্গিক। এই রূপকথার শিল্পী হইল শৃগাল সম্বদ্ধ[২৫]। এই কাহিনীটিতে বলা হইয়াছে যে রাজা কিরূপ অবস্থায় চারিজন বিশ্বস্ত মন্ত্রীকে হত্যা করিবার জন্য রাণীকে অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা অতঃপর একজন শবর ও একজন মুনির পালিত ময়ূরের উপদেশ শুনিয়া যথাকর্তব্য নির্ধারণ করিলেন। এই কাহিনীটি তন্ত্রির দেমুঙ্ সংস্করণেও বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তী কাহিনীতে একটি কচ্ছপ ও দুইটি রাজহংসের আখ্যায়িকা বিবৃত হইয়াছে[২৬]। ইহারও কথাশিল্পী হইল শৃগাল সম্বদ্ধ। কথিত হইয়াছে যে কচ্ছপ ও রাজহংসদ্বয় কুমুদ্বতী হ্রদে বাস করিত। রাজহংসটির নাম ছিল চক্রাঙ্গ ও তাহার স্ত্রীর নাম ছিল চক্রাঙ্গী। দুর্বুদ্ধি ছিল কচ্ছপটির নাম এবং তাহার পত্নীর নাম ছিল কচ্ছপা। হিতোপদেশ এবং পঞ্চতন্ত্রে কচ্ছপটির নাম দেওয়া হইয়াছে কম্বুগ্রীব; তাহার স্ত্রীর নাম সংস্কৃত গ্রন্থে নাই। হ্রদটির নাম হিতোপদেশে দেওয়া হইয়াছে ফুল্লোৎপল, ইহা যবদ্বীপীয় নামের অনুরূপ অর্থব্যঞ্জক। তন্ত্রি কামন্দকের চক্রাঙ্গ এবং চক্রাঙ্গীর নাম সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে দেওয়া হইয়াছে সঙ্কট এবং বিকট। যাহাই হউক, গ্রীষ্মকাল উপনীত হইলে রাজহংসদম্পতী এবং কচ্ছপ দম্পতী মানসারে উড়িয়া যাইতে মনস্থ করিল; সংস্কৃত গ্রন্থে গন্তব্য হ্রদের কোন

নাম দেওয়া হয় নাই। যাহাই হউক কচ্ছপদম্পতী রাজহংসদম্পতীর চঞ্চুতে ধৃত একটি যষ্টিখণ্ড অবলম্বন করিয়া শূন্যে দোদুল্যমান হইয়া রহিল ; রাজহংসম্পতীও তখন তাহাদিগকে লইয়া শূন্যে উড়িয়া চলিল। এইরূপে যখন তাহারা বিলঙ্গল মাঠের উপরে উপস্থিত হইল তখন তাহারা নোহন এবং বেবিয়ন নামক দুইটি শৃগাল-শৃগালীকে নীচে দেখিতে পাইল। শৃগাল-দম্পতীর মন্তব্য শুনিয়া জবাব দিতে গিয়াই কচ্ছপদম্পতী যষ্টিচ্যুত হইয়া মৃত্যুবরণ করিল। কচ্ছপদম্পতীর মৃত্যুর কাহিনী সব গ্রন্থে একই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু কচ্ছপগুলি যাহারা ধরিয়াছিল তাহাদের নাম সংস্কৃত গ্রন্থে বিভিন্ন। পঞ্চতন্ত্রে তাহাদিগকে বলা হইয়াছে পৌরাঃ বা নগরবাসী, কিন্তু হিতোপদেশে তাহারা পশুপালক।

এই গল্পটি যবদ্বীপে খুব জনপ্রিয় ছিল, কারণ ইহা বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে রূপায়িত হইয়াছে। চণ্ডী জাগোর রিলিফ চিত্রে[২৭] আমরা দেখিতে পাই যে একটি রাজহংস দুইটি কচ্ছপ পরিবহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহাদের বিপরীত দিকে চিত্রে দুইটি কুকুর বা শৃগালকে—সম্ভবতঃ শৃগালকে—দেখা যাইতেছে। তাহারা ভূপতিত কচ্ছপগুলিকে নিধন কার্যে ব্যাপৃত আছে। তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে চিত্রের কাহিনীটির সহিত তন্ত্রি কামন্দকের কাহিনীর পার্থক্য আছে, কারণ এই দুই স্থলেই রাজহংসের সংখ্যা বিভিন্ন। বস্তুতঃ ইহার সংস্কৃত কাহিনীটির পার্থক্যও একেবারে উপেক্ষণীয় নহে, কারণ চণ্ডী জাগোতে যাহারা কচ্ছপগুলিকে ধরিয়াছিল তাহারা পৌরজনও নহে, পশুপালকও নহে। এই কাহিনীটির সংক্ষিপ্তসার পনতরনের মন্দিরগাত্রে রূপায়িত হইয়াছে। বরবুদুরের সমসাময়িক কালে নির্মিত চণ্ডী মেণ্ডুতে এই কচ্ছপ ও হংসের কাহিনীটি উৎকীর্ণ হইয়াছে। একই রিলিফে আমরা দেখিতে পাইতেছি শূন্যে পরিবাহিত কচ্ছপ এবং তাহারই নিম্নদিকে দেখিতেছি উহাকে হত্যা করার দৃশ্য[২৮]। এই জনপ্রিয় কাহিনীটি দেমুঙ্-সংস্করণেও বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্বোল্লিখিত গল্পটি বলা শেষ হইলে সম্বন্ধ তখন তুম এবং মক্ষিকার কাহিনীটি বলিতে আরম্ভ করিল[২৯]। তুম বা উকুনটির নাম ছিল অসদ ; সে রাজার রক্ত পান করিয়া জীবন ধারণ করিত। এদিকে প্রাচীরের ফাটলে আবার বাস করিত একটি অনাহার পীড়িত মক্ষিকা। মক্ষিকাটির নাম ছিল চণ্ডিল। পঞ্চতন্ত্রে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে অগ্নিমুখ, কথাসরিতসাগরে তাহার নাম হইল টিট্টিভ। কালক্রমে উকুন এবং মক্ষিকার মধ্যে পরিচয় স্থাপিত হইল এবং উকুন মক্ষিকাকে সাবধানে রাজার রক্তপান করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইল। উকুন মক্ষিকাকে সতর্ক করিয়া দিল যে সে যেন বকের মত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় না দেয়, কারণ সামান্য একটি কাঁকড়াই তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছিল। মক্ষিকা উকুনের কথা না শুনিয়া জাগ্রত রাজার রক্তশোষণ করিতে উদ্যত হইলে রাজা তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন। এই কাহিনীটিও জনপ্রিয় ছিল, কারণ ইহা দেমুঙ্ এবং কেদিরি সংস্করণেও বিদ্যমান।

এই গল্পের মধ্যে আরো একটি গল্প নিহিত আছে। মক্ষিকা উকুনকে বক এবং কাঁকড়ার কাহিনীটি[৩০] বলিতে বলিলে উকুন বলিল যে মালিনী হ্রদের তটে অনেকগুলি ফলবান বৃক্ষ ছিল। হিতোপদেশে এই হ্রদটির নাম হইল পদ্মগর্ভ। সে যাহাই হউক, এই হ্রদে ছিল অনেক

মৎস্য। বক ছিল মিষ্টভাষী; সুতরাং মৎস্যেরা সহজেই বকের মিষ্টি কথায় প্রলুব্ধ হইল। সংস্কৃত কাহিনীটিতেও বকের এই ভূমিকা দেওয়া আছে। বকটি মৎস্যকুলের নিকট ভান করিত যে সে তাহাদিগকে অন্দবহন হ্রদে লইয়া যাইবে। মাছগুলিও ইহাতে খুব খুশী। এইরূপে সে মাছগুলিকে লইয়া গিয়া একখানি প্রস্তরখণ্ডের উপর তাহাদিগকে আছড়াইয়া মারিত এবং পরিশেষে নিজের উদর পূর্ণ করিত। অবশেষে একটি কাঁকড়া বকের এই চাতুরী ধরিয়া ফেলিল। সে বককে বলিল যে তাহাকে পুনরায় মালিনী হ্রদে লইয়া যাওয়া হউক। এই হ্রদে পৌঁছিয়াই কাঁকড়াটি বকের গলা এমনভাবে কামড়াইয়া ধরিল যে উহাতে তাহার সরু কণ্ঠটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। পঞ্চতন্ত্র এবং হিতোপদেশে দ্বিতীয় হ্রদটির নাম দেওয়া হয় নাই। বক এবং কাঁকড়াটির প্রত্যাবর্তনের কাহিনীও হিতোপদেশে বর্ণিত নাই, কিন্তু ইহা পঞ্চতন্ত্রে আছে। এই সুন্দর কাহিনীটি দেমুঙ্ সংস্করণেও বিবৃত আছে[৩১], কিন্তু তন্ত্রি কেদিরি (বি)-তে এই স্থলে জলচর পক্ষী ও কোকিলের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে[৩২]।

এইবার নন্দক কথক হিসাবে গল্প বলিতে আরম্ভ করিল। সে রাজা সেবস্তরের কাহিনী বলিল[৩৩]। সেবস্তর একদা শিকার করিতে গিয়াছিলেন; তিনি ক্ষুৎপীড়িত হইয়া সেবঙ্গর নামক এক ব্যক্তিকে নিকটে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ফলমূল এবং পানীয় জল আনিতে আদেশ করিলেন। সেবঙ্গর সমুদ্রতীরে গেল; সেখানে সে দেখিতে পাইল যে সমুদ্রবক্ষে একটি বানর নৃত্য করিতেছে। উহা দেখিয়া ভীতমনে সে রাজার নিকট ছুটিয়া গেল এবং যাহা দেখিয়াছিল তাহা রাজার নিকট নিবেদন করিল। রাজা ভৃত্যের সহিত সমুদ্রতীরে আসিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কারণ বানরটি ছিল একটি বিদ্যাধর। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃত্যকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিলেন। এই আখ্যায়িকাটি কেদিরি সংস্করণেও বিবৃত হইয়াছে[৩৪]। এই ধরণের কাহিনী বাঙলাদেশের রূপকথায় এবং পাঁচালীতে বর্ণিত আছে।

ইহার পর পরিবেশন করা হইয়াছে সুবুদ্ধি কন্যা বানরীর কাহিনী। কথিত হইয়াছে যে একদা ব্যাধ পাপক ব্যাঘ্র কর্তৃক তাড়িত হইলে বানরী তাহাকে চরম মুহূর্তে রক্ষা করে। পাপক উঠিল বৃক্ষশাখে, আর ব্যাঘ্রটি বৃক্ষতলে বসিয়া রহিল। ব্যাঘ্র বানরীকে বলিল যে পাপক অবিশ্বস্ত স্বর্ণকারের মত বিশ্বাসঘাতক হইতে পারে। বানরী এই কাহিনী শ্রবণে ইচ্ছুক হইলে ব্যাঘ্র সেই কাহিনীটি বর্ণনা করিল। কেদিরি সংস্করণে[৩৫] এই গল্পটির স্থলে আমরা পাইতেছি সিংহ ও উষ্ট্রের কাহিনী। ব্যাঘ্র যে অবিশ্বস্ত স্বর্ণকারের কথা বলিল[৩৬] তাহা মালয় হিকায়ৎ কলিল এবং দিম্ন নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই কাহিনী এক্ষণে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল সাজ্ঞাধর্ম। একদা গ্রীষ্মকালে তিনি তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইলেন। একদিন তৃষ্ণার্ত হইয়া তিনি একটি কূপের নিকট গমন করিলেন; তিনি দেখিতে পাইলেন কূপটি শুষ্ক; উহাতে একটি বানর, ব্যাঘ্র, বিদ্যুৎ-নামধেয় একটি সর্প এবং একজন স্বর্ণকার নিপতিত হইয়া রহিয়াছে। স্বর্ণকার অপর সকলকে উদ্ধার করিতে বারণ করিলেও ব্রাহ্মণ সকলকেই কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন। ব্যাঘ্র একজন রাজপুত্রকে হত্যা

করিয়া যে স্বর্ণালঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা ব্রাহ্মণকে দান করিয়া তাহার অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। বানরটিও অনুরূপ ভাবে কিছু খাদ্যদ্রব্য ও ফলমূল ব্রাহ্মণকে উপহার দিল। ব্রাহ্মণের স্বর্ণালঙ্কারের কোন প্রয়োজন ছিল না; সুতরাং তিনি উহা স্বর্ণকারকে দিবার মনস্থ করিয়া তাঁহার আবাসভূমি মধুর-ক্লিঙ্গে গমন করিলেন।

স্বর্ণকারটির নাম ছিল সুবর্ণঙ্কর। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার দান করিলেন, কিন্তু নিহত রাজকুমারের অলঙ্কার দেখিয়া রাজা বুঝিলেন অন্যরূপ। সুবর্ণঙ্কর নিজে বাঁচিবার উৎকট আকাঙ্ক্ষায় রাজাকে অন্যপ্রকার বুঝাইলেন। রাজা তখন ব্রাহ্মণকে ভূগর্ভস্থ এক কারাগারে বন্দী করিলেন। তখন সর্পের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ উপস্থিত হইল; সে রাজকুমার বীর-সেনের পদদংশন করিয়া বসিল। তখন ব্রাহ্মণ কারার বাহিরে আসিয়া সর্পের সহায়তায় রাজকুমারকে বিপন্মুক্ত করিল। ব্রাহ্মণও রাজার পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী অর্ধেক রাজত্ব লাভ করিলেন। তখন শাস্তি পাইল স্বর্ণকার তাহার মিথ্যাচরণের জন্য। এই আখ্যায়িকাটি কেদিরি[৩৭] এবং দেমুঙ্ সংস্করণে[৩৮] স্থানলাভ করিয়াছে। অকৃতজ্ঞ মানুষ এবং কৃতজ্ঞ পশুর এইরূপ কাহিনী পৃথিবীর সাহিত্যের অমূল্য রত্ন।

উপরোক্ত আখ্যায়িকার অন্তর্ভুক্ত আরো একটি গল্প আছে। উহা স্বর্ণকারের স্ত্রী স্বর্ণকারকে সতর্ক করিবার জন্য বলিয়াছিল। স্বর্ণকারের স্ত্রী বলিল যে একদা মুর্দস বা অস্তি নামে একটি বানর ছিল[৩৯]। বানরটি বিদ্যাধরী অঙ্গরপ্রাণার মত সুন্দর হইবার জন্য মহাতপস্যা আরম্ভ করিয়াছিল। তখন একজন দেবতা তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একটি বিশেষ সরোবরে সাতবার অবগাহন স্নান করিতে বলিলেন। বানরটি উমা অপেক্ষাও সুন্দর হইবার উদ্দেশ্যে সপ্তবারের অধিকবার ডুব দিয়া আবার বানর মূর্তি পরিগ্রহণ করিল। এই প্রকারের কাহিনী বাঙলাদেশের রূপকথায় এবং অন্যত্রও বিদ্যমান। আমরা সংস্কৃত মহাভারতে পড়িতেছি[৪০] যে বৃদ্ধ ঋষি চ্যবন এক হ্রদে স্নান করিয়া যৌবনের অপূর্ব সৌন্দর্য লাভ করিলেন। দশকুমার-চরিতেও আমরা পড়ি যে মন্ত্রগুপ্ত একজন নির্বোধ রাজাকে সমুদ্রে স্নান করিয়া অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী হইবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। বাঙলাদেশের সুখু এবং দুখুর রূপকথায় আছে যে দুখু কয়েকবার স্নান করিয়া অনুপম সুন্দরী হইল, কিন্তু সুখু দুখুকেও সৌন্দর্যে অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকবার বেশী ডুব-স্নান করিয়া সর্বাপেক্ষা কুৎসিৎ নারীতে পরিণত হইল[৪১]।

এইবার আমরা পুনরায় বানরী, ব্যাধ, পাপক এবং ব্যাঘ্রের কাহিনীতে প্রত্যাবর্তন করিতে পারি। বানরী বলিল যে ব্যাঘ্রেরা অন্যান্য জীব অপেক্ষা অধিকতর অকৃতজ্ঞ এবং উহার দৃষ্টান্তস্বরূপ সে একজন ব্রাহ্মণের কাহিনী অবতারণা করিল[৪২]। ব্রাহ্মণটি বৃহস্পতির নিকট বেদপাঠ সমাপ্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। যাত্রাপথে তিনি একটি সর্পদষ্ট ব্যাঘ্রকে দেখিতে পাইলেন। দয়াপরবশ হইয়া ব্রাহ্মণ মন্ত্র সাহায্যে তাহাকে বিষের প্রভাব হইতে মুক্ত করিলেন, কিন্তু ব্যাঘ্রটি বিপন্মুক্ত হইয়া প্রথমেই ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিল। বানরী বলিল যে এইদিক দিয়া বিচার করিলে কর্কট সম্প্রদায়ও ব্যাঘ্র অপেক্ষা মহত্তর। ইহার

দৃষ্টান্ত পরিবেশন করিতে অনুরোধ করা হইলে বানরী আর একটি গল্প ফাঁদিয়া বসিল[৪৩]। সে বলিল যে এক সময়ে পাতাল নামক স্থানে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; তাঁহার নাম ছিল দ্বিজেশ্বর। তিনি একদা পর্বতশৃঙ্গে একটি কাঁকড়া দেখিতে পাইলেন; কাঁকড়াটির নাম ছিল অষ্টপাদ। ব্রাহ্মণ তাহাকে জলে ছাড়িয়া দিবার জন্য লইয়া গেলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণ নিদ্রামগ্ন হইলে একটি সর্প ও একটি কাক ব্রাহ্মণকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। সর্প এবং কাক উভয়ে বন্ধু ছিল। কাঁকড়াটি তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া বলিল যে তাহারা যদি কাঁকড়ার নিকটে আসে তাহা হইলে কাঁকড়া তাহাদের গলা দীর্ঘতর করিয়া দিতে পারে; কাঁকড়া বলিল যে ইহাতে তাহাদের ব্রাহ্মণকে হত্যা করিতে খুব সুবিধা হইবে। কাক এবং সর্প ইহাতে স্বীকৃত হইয়া কাঁকড়ার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কাঁকড় ত্বরিৎবেগে উভয়কে নিহত করিয়া ব্রাহ্মণকে বিপন্মুক্ত করিল। এই কাহিনীটি তন্ত্রি কামন্দক, দেমুঙ্ এবং কেদিরি-সংস্করণে বিদ্যমান।

ইহার প্রত্যুত্তর হিসাবে ব্যাঘ্র বিবৃত করিল বানর ও বাবুই পক্ষীর কাহিনী[৪৪]। বানর থাকিত একটি বৃক্ষের উপরে এবং বাবুই পাখী থাকিত তাহাদের সুন্দর নীড়ে। বানরেরা বাসা নির্মাণ করিতে অপারগ বলিয়া ঠাট্টা করিলে বানরগুলি ক্রুদ্ধ হইয়া বাবুই পক্ষীদের সমস্ত নীড় ধ্বংস করিয়া ফেলিল। এই কাহিনীটি উপরোক্ত কয়েকটি তন্ত্রি-সংস্করণেই দেখিতে পাওয়া যায়; এতদ্ব্যতীত ইহা সংস্কৃত হিতোপদেশেও আছে[৪৫]। ব্যাঘ্রের গল্পের জের এইখানেই শেষ হইল না। সে পুনরায় বানরদের মূর্খতার আরো দৃষ্টান্ত পরিবেশন করিতে লাগিল[৪৬]। সে বলিল যে একদা একজন রাজকুমার এবং একজন রাজকন্যা তাঁহাদের প্রমোদ উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। শ্রান্ত হইয়া পড়িলে তাঁহারা বানরকে তাঁহাদের উপর লক্ষ্য রাখিতে বলিয়া নিজেরা নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে দুইটি সবুজ মক্ষিকা-দম্পতী রাজকন্যা ও রাজপুত্রের কণ্ঠে বারংবার বসিতে লাগিল। রাজকুমারের আদেশের কথা স্মরণ করিয়া বানর মক্ষীদ্বয়কে মারিতে গিয়া রাজপুত্র ও রাজকন্যার কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া ফেলিল। পঞ্চতন্ত্রেও এই প্রকারের একটি কাহিনী বিবৃত হইয়াছে[৪৭], তবে তন্ত্রি কামন্দক হইতে ইহার দুইটি বিষয়ে পার্থক্য পারিদৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ কাহিনীটির ঘটনাস্থল হইল রাজপ্রাসাদ এবং দ্বিতীয়তঃ রাজপুত্র-দম্পতীর মধ্যে একজন এই কাহিনীতে অনুপস্থিত। সংস্কৃত গ্রন্থটিতে বানরটির নামও দেওয়া হয় নাই। এই কাহিনীটি কেদিরি সংস্করণেও বিদ্যমান।

এখন সেই বানরী, ব্যাধ, পাপক এবং ব্যাঘ্রের মূল কাহিনীতে ফিরিয়া আসা যাউক[৪৮]। ব্যাঘ্রটি এই সমস্ত গল্প বলিতে বলিতে ব্যাধও কিঞ্চিৎকাল পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করিল। অতঃপর সে ব্যাঘ্রের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলে ব্যাঘ্রও বিদ্যুৎবেগে পলায়ন করিল। তখন ব্যাধ বানরীকে বলিল যে সে এই ভীষণ অরণ্য হইতে একাকী যাইতে পারিবে না; সুতরাং সে তখন বানরীর সাহায্য প্রার্থনা করিল। বানরী বলিল যে তাহারা প্রথমে বানরীর আবাসস্থলে যাইয়া ক্ষণকাল বিশ্রামলাভ করিবে এবং তাহার পর বানরী ব্যাধের পথনির্দেশ করিয়া দিবে। বানরী তাহার আবাসস্থলে পৌছিলে মার্দব এবং মার্দবী নামক বানরীর সন্তানদ্বয় তাহাদিগকে অভ্যর্থনা

জানাইল। তাহারা ছিল ক্ষুধার্ত। বানরী এই জন্য কিছু ফলমূল আহরণের উদ্দেশ্যে বাহিরে চলিয়া গেলে স্বভাবদুর্বৃত্ত ব্যাধ স্থির করিল যে সে বানর-শিশুদ্বয়কে অগ্নিদগ্ধ করিয়া উহাদিগকে ভক্ষণ করিবে। বানরীকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য সে বানরীর আবাস ও চতুষ্পার্শ্বস্থ জায়গায় অগ্নি সংযোগ করিল ; দাউ দাউ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ব্যাধ সেই অগ্নিতে শিশুদ্বয়কে দগ্ধ করিয়া আপন ভোজনপর্ব সমাধা করিল। বানরী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে সব শেষ হইয়া গিয়াছে। সে শিশুদ্বয়ের অন্তর্ধানের ব্যাপারটি মনে মনে বুঝিতে পারিলেও মুখে কিছু প্রকাশ করিল না। যাহাই হউক, বানরী ব্যাধকে বনের প্রান্তদেশে লইয়া গেলে ব্যাধ তাহাকে শরাঘাতে নিহত করিল। বানরীর আত্মা ইন্দ্রলোকে চলিয়া গেল। লেখক এই সূত্রে নৈতিক উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন যে বানরী এবং শিশুদ্বয় স্বর্গে গমন করিল, কিন্তু ব্যাধ পাপক তাহার কৃতকর্মের জন্যে সপ্তনরকের নিম্নস্থ বালুকার্ণবে নিক্ষিপ্ত হইল। চণ্ডী জাগোর মন্দিরগাত্রের রিলিফে এই আখ্যানটি উৎকীর্ণ হইয়াছে। ডঃ ব্র্যাণ্ডেস বহুদিন পূর্বে মন্তব্য করিয়াছিলেন[৪৯] যে দৃশ্যগুলির ক্রমানুযায়ী-বিন্যাস এখানে তন্ত্রি কামন্দক হইতে স্বতন্ত্র। এতদ্ব্যতীত, চণ্ডী জাগোতে কয়েকটি নূতন তথ্যও পরিবেশিত হইয়াছে। এই কাহিনীটি দেমুঙ্-সংস্করণেও বিবৃত হইয়াছে। তন্ত্রি কেদিরি (খ)-তে এই স্থলে সিংহ এবং উষ্ট্রের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

সম্বন্ধ অতঃপর মেষ-নামধারিণী একটি ছাগীর কাহিনী বিবৃত করিল। একটি ব্যাঘ্রকে ছলনা করিয়া সে নিজের এবং তাহার ছানা বিবিঙ্গশলির জীবনরক্ষা করিয়াছিল[৫০]। একদা যখন তাহারা পর্বতের উপত্যকায় চরিতেছিল তখন এক ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র তাহাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। ছাগী এই বলিয়া তাহাকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল যে সে দশটি ব্যাঘ্র ভক্ষণ করিতে অভ্যস্ত, সে তো মাত্র একটি। ভীত ব্যাঘ্র তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। ফিরিবার পথে ব্যাঘ্রটি তাহার পুরাতন বন্ধু বানরের সাক্ষাৎ পাইল। বানর তাহাকে লইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে অনুরোধ করায়, ব্যাঘ্র এক সর্তে স্বীকৃত হইল। সর্তটি এই যে তাহারা একসঙ্গে আবদ্ধ অবস্থায় ছাগীর সম্মুখীন হইবে। এইরূপ অবস্থায় তাহারা প্রত্যাবর্তন করিলে ছাগী বানরকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে সে কেবলমাত্র একটি ব্যাঘ্রকে লইয়া আসিয়াছে, বেশী নয় ? ভীত ব্যাঘ্রটি ত্বরিদ্বেগে পলাইয়া গেল এবং যাওয়ার পথে বানরটির মস্তক মাটিতে কঠিন আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় বানরটিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনুরূপ একটি গল্পও তিব্বতে প্রচলিত আছে[৫১]। ইহাদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এই যে ছাগলের স্থলে দুইটি শৃগালের আবির্ভাব হইয়াছে এবং ঘটনাস্থল পার্বত্য অঞ্চলে না হইয়া ব্যাঘ্রের গহ্বরে হইয়াছে। বানর, ব্যাঘ্র ও ছাগীর ছলনা করিবার প্রণালী উভয় স্থলেই একপ্রকার। এই প্রকারের একটি মালয় উপকথাও প্রচলিত আছে ; উহাতে ছাগীর স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে একটি কৃশ বৃষভ। ব্যাঘ্রটি আসিয়া পড়িলে বৃষভারূঢ় বানরটি বলিল, "এই ব্যাঘ্রের মস্তকটি চর্বণ করিতে খুব সুস্বাদু।" গল্পের অবশিষ্ট অংশ তন্ত্রি কামন্দকের মতই ; পার্থক্য এইটুকু যে ব্যাঘ্র ও বানরের স্থলে এখানে ব্যাঘ্র ও ভল্লুকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ভল্লুকটি অবশ্য মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই[৫২]। গল্পের অন্যান্য অংশ অনুরূপ।

যবদ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে এবং মালয়, আচেনীজ, বটক, ফিলিপিনো, ডয়ক, চাম, কাম্বোডীয়, সঙ্গীরিজ, লাম্পোঙ্গীজ প্রভৃতি লোকের মধ্যে কঞ্চিল গল্পগুচ্ছ একদা খুব জনপ্রিয় ছিল[৫৩]। উহাতে বলা হইয়াছে যে একটি ব্যাঘ্র এবং একটি বানর পরস্পর লাঙ্গুলবদ্ধ হইয়া একটি বেডুস বা ছাগলের নিকট উপস্থিত হইল। ছাগল ব্যাঘ্রটিকে ভক্ষণ করিবে এই আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া ব্যাঘ্রটি তীব্রবেগে পলায়ন করিল ; লাঙ্গুলবদ্ধ বানরটিও মৃত্তিকায় কঠিন আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল[৫৪]। বাঙ্‌লা দেশের একটি রূপকথাতেও একটি ভেড়ার মুখে আমরা শুনিতেছি :

"সিংহের বেটা ভম্বলদাস
সাত সাত বাঘ গিলি এক এক গ্রাস।"

ইহা অসম্ভব নহে যে এই গল্পটি অষ্ট্রিক-উৎস হইতে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এসিয়ার রূপকথার জগতে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। এই অষ্ট্রিক-গোষ্ঠি বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়ার জন্য গল্পটিও বিভিন্নস্থলে সামান্য পরিবর্তিত রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অন্যান্য কারণের জন্য এই পরিবর্তনটুকু হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু গল্পের কাঠামোটুকু এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একই প্রকার রহিয়া গিয়াছে। দেমুঙ্‌ এবং কেদিরি সংস্করণেও এই কাহিনীটি বর্ণিত হইয়াছে। এই কাহিনীটি এত জনপ্রিয় ছিল যে চণ্ডী মেণ্ডুৎ এবং পনতরনের মন্দিরগাত্রেও এই গল্পটির সংক্ষিপ্তসার দক্ষতার সহিত রূপায়িত হইয়াছে[৫৫]।

অতঃপর সম্বদ্ধ আর একটি কাহিনী বিবৃত করিল। সে বলিল যে একদা একটি হস্তী সিযুঙ্‌ পক্ষীর ডিমগুলি বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল[৫৬]। স্ত্রী-পক্ষীটি ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া স্বামীকে প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিল। মাছি, কাক, কাঠ্‌ঠোকড়া, ভেক প্রভৃতি তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছিল ; ইহাদের মধ্যে কাক বলিল যে প্রতিহিংসা গ্রহণ করার চেষ্টা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইবে। এই সম্পর্কে সে ইন্দ্র ও ময়ূরের একটি কাহিনী বর্ণনা করিল[৫৭]। এক সময়ে ইন্দ্রের সভায় যমরাজ উপনীত হইলে দেবরাজের ময়ূরটি ভীত হইয়া তাঁহার সিংহাসন-তলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। দেবরাজ ইন্দ্র বিরক্ত হইয়া তাহাকে নরকে যাইবার অভিশম্পাত প্রদান করিলেন। পক্ষীটির মৃত্যুর পর দেবরাজের মনে কষ্টের উদয় হইল ; তিনি উহাকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যম, কাল, চিত্রগুপ্ত দেবরাজকে বলিলেন যে, তাঁহারা পক্ষীটিকে আর সঞ্জীবিত করিতে পারিবেন না। এই কাহিনীটি দেমুঙ্‌ এবং কেদিরি সংস্করণেও বিদ্যমান। যাহাই হউক, অবশেষে সিযুঙ্‌ দম্পতীর বান্ধবগণ পরামর্শ দিল যে কচ্ছপগণ গরুড়কে যেরূপে পরাজিত করিয়াছিল তাহারাও সেইরূপে হস্তীকে পরাভূত করিবে। এই স্থলে কাঠ-ঠোকড়া একটি প্রশ্ন করিলে উহা হইতে পরবর্তী অপর একটি গল্পের উদ্ভব হইল। পঞ্চতন্ত্রে এই কাঠ-ঠোকড়ার নাম দেওয়া হইয়াছে কাষ্ঠকূট। যাহাই হউক বিযুঙ্‌ তখন গরুড় এবং কচ্ছপদের মধ্যে দ্রুত-ধাবনের এক প্রতিযোগিতার কাহিনী বর্ণনা করিল[৫৮]। সে বলিল যে গরুড় পক্ষী নির্বিচারে কচ্ছপদের ধ্বংস করিতেছিল। তখন কচ্ছপগণ সমুদ্রের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়িল এবং গরুড় যখন খাদ্যের জন্য কচ্ছপদের অন্বেষণ

করিয়া ফিরিতে লাগিল তখন কচ্ছপদের নেতা এক দৌড়-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব উত্থাপন করিল। কচ্ছপদের নেতা বলিল যে এই দৌড়-প্রতিযোগিতায় যদি তাহারা পরাজিত হয় তাহা হইলে তাহাদের সন্তানেরা, পৌত্রগণ ও তাহাদের ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততিরা সকলেই সর্বকালের জন্য গরুড়ের ভোজ্য হইবে। গরুড় স্বীকৃত হইলে দৌড়-প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। গরুড় সমুদ্রের পরপারে যাইয়া দেখিল যে কচ্ছপ পূর্বেই অপর পারে উপনীত হইয়াছে। এই কাহিনীটি দেমুঙ্ সংস্করণেও বিবৃত হইয়াছে। চণ্ডী মেণ্ডুতের একটি ভগ্ন রিলিফে একটি ঊর্দ্ধমুখ কচ্ছপকে দেখা যায়; ইহা হইতে ডঃ ব্র্যাণ্ডেস অনুমান করিয়াছেন যে ইহার সহিত উপরোক্ত কাহিনীর কোন সংযোগ থাকিতে পারে। কঞ্চিল এবং কেয়োঙের কাহিনীটি এই গল্পের অনুরূপ[৫৯]; এই প্রকারের আরো একটি উপকথা চিরুদের মধ্যে প্রচলিত আছে; কাহিনীটি শামুক ও ব্যাঘ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া বিরচিত[৬০]। চিরুরা এখনো সভ্যতার পথে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই এবং তাহারা পূর্ব ভারতের মনিপুর উপত্যকার পশ্চিমাঞ্চলে বাস করে। শামুক এবং ব্যাঘ্রের এই কাহিনীটি মালয় পলিনেশীয় অঞ্চলেও সুপ্রচলিত। সেল্‌তেমা বলিয়াছেন[৬১] যে কঞ্চিল এবং শামুকের কাহিনীটি ইউরোপে গিয়াও সমুপস্থিত হইয়াছে এবং ইয়াকব ও গ্রিম এই কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গল্পটি অস্ট্রিক-উৎস হইতে উদ্ভূত বলিয়া সন্দেহ হয়।

অতঃপর ভেক সমুদ্রতটনিবাসী এক কাঁদাখোঁচা পাখীর কাহিনী বিবৃত করিল[৬২]। পক্ষীটির নাম ছিল সুপ্লপদ এবং তাহার পত্নীর নাম ছিল প্রিয়ম্বদা। পক্ষিনী একদিন তাহার স্বামীকে বলিল, "হে আমার সন্তানের জনক, আমি এখন কি করিব? আমি এখন ডিম্ব প্রসব করিব।" সে সমুদ্রসৈকতে ডিম্ব প্রসব করিলে জলদেবতা উহা ভাসাইয়া লইয়া গেলেন। পক্ষী-দম্পতী খুব ক্ষুব্ধ মনে গরুড়ের নিকট তাহাদের দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিলে গরুড় পক্ষী উহা আবার ভটার বিষ্ণুর নিকট নিবেদন করিল। তখন বিষ্ণুর প্রেরিত দূত জনস্তের মাধ্যমে কাঁদা-খোঁচা পক্ষীর ডিম্ব আবার তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইল। এই কাহিনীটি হিতোপদেশ[৬৩], পঞ্চতন্ত্র[৬৪] এবং কথাসরিৎসাগরে[৬৫] বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের কোনটিতেই জনস্তের উল্লেখ নাই। এতদ্ব্যতীত তন্ত্রি কামন্দকে পক্ষীর যে নাম দেওয়া হইয়াছে তাহা উপরোক্ত সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে অনুপস্থিত। ভারতীয় সংস্করণের টিট্টিভ পক্ষীর নাম যবদ্বীপীয় সংস্করণে তিনিল হইয়া গিয়াছে[৬৬]। এই কাহিনীটি দেমুঙ্ এবং কেদিরি সংস্করণেও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

অতঃপর সবুজ মক্ষিকাটি ব্যাধ এবং ব্রাহ্মণের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল[৬৭]। ব্যাধটি একসময় লক্ষ্য করিল যে ব্রাহ্মণ সাধারণতঃ দুগ্ধ এবং মাখন দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য আহার করিয়া থাকেন; সুতরাং সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে এই সমস্ত খাদ্য কোথা হইতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ গরুর কথা বলিলে ব্যাধ একটি গরু ক্রয় করিয়া উহা বাড়ী লইয়া আসিল। গরু কিরূপে দোহন করিতে হয় ব্যাধ তাহা জানিত না; সুতরাং সে গরুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হে গাভী মহাশয়া, আমাকে দয়া করিয়া দুগ্ধ এবং মাখন দিন।" স্বভাবতঃই ব্যাধ কিছুই পাইল না। এই কাহিনীটি কেদিরি-সংস্করণে আছে, কিন্তু দেমুঙ্-সংস্করণে নাই।

কাঠ-ঠোকড়া অতঃপর আর একটি গল্প বলিল[৬৮]। সে বলিল যে একদা একজন মানুষের হাড় বাঘের গলায় আটকাইয়া গিয়াছিল। কাঠ-ঠোকড়া যে গাছে বাস করিত তাহার নীচেই ব্যাঘ্রটি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। কাঠ-ঠোকড়া এই সর্তে হাড়টি বাহির করিয়া দিল যে ব্যাঘ্র সুস্থ হইয়া তাহাকে একটি খরগোশের হৃদ্‌পিণ্ড উপহার দিবে। ব্যাঘ্র সুস্থ হইয়া নির্বিকারে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে ক্রুদ্ধ কাঠ-ঠোকড়া বাঘের চোখ ঠোক্‌রাইয়া তুলিয়া ফেলিল।

এইরূপ গল্প বলার পর সবুজ মাছি, কাঠ ঠোকড়া এবং ভেক হস্তীর দিকে অগ্রসর হইল। গ্রন্থে ইহাদের নাম যথাক্রমে বীণারবা, কাষ্ঠকুট এবং মেঘনাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের সঙ্গে একটি কাকও ছিল। উহাদের মধ্যে একজন হস্তীকে অন্ধ করিল, আর একজন উহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিল, আর ভেক তাহার কণ্ঠরবে হস্তীকে বিপথে পরিচালিত করিল। এইরূপে হস্তী নিহত হইল।

সম্বন্ধ অতঃপর একটি দাঁড়কাক, সর্প এবং একটি কেপুহ্-বৃক্ষের কাহিনী বিবৃত করিল[৬৯]। এই কাহিনীটি দেমুঙ্-সংস্করণে আছে, কিন্তু তন্ত্রি কেদিরি (খ)-তে নাই। কাহিনীর প্রারম্ভেই শিম্মপ-নামধারী একটি কেপুহ্-বৃক্ষের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে; বৃক্ষটি শোভা নামক অঞ্চলের মধ্যভাগে নির্বান্ধব অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল। কিশোর রাখাল বালকদের অত্যাচারে তাহার শাখাগুলিতে কিশলয় স্ফুরিত হইত না। একটি কাকদম্পতী রাখাল বালকদিগকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইবার সঙ্কল্প করিল। কাকটির নাম ছিল নীল এবং তাহার স্ত্রীর নাম ছিল কক (= কাক)। কাকটি মাথার খুলি, হাড় প্রভৃতি আনিয়া সেখানে উপস্থাপিত করিল এবং একটি মৃতদেহ বৃক্ষশাখে ঝুলাইয়া রাখিল। পরদিন রাখাল বালকগণ সেইস্থল শ্মশানে রূপান্তরিত হইয়াছে দেখিয়া সেইস্থল পরিত্যাগ করিল। কালক্রমে সেই বৃক্ষ পত্রবহুল হইল এবং শিম্মপ বৃক্ষটির অনুমতি লইয়া স্ত্রীপক্ষীটিও সেইস্থলে ডিম্ব প্রসব করিল। কোকিলের একটি ডিম্ব সহ স্ত্রীপক্ষীটি চারটি ডিম্ব রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। কেপুহ্-বৃক্ষ উহাদের রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিল। অবশেষে ডিমগুলি হইতে ছোট ছোট পক্ষীশাবক বাহির হইল। একদা ভক্ষক নামক একটি ক্ষুধার্ত সর্প সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বৃক্ষকে তাহার শক্তির দম্ভ দেখাইয়া তাহার আশ্রয় হইতে পক্ষীশাবকগুলিকে লইয়া ভক্ষণ করিল। লোকজন সর্পদষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকিলে সকলে ঐ অঞ্চল পরিহার করিতে লাগিল। ঐ অঞ্চলের প্রধান ব্যক্তির নাম ছিল মঙ্গলল্য; তিনি একজন মুনির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ঐ স্থলে অগ্নি-সংযোগ করিলেন; ইহাতে সর্প ও বৃক্ষ উভয়েই পুড়িয়া মরিয়া গেল।

অতঃপর ব্যরুন্দি নামক এক কাকের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কাকটি সপরিবারে একটি বৃক্ষের উপর বাস করিত[৭০]। ঐ বৃক্ষের পাদদেশে একটি গর্তে সিতর নামক একটি সর্পও বাস করিত। সে কাকের ছানাগুলি ভক্ষণ করিত। সুতরাং ব্যরুন্দি প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিল। সুযোগও উপস্থিত হইল। একদা রাজকুমার বীরপ্রাণ তাঁহার অঙ্গের ভূষণ তীরে রাখিয়া এক সরোবরে স্নান করিতেছিলেন। কাকটি তাঁহার অলঙ্কার ছোঁ মারিয়া লইয়া গিয়া সর্পের গর্তের সন্নিকটে রাখিল। রাজপুত্রের ভৃত্যগণ অলঙ্কার খুঁজিতে

গিয়া সর্পকে হত্যা করিল। এই গল্পটি দেমুঙ্‌ এবং কেদিরি সংস্করণে নাই, কিন্তু এই কাহিনীটি হিতোপদেশ[১১] এবং পঞ্চতন্ত্রে[১২] বর্ণিত হইয়াছে।

নন্দক অতঃপর সম্বন্ধের নিকট তিনটি মৎস্যের আখ্যায়িকা বর্ণনা করিল[১৩]। এই কাহিনীটি কথাসরিৎসাগর[১৪], পঞ্চতন্ত্র[১৫] এবং হিতোপদেশেও[১৬] বিবৃত হইয়াছে। তন্ত্রি-কামন্দকের দেমুঙ্‌ এবং কেদিরি সংস্করণে এই কাহিনীটি নাই। গল্পে বলা হইয়াছে যে কোন সরোবরে তিনটি মৎস্য বাস করিত; তাহাদের নাম ছিল অনঙ্গবিহুতা, প্রত্যুন্নমতি এবং যৎভবিষ্যতি। গ্রীষ্মকাল উপনীত হইলে অনঙ্গবিহুতা অন্যত্র যাইবার প্রস্তাব করিল এবং অবশেষে চলিয়াও গেল। অতঃপর মৎস্যজীবিরা সেই সরোবরে মাছ ধরিতে আসিলে প্রত্যুন্নমতি সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত একই কৌশলে পলায়ন করিল, কিন্তু যৎভবিষ্যতি ধৃত হইয়া নিহত হইল। ইহা লক্ষ্যণীয় যে যবদ্বীপীয় গ্রন্থে সংস্কৃত নামগুলি খুব বেশী বিকৃত হয় নাই। সংস্কৃত গ্রন্থে উহাদের নাম যথাক্রমে অনাগত বিধাতা, প্রত্যুৎপন্নমতি ও যদ্‌ভবিষ্য[১৭]।

সম্বন্ধ অতঃপর সিংহের নিকট রাজা অরিধর্ম কর্তৃক দৃষ্ট একটি সর্প-নারী ও চক্রচিহ্ন-বিশিষ্ট সর্পের রতিক্রিয়ার কাহিনী বর্ণনা করিল[১৮]। একদা রাজা শিকারে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে উপরোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট দুইটি প্রাণী রতিক্রিয়ায় মত্ত, তিনি ভাবিলেন যে ইহাতে বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হইবে। সুতরাং তিনি সর্পকে নিহত করিলেন এবং সর্প-নারীকে চপেটাঘাত করিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া সর্পনারী প্রতিশোধ গ্রহন করিতে সংকল্প গ্রহণ করিল এবং তাহার পিতা সর্পরাজকে একটি অলীক কাহিনী বর্ণনা করিয়া শুনাইল। সর্পরাজ তখন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিল এবং পরে স্বীয় সর্পবেশ পরিগ্রহণ করিয়া রাজার সিংহাসনতলে লুক্কায়িত রহিল। রাজা অরিধর্ম তখন মহিষী মায়াবতীর সহিত কথোপকথন করিতে ছিলেন। সর্পরাজ তাহাদের কথোপকথন হইতে বুঝিতে পারিলেন যে তাহার কন্যা তাহাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। সুতরাং সর্পরাজ পুনরায় ব্রাহ্মণের বেশ পরিগ্রহণ করিয়া রাজা অরিধর্মকে বরপ্রদান করিতে ইচ্ছুক হইল। সর্পরাজ বলিল যে তাহার বর অনুযায়ী অরিধর্ম পশুদের কথাবার্তা বুঝিতে পারিবেন, কিন্তু উহা অন্যকে জানাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। একদা তিনি একটি চেচেক-পাখীর কথা শুনিয়া হাস্য করিলে রাণী তাঁহার হাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বলিলেন যে তাঁহার চিতাশয্যা সজ্জিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি উহা বলিতে পারিবেন না। রাজা চিতাশয্যায় শয়ন করিলেন। তখন তিনি এক ছাগ-দম্পতীর আলাপ শ্রবণ করিলেন। ছাগ-দম্পতীর নাম ছিল বঙ্গলি এবং বিবিতা। রাজা ছাগের কথা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে স্ত্রীলোকদের প্রত্যেক ইচ্ছাই পুরণ করা উচিত নহে; সুতরাং তিনি অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন না দিয়া রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন[১৯]। এই কাহিনীটি কেদিরি এবং দেমুঙ্‌-সংস্করণেও বিবৃত হইয়াছে।

এই গল্পের শেষে মূল কাহিনীটির উপর যবনিকা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেখানে শৃগালের পরিকল্পনা ও চক্রান্ত অনুযায়ী বৃষ এবং সিংহের মধ্যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল। তাহাদের মৃত্যুর পর সিংহ বিষ্ণুলোকে এবং বৃষ শিবলোকে গমন করিল। শৃগালটি তাহার কৃতকর্ম

অনুযায়ী বালুকার্ণব তাম্রগোহমুখ এবং যমনীলোক নামক নরকে নিপতিত হইল। শৃগালটির দেহে যত লোম ছিল তাহার দশগুণ বৎসরকাল তাহার ঐ নরকে বাস করিতে হইবে।

চন্দ্রিতে[৮০] কতকগুলি গল্প আছে যাহা অন্যান্য সংস্করণে না থাকিলেও অন্যত্র একেবারে দুর্লভ নহে। এই সংস্করণটির সূচনা তন্ত্রির অন্যান্য সংস্করণের মতই। প্রারম্ভাংশের পর বয়ন বুদিমনের কাহিনীটি বিবৃত হইয়াছে। এই কাহিনীটিই মালয় গ্রন্থটির কাঠামো রচনা করিয়াছে। ময়ূর কর্তৃক কথিত প্রথম কাহিনীটি এমন একজন লোকের সম্বন্ধে, যে নাকি তাহার পত্নীকে তাহার জীবনের অর্ধেক পরমায়ু দান করিয়াছিল, কিন্তু ইহার পরিবর্তে সে পাইয়াছিল স্ত্রীর অপরিসীম অকৃতজ্ঞতা। এই উপকথাটি কোন কোন কঞ্চিল এবং মালয় কাহিনীতেও সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে পালেম্বাঙের একজন রাজার কাহিনীও বর্ণিত হইয়াছে। তিনি চীনদেশীয় একটি শ্বেত গরুড়ের পালিতা কন্যাকে স্বপ্নে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। রাজা তাহার তিনজন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন ঐ কন্যাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার জন্য, কিন্তু তাহার পূর্বেই রাজার অবৈধ একটি সন্তান পক্ষীটিকে হত্যা করিয়া সেই কন্যাটির সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। এই গ্রন্থের বলিদ্বীপীয় সংস্করণটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। ইহাতে মালয়, পর্তুগীজ এবং শশক-শব্দের অনুপ্রবেশ ; ঘটিয়াছে প্রাণীর নামগুলির বানানও যবদ্বীপীয় সংস্করণ হইতে অনেক ক্ষেত্রে পৃথক।

পূর্বোক্ত সমালোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে দ্বীপময় ভারতের তন্ত্রি কাহিনীগুলির মৌলিক উপাদান হয়তো সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় নহে। যদিও আমরা কোন কোন গল্পের উৎস সঠিকরূপে নির্ধারণ করিতে পারি না, তবুও ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে উহার কোন কোনটি অষ্ট্রিক চিন্তাধারা হইতে নির্গলিত হইয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে তন্ত্রির প্রায় সমস্ত সংস্কৃত উপ-কথাগুলিই পঞ্চতন্ত্রের প্রথম ভাগেই সন্নিবেশিত আছে ; হিতোপদেশে উহা বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, যে গল্পগুলি অবিসংবাদীরূপে ভারতীয় তাহার পারম্পর্য তন্ত্রি-কামন্দক এবং সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে একরূপ নহে। ইহাও লক্ষণীয় বিষয় যে ধর্মের দিক দিয়া বিচার করিলে তন্ত্রি কামন্দক যেন একখানি ধর্মনিরপেক্ষ গ্রন্থ। ইহাতে একদিকে যেমন মন্ত্রতন্ত্রের কার্যকারিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, তেমনি আবার বিষ্ণুলোক ও শিবলোকের মাহাত্ম্যও বর্ণনা করা হইয়াছে। ইন্দ্র এবং তাহার প্রিয় ময়ূরের কাহিনীতে ভটার সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতারূপে সংস্থাপিত হইয়াছেন। তবে গ্রন্থকারের ধর্ম সম্বন্ধে গ্রন্থ হইতে কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর নহে, কারণ তন্ত্রি কামন্দকের রচনায় হয়তো পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থকারের প্রভাব পড়িয়াছে ; সুতরাং তাহার ধর্ম-সম্বন্ধীয় ধ্যান-ধারণা তন্ত্রি কামন্দককে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকিতে পারে।

(খ) অন্যান্য জীবজন্তুর কাহিনী

ভারত-মালয়-পলিনেশীয় অঞ্চলের তন্ত্রি গল্পসাহিত্য ব্যতীত এই প্রকারের আরো গল্প প্রচলিত আছে যাহা আমরা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে পারি। উত্তরে তিব্বত হইতে

আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-পুর্বে বলিদ্বীপ পর্যন্ত এই সমস্ত গল্প সুপরিচিত এবং সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া উহা ছেলে-ভুলানো রূপকথার আকারে জনগণের চিত্ত অধিকার করিয়াছে।

এই সমস্ত কাহিনী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুখে মুখে শত শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে, কিছু কিছু লিপিবদ্ধ হইয়াছে। একই কাহিনী কোথাও মুখে মুখে, কোথাও বা লিখিত রূপকথা রূপে প্রচারিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সুপ্রাচীন কাহিনীগুলি বলিবার সময় অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্র সহযোগে গীত হইয়া থাকে। তোরজ জাতির মধ্যে গদ্য কাহিনীগুলিও ক্ষেত্রবিশেষে গীত হইয়া থাকে[৮১]। এইগুলি পরিবেশনের সময় সাধারণতঃ সন্ধ্যাকাল বা রাত্রিবেলা। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে এই পর্যায়ের "সাহিত্যের" একটা ধর্মীয় তাৎপর্য আছে এবং সেই জন্যই মুকুরী পাপুয়ান, বটক, গয়ো এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেরা এই ধরণের রূপকথা একমাত্র রাত্রিতেই শ্রবণ করিয়া থাকেন। গয়োগণ এবং মধ্য সিলিবিসের তোরজগণ বিশ্বাস করে যে এইগুলি দিনের বেলা শুনিলে ইহার ফল হইবে অশুভ, অকল্যাণময়[৮২]। এই সমস্ত রূপকথার সহিত যাদুবিদ্যার সম্বন্ধও বিদ্যমান আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। নিয়াস অঞ্চলে উৎসব উপলক্ষ্যে নর-নারীগণের সঙ্গীতচক্রে এই প্রকার কাহিনী অনেক সময় পরিবেশন করা হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এই সমস্ত কাহিনী কে কবে রচনা করিয়াছে তাহা আজ আর বলিবার উপায় নাই। এই রূপকথা জগতের কোন কোন কাহিনী ইন্দো-মালয়-পলিনেশীয় অঞ্চলে বহুলরূপে প্রচলিত আছে। ইহারই কয়েকটি কাহিনী নিম্নে পরিবেশন করা হইতেছে।

তন্ত্রি কামন্দকের বহির্ভূত হিতোপদেশের একটি গল্প কঞ্চিল গল্পচক্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থে[৮৩] হরিণ এবং একটি কাকের কাহিনী বিবৃত আছে; তাহারা মগধের চম্পকবতী অরণ্যে বন্ধুর মত বাস করিত। একদিন একটি অজ্ঞাতকুলশীল শৃগাল তাহাদের মধ্যে আসিয়া উপনীত হইল এবং হরিণকে নিকটবর্তী একটি শস্যশ্যামল ক্ষেত্রে চরিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইল। ক্ষেত্রপতি শস্য নষ্ট হইতেছে দেখিয়া একটি জাল পাতিয়া হরিণকে ধরিয়া ফেলিল। কাক সেখানে আসিয়া হরিণকে মৃতবৎ নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকিতে বলিল। ক্ষেত্রপতি হরিণকে মৃত মনে করিয়া ফেলিয়া দিলেই হরিণ পলায়ন করিল। হরিণের প্রতি নিক্ষিপ্ত অস্ত্র অপেক্ষমান শৃগালকে আহত করিলে উহা শীঘ্রই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। কঞ্চিল কাহিনীতে[৮৪] ইহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে কিডঙ্, চেপ্লুকন এবং বানর। কিডঙ্ বা হরিণটি প্রত্যহ শস্য বিনষ্ট করিলে ক্ষেত্রপতি একটি জাল পাতিল এবং উহাতে কিডঙ্টি ধরা পড়িল। কাকের স্থলাভিষিক্ত চেপ্লুকনটী হরিণকে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিতে বলিল। ক্ষেত্রপতি হরিণকে মুক্ত করিয়া দিলে কিডঙ্ দ্রুত পলায়ন করিল, কিন্তু তাহার হস্ত-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বানরটির মৃত্যু ঘটাইল। ঐ কঞ্চিল কাহিনীগুলিরই অপর একটি উপাখ্যানে[৮৫] এই গল্পটির পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে, কিন্তু সেখানে বানরের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে কুবুক।

আরো কতকগুলি গল্প আছে যাহার অনুরূপ কাহিনী অন্যত্রও বিদ্যমান। যেমন সহস্র এবং একরজনীর কাহিনী এবং হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের ব্রাহ্মণ কর্তৃক শক্তুপাত্র ভাঙ্গিবার

কাহিনী। লেগেনের (একপ্রকার রস)[৮৬] একজন ব্যবসায়ী ফাঁপা বংশপাত্রে রস সংগ্রহ করিবার জন্য বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল। পাত্রটি পূর্ণ হইলে সে রস বিক্রয় করিয়া অর্থ প্রাপ্তির কথা চিন্তা করিল ; সে ভাবিল যে ঐ অর্থ দ্বারা সে মুরগী বিক্রয়ের ব্যবসা করিবে। সে ভাবিল যে সে এইরূপে একটি গৃহ ক্রয় করিতে পারিবে। ভাবিতে ভাবিতে সে নিদ্রাতুর হইয়া নীচে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইল। পশ্চিম যবদ্বীপে এই গল্পটির নাম তুকঙ্ ন্দপ্ ললমুনন। মুষিক এবং একজন ঋষির কাহিনীও ভারতবর্ষে খুব জনপ্রিয়। হিতোপদেশে[৮৭] বর্ণিত হইয়াছে কিরূপে ঋষি গৌতম একটি শিশু মুষিককে একটি বলিষ্ঠ বিড়ালে, বিড়ালটিকে আবার কুকুরে এবং কুকুরটিকে পুনরায় ব্যাঘ্রে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। ব্যাঘ্রটি ঋষিকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে ঋষি তাহাকে পুনরায় মুষিকে রূপান্তরিত করিলেন। যবদ্বীপেও সজারু এবং পাহাড়ের একটি কাহিনী প্রচলিত আছে[৮৮]। পাহাড়টিকে সজারু বারংবার বিদীর্ণ করিলে, পাহাড়টি সজারু হইতে চাহিল। তখন তাহাকে সজারু করা হইল, কিন্তু সে তখন কুকুরের ভয়ে কুকুর হইতে চাহিল। কুকুর হইয়া সে তাহার প্রভুর সহিত শিকারে যাইতে অনিচ্ছুক হইলে তখন তাহাকে মানুষ করা হইল। মানুষ হওয়ায় তাহাকে গ্রামের ঘোড়ল পরিবহনের কার্যে নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর সে ক্রমে ক্রমে লুরহ, চম্য, বদন প্রভৃতির কাযে নিযুক্ত হইল। অবশেষে তাহার সুবুদ্ধির উদয় হওয়ায় সে পুনরায় পাহাড়েই রূপান্তরিত হইল।

উচিঙ্গ জেউঙ্গ্ মনুক তিতিরণ নামক একটি কাহিনীতে বিড়াল এবং ঘুঘুর কাহিনী বিবৃত হইয়াছে[৮৯]। ইহার অনুরূপ কাহিনী হইল হিতোপদেশের[৯০] অন্ধ গৃধ্র, বিড়াল এবং পক্ষীর গল্প। যবদ্বীপীয় বিড়ালটি সংস্কৃত দীর্ঘকর্ণের স্থলাভিষিক্ত ; যবদ্বীপীয় কথক যদিও বলেন নাই বিড়ালটি চান্দ্রায়ণব্রত অবলম্বন করিয়াছিল কিনা, তবুও তাহার তপস্যার কথা সুবিদিত ছিল। যবদ্বীপীয় বিড়ালটি ভারতীয় দীর্ঘকর্ণের মত ঘুঘুটীর বিশ্বাস অর্জন করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছিল। দ্বীপময় ভারতে এইরূপ আরো কাহিনী প্রচলিত আছে যাহা আমাদিগকে আসিংস বগ্গের বানরেন্দ্রজাতক[৯১], কুম্ভীর জাতক[৯২], শিশুমার জাতক[৯৩] প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অবশ্য ইহা বৌদ্ধপ্রভাব বিবর্জিত। পঞ্চতন্ত্রের বানর এবং কুম্ভীরের কাহিনীটিও এইগুলির অনুরূপ। বর্তমানে ইহা বলা সম্ভবপর নহে যে এই গল্পগুলি আদিম যুগে মালয়-পলিনেশীয় ছিল কি না অথবা এইগুলি ভারতীয় প্রাচীন ঔপনিবেশিকদের মাধ্যমে দ্বীপময় ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল।

মালয়-পলিনেশীয় অঞ্চলে যে কঞ্চিল কাহিনীগুলি প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে এমন একটি গল্প আছে যাহা বাঙ্লাদেশে বিদ্যমান। বাঙ্লা গল্পটিতে বলা হইয়াছে যে একদা একটি শৃগাল কুম্ভীরের সঙ্গে মারাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হইল। এক সময় যখন শৃগালটি নদী উত্তীর্ণ হইতেছিল তখন কুম্ভীরটি তাহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য শৃগালের পা তাহার মুখের মধ্যে লইয়া উহা চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শৃগালটি তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে কুম্ভীরের মুখে যাহা রহিয়াছে তাহা শৃগালের পা নহে, একটি লাঠি মাত্র। নির্বোধ

কুম্ভীরটি পা ছাড়িয়া দিলে শৃগালটি লম্ফ প্রদান পূর্বক তীরে পৌছিয়া গেল। ইহার কিছুকাল পরে যখন কুম্ভীরটি একটি নদীর তীরে রৌদ্র পোহাইতেছিল তখন শৃগালটিকে বাধ্য হইয়া ঐ পথে যাইতে হইয়াছিল। কুম্ভীরটি জাগ্রত আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য শৃগালটি উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল—'এই কুম্ভীরটি যদি জীবিত থাকিয়া থাকে তাহা হইলে উহা নিশ্চল অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে; যদি উহা মরিয়া গিয়া থাকে এবং মনে হইতেছে উহা মরিয়া গিয়াছে—তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই লেজ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালিত করিবে।" কুম্ভীরটি মৃত ইহা প্রমাণ করিবার জন্য নড়িতে চড়িতে আরম্ভ করিলে শৃগালটি পলায়ন করিল।

কঞ্চিল কাহিনীতে শৃগালের স্থান অধিকার করিয়াছে পিউচঙ্গ্ এবং কিডঙ্; কোন স্থলে আমরা পিউচঙ্গ্‌কে আবার কোন স্থলে কিডঙ্গ্‌কে দেখিতে পাই[১৪]। বাঙ্‌লা রূপকথার মত পিউচঙ্গ কুম্ভীরের মুখ বিবর হইতে অব্যাহতি পাইয়া অবশেষে এক দ্বীপে ঘুমাইবার জন্য চলিয়া গেল। অনতিকাল পরেই ঐ দ্বীপটি ক্ষুধার্ত কুম্ভীর কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া গেল। পিউচঙ্গ্ তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিতে আরম্ভ করিল; ইহাতে কুম্ভীরগুলি সন্নিকটবর্তী হইয়া সারিবদ্ধ হইয়া গেল। পিউচঙ্গ্‌টি তখন উহাদের শরীরের উপর দিয়া দৌড়াইয়া চক্ষুর পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল। অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই যে একটী কিডঙ্ কিউচঙ্গের স্থলে আবির্ভূত হইয়াছে। কিডঙ্‌টিও শৃগালের মত কুম্ভীরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল যে তাহার সম্মুখস্থ দেহটি কি কুম্ভীরের, না উহা একটি বৃক্ষ কাণ্ড! গল্পটির অবশিষ্ট অংশ বাঙ্‌লা রূপকথার অনুরূপ। সুতরাং ইহা পরিষ্কার রূপেই দেখা যাইতেছে যে এই বাঙ্‌লা রূপকথাটির নাম এবং তথ্যাদির দিক দিয়া উপরোক্ত কাহিনীদ্বয়ের একটির সঙ্গে একেবারে মিলিয়া যাইতেছে। সমস্ত দিক পর্যালোচনা করিয়া মনে করা যাইতে পারে যে এই গল্পটি বাঙ্‌লা দেশ হইতে বাহিরে গিয়াছে, কিন্তু ইহার মূল উৎস অষ্ট্রিক হওয়া অসম্ভব নহে।

এতদ্ব্যতীত বাঙ্‌লাদেশের কিম্বদন্তী অনুযায়ী আমরা চন্দ্রের কলঙ্কের মধ্যে চরখা-কাটা বুড়ী দেখিয়া থাকি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিয়াছেন—

'..... পুরাণে তার বয়স লেখে একশো হাজার কুড়ি'। বর্তমান যবদ্বীপীয় গল্প সাহিত্যেও একজন নিনি অস্তিহ বা চরকা-কাটা বুড়ী বিদ্যমান[১৫]। যবদ্বীপের এই চরকা-কাটা বুড়ীর কিম্বদন্তী প্রাচীন উৎস হইতে সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। আরও কতকগুলি গল্প আছে যাহাতে রাক্ষস এবং ভূত প্রেত ইত্যাদি বিশেষ ভূমিকা পরিগ্রহণ করিয়াছে। ভারতীয় মহাকাব্যগুলির প্রভাব এবং জনসাধারণের কুসংস্কার সম্ভবতঃ ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। মালয়গণ[১৬] এখনো মনে করে যে যখন পিতলো গুরু (= ভটার গুরু) কোন কারণের জন্য প্রেতাত্মাদিগকে একটি বনে নির্বাসিত করিলেন তখন তাহারা মনুষ্য জাতির উপর প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ গ্রহণ করিল। কথিত আছে যে এই সমস্ত অপদেবতার সংখ্যা ১২৪০০০। তাহাদের অশরীরী আত্মা মালয়-পলিনেশীয় চিন্তাকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে।

ভারত-মালয়-পলিনেশীয় লোক সাহিত্যের আলোচনা শেষে আমরা দুই একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব। গল্পগুলিতে যে সমস্ত জন্তু বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহার মধ্যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে শৃগাল, বানর, হরিণ, ব্যাঘ্র, কুম্ভীর, হস্তী, ভেক, কাক এবং ইঁদুর। এই সমস্ত পশু যে চতুরতা অবলম্বন করিয়াছে তাহা একদিকে যেমন সহজ, তেমনি কিছুটা নির্বুদ্ধিতার স্বাক্ষরবাহী, অনেক সময় উহা কৌতূহলজনকও বটে[১৭]। অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তি অপেক্ষা কল্পনা প্রবল রূপে দেখা দিয়াছে। কোন ক্ষুদ্রপ্রাণী একটি বিশালকায় প্রাণীকে পর্যুদস্ত করিবার জন্য সাধারণতঃ তিন প্রকারের চতুরতা অবলম্বন করিয়াছে, যথা, (১) কোন সময়ে সে মুখ রক্তাভ করিয়া এই বিষয়টিই বুঝাইতে চাহিয়াছে যে সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় জীবকে ভক্ষণ করিয়াই বাঁচিয়া আছে। (২) কোন সময়ে আবার প্রতিদ্বন্দ্বীকে কূপ, গর্ত বা কর্দমপূর্ণ সরোবরে নামিতে প্ররোচিত করিয়া সে পলায়ন করিয়াছে। (৩) কখনো আবার প্রতিদ্বন্দ্বী পশুটিকে কাল্পনিক শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া স্বয়ং স্বচ্ছন্দে পলায়ন করিয়াছে। এই সমস্ত কাহিনী প্রাচীন কথা-শিল্পীদের অমর প্রতিভার স্বাক্ষরবহ।

পা দ টী কা

১. *Das Pancatantra*, pp. 451 ff.

২. Brigg, *Ferishta*, vol. I, pp. 149-50 ; Hertel, *op. cit* , pp. 362 ff.

৩. C. Hooykaas, *Tantri Kamandaka*, Bibliotheca Javanica, no. 2, Introd., p. 5.

৩ক. *JGIS* XV, pp. 32 ff.

৪. *Tantri Kamandaka*, p. 5.

৫. Juynboll, *Supplement* I, pp. 244 ff.

৬. Van der Tuuk, *KBNWdb*, II, p. 578.

৭. *JRAS*, n. s., XIII, p. 45.

৮. ঐ।

৯. Juynboll, *op. cit.*, pp. 239 ff.

১০. *BKI* 121 (1965) pp. 356 ff.

১১. Ed. Sharada Rani, *Ślokāntara*, Notes, pp. 47, 115, 125, 126, 138, 186, 219, 234, 336, 339 etc.

১২. *Op. cit.*, p. 7.

১৩. এ. ভেঙ্কটসুব্বিয়া *On the titles Pañcatantra and Tantrākhyāyikī* নামক একটি প্রবন্ধে [*IHQ* 13 (1937)] এই নামগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

১৩ক. শ্রীরাঢ় খণ্ডের।

১৪. হুইকাশ, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১৪।

১৫. Keith, *History of Sanskrit Literature*, p. 361.

১৫ক. Cosquin, Le Prologue-Cadre des Mille et une Nuits in Etudes Folkloriques,

Recherches sur les Migrations des Contes Populaires et leur Point de Depart, Paris, 1922 pp. 265-348; also Przyluski in *JA* 1924 pp 101 ff.; C. Hooykaas, *JGIS*, XV, p 32.

১৬. *The Thousand and one Nights*, vol. III, p. 676. লেন কর্তৃক মূল আরবী হইতে অনূদিত।

১৭. ঐ, পৃঃ ৬৮২। তুলনীয় *JRAS*, 1924, pp. 353 ff. ; ঐ, ১৯২৬, পৃঃ ১ হইতে।

১৮. হুইকাশ, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১২-৬১।

১৯. ঐ, পৃঃ ৬২-৭৯।

২০. কর্মচারীবিশেষ।

২১. তুলনীয় পঞ্চতন্ত্র ১।২।

২২. হুইকাশ, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ৮০-৯৫।

২৩. তুলনীয় হিতোপদেশ ২।১।

২৪. *Tjandi Djago*, p. 67. ফটো সংখ্যা ৬৯ এবং ৭০।

২৫. হুইকাশ, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ৯৬-১০৭।

২৬. ঐ, পৃঃ ১১৩-১৭। তুলনীয় হিতোপদেশ ৪।২ ; কথাসরিৎসাগর, টনি কৃত অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৭ ; পঞ্চতন্ত্র, কীলহর্ণের সংস্করণ, ১।১৩; দ্রষ্টব্য *BKI*, 1904, pp. 292-3; তুলনীয় *TBG* 1894 pp. 27 ff., 127 ff.

২৭. Brandes, *op. cit.*, p. 70.

২৮. Krom, *Borobadur* (1927), vol. I, p. 177.

২৯. তুলনীয় কথাসরিৎসাগর, টনি কৃত অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪ ; পঞ্চতন্ত্র, কীলহর্ণের সংস্করণ ১।৯ ; হুইকাশ, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১১৯-২১।

৩০. হুইকাশ, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১২১ হইতে ; হিতোপদেশ ৪।৭ ; পঞ্চতন্ত্র, কীলহর্ণের সংস্করণ ১।৭ ; তুলনীয় কথাসরিৎসাগর, টনি কৃত অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩১।

৩১. Juynboll, *Supplement* I, p. 245.

৩২. ঐ, পৃঃ ২৪১।

৩৩. হুইকাশ, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১২৮-৩১।

৩৪. *BEFEO*, XVII, pp. 99-100 ; *IHQ* VII, pp. 516 ff.

৩৫. Juynboll, *op. cit.*, p. 241.

৩৬. হুইকাশ, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১৩২-১৪৫।

৩৭. Juynboll, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ২৪১।

৩৮. ঐ, ২৪৫।

৩৯. হুইকাশ, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১৩৬-৩৯।

৪০. মহাভারত, ৩।১২২-২৫ ; ১২।৩৪২ ; ১৪।৯। এই কাহিনীটি কোন কোন পুরাণেও বর্ণিত আছে।

৪১. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ঠাকুরমার ঝুলি।

৪২. হুইকাশ, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১৪৪-৪৭।

৪৩. ঐ, পৃঃ ১৪৬-৪৯।

৪৪. ঐ, পৃঃ ১৪৮-৫১।

৪৫. হিতোপদেশ ৩।২।

৪৬. হুইকাশ, ঐ পৃঃ ১৫০-৫৩।

৪৭. কীলহর্ণের সংস্করণ, ১।২২।

৪৮. হুইকাশ, ঐ পৃঃ ১৫২-১৬১ ; তুলনীয় *IHQ*, 10, p. 109.

৪৯. *Tjandi Djago*, pp. 68-69 ; photo no. 71, 72.

৫০. হুইকাশ, ঐ পৃঃ ১৬২-৬৭ ।

৫১. O'Connor, *Folk Tales from Tibet*, pp. 78 ff.

৫২. Ivans, *Studies in Religion, folklore and Custom in British North Borneo and Malay Peninsula*, pp. 273-74.

৫৩. *BKI*, VI, II, p. 109. Cf. Gonda, *De Letterkunde van de Indische Archipel*, p. 13.

৫৪. *TBG* 37 (1894) pp. 42 ff., 135 ff. Cf. *Ibid* (1900) p. 383.

৫৫. Brandes, *Tjandi Djago*, pp. 70-71, photo no. 65 and 64.

৫৬. হুইকাশ, ঐ পৃঃ ১৬৬-৬৭ । তুলনায় পঞ্চতন্ত্র, কীলহর্ণের সংস্করণ, ১।১৫ ।

৫৭. হুইকাশ, ঐ পৃঃ ১৬৮-১৭১ ।

৫৮. ঐ, পৃঃ ১৭০-৭৩ ; তুলনীয় *IHQ*, 10, pp. 109 ff.

৫৯. *TBG* 37 (1894) pp. 37-40, 133 ; তুলনীয় ঐ, 80, পৃঃ ৩৬১ হইতে ; *BKI*, 1894 pp. 713-14 ইত্যাদি।

৬০. *Linguistic Survey of India*, vol. III, pt. 3, pp. 226, 233 ; also cf. Mrs. Rafy's *Folk Tales of the Khasis*, 1920, pp. 81-84.

৬১. *Monumental Java*, 1912, pp. 220-21 ; Maxmüller, *Chips from a German Workshop* IV, pp. 145 ff., quoted by Scheltema.

৬২. হুইকাশ, ঐ, পৃঃ ১৭২-৭৫ ।

৬৩. ২।১০ ।

৬৪. কীলহর্ণের সংস্করণ, ১।২ ।

৬৫. টনি কৃত অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৬ ।

৬৬. য়ুইনবলের *Supplement* II, p. 398.

৬৭. হুইকাশ, ঐ পৃঃ ১৭৪-৭৭ ; তুলনীয় *IHQ* 7, pp. 518 ff.

৬৮. হুইকাশ, ঐ পৃঃ ১৭৬-৭৯ ।

৬৯. হুইকাশ, ঐ পৃঃ ১৭৮-১৮৭ ।

৭০. ঐ, পৃঃ ১৮৬-৮৯ ।

৭১. ২।৮ ।

৭২. কীলহর্ণের সংস্করণ, ১।৬ ।

৭৩. হুইকাশ, ঐ পৃঃ ১৮৮-১৯১ ।

৭৪. টনি কৃত অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৭ ।

৭৫. পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ১।১৪ ।

৭৬. ৪।৩ ।

৭৭. Cf. *BKI*, 1904, pp. 299-300 ; *JRAS*, n. s., 13, p. 45.

৭৮. হুইকাশ, ঐ পৃঃ ১৯২-২০১ ; তুলনীয় *IHQ* 10, p. 110.

৭৯. এই কাহিনীটি মালয় হিকায়ৎ বয়ন বুদিমানেও বিবৃত হইয়াছে । দ্রষ্টব্য *TBG*, 41 pp. 460-61

৮০. Juynboll, *Supplement* II, p 115.

৮১. Gonda, *op. cit.*, p. 2.

৮২. ঐ।

৮৩. হিতোপদেশ, ১।৩।

৮৪. *TBG*, 37 (1894) pp. 44-45.

৮৫. ঐ, পৃঃ ৪৯।

৮৬. *BKI*, 7th series VI, p. 83.

৮৭. ৪।৬।

৮৮. *BKI*, 7th series VI, p. 88.

৮৯. ঐ, পৃঃ ৬২।

৯০. ১।৪।

৯১. জাতক নং ৫৭।

৯২. জাতক নং ২২৪।

৯৩. জাতক নং ২০৮।

৯৪. *TBG*, XLII (1900) pp. 356 ff. , also *Ibid* XXXVII (1894) pp 39, 48.

৯৫. Pigeaud, *Java in the 14th Century* IV p. 147.

৯৬. *BKI*, 7. VI pp. 439 ff.

৯৭. তুলনীয় Gonda, *Letterkunde van de Indische Archipel*, 1947, p. 13

এ ক বিং শ অ ধ্যা য়

ইতিহাস ও কিম্বদন্তী সাহিত্য

এই অধ্যায়ে আমরা ইতিহাস এবং কিম্বদন্তী সাহিত্যকে তিন বিভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করিব, যথা (ক) কুলপঞ্জী ও অর্ধ পৌরাণিক কাহিনী (খ) শিলালেখ-তাম্রশাসন এবং (গ) ঐতিহাসিক সাহিত্য। প্রথমেই আমরা কতকগুলি কুলপঞ্জী ও অর্ধ পৌরাণিক সাহিত্যের আলোচনা করিব।

(ক) কুলপঞ্জী ও অর্ধ পৌরাণিক সাহিত্য

এই পর্যায়ের গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীন যুগের ঐতিহ্য সংগুপ্ত থাকা অসম্ভব নহে, কিন্তু উহাতে সন্নিবেশিত বিবরণগুলি এতই অকিঞ্চিৎকর এবং তাহার মূল্যও এত সামান্য যে উহাকে গ্রহণ করার সার্থকতা খুব অল্পই। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা বিপজ্জনকও বটে। সুতরাং উহা কেবলমাত্র নিঃসন্দেহে প্রমাণিত ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপূরক হইতে পারে; উহার স্বকীয় বিশেষ কোন মূল্য নাই। যবদ্বীপের বিখ্যাত অজি-শক নামক গ্রন্থটি এই পর্যায় গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থখানি বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে উইনটার সম্পাদনা করিয়াছিলেন এবং ইহার কিয়দংশ র‍্যাফলস্ তাঁহার যবদ্বীপের ইতিহাসে অনুবাদ করিয়াছিলেন[১]। আমরা এই গ্রন্থ হইতে ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের যবদ্বীপে যাত্রার কিম্বদন্তী যে অংশে সন্নিবদ্ধ আছে কেবলমাত্র সেই অংশটুকুই এ স্থলে উদ্ধৃত করিব। ঐ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে :

"ক্লিঙ্গের[২] রাজা ২০০০০ পরিবারকে যবদ্বীপে প্রেরণ করিলেন। এই লোকগণ উন্নতি লাভ করিল এবং সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তাহারা ২৮৯ অব্দ পর্যন্ত অসভ্য অবস্থায় রহিল; এই সময় ভগবানের কৃপায় কারমা রাজা হইলেন এবং তিনি ১০০ বৎসর রাজত্ব করিলেন। এই সময়ের পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন বাসুকতি। রাজ্যের নাম ছিল বিরত (= বিরাট)। বাসুকতি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র মাঙ্গসপাতি রাজা হইলেন। পিতা এবং পুত্র ৩০০ বৎসর রাজত্ব করিলেন।

এই সময় অস্তিন (= হস্তিনা) নামক আর একটি রাজ্য গড়িয়া উঠিল। ইহা রাজা পুলশর কর্তৃক শাসিত হইত। পুলশরের পর তাঁহার পুত্র আধয়স রাজা হইলেন; আধয়সের পর তাঁহার পুত্র পণ্ডুদেবনত রাজা হইলেন। শেষোক্ত তিনজন রাজার রাজত্বকাল একত্রে

১০০ বৎসর ব্যাপী হইয়াছিল। ইহার পর জয়বয় স্বয়ং রাজা হইলেন। তিনি অস্তিন হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। আমরা যবদ্বীপের ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পড়িয়াছি যে দহের রাজগণ পুতচরিত্র পুলহ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেন। অজি শক গ্রন্থের এই লেখকও ঠিক একই প্রকারে এই রাজবংশগুলিকে ভারত যুদ্ধের বীরপুরুষগণের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। উপরে আমরা যে বিবরণ সন্নিবেশিত করিয়াছি তাহার পরবর্তী অধ্যায়ের কিঞ্চিত বিবরণ পরিবেশন করিয়াছেন কিয়ঙ্গ অদিপতি আদিমঙ্গল। আমরা পূর্বে জয়বয়ের রাজত্বকালের কথা বলিয়াছিলাম ; এ স্থলে আবার সেই রাজত্ব কালেরই জের টানিতেছি[৩]।

"যখন অস্তিনার প্রবু জয়বয় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন তখন তাঁহার পুত্র এবং বংশধরগণ, যেমন অমিজয়, জয় অমিসান, পাঞ্চদ্রিয় এবং কস্থমচিত্র রাজা হইলেন। শেষোক্ত রাজার রাজত্বকালে সম্ভবতঃ রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল, অথবা দেশের নাম পরিবর্তিত হইয়াছিল। কারণ ইহাকে তখন কুজরৎ বা গুজরত বলা হইত। তখন এই ভবিষ্যদ্বাণী হইয়াছিল যে এই দেশের পতন হইবে অথবা উহা একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। তখন রাজা স্থির করিলেন যে তিনি তাঁহার পুত্রকে যবদ্বীপে প্রেরণ করিবেন। তাঁহার নিকট অজি শক নামক লিখিত গ্রন্থ ছিল ; উহা তাঁহার বংশে রক্ষিত ছিল। তিনি ঐ গ্রন্থটি তাঁহার পুত্রকে দিলে পুত্র ৫০০ অনুচর সহ সেই দ্বীপের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।····· তাঁহারা ঐ দ্বীপের যে অংশ মতারেম নামে খ্যাত সেই অংশে উপনীত হইলেন। তখন প্রধান পুরোহিত অজি শকের বই খুলিয়া একটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করিলেন যে যবদ্বীপ প্রবু জয়বয়ের বংশধরগণের উত্তরাধিকারে আসিবে। তিনি সমগ্র দলটিকে আহ্বান করিয়া সমাগত যুবরাজকে দেশের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহার নাম হইল ব্রোবিজায় সবেল চাল। তখন রাজধানীর নাম হইল মন্দঙ্গ কমুলন।

রাজা তখন রাজধানীর উন্নতি-বিধানে তৎপর হইলেন এবং ইহা ৫২৫ অব্দে একটি বিশালায়তন সহরে পরিণত হইল। এই সময় হইতে জাভা একটি বিখ্যাত রাজ্যরূপে পরিগণিত হইল এবং গুজরাত ও অন্যান্য দেশের সহিত বিপুল ব্যবসা বাণিজ্য চলিতে লাগিল।"

জাভার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বৃত্তান্ত নিম্নলিখিত বিবরণীতে সন্নিবেশিত হইয়াছে ; উহাতে ঐ দ্বীপের প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে এক প্রকার পৌরাণিক বংশপঞ্জী[৪] উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই বংশ তালিকায় আমরা চন্দ্রবংশের কয়েকজন বীরপুরুষের নাম দেখিতে পাইতেছি ; উহা মহাভারতের প্রভাবের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। রামায়ণের মহানায়িকা দেবি সিন্তর উল্লেখও এই প্রসঙ্গে করা হইয়াছে। এই কাহিনীতে বলা হইয়াছে যে যবদ্বীপে কোন প্রাণী সৃষ্ট হইবার পূর্বে ঐ দ্বীপের অধিষ্ঠাতা দেবতা ছিলেন বিষ্ণু ; তাঁহার পরে অধিষ্ঠাতা দেবতা হইলেন ব্রহ্মার পৌত্র এবং জালপ্রাসির পুত্র ত্রিত্রেস্ত। তিনি গুনুঙ্ সেমিরুর (সংস্কৃত সুমেরু) সানুদেশে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিলেন ; উহার নাম হইল গিলিঙ্গবেশি। তাঁহার পুত্রদের নাম ছিল মনুমনস এবং মনুমদেব। সিন্ত এবং লন্দপ নাম্নী দুইজন অপূর্ব সুন্দরী কন্যা তাঁহার রাজসভায় ছিলেন ; তাঁহাদের অলৌকিক সৌন্দর্যের কথা শুনিয়া ক্লিঙ্গের বটুগুনুঙ্গ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে তিনি মৃত্যু বরণ করিলেন এইরূপে

ক্লিঙ্গের অসম সাহসী বীরপুরুষ বটুগুনুঙ্গ গিলিঙ্গবেশির অধিকর্তা হইলেন এবং সেখানে ১৪০ বৎসর রাজত্ব করিলেন। বিষ্ণু অবশেষে তাঁহাকে ২৪০ অব্দে হত্যা করিয়া তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করিলেন। অবশেষে ঐ শূন্য সিংহাসন অধিকার করিলেন ক্লিঙ্গ দেশের গুতাক ; তিনি ছিলেন বটর গুরুর আশ্রিত। তিনি ৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ২৯০ অব্দে তাঁহার পুত্র রাদেন সবেল রাজা হইলেন ; তিনি ২০ বৎসর রাজত্ব করিলে পর গুতম রাজা হইলেন। তিনি গিলিঙ্গবেশি হইতে অস্তিনতে এবং পরে অস্তিন হইতে লগ্রেস্তিনে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। ইত্যবসরে গুনুঙ্গ জলির রাদেন দস বিরিয় নামক একজন ব্রাহ্মণ-পুত্র জাভার একটি পর্বতের সানুদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার পুত্র দাস বাহু ৩১০ অব্দে অস্তিন অধিকার করিল। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র সুঅনন্তন সুযোগ্য ভাবে দেশের শাসন কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাহার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল, কিন্তু মাতা প্রসবকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

তখন নবজাতককে স্তন্যদান করিতে পারে এইরূপ একজন স্ত্রীলোককে খুঁজিয়া বাহির করার প্রয়োজন দেখা দিল। এই সময়ে ত্রিত্রেস্তের পৌত্র পুলসরের স্ত্রী অম্বুসরি তাহার শিশুপুত্র অবিয়সকে (=ব্যাস) লইয়া পরিভ্রমণ করিতেছিলেন ; তখন তাঁহার সহিত সুঅনন্তনের সাক্ষাৎ হইল। সুঅনন্তন তখন নবজাতকের জন্য একজন ধাত্রী অনুসন্ধান করিতেছিলেন। অম্বুসরি কিন্তু একটি প্রতিশ্রুতি প্রতিপালিত না হইলে স্তন্যদান করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে রাজা অস্তিনর রাজ্য অম্বুসরিকে প্রদান করিবেন এই প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে ; অম্বুসরি এই রাজ্য অবিয়সকে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে প্রদান করিবেন। রাজা এই চুক্তিতে সম্মত হইলেন এবং তদনুযায়ী অবিয়স ৪১৫ অব্দে সিংহাসনে আরোহন করিলেন। সুঅনন্তনের পুত্র দেবব্রত কুম্বিনের রাজা হইলেন। অবিয়স বৃদ্ধকালে বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার তিন সন্তান হইল ; ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলের অন্ধ দ্রেষ্‌তরত (ধৃতরাষ্ট্র)। অপর দুইজনের মধ্যে পন্দু দেবনত পরম সুন্দর পুরুষ ছিলেন এবং সর্বকনিষ্ঠ রম বিদর ছিলেন খঞ্জ। দ্বাদশ বর্ষ রাজত্ব কালের পর অবিয়স শাসনদণ্ড তাঁহার সুদক্ষ দ্বিতীয় পুত্র পন্দুর করে সমর্পণ করিলেন। পন্দু কালক্রমে দেবী কুন্তীকে বিবাহ করিলেন। দেবী কুন্তীর গর্ভে তিনজন পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন, যথা কুন্তদেব, সেন এবং জিনাক এবং দ্বিতীয়া মহিষী মদ্রিনের গর্ভে নকুল এবং সদেব (সহদেব) জন্মগ্রহণ করিলেন। পন্দু মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় এবং তাঁহার পুত্রগণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় দ্রেষ্‌তরত তাঁহাদের অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন। দ্রেষ্‌তরত রাজ্যটি পন্দুর পুত্রগণকে প্রত্যর্পণ না করিয়া উহা তাঁহার স্বকীয় পুত্র সুযুধনের করে সমর্পণ করিলেন। এইরূপে সুযুধন অস্তিনর রাজা হইলেন। পন্দুর পুত্রগণকে অমের্ততে বসতি স্থাপন করিতে বলা হইল ; সেই স্থল হইতে তাঁহারা অন্ততঃ অর্ধেক রাজ্য দিতে হইবে এই দাবী করিয়া কৃষ্ণকে পাঠাইলেন। সুযুধন এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না ; সুতরাং দ্রেষ্‌তরতের পুত্রগণের বিরুদ্ধে বিখ্যাত ব্রত যুধ (=ভারত যুদ্ধ) আরম্ভ হইল ; এই যুদ্ধে সুযুধন যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

এইরূপে পুনতুদেব ৪৯১ অব্দে রাজা হইলেন, কিন্তু তিনি দুই বৎসর পরেই শাসনদণ্ড অভিমন্যু-পুত্র পরিকিসিতের করে সমর্পণ করিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র উদয়ন রাজা হইলেন। ইহার পরে জয় দের্ম এবং তৎ-পুত্র জয়মিসন অস্তিনর সিংহাসনে আরোহন করিলেন। এই সময় মহামারী আরম্ভ হইলে জয় মিসনের পুত্র জয় পুরুস মিলবে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। এই স্থলে তাঁহার বংশধরগণ রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিস্থর চম্পক মেন্দঙ্‌ কমুলনে গমন করিয়া সেখানে পণ্ডিতরূপে বসবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরবর্তী তৃতীয় রাজা ছিলেন অজি জয় বয়; তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্যের নাম রাখিলেন পুর্ব চিরিত। কথিত আছে যে বটর গুরুর (=ভটার গুরু) আদেশে তিনি ৭০১ অব্দে ব্রত যুধ রচনা করেন। অতঃপর তাঁহার পুত্র সলাপর বাত ৭৫৬ অব্দে রাজা হইলেন। সলাপর বাত মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র জয় লঙ্কর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিবার পুর্বে তিনি তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেন। প্রথম পুত্র সুব্রাত জঙ্গলের রাজা হইলেন; দ্বিতীয় পুত্র পর জর হইলেন কেদিরির অধীশ্বর। জাত বিদ ছিলেন তৃতীয় পুত্র; তিনি সিঙ্গ সরির রাজা হইলেন। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র সুবিদ পাইলেন ঙ্গরাবন[৫]।

এই সমস্ত কাহিনীর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা বা তথ্য সংগুপ্ত থাকা অসম্ভব নহে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার উপর সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে নির্ভর করাও বিপজ্জনক। কারণ এই সমস্ত কাহিনীর মধ্যে কোথায় উপকথা বা রূপকথার জগৎ শেষ হইয়াছে এবং কোথায় ঐতিহাসিক বা অর্ধ ঐতিহাসিক জগতের আরম্ভ হইয়াছে তাহার সীমারেখা নির্ণয় করা একান্তই দুঃসাধ্য কিংবা অসম্ভব।

এই কথা স্মরণে রাখিয়া কয়েকটি বিষয়বস্তুর আলোচনা করা যাউক। ডঃ হ্যাজো বলিয়াছেন[৬] যে মহাকাব্যের নায়কগণকে রাজবংশের পুর্বপুরুষরূপে চিত্রিত করিবার যে-চেষ্টা বাবাদ্‌ বা ঐতিহাসিক রচনাগুলিতে পরিলক্ষিত হয় তাহা মজপহিত যুগে কখনো আশীর্বাদ লাভ করে নাই। শাসক বংশগুলির অঙ্গে আভিজাত্যের শীলমোহর লাগাইবার জন্য এই প্রচেষ্টা হইয়াছিল মজপহিতোত্তর যুগে। এই সমস্ত বংশপঞ্জী, রাজা এবং রাজ্যের নামের তালিকা সঙ্কলনের ভার যাহাদের উপর অর্পণ করা হইয়াছিল তাঁহাদের বিষয়-পরম্পরার পৌর্বাপর্য জ্ঞান আদৌ ছিল না; সুতরাং তাঁহারা ঘটনার কোন অংশ বিচ্ছিন্ন পাইলে উহাতে আজগুবী তথ্যের প্রলেপ লাগাইয়াছেন[৭]। কালক্রমে প্রাচীন ইতিহাসের পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ হইল। ডঃ হ্যাজো বলিয়াছেন[৮] যে উহার প্রাচীনতম অংশে এখনো উপকথামূলক বিবরণ রহিয়া গিয়াছে এবং যদিও স্থলে স্থলে ঐতিহাসিক ঘটনার ক্ষীণ চিহ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে তবুও নাম ব্যতীত আর কোন বিষয়ে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য। ইহা অতীব সত্য কথা।

(খ) শিলালেখ ও তাম্রশাসন

আমরা পুর্বেই বলিয়াছি যে যবদ্বীপের প্রাচীন অনুশাসনগুলি দক্ষিণ বা উত্তর ভারতের লিপিতে লিখিত হইয়াছে। ইহা লক্ষনীয় বিষয় যে এই অনুশাসনগুলির রচনায় ভারতীয়

প্রভাব অনেক স্থলে বিদ্যমান। ভারতবর্ষ এবং তাহার দক্ষিণপূর্ব এসিয়ার উপনিবেশগুলির অনুশাসনগুলির মতই প্রাচীন যবদ্বীপের অনুশাসনগুলির প্রারম্ভে সাধারণতঃ লেখা আছে "ওম্ স্বস্তি" বা "সিদ্ধম্"। উহার পরেই অনুশাসন রচনার তারিখ দেওয়া হইয়াছে। এই স্থলে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ৭৭২ শকাব্দের একটি শিলালিপির আরম্ভে লেখা আছে "স্বস্তি শকবর্ষাতীত ৭৭২ আষাঢ় মাস তিথি দ্বিতীয় সুক্লপক্ষ তু. প. আ. বার৯।" বানানগুলির বিকৃতি মার্জনীয়। আর একটি শিলালেখে প্রারম্ভে লেখা আছে: "ওম্ নমশ্‌শিবায় নমো বুদ্ধায়।" ইহার পরেই তারিখটি দেওয়া হইয়াছে "স্বস্থা শ্রী সঞ্জয় বর্সা ৬৯৪ পোস্ত মাস তিথি তৃতীয় কৃষ্ণ পক্ষ .....[১০]"। ইহার সহিত আমরা তুলনা করিতে পারি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উদয়গিরি গুহার শিলালেখ; উহার আরম্ভে লেখা আছে "সিদ্ধম্॥ সম্বৎসরে ৮০, ২ আষাঢ় মাস শুক্লে(ঐ)কাদশ্যাম[১১]।" গোপ রাজের স্তম্ভ-লেখটিও অনুরূপ[১২]। বাংলাদেশের সেন রাজগণের অনুশাসনগুলির অন্তে তারিখ দেওয়া আছে। সংস্কৃত বা প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় রচিত অনুশাসনগুলির রচনা-শৈলী অনেক সময় ভারতীয় অনুশাসনগুলির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যবদ্বীপের ভূমিদান সংক্রান্ত অনুশাসনগুলির অন্তে সাধারণতঃ যে শপথ বাক্য দেখা যায় তাহার অনুরূপ শপথ বাক্য কলিঙ্গ অঞ্চলসহ দক্ষিণ ভারত এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থলে প্রচলিত ছিল।

যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের অনেক রাজার নাম সংস্কৃত রীতিতে লিখিত। পশ্চিম যবদ্বীপের প্রথম রাজা পূর্ণবর্মন হইতে আরম্ভ করিয়া যবদ্বীপের শেষ উল্লেখযোগ্য হিন্দু রাজা গিরীন্দ্র বর্ধন রণবিজয় পর্যন্ত অনেক রাজারই পোষাকী সংস্কৃত নাম ছিল। যথেচ্ছভাবে দৃষ্টান্ত চয়ন করিতে গিয়া আমরা কাঞ্চনের তাম্রশাসনলিপিতে (গেড়ঙ্গন-লিপি, ৭৮২ শকাব্দ) পাইতেছি: শ্রীমহারাজ শ্রীভুবনেশ্বর বিষ্ণু সকালাত্মক দিগ্বিজয় পরাক্রমোতুঙ্গদেব লোকপল[১৩]। বানানে ভুল থাকিলেও নাম এবং নামের বিশেষণগুলি পরিপূর্ণ ভারতীয় রীতির স্বাক্ষর বহন করিতেছে। আর একটা নাম দিতেছি: উহাতে স্বদেশী এবং সংস্কৃত নাম পাশাপাশি বিদ্যমান। সঙ্গসঙ্গ তাম্রশাসনে পড়িতেছি: শ্রি মহারাজ রকেই বটুকুর দ্যহ্‌বলিতুঙ্গ্‌ শ্রী ধর্মোদয় মহাসম্বু[১৩]। এ স্থলে বলিতুঙ্গ হইল মহারাজের স্বদেশী নাম এবং সংস্কৃত নামটি হইল মহাশম্ভু। মনে হয় যে রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার সময় রাজারা এই প্রকার সংস্কৃত নাম পরিগ্রহণ করিতেন। আমরা পররতন নামক গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় পাইতেছি: "সির রঙ্গবুনি অভিষেক বিষ্ণু বর্ধন করতুন্ ইর" অর্থাৎ রঙ্গবুনি রাজা হইয়া বিষ্ণুবর্ধন নাম পরিগ্রহণ করিলেন। তবে একথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে মধ্য যবদ্বীপের প্রাচীন রাজাদের সংস্কৃত পোষাকী নাম থাকিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা কেবলমাত্র স্বদেশী নামই ব্যবহার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে ককের ৮০১ শকাব্দের তাম্রশাসনে রাজার নাম পড়িতেছি: "শ্রী রাজ রকে কয়ুবঙ্গি[১৪]; আবার তাঁহারই ৮০৪ শকাব্দে উৎকীর্ণ রম্বি-তাম্রশাসনে পড়িতেছি[১৫]: "শ্রীমহারাজ রকে কয়ুবঙ্গি শ্রীসজ্জনোৎসবতুঙ্গ"। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বদেশী নামগুলি বিশিষ্ট গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে, যেমন রাজা সিণ্ডোক, ঐরলঙ্গ, কেন আঙ্‌রোক, হয়ম ভুরুক প্রভৃতি। রাজমাতা, রাজমহিষী, রাজ-

কন্যাগণও সংস্কৃত নামে অভিহিতা হইতেন। যথা, ঈশানতুঙ্গবিজয়া, মহেন্দ্রদত্তা বা গুণপ্রিয়-ধর্মপত্নী, জয়বর্ধনী, গায়ত্রী, ত্রিভুবনা, সুহিতা ইত্যাদি। অনুশাসনলিপিগুলি পড়িলে উহার সাধারণ শ্রেণীর লোকের নামের অরণ্যে অজস্র স্বদেশী নাম এবং কিছু কিছু সংস্কৃত নাম পরিদৃষ্ট হইবে।

সম্ভবতঃ সংস্কৃত নাম উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যেই বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। যবদ্বীপীয় এবং সংস্কৃত শব্দের মিশ্র নামও বিদ্যমান ছিল, যেমন, বেকস্ ইঙ্গ সুক (সুখের পরাকাষ্ঠা), তঞ্জুঙ্গ-পুর (কমল-নগর), জয়-কৎবঙ্গ (বিজয়-সম্মান) ইত্যাদি। এই প্রকার সংস্কৃত নাম বাবাদ বা কিম্বদন্তী সাহিত্যেও প্রতিফলিত হইয়াছে। এই নামগুলি কখনো একটি সংস্কৃত শব্দে রচিত, কখনো বা উহা একাধিক শব্দের সংযুক্ত শব্দগুচ্ছ; কোথাও বা উহা সংস্কৃত-যবদ্বীপীয় শব্দের সংমিশ্রণ। কোথাও আবার সংস্কৃত শব্দগুলি যবদ্বীপীয় ভাষায় বিকৃতরূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে, যেমন দর্মসেতিয়বন = ধর্ম সত্যবান ইত্যাদি[১৬]। রাজকর্মচারীদের সরকারী উপাধি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশজ, যেমন পংকুর, তবন, তিরিপ, রক-রকরিয়ণ-রকরয়ান, হিনো, হলু, সিরিকন, কনুরুহন, দেমুঙ্গ, মকুতুর, জুরু প্রভৃতি। যে কোন যবদ্বীপীয় অনুশাসনলিপি পড়িলেই ইহার যথার্থতা উপলব্ধি হইবে। তবে সংস্কৃত উপাধিও একেবারে বিরল নহে। যেমন—মন্ত্রী, পতি, ধর্মাধ্যক্ষ, অধিকার, অধিরাজ, অধিপতি, পরমেশ্বরী প্রভৃতি। এই যবদ্বীপীয় সরকারী উপাধির প্রাচুর্য সর্বপ্রাচীন অনুশাসনলিপিগুলি হইতেই পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহা হইতে এই অনুমান করাই স্বাভাবিক যে যবদ্বীপে হিন্দুগণের আগমনের পুর্ব হইতেই সেখানে একপ্রকার স্বদেশী (সম্ভবতঃ গোষ্ঠিমূলক Tribal) শাসনতন্ত্র বিদ্যমান ছিল।

সাধারণতঃ অনুশাসনলিপিগুলির প্রারম্ভে থাকিত স্বস্তিবাচন; কোথাও কোথাও প্রারম্ভে থাকিত সংস্কৃত আশীষবহ সংস্কৃত শ্লোক। ইহার পরে থাকিত উক্তলিপি উৎকীর্ণ হওয়ার তারিখ। সম্বৎ ছিল শকাব্দে, কিন্তু সঞ্জয়াব্দও দুইটি অনুশাসনলিপিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই তারিখ বর্ণনায় ভারতীয় মাস, বার, গ্রহ নক্ষত্রাদির সংস্থান প্রভৃতি বর্ণিত হইত; আবার যবদ্বীপীয় পঞ্চাহ, ষষ্ঠাহ, বুকু প্রভৃতিরও উল্লেখ থাকিত। রাজকীয় অনুশাসন হইলে ইহার পরই বলা হইত যে রাজা···এর আজ্ঞা বিশিষ্ট রাজকর্মচারীবৃন্দ কর্তৃক পরিগৃহীত হইয়া উহা অধস্তন কর্মচারীদের নিকট প্রেরণ করা হইল। ইহার পর থাকিত "সম্বন্ধ" অর্থাৎ যে-বিষয় উপলক্ষ্য করিয়া অনুশাসনলিপিটি উৎকীর্ণ হইল তাহার বিবরণ। আবিষ্কৃত অনুশাসনলিপিগুলির অধিকাংশই হইল ভূমিদান বা দেবোত্তর সংক্রান্ত; ইহার মধ্যে রাজনৈতিক অনুশাসনলিপির সংখ্যা ছিল একান্তই কম। ভূমিদান সংক্রান্ত অনুশাসনলিপি হইলে সাধারণতঃ জমির পরিমাণ ও উহার চৌহদ্দি বর্ণিত থাকিত। দেবোত্তর সম্পত্তি হইলে ইহার অধিকার, এই সম্বন্ধে "মঙ্গিলল দ্রব্য হজি"র কর্তব্য প্রভৃতি নির্ধারিত থাকিত। কেহ রাজাদেশ যদি ভবিষ্যতে অগ্রাহ্য করেন তাহা হইলে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মকুতুর প্রভৃতি অভিশম্পাত বাণী বর্ষণ করিতেন। কখনো কখনো এই উপলক্ষ্যে হিন্দু দেবদেবী প্রেতাত্মা প্রভৃতিকে সাক্ষ্য মানা হইত; এই অনুষ্ঠানে কখনো কখনো আবার মুর্গীর দেহাঙ্গ প্রস্তরখণ্ডে চুর্ণ করা

হইত। এই অনুষ্ঠানে যাহারা সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকিতেন তাহাদিগকে বস্ত্র ও পসেকসেন বা সাক্ষী হওয়ার টাকা পয়সা দেওয়া হইত এবং এই উপলক্ষ্যে "লিখিত ভুক্তি" অর্থাৎ দলিল সম্পাদন করিয়া সামাজিক ভোজন হইত। ভূমিদান বা দেবোত্তর ব্যতীত জয়-পত্র বা জয়সোঙ্গ[১৭], খেয়া নৌকার লোকদের বিশেষ অধিকার প্রদান[১৮] ইত্যাদি ধরণের অনুশাসনলিপিও পাওয়া গিয়াছে। জয়সোঙ্গ শব্দটি সম্ভবতঃ জয়পত্র দ্বারা রক্ষা করাকে বুঝায়; সোঙ্গ শব্দের অর্থ ছত্র বা ছাতা। অনুশাসনলিপিগুলি অধিকাংশই ধর্মমূলক হওয়ায় ইহার মধ্য হইতে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সংবাদ আহরণ করা খুবই কষ্টসাধ্য। তবুও অনেক ক্ষেত্রে ইহার মধ্যে রাজার নাম এবং পদমর্যাদানুযায়ী রাজকর্মচারীগণের নাম বিন্যস্ত থাকায় ইহার দ্বারা যবদ্বীপীয় ইতিহাস রচনার পথ অনেকটা সুগম হইয়াছে। তবে যবদ্বীপে কোন ব্যক্তির জীবনে বিশিষ্ট কোন ঘটনা ঘটিলে, (যেমন—বিবাহ, উচ্চপদ লাভ) তাহার নাম পরিবর্তন হইতে পারিত। ইহার দ্বারা আবার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে চিনিবার পক্ষে অনেক সময় জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে; কারণ একই ব্যক্তি বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন নাম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। তবে রাজনৈতিক সংবাদ যে একেবারেই আহরণ করা যায় না তাহা নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ঐরলঙ্গের কলিকাতা শিলালিপি[১৯] এবং আরো কয়েকটি অনুশাসনলিপির উল্লেখ করিতে পারি। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা নগণ্য।

যবদ্বীপে তাম্রশাসনলিপিগুলির অপূর্ব মর্যাদা ছিল; বিশেষতঃ যেগুলি রাজানুগ্রহে প্রদত্ত হইয়াছিল। এইগুলিকে 'পুসক' বা বংশের উত্তরাধিকার হিসাবে সযত্নে রক্ষা করা হইত এবং বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে পুজা করা হইত। এই পুজা করার সুস্পষ্ট উল্লেখ কোন কোন অনুশাসনলিপিতে রহিয়া গিয়াছে। খেয়া নৌকার অনুশাসনলিপিতে বলা হইয়াছে যে ইহা পুজা করার উপলক্ষ্যে মোরগের লড়াই, জুয়াখেলা, বাদ্য সহযোগে সঙ্গীত পরিবেশিত হইতে পারিবে[২০]। দীর্ঘকাল পরেও এই সমস্ত অনুশাসনলিপির কোন কোনটি জনগণের সম্পত্তি রক্ষার সহায়ক হইয়াছিল তাহার প্রমাণ রহিয়াছে[২১]।

(গ) ঐতিহাসিক সাহিত্য

যবদ্বীপে কয়েকটি ঐতিহাসিক গ্রন্থও বিদ্যমান। যবদ্বীপের অধিবাসীদিগকে ঐতিহাসিক রচনায় কে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল তাহা আজ বলা দুঃসাধ্য; কারণ ভারতীয়গণ নিজেরাই এই সাহিত্য রচনার বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। ইহা অসম্ভব নহে যে চীনারা এই সাহিত্য রচনার আদর্শ যবদ্বীপবাসীদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিল, কারণ ভারতবর্ষ ও যবদ্বীপের এক সহস্র বৎসরের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের যুগে এই সাহিত্য বিকাশ লাভ করে নাই, কিন্তু চীন এবং যবদ্বীপের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংস্পর্শ আরম্ভ হওয়ার পর হইতেই এই সাহিত্যের বিকাশলাভ পরিদৃষ্ট হয়। ইহা একান্ত আকস্মিক ঘটনা নাও হইতে পারে। অবশ্য ইহাও অসম্ভব নহে যে যবদ্বীপের অধিবাসীরা নিজেরাই এই সাহিত্যের বিকাশের জন্য দায়ী, যবদ্বীপের বাহিরে মালয়েসিয়াতেও ঠিক একই প্রকার ঘটনা ঘটিয়াছে। মালয়েসিয়ার অপর একটি অঞ্চলে

ঐতিহাসিক রচনার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় যবদ্বীপের কয়েক শতাব্দী পরে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুবিখ্যাত মালয় 'ঐতিহাসিক' রচনা সেজর মেলয়ু (মালয়বংশ পঞ্জী) লিপিবদ্ধ হয়। ইহাতে মালাক্কায় মালয় রাজ্য সংস্থাপনের বিস্তৃত কাহিনী পরিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে কথিত হইয়াছে যে ইস্কান্দার এবং একজন ভারতীয় রাজকুমারীর দূরবর্তী অধস্তন পুরুষগণ পালেম্বাঙ্গের সি-গুন্তঙ্গ পর্বতে তাঁহাদের প্রথম আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। মালয়-সুলতানগণ এই স্থলকেই তাঁহাদের আদি বাসভূমি বলিয়া মনে করেন। মালয়েসিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির যবদ্বীপের মতই নিজস্ব 'ইতিহাস' আছে। উত্তর সুমাত্রার পসেই, জোহোর, বোর্ণিওর কুটেই প্রভৃতি রাজ্যের আঞ্চলিক 'ইতিহাস' আছে। এই ইতিহাস রোমান্টিক আখ্যায়িকার ধরণে রচিত এবং ইহাতে জন্ম, বিবাহ, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ ইত্যাদির কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই সমস্ত আখ্যায়িকার আধুনিক অংশে অনেক নাম এবং ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায় যাহা অনেক সময় বৈদেশিক তথ্যাদি দ্বারা সমর্থিত হয়[২২]। তবে এই সমস্ত "ইতিহাস" রচনার কাঠামো অনেকটা যবদ্বীপের আধুনিক আঞ্চলিক "ইতিহাস" রচনার মতই। যবদ্বীপীয় ঐতিহাসিক সাহিত্যকে আমরা আরো দুইটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি: (১) মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক সাহিত্য এবং (২) আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক সাহিত্য।

প্রথমটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে প্রাচীন যুগের পূব-যবদ্বীপীয় আধিপত্যের শেষ পর্যায়ের ইতিহাস। এই যুগের ইতিহাসে সিঙ্গসরি এবং মজপহিত রাজ্যের ইতিবৃত্ত, উপনিবেশ স্থাপন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত বলিদ্বীপের ইতিহাস পরিবেশিত হইয়াছে। কোন কোন ঐতিহাসিক পটভূমিকা ঐরলঙ্গের রাজ্যকাল পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। যেমন, নাগরকৃতাগমে ভড়র কর্তৃক ঐরলঙ্গের রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত করণের কাহিনীটি। পররতনের মধ্যেও কেন আংগ্রোকের জীবনেতিহাসের মধ্যে ইতিহাসের সঙ্গে পুরাণের অলৌকিক কাহিনীর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। কেন আংগ্রোক ছিলেন সিঙ্গসরি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা (১২২২ খৃঃ), কিন্তু তিনি ব্রহ্মার পুত্ররূপে কীর্তিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সিঙ্গ-সরি-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় (১২৯৩), সুন্দ দেশের রাজকুমারী (কিডুঙ্ সুন্দ), বিদ্রোহীবীর রঙ্গলবে (আনুমানিক ১৩১০ খৃঃ) প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া রোমান্টিক ঐতিহাসিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বলিদ্বীপে উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপনেও আমরা অনেকটা ঐতিহাসিক ঘটনার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। এই সমস্ত গ্রন্থ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে বলিদ্বীপের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে; পুরাতন গ্রন্থকে নূতনরূপে পরিবেশনের চেষ্টা এবং স্থানীয় বংশের ইতিবৃত্তকে সুগ্রথিত করিবার উদ্যমও এই পর্যায়ের গ্রন্থের অন্যতম স্মরণীয় কীর্তি।

আধুনিক যুগের যবদ্বীপীয় ঐতিহাসিক সাহিত্যের মূল্যায়ন করিতে গেলে দেখিতে পাই যে ইহার সহিত মধ্যযুগের ইতিহাসের যথেষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে। আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার প্রাণকেন্দ্র ছিল মধ্য যবদ্বীপের মতরমে অবস্থিত মুসলমান রাজ্য, কিন্তু এই রাজ্যের সুলতানগণের আনুকূল্যে যে "ঐতিহাসিক" গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল তাহাতে ঘটিয়াছিল তথ্যাদির অসদ্ভাব। কারণ হিন্দুগণ যথাসম্ভব পুঁথিপত্র লইয়া বলিদ্বীপে চলিয়া গেলে যবদ্বীপে

ঐতিহাসিক রচনার তথ্যাদি দুর্লভ হইয়া উঠিল। সুতরাং মধ্য যবদ্বীপের সুলতানগণের দরবারী ঐতিহাসিকগণ ওয়েয়াঙ্ সাহিত্য, মহাকাব্য কাহিনী, ঐতিহাসিক কিম্বদন্তী এবং হিন্দু ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধন করিয়া যাহা পরিবেশন করিলেন তাহাই হইল মতরাম-বাবাদ। এই পর্যায়ের গ্রন্থাদি সম্প্রসারণ করিয়া সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। তবে এই সময়ের গ্রন্থে যখন সমসাময়িক ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তখন উহাতে আমরা ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিচ্ছায়া দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত যবদ্বীপে অনেক ব্যক্তিগত ডায়েরী বা প্রিম্বোনও আবিষ্কৃত হইয়াছে; কোন কোন বিষয়ে ইহার যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে[২৩]।

এইবার আমরা যবদ্বীপের অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলির বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব। আমরা প্রথমেই নাগরকৃতাগম নামক ঐতিহাসিক কাব্যের আলোচনা করিব। ইহাকে "অশেষ গুরুত্ব সম্পন্ন" পুস্তক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা বিভিন্ন সংস্কৃত ছন্দে বিরচিত হইয়াছে এবং ইহাতে ৯৮টি সর্গ আছে, কিন্তু ইহার কাব্যগুণ উচ্চস্তরের নহে। বস্তুতঃ লেখকের অন্যান্য গ্রন্থের নাম পাঠ করিলে মনে হইবে যে তিনি কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ৯৫ সর্গে বলা হইয়াছে রাজান্তঃপুরের মহিলারাও তাঁহার কবিত্বের গুণগান করিতে পারেন নাই। গ্রন্থখানি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ডঃ ব্র্যাণ্ডেস কর্তৃক লম্বকদ্বীপে চক্রনেগরের বলিদ্বীপীয় রাজার প্রাসাদ-অঙ্গণে আবিস্কৃত হইয়াছিল; তিনি উক্ত পুঁথিটি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন[২৪]। লেখক প্রপঞ্চ সম্ভবতঃ তাঁহার এই ঐতিহাসিক কাব্যকেই গ্রন্থ মধ্যে "দেশ বর্ণন" আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। কবির অন্য নাম ছিল বিনাদ। এই পুঁথির একজন বলিদ্বীপীয় নকলনবীশ গ্রন্থশেষে লিখিয়াছিলেন: "ইতী নাগরকৃতাগম সমাপ্ত, সঙ্কথ শ্রী মহারাজ বিল্বাতিক্ত……" ইত্যাদি। গ্রন্থখানি এই নামেই খ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

ডঃ ব্রাণ্ডেস নাগরকৃতাগম পুঁথিটি বলিদ্বীপীয় হস্তাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহার পর অধ্যাপক কার্ণ ইহার সম্পাদনা করেন। তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থে রোমান অক্ষরে প্রকাশিত মূল রচনাটি টীকাটিপ্পনী ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছিল[২৫]। ইহার পর অধ্যাপক ক্রোমের টীকা এবং ব্যাখ্যাসহ কার্ণের সংস্করণটি নবকলেবরে প্রকাশিত হইল[২৬]। ইহার পর পুর্বচরক প্রমুখ[২৭] বিভিন্ন পণ্ডিত এই গ্রন্থের নানাপ্রকার সংশোধন প্রস্তাব করিয়াছেন। এই গ্রন্থের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্করণ ইদানীং ডঃ পিগো প্রকাশ করিয়াছেন[২৮]।

এইবার ৯৮টি সর্গে বিভক্ত এই ঐতিহাসিক কাব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিবেশন করা যাইতেছে। প্রথম সর্গের প্রথমেই আমরা পড়িতেছি:

"ওম্ নাথায় নমোস্তুতে স্তুতিনিঙ্গ অৎপদ রি পদ ভটার নিত্যাশ,
সঙ্ স্থক্ষমেঙ্ তেন্নঙ্ ইঙ্ সমাধি শিব বুদ্ধ সির সকল নিষ্কলাত্মকা"।

বৌদ্ধ গ্রন্থকার "ওম্" দিয়া তাঁহার কাব্যের সূচনা করিলেন এবং যিনি গভীর সমাধিতে সূক্ষ্ম, সেই সকল নিষ্কলাত্মক শিববুদ্ধকে, অচিন্ত্যের অচিন্ত্যকে প্রণতি জানাইয়া গ্রন্থকার বলিলেন যে তাঁহার অবতার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই অবতার হইলেন বিল্বতিক্ত-

নাথ রাজা রাজসনগর (৩); ১২৫৬ শকাব্দে যখন তাঁহার জন্ম হইল তখন বহু অসম্ভব ব্যাপার সংঘটিত হইল, পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠিল (৪)। তাহার রাজত্বকালে বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং চতুরাশ্রম নিজ নিজ কর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল (৫)। ইহার পরবর্তী দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে রাজার মাতামহী রাজপত্নীর প্রশস্তি গীত হইয়াছে। তাঁহাকে আখ্যা দেওয়া গিয়াছে "ভটারি পরম ভগবতি"; তাঁহার যোগে উৎসাহ ছিল, তিনি ছিলেন মুণ্ডিত-মস্তকবৌদ্ধভিক্ষুণী। ১২৭২ শকাব্দে তিনি জিনপদ লাভ করিলে (মৃত্যুমুখে পতিত হইলে), রাজসনগরের মাতা ত্রিভুবনবিজয়োত্তুঙ্গদেবী তাঁহার স্থলাভিষিক্তা হইলেন (২)। ইহার পর তৃতীয় সর্গ হইতে ষষ্ঠ সর্গ পর্যন্ত রাজার পিতা কৃতবর্ধন এবং রাজপরিবারের অন্যান্য সকলের সম্বন্ধ এবং গুণাবলী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহাদের সকলেরই বিস্বতিক্তে বাসস্থল ছিল (৬/৪)।

কবি সপ্তম সর্গে রাজাকে বিভিন্ন দেবতার সহিত তুলনা করিয়া রাজপুত্রী কুসুমবর্ধনী এবং তাঁহার ভাবী স্বামী বিক্রমবর্ধনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

কাব্যের অষ্টম সর্গে রাজধানী মজপহিতের বর্ণনা করা হইয়াছে[২৯]। রাজপ্রাসাদের আঙ্গিনা ছিল উচ্চ এবং প্রশস্ত প্রাচীর বেষ্টিত; উহা ছিল রক্তবর্ণ প্রস্তর নির্মিত। পশ্চিম প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে ছিল বিস্তৃত মাঠ; চত্বরে সারিবাধা বোধি-বৃক্ষ ছিল এবং তণ্ডগণ পুরসভার রক্ষীগৃহ ('করক্ষণ') হইতে সতর্ক প্রহরা দিত। উত্তরের দিকে ছিল প্রধান প্রবেশ পথ; উহার দ্বার ছিল লৌহ নির্মিত, দ্বারে নানাবিধ মূর্তি অঙ্কিত ছিল। ইহার বাহিরে ছিল মাঠ; সেখানে সভা হইত, মোরগের লড়াই হইত, বাজার ছিল। পূর্বদিকে ছিল প্রাসাদমালা ও সাস্ত্রীগণের উচ্চ রক্ষীগৃহ; দক্ষিণে প্রশস্ত বীথিগুলির সঙ্গমস্থল। রাজপুরীর প্রধান আঙ্গিনার পার্শ্বে ছিল বিতান বা সুদীর্ঘ প্রশস্তঘরসমন্বিত চতঙ্গন। উত্তর পার্শ্বে দর্শনার্থী ভুজঙ্গ (ধর্ম সম্পর্কিত রাজকর্মচারী) ও মন্ত্রীদের প্রতীক্ষালয়; পূর্বপার্শ্বে ছিল শৈব ও বৌদ্ধগণের স্থল; সেখানে শ্রাবণ এবং ফাল্গুন মাসে বাৎসরিক শুদ্ধি উপলক্ষ্যে জগতের কল্যাণ কামনায় তাঁহারা প্রতিযোগিতা করিয়া ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। সেইদিকে শৈবগণের একসারি হোম করিবার স্থলও ছিল। বিপ্রগণের স্থল ছিল দক্ষিণ দিকে; আর উত্তর দিকে ছিল বৌদ্ধগণের উপাসনার স্থল। রাজপ্রাসাদের প্রধান আঙ্গিনা হইতে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ছিল রাজপুরীর ভৃত্যগণের স্থান। এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু মণ্ডপ ছিল পোষাক পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিবার জন্য। এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা পদমর্যাদা অনুযায়ী যথাস্থানে অবস্থান করিতেন।

নবম সর্গে বিভিন্ন শ্রেণীর পঙ্গলসন বা সান্ত্রীর নামোল্লেখ করা হইয়াছে; তাহারা তাহাদের দেশভূমির নামানুযায়ী পরিচিত হইত। তাহারা বহিঃপ্রাঙ্গণের রক্ষীগৃহে থাকিয়া পালাবদল করিয়া পাহারা দিত। বায়ুকোণে এবং পশ্চিম দিকেও অনেকগুলি প্রাসাদ ছিল; এই স্থলে সুমন্ত্রিগণের (শাসনকর্তা) প্রতীক্ষালয় ছিল। এই অঞ্চল সর্বদা কর্মচঞ্চল ছিল। রাজপুরীর প্রথম ও দ্বিতীয় ফটকের মধ্যে ছিল উৎসবাদির জন্য নির্ধারিত আঙ্গিনা; এখানে

অন্ততঃ দুইটি বিতান বা প্রকাণ্ড হল-ঘর ছিল। এখানে উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেন।

দশম সর্গে প্রধান প্রধান রাজ কর্মচারীদের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ছিলেন মন্ত্রী, আর্য, সপরেক, মপতিহ্, দেমুঙ্, কমুরুহন, রঙ্গ, তুমেঙ্গুঙ্গ, ক্ষত্রিয়, ভুজঙ্গ, রেষি (= ঋষি), বিপ্র, ধর্মাধ্যক্ষ, সপ্তোপপত্তি ইত্যাদি। এই সমস্ত উপাধিধারী ব্যক্তিগণ রাজদর্শনের জন্য বিতান-গুলিতে অপেক্ষা করিতেন। ইহার পরবর্তী সর্গে সংক্ষেপে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ আঙ্গিনার বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে; সম্ভবতঃ কবি এই অঞ্চলে প্রবেশ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। রাজপ্রাসাদের আঙ্গিনায় অনেক কুঞ্জবন ছিল।

দ্বাদশ সর্গে রাজপ্রাসাদের আঙ্গিনার সংলগ্ন অঞ্চলে যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহাদের বিবরণ পরিবেশন করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ছিলেন শৈব দ্বিজগণের মধ্যে মুখ্য ব্যক্তি ড়ঙ্গ্হ্যঙ্গ্ ব্রহ্মরাজ এবং বৌদ্ধগণের মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন নদী অঞ্চলের মহান্ ব্যক্তি (স্পুঙ্কু ইঙ্ নদী)। ইহারা ছিলেন রাজপুরোহিত; এতদ্ব্যতীত এই স্থলে বাস করিতেন বেঙ্গের-দহ-মতহুন-লসেম রাজপরিবার, বিখ্যাত মন্ত্রী গজমদ, ধর্মাধ্যক্ষ প্রভৃতি।

ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ সর্গে মজপহিত সাম্রাজ্যের করদ রাজ্য এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের নাম পরিবেশিত হইয়াছে। এই তালিকায় সুমাত্রা, বোর্ণিও, মালয় উপদ্বীপ, জাভার পুর্বদিকস্থ দ্বীপ-সমূহের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের মধ্যে দক্ষিণপুর্ব এসিয়ার কয়েকটি রাষ্ট্রের নাম আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে যবন (= আনাম) ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্র "রক্ষণাধীন" ছিল বলিয়া দম্ভ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই দম্ভের ঐতিহাসিক ভিত্তি নিতান্ত দুর্বল। ষোড়শ সর্গে শৈব এবং বৌদ্ধ রাজকর্মচারীদের বিভিন্ন দ্বীপে যাওয়ার নিয়মাবলী ও বিধিনিষেধ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে মহামুনি ভরড় এবং মুনীন্দ্র কুতুরণের নামোল্লেখ করা হইয়াছে।

সপ্তদশ হইতে অষ্টত্রিংশ সর্গ পর্যন্ত রাজকীয় সফরের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। রাজা মজপহিত হইতে বহির্গত হইয়া পুর্ব যবদ্বীপের বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন করিয়া সিঙ্গসরিতে ফিরিয়া আসিলেন। সপ্তদশ সর্গের প্রারম্ভে (১-৩ শ্লোক) রাজার রাজত্বকালের সুখসমৃদ্ধি এবং কীর্তিকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে রাজা প্রতি বৎসর শীতান্তে আনন্দ উপভোগ করার জন্য একবার করিয়া বিহার যাত্রায় বহির্গত হইতেন। ইহার পর প্রাক্তন তিনটি যাত্রার বিবরণ পরিবেশন করিয়া লেখক ১২৮১ শকাব্দের (১৩৫৯ খৃঃ) যাত্রার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পরই আমরা অষ্টম এবং নবম শ্লোকে লেখক পরব প্রপঞ্চের বিবরণ পাঠ করিতেছি। পরব ছিল তাঁহার ডাক-নাম; তাঁহার অপর নাম ছিল বিনাদ। তিনি নিজেকে "সঙ্গ কবি পুত্র সঙ্গ কবি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি কবি পুত্র এবং স্বয়ং কবি ছিলেন। তাঁহার পিতা ছিলেন "ধর্মাধ্যক্ষ খসোগতন (কসোগতন)" অর্থাৎ সৌগত বা বৌদ্ধগণের ধর্মাধ্যক্ষ। এই স্থলে একটি শ্লোকে আমরা পড়িতেছি যে "তিনি নরপতির কার্যক্রমেই সম্মানিত পিতার পদাভিষিক্ত হইয়া সোগত (বৌদ্ধ) সম্প্রদায়ের ধর্মাধ্যক্ষ

হইয়াছেন।” ডঃ পিগো মনে করেন যে এই “তিনি” শব্দটি দ্বারা প্রপঞ্চের পিতাকে বুঝাইতেছে; সুতরাং প্রপঞ্চের পিতা এবং পিতামহ উভয়েই বৌদ্ধগণের ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। এই মত নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য নহে এবং আমার মনে হয় যে পূর্বে পণ্ডিতগণ যে অভিমত পোষণ করিতেন তাহাই সমর্থনযোগ্য। অর্থাৎ প্রপঞ্চ স্বয়ং এবং তাঁহার পিতাই ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন[৩০]।

অষ্টদশ সর্গে কপুলুঙ্গন হইতে পতুকঙ্গন পর্যন্ত যাত্রাকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কপুলুঙ্গন হইতে রাজকীয় দলের শকটগুলি বিভিন্ন প্রতীক সহ যাত্রা করিল; কাহারো শকটের প্রতীক ছিল ইক্ষুদণ্ড, কাহারো ছিল শ্বেত বৃষভ, কাহারো তাম্বূল-পত্র। রাজার প্রতীক ছিল বিম্ব এবং তাঁহার “স্বর্ণরত্ন প্রদীপ্ত” ‘রথ’ ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে ঝলমল করিতেছিল। গাড়ীর সংখ্যা ছিল চারিশত এবং উহা ছয় দলে বিভক্ত ছিল, সঙ্গে ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের ভৃত্য। যাত্রীদল প্রভাতকালে পঞ্জুরন মুঙ্কুরে আসিয়া থামিল। কবি এই উপলক্ষ্যে সবুঙ্গন গিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দূরদূরান্তর হইতে বৌদ্ধগণ আসিয়া পথিপার্শ্বে তাঁহাদের সহিত দেখা করিলেন; ধর্মাধ্যক্ষও[৩১] পরিতৃপ্ত হইলেন।

উনবিংশ সর্গের প্রথমে বলা হইয়াছে যে ভয়লঙ্গোতে ত্রিরাত্র প্রবাস করিয়া রাজা আবার যাত্রা সুরু করিলেন। যাত্রাপথে পোগরের কুটি (বৌদ্ধ cloister-hall) এবং হম্বুলু-ত্রয়ের মণ্ডল পড়িল। রাজা প্রধান উজীর গজমদকে একটি জায়গা দান করিয়াছিলেন; উহার নাম মদকরিপুর[৩১ক]। উহাতে ছিল একটি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান। রাজার থাকিবার জন্য জায়গাটি (“পসংগ্রহণ”) চিত্রাঙ্কিত করিয়া সুসজ্জিত করা হইয়াছিল (“রিনূপকা”)।

বিংশ সর্গে ঈশানবজ্র, মুঙ্গুহ্ এবং রত্নপঙ্কজ নামক তিনটি বৌদ্ধ কুটির একাদশটি অংশের বা অধীনস্থ তালুকের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের নাম রাজকীয় খতিয়ানে ছিল; সুতরাং রাজা তাহার অধিকার স্বীকার করিয়া আবার যাত্রা সুরু করিলেন। রাজা অতঃপর যে সমস্ত জায়গা অতিক্রম করিলেন তাহাতে সম্ভবতঃ সমগ্র দিন অতিবাহিত হইয়াছিল (২১ সর্গ[৩২])। অতঃপর (২২ সর্গ) রাজা সমুদ্রতীর দিয়া চলিতে চলিতে নীলোৎপলসমুজ্জ্বল এক তড়াগ-তটে উপনীত হইলেন। তৎপর সমুদ্রতটস্থ বনে শিকার করিয়া সূর্যাস্ত সময়ে আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। যাত্রাপথে রাজা সড়েঙ্গ, পকম্বঙ্গন (২৩ সর্গ) প্রভৃতি স্থলে যাত্রা ভঙ্গ করিলেন। আবার রওনা হইলে পথিমধ্যে বৃষ্টি নামিল; তখন সঙ্কীর্ণ পিচ্ছিল একটি পথে কয়েকটি গাড়ী ধাক্কাধাক্কি করিয়া জখম হইল।

ইহার পর আরো কতকগুলি জায়গা অতিক্রম করিয়া রাজকীয় দল পতুকঙ্গন আসিয়া পৌছিল (২৪ সর্গ[৩৩])। স্থানটি সমুদ্রতীরে তালিবনসমন্বিত (২৫ সর্গ)। এই স্থলে যাত্রাসঙ্গী সকলে সমবেত হইলেন।

উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিবর্গ, ধ্যক্ষ (=অধ্যক্ষ বা বিচারক), বংশাধিরাজ, শৈব উপপত্তি ড়ঙ্গ আচার্য উত্তম এবং কবি(-সাহিত্য) ও আগম শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অপঞ্জি-মপঞ্জি সাস্তর। স্থানীয় অধিপতি বা শাসনকর্তা আর্য শূরাধিকারও

উপস্থিত ছিলেন (২৬ সর্গ)। রাজা এই অঞ্চলের হতুর-হতুর বা রাজকীয় নজরানা প্রাপ্ত হইলেন এবং রাজাও বস্ত্রাদি দান করিলেন। সকলে সন্তুষ্ট হইলেন। স্থানীয় শাসনকর্তা তট হইতে কিছু দূরে সমুদ্র-গর্ভে ক্ষুদ্র আবাস-গৃহ নির্মাণ করিলেন এবং উহা তট হইতে সেতুর দ্বারা ("লর্য-লর্যন") সংযোগ করিলেন[৩৪]। রাজা সূর্যের তাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঐ স্থলে গমন করিলেন। রাজান্তঃপুরচারিণীরাও স্বর্গভ্রষ্টা অপ্সরাগণের মত তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন। সম্ভবতঃ এই সমুদ্র-স্নানে তাঁহারা বিগতপাপ ("মোক্তঙ্গ ক্লেস") হইলেন। এই উপলক্ষে রকেৎ-নৃত্য ও শ্রম-ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হইল। এই স্থলে (২৮ সর্গ) বলি, মাদুরা প্রভৃতি স্থলের প্রধান ব্যক্তিগণ আসিয়া রাজাকে উপহার প্রদান করিলেন। রাজা এই সময় রাজকীয় ভৃত্য এবং সাধারণ কবিগণকে পুরস্কার প্রদান করিলেন।

উনবিংশ সর্গে প্রপঞ্চ কবি সোগত উপপত্তি মপঞ্জি কের্তষশের মৃত্যুর জন্য অনুপম ভাষায় গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছেন[৩৫]। অতঃপর আবার যাত্রা সুরু হইল। রাজা সদলবলে কেট পৌঁছিলেন (৩০ সর্গ) এবং সেখানে পাঁচ রাত্রি প্রবাস করিলেন। এখানে যাঁহারা রাজদর্শনে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন আর্য বীরপ্রাণ, শৈব এবং বৌদ্ধ উপপত্তি। রাজা কলুয়তে পৌঁছিলে (৩১ সর্গ) জাঁকজমক সহকারে এক রাজকীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। এই স্থলের বৌদ্ধ ধর্ম-সীম পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা উপলক্ষ্যে উপভোগ-ভোজনাদি সমাপ্ত হইল; মের্দঙ্গ এবং পড়হ বাদ্য বাজিয়া উঠিল। রাজা এই স্থলে তাঁহার অন্তঃপুরের জন্য সুন্দরী বিনি হজি সংগ্রহ করিলেন। বৌদ্ধ কবি প্রপঞ্চ যাত্রা-পথে সে সমস্ত বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠান পড়িয়া গেল তাহার বিবরণ পরিবেশন করিতে বিস্মৃত হইলেন না। রাজা সদলবলে এইবার পজরকন আসিয়া পৌঁছিলেন (৩২ সর্গ)। সেখানকার একটি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ("সুধর্ম সুগতাসন") দক্ষিণ দিকে তাহারা কুবু-কুবু ভোজনোৎসব পর্ব সম্পন্ন করিলেন এবং তৎপরে একটি মণ্ডল অতিক্রম করিয়া তাঁহারা সাগর নামক স্থলের বনাশ্রমে উপনীত হইলেন। সেই স্থলের তপস্যা-মন্দিরের গাত্রে ছিল উৎকীর্ণ রিলিফ-চিত্র; উহাতে একটি কাকাবিন রূপায়িত হইয়াছিল[৩৬]।

এই স্থলের অন্যত্রও কথা-চিত্র[৩৭] অঙ্কিত ছিল। তড়াগতটে ছিল নাগসরি, অন্দোঙ্গ, করবির প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের মেলা। স্থানটি ছিল শৈব-আশ্রম। রাজা মহর্ষির সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার আপ্যায়ন গ্রহণ করিলেন (৩৩ সর্গ) এবং ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাপস-তাপসীগণের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। রাজার বিহনে আশ্রম বিষাদে অভিভূত হইল (৩৪)। রাজা অতঃপর কয়েকটি স্থল অতিক্রম করিয়া অবশেষে সিঙ্গসরি প্রাঙ্গণের রাজকীয় ধর্মস্থলে আসিয়া উপনীত হইলেন (৩৫)। প্রপঞ্চ ইত্যবসরে ড়রবরুর কুটি পরিদর্শন করিয়া আবার সিঙ্গসরিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। রাজা তখন ধর্মস্থলের অভ্যন্তরে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান শেষ করিয়াছেন[৩৮]।

ইহার পর তিনি শুভলগ্নে দক্ষিণ দিকে কগেনেঙ্গন যাত্রা করিলেন (৩৬)। কগেনেঙ্গনে ছিল প্রাসাদ বা মন্দির, মেরুতুল্য, শিবের বাসস্থান (৩৭); এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল এই রাজ-বংশের স্থাপয়িতা রাজসের শিবরূপী প্রতিমূর্তি; তিনি ছিলেন হয়ম ভুরুকের প্র-প্র-প্রপিতামহ

"ভটার গিরিনাথ পুত্র" রাজস। ইহার দক্ষিণ দিকে একটি যত্নবিরর্জিত বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল ; প্রপঞ্চ ইহার উল্লেখ করিয়া এই আশা প্রকাশ করিলেন যে রাজার কল্যাণময় হস্তক্ষেপে ইহা পুনর্জীবন লাভ করিবে। ইহার পর রাজা কিড়লের ধর্ম প্রতিষ্ঠানে প্রণাম করিয়া সায়াহ্ন বেলায় জজগু[৩৯] উপনীত হইলেন। সেই স্থলে জিন মূর্তির অর্চনা করিয়া তিনি পরদিন প্রভাতে সিঙ্গসরি ফিরিয়া গেলেন। পথিমধ্যে তিনি ক্ষণকাল থামিয়া বুরেঙ্গের তড়াগ মধ্যস্থিত একটি চণ্ডীর (মন্দির) সৌন্দর্য অবলোকন করিয়াছিলেন (৩৮)।

রাজা সিঙ্গসরি অবসর বিনোদনের জন্য কিছুকাল রহিয়া গেলে প্রপঞ্চ গেলেন মুঙ্গু নামক স্থানের বৃদ্ধ ভ়ঙ্গ আচার্য রত্নাংশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। রত্নাংশ প্রদত্ত এই রাজবংশের পূর্বপুরুষের কাহিনী ৩৮ সর্গ হইতে ৪৯ সর্গে বিবৃত হইয়াছে। রত্নাংশ ছিলেন সুগত মুনীশ্বর এবং একটি দেবোত্তর প্রতিষ্ঠানের স্থাপক বা মঠাধ্যক্ষ। তিনি রাজবংশের সঙ্গেও সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। রত্নাংশ রাজবংশের পুরাকাহিনী ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন যে বংশের স্থাপয়িতা রঙ্গ রাজস (৪০) ছিলেন অযোনিসম্ভব। তিনি প্রথমে কুটরাজ নামক স্থান দখল করিয়া কদিড়ি-রাজ কৃতজয়কে পরাজিত করিলেন। ইহার ফলে সমগ্র যবভূমি বশ্যতা স্বীকার করিল।

অতঃপর ১১৪৯ শকাকে তাঁহার মৃত্যু হইলে তিনি শিববুদ্ধরূপে কগেনেঙ্গনের ধর্মস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার পুত্র অনূষনাথ ১১৭০ শকাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার শিব-প্রতিমূর্তি কিড়লের দেবোত্তরে প্রতিষ্ঠিত হইল (৪১)। ইহার পর অনূষনাথের পুত্র জয়বিষ্ণুবর্ধন এবং নরসিংহের যুক্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইহার কয়েক বৎসর পরে জয়বিষ্ণুবর্ধনের জীবিত কালেই রাজকুমারকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করা হইল এবং কুটরাজ নগরটীর নাম হইল সিঙ্গসরি। ১১৯০ শকাব্দে বিষ্ণুবর্ধনের মৃত্যু হইলে তাঁহার শিবমূর্তি বলেরিতে এবং সুগত-মূর্তি জজযুর দেবোত্তর-স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। নরসিংহমূর্তির মৃত্যু হইলে তাঁহাকেও কুমিতির নামক স্থানে শিবমূর্তি রূপে প্রতিষ্ঠা করা হইল। ইহার পর কৃতনগরের শৌর্যবীর্য এবং কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তিনি চয়রাজ, মহিষ রঙ্গ্ক (৪২) নামক দুর্বৃত্তদ্বয়কে নিহত করিলেন ; বলি, বকুলপুর (বোর্ণিও) প্রভৃতি দ্বীপ বিজয় করিলেন। তাঁহার বৌদ্ধ সময় ও ব্রতাদিতে অচল শ্রদ্ধা ছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে যে কলিযুগের প্রারম্ভে ৩১৭৯ বৎসরের সহিত শকাব্দ যোগ করিলে যে বৎসর হয় সেই বৎসরে[৪০] পাণ্ডবগণ স্বর্গে গিয়াছিলেন (৪৩)। কৃতনগর ছিলেন পঞ্চশীল, তর্ক-ব্যাকরণ এবং সুভূতিতন্ত্রে পারদর্শী ; পূজা-যোগ-সমাধিতেও তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। তিনি প্রয়োগক্রিয়া এবং তত্ত্বোপদেশেও সুনিপুণ ছিলেন। ১২১৪ শকাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন এবং সিঙ্গসরিতে তাঁহার শিববুদ্ধ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজমহিষী বজ্রদেবীর সহিত তাঁহার অর্ধনরেশ্বরী মূর্তি সগল-নামক স্থানে স্থাপিত হইল। ইহার পর কৃতনগরের মৃত্যু এবং (৪৪) কদিড়িরাজ জয়কৎবঙ্গ কর্তৃক সিঙ্গসরির সিংহাসন দখলের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তৎপরে রত্নাংশ জয়কৎবঙ্গের পূর্বপুরুষের কাহিনী পরিবেশন করিয়াছেন। অতঃপর কৃতনগরের

জামাতা বিজয় জয়কৎবঙ্গকে পরাজিত করিলেন। তিনি অতঃপর কৃতরাজস জয়বর্ধন নাম পরিগ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (৪৫)। ইহার পর (৪৬) কৃতনগরের সুরবধূতুল্য চারি কন্যার নাম ও গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে ; তাহারা ছিলেন রাজকুমারী ত্রিভুবনা, দুহিতা, প্রজ্ঞাপারমিতা এবং গায়ত্রী। শেষোক্তা রাজকুমারী রাজপত্নী নামে খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন। এই চারিটি রাজকন্যা কৃতরাজস জয়বর্ধনের মহিষী হইলেন। তিনি কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার জিন-বিম্ব রাজপুরীরর অন্তঃপুরে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং সিম্পিঙ্গে তাঁহার শিবমূর্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল (৪৭)। তখন তিক্তবিল্বের প্রভু হইলেন জয়নগর (৪৮)। তাঁহার রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা হইল পজরকন হইতে নম্বি (=তম্বি) পরিবারের উৎখাত। অতঃপর ১২৫০ শকাব্দে তিনি "হরিপদ" লাভ করিলে রাজান্তঃপুরে তাঁহার বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। শিলা পেটক এবং বুবতেও তাঁহার বিষ্ণুপ্রতিমা স্থাপিত হইল ; সুকলিলতে স্থাপিত হইল তাঁহার অমোঘসিদ্ধি মূর্তি। উনপঞ্চাশ সর্গে রাজপত্নীর শাসনকাল বিবৃত হইয়াছে। এই সময়ে সড়েঙ্গ, কেট এবং বলি পরাজিত হইয়াছিল। ড়ঙ্গ আচার্য রত্নাংশের কাহিনী এইখানেই শেষ হইল।

পঞ্চাশ হইতে চুয়ান্ন সর্গে বর্ণিত হইয়াছে সিঙ্গসরির উপকণ্ঠে রাজকীয় মৃগয়ার কাহিনী। ভৃত্যগণ খাণ্ডববনের মত অগ্নি প্রজ্বালন করিয়া পশু তাড়াইয়া উহাদিগকে একত্র করিল (৫০-৫১)। এই শিকারে কুকুরগণও অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাতে অনেক কুকুর ও পশু হতাহত হইল (৫২)। অনেক রাজভৃত্যও হতাহত হইল (৫৩)। এই শিকারে শৈব এবং বৌদ্ধ রাজ-পুরোহিতগণ (বিকু-হজি) অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৫৪ সর্গে অশ্বারূঢ় রাজার শিকার বৃত্তান্ত পরিবেশিত হইয়াছে।

অতঃপর রাজা সিঙ্গসরি হইতে রাজধানী মজপহিত অভিমুখে যাত্রা করিলেন (৫৫)। যাত্রাপথে তিনি কুমুকুস পর্বতের পাদমূলে অবস্থিত জজবের ধর্ম প্রতিষ্ঠানে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করিলেন। উক্ত চণ্ডী রাজার প্রপিতামহ কৃতনগর নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং উহাতে তাঁহার শিব-অক্ষোভ্য প্রতিমা ছিল (৫৬)। কিন্তু এই অক্ষোভ্য মূর্তিটি অলৌকিক রূপে অন্তর্হিত হইয়া যায়। ইহার সাক্ষী ছিলেন রাজধিকার নামক স্থানের মহাগুরু (৫৭)। ইহার পর রাজা বিভিন্ন স্থল অতিক্রম করিয়া অবশেষে নগরের উপকণ্ঠে জপন নামক স্থানে আসিয়া রাজ-পরিবারের অন্যান্য সকলের সহিত মিলিত হইলেন (৫৮)।

ইহার পরবর্তী সর্গে রাজার সদলবলে মজপহিতে আগমন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার আগমনে পুরনারীগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন, তাঁহাদের গাত্রা-বরণী স্থানচ্যুত হইল ; সমবেতভাবে কলশংখ বাজিয়া উঠিল। গুরু দ্রব্যভার স্কন্ধে বহন করিয়া এবং বহু ফলমূল পশু ইত্যাদি লইয়া ভৃত্যগণ রাজার সঙ্গে রাজার প্রাঙ্গণে আসিয়া উপনীত হইল (৬০)। ইহার পরে রাজা ১২৮২ শকাব্দের ভাদ্র মাসে এবং পরবর্তী বৎসরের বৈশাখ মাসে পুনরায় পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন (৬১)। এই উপলক্ষ্যে তিনি লোড়য় আসিয়া সেখানে কয়েক রাত্রি অতিবাহিত করিলেন ; অতঃপর তিনি সিম্পিঙ্গের ধর্ম এবং প্রাসাদের

ধ্বংসাবস্থা দেখিয়া তিনি উহা সংস্কার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন ; তিনি গুরুঙ্গ-গুরুঙ্গের বজ্রধর-সম্প্রদায়ের কুটি লইয়া সেই স্থলে সিম্পিঙ্গের ধর্মস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং উক্ত স্থান গ্রহণ করার জন্য গুরুঙ্গ-গুরুঙ্গের ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা করিলেন (৬২)। রাজা প্রত্যাবর্তনের পথে যে সমস্ত জায়গা পরিদর্শন করিলেন তাহার মধ্যে যানবজ্র, বজ্রলক্ষ্মী প্রভৃতির নাম সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ইহার পর ৬৩-৬৯ সর্গে রাজপত্নীর শ্রাদ্ধের বর্ণনা করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা মৃত্যুর পর প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইতেছিল, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী ইহাই দ্বাদশ বর্ষান্তের সর্বশেষ অনুষ্ঠান ("শ্রদ্ধা শ্রী রাজপত্নী বেকসন গবয়েন")[৪১]। গজমদ এই অনুষ্ঠান আরম্ভ করা সম্বন্ধে রাজদরবারে বক্তৃতা দিলে ইহার ব্যয়ভার সম্বন্ধে আলোচনা হইল (৬৩)। অতঃপর শ্রাদ্ধের স্থান সুসজ্জিত করা হইতে লাগিল। রাজপত্নীর আত্মার অবস্থানের জন্য সিংহাসন রচিত হইল। বিতানে অলংকরণের কার্য চলিল। পূর্বমুখী করিয়া মণ্ডপ রচিত হইল রাজ-বংশের সকলের বসিবার জন্য (৬৪)। রাজপ্রাঙ্গণের প্রান্তিকে অন্য সকলের পদমর্যাদানুযায়ী বসিবার ব্যবস্থা হইল। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য লোকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিকু (ভিক্ষু), বৌদ্ধতন্ত্রগত ; তাঁহারা মণ্ডল-অঙ্কন পর্যবেক্ষণ করিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন আবেশ-ভাবাপন্ন "শাস্ত্রতন্ত্রত্রয়"[৪২]-অভিজ্ঞ নদী নামক ধর্ম স্থলের স্থাপক বা মঠাধ্যক্ষ। তাঁহার শিষ্য এইবার মণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া মুদ্রা, মন্ত্র এবং সঠিক উচ্চারণে জপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর পুর্ণিমাতে রাজপত্নীর স্বঃ বা আত্মা সিংহাসনস্থ পুষ্প-শরীরে অবতরণ করিলেন। কলশংখ, পড়হ-গঞ্জুরণ প্রভৃতি বাদ্য বাজিয়া উঠিল (৬৫)। রাজবংশের সকলে এবং অন্যান্য রাজ-কর্মচারী প্রণতি জানাইলেন। এই উপলক্ষ্যে রাজপত্নীর আত্মার উদ্দেশ্যে আড়ম্বর সহকারে খাদ্য, দুকুল বস্ত্র, তাম্বুল প্রভৃতি নিবেদিত হইল। এই উপলক্ষ্যে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগকে মর্যাদানুযায়ী খাদ্য এবং অন্যবিধ উপহার প্রদত্ত হইল। সাতদিন ব্যাপিয়া এই দানের পর্ব অনুষ্ঠিত হইল (৬৬) এবং নৃত্য, সঙ্গীত ও পানোৎসবে সভাস্থল ভরিয়া উঠিল। ইহার পরবর্তী সর্গে এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের অবসান বিবৃত হইয়াছে। রাজপত্নীর আত্মা এইবার পুষ্পশরীর ত্যাগ করিয়া মহাবুদ্ধলোকে চলিয়া গেল। অতঃপর (৬৮) ঐরলঙ্গ কর্তৃক দুই সন্তানের জন্য রাজ্য বিভাগ করার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক যোগী ম্পু ভরড় কিরূপে জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া বলিদ্বীপে দিয়াছিলেন এবং রাজানুরোধে কিরূপে তিনি শূন্যপথে উড়িয়া কমণ্ডলুস্থ জলরেখা দ্বারা যবদ্বীপ দুইভাগে বিভক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। শূন্য পথে চলিবার সময় তাঁহার পরিচ্ছদ কমল-বৃক্ষে আটকাইয়া যাওয়ায় তিনি শেষপর্যন্ত পুলুঙ্গন্ দেশে কমণ্ডলুসহ অবতরণ করিয়াছিলেন। ইহার পর (৬৯) প্রজ্ঞাপারমিতাপুরী এবং ভয়লঙ্গু বা বিশেষপুর নামক ধর্মস্থল প্রতিষ্ঠার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই উভয় স্থলেই প্রতি ভাদ্র মাসে মৃত রাজপত্নীর পুজার ব্যবস্থা হইল। ইহার পর সপ্ততিতম সর্গে সিম্পিঙ্গে কৃতরাজসের মূর্তি প্রতিষ্ঠার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তত্ত্বোপদেশ এবং শৈবাগমে পারদর্শী আর্য রাজপরাক্রম পুজাকার্য সম্পন্ন করিলেন। এই উপলক্ষ্যে প্রাসাদ বা মন্দির, গোপুর

মেখলা অর্থাৎ প্রাচীর নির্মিত হইল। ইহার পরবর্তী সর্গে (৭১) রাজ্যের প্রধান উজীর গজমদের মৃত্যুকথা বর্ণিত হইয়াছে। রাজপরিবারের প্রধান নয়জন নরনারী গোপন সভায় মিলিত হইয়া ঠিক করিলেন যে গজমদের মৃত্যুর ক্ষতি অপুরণীয়; সুতরাং স্থল আপাততঃ শূন্য রহিয়া গেল। তবে কয়েকটি নূতন শাসনকর্তা নিয়োগের দ্বারা রাজ্যের শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হইল (৭২)। ইহার মধ্যে ছিলেন বৃদ্ধ মন্ত্রী আত্মরাজ পু তণ্ডিঙ্ এবং বীর মণ্ডলিক পু নাল।

৭৩ হইতে ৭৮ সর্গে সমগ্র রাজ্যের শৈব বৌদ্ধ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্মস্থানগুলির শ্রেণীবিন্যস্ত তালিকা পরিবেশন করা হইয়াছে। এই তালিকাগুলির মূল্য অসাধারণ। কারণ পূর্ব যুগ হইতে যে সমস্ত ধর্ম প্রতিষ্ঠান চলিয়া আসিতেছিল এই স্থলে তাহার সরকারী তালিকা পাইতেছি এবং দ্বিতীয়তঃ এইগুলির শ্রেণীবিন্যাস পাইতেছি। এই শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম পাইতেছি (১) ধর্ম লেপস্ প্রতিষ্ঠা শিব অর্থাৎ শিবমন্দির সহ দেবোত্তর (২) ধর্ম কসোগতন কবিনয় লেপস অর্থাৎ বিনয়ের নিয়মাবদ্ধ বৌদ্ধগণের দেবোত্তর (৩) কসুগতন কবজ্রধরণ অক্রম অর্থাৎ বিবাহিত বৌদ্ধগণের বজ্রধর সম্প্রদায়[৪৩] (৪) ধর্মস্ লেপস্ করেষ্যন অর্থাৎ ঋষিগণের দেবোত্তর। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে দেবালয়বিহীন সীম বা স্বাধীন ধর্মস্থান[৪৪]। যথা, কশৈবাঙ্কুরান বা শৈব সম্প্রদায় শাখার ধর্মস্থান, কবোদ্ধাংশন অর্থাৎ বৌদ্ধাধীন ধর্মস্থান, করেষ্যাঙ্কুরান বা ঋষি সম্প্রদায়ের শাখার ধর্মস্থান; রাজবংশের জ্ঞাতিগণের সীম ("ককদংঘজ্যন"), বংশ বিষ্ণু[৪৫], দেশ মেড়ঙ্গ্ হুলুন হঙ্গ্ (প্রেতাত্মার উদ্দিষ্ট ধর্মস্থল)। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে কলগ্যন (কারুশিল্পীবৃন্দের স্থান), কসজ্যিকন (বৌদ্ধ সংঘের স্থান), কস্থাপকন (মঠাধ্যক্ষের বাসস্থান), মণ্ডল (তান্ত্রিক সম্প্রদায়), চতুর্ভস্ম, কত্যাগণ, চতুরাশ্রম ইত্যাদি।

এই সমস্ত ধর্মস্থানগুলিকে প্রাচীন দলিল পত্রানুযায়ী স্ব স্ব অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইল। যাহাদের দলিল ছিল না তাহাদিগকে উপযুক্ত লোক দ্বারা দলিল পত্রাদি প্রস্তুত করাইতে নির্দেশ দেওয়া হইল। এইরূপে রাজকীয় খতিয়ান পরিশোধন করা হইল। রাজকীয় ধর্মস্থানগুলির সংখ্যা ছিল ২৭ এবং ইহাদের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য আর্য বীরাধিকারকে ধর্মাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হইল। শৈব অধ্যক্ষের কর্তৃত্ব পরহ্যঙ্গন এবং কলগ্যনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। বৌদ্ধ অধ্যক্ষগণ কুটি এবং বিহার তত্ত্বাবধানের ভার পাইলেন। আর মন্ত্রি হের হজির কর্তৃত্বাধিকার স্থাপিত হইল করেষ্যন বা তপস্বীদের উপর। প্রমাণ-পাট্টা দেখিয়া তিনি এই প্রকার বিভিন্ন ধর্মস্থলের অধিকার যথাযথভাবে স্বীকার করিয়া লইলেন, কিন্তু যাহারা কোন প্রকার প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারিল না তাহাদিগকে "দেশভের্ত্য" বা ভূমিদাস রূপে পরিণত করা হইল (৭৯)। বলিদ্বীপেও ঠিক একইরূপে প্রমাণাদি গ্রহণপূর্বক ধর্মস্থানগুলির অধিকার সংরক্ষিত হইল। বলিদ্বীপের ধর্মস্থান, গ্রাম কুবু বা খামারের প্রমাণ-পাট্টা দেখিয়া উহাদের অধিকার সংরক্ষিত হইল এবং বৌদ্ধগণের ধর্মস্থানগুলির তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। এই ধর্মস্থানগুলির মধ্যে ছয়টি ছিল বজ্রধর সম্প্রদায়ের ধর্মস্থান (৮০); একমাত্র বিহারে ছিল বিনয়-নিয়মাবদ্ধ বৌদ্ধগণের একটি ধর্মস্থল।

ইহার পরবর্তী সর্গে প্রশস্তি, পটিকগুগুল[৪৬], অধিগম, শিক্ষা এবং শাসনানুযায়ী চতুর্দ্বিজ, চতুরাশ্রম, চতুর্ভস্ম, চতুর্জন প্রভৃতিকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। রাজার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া রাজার ভগ্নিপতিগণও কয়েকটি ধর্মস্থানের প্রতিষ্ঠা করিলেন (৮২)। অতঃপর কবি যবদ্বীপ এবং জম্বুদ্বীপের প্রশস্তি গাহিয়াছেন :

"জ্যিঙ্গ্ জম্বুদ্বীপ লাবন যব কেতঙ্গ্ ইনুচপ্
কোত্তমন্তন্ সুদেশ"

অর্থাৎ সঠিক ভাবে বলিতে গেলে জম্বুদ্বীপ এবং জাভার কথাই সকলে বলিয়া থাকেন, কারণ হইল সু-দেশরূপে উহাদের শ্রেষ্ঠতা। ৮৩ সর্গে দ্বিজবর ব্রহ্মরাজের উল্লেখ আছে ; তিনি ছিলেন আগমজ্ঞ, মহাকবি এবং নৈয়ায়িক[৪৭]। এতদ্ব্যতীত বেদজ্ঞ ভামন, "সাম জপ"-এ সুনিপুণ বিষ্ণুর কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ তাঁহারা ভারতবর্ষাগত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। কারণ, পরবর্তী শ্লোকেই বলা হইয়াছে যে এই সময় জম্বুদ্বীপ, কম্বোজ, চীন, যবন (আনাম), চম্পা, কর্ণাটক, গোড় (গৌড়) এবং স্যঙ্ক (শ্যাম) দেশ হইতে বণিকদের সহযাত্রী হইয়া "অবিচ্ছিন্নভাবে সকল লোক" আসিত। ইহাদের মধ্যে ভিক্ষু এবং বিপ্রগণও ছিলেন। ফাল্গুন মাসে রাজার পরিপুজা (মিছিল সহকারে পূজা) উপলক্ষ্যে মন্ত্রী এবং অন্যান্য রাজকীয় কর্মচারী উপনীত হইতেন এবং প্রভেতি-কর প্রদান করিতেন। সেই উপলক্ষ্যে পড়হ্, মৃদঙ্গ, শংখ, তবয়ন প্রভৃতি বাদ্য বাজিয়া উঠিত, ভট্টগণ গান গাহিতেন, সংস্কৃত শ্লোকে রাজার গুণ-কীর্তন করা হইত (৮৪)। রাজা ছিলেন রাম এবং কৃষ্ণ তুল্য। ইহার পর রাজকীয় মিছিলের বর্ণনা করা হইয়াছে। চৈত্র মাসে রাজকর্মচারীবৃন্দের একটি সভা হইত ; উহাতে অজর ইঙ্গ্ রাজ কপম নামক গ্রন্থের নির্দেশানুযায়ী রাজকর্মচারীদিগকে চলিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল (৮৫)। অতঃপর আমরা রাজকীয় প্রাঙ্গণের উত্তর দিকস্থ বুবতের মাঠ (৮৬) এবং উহাতে সপ্তদিবস ব্যাপী ক্রীড়া উৎসবের (৮৭) বর্ণনা পড়িতেছি। ইহার পরবর্তী দুই সর্গে রাজপরিবারের সহিত রাজকর্মচারী এবং দেশস্থ মান্যগণ্য ব্যক্তিগণের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পর চারিটি বিতানে সকলের ভোজন পর্বের কাহিনী পরিবেশন করা হইয়াছে। লোকপুরাণ অনুমোদিত খাদ্য তালিকা অনুযায়ী রাজপরিবারের সকলকে স্বর্ণপাত্রে করিয়া খাদ্য পরিবেশন করা হইল। অন্য সকলকে রৌপ্য পাত্রে বাহিত খাদ্য পরিবেশন করা হইল (৯০)। বিভিন্ন প্রকার মদ্যও প্রচুর পরিমানে প্রদত্ত হইল। এই পরিবেশে গান গাহিতে গাহিতে নর্তকীর আবির্ভাব হইল (৯১)। তিনি রাজসন্নিধানে মদ্যপান করিয়া কিদুঙ্ গান ধরিলেন ; রাজাও এই সঙ্গীতে যোগ দিতেন। এই উৎসব উপলক্ষ্যে গীত সহযোগে রকেৎ বা নৃত্যনাট্যও প্রদর্শিত হইত।

কবি ইহার পরবর্তী সর্গে রাজাকে একস্থলে সুগত এবং অন্যস্থলে গিরিনাথের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন (৯৩) যে জম্বুদ্বীপস্থ কাঞ্চীপুরীষড়বিহারের ভিক্ষু বুদ্ধাদিত্য সংস্কৃত শ্লোকে রাজার উদ্দেশ্যে ভোগাবলি রচনা করিয়াছেন ; বিপ্র মুতলি সহৃদয়-ও সংস্কৃত শ্লোকে তাঁহার প্রশস্তি গাহিয়াছেন। ডঃ কার্ণের মতানুযায়ী মুতলি একটি তামিল শব্দ

এবং উহার আধুনিক প্রতিশব্দ হইল মুদেলিয়র। এই প্রসঙ্গে যবদ্বীপের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্তৃক একত্র বসিয়া শ্লোক রচনা করার কথাও বলা হইয়াছে। কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন (৯৪) যে তাঁহার কবিপ্রতিভা রাজদরবারে বিশেষ সমাদৃত হয় নাই। কবি এই সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকে তাহার গ্রন্থের নাম "দেশবর্ণন" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রপঞ্চ বলিয়াছেন যে তিনি স্বয়ং আরো গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যথা শকাব্দ, লম্বঙ্গ, পর্বসাগর[৪৮], ভিষ্মশরণ এবং সুগতপর্ব-বর্ণন। এই সর্গের শেষেও কবি তাহার প্রতিভার স্বীকৃতি না পাওয়ায় আবার মনোবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। নাগরকৃতাগমের শেষের পর্বগুলিতে (৯৫-৯৮) কবি নিজের সম্বন্ধে এবং নিজের অবস্থা সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। অবহেলাপীড়িত হইয়া কবি গেলেন "কমলসন"-নামক আশ্রমে বাস করিতে (৯৫)। এই কাব্য রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল "শাকদ্রি গজার্জমাশ্বযুজমাস শুভ দিবস পুর্ণচন্দ্রম" অর্থাৎ অদ্রি-গজ-অর্যমা বা ১২৮৭ শকাব্দের অশ্বযুজমাসে শুভদিনে পুর্ণিমাতে। অধ্যাপক দামাইর মতানুযায়ী এই তারিখ হইল ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দ ৩০শে সেপ্টেম্বর (জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার)[৪৯]।

প্রপঞ্চের রচনাশৈলীতে ভারতীয় প্রভাব বিদ্যমান। তারিখ দিবার সময় প্রপঞ্চ অন্যান্য যবদ্বীপীয় গ্রন্থকারের মত চন্দ্রসঙ্কল ব্যবহার করিয়াছেন। এই কাব্য গ্রন্থটি বিভিন্ন ভারতীয় ছন্দে রচিত হইয়াছে, কিন্তু ছন্দগুলি সংস্কৃত হইলেও নকলনবিসগণের মাত্রার হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে দীর্ঘস্বরগুলি চরণের অন্তে অথবা উচ্চপদস্থ লোকের নাম ও উপাধিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে আবার যেখানে দীর্ঘ-মাত্রা ছন্দের প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হওয়া দরকার সেখানে দীর্ঘ মাত্রাই (Long Syllables) ব্যবহৃত হইয়াছে। সর্গগুলির পরিধি একপ্রকার নহে এবং কোথাও কোথাও বর্ণনা বিশেষভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কবির পৃষ্ঠপোষকের জন্মকালের বিবরণে বলা হইয়াছে, "ভূমিকম্প হইল, সৃষ্টি কাঁপিয়া উঠিল, বজ্র গর্জন করিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ-শিখা গগন বিদীর্ণ করিয়া দিল, কাম্পুদ পর্বত বিচুর্ণ হইল এবং দুর্বৃত্তগণ পর্যুদস্ত হইল[৫০]।" সংস্কৃত গ্রন্থেও বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্মগ্রহণ কালে এইরূপ প্রাকৃতিক ঘটনা সংঘটনের বিবরণ আছে[৫১]। দেবগণ এইরূপ কালে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভি ধ্বনি করেন।

এইবার আমরা পররতন (কেন আংগ্রোক) বা তুমপেল এবং মজপহিতের রাজগণের ইতিবৃত্ত নামক গ্রন্থখানির আলোচনা করিব। এই গ্রন্থের প এবং খ সংখ্যক পুঁথির সমাপ্তিকা হইতে মনে হয় যে এই গ্রন্থখানি ষোড়শ শকাব্দের প্রারম্ভেও প্রচলিত ছিল। আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে দৃষ্ট হয়, এই গ্রন্থে শেষ যে-ঘটনা বিবৃত করা হইয়াছে তাহা পঞ্চদশ শকাব্দের পুর্বের নহে[৫২]। ইহার রচনাশৈলী হইতে মনে হয় যে গ্রন্থটি রচনায় মাঝে মাঝে ছেদ পড়িয়াছে। এই সমস্ত তথ্য হইতে অনুমিত হয় যে গ্রন্থখানি মজপহিত যুগের শেষভাগে আনুমানিক ১২৭৮-১৪৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল[৫৩]। গ্রন্থের কোন কোন অংশ আরও পরবর্তী কালে রচিত হইয়া থাকিবে। ইহা গদ্যে রচিত হইয়াছে এবং ইহার ভাষাকে মধ্য-জাভানীজ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সমগ্র গ্রন্থটি অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অংশটি সুবিখ্যাত ভারতীয় স্বস্তিবচন দিয়া আরম্ভ হইয়াছে "ওম্ অবিঘ্নম্ অস্তু নমস্ সিদ্ধম্"। গ্রন্থের এই ভাগটি একান্তই উপকথামূলক এবং ইহার অজ্ঞাতনামা লেখক বা লেখকবৃন্দ এই স্থলে ভবিষ্যৎ রাজার রোমান্টিক বা উদ্ভট সাহসিকতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন তাঁহার বিবাহিতা মাতা ও ব্রহ্মার সন্তান; মাঠে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কেন আংগ্রোক যখন তুমপেলের অকুবু বা শাসনকর্তা তুঙ্গুল অমেতুঙ্গ্‌কে তাঁহার উন্নতির পথ হইতে দূরীভূত করিয়া তাঁহার বিধবা কেন ড়েড়েস-কে বিবাহ করিলেন এবং তুমপেলের প্রধান হইয়া বসিলেন, তখন হইতেই ঘটনাবলী অনেকটা ইতিহাসের আকার পরিগ্রহণ করিল। এই অংশের লেখক শৈব ভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া মনে হয়। আংগ্রোক ছিলেন সিংহসরির প্রথম রাজা এবং মজপহিত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই সময় হইতে গ্রন্থের কাহিনী একান্তভাবে ইতিহাসানুযায়ী হইয়াছে, যদিও ক্রিসের উপাখ্যান সমালোচকের মনে অনেকটা সংশয়ের সৃষ্টি করে। ডঃ ক্রোম[৫৪] এই জন্য অনুমান করিয়াছেন যে পররতনের লেখক একদিকে যেমন ইতিকথার উপর নির্ভর করিয়াছেন, তেমনি আবার আর একদিকে গল্পভাণ্ডার হইতেও সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে এই গ্রন্থের কোন কোন অংশ অনুশাসনলিপি এবং চৈনিক তথ্যাবলীর আলোকে পাঠ করিলে সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ নাগরকৃতাগমের সহিত পররতনের তুলনা করিলে শেষোক্ত গ্রন্থের উপকথামূলক অংশ সুস্পষ্টরূপে চোখের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। এই গ্রন্থখানিতে প্রাক্ হিন্দু যুগের ধর্মবিশ্বাসের স্বাক্ষর বিদ্যমান আছে।

লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে অনেকগুলি পুস্তক আছে, যাহাকে অংশত ইতিবৃত্ত এবং অংশত ঐতিহাসিক রোমান্স বলিয়া অভিহিত করা যায়। যে রচনা পদ্ধতিতে এই গ্রন্থগুলি লিখিত হইয়াছে তাহাকে সাধারণভাবে কিদুঙ্-নামে আখ্যাত করা হইয়াছে; ইহা কাকাবিন শ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র মর্যাদালাভ করিয়াছে। ডঃ বের্গ[৫৫] মনে করেন যে এই সমস্ত ঐতিহাসিক কাব্যের লেখকগণ সম্ভবতঃ তাহাদের রচনায় রোমান্টিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিবার জন্য ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে বিকৃত করিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি কিদুঙ সুন্দ নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের শেষাংশে বর্ণিত হইয়াছে কিরূপে অয়ম্ ভুরুক (হয়ম্ ভুরুক) শোকাভিভূত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, কারণ তিনি তাঁহার প্রিয়া সুন্দ রাজকুমারীর মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিলেন[৫৬]। গ্রন্থকার সম্ভবতঃ এই ব্যাপারে তৎকালীন জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে মধ্য-যবদ্বীপীয় যুগের ঐতিহাসিক কিম্বদন্তীগুলিতে সময় সময় নূতন নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় যাহা উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে পাওয়া যায় না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। উসন জব (সমগ্র প্রথমাংশ), পমঞ্চঙ্গ্ এবং কিদুঙ্ সুন্দের ক-সংস্করণে গজমদের বলিদ্বীপে অভিযানের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহার কোন উল্লেখ পররতনে নাই। অনুরূপভাবে পমঞ্চঙ্গে বলা হইয়াছে যে অয়ম ভুরুক গজমদের মৃত্যুর পর মজপহিতে একটি রাজকীয় সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু এই ঘটনাটি পররতনে উল্লিখিত হয় নাই[৫৭]। এই সমস্ত ঘটনা অনুশাসন-

লিপি বা ঐ শ্রেণীর প্রামাণ্য তথ্যাদির দ্বারা সমর্থিত না হইলে উহাদের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।

পমঞ্চঙ্গ্ শব্দকে আধুনিক যবদ্বীপীয় ভাষায় বলা হয় বাবাদ। ইহা কোন নাম নহে, ইহা সাধারণভাবে ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিকে বুঝাইয়া থাকে। ফ্রিডরিখ্ একটি পমেগুঙ্গ্ নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। বের্গ মনে করেন যে উহা পমঞ্চঙ্গ্ গ্রন্থের ৪৩৬১ সংখ্যক পুঁথি। উপরোক্ত অধ্যাপক বলিয়াছেন যে ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের একটি ইতিবৃত্ত এবং ইহার মধ্যে রাজা এবং পুরোহিতগণের জটিল ইতিকথা, গেল্‌গেলের আদিম পুঙ্গবগণের মধ্যে বলিদ্বীপের বণ্টন এবং কোন কোন রাজবংশের— যেমন, করঙ্গ্-অসেম রাজগণের-বংশতালিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ডঃ বের্গ আরও বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ফ্রিডরিখ্ এবং যুইনবলের বর্ণনা এক হয় একদেশদর্শী নতুবা প্রমাদপূর্ণ[৫৮]। গ্রন্থটির আরম্ভে পড়িতেছি স্বস্তিবাচন : "অবিঘ্নম্ অস্তু"। গ্রন্থটি কতকগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত। উহাতে বলা হইয়াছে কিরূপে মজপহিত হইতে একটি যবদ্বীপীয় উপনিবেশ বলিদ্বীপে স্থাপিত হইয়া উহা গেল্‌গেলের পতন এবং ক্লুঙ্গ্‌কুঙ্গের উত্থান-কাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এই গ্রন্থের ৫০৫৮ (১)-নং পুঁথিতে পকপিসন-বংশের তালিকা ও কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। নিরর্থের উত্তর-পুরুষের তালিকা ৫২৪৩ সংখ্যক পুঁথিতে বিবৃত হইয়াছে। স্থানীয় ইতিহাসকে কেন্দ্র করিয়াও কতকগুলি পমঞ্চঙ্গ্ বিরচিত হইয়াছে। নাগরকৃতাগমে (৬৬/৫) বিতু অমঞ্চঙ্গ্-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ তাহারা প্রাচীনকালে গাথা বা কাহিনী সুর করিয়া পড়িত কিংবা গাহিত। অধ্যাপক বের্গ যে সমস্ত পমঞ্চঙ্গ্ সম্পাদনা করিয়াছেন[৫৯] তাহার মধ্যে কোন কোনটি হয়তো প্রাচীন কাহিনীর ছন্দায়িত সাহিত্যিক রূপ[৫৯ক]।

উসন জব বা জাভার প্রাচীন ইতিহাস নামটির কোন সার্থকতা নাই। ফ্রিডরিখ্[৬০] বলিয়াছেন যে মজপহিতের অধিবাসীবৃন্দ কর্তৃক বলি-বিজয়ের কাহিনী ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। বিল্বতিক্ত বা মজপহিতের রাজা তাঁহার ভ্রাতা আর্য দমর এবং তাঁহার পতিহ্ গজমদকে ঐ দ্বীপ অধিকার করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন[৬১]। গ্রন্থে অতঃপর বর্ণনা করা হইয়াছে কিরূপে দেব অগুঙ্গ্ গেল্‌গেল নামক অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিলেন এবং কিরূপে ভূসম্পত্তি রাজসভাসদ্‌গণের মধ্যে বিতরিত হইল। গ্রন্থটি স্থানে স্থানে উপকথামূলক হইয়াছে। উসন বলি[৬২] সম্বন্ধে ফ্রিডরিখ্ বলিয়াছেন যে উহা একমাত্র জনগণের জন্যই রচিত হইয়াছে এবং উহা পুরোহিত শ্রেণীর অভ্যর্থনা লাভ করে নাই। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একজন লেখক বলিয়াছেন যে উহা আর্যদমরের বংশ সম্বন্ধে অনেকটা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। মধ্য-যবদ্বীপীয় রোমান্টিক ঐতিহাসিক কাব্য রঙ্গ লবের্ কাহিনীটি র‍্যাফল্‌স[৬৩] বহু পূর্বে বর্ণনা করিয়াছিলেন। হস্তলিখিত পুঁথিতে এই কাব্যের নাম দেওয়া হইয়াছে পঞ্জি বিজয়ক্রম। ইহাতে দহ এবং তুমপেলের মধ্যে যুদ্ধের কাহিনী, রাদেন বিজয় কর্তৃক মজপহিতের গোড়াপত্তন, তাঁহার বিশ্বস্ত কর্মচারী রঙ্গ লবের বিদ্রোহ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। চীন ইতিবৃত্তে এই সময়ের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হওয়ায় এই ঐতিহাসিক রোমান্সের তথ্যগত মূল্য কতটুকু তাহা নির্ধারণ

করিবার সুযোগ রহিয়াছে। এই গ্রন্থের রচনাকালে ১৪৬৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দ। ডঃ ব্র্যাণ্ডেসের মতানুযায়ী[৬৪] ইহা ইতিহাসের দিক হইতে যতটা মূল্যবান, সাহিত্যের মানদণ্ডে ইহা তদপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান। ইহার বিষয়বস্তু পররতনের পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম অধ্যায়ের এবং অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভের সহিত মোটামুটিভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।

কিদুঙ্ সুন্দ নামক কাব্যটিও[৬৫] একখানি ঐতিহাসিক রোমান্স। ইহাতে সুন্দ রাজ-পরিবারের মজপহিত যাত্রার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। রাজপরিবার গিয়াছিলেন সুন্দ রাজ-কন্যার সহিত মজপহিত-রাজ হয়ম ভুরুকের বিবাহ-উৎসব উপলক্ষে, কিন্তু সুন্দ (পশ্চিম যবদ্বীপ) এবং মজপহিতের রাজকীয় মর্যাদা সমান নহে এই প্রশ্ন লইয়া উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মতবিরোধ হয় এবং যুদ্ধ আরম্ভ হয় (১৩৫৭ খৃঃ)। এই যুদ্ধের ফলে সুন্দ-বাহিনী বুবতের রণক্ষেত্রে বিধ্বস্ত হয় এবং ইহার কিছুকাল পরেই সুন্দ রাজকুমারীর মৃত্যু হয়। কথিত হইয়াছে যে হয়ম ভুরুকও শোকাভিভূত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পূর্বেই বলিয়াছি শেষোক্ত ঘটনাটির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

এই গ্রন্থের তারিখ নির্ণয় করা দুরূহ। ইহাতে আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু ডঃ বের্গ[৬৬] মনে করেন যে ইহা গ্রন্থের আধুনিকতার পরিচায়ক নহে। এই গ্রন্থের খ-সংস্করণটি রঙ্গ লবে হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক মনে হয়, কারণ ইহাতে (২/১৩৯) পতিহ্ অনেপকেনের অশ্বতরকে রঙ্গ লবের অশ্ব অন্দ বেসির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। রঙ্গ লবের তারিখ ১৪৬৫ শকাব্দ হইলে খ-সংস্করণটির তারিখ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দ বা ইহার কিছু পরবর্তীকালে হইবে। তবে মনে হয়, যে-কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া ইহা রচনা করা হইয়াছে তাহা ১৫৫০ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা প্রাচীনতর হইবে।

আমরা অন্যত্র বলিয়াছি যে ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে নাগরকৃতাগম রচিত হওয়ার পর আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তবে ইহার পর দ্বীপময় ভারতের সাহিত্যের ইতিহাসে যেন একটা দুর্যোগের আভাষ পাই। বস্তুতঃ আনুমানিক ১৩৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ যবদ্বীপের সাহিত্যের ইতিহাসে যেন একটা অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। যবদ্বীপের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য এই যুগে বলিদ্বীপের গুরুত্ব অনেকটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক প্রচেষ্টাও যবদ্বীপ হইতে বলিদ্বীপে চলিয়া আসে। এই সময়ে বলিদ্বীপ কিদুঙ্ শ্রেণীর মধ্য-জাভানীজ সাহিত্যের বিকাশস্থল হইয়া ওঠে। যদিও কিদুঙ্ সাহিত্য যবদ্বীপে অজ্ঞাত ছিল না, তবুও ইহা বলিদ্বীপে যেন একটি নূতন নীড় রচনা করিয়া আশ্রয়লাভ করিল। ইহার মর্মস্থল বা প্রাণকেন্দ্র ছিল গেল্‌গেল্ এবং ইহা মজপহিতের স্থান গ্রহণ করিল। সাহিত্যিক প্রচেষ্টার স্থানান্তর করণের কাহিনীটি সম্ভবতঃ পমঞ্চঙ্গে[৬৭] বিবৃত নিরর্থের গল্পটিতে প্রতিফলিত হইয়াছে ; নিরর্থকে সাধারণতঃ বলিদ্বীপীয় পুরোহিতগণের পূর্বপুরুষরূপে গণ্য করা হয়। তিনি মজপহিত হইতে দহ হইয়া পসুরুহন এবং সেই স্থল হইতে ব্লঙ্‌বঙ্গন গমন করেন ; অতঃপর ব্লঙ্‌বঙ্গনে কিছুকাল থাকিয়া তিনি বলিদ্বীপে চলিয়া যান। ইহার পর গেল্‌গেলের রাজা বতু রেঙ্গোঙ্ তাঁহাকে গেল্‌গেলে আমন্ত্রণ জানাইলে তিনি সেখানকার আশ্রমে বাস করিয়া গ্রন্থ

রচনা করিতে থাকেন। তিনি স্মরার্চন কাব্যের প্রত্যুত্তর স্বরূপ শরকুসুম রচনা করেন[৬৮]। নিরর্থের পুত্র তলাগ অন্ততঃ চৌদ্দটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন[৬৯]। তাঁহার পুত্রও কবি, দার্শনিক এবং বিচারক হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে তিনি তর্ক-ব্যাকরণেও সুনিপুণ ছিলেন। নিরর্থ সম্ভবতঃ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের সন্নিকটবর্তীকালে বলিদ্বীপে আসিয়াছিলেন[৭০]; সুতরাং তাঁহার সাহিত্য সাধনাও এই সময় হইতে প্রসারিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালে বলিদ্বীপে যে সাহিত্যিক প্রচেষ্টা চলিয়াছিল তাহার মূলে নিরর্থ-পরিবারের অনেক দান ছিল।

রঙ্গ লবে, কিদুঙ্ সুন্দ (খ), গদ্যে রচিত দুইটি উসন ইতিবৃত্ত এবং আরও কয়েকখানি গ্রন্থ বলিদ্বীপে রচিত হইয়াছিল এবং ইহাদের সহিত যবদ্বীপীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বা কিম্বদন্তীর সহিত সাক্ষাৎ সংযোগ ছিল না। মজপহিতের গৌরবময় যুগে এই সকল ঐতিহাসিক কিম্বদন্তী যবদ্বীপীয় ঔপনিবেশিকগণের মাধ্যমে বলিদ্বীপে প্রচারিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা অতীব স্বাভাবিক যে যদিও এই সমস্ত গ্রন্থে পররতনের মধ্যবর্তী অংশের বিষয়বস্তু লইয়া আলোচনা হইয়াছে, তথাপি এই সমস্ত গ্রন্থের সহিত পররতনের অনেক পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে এই পার্থক্য কবিজনসুলভ কল্পনার জন্য হইয়াছে। অন্য কারণও বিদ্যমান থাকা অসম্ভব নহে। হয়ম ভুরুকের যুগে যবদ্বীপে অনেক ইতিকথা বা কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল। মজপহিত হইতে যে সমস্ত ঔপনিবেশিক বলিদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতেও অনেক ইতিকথা ও জনশ্রুতি শুনিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিভিন্ন ধারার গঙ্গোত্রীসঙ্গম হইয়াছে এই শ্রেণীর রোমান্সের ঐতিহাসিক বা অর্ধ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে[৭১]।

আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিতে অর্থাৎ বাবাদ এবং সজরগুলিতে ঘটনা এবং কল্পনার নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর পরে ভারত-যবদ্বীপীয় ইতিহাস রচনা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইয়াছে; সুতরাং অনৈতিহাসিক ঘটনাকে সত্যের মুখোশ পরাইয়া উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে—

(১) রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, যাহা মজপহিতের পতনকাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত মধ্যে মধ্যেই দেখা দিয়াছিল।

(২) ইস্লামের অভ্যুদয় ইতিহাসের প্রাচীন গতিপথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল।

(৩) প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা মননশক্তিকে খানিকটা পঙ্গু করিয়া দিয়াছিল।

(৪) লিখিত এবং মৌখিক কিম্বদন্তী পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

(৫) পরবর্তী যুগের সঙ্কলনকারীদের নিপুণতার অভাব।

(৬) মজপহিত যুগের পরে যে সমস্ত রাজা শাসন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সূর্য এবং চন্দ্রবংশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবার উদগ্র কামনা।

এই সমস্ত গ্রন্থকে অনুগ্রহ করিয়া 'ঐতিহাসিক' আখ্যা দেওয়া চলিতে পারে, কিন্তু

ইহার সেজন্য নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নাই। ইহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা (১) প্রথমাংশে প্রাচীন যুগের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করা হইয়াছে, (২) দ্বিতীয়াংশে ইস্লামোত্তর পর্বের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

কোন কোন গ্রন্থে বিভিন্ন শ্রেণীর উপাদান একত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে রাজা পকুবুভনের (১৮৫০-৫৮ খৃষ্টাব্দ) সভাকবি রঙ্গবসিস্ত কর্তৃক লিখিত পুস্তক রজ পুর্বে কেবলমাত্র যে মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণ হইতে উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা নহে, উহাতে কঞ্চিল-গল্প-সাহিত্য হইতেও কাহিনী সঙ্কলন করা হইয়াছে[১২]। বাবাদ তানা জাভিতে আবার রাজবংশের তালিকার মধ্যে মহাভারতের বীর অর্জুন এবং তাঁহার পূর্বপুরুষগণকে দেখিতে পাইতেছি। শিব এবং ব্রহ্মাও যবদ্বীপবাসীদের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে বিদ্যমান আছেন। এই ভারতীয় এবং মালয়-পলিনেশীয় উপকথার সহিত রোমান্টিক সাহিত্যের ঐতিহাসিক কিম্বদন্তী, কল্পিত এবং সত্য কাহিনী, কোথাও কোথাও মাণিকমায়া শ্রেণীর গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত জগৎসৃষ্টিকাহিনীর অংশবিশেষ সংমিশ্রিত হইয়া এই পর্যায়ের গ্রন্থ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা আর যাহাই হউক, অন্ততঃ ইতিহাস নহে। অবশ্য ইহা হইতে এই ধারণা করা সঙ্গত হইবে না যে সমস্ত গ্রন্থই এই প্রকারে রচিত হইয়াছে। ডঃ হেজো[১৩] বলিয়াছেন যে কোন কোন গ্রন্থের যে অংশে জাভার বর্তমান ইতিহাস (সপ্তদশ শতাব্দী হইতে) আলোচিত হইয়াছে তাহাকে বাস্তবিকই ঐতিহাসিক আখ্যা দেওয়া চলে। এই সমস্ত বাবাদের নামকরণ হইতে অনেক সময় গ্রন্থটি কোন যুগের কাহিনী বিবৃত করিয়াছে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। বাবাদ বেস্থকী, বাবাদ বন্দবস, বাবাদ বলম্বঙ্গন, বাবাদ মাদুর, বাবাদ জঙ্গল, বাবাদ মজপহিত, বাবাদ মতরম প্রভৃতি নাম এই দিক দিয়া বিশেষ অর্থবহ। এক নির্বাসিত রাজা বাবাদ দিপনেগর রচনা করিয়াছিলেন এবং ইহাতে জাভার প্রাচীন ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইয়াছে। বাবাদ পলিহন নেগরির প্রারম্ভে সুরাকার্তার প্রতিষ্ঠার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে এবং ইহা শেষ হইয়াছে মঙ্কুনেগরের বিবরণী দিয়া (যসদিপুরের সংস্করণ)। অনুরূপভাবে বাবাদ বেড়হ্ ঙ্গযোগযা নামক গ্রন্থে ইংরেজগণ কর্তৃক যোগযার ক্র্যাতন্ বা রাজপ্রাসাদ আক্রমণকাল পর্যন্ত যোগযার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করা হইয়াছে[১৪]। এই সমস্ত বাবাদের অনেকগুলিতেই স্বাভাবিক ভাবে ঐশ্লামিক প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে বাবাদ তানা জাভি-তে আদমকে যবদ্বীপীয় রাজগণের পূর্বপুরুষ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। হজরত মহম্মদের ইতিহাস এবং কয়েকজন বীরের অসমসাহসিকতার বিবরণ মুসলমান প্রভাবসঞ্জাত। ডঃ জয়দিনিঙ্গরাৎ[১৫] জক বোড়োর কাহিনীর দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। উহাতে হজরত মহম্মদের ইতিবৃত্ত সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। যদিও পুস্তক রজ পুর্ব এবং ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ ১ শকাব্দ হইতে জাভার ইতিহাস পরিবেশন করিবার স্পর্ধা রাখে, তবুও ইহাদের সময়ের পারম্পর্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা নাই। ইহা প্রমাণ করা আদৌ কষ্টসাধ্য নহে যে অনেক ক্ষেত্রে দেশ এবং ব্যক্তির নামে বিপর্যয় হইয়াছে এবং যে সন তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহা অনেক ক্ষেত্রেই ভুল।

জাভার প্রাচীন ইতিহাস সংক্রান্ত এই সমস্ত কিম্বদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে মতরমে, সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে[১৬]। ইহার অনেক কাহিনী পূর্বেই এক বিশিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছিল ; সুতরাং তাহারা একই রূপে বিভিন্ন বাবাদে সমুপস্থিত। এই সমস্ত গ্রন্থের সহিত যবদ্বীপের প্রাক্-মুসলিম ঐতিহাসিক রচনার গুরুতর পার্থক্য আছে। কারণ, যদিও শেষোক্ত রচনায় কেন আংগ্রোকের অলৌকিক কাহিনীর মত আখ্যান স্থান লাভ করিয়াছে তবুও উহাতে যবদ্বীপীয় রাজগণের বংশতালিকায় রামায়ণ এবং মহাভারতের বীরবর্গকে সমুপস্থাপিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই। ইহা আশ্চর্য মনে হয় যে প্রাচীন মুসলমান লেখকগণ হিন্দু অপেক্ষা বিশিষ্টতর ঐতিহাসিক হইলেও তাহারাও ঘটনা এবং কল্পনার সংমিশ্রণে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

পা দ টী কা

১. Raffles, *History of Java*, II, (1830) pp. 73 ff.

২. অর্থাৎ কলিঙ্গ।

৩. Raffles, ঐ, পৃঃ ৮৭ হইতে।

৪. এই শ্রেণীর অন্যান্য কাহিনী সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য : *Catalogue of Manuscripts in European languages belonging to the Library of the India Office*, vol. I, pt. I, 1916, pp. 15 ff.

৫. Raffles, ঐ, পৃঃ ৭৮-৮২ এবং ৮৬ পৃষ্ঠার বংশ-তালিকা। র‍্যাফ্‌লসের গ্রন্থ হইতে যে সারাংশটুকু আমরা উপরে সংকলন করিয়া দিয়াছি তাহা "নাত কুসুম কর্তৃক সংগৃহীত জাভার পূর্বাঞ্চল, সুমেনপ এবং বলি অঞ্চলে প্রাপ্ত পুঁথির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত"। নাত কুসুম "তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য কেবলমাত্র যে যবদ্বীপের অধিবাসী-বর্গের মধ্যে বিখ্যাত তাহা নহে, তিনি সভ্যতায় অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ইওরোপীয় জাতিসমূহেরও শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য।"

৬ *Oud en Nieuwe uit Javaansche Letterkunde*, 1921 p. 6.

৭. ঐ, পৃঃ ৭।

৮. ঐ, পৃঃ ৩।

৯. Brandes-Krom, *OJO*, p. 7.

১০. ঐ, পৃঃ ৫৫।

১১. Fleet, *Corpus Inscriptionum Indicarum*, III, p. 25.

১২. ঐ, পৃঃ ৯২।

১৩. দ্রষ্টব্য : *Aanw. Kol. Inst.*, 1934, Bijl. A.

১৪. *OJO*, XII.

১৫. *KO*, XV.

১৬. Gonda, *Sanskrit in Indonesia*, pp. 212 ff.

১৭. Vide *KO* XIV, XIX ; Stutterheim in *OV*, 1925 ; Van Naerssen in *Oudjav. Oor.*

Duitsche Deensche Verza., 1914, p. 4; Stutterheim in *TBG*, 75; Brandes in *TBG*, 32 (1889) etc.

১৮. Pigeaud, *Java in the 14th Century* I, p. 111, vol. III, pp. 159-60.

১৯. Kern, *VG* VII and *OJO*, LXII.

২০. Vide Pigeaud, *op. cit.*, vol. III, pp. 159-60, pl. 9, recto : 2-3.

২১. Vide Pigeaud, *Decree Jaya Song* in *Ibid* I, pp. 104-7; III, pp. 151-55.

২২. তুলনীয় Gonda, *De Letterkunde van de Indische Archipel*, p. 21.

২৩. *Ibid* pp 21-23.

২৪. *VBG* 54 (1902).

২৫. Kern *VG* VII and VIII.

২৬. ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে। ইহাকে এক হিসাবে অধ্যাপক কার্ণের গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বলা যায়।

২৭. *BKI* 80 (1924).

২৮. Dr. Th. Pigeaud, *Java in the 14th Century*, vol. I-V, The Hague, 1960-1963.

২৯. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Stutterheim, *De kraton van Madjapahit*, 1948.

৩০. ডঃ পিগো তাঁহার মতের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে উচ্চ শ্রেণীর সর্বনাম এবং ক্রিয়াত্মক শব্দ (predicate) 'সির' দ্বারা কবি প্রপঞ্চের পিতাকেই বুঝাইতেছে; কারণ এই শব্দটি নিজের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা তাঁহার পক্ষে আত্মম্ভরিতার পরিচায়ক হইবে। দ্বিতীয়তঃ "যযঃ" (= পিতা) শব্দটি দ্বারা প্রপঞ্চের পিতার পিতা অর্থাৎ পিতামহকে বুঝাইতেছে।

এই মত গ্রহণ করার পক্ষে কতকগুলি বাধা বিদ্যমান। কারণ, যিনি নিজেকে কবি বলিয়া তাঁহার নামের পূর্বে উচ্চ সম্মানজনক সঙ্ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে 'সির' শব্দ ব্যবহার করিয়া কিঞ্চিৎ আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করা আশ্চর্য নহে। দ্বিতীয়তঃ মূল শ্লোকের 'সির' শব্দটি 'সঙ্ কবি' শব্দের পরে ব্যবহৃত হইয়াছে; 'সঙ্ কবি পুত্র'-এর পরে নহে। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই 'সির' শব্দটি সঙ্ কবিকেই নির্দেশ করিতেছে। তৃতীয়তঃ প্রপঞ্চের পিতা রাজার অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি ছিলেন; নাগরকৃতাগম পাঠ করিলে তাঁহার জ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা তাঁহার ধর্মাধ্যক্ষপদের অনুপযোগী নহে। তিনি রাজার সমসাময়িক হইলেও তাহার অর্থ ইহা নহে যে উভয়েই একই বৎসরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; বরঞ্চ ১৭।৯ শ্লোক পাঠ করিলে মনে হইবে যে রাজার বাল্যকালে তাঁহার (প্রপঞ্চের) রাজনির্দেশ প্রতিপালন করিবার বয়স ও বিবেচনা হইয়াছিল। চতুর্থতঃ অষ্টাদশ সর্গের সপ্তম শ্লোকের চতুর্থ চরণে যে ধর্মাধ্যক্ষকে বুঝাইতেছে তিনি খুব সম্ভব প্রপঞ্চ; কারণ প্রপঞ্চের পিতা বৌদ্ধ ধর্মাধ্যক্ষ রূপে এই রাজ-সফরে গিয়াছিলেন কিনা অথবা তিনি এই সময়ে আদৌ জীবিত ছিলেন কিনা তাহা সন্দেহস্থল। শৈব ধর্মাধ্যক্ষ এই সফরে গিয়াছিলেন বলিয়া সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই; সুতরাং প্রপঞ্চের কবি হিসাবে যাওয়া বিচিত্র নহে এবং তিনি হয়তো এই উপলক্ষ্যে পথিপার্শ্বস্থ বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি সন্দর্শন করিয়াছেন। পঞ্চমতঃ ৩৯ সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথমেই পড়িতেছি "ন্দ সঙ্গতব্য তে কি ম্ লুন মাজরোসেন"; এইস্থলে অশীতিপরবৃদ্ধ রাজবংশের জ্ঞাতি এবং সুঙ্গু মঠের অধ্যক্ষ রঙ্গাংশ বলিতেছেন :

"তৎপরে আপনার অনুমতি লইয়া আপনার ভৃত্য এইক্ষণেই এখানে উপদেশ দিবেন।" এই সম্মান প্রপঞ্চ ধর্মাধ্যক্ষ না হইলে পাইতেন কিনা সন্দেহ। বস্তুতঃ ৩৮ সর্গের পঞ্চম শ্লোকের ৪র্থ পাদে প্রপঞ্চের আগমন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ইহা যেন স্বপ্নের মতো অলৌকিক ঘটনা। এত উচ্ছ্বাস প্রপঞ্চ ধর্মাধ্যক্ষ না হইলে কি সম্ভব হইত?

এই সমস্ত কারণে আমরা পূর্বের অভিমতই সমর্থন করিতেছি।

৩১. এই ধর্মাধ্যক্ষ প্রপঞ্চ ভিন্ন আর কেহই নহেন বলিয়া আমার মনে হয়।

৩১ক. মদ + করি (= গজ) = মদ + গজ = গজ মদ।

৩২. ডঃ পিগো বলিয়াছেন (*Java in the 14th Century*, IV p. 61) যে রাজকীয় সফর চলিত অপরাহ্ন, রাত্রি এবং প্রভাত সময়ে। অন্য সময়ে উহার বিরতি ঘটিত।

৩৩. বন্ধনীর মধ্যকার সংখ্যা দ্বারা সর্গের আরম্ভ সূচিত হইতেছে, শেষ নহে।

৩৪. ডঃ পিগো বলিয়াছেন (*Java in the 14th Century* IV, p. 79) যে এইরূপ ভাসমান তাবু বা bale kambang জাভা ও বলিদ্বীপের রাজগণের প্রমোদ ও নীরব সাধনার জন্য ব্যবহৃত হইত।

৩৫. Cf. *Java in the 14th Century* IV, p. 84.

৩৬. ভান ষ্টাইন্ ক্যালেনফেল্‌স সাগর-মন্দিরকে চণ্ডী কেড়তনের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। এই স্থলের প্রাচীর গাত্রে অর্জুনবিবাহ রূপায়িত হইয়াছে। উপরোক্ত মত সন্দেহাতীত নহে।

৩৭. সম্ভবতঃ মহাভারত বা পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের কোন আখ্যায়িকা।

৩৮. সম্ভবতঃ রাজার প্রপিতামহ কৃতনগরের শিববুদ্ধ মূর্তির পদতলে এই পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনি ছিলেন সিঙ্গসরির শেষ রাজা (vide Pigeaud, *op. cit.*, IV p. 107).

৩৯. পূর্বপুরুষের ভস্মাধারযুক্ত মন্দিরকে চণ্ডী বলিত। তবে মজপহিত যুগে অন্যান্য মন্দিরকেও চণ্ডী বলিত ইহার সম্ভাবনা রহিয়া গিয়াছে। তুলনীয় Pigeaud, *op. cit.*, IV p. 115.

৪০. খৃষ্টীয় সন অনুযায়ী এই তারিখ ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ৩১০২ খৃঃ পূঃ অব্দ।

৪১. ৬৩।২। এই স্থলে শ্রদ্ধা = শ্রাদ্ধ। প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় অকার-আকারের মধ্যে পার্থক্য নাই।

৪২. ইহা সম্ভবতঃ ক্রিয়াতন্ত্র, চর্যাতন্ত্র এবং যোগতন্ত্র। দ্রষ্টব্য Pigeaud, *op. cit.*, IV p. 181.

৪৩. ইহাদের ধর্মস্থানের নামের মধ্যে বুদুরের নাম পাইতেছি। সম্ভবতঃ ইহা বরবুদুর ভিন্ন আর কিছু নহে।

৪৪. 'সীম'-দ্বারা সাধারণতঃ দেবোদ্দিষ্ট খাজনাবিহীন জায়গা বুঝায়।

৪৫. ইহা হইতে অনুমিত হয় যে চতুর্দশ শতাব্দীতে যবদ্বীপে বৈষ্ণবগণ একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ছিল। যবদ্বীপীয় কোন কোন রাজা মৃত্যুর পরে বিষ্ণুমূর্তি পরিগ্রহণ করিলেও যবদ্বীপে এই সম্প্রদায়ের প্রভাব খুব বেশী ছিল না।

৪৬. বিধানাবলী। কেহ কেহ ইহাকে রাজপতিগুণ্ডল নামক গ্রন্থের বিকৃত রূপ বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Pigeaud, *op. cit.*, IV pp. 253-4.

৪৭. পিগো কর্তৃক "মহাকব্য নৈয়েয়িকাদি"-কে "সাঙ্খ্য নৈয়ায়িক" রূপে সংশোধন করার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ এস্থলে শব্দের আমূল পরিবর্তন সাধিত হইতেছে (Pigeaud, *op. cit.*, II p. 95 ; vol. IV p. 269)

৪৮. ইহা অধ্যাপক কার্ণকে কথাসরিৎসাগরের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল।

৪৯. *BEFEO*, 1958, p. 228.

৫০. নাগরকৃতাগম ১।৪।

৫১. তুলনীয় খিল হরিবংশ, ৫৯ অধ্যায়।

৫২. পররতনের শেষ ঘটনার তারিখ ১৪৮১ খৃষ্টাব্দ।

৫৩. Brandes-Krom, *Pararaton*, Introd., p. 5.

৫৪. *Geschiedenis*, p. 23.

৫৫. *Middeljavaansche historische traditie*, 1927 pp. 8-9.

৫৬. এই ব্যাপারটির সহিত তুলনীয়, Brandes-Krom, *Pararaton*, Chap. X, p. 157.

৫৭. Berg, *op. cit.*, p. 11.

৫৮. *Ibid*, pp. 14 ff.

৫৯. *Pamañcangah* edited by Berg, 1929.

৫৯ক. তুলনীয় Pigeaud, *op. cit.*, IV, p. 196.

৬০. *Voorloopig Verslag* etc., pp. 21-22 ; cf. *VBG* XXIII pp. 24-25.

৬১. Juynboll, *op. cit.*, p. 388 ; *Usana Java*, pp. 159-62। ইহার আধুনিক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য : Krom, *Geschiedenis*, p. 391 ; R. C. Majumdar, *Suvarnadvipa* I p. 425. Discussion by Berg, *op. cit.*, pp. 103-121.

৬২. *TBG*, 9th year 3rd volume, pp. 245-73, particularly 277-78 ; Juynboll, *op. cit.*, pp. 385 ff.

৬৩. *Op. cit.*, II pp. 112 ff. ; see also Friederich, *op. cit.*, vol. XXII, p. 21 ; *BKI* (1877), p. 145 ; *Ibid*, 1887 p. 575 ; Juynboll, *op. cit.*, I, pp. 255 ff. *Rangga Lawe*, ed. Berg, Bibliotheca Javanica, no. 1.

৬৪. Brandes-Krom, *Pararaton*, p. 137, Berg, *op. cit.*, p. 62.

৬৫. *BKI*, 83 (1927) pp. 1-61 ; Juynboll, *Supplement* I, p. 234.

৬৬. *BKI* 83 (1927) p. 5.

৬৭. Berg, *Middeljavaansche historische tradities*, p. 20.

৬৮. *Ibid*, p. 28.

৬৯. *Ibid*, p. 31.

৭০. *Ibid*, p. 37.

৭১. *Ibid*, p. 20.

৭২. Hosein Djajadiningrat, *Critische beschowing van de Sajarah Banten* (1913) pp. 279, 290, 298, 300.

৭৩. *Oud en Nieuwe uit de Javaansche Letterkunde*, 1921, p. 3.

৭৪. Cf. *Pararaton* pp. 206-11 (edition of Brandes-Krom)। প্রমাণপঞ্জী এই গ্রন্থের ২০৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

৭৫. *Op. cit.*, p. 298. Cf. Shrieke, *Het Boek van Bonang*, 1916, pp. 48-55.

৭৬. Cf. Hosein Djajadiningrat, *op. cit.*, p. 303 ; Krom, *op. cit.*, p. 25.

চ তু র্বিং শ অ ধ্যা য়

উপসংহার

দ্বীপময় ভারতের সাহিত্যের উপর ভারতীয় প্রভাব কিরূপ সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল তাহা পূর্বোক্ত আলোচনা হইতেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই ভারত-যবদ্বীপীয় সাহিত্যের বিকাশ যেন কিছুটা আকস্মিক বলিয়া মনে হয় ; যখন ইহার প্রথম রূপ আমাদের নয়নগোচর হয় তখন ইহা প্রায় সর্বাঙ্গ-সুন্দর ; দেবী মিনার্ভার মত যেন ইহা সহসা বিভিন্ন অঙ্গে অস্ত্রধারণ করিয়া আবির্ভূত হইল। যদিও সংস্কৃত শব্দের প্রাচীন সংক্ষিপ্ত যবদ্বীপীয় ব্যাখ্যা এবং আনুসঙ্গিক সাহিত্যিক বিষয় ৭৭৮ খৃষ্টাব্দের সন্নিকটবর্তী কাল হইতে পাওয়া যায়, তথাপি প্রকৃত সাহিত্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা কেবলমাত্র দশম শতাব্দীর শেষাংশেই দৃষ্টিভূত হয়। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত যবদ্বীপীয় সাহিত্যের মন্দাকিনী প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছে ; এই যুগের অধিকাংশ রচনাই কাব্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যদিও পৃথিবীর সাহিত্যে তাহার দান অসামান্য নহে, তবুও ভারতীয় সাহিত্যের অবদান হিসাবে উহার মূল্য আছে। এই সাহিত্য অনেক দিক দিয়া অপ্রকৃত মনে হইলেও ইহা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের উপর আংশিক আলোকসম্পাত করিয়াছে। এই সমস্ত কাকাবিন পড়িবার সময় মনে হয় আমরা যেন আমাদের কোন প্রাদেশিক ভাষায় ভারতীয় সাহিত্য পাঠ করিতেছি। সংস্কৃত শব্দ এবং শ্লোকসম্ভার গ্রন্থ মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিয়া এই ধারণাই বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করে। সুতরাং এই সমস্ত গ্রন্থের মূল্যায়নে আমরা এই কথাই বলিতে পারি যে এই গ্রন্থগুলির সাহায্যে আমরা কোন কোন সময় ভারতীয় সাহিত্যের সংশ্লিষ্ট অংশের নির্ভুলতা বা প্রাচীনত্বও বিচার করিতে পারি ; ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বীপান্তরে কিরূপ বেশ পরিগ্রহণ করিয়াছে তাহা বুঝিতেও ইহাদের অবদান কম নহে। যবদ্বীপীয় গ্রন্থকারদের স্বপক্ষে আমরা একথা বলিতে পারি যে যদিও তাহারা এক হিসাবে ভারতীয় ভাব-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তবুও তাঁহারা অনেক সময়ে উহাতে যথেষ্ট মৌলিকতাও প্রদর্শন করিয়াছেন।

অনেক স্থলে আদিরস প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার আধ্যাত্মিকতার আবেদনও নিতান্ত কম নহে। এই আদিরসের প্রাধান্য ভারতীয় শিল্প এবং সাহিত্যেও নিতান্ত অপ্রচুর নহে ; এতদ্ব্যতীত সেই যুগের রুচিবোধকে বর্তমান যুগের মানদণ্ডে বিচার করিলে চলিবে না। যুগে যুগে রুচির যে মান ছিল তাহা সাহিত্যে ও শিল্পে প্রতিফলিত হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবন, খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, সাধারণ লোকের সুখদুঃখ এবং গৃহস্থালীর কথা নিতান্তই দুর্লভ। এই সাহিত্যের কারবার অধিকাংশ-স্থলেই ধর্ম, পুরাণ এবং মহাকাব্য লইয়া ; সুতরাং এই সমস্ত সংবাদ সাহিত্যের দরবারে বিশেষ স্থান পায় নাই ; উহা নেপথ্যে রহিয়া গিয়াছে। এই দিকের সংবাদ কিছুটা হয়তো মন্দিরের রিলিফে প্রতিফলিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার কতটা আবার কল্পনার জগতের, কতটা বাস্তব জগতের তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বস্তুতঃ যবদ্বীপের প্রাচীন সাহিত্যে এবং আর্টে বাস্তবের প্রতিফলন অত্যন্ত সীমায়িত।

প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যের একটি দুর্বল দিকও আছে। বর্তমানে যে গ্রন্থগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহা দিয়া যবদ্বীপীয় সাহিত্যকে বিচার করিলে বলা যায় যে যবদ্বীপীয় লেখকগণ নাট্য-সাহিত্য ও গীতিকাব্য রচনায় সস্নেহ দৃষ্টিপাত করেন নাই, যদিও ইহা একেবারে অনুপস্থিত ছিল ইহা মনে করিবারও কোন কারণ নাই। বিজ্ঞানের কোন কোন শাখা নিতান্ত শৈশবাবস্থায় ছিল, তবে সাহিত্য প্রচেষ্টার অন্য দিকে, যেমন কামশাস্ত্র, সঙ্গীত, পশুপক্ষী সংক্রান্ত রচনায়ও তাহাদের প্রতিভা নিয়োজিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় যবদ্বীপের ভাষা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এত সীমাবদ্ধ যে, উহার সমগ্র সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সর্বাত্মক ধারণা করা অত্যন্ত দুরূহ। তবুও দ্বীপময় ভারতের যে সাহিত্য আমাদের যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা লইয়া দ্বীপময় ভারতের অধিবাসীবর্গের গৌরব করিবার সুসঙ্গত কারণ রহিয়াছে। এই সাহিত্য সাধনায় যবদ্বীপ এবং ভারতীয় লেখকগণ যে সহযোগিতা করিয়াছেন এবং সেই সহযোগিতায় যে অমৃতময় ফল ফলিয়াছে তাহা আজিও দেশবিদেশের সাহিত্য রসিকগণের অভিনন্দন লাভ করিয়াছে। সাংস্কৃতিক এই সহযোগিতার ফলে যে অমৃতময় ফল ফলিয়াছে তাহার সম্বন্ধে ডঃ গপ্তা (Sanskrit in Indonesia, p. 21 ff.) কয়েকটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। "বস্তুতঃ ভারতবর্ষই দ্বীপময় ভারতের প্রধান প্রধান দ্বীপগুলিকে অন্যান্য দেশের সহিত সংযোগ-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সভ্যতার উচ্চতর স্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ভারত তাহাদের গোষ্ঠিভিত্তিক সমাজকে রাষ্ট্রের মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছে, তাহাদের রীতিকে দিয়াছে আইনের রূপ এবং তাহাদের উপকথা বা রূপকথাকে সাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছে। পরবর্তী যুগে এই ভারতবর্ষই পুনরায় এইখানে লইয়া আসিল ইস্‌লাম, মুসলিম সাহিত্য এবং ফার্সী এবং অন্যান্য অনুবাদের ছদ্মবেশে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার উপকথা এবং কাহিনী ; সুতরাং তাহাদের অনেক ঘুমপাড়ানী গান বা ছেলে ভুলানো ছড়া ইউরোপের মতই পঞ্চতন্ত্র এবং অন্যান্য ভারতীয় সঙ্কলন হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে।"

হিন্দু সভ্যতার জারক-রসে পরিপুষ্ট হইয়া দ্বীপময় ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্রুত বিকাশ লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম যতদিন প্রাণোচ্ছল ছিল, ততদিন উহার নিজস্ব একটা শক্তি ছিল, ততদিন উহা দক্ষিণপূর্ব এসিয়ার বিভিন্ন স্থলে এবং দ্বীপময় ভারতের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অপূর্ব প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ এবং পূর্বাঞ্চল বিশেষভাবে এই সাংস্কৃতিক মহাযজ্ঞে হোতার আসন পরিগ্রহণ করিয়াছিল। বণিকগণের কল-

কোলাহলমুখর বন্দর, রাজধানী, মন্দির, বিহার প্রভৃতি কেন্দ্র হইতে উৎসারিত সাংস্কৃতিক ধারা ক্রমে ক্রমে দ্বীপময় ভারতের বিভিন্ন স্তরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। শহর হইতে গ্রামে গ্রামে ইহার প্রসার ঘটিল। তবে ইহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে যে এই সাংস্কৃতিক বিস্তৃতি যতই দূরে প্রসারিত হইতে লাগিল ততই ইহার প্রাণশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িল। সুদূর গ্রামাঞ্চলে হিন্দু-বৌদ্ধ প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক ইন্দোনেশীয় ধর্মমত, আচার-ব্যবহার, প্রেতাত্মার জগতে বিশ্বাস সমস্ত মিশ্রিত হইয়া এক নূতন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছিল। যতদিন ভারতবর্ষের হিন্দুধর্ম প্রাণময় ছিল এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল ততদিন দ্বীপময় ভারতের হিন্দু তথা বৌদ্ধ সত্তার অস্তিত্ব রহিল, কিন্তু ভারতে মুসলিম প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার পর এই যোগ-সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। তখন নেপথ্য হইতে ইন্দোনেশীয় বা অষ্ট্রোনেশীয় ভাবধারা জাতীয় জীবনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইল। এই পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংস্কারের বিভিন্ন পর্যায়ে জাতিগত সংমিশ্রণও ঘটিয়াছিল। দক্ষিণপূর্ব এসিয়ার বিভিন্ন স্থলে এবং দ্বীপময় ভারতে এই রক্ত সংমিশ্রনের সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণও রহিয়া গিয়াছে। যাহাই হউক ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসারের ফলে দক্ষিণপূর্ব এসিয়া এবং দ্বীপময় ভারতে এক নূতন সভ্যতার অভিষেক হইয়াছিল। যবদ্বীপ এবং বলিদ্বীপে ইহার ব্যাপক পরিচয় রহিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ এই স্থলে এক সময়ে রাজাদের মন্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্মণ, দরবারের ভাষা ছিল সংস্কৃত, স্থাপত্য ছিল ভারতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ, সমাজে চতুর্বর্ণের প্রচলন ছিল। যাগযজ্ঞ, ব্রাহ্মণ, শৈব, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ধর্ম, জ্যোতির্বিদ্যা, দূরত্ব ও কালমাপক শব্দ, কাব্য, ধর্মগ্রন্থ, পৌরাণিক কাহিনী ও রূপকথা, আইন-কানুন, ব্যাকরণ প্রভৃতি একত্র হইয়া জাভা-বলিদ্বীপে এক সময় এক ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ রচনা করিয়াছি। বস্তুতঃ এ কথা অতীব সত্য যে যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের অধিবাসীবর্গ আজিও জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ভারতের অতীত ঐশ্বর্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বাস করিতেছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি ইহারই সাহিত্যিক পরিচায়িকা।

নির্ঘণ্ট

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	৮	সজ্ঞাত	সঞ্জাত
১৩	৮	গৃহ	বৃক্ষ
২৫	১৮	অনুশীলয়	অনুশীলন
৩১	৮	পরবতন	পররতন
৪৫	২৮	বা	রা
৭৪	২৮	কুঞ্জরকুঞ্জের	কুঞ্জরকর্ণের
৭৭	২১	বয়াঙ্	ওয়েয়াঙ্
১২৭	৫	জীবনচরণের	জীবনাচরণের
১২৯	১৬	কুঞ্জরকর্ণ	কুঞ্জরকর্ণে
১৩০	১	কর্ণ	কার্ণ
১৩৩	৭	হই	হইল
১৩৮	১৭	হোম-এয়	হোম-ত্রয়
১৫৫	১৪	এবুলন	ত্রবুলন
২০৫	২১	পুনবসু	পুনর্বসু
২৬১	৩	কোদিরি	কেদিরি
২৭৮	১৫	সংস্কৃতে	সংস্কৃত
২৮৩	১৯	বাজধানী	রাজধানী
২৯৫	১৭	প্রমথ	প্রথম
৩১০	২৮	কুঞ্জরকুঞ্জে	কুঞ্জরকর্ণে
৩৪১	২৬	শৌধ	সৌধ
৩৪২	১০	স্বরদহনের	স্মরদহনের
৩৪৩	৩	স্বরদহন	স্মরদহন
৩৫৬	৭	প্রেমবিলাশ	প্রেমবিলাস
৩৯৭	১৯	প্রারম্ভে	প্রারম্ভে
৩৯৯	২২	সিঙ্গসরি	মজপহিত
৪০৮	৩	সুতরাং স্থল	সুতরাং তাঁহার স্থল
৪২০		চতুর্বিংশ অধ্যায়	দ্বাবিংশ অধ্যায়